গোপভূমের
স্বরূপ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

শিবশংকর ঘোষ

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন
কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
৮ ডিসেম্বর, ২০০০

টাইপসেটিং ঃ
ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স

মুদ্রণ ঃ
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১এ, গড়পার রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

।। উৎসর্গ ।।

পরম করুণাময় কারণিকের কৃপায় যাঁদের অপরিশোধ্য স্নেহ, মায়া, মমতা ও অনুকম্পায় পরিপালিত হয়ে, এই ধরিত্রীর মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার অনন্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ অন্তরে অনুরণিত হয়েছিল— আমার সেই পরম পূজ্য জন্মদাতা ভূপতিভূষণ ঘোষ ও গর্ভধারিণী মহিমময়ী মা ঊর্মিলা দেবীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই সৃষ্টি উৎসর্গিত হল ——

ভূমিকা

শ্রীমান শিবশংকর ঘোষ বর্ধমান জেলার ভাতাড় থানার এক প্রাচীনবর্ধিষ্ণু গ্রাম একুয়ারের বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষক, নেশায় গবেষক শ্রী ঘোষ দক্ষিণরাঢ়ের এক অনালোকিতস্থান গোপভূমের অবস্থান, আয়তন ও তার ইতিহাস, পুরাকীর্তি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যালোকে সমৃদ্ধ এক গ্রন্থ রচনা করেছে।

এই গ্রন্থে লেখক রাঢ়-বঙ্গের মধ্যমণি বর্ধমানের এক বিস্তৃত এলাকার কথা তুলে ধরেছেন। যে এলাকা কাটোয়া থেকে শুরু করে অজয়ের দক্ষিণ বরাবর পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে, আউশ গ্রামের গুসকরা ছুঁয়ে আরও দক্ষিণে গলসীর প্রান্তসীমায় দামোদর স্পর্শ করেছে। এই সীমার পশ্চিমেও সুবিস্তৃত এলাকার দক্ষিণে দামোদর, উত্তরে অজয় ও তাদের পশ্চিমে বরাকর নদীর বেষ্টনে আবদ্ধ বিস্তৃত বনাঞ্চলই একদা 'গোপভূম' নামে খ্যাত হয়েছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাকে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম বর্ধমান বলাই সঙ্গত।

যুগ যুগ ধরে অনালোকিত সেই অজয়-দামোদরের সোহাগ ঘেরা, তাদের সুদীর্ঘ দোয়াব অঞ্চলের কথা প্রায় অকথিতই রয়ে গেছে। লেখকের উদ্যোগী প্রচেষ্টায় আজ তা লোক সমক্ষে বিবৃত হতে চলেছে। সেই গোপভূমের প্রায় সমুদয় স্থানই এই গ্রন্থে, পাদ-প্রদীপের আলোয় এসেছে।

কল্যাণীয় শিবশংকর ইতিপূর্বে আরও তিনখানি তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ প্রনয়ণ করেছে। এটি তার চতুর্থ প্রয়াস। পূর্বের গ্রন্থগুলিতে লেখক তার অন্বেষা ও গবেষণার সুস্পষ্ট পরিচয় রেখেছে, ফলে সুধীসমাজে সেগুলি আদৃতও হয়েছে। এতেও তার বলিষ্ঠ মননের পরিচয় আরও সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত হয়েছে।

বর্ধমান সম্পর্কে বহু লেখকই অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। বর্ধমানের সামগ্রিক প্রামান্য ইতিহাস বলে সেগুলিকে ঠিক ধরা না গেলেও বহু লেখক এ প্রসঙ্গে নানা ভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছেন ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় প্রয়াস। সম্প্রতি আঞ্চলিক ভিত্তিতে কিছু কিছু পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। খণ্ডিত হলেও

এগুলির মূল্য আছে। সেইসব পুস্তক রচয়িতাদের নিয়ে একটি প্রামাণ্য পুস্তক রচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আনন্দ সংবাদ এই যে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য পুস্তক রচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে একটা মোটা অঙ্কের অনুদান পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জেলা পরিষদ ও পুর কর্তৃপক্ষের মিলিত সহায়তায় বর্ধমান সম্পর্কে লিখিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রণেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি প্রামাণ্য পুস্তক প্রকাশ করলে পাঠক সমান উপকৃত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে একাজে অগ্রসর হলেই তা সার্থক হতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে যারা পুস্তক রচনা করেছেন তাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সযত্ন প্রয়াসের অভাব লক্ষ্য করা যায়। শ্রীমান শিবশংকর এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে দেখে আমি আনন্দ পেয়েছি। কাটোয়া থেকে কল্যানেশ্বরী পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম বর্ধমানের অজয়-দামোদর উভয় নদীর উপত্যকাকেন্দ্রিক অঞ্চল তথা প্রাচীন গোপভূম সম্পর্কে বিশেষভাবে কোন পুস্তক বা রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা প্রায় নাই বললেই চলে। সেদিক থেকে শ্রী ঘোষের এই পুস্তকখানি সত্যই নতুনত্বের ও বিশেষত্বের দাবী রাখে। তার লেখা পূর্ববর্তী পুস্তকগুলির সব কটিতেই লেখকের সযত্ন প্রয়াস ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেছে। বর্তমান পুস্তকখানি রচনাতেও তার দীর্ঘদিনের সযত্ন প্রয়াস ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য এলাকা বা গোপভূমের প্রায় সকল গ্রাম ঘুবে ঘুরে সেখানকার মাটির স্পর্শে স্পর্শায়িত হয়ে তার ইতিহাস ও তথ্য আহরণের জন্য তিনি সুদীর্ঘকাল প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ফলে তা যথার্থই বাস্তবতা নির্ভর ও প্রামাণিক তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে।

বঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে রাঢ়ের প্রাণভ্রমরা হল বর্ধমান। তাই বর্ধমানকেই বঙ্গ সংস্কৃতির মহাজনের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে বৈষ্ণবসাহিত্য সহ মধ্যযুগীয় বিভিন্ন রচনায় তার প্রমাণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেই বর্ধমানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের এক প্রামাণ্যতথ্য সম্বলিত শ্রী ঘোষের "গোপভূম ঃ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি" গ্রন্থখানি বিশেষভাবে আদৃত হবে, এ আশা আমি রাখি। ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় এই বলিষ্ঠ গবেষকের কাছ থেকে আরও কিছু পাওয়ার আশায় রইলাম।

মুখবন্ধ

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সক্ষোভে বলেছিলেন— "বাঙালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী মানুষ হইবে না।" বস্তুত আমরা প্রকৃত অর্থেই যে ইতিহাস সচেতন নই, তা আমাদের প্রাক্ মধ্যযুগের ইতিহাস ও তার তথ্যানুসন্ধান ব্যাপৃত হলেই বোঝা যায়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কোন প্রাচীন ইতিহাস লিখে যাননি। অথচ গ্রিক সম্রাট আলেকজাণ্ডার সুদূর মেসিডোন থেকে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি সঙ্গে এনেছিলেন ঐতিহাসিক— যাঁর কাজ ছিল রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা, স্থানীয় মানুষের বর্ণ-বিভেদ, আকৃতি, ভাষা, বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস, আচার আচরণ কেমন ছিল তা লিপিবদ্ধ করা। এনেছিলেন অর্থনীতিবিদ যিনি বিজিত দেশের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা, উৎপাদিত ফসলের নাম ও তার মূল্যমান, উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন অঞ্চল, আমদানি, রপ্তানি, শিল্প ও তার অবস্থা, চাহিদা, বাণিজ্য ব্যবস্থা নথিভুক্ত করা। এনেছিলেন ভূতাত্ত্বিক ভৌগোলিক— যার কাজ ছিল নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, ভূমিরূপ, ভূমিক্ষয়, অরণ্য জঙ্গল, বন্দর প্রান্তর ইত্যাদির কথা লিপিবদ্ধ করা। এনেছিলেন চিত্রকর, যিনি সমগ্র এলাকার নকশা লিপিবদ্ধ করে দেশের একটি সামগ্রিক ইতিহাস ও তথ্য জেনে নিতেন। এককথায় দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ও বিবর্তনশীল সমাজের আঞ্চলিক ইতিহাস জেনে নেওয়া।

ভারতবর্ষের কোন সম্রাট ঠিক এইভাবে দেশ জয়কে ইতিহাস সমৃদ্ধ করেননি। তাই আমাদের রাঢ়ের আঞ্চলিক ইতিহাসের অনুসন্ধানের জন্য মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থের অবশিষ্ট কয়েক টুকরো পাতার খোঁজ করতে হয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে কিংবা আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে। হন্যে হয়ে ঘুরে মরতে হয় ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তের জন্য যারা এই প্রাচীন রাঢ় ভ্রমণ করেছিলেন। খুঁজতে হয় জৈন আচারাঙ্গ সূত্রের অনুবাদের পৃষ্ঠায় যাতে আছে খ্রিঃ পূর্ব ছয়শত বৎসর পূর্বের চব্বিশতম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর জিনের প্রব্রজ্যা কাহিনী।

এতো গেল প্রাক মধ্যযুগের কথা। অবশ্য মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্য

বাঙলার বিশেষ করে দক্ষিণ রাঢ়ের দিগ্বিজয় কালের কিছু বিবরণ ছাড়া আর কিছু ইতিহাস নাই। এছাড়া 'সদৃক্তি কর্ণা মৃতে' খণ্ডিতভাবে, দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে, কথা সরিৎ সাগর, বৃহদ্ধর্ম পুরাণে প্রভৃতি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে আর সবশেষে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে কিছু ইতিহাসের ক্ষণোদ্ভাসিত শ্লোক পাই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রাঢ় বঙ্গের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমাদের নেই।

গ্রিকবর্ণিত ইতিহাস থেকেই আমরা জানতে পারি গঙ্গার পশ্চিম প্রান্ত দেশ শাসিত হত বলবীর্য খ্যাত "গঙ্গারিডি" নামে একদা ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত জাতির দ্বারা, যা আজ পর্যন্ত ভারতীয় ও বাঙালি ঐতিহাসিকগণ নথি দলিল প্রমাণাভাবে এ সম্পর্কে একটি বাক্যও খরচ করেননি। ঐ বিশাল ঐতিহ্য কেন আজ পর্যন্ত ইতিহাসে অনুল্লিখিত রয়ে গেছে তা বিস্ময়াবহ। তাই রাঢ় সংস্কৃতির পক্ষে সদস্য গবেষকগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকার উপর আঞ্চলিক ইতিহাসের লুপ্ত ও সুপ্ত অনাবিষ্কৃতির অভিশাপ মোচন করে, পাঞ্চাণী অহল্যার মতই পুরাসম্পদ ও পুরাতত্ত্বকে প্রজ্ঞার আলোয় আনতে বদ্ধপরিকর ও অজানা তথ্য উদঘাটনে ব্রতী। আঞ্চলিক ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কোন জাতির সামগ্রিক ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। এখানেই আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব।

আমাদের রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদের সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী স্নেহভাজন শ্রী শিব শংকর ঘোষ দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যভাগের এক প্রাচীন জনপদ এরুয়ারের অধিবাসী। এই এলাকার পশ্চিমাংশ গড় জঙ্গল নিয়ে যে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর বাস, তা হল গোপভূমি। তিনি এই গোপ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রা, সমাজ ধর্ম, জীবনাচরণ সংস্কৃতি, শিক্ষা, লোকাচার ও তার উপাদান সংগ্রহে পনেরো বৎসর যাবৎ লিপ্ত রয়েছেন ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে। মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ তাকে এই গোপ জনগোষ্ঠীর রহস্য ও তথ্য সন্ধানে প্রেরণা জুগিয়েছে।

ঐতিহাসিক গোপভূমির উল্লেখ আছে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কবি 'কঙ্কন চন্ডী' তে এবং গোপভূমির পটভূমিকায় "ধর্মমঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা ঘনরাম চক্রবর্তী ও রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মপূজা প্রচলনে স্বাচ্ছন্দ্য বিহার আমাদের ঐতিহ্য। দক্ষিণ রাঢ়ের গোপরাজা পরাক্রমী ইছাই ঘোষ ও সেখানকার প্রতিভূ কর্ণ সেন— এ কাব্যকে শক্তিধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপাদান জুগিয়েছে, তেমনি গোপরাজা ইছাই ঘোষ স্বাধীনতার স্পৃহায় এই জনগোষ্ঠীর প্রাণে অনাস্বাদিত জীবনের কলধ্বনি শুনিয়েছিলেন। শ্রীমান শিব শংকর সেই জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যকেই তুলে ধরেছে।

গোপ রাজত্ব এখন আর নেই কিন্তু সেই জনদের সামাজিক জীবন কালের প্রবাহে আবর্তিত ইতিহাস খ্যাত গোপসমাজ আজও আছে। শিবশংকর সেই ইতিহাস খ্যাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব। বিবর্তনও সাঙ্কর্যের বর্ণময় চরিত্রকে গবেষণার দৃষ্টিতে অনেক অজ্ঞাত তথ্য সাগর ছেঁচা মণিরত্নের মত তুলে এনে উৎসাহী পাঠককে উপহার

দিয়েছেন। তেমনি অতীতের সঙ্গে চলমান বর্তমানকে করেছেন সাঙ্গীকৃত। তার বিশ্লেষণ ধর্মী লেখনীতে এই গ্রন্থ এক দিকে যেমন সমাজ বিজ্ঞান ও অপর দিকে ইতিহাসাশ্রিত তথ্য হয়ে উঠেছে। গবেষণার কেন্দ্র বিন্দুতে তাই স্থান পেয়েছে— গোপভূমের সংস্কৃতি ধর্ম ও জীবনাচরণ।

দীর্ঘ পনেরো বৎসর নিরলস তথ্যানুসন্ধানের জন্য গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমা ও ক্ষেত্র সমীক্ষার পর তিনি এই গ্রন্থতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার নির্যাসে জারিত করেছেন তা সম্যক উপলব্ধি করতে বিন্দু মাত্র বিলম্ব হয় না। তিনি পাঠকের দৃষ্টিকে ইতিপূর্বে টেনে নিয়ে গেছেন "রাঢ় সংস্কৃতির সন্ধানে একটি গ্রাম সমীক্ষা" শীর্ষক রচনার দিকে। আবার "বঙ্গের শাক্তপীঠ ও সাধনক্ষেত্র" রচনা করে পাঠকের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন দূরবর্তী ধ্যানমৌলী ভূধরের দিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে।

এবার তিনি হৃদয় মথিত করে, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রাঢ় বঙ্গের এক অনালোকিত ক্ষেত্র, গোপভূমের লুপ্ত অতীত ও ঐতিহ্য উদ্ধার করেছেন। যে অসীম নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার বাতাবরণে তিনি দোলায়িতা, তার অনুরণনে 'গোপভূমের' বিবর্তন, তার ধর্ম সমাজ, দেব-দেবীর পূজাবিধি, উৎসব, পালা-পার্বণ ও সংস্কৃতি তার কলমের ছোয়ায় আঞ্চলিক ইতিহাস যেন পূর্ণতা পেয়েছে।·

পেশায় একজন কীর্তিমান শিক্ষক হয়েও নেশায় অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান স্পৃহাকে সম্বল করে যে রত্ন গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে তুলে এনেছেন, তার জন্য তাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। অবসর জীবনে সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর হয়ে রইল তার এই গ্রন্থ "গোপভূমের স্বরূপ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি"। গ্রন্থটি রাঢ় গবেষকদের কাছে আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। আমি শ্রীমান শিবশংকরের এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি ও তাকে আশীর্বাদ জানাই।

কিছু কথা

নদীমার্তৃক বঙ্গভূমি। যুগ যুগান্ত ধরে বহতা নদীর স্নেহধারায় যেমন এই দেশ পরিপুষ্ট হয়েছে— তেমনই তাদের বহমান জলধারায় বহুধা বিভক্তও হয়েছে। তার ফলেই সৃষ্ট হয়েছে বহু ভূখণ্ড এবং সেই সব খণ্ডাংশের সীমা পরিসীমা। বঙ্গের বুকেও বহু নদীর ক্রিয়া কাণ্ডে সৃষ্টি হয়েছে নব নব ভূখণ্ড। একাজে প্রধান ভূমিকা অবশ্যই পুণ্যতোয়া গঙ্গা নিলেও অন্যান্য নদ-নদীও যে অংশ নেয়নি তা নয়।

শুরুতেই পশ্চিমাগত গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ নিয়েই গঠিত হয়েছে রাঢ়-বঙ্গ। তার পূর্বাংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে বারেন্দ্রভূমি, উত্তর অংশ নিয়ে গৌড়। তেমনি অজয়-দামোদরের প্রবাহের দ্বারাই বিভক্ত হয়েছে রাঢ় বঙ্গ। অজয় নদী তার প্রবাহ ধারায় রাঢ় বঙ্গকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। তাই অজয়ের উত্তর অংশই উত্তর রাঢ় এবং তার দক্ষিণ অংশই দক্ষিণ-রাঢ় নামে খ্যাত হয়েছে।

অজয়ের দক্ষিণে প্রায় তার সমান্তরাল গতিতে প্রবাহমান আর এক পাহাড়ি নদী দামোদর। সেই দামোদরের ধারাই দক্ষিণ রাঢ়ের সীমা নির্দেশ করেছে। তাই ষোড়শ শতকে রচিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে বলা হয়েছে— দামোদরোত্তরভাগে ... রাঢ়দেশঃ প্রকীর্তিতঃ। এতে বোঝা যায় দামোদর নদীই ছিল দক্ষিণ রাঢ় দক্ষিণ সীমা।

এইভাবেই বিভিন্ন নদীর গতিবিক্ষেপেই বহু দেশের সীমাপরিসীমা নির্দ্ধারিত হত এমনই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থেই। সেখানেও বলা হয়েছে—

অজয়াদ্দক্ষিণে ভাবে শিলাবত্যাশ্চ হ্যুত্তরে।
গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে পারে দারিকোশহি পূর্ব্বতঃ।।

— অর্থাৎ অজয় নদীর দক্ষিণে, শিলাবতী নদীর উত্তরে এবং পূর্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে দারিকেশ এই চার নদীর বেষ্টনে আবদ্ধ এক দেশের কথা বলা হয়েছে যার নাম বর্ধমান। একদা বর্ধমান ছির রাঢ় বঙ্গের এক উল্লেখ্য প্রদেশ বা ভুক্তি, যার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ষষ্ঠশতকে মল্লশারুল তাম্রশাসনে। পরবর্তীকালে বর্ধমান রাঢ় বঙ্গের এক উল্লেখ্য জেলায় পর্যবসিত হয়েছে। সেই বর্ধমানের পশ্চিমে অজয়-দামোদর ও বরাকরের ঘেরায় এক অঞ্চল পরিব্যপ্ত ছিল যা 'গোপভূম' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

সেই গোপভূমের প্রকৃতি, পরিবেশ ও তার ঐতিহ্য ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়েই এই গ্রন্থের অবতাবণা।

বঙ্গের সমস্ত জেলাগুলির মধ্যে এখনও পর্যন্ত বৃহৎ জেলা এই বর্ধমান। এই জেলা কেবল আকারেই বৃহৎ নয় এটি ঐশ্বর্য ও সম্পদেও সবিশেষ সমৃদ্ধশালীও। বর্ধমান বঙ্গের শস্য ভাণ্ডার তো বটেই, সেই সঙ্গে এর মৃত্তিকার অভ্যন্তরে রয়েছে কালো মানিক বা কয়লার বিপুল সঞ্চিত ভাণ্ডার। ফলে শস্য ও খনিজ উভয় সম্পদে সুসমৃদ্ধ এবং সম্পদে ব্যতিক্রমী জেলা। এই বর্ধমান সম্পর্কে তাই প্রচলিত প্রবাদে বলে।"

নীচে কয়লা উপরে ধান।
এই নিয়ে বর্ধমান।।

এহেন বর্ধমান জেলা যুগ পরম্পরায় সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে অবস্থিত ছিল, মধ্যযুগে ধর্মমঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও বলেছেন—"বর্ধমান দেশ ভাই সবাকার নাভি।" পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকও তাই বলেছেন— "রাঢ়বঙ্গে বর্ধমান যেন মধ্যমণি"।

সেই মধ্যমণি বর্ধমানের মধ্যাংশ থেকে সমগ্র পশ্চিম অংশই অতীতেই গোপভূমি— যা মূলত উত্তরে অজয় ও দক্ষিণে দামোদরের ঘেরাটোপে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তার অতীত ইতিহাস আমাদের কাছে "অন্ধকার বিদিশার নিশা"র মতই রয়ে গেছে। কারণ ইতিহাস বিমুখজাতি বলে বাঙালির দুর্নাম আছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও তা স্বীকার করেছেন এবং সকলকে দেশের ইতিহাস লেখার জন্য উদ্বুদ্ধও করেছেন।

তাই বলি দিন এসেছে, বাঙালির বিভিন্ন দিকের ইতিহাসকে জন সমক্ষে তুলে ধরার।

বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সে প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে গেছে। তাই বিভিন্ন জেলায় অনেক প্রত্যন্ত স্থানের ইতিহাসকেও তুলে ধরার জন্য গবেষকরা এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। আমাদের জেলা বর্ধমানকে নিয়েও ব্যাপকভাবে লেখালেখি শুরু হয়েছে এবং এখনও অনেকেই সে ব্যাপারে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে অরণ্য ঘেরা পশ্চিম বর্ধমান এককালের 'গোপভূম' এখনও অনালোকিত রয়েই গেল। তাই সে এলাকাকেই পাদ প্রদীপের আলোয় আনার প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ।

একদা এখানেই জীবন জীবিকার তাগিদে বসতি গড়েছিল পশুচারক সম্প্রদায়। তারা শুরুতে ছিল যাযাবর প্রকৃতির। অরণ্যচারী বিভিন্ন পশুকে পোষ মানিয়ে তারা এখানেই বসতি করতে থাকে। তাদের পোষ্য জীব-জন্তুর মধ্যে গো-মহিষের সংখ্যা বেশি থাকায় তারা গো-পালক বা 'গোপ অভিধায় অভিহিত হতে থাকে, এবং যেহেতু তারা তখনকার অরণ্যাঞ্চলের বিস্তৃত চারণক্ষেত্রে তাদের পালিত গরু বাছুর নিয়ে বসতি করতে থাকায় এই এলাকা এক সময় গোপেদের ভূম থেকে 'গোপভূম' নামে

খ্যাত হয়। তাই প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চল 'গোপভূম' পরিচয় বহন করছে।

এই গোপভূম সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই সম্যক ধারণা নাই। পরিণত বয়সে আমার এক পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নকুল চন্দ্র দত্তের নিবিড় সান্নিধ্যে আসি। তিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁরই প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও নির্দেশ আমায় লেখার জগতে উঁকি মারার সুযোগ করে দেয়। তাই গ্রামীন সংস্কৃতি, পুরাকীর্তি, ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি শুরু করি, পরিণতিতে প্রকাশিত হয় কয়েকটি পুস্তক। তিনিই আমায় গোপভূম নিয়ে লেখার প্রেরণা দিলে আমি গোপভূমকে জানার ও বোঝার কাজে লিপ্ত হই। কর্মজীবনের শেষের দিকে দীর্ঘ ১০/১২ বছর গোপভূমের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান নিই। তারই ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ।

কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল মনে। কারণ আমার প্রেরণা দাতা শিক্ষক যার প্রেরণায় এই কাজে নামা— তিনি এই পুস্তকের প্রকাশ দেখে যেতে পারলেন না। বছর কয়েক আগে তিনি পরকালের আহ্বানে পরমধামে গমন করেন। তবুও তাঁরই প্রত্যক্ষ আশীর্বাদে এই পুস্তকের প্রকাশ বলেই মনে করি।

এই পুস্তক রচনায় আরও যাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি তাঁরা হলেন আমার অগ্রজ প্রতিম, লোক সংস্কৃতির উজ্জ্বল গবেষক শ্রদ্ধেয় মহম্মদ আয়ুব হোসেন (রাজুয়া, বর্ধমান), বীরভূমের বলিষ্ঠ গবেষক সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় (মুলুক), বর্ধমানের বরিষ্ঠ নাগরিক ও জ্ঞানতাপস নারায়ণ চোধুরী, বিদগ্ধ পণ্ডিত ডঃ মিহির চোধুরী কামিল্যা, বর্ধমান 'রাঢ়' সংস্কৃতি পরিষদের প্রাণপুরুষ ও লেখক সুধীর চন্দ্র দাঁ, লেখক সৈয়দ আব্দুল হালিম, গবেষক ডঃ গোপীকান্ত কোঙার, গোস্বামী দাস রায় (দুর্গাপুর), দুর্গাপদ মণ্ডল (মনোহর, বাঁকুড়া) কবি ও গবেষক মোহন সিংহ (বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া)— এদের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

এই কাজে অগ্রবর্তী হয়ে গ্রামে গঞ্জে ঘোরার কালে সহৃদয় গ্রামবাসীর অনেকেরই সাহচর্যে যেমন পরিপূর্ণ হয়েছে তত্ত্ব ও তথ্যের ঝুলি, তেমনি তাদের অকৃত্রিম আতিথেয়তা ও ভালবাসায় অন্তর পূর্ণ হয়েছে। তাদের হার্দিক সহযোগিতা আমাকে এগিয়ে চলার পাথেয় যুগিয়েছে। তাই তাদের সকলের প্রতি রইল আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও প্রীতি শুভেচ্ছা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য একাজে আরও কয়েকটি সংস্থার কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার— যেখানে দিনের পর দিন গিয়ে বহু মুল্যবান গ্রন্থের সাহায্য পেয়েছি— তার জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ব বিদ্যালয় ও তার কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও বর্ধমানের বামুনাড়া গ্রামের প্রাচীন লাইব্রেরী হিরন্ময়ী স্মৃতি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বন্ধুবর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য

ও লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের সহায়তায় পেয়েছি বহুদুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সহায়তা— তাই তাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, এছাড়াও নিজের গ্রামের "এরুয়ার স্বামী বিবেকানন্দ রুরাল লাইব্রেরীর নিকটেও বহু সাহায্য পাওয়ায় লাইব্রেরী তথা কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের লেখা বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্যও নিয়েছি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ। তাঁদের ঋণের কথা যথাস্থানে উল্লেখের চেষ্টা করেছি।

সংসারে থেকেও সাংসারিক কাজ কর্মের দায়িত্ব হতে যারা আমায় অব্যাহতি দিয়ে সেই দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজেরা গ্রহণ করে আমায় পরিপূর্ণভাবে লেখার কাজে আত্মনিয়োগের সুযোগ ও প্রেরণা দিয়েছে— আমার সেইসব আত্মীয় স্বজন যেমন— আমার সহধর্মিণী, পুত্রদ্বয় ও বধু মাতাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় আমি আপ্লুত।

বইটির প্রকাশ কালকে সুষ্ঠু ও তরান্বিত কবার জন্য প্রভা প্রকাশনীর তরুণ প্রকাশক শ্রদ্ধেয় অসীমকুমার মণ্ডল মহাশয়ের সবিশেষ আগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রয়াস এবং লেখকের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও ঔদার্য সত্যই স্মরণযোগ্য। তাঁর সেই হৃদ্যসহযোগিতায় আমি নিবিড় ভাবে ঋণী। তাই তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। এই সারস্বত সৃষ্টির ছাপার কাজে ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স ও ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের নিষ্ঠায় এর প্রকাশ তরান্বিত সুন্দর হওয়ায় ঐ দুই সংস্থার সকল কর্মীদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। গ্রন্থের প্রথম প্রুফ দেখে যিনি একে সর্বাঙ্গসুন্দর করার প্রয়াস নিয়েছেন— সে আমার গ্রামবাসী এবং আমার ভ্রাতৃ প্রতিম। আমি তাকেও আমার স্নেহ সিক্ত অনুরাগ জানাই। এছাড়াও প্রুফ সংশোধনে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন স্টালিন আইনস্টাইন শতবার্ষিকী স্মারক পাঠাগার, ডায়মণ্ড হারবার-এর গ্রন্থাগারিক শ্রী অরুণাভ দাশ। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

পরিশেষে জানাই আমার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল "গোপভূম ঃ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি" পাঠকচিত্তে যদি বিন্দুমাত্র আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। চলতে গেলেই হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা সাধুবাক্য 'চরৈবেতি চরৈবেতি" অনুসরণে এগিয়ে চলতেই হয় তাও কোন ত্রুটি থাকলে ক্ষমা সুন্দর চোখে তাকে দেখার আর্জি জানিয়ে আমার "কিছু কথা" এখানেই শেষ করলাম।

সি. এস. পর্চায় পরগণা হিসাবে গোপভূমের স্বীকৃতি

মৌজা হরিয়াপুর জে: এল: নং ১১২

জিলা বর্দ্ধমান তৌ: সাঃ নং ১৮৩৫ [illegible] ১২৪৮

থানা আউসগ্রাম পরগণা গোপভূম [illegible] ১

খতিয়ান নম্বর	দখলকার সংক্ষিপ্ত	পরগণার অংশ	খাজানা	সেস	[illegible]	খাজানা	সেস
	উপরিস্থ স্বত্বের		[illegible]			[illegible]	
২ ক ৩	পত্নীর এবং দরপত্তনি নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী	।।০ ।।০ ১,	নিষ্কর		তোপচপলসূত্রে		
ক্রম নম্বর	স্বত্ত্বের বিবরণ ও দখলকার	অংশ		স্বত্বের শ্রেণী ও বিবরণ		স্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ	

—ঃ বিষয় সূচী ঃ—

।। বঙ্গহৃদে গোপভূমের অবস্থান ও পরিচিতি ।।

বঙ্গের প্রাচীন মহাকাব্য মহাভাবতের কাহিনী অনুযায়ী জানা যায় যে, আপন আত্মীয় কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে দীর্ঘতমা নামে এক স্বজন-হারা অন্ধ ঋষি কোন এক নদীতে ভাসতে ভাসতে যযাতির বংশজাত পূর্বদেশীয় অপরাজেয় অসুররাজ বলির রাজ্যে উপনীত হন। দয়ালু রাজা বলি তাকে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দেন। পরবর্তী কালে রাজা বলি সেই দীর্ঘতমা ঋষিকে দিয়েই আপন মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করান। এ সম্পর্কে মহাভারতের আদি পর্বে (১০৩/৫১-৫৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুন্ড্রঃ সুহ্মশ্চতে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমখ্যাতাঃ স্বনাম প্রথিতা ভুবি।।
অঙ্গস্যাঙ্গোহ্ ভবদ্দেশো বঙ্গো বঙ্গস্য চ স্মৃতঃ।
কলিঙ্গ বিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্য চ স স্মৃতঃ।।
পুন্ড্রস্য পুন্ড্রাঃ প্রখ্যাত্যাঃ সুহ্মস্য চ স্মৃতান।
এবং বলেঃ পুরা বংশঃ প্রখ্যাতঃ পরমর্ষিজঃ।।

উদ্ধৃতাংশের মর্ম অনুযায়ী জানা যায় বলির সেই পাঁচ ক্ষেত্রজ সন্তানেরা হলেন— অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম। তারা পরে যে যে রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন সেই রাজ্যগুলিও তাদের নিজ নিজ নামে নামিত হয়েছিল। যেমন— অঙ্গের অধিকৃত রাজ্য অঙ্গদেশ, বঙ্গের রাজ্য বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের কলিঙ্গদেশ, পুন্ড্রের পুন্ড্রদেশ ও সুহ্মের সুহ্মদেশ।

এখন বলির সেই ক্ষেত্রজ সন্তানদের রাজ্যগুলির বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে বলা যায়— অঙ্গ বর্তমান ভাগলপুর এবং কলিঙ্গ উড়িষ্যার দক্ষিণবর্তী ভূভাগ। পুন্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ যথাক্রমে বাংলার উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ও পূর্বভাগ। [১] এই গেল বঙ্গদেশ সৃষ্টি বা উদ্ভবের পৌরাণিক তথ্য। কিন্তু বঙ্গদেশের নামের তাৎপর্য বিষয়ে ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের অন্ত নেই তার মধ্যে আবুল ফজলের মতামতটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবুল ফজল তার 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল কিংবা সংস্কৃত আলি বা পূর্বদেশীয় শব্দ আইল যোগ করে বাঙ্গাল বা বঙ্গাল শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে বলে

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নদীমাতৃক বারিবহুল দেশে বৃষ্টি, বন্যা এবং জোয়ারের স্রোত ঠেকাবার জন্য ছোট বড় বাঁধ ছিল কৃষিও বাস্তু ভূমির যথার্থ পরিপালনের পক্ষে অনিবার্য। (২) এই আলগুলিই আবুল ফজলের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাই তিনি এই দেশকে ঐ অর্থেই বাংলাদেশ বলেছেন।

এই বঙ্গ বা বাঙলাদেশ খুবই প্রাচীন। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই দেশের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রামায়ণেও বঙ্গজনদের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়াও 'বৃহৎ সংহিতা' ও 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' ইত্যাদি গ্রন্থেও বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে পাল ও সেন আমলের বহু লিপিমালায়-বিশেষ করে একাদশ শতকে বিজজল কলচুর্যের অবলুর লিপি, রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপি এবং দক্ষিণী কিছু লিপিতেও বঙ্গাল দেশের উল্লেখ রয়েছে। সেদিক থেকে এই দেশ বহু প্রাচীন দেশ। পরবর্তীকালে এই দেশ বিভিন্ন বিভাগে ও বিভিন্ন নামে বিভক্ত হয়েছিল। যেমন— পুন্ড্র, পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, হরিকেল, সমতট, পট্টিকেরা, সুহ্মভূমি, গৌড়, রাঢ় ইত্যাদি।

উল্লেখিত বিভাগগুলির মধ্যে রাঢ় বিভাগের প্রতিই আমরা সবিশেষ দৃষ্টি দিতে চাই কারণ ঝিনুক গর্ভে মুক্তার মত এই বিভাগেই রয়েছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমণি বর্ধমান আর তারই পশ্চিমাংশে রয়েছে আমাদের আলোচ্য বিষয়ক্ষেত্র গোপভূম।

মধ্যযুগের শেষভাগে রচিত বাংলা মানিকচন্দ্র রাজার গানে ভাটির অধিবাসীদের 'বাঙ্গাল' বলা হয়েছে। লম্বা দাড়ি তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। মানিকচন্দ্রের গানে একটি বহু শ্রুত পদ শোনা যায়— 'ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।'' এই পদে ব্যবহৃত ভাটি ও বাঙ্গাল এক সময় সমার্থক ছিল। অনুরূপভাবে সুহ্ম ও রাঢ়া সমার্থক ছিল। প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও এই মতকেই সমর্থন করে বলেছিলেন— সুহ্ম এবং রাঢ়া এক এবং সমার্থক। (৩) অন্যদিকে জৈন আচারঙ্গ সূত্রেও (১/৮/৩) উল্লেখ আছে যে, সুহ্মদেশ রাঢ় দেশের অন্তর্গত। (৪) এ রকম অনেক প্রমাণই দেওয়া যেতে পারে যাতে জানা যায় যে, সুহ্মই ছিল রাঢ় দেশ। এখন দেখা যাক রাঢ়দেশের পূর্বের অবস্থান কেমন ছিল।

প্রখ্যাত সংস্কৃতি গবেষক শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষের মতে প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ় দেশই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ। অন্যদিকে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে— 'রাঢ় হল পশ্চিমবঙ্গের সমার্থক।'' (৫) এখন এই রাঢ় এর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জৈন গ্রন্থ 'আয়াবাঙ্গ' বা আচারাঙ্গ সূত্রে। এই গ্রন্থে রাঢ় দেশকে পথ-বিহীন, আচার-বিহীন এবং তার প্রকৃতিকেও রূঢ় বলা হয়েছে— কারণ মহাবীর জৈন সশিষ্য ধর্মপ্রচারে (ষষ্ঠ শতকে) এলে এখানকার অধিবাসীরাই নাকি তাদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে কালাতিপাত করতে হয়েছিল ইত্যাদি।

অন্যদিকে রাজশেখরের 'কর্পূব মঞ্জরী' গ্রন্থে রাঢ়া জনপদের সৌন্দর্যের উল্লেখ আছে। হলায়ুধের অভিধান গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। [৬] কাজেই এইসব পরস্পর বিরোধী মতবাদ বাদ দিয়েই আসল কথায় আসা যাক।

এই রাঢ় দেশকে প্রাচীন কাল থেকেই কয়েকটি উপবিভাগে সীমিত করা হয়ে থাকে। নবম-দশম শতক থেকেই রাঢ়ের দুটি সুস্পষ্ট বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন— উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ়। একাদশ শতকের প্রথম পাদে এই বিভাগ দুটি উত্তীর লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কন লাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়) নামেও পরিচিত হয়েছিল। আনুমানিক নবম শতকে গঙ্গারাজ দেবেন্দ্র বর্মনের এক লিপিতেই এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর একাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোলেব তিরুমলয় লিপিতেও এর উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হতে হতে উত্তীর লাঢ়ম ও তক্কন লাঢ়ম যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ে পরিণত হয়েছে।

এখন দেখা যাক ঐ দুই রাঢ়কে কোন সীমারেখার দ্বারা সীমায়িত করা হয়েছে। সেখানে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রধানত একটি নদীর গতিপথকেই উভয়ের মধ্যে সীমানা পৃথকের মাধ্যম হিসাবে ধরা হয়েছে। সেই নদীটির একদা নাম ছিল ঋজুপালিকা যা পরে 'অজয়' নামে খ্যাত হয়েছে। পাল রাজ অজয় পালের নাম অনুসারেই নাকি এই নদীর নাম অজয় হয়েছিল বলে অনেকেই অনুমান করলেও এবিষয়ে সংশয় আছে। তবে এই নদীর নাম অজেয় (যা জয় করা যায় না) থেকেই অজয় হয়েছে এমন অনুমান করা যেতে পারে। এই নদী চলার পথে বহুবার তার গতিপথের পরিবর্তন ঘটালেও মোটামুটি এরই গতিপথকেই বিভাগীয় সীমা হিসাবে ধরা হয়েছে। এখন যেমন ১৮০৬ খ্রিঃ ৯ই অক্টোবরের এক আদেশনামায় অজয়ের প্রবাহপথটি বর্ধমান জেলার উত্তরাংশের পশ্চিমভাগ ও বীরভূম জেলার দক্ষিণাংশের সীমারেখারূপে চিহ্নিত হয়েছিল— [৭] সেইভাবেই এই অজয় নদীর গতিপথই তখনকার দিনে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের সীমাকেই পৃথক করেছিল। তাই বলা যায় মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ, কাঁদি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা, সাঁওতাল ভূমিসহ বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ নিয়েই তখনকার উত্তর রাঢ় গঠিত হয়েছিল। ফল কথা এই অজয় নদীই ছিল উত্তর রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর সীমা।

এই প্রসঙ্গেই অজয় নদীর বেশ কিছুটা দক্ষিণে প্রায় সমান্তরাল প্রবাহে আর একটি নদীর নাম এসে যায়— সেটি হল দামোদর নদী। কেউ কেউ বলেন দামোদর নদীর সঙ্গে মুন্ডা তথা আদিবাসী কৃষ্টির বিশেষ যোগ আছে। তাই এই নদী আদিবাসীদের কাছে খুবই পবিত্র। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ এই নদীর নাম প্রসঙ্গে বলেছেন— 'দা-মুন্ডা' (Dahmoondoh) থেকে দা-মুদা > দামোদর নাম হয়েছে। 'দা-মুন্ডা' কথার অর্থ হল মুন্ডাদের জল। এই দামোদরের তীরে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির আঞ্চলিক উত্থান-পতন

হয়েছে সবচেয়ে বেশি।[৮] কাজেই ব্যাপক গতিপথের পরিবর্তনকারী, 'বঙ্গের দুঃখ' অভিধায় অভিহিত এই নদী তৎকালীন রাঢ় দেশের দক্ষিণ সীমায় প্রবাহিত হত। কারণ ষোড়শ শতকে রচিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে সে কথাই বলা হয়েছে। যেমন— "দামোদরোত্তর ভাগে .... রাঢ়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

এছাড়াও রাজা ভোজ বর্মার বেলাব লিপি, বল্লাল সেনের নৈহাটি পট্রোলী, জৈনগ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপনা', ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' গ্রন্থ ও তবকাত-ই-নাসিরী (মিনহাজ-উম-সিরাজ) ইত্যাদি গ্রন্থ ও লিপি প্রমাণ হতে জানা যায় যে, দামোদরের উত্তরেই দক্ষিণ রাঢ় অবস্থিত ছিল, তবুও দামোদরের দক্ষিণে এর বিস্তার ছিল না এ কথা বলা যায় না।

তখনকার দক্ষিণ রাঢ় বলতে মোটামুটি উত্তরে অজয়, দক্ষিণে দামোদর, পূর্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ি এলাকার পূর্বে বিস্তৃত এলাকাকেই বুঝান হত। আর সেই বিস্তৃত এলাকাই পরবর্তীকালে যৎসামান্য রদবদলে বর্ধমান জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পায়, কারণ দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে বর্ধমানের সীমানা বলতে উল্লেখ করা হয়েছে—

অজয়াদ্দক্ষিণে ভাবে শিলাবত্যাশ্চ হ্যত্তরে।
গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে পারে দারিকোশর্হি পূর্ব্বতঃ।

কাজেই যৎসামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে সেদিনের দক্ষিণ রাঢ়ই বর্ধমান জেলার সীমানাভুক্ত হয়েছিল আর সেই দক্ষিণ রাঢ়কে নিয়েই প্রাচীনকালেই গঠিত হয়েছিল 'গোপভূম'। তাই বর্তমান্ বর্ধমান জেলার অজয়-দামোদর মধ্যবর্তী বেশ কিছু অংশকেই গোপভূম বলা হয়। মোট কথা সমগ্র বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরসহ পূর্বদিকের সমুদয় অংশ ছাড়া, প্রায় সমগ্র পশ্চিম বর্ধমানই সেদিনের গোপভূম। আর সেই গোপভূমের অবস্থান ও বিস্তার নিয়ে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার যে সকল বক্তব্য পোষণ করেছেন— আমরা তাদের সেই সকল মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে গোপভূমের অবস্থান বিষয়ে ধারণাকে স্পষ্ট করতে চাই।

বঙ্গের মল্লভূম, শূরভূম, বীরভূম নামের সঙ্গে 'গোপভূম' নামটি অনেকেই শুনে থাকলেও গোপভূম সম্পর্কে বহুজনেরই সম্যক ধারণা নাই। তাই গোপভূম বলতে কি বোঝায় এবং তার পরিচিতি সম্পর্কে অবশ্যই কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা জানি মল্লদের বাসভূমি হল মল্লভূম, তেমনি সেনেদের বসতভূমি 'সেনভূম'। যেখানে বীরজাতির বসতভূম তা বীরভূম, যেখানে গোপজাতির বসতক্ষেত্র বা বসতভূমি গোপভূম নামেই পরিচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই রাঢ় বঙ্গের এক বিশেষ এলাকা 'গোপভূম' নামে পরিচিত। কিন্তু কেন? তার উত্তরে বলা যায় 'গো' শব্দের অর্থ গরু আর তাদের

প্রতিপালন করে যে সম্প্রদায় তাদেরই 'গোপ' অভিধায় অভিহিত করা হয় এবং তারা যেথায় অবস্থান করেন সেই স্থানই গোপভূম।

এখন দেখা যাক সেই গোপ সম্প্রদায়ের বসতক্ষেত্র বা গোপভূমের অবস্থানটি কোথায়? সে প্রসঙ্গেই বলা যায় রাঢ় বঙ্গের বুক চিরে পশ্চিম হতে পূর্বে প্রবাহিত দুই নদী— উত্তরে অজয় ও দক্ষিণে দামোদর। তাদের মধ্যবর্তী ভূভাগ যা বর্তমানে, পূর্বে কাটোয়া থেকে শুরু করে পশ্চিমে বরাকর নদীর কোল পর্যন্ত বিস্তৃত সেই উষর রক্তিম কাঁকুড়ে মাটির বুকে শাল-পিয়ালের ঘন অরণ্যের আঁচলে ঘেরা বিস্তীর্ণ এলাকাই এককালের গোপভূম। অনেকের মতে এই গোপভূম কোথাও কোথাও অজয়-দামোদরের প্রবাহমান সীমানা অতিক্রম করেও বর্তমান বীরভূম ও বাঁকুড়ার ব্যাপক অংশেও বিস্তৃত ছিল।

একদা এই আরণ্যক পরিবেশেই দুর্ধর্ষ অরণ্যচাবী পশুপালক গোপজাতি এখানেই স্থিতু হয়েছিল। কারণ হিসাবে বলা যায়— শ্যামল বঙ্গের এই দুই নদীর আবেষ্টনে অরণ্যময় চারণক্ষেত্রে, নিজেদের পালিত পশুচারণ করার প্রশস্তক্ষেত্র পেয়ে, দুর্ধর্ষ এই পশুচারক সম্প্রদায় এখানেই তাদের আস্তানা স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয়ত— অরণ্যে বসবাসের জন্য প্রয়োজন— অসীম সাহসিকতার। আর সেই সাহসিকতাও এই সম্প্রদায়ের অতিমাত্রায় ছিল। তাই এই জাতি প্রথমদিকে নিত্যনতুন চারণক্ষেত্রের সন্ধানে অনেকটাই যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত হলেও পরে পরে তারা অরণ্যের বেশ কিছু ক্ষেত্র নিয়ে 'বাথান' তৈরি করে স্থায়ী বসবাসে অভ্যস্ত হয়। পশুচারী এই সম্প্রদায় ধীরে ধীরে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে বন্যপশুকে বশে আনে এবং পশুপালনের মাধ্যমেই সেই পশুকেই পোষ মানিয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটায়। পরে তাদের থেকে দুগ্ধ গ্রহণ করে খাদ্যোৎপাদনে ব্রতী হয়। সভ্যতার ঊষালগ্নে এটা বড় কম উদ্ভাবন নয়। পরবর্তীকালে সভ্যতা আর এক ধাপ উন্নীত হলে— এই মানুষই পশুপালনসহ কৃষিকার্যের কলা কৌশল রপ্ত করে।

সে যাই হোক অতি প্রাচীনকাল থেকেই অজয়-দামোদরের দোয়াব অঞ্চলের অরণ্য ঘেরা পরিবেশে গোপালক গোপ জাতির বসবাস গড়ে ওঠায় তা গোপভূম নামেই পরিচিত হয়। তৃতীয়ত— এই দোয়াব তখনও কৃষিকাজের উপযুক্ত ছিল না— তাই তৃণ গুল্ম ও বৃক্ষাচ্ছাদিত অরণ্য ক্ষেত্রে পশুচারণের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করেই সেই পশুচারকের দল এই দুই নদীর অভ্যন্তরে অবস্থিত অরণ্যাঞ্চলেই গোপ জাতিরা বসতি গড়ে তুলেছিল— তাই এই এলাকা 'গোপভূম'।

এখন এই রাঢ়বঙ্গের অজয়-দামোদর কেন্দ্রিক জঙ্গলময় এলাকায় এই পশুপালক গোপ জাতির কিভাবে আবির্ভাব ঘটল সে প্রসঙ্গে আসা যাক। এবিষয়ে বহু ঐতিহাসিকের মূল্যবান মতামত বিশ্লেষণ করে বাঁকুড়ার প্রখ্যাত গবেষক শ্রদ্ধেয় মানিকলাল সিংহ

মহাশয় তার "রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি" (২য়) গ্রন্থে কিছু আলোকপাত করেছেন। তার মতে এই প্রাচীন জাতি সুদূর অতীতে চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের মনুষ্যগোষ্ঠীগুলির চাক (Man-hive) হতে ইউচি ইত্যাদি জাতগোষ্ঠীর সঙ্গে ক্রমশ বিবাদ বিসম্বাদের কারণে বিরক্ত হয়ে সেখানকার পশুচারক জাতির অনেকেই ভারতের দিকে অগ্রবর্তী হয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-শোন-চম্বল নদী বিধৌত চারণক্ষেত্রে ও মধ্যভারতের মথুরা বৃন্দাবন কেন্দ্রিক পলিবহুল তৃণপ্রাচুর্যের অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে এখানকার অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিজেদের শৌর্যে অবদমিত করে নিজেদের প্রতিপালিত পশুপ্রাণীসহ বসবাস শুরু করেন। এরা পশুচারক হলেও জাতিতে ছিল শক, পল্লব, ক্ষত্রপ গোষ্ঠীভুক্ত এবং নিজেদের শৌর্যবীর্যের দ্বারাই সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল জয় করে নিয়েছিল। ঐতিহাসিক ডঃ হটন সাহেব ও সেই কথাই ব্যক্ত করে বলেছেন— "The people who came from the steppes of the North-West to conquer northern India." [৯] সেই দুর্ধর্ষ জাতই এদেশে পশুচারক বা পশুপালক জাতি হিসাবে পরিচিত হয়। সমগ্র দেশে এরা আভীর বা আহীর ও পল্লব গোপ নামে পরিচিত।

এই পশুপালক জাতিই ধীরে ধীরে ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরই এক শাখা রাঁচি, হাজারীবাগ অতিক্রম করে মানভূমের উপর দিয়ে রাঢ়ের উপকণ্ঠ তথা রাঢ় সীমান্ত পর্যন্ত এসে দক্ষিণে উড়িষ্যা এবং সেখান থেকে আরও দক্ষিণ পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। অন্য শাখা গঙ্গানদীর প্রবাহ পথ ধরে অগ্রবর্তী হতে হতে প্রায় সমগ্র ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। এরাই মূলত আহীর গোপ।

অন্যদিকে ঐ গোপসম্প্রদায়ের আর এক শাখা বিহারের দ্বারভাঙ্গা হয়ে বঙ্গের পশ্চিমদিক থেকে বঙ্গে প্রবেশ করে। কিন্তু দ্বারভাঙ্গা দিয়ে কেন? সেখানে বলা যায় "দ্বারভাঙ্গা তো দ্বারবঙ্গ (বঙ্গের দ্বার) শব্দেরই আধুনিক বিকৃত রূপ" [১০] তাই তারা সেই দ্বারবঙ্গ দিয়েই সেই পশুপালক গোষ্ঠীর এক বিশেষ শাখা 'পল্লব' গোপেরা রাঢ়বঙ্গে প্রবেশ করে এবং ব্যাপক সংখ্যায় অজয়-দামোদর দোয়াব অঞ্চলের জঙ্গল ঘেরা আরণ্যক পরিবেশে বসবাস শুরু করে এবং সেখানেই স্থিতু হয়। যেহেতু এই এলাকা অরণ্যাঞ্চল এবং স্বাভাবিকভাবেই তৃণ প্রাচুর্যের অভাব, তাই তারা তাদের পালিত পশুপ্রাণীদের তৃণসহ বৃক্ষলতা গুল্মের পল্লবের (small twig) দ্বারাই প্রতিপালিত করত বলেই তারা বিশেষভাবে 'পল্লব গোপ' নামে পরিচিত হয়। তাই বলা যায় শক-ক্ষত্রপ পল্লব জাতির মানুষই রাঢ়ীয় পল্লব গোপদের পূর্বপুরুষ। মহাভারতেও পল্লব গোপদের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে পহ্লবী নাম্নী গোপকন্যা জাত গোপেরা পহ্লব বলে পরিচিত। যথা— "ব্রহ্মোরু সমুদ্ভুত পহ্লবী"। সেদিক থেকে এই সম্প্রদায় যে বেশ প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই।

এখন এই গোপভূমের অবস্থান বিস্তার বা সীমা সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অজয়-দামোদরের সোহাগঘেরা বিস্তৃত অঞ্চল যা ভাগীরথী নদীর পশ্চিম থেকে নির্গত হয়ে, পশ্চিমে আসানসোল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাই একদা গোপভূম হিসাবে স্বীকৃত ছিল। এখন আমরা বহু বিদগ্ধ জনের মতামতকে পাথেয় করে গোপভূমের পরিচিতি ও অবস্থানকে তুলে ধরার চেষ্টা করি।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বঙ্গের প্রখ্যাত সংস্কৃতি গবেষক শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে বলেছেন— "বর্ধমানে গোপভূম নামে পরগনা ছিল, প্রধানত আসানসোল মহকুমার বনময় অঞ্চল নিয়ে।" (১১) অন্যত্র 'দুর্গাপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে গ্রন্থকার স্বর্গত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন— "সুদূর অতীতকাল থেকে দুর্গাপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল গোপভূম নামে পরিচিত ছিল।" (১২) এবিষয়ে মানিকলাল সিংহও বলেছেন— "অজয় এবং দামোদর নদ দুইটির মধ্যবর্তী বর্ধমান জেলার এক সুবৃহৎ অংশ জুড়িয়া একদা এক স্বাধীন সার্বভৌম গোপভূম রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।" (১৩) এবং তিনি তার পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি গ্রন্থে গোপভূমের যে চিত্র সংযোজন করেছেন তাতেও অজয়-দামোদরের মধ্যবর্তী প্রায় কাটোয়া থেকে আসানসোল পর্যন্ত ভূভাগকেই দেখিয়েছেন।

এই অরণ্যঘেরা বিস্তৃত অঞ্চল গোপভূমের দুই উল্লেখ্য রাজার কথা প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন যে— বর্ধমান জেলার গোপভূমের রাজা ছিলেন দুজন এবং একজনের রাজধানী ছিল ঢেকুরে তিনি ইছাই ঘোষ, সমগ্র গোপভূমে তিনি সার্বভৌম রাজা ছিলেন আর একজনের অমরার গড়ে। অমরার গড়ের রাজা মহেন্দ্রের রাজ্য কাটোয়া থেকে পঞ্চকোট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (১৪) বর্তমান কালের প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক গবেষক ও ঐতিহাসিক সদ্যপ্রয়াত ডঃ অতুল সুরও গোপভূমের উক্ত সীমানার উল্লেখ করেই বলেছেন "মঙ্গলকোট গোপরাজ্যের সীমান্ত দুর্গ ছিল।" বর্ধমানের কালেকটর ওল্‌ড্‌হ্যাম C.I.E. সাহেব ১৮৮৯ খ্রিঃ বর্ধমানের গোপভূমের সীমানা সম্পর্কে বলেছেন— গোপভূম পরগনাটি এখনও অতি বৃহৎ। পরগনা সের গড় গোপভূম পরগনার অন্তর্গত ছিল এবং ইহা অজয় নদী হইতে দামোদর পর্যন্ত বিস্তৃত। পরে সের গড় ও গোপভূম মধ্যবর্তীস্থলে পরগনা সলিমপুর এবং পরগনা সেন পাহাড়ী— উহা পূর্বে গোপভূম পরগনার অন্তর্গত ছিল। (১৫)

"বর্ধমান পরিচিতি" গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় নারায়ণ চৌধুরী ও অনুকূল সেন মহোদয় বলেছেন— 'ইছাই ঘোষ .... নিজেকে 'মহামাণ্ডলিক' বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল ঢেকুর, বর্তমান শ্যামারূপার গড়। কাঁকসা থানার অন্তর্গত অজয় তীরে অরণ্যাবৃত এই শ্যামারূপার গড় এখনও ইছাই ঘোষের দুর্গ ও রাজধানীর সাক্ষ্যস্বরূপ বর্তমান। .... গোপভূমের আর এক গোপ রাজ বংশ অমরাগড়ের রাজগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। এই রাজবংশ একসময় এইরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠেন যে—

কাটোয়া হইতে পঞ্চকোট রাজ্যের সীমা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম বর্ধমান তাহাদের অধিকারে আসে। (১৬)

এখন দেখা যাক J. C. K. Peterson, Bengal District Gazetteers, Burdwan এ গোপভূম সম্পর্কে কি বলেছেন— A large Pargana lying on the eastern slopes of the Asansol watershed. This was the name given to the tract of wooded upland forming the cape or headland of the Promontory from central India which just out in to the district. The neck of this Promontory is Shergarh, lying between the Ajay and Damodar. Between it and Gopbhum in the same formation are the recently formed Parganas of Salimpur and Senpahari— which probably belonged to Gopbhum. (১৭)

আলোচ্য গোপভূমের পরিচিতি প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাংবাদিক তথা প্রাবন্ধিক শান্তনু ঘোষ সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় তার 'গড় জঙ্গলের হাজার বছরের দুর্গাপুজো' প্রবন্ধে যা বলেছেন তা হল— বর্ধমান জেলার দামোদর-অজয় উপত্যকার উত্তরাংশ, অর্থাৎ এখনকার দুর্গাপুর, কাঁকসা ও আউশ গ্রাম ব্লককে প্রাচীনকালে গোপভূম বা গোপভূমি বলা হত। .... গোপচন্দ্র ষষ্ঠ শতকে গোপভূমির স্বাধীন রাজা ছিলেন। পরবর্তীকালে .... পাল রাজশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। .... মহামাণ্ডলিক ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বর ঘোষ এই সুযোগে গোপভূমিকে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করে। একাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক কাহিনী কয়েকশো বছর লোকগাথা হয়ে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরার পর ধর্মমঙ্গলের কাব্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। (১৮)

এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি পর্বের পরিসমাপ্তি টানার আগে এই গোপভূমেরই এক বিশিষ্ট গ্রাম সুয়াতার বিগত দিনের এক কবি আব্দুল হালিমের কথায় আসি— যিনি বিদ্যোৎসাহী বঙ্গেশ্বর সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) সমসাময়িক ছিলেন। তিনি হুসেন শাহের নির্দেশেই ১৪৩৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রিঃ 'মৃগাবতী' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। সেই কাব্যগ্রন্থটি গ্রাম বাংলার প্রখ্যাত গবেষক অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় আয়ুব হোসেন— ঐ গ্রামেরই এক কৃতী সন্তান মরহুম আব্দুল কাদের চৌধুরীর বাড়ি থেকে ওটি উদ্ধার করে ১৩৯১ বঙ্গাব্দের 'শারদীয়া বর্ধমান' পত্রিকায় সম্পাদনাসহ প্রকাশ করেন। তাতে সমসাময়িক বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে গোপভূমের অবস্থান বিষয়ে কিছু তথ্য জানা যায়। তাই প্রাসঙ্গিক অংশের কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল—

গোপভূম নামে দেশ অতিপুরাতন।
কত গোপ বাস করে শুন দিয়া মন।।
অজয় কুনুর বহে গোপভূম ভিতর।
এর মাঝে আছে কত সুন্দর শহর।।

ভালকী উজানী ভাদর দিগনগর।
উন্নাগ মঙ্গলকোট ভালকী শহর।।
বানকেশ্বর ভরতপুর বসুধা চুরুলিয়া।
পনিয় সুয়াতা আর জাঙ্গলে বেড়িয়া।।
গোপভূম রাজ্যে আছে এসব নগরী।
জঙ্গলেতে ঘেরা দেশ অপরূপ পুরী।। [১৯]

ঐ কাব্য সম্পাদনা কালে গোপভূম সম্পর্কে সাহিত্যবিনোদ এবং আচার্য দীনেশ সেন স্মৃতি পুরস্কাব ধন্য প্রখ্যাত গবেষক শ্রদ্ধেয় আয়ুব হোসেনের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— "গোপভূম বর্তমানে পরগনা হলেও পরগনা সৃষ্টির বহু আগেই গোপভূমের সৃষ্টি। 'গোপভূম' নাম এক প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। গোপ ও ভূম এই দুটি শব্দ দ্বারা গোপভূম গঠিত। গোপ অর্থাৎ গো-পালক, ভূম অর্থে ভূমি বা স্থান। গোপভূম হলো গোপালকদের ভূমি। দামোদর নদ বেষ্টিত এবং কুনুর, গাঙ্গুর, খড়ি, বাঁকা নদী বিধৌত ছিল গোপভূম।"

উপরিউক্ত বিভিন্ন বিদগ্ধজনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে, একদা গোপভূম অজয়-দামোদরের মধ্যবর্তী দোয়াবকে ঘিরেই ব্যাপক এলাকা নিয়েই বিস্তৃত ছিল। যার সীমাকরণ করতে গিয়ে সহজেই বলা যায় যে, এই অঞ্চল পূর্বে কাটোয়া তথা গঙ্গা, পশ্চিমে কল্যাণেশ্বরী অর্থাৎ বরাকর এবং উত্তরে অজয় ও দক্ষিণে দামোদর বেষ্টিত বিস্তৃত ভূভাগ নিয়েই অবস্থিত ছিল। কোথাও কোথাও এর এলাকা অজয় দামোদরকেও ছাড়িয়ে যেত। তাই দেখা যায় অনেক সময়েই অজয়ের উত্তরাংশ বা বীরভূমের অজয় তীরবর্তী বিস্তৃত এলাকাই গোপভূমের অন্তর্গত ছিল। অন্যদিকে দামোদরের দক্ষিণে বেশ কিছু এলাকা যেমন পোখরন, দধিমুখা, বড়জোড়া, সোনামুখী ইত্যাদি সহ অনেকক্ষেত্রেই— দামোদর থেকে দ্বারকেশ্বর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাই গোপভূমের সীমানাভুক্ত ছিল। কিন্তু তা থাকলেও ধীরে ধীরে তা সঙ্কুচিত হতে হতে দামোদর ও অজয় নদীর মধ্যবর্তী এলাকাই গোপভূম হিসাবে দীর্ঘদিন স্বীকৃত ছিল। আর সেই প্রাচীন স্বীকৃত গোপভূমের মধ্যেই অবস্থিত ছিল বর্তমান শিল্পনগরী দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, আসানসোল। তবে শিল্পনগরী হিসাবে তখন তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেগুলি ছিল সবই গহন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আসানসোলের নামকরণের ইতিহাস খুঁজতে গেলেই প্রমাণ হবে যে, একদা ঐ এলাকায় 'আসন' গাছের আধিক্য থাকায় সেখানের নাম হয়েছিল আসানসোল। কাজেই গাছপালায় ঘেরা ছিল প্রাচীন গোপভূম। আর তার সীমানাও ছিল বিশাল বিস্তৃত।

তবুও বলা যায় পরিবর্তনশীল জগতে চিরকাল কোন জিনিষ অপরিবর্তনীয় থাকে না। জাগতিক নিয়মেই তার পরিবর্তন ঘটে। সেই নিয়মেই গোপভূমের পূর্বের সেই

কলেবর বা বিস্তৃতি এখন আর নাই। তার অবয়বে ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। মধ্যযুগে এর পূর্ব সীমা ভাগীরথীকে ছেড়ে আরও পশ্চিমে সরে এসেছে, তা মোটামুটি কাটোয়া থেকে অজয় বরাবর পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে মঙ্গলকোটে হাজির হয়েছে এবং সেখান থেকে বাদশাহি সড়ক যা মঙ্গলকোটে অজয় পার হয়ে কালুত্তাকের ভিতর দিয়ে বর্ধমান অতিক্রম করে গড় মান্দারনের দিকে চলে গেছে। সেই বাদশাহি সড়ককেই এর পূর্ব সীমা ধরা হত, কিন্তু পরবর্তীকালে তাও পরিবর্তিত হয়েছে। সেই সীমা সঙ্কুচিত হয়ে মঙ্গলকোট থেকে গুসকরার দিকে আরও এগিয়ে পূর্বে আউশ গ্রাম ব্লকের সীমানা বরাবর দক্ষিণে অগ্রবর্তী হয়ে গলসীর পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে দামোদর স্পর্শ করেছে। অন্যদিকে পশ্চিম সীমানাও বরাকর থেকে অনেকখানিই পূর্বদিকে এগিয়ে এসেছে এবং উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহমান দুই নদীকেন্দ্রিক সীমানাও কোথাও কোথাও পরিবর্তিত হয়েছে।

সেদিক থেকে পূর্বের সেই আকৃতির পরিবর্তন হতে হতে ভারত সম্রাট শের শাহের আমলে (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রিঃ) যখন শের শাহ বাংলাদেশ অধিকার করে শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলা আনার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি সুবা এবং প্রত্যেক সুবাকে কয়েকটি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন। বিশেষ করে সমগ্র বঙ্গকে মোট ১৯টি সরকারে বিভক্ত করার পর সেই সকল সরকারগুলিকে বেশ কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করা হয়েছিল। ঠিক তখনই গোপভূমের সীমা সঙ্কুচিত হয়ে তা গোপভূম পরগনায় পরিণত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ভারত সম্রাট আবুল জাফর মহাম্মদ মহীঅদ্দিন বাদশাহ গাজী আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ) তাঁর সময়কালে ১৬৯৪ খ্রিঃ এক ফরমানে বর্ধমানের জমিদার কিষণরাম রায় রাঢ় বঙ্গের অন্যান্য পরগনার সঙ্গে এই গোপভূম পরগনাটির শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করেছিলেন [২০] তখন থেকে এটি বর্ধমান রাজ পরিবারের অধীন একটি পরগনা হিসাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। তবে কখনও কখনও এটি 'গোয়ালাভূম' নামেও অভিহিত হত। যেমন ১৭০৬ খ্রিঃ আবুল জাফর মহাম্মদ মহীঅদ্দিন আলমগীর বাদশাহ গাজীর ফরমানের এক তপশীল মহালে অন্যান্য পরগনার সঙ্গে একে গোয়ালাভূম নামেও উল্লেখ করেছে। [২১]

এর দীর্ঘদিন পরে ১৭৪৪ খ্রিঃ বর্ধমানরাজ চিত্র সেন এই গোপভূম জয় ও অধিকার করে নেয়। [২২] তবুও 'গোপভূম' হিসাবেই এর বিশেষ পরিচিতি অক্ষুণ্ণ ছিল তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় ইংরেজ আমলে ১৭৯৩ খ্রিঃ প্রাপ্ত পুলিস ট্যাক্সের এক রিটার্ন থেকে বর্ধমান চাকলার বিভিন্ন পরগনার যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে অন্যান্য পরগনার সঙ্গে এটিও 'গোপভূম' পরগনা নামেই উল্লেখিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে মহকুমার অধীনস্থ বিভাগগুলিই পরগনা নামে অভিহিত হলেও ঐ

বিভাগগুলিই থানায় রূপান্তরিত হয় এবং মোগল আমলের পরগনা অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর হলেও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাদের সেই পূর্বের পূরা নামই বজায় ছিল। সেই তথ্যচিত্র Maps of Revenue Survey of India, 1854-57 তেও দেখা যায়। তদবধি একমাত্র আউশ গ্রাম এক নং এবং আউশ গ্রাম ২ নং নামে দুটি থানা নিয়েই গোপভূম পবগনা এখনও যে বর্তমান তা ঐ দুই থানা অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রাচীন সি.এস (C.S) পর্চা অবলোকন করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। গ্রন্থ শেষে ঐরকম ২/১টি পর্চার নমুনা তুলে দেওয়া হল। তবে গোপভূমের অতীতের সেই বিস্তৃতি তখন থেকেই ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে অমাবস্যার পরে প্রতিপদ অন্তে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ক্ষীণ ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

তা পড়ুক। পরিবর্তন তো হতেই পারে। কালে কালে কত দেশেরই তো আকার, অবয়ব ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটছে এবং পরিবর্তনশীল জগতে সেটাই নিয়ম। সেই নিয়মের নিগড়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা কারো নাই। তাই সেটা মেনে নিতেই হয়। গোপভূমেরও আকার আয়তনের পরিবর্তন হলেও যুগে যুগে তার সীমানা ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলেও এখানে সেই প্রাচীন গোপভূমের কথাই আলোচনায় তুলে ধরতে চাই। উদ্দেশ্য বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে দেখা— অর্থাৎ বর্তমান গোপভূমের নিরিখে অতীতের গোপভূমকে ফিরে দেখা। তাতে তার সামগ্রিক রূপটাই পরিস্ফুট হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। প্রাচীন সেই গোপভূমের পরিসীমার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন সেই এলাকাকে ভৌগোলিক পরিভাষায় অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের বেড়াজালে ফেললে যার সীমা দাঁড়ায় ৮৭ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৮৮ ডিগ্রী ১০ মিঃ পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২৩ ডিগ্রী ২০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৩ ডিগ্রী ৪০ মিঃ অক্ষাংশের মধ্যে। ঐ এলাকাস্থিত স্থানটুকুই গোপভূম শিরোনামায় আমাদের আলোচ্যস্থান। বর্তমান বর্ধমান জেলার আকার অনেকটাই হাতলযুক্ত হাতুড়ির মত। এখন সেই হাতুড়ির উপরের সামান্য অংশ সহ, সমগ্র হাতলটাই আলোচনার বিষয়। এক কথায় প্রায় সমগ্র পশ্চিম বর্ধমানই প্রাচীন গোপভূম। গোপভূমের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সেই সমগ্র প্রাচীন গোপভূম এলাকাই পাদপ্রদীপের আলোয় আনতে চাই।

।। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকা।।

১) বাংলাদেশের ইতিহাস— রমেশচন্দ্র মজুমদার।.... পৃঃ-১২

২) বাঙালীর ইতিহাস— নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-১০৮

৩) ঐ ঐ .... পৃঃ-১১৭

৪) পাল পূর্ব যুগের বংশানুচরিত — ডঃ দীনেশ সরকার।.... পৃঃ-৫০

৫) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-৯২
৬) বাঙালীর ইতিহাস— নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-১১৭
৭) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১১
৮) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (অখন্ড) বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-৫৮
৯) Hutton Census Report, VOL. 1. .... Page-395-96
১০) বাঙালীর ইতিহাস— নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ ৬৯
১১) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (অখন্ড সং) বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-৪৩
১২) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৬৭
১৩) রাঢ়ের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি (২) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৩৮
১৪) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২২২
১৫) সদগোপতত্ত্ব— ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-২২৯
১৬) বর্ধমান পরিচিতি— অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী।.... পৃঃ-২৭-২৮
১৭) Bengal District Gazetteers, Burdwan. Page-247
১৮) সাপ্তাহিক বর্তমান— ৬ই অক্টোবর— ১৯৯৬ .... পৃঃ-২৫
১৯) মৃগাবতী কাব্য— আব্দুল হালিম, সম্পাদনা— মুহম্মদ আয়ুব হোসেন শারদীয়া বর্ধমান (১৩৯১).... পৃঃ-৬২
২০) বর্ধমান রাজ বংশানুক্রম/চরিত— রাখালদাস মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ পরিশিষ্ট-৫
২১) ঐ ঐ .... " " -১০-১২
২২) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৮০

।। গোপভূমের প্রাচীনত্ব ।।

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ।। — দ্বিজেন্দ্রলাল।

আমাদের এই ভারতভূমি একদা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। পরে তা ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু বর্তমান আকার পেতে তার সময় লেগেছিল কম করেও কয়েক লক্ষ বছর। আর সেই দীর্ঘ সময়ে ছোট বড় বহু নদীর সক্রিয় পলল প্রক্রিয়াতেই এদেশ বর্তমান রূপ পেয়েছে। তাদের পলল-প্রক্রিয়ায় এই দেশ শুধু গঠিতই হয়েছে তা নয়— তাদের জলপ্রবাহে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ করেছে চাষ-আবাদ, করেছে নদীপথে যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য। তাই নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা। মোট কথা নদী বিভিন্নভাবেই তাদের জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করেছে তাই এই দেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়।

যে সকল নদী দ্বারা এই বঙ্গদেশ গঠিত তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য হল গঙ্গ া নদী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে তার পলি সঞ্চয়নেই সৃষ্টি করেছে সরস শ্যামল উর্বর পেলব বাংলাদেশ। আর তাকে ঐ কাজে সাহায্য করেছে আরও যেসব সহযোগী উপনদী তাদের মধ্যে রাঢ় বঙ্গে অজয়-দামোদরের উল্লেখ্য প্রাধান্য ছিল। অনেকের মতে এই নদীগুলির মধ্যে দামোদর নাকি গঙ্গা অপেক্ষাও প্রাচীন। চতুর্থ হিমবাহ যুগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে এদের সৃষ্টি। পণ্ডিতদের মতে সেইসময়েই মধ্য ভারত ও সাঁওতাল পরগনা হতে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে ঐসব নদী দ্বারাই বাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বঙ্গে। এইভাবেই রাঢ় বঙ্গ সহ সমগ্র বঙ্গই বর্তমান রূপ পায়।

বঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান গঙ্গানদী এবং তার দুই প্রধান উপনদী অজয় ও দামোদর রাঢ় বঙ্গের বুক চিরে প্রায় সমান্তরাল গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্বে এগিয়ে গিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত গঙ্গাতেই মিশেছে। এখন সেই অজয়-দামোদরের সোহাগ ঘেরা মধ্যবর্তী অঞ্চলই রাঢ় বঙ্গ নামে পরবর্তীকালে খ্যাত হয়। রাঢ় বঙ্গ আবার দু'টি ভাগে বিভক্ত যথা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। আমি গোপভূম প্রসঙ্গে যে রাঢ় বঙ্গের কথা বলছি তা হল দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর অংশ। এই অংশই অজয়-দামোদরের বেষ্টনীর

মধ্যেই অবস্থিত এবং ঐ অংশই পরবর্তীকালে গোপভূম হিসাবেই পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু কখন এবং কেন সে কথায় পরে আসছি।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চল ছিল গভীর অরণ্যে পরিব্যাপ্ত। সেই গভীর অরণ্যে অতি প্রাচীন কাল থেকেই অরণ্যচারী বন্য জাতির অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। আসলে সেই প্রাচীন মানুষের বসবাসের জন্য এদেশ ছিল স্বর্গ রাজ্য। কারণ এর গহন-গভীর অরণ্যে সহজেই বন্য ফলমূল সংগ্রহ ও অবাধে বন্যপ্রাণী শিকার করে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করা যেত। পরে সেই অরণ্যচারী মানুষ যখন দীর্ঘকাল অতিক্রমণের পর পশুপালনে রত হল তখনও এই অঞ্চল তাদের কাছে স্বর্গ রাজ্যই ছিল— কারণ এর গহন গভীর অরণ্যের গাছপালা ও নদী চরায় চারণক্ষেত্র তাদের জীবন-জীবিকায় খুবই সাহায্য করত। পরে পরে যখন তারা চাষ আবাদে রপ্ত হল তখনও এই এলাকা তাদের কাছে স্বর্গ রাজ্যই ছিল— কারণ তখন এই রাঢ় বঙ্গভূমি কৃষিকাজের জন্য প্রচুর পলি গঠিত উর্বর সমভূমি হওয়ায় সেখানে তারা সহজেই কৃষিকাজের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে পারত। তাই সভ্যতার আদি পর্ব থেকেই যুগ পরম্পরায় এখানে জনবসতির চাপ ছিল।

প্রাগৈতিহাসিক কালেও এখানে অরণ্যচারী মানুষের অবস্থান যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় অজয়-দামোদর নদী বেষ্টিত অরণ্যাঞ্চলে। এখানকার বীরভ্যানপুরেই সেই অরণ্যচারী মানুষদের ব্যবহার্য বহু প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে— তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে একদা এই অঞ্চলেও প্রাচীন প্রস্তর যুগীয় মানুষেরও বসবাস ছিল।

পরে প্রস্তর যুগ পার হবার বহু পরে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখল এবং সেই ধাতুকে কাজে লাগিয়ে নানান অস্ত্রশস্ত্রসহ অলংকারাদি নির্মাণের কৌশলও রপ্ত করল। তখনকার দিনে তামাই ছিল প্রধান ধাতু। সেই তামাকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে গোপভূম নামে চিহ্নিত এই অজয়-দামোদর দোয়াব অঞ্চলেই একদা তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল তার প্রমাণ আজ আমাদের হাতের নাগালেই রয়েছে। যেমন অজয়-দামোদর নদীর তীরবর্তী এলাকার ভরতপুর, পোখরন, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বসন্তপুর, গোস্বামীখণ্ড, মঙ্গলকোট ইত্যাদি অঞ্চলেও একদা ব্যাপকভাবে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার সমসাময়িক তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পরে পরে ঐ সকল স্থানেই লৌহ যুগীয় সভ্যতা ও ঐতিহাসিক কালের বহু সভ্যতার নিদর্শনই আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই বলা যায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এই এলাকায় মনুষ্য বসবাসের আধিক্য ছিল কিন্তু তখন ঐ এলাকা কি নামে পরিচিত ছিল তা জানা না গেলেও ঐ এলাকার যে অস্তিত্ব ছিল তা আজ পাথুরে প্রমাণে প্রমাণিত। পরবর্তীকালে ঐ এলাকা 'গোপভূম' নামে পরিচিত হলেও কতদিন আগে তা 'গোপভূম' হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল তা আলোচনা করেই

দেখা যাক এবং তা করতে গেলে আমাদের বেশ কিছু সময় পিছন ফিরে যেতে হবে।

ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ। এখানে প্রাচীনকাল থেকেই পশুপালক গোপ জাতির বাস। শুরুতে তারা পশুপালক জাতি হিসাবে পরিচিত হলেও তাদের পালিত পশুর মধ্যে গরুর সংখ্যাই ছিল বেশি। তাই তারা গোপাঃ বা গোপাল বা গোপালক নামে পরিচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদে বহু সূক্তে তার উল্লেখ আছে। পবে সেই জাতি গোপাঃ > গোপাল > গোপ বা গোয়ালা নামেও অভিহিত হয়। পরে তারাই তাদের উৎপাদিত দুগ্ধ গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা সহকারে বিক্রয় করত বলে তারা ঘোষক > ঘোষ উপাধি প্রাপ্ত হয়।

সেই প্রাচীন কাল থেকে যে সকল বিদেশী গোষ্ঠী ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল তাদের সকলেই প্রকৃতিতে ছিল পশুপালক এবং যাযাবর। আর্যরাও তার ব্যতিক্রম নয়। আর্যরা ভারতে এসেছিল খ্রিষ্ট জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগে। আর্যদের আসা নিয়ে যদিও পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। অনেকেই বলেন তারা এদেশেরই বাসিন্দা ছিল— তা না হলে তাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তারা কোথা থেকে এসেছে তার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকত কিন্তু কোথাও তেমন উল্লেখ নাই। অন্যদিকে এদেশে কোথায় কোথায় তারা অবস্থান করেছিল তার বহু উল্লেখ তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

তবুও বলি, তারা যদি বহিরাগতই হয় তবে তারাও ছিল পশুপালক ও যাযাবর তাতে সন্দেহ নাই। কারণ আর্যদের প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে তারা তাদের পালিত গবাদি পশুর মধ্যে গাভীগুলি যাতে দুগ্ধবতী হয় এবং তাদের শরীর স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে তার জন্য তারা পরম করুণাময়ের কাছে বারে বারে প্রার্থনা জানিয়েছেন। অন্যদিকে ঐ ঋগ্বেদের বহুস্থানেই বিশেষ করে অষ্টম মণ্ডলের ৪১, ৫২ সূক্তে, দশম মণ্ডলের ২১, ২৩, ২৮ ইত্যাদি সূক্তে গোপ জাতির বিষয়ে এবং তাদের গোচারণ ক্ষেত্র ইত্যাদির বিষয়েও বহু বহু উল্লেখ আছে। গোপেরা পশুপালক হওয়ায় তারা বিভিন্ন নদীকেন্দ্রিক তৃণাঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিল— বিশেষ করে যমুনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় গোপ জাতির গাভীগুলি ছিল বেশ স্বাস্থ্যবতী ও দুগ্ধবতী তাই প্রাচীন ঋষিগণও ঋগ্বেদের বহু সূক্তে বিশেষ করে ৫ম মণ্ডলের ৫২ সূক্তে প্রার্থনা করেছেন এই বলে— "যমুনায়ামধি শ্রুতমুদ্রাধো গব্যং মৃজে"। অর্থ— আমি যেন যমুনা নদীর তীরে প্রসিদ্ধ ধেনুধন লাভ করি। [১] এতেই বোঝা যায় গোপ জাতির পালিত গাভী আর্যদেরও কাম্য ছিল।

সে দিক থেকে বলা যায় গোপেরা পশুপালক আর আর্যরাও পশুপালক এবং আর্যদের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে গোপেদের যখন প্রভূত উল্লেখ রয়েছে তখন ধরে নিতে অসুবিধা নাই যে এরাও ভারতে আর্যদেরই সমকালীন জাতি এবং তা কোন বর্ণসংকর নয় সাবেক বনিয়াদি জাতি। তবে আর্য জাতির সঙ্গে গোপেদের যে সামান্য পার্থক্য ছিল না তা নয়। আর্যরা ঘোড়ার ব্যবহার জানত। গোপেদের তা জানা ছিল না। আর্য

কৃষ্টিব প্রধান অবদান ছিল তাদের উন্নত মানের ভাষা— যা অন্যান্যদের মধ্যে ছিল না। আর্যরা আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।

ঐ প্রসঙ্গে পশ্চিম রাঢ়ের প্রখ্যাত গবেষক মানিকলাল সিংহ বলেছেন— "সেকালের গোপেদের জীবন অনেকটা আর্য ঋষিদের মতই ছিল। আর্য ঋষিরাও গৃহী, খাদ্যের জন্য গোপালন করিতেন, বন জঙ্গল হইতে শাক সব্জী আহরণ করিতেন কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনায় নিবিষ্ট থাকিতেন। গোপরাও গৃহী খাদ্যের জন্য গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া পালন করিতেন। বন জঙ্গল হইতে শাক সব্জী আহরণ করিতেন। কিন্তু ভারতীয় ঋষিদের মত আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন না।" (২)

তা না থাক তবে আর্যদের মত গোপেরাও দুর্ধর্ষ ছিল। গোপালন করলেও তারা নিজেদের শৌর্য বীর্যের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে গোষ্ঠপতি, ভূস্বামী তো ছিলেনই, অনেক ক্ষেত্রে তারা রাজপদেও ব্রতী হয়েছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তারা রাজকার্যও পবিচালনা করেছিলেন। প্রমাণ হিসাবে পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা যায় যে, তারা মথুরা, বৃন্দাবন, হস্তিনাপুর ইত্যাদি বহুস্থানেই রাজত্ব করেছিলেন।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও বলা যায় গোপেদের আহীর বা আভীর, পহ্লব ইত্যাদি গোষ্ঠীর লোকেরা বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গোপেদের প্রধান পদবী ছিল ঘোষ। তার প্রমাণ বৃন্দাবনের নন্দ ঘোষ, আয়ান ঘোষ ইত্যাদি। এই পদবীটি তাদের মৌলিক পদবী। এখন দেখা যাক ঘোষ পদবী বা উপাধির গোপেরাও বহু ক্ষেত্রেই রাজা ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ওদুম্বরের ধরা ঘোষ এমনই একজন গোপ রাজা ছিলেন। তার নামাঙ্কিত এক কার্যাপনে (রৌপ্যমুদ্রায়) একদিকে খরোষ্ঠী লিপিতে অন্যদিকে ব্রাহ্মী লিপিতে রাজ্ঞার নাম উৎকীর্ণ আছে। সেখানে এক পিঠে দণ্ডায়মান এক পুরুষ মূর্তি তাতে খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা-- "মহাদেবসা ঘোষসা ওদুম্বরিসা" অন্য পিঠে রেলিংএ ঘেরা এক বৃক্ষ এবং সেখানে রয়েছে ত্রিশূল ও যুদ্ধ কুঠারের ছবি। সেখানেও ব্রাহ্মী লিপিতে ঐ একই কথা লেখা আছে— যার ইংরাজী করা হয়েছে— "of the great Lord Dhara Ghosa Prince of Audumbara." (৩)

অনুরূপ 'পাল' পদবীটিও গোপ সম্ভূত শক, পহ্লব, ক্ষাত্রপ বংশীয় বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত 'ধর্মপাল' নামাঙ্কিত মুদ্রাও পাওয়া গেছে যা বিশেষজ্ঞদের মতে গোপরাজাদেরই মুদ্রা। তাই ঐ সকল ইতিহাস নির্ভর তথ্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পশুচারক জাতি হলেও এরা প্রকৃতিতে দুর্ধর্ষ ছিল এবং গোচারণের সঙ্গে সঙ্গে আপন শক্তি সামর্থে তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজত্বও করেছিল সে প্রমাণ ভারতের সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। যেমন দক্ষিণ ভারতের বর্তমান তামিলনাড়ু রাজ্যের মহাবলীপুরমে, পহ্লবরাজ মহেন্দ্র বর্মণ সৃষ্ট

অতুলনীয় শিল্পকলাব নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। ঐসময় কাল, অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় সাতের শতক সেখানকাব ইতিহাসে পহ্লব যুগ নামে খ্যাত। পহ্লব শিল্পকলার নিদর্শনগুলি হল— কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির, ঐরাবতেশ্বরের মন্দির ও মহাবলীপুরমের রথ মন্দিবসমূহ।

এখন যুগে যুগে ভারতের ঐশ্বর্য ও সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে বহু বিদেশী গোষ্ঠী এদেশে এসে আপন আধিপত্য বিস্তার পূর্বক এই দেশেই রয়ে গেছে। এবিষয়ে একটি প্রবাদ বিশেষভাবে চালু আছে তাতে বলা হয়— এদেশে প্রবেশের পথ আছে কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে যাবার পথ নাই। কারণ এ দেশ মানুষের কাছে এতই আকর্ষণীয় যে, এদেশকে আপন করে নিয়ে এখানেই তারা থেকে যেতে চায়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবির সেই শাশ্বত উক্তিটি স্মরণীয়। যেখানে তিনি বলেছেন— "শক-হুনদল-পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।" অর্থাৎ যুগে যুগে বিভিন্ন বিদেশী গোষ্ঠী এদেশে এসেছে এবং এই দেশকেই ভালবেসে এদেশেই থেকে গেছে। আর্যদের পর তেমনি আর এক বিদেশী গোষ্ঠী, ইতিহাসের কোন সুপ্রাচীনকালে চীন দেশের প্রান্তসীমা থেকেই এদেশে প্রবেশ করেছিল। তারাও হল পশুচারক বা পশুপালক শক-ক্ষত্রপ-পহ্লব সম্প্রদায়। এরা ইউচি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ এর ফলেই দেশ ছেড়ে এদেশে চলে এসেছিল এবং শুরুতেই আপন শৌর্যের দৌলতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রান্তসীমা নিজেদের অধিকারে এনে 'শকস্থান' সৃষ্টি করেছিল।

পববর্তীকালে সেই গোষ্ঠীর লোকেরাই তাদের পালিত গবাদি পশুসহ বিভিন্ন নদ-নদীর চারণক্ষেত্র বরাবর অগ্রবর্তী হয়ে গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল বা মধ্যভারতে এসে পশুচারক গোপ জাতির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সেটাই স্বাভাবিক কারণ উভয়ের পেশা ও বৃত্তি যেখানে এক সেখানে দূরে দূরে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়— তাই শক ক্ষত্রপ পহ্লবেরা গোপেদের সঙ্গে পারস্পরিক মেলামেশায় একীভূত হয়ে গোপ জাতিতেই পরিণত হয় এবং দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করতে থাকে। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় ভগবান কৃষ্ণের লীলাভূমি তথা গোপকৃষ্টির পীঠভূমি— সেই মধ্যভারতের মথুরা বৃন্দাবনে। সেখানেও শক ক্ষত্রপ পহ্লব গোষ্ঠীর গোপেরাও যে সে সময় সেখানেও রাজত্ব করেছিলেন তারই প্রমাণ পাওয়া যায় বিখ্যাত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে একটি লাল পাথরের সিংহ মূর্তিতে— যার গায়ে খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা এক শক ক্ষত্রপ গোষ্ঠীভুক্ত রাজপরিবারের বংশতালিকাও তাতে উল্লেখিত ছিল। [(৪)]

শক ক্ষত্রপ পহ্লবরা গোপেদের সঙ্গে একীভূত হলেও গোপেদের প্রধান বিভাগগুলির মধ্যে পহ্লবও একটি বিভাগ হিসাবে স্বীকৃত হয়। যদিও বলা যায় গোপেদের প্রধান গোষ্ঠী আভীর বা আহীররা হল তৃণাশ্রিত পশুপালক আর পহ্লবরা অরণ্যচারী। তারা

তাদের পালিত জীবজন্তুকে অরণ্যের লতা গুল্ম ও বৃক্ষের পল্লব (পাতা) দ্বারা পরিপালিত করত বলেই তারা পহ্লব গোপ নামে পরিচিত হয়েছিল।

যাই হোক, এই গোপালক গোপ সম্প্রদায় দীর্ঘদিন একত্রে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, শোন, চম্বল বিধৌত উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্যভারতের মথুরা-বৃন্দাবন কেন্দ্রিক পলিবহুল তৃণ প্রাচুর্যের অঞ্চলে বসবাস করলেও জনসংখ্যার চাপে তারা নতুনতর কোন তৃণাচ্ছাদিত স্থানের উদ্দেশ্যে আরও দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হতে থাকে। এইভাবে তাদের এক শাখা রাঁচি, হাজারীবাগ, পালামৌ অঞ্চলের দিকে অগ্রবর্তী হয়ে আরও দক্ষিণে এগিয়ে যায়। এদের মধ্যে আহীর ও পহ্লব উভয় সম্প্রদায়ই ছিল। তবে আহীরদের সংখ্যাই বেশি। গোপেদের এক শাখা ধানবাদ-পুরুলিয়ার উপর দিয়ে রাঢ় বঙ্গের উপকণ্ঠ হয়ে রাঢ় বঙ্গে ব্যাপকভাবে প্রবেশ না করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে যায় এবং এদেরই বিশেষ অংশ, দ্বারভাঙ্গা অর্থাৎ বঙ্গের দ্বার বা দ্বারবঙ্গ হয়ে রাঢ় বঙ্গে প্রবেশ করে, সেই রাঢ় বঙ্গের পশ্চিম অংশে অজয়-দামোদরের পক্ষপুটে গভীর অরণ্যাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বসতি গড়ে ছিল। ফলে ঐ এলাকা গোপেদের বসতক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় তাকেই পরে 'গোপভূম' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এখানে মধ্য ভারত থেকে আগত গোপেরা অধিকাংশই ছিল পহ্লব গোপ এবং তারা এই অরণ্যাঞ্চলে নিজেদের পালিত পশুপ্রাণীদের অরণ্যের লতা, গুল্ম, বৃক্ষের পল্লব দ্বারাই অনেকাংশেই পরিপালিত করত বলেই তারা পরিপূর্ণভাবেই ছিল পহ্লব গোপ।

এই পহ্লব গোপেদের আর একটি শাখা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ আধিপত্যের সঙ্গে রাজত্ব পরিচালনা করে সেই সব স্থানে নিজেদের শিল্প কৃষ্টির বহু পরিচয় রেখে গেছে— সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে এই গোপগোষ্ঠীর আর এক শাখা দ্বারভাঙ্গা দিয়েই পদব্রজে গৌড়বঙ্গের উপর দিয়ে প্রাগজ্যোতিষপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই প্রাগজ্যোতিষপুরই হল বর্তমান আসাম। একদা সেখানে গোপভূমের মতই গোপ বা গোয়ালাদের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল বলেই এখনও সেখানের একটি জেলা গোয়ালপাড়া নামে খ্যাত। তাই বলা যায় এই গোপ জাতি বিভিন্ন সময়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং জাতি হিসাবে এই সম্প্রদায় যে খুবই প্রাচীন তার বহু প্রমাণ বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুরাণ ভাগবত গীতা ইত্যাদি গ্রন্থে এবং ভারতীয় লিপিসমূহের জননী স্বরূপা বহু ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিমালায় (যার রচনাকাল সাধারণত খ্রিষ্ট পূর্ব ৫ম-৪র্থ শতাব্দী ও তার পরবর্তীকাল) এ জাতির কথা উল্লিখিত থাকায় এ জাতির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত।

তা হোক। এখন আবার গোপভূমের কথায় ফিরে আসি। আমরা দেখলাম রাঢ়

বঙ্গের এক প্রত্যন্ত এলাকার অজয়-দামোদর বেষ্টিত অরণ্যাঞ্চলে গোপজাতির বসতি বিন্যাস গড়ে ওঠায় তা ধীরে ধীরে 'গোপভূম' নামেই খ্যাত হয়ে যায়। কিন্তু ঐ এলাকা কখন থেকে ঐ পরিচিতি পেয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রশ্ন এসে যায়। তারই উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টায় এতক্ষণ ধরে বেশ কিছু সময় পিছিয়ে গিয়ে গোপ জাতির প্রসঙ্গে যে আলোচনার অবতারণা করা হল তাতো সেই উদ্দেশ্যেই।

আলোচনায় দেখা গেল শক ক্ষত্রপ পহ্লবরা চীনদেশের প্রান্তসীমা পার হয়ে উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করেছিল— তার সময়কাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে। তারপর তারা বিভিন্ন নদ-নদীর তীর ধরে তাদের পালিত গবাদি পশুসহ অগ্রবর্তী হতে হতে মধ্যভারতের গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলে বসতি গড়েছিল এবং সেখানে দীর্ঘদিন বসবাসের পর প্রাচীন গোপেদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হওয়ার ফলে জন বিস্ফোরণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গোপ জাতি দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রবর্তী হতে হতে দ্বারভাঙ্গা পার হয়ে রাঢ় বঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানেই স্থিতু হয়ে যায়।

সেদিক থেকে ঐ বিদেশী গোষ্ঠীর ভারতে আগমন ও মধ্যভারতে দীর্ঘদিন অবস্থানজনিত জনাধিক্য হেতু চারণক্ষেত্রের অভাব অনুভবে গোপজাতিব উভয় গোষ্ঠী আভীর ও পহ্লব সম্প্রদায়ের অনেকেই সাবেক স্থান পরিত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রবর্তী হয়ে রাঢ় বঙ্গে প্রবেশ করতেও কম করে কয়েকশ বছর সময় লেগেছিল— সেটাই স্বাভাবিক তাই তাদের রাঢ় বঙ্গে প্রবেশের কাল কম করেও খ্রিষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক হওয়াই সম্ভব। তাছাড়া সেই গোপ সম্প্রদায় যেখানে বসতি গড়ল সেই স্থানে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবার পর সেই এলাকা তাদের নামে নামিত হতে আরও কিছু সময় নিশ্চয়ই লেগেছিল। তাই বলা যায় রাঢ় বঙ্গে অজয়-দামোদর ঘেরা অরণ্যাঞ্চল গোপভূম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল প্রায় খ্রিষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতক থেকে। সুতরাং গোপভূম ঐ এলাকা কম করেও পৌনে দু'হাজার বছরের মত প্রাচীন সেটা ধরে নিতে পারা যায়। আর ঐতিহাসিক নিরিখে তাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয় শকদের সমগোত্রীয় বা সম্পর্কিত পহ্লব জাতির মানুষই রাঢ়ীয় পল্লব গোপদের পূর্বপুরুষ। (৫)

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বঙ্গের কোন এক বিশেষ অঞ্চল গোপভূম হিসাবে পরিচিত যে হয়েছিল তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? তার উত্তরে বলা যায় বাঙালি চিরকালই ইতিহাস বিমুখ জাত। তাদের ইতিহাসচেতনা মোটেই ছিল না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও দুঃখ করে বলেছিলেন— "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" কিন্তু বাঙালিরা সেই ইতিহাস সন্ধানে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। সেখানেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বিংশ শতকের ১ম ও ২য় পাদে এসে ইংরেজদের প্রেরণায়

সে প্রচেষ্টা বাঙালিরা প্রথম শুরু করে। তাই বলা হয় ঐতিহাসিক গবেষণা ও "দৃষ্টিভঙ্গী আমরা পাইয়াছি সমসাময়িক য়ুরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজি ঐতিহাসিক আলোচনা গবেষণার রীতিপদ্ধতি ও আদর্শ হইতে।" (৬)

তাছাড়াও বঙ্গের ইতিহাস অনুসন্ধানে সাহিত্যে সম্রাট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের উদাত্ত আহ্বান- সেখানে তিনি বলেছিলেন— "আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক।" (৭) তাতে সাড়া দিয়ে অনেকেই সেই কাজে ব্রতী হয়েছেন। সেহেতু ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে অনেক কিছু ফল মিলতে শুরু করেছে। তবুও বলা যায় প্রাচীন কালের বঙ্গ-ইতিহাসের অনুসন্ধান খুবই দুরূহ ব্যাপার, আর আঞ্চলিক ইতিহাস খুঁজতে যাওয়া সেতো খুবই কঠিন প্রচেষ্টা তাতে সন্দেহ নাই। তবুও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পর্যালোচনার মাধ্যমে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেল তা আলোচনা করে দেখালাম—গোপভূম কম করেও দেড় হাজার বছরের প্রাচীন।

এবার বঙ্গ ও রাঢ় বঙ্গের প্রাচীনতার বিষয়ে দু'চার কথা বলে-সেই বঙ্গ তথা রাঢ় বঙ্গেরই এক বিশেষ জনপদ যে অতীত কাল থেকেই গোপভূম হিসাবে স্বীকৃত ছিল, বিভিন্ন তথ্য প্রমাণে তার প্রাচীনত্বের বিষয়ে আরও কিছু আলোচনার উদ্যোগী হওয়া যেতে পারে।

বঙ্গদেশ খুব প্রাচীন দেশ, কিন্তু কতদিনের প্রাচীন? সেখানে বলা যায় বঙ্গ দেশের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সম্ভবত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে— যা মহিদাস ঐতরেয়র রচনা বলে জনশ্রুতি থাকলেও আসলে এটি "ঋগ্বেদের সঙ্গে যুক্ত অন্যতম ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।" (৮) ফলে এটি ঋগ্বেদের সমসাময়িক কালেব সৃষ্ট সেটাই ধরে নিতে হয়। পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের রচনা কাল খ্রিষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক বা তার কাছাকাছি সময়। সে দিক থেকে ঐতরেয় আরণ্যক ঋগ্বেদের সমসাময়িক হলে এরও রচনা কাল আড়াই থেকে তিন হাজার বছরের প্রচীন হওয়ারই কথা। আর তাতে যখন বঙ্গ দেশের কথা উল্লেখিত হয়েছে তখন বঙ্গদেশও প্রায় তিন হাজার বছরের প্রাচীন সেটাই ধরে নেওয়া যায়।

এখন সেই প্রাচীন বঙ্গদেশের উল্লেখ্য এক অংশ হিসাবে রাঢ় দেশের কথায় আসা যাক। প্রথম এই দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈনধর্ম গ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্রে'। সেখানে জৈনধর্ম প্রচারক সশিষ্য মহাবীরের প্রতি রাঢ়বাসীর দুর্ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে। তাছাড়াও একই সময় কালে রচিত 'জৈন ভাগবত সূত্রে' ও ষোড়শ মহাজনপদের একটি হিসাবে রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। (৯) তাই বলা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে রচিত পুস্তকে রাঢ় বঙ্গের উল্লেখ থাকলে সেই দেশ কম করেও যে আড়াই হাজার বছরেরও অধিক প্রাচীন তা ধরে নিতে হয়। এহেন রাঢ় বঙ্গ পরবর্তী কালে

উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় নামে ২টি ভাগে বিভক্ত হবার আগেই তার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে অজয়-দামোদর নদীবেষ্টিত অরণ্য অঞ্চলে গোপজাতির আবির্ভাব সংঘটিত হয়ে যায় এবং সেই অঞ্চল গোপ অধ্যুষিত হয়ে পরে, বঙ্গে আর্য জাতির প্রভাব পড়ার অনেক আগেই।

আমরা জানি আর্যজাতির ভারতে আসার অনেক অনেক পরে তারা নিজস্ব প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। তার কারণ সেখানে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত জনগোষ্ঠী তথা আলপাইন গোষ্ঠী এবং সেখানকার প্রাচীন বাসিন্দারা মিলে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাই দীর্ঘদিন ধরে বহু চেষ্টা করেও আর্যরা বঙ্গে তথা রাঢ় বঙ্গে কোন ভাবেই প্রভাব ফেলতে পারে নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং আরণ্যকেও বলা হয়েছে—"অঙ্গে বঙ্গে অথবা মগধে আর্য জাতির বাস ছিল না।" (১০) এতে প্রমাণ হয় যে, উত্তরা পথের পশ্চিমাংশ আর্যগণ কর্তৃক বিজিত হলেও মগধ ও বঙ্গ কিন্তু বহু দিন পর্যন্ত স্বাধীন ছিল, (১১) আর বঙ্গ ও মগধ পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। তাই বলা যায় রাঢ় বঙ্গে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হবার বহু আগেই ভারতের গোপ জাতি খ্রিষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতকেই রাঢ় বঙ্গের প্রত্যন্ত সীমায় পৌঁছে যায়।

তখনও রাঢ় বঙ্গে রাজনৈতিক সুস্থিরতা ছিল না অর্থাৎ এই রাঢ় বিশেষ কোন রাজার দ্বারা সুষ্ঠ ভাবে শাসিত হত— তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ ঐ সময় ছিল বঙ্গ ইতিহাসের অন্ধাকারময় যুগ। মোটামুটি সেই সময়েই রাঢ়-বঙ্গে গোপ জাতির আবির্ভাব ঘটে। গোপদের অনুপ্রবেশের ফলে সেই অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অবশ্যই শুরু হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। তার ফলে "বিজেতা জাতি যতই ক্রমে এদেশের উর্বর ভূমির উপর অধিকার স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিল এদেশের আদিম অধিবাসীরা সম্ভবত ততই পূর্বদিকে, বর্তমান বাংলা দেশের দিকে এবং দক্ষিণ পশ্চিমে ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যার পর্বত এবং অরণ্যাঞ্চলে অগ্রসর হয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল।" (১২)

এর পরেও যারা এদেশে রয়ে গেল তাদের সঙ্গে বিজেতাদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটে দেশের মধ্যে এক পারস্পরিক মিশ্র সংস্কৃতির যে উদ্ভব হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রমাণ হিসাবে বলা যায় গোপজাতি কৃষিকাজে তেমন রপ্ত ছিল না কিন্তু এখানে স্থিতু হবার পর এখানকার অধিবাসীদের সংস্পর্শে এসে তারাও পরে পরে কৃষি কাজ রপ্ত করল।

আর্যগণ ভারতে আসার বহু পূর্ব থেকেই এদেশে অন্য জাতি গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। বাংলার এই জনসমষ্টি কোন সময়েই এক অভিন্ন মানব গোষ্ঠীর বংশোদ্ভব নয়। বিভিন্ন সময়ে আগত বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর পারস্পরিক সংমিশ্রণে এখানে সৃষ্টি হয়েছিল এক

সংকর বা মিশ্রজাতি। মোটামুটি ভাবে ইহাই বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর চেহারা এবং এই জন সৌধের উপরেই বাঙালির ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সংকর জন লইয়াই বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের সূত্রপাত। (১৩)

সে যাই হোক সেই প্রাক আর্য প্রভাব কালে বঙ্গদেশ বা রাঢ় বঙ্গ কোন শক্তিশালী রাজার অধীনে সংগঠিত হয়নি। আর হলেও তেমন কোন ইতিহাস মেলে না। ইতিহাস যা মেলে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। দেশী-বিদেশী সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা মাত্র। তেমনি এক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় সিংহল দেশীয় মহাবংশ নামক পালি গ্রন্থে। যেহেতু সেই কাহিনী আলোচ্য গোপভূম সীমানাধীন এক রাজ-কাহিনী তাই তার উল্লেখ করতে চাই।

এখন মহাবংশ গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় রাঢ় বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল এক সময় গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একদা বঙ্গের এক বেপরোয়া রাজকন্যা সুসিমা গোপনে মগধ যাবার কালে অরণ্যস্থ সিংহরাজ কর্তৃক অপহৃতা হন। পরে সেই সিংহরাজ তাকে বিবাহ করলে তাদের 'সিংহবাহু' নামে পুত্র জন্মে। সিংহবাহু পরে রাজা হয়ে সেই অরণ্যাঞ্চলের একশত যোজন পরিমাণ অরণ্য পরিষ্কার করিয়া তথায় এক জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন, এই জনপদই রাঢ়। (১৪) সম্ভবত এটি পশ্চিম রাঢ়। অনেকের মতে ওয়ারিয়া-দুর্গাপুরের সন্নিকটে সিঙ্গারণ নদীর পাশে অবস্থিত 'সিঙ্গারণ'ই সিংহবাহুর রাজধানী ছিল।

এবিষয়ে অনেক মতপার্থক্য বর্তমান। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, হান্টার সাহেব, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নন্দলাল দে প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা হুগলী জেলার 'সিঙ্গুর'কেই সিঙ্গারন বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐ মতকে যারা মানতে চান না তারা নিজেদের পক্ষ সমর্থন পূর্বক যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে মহাবংশে উল্লেখিত বঙ্গ রাজ-কন্যা, মগধ যাবার পথে গভীর জঙ্গলে সিংহরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাদের মতে সেই গভীর জঙ্গল হুগলী জেলার সিঙ্গুরের পরিবর্তে পশ্চিম রাঢ়ে পশ্চিম বর্ধমানের প্রাচীন জঙ্গল হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া বলা যায় আগের দিনের হুগলীর ঐ অঞ্চল রাঢ় নামে পরিচিত ছিল বলে আদৌ মনে হয় না। তাই বর্তমান ঐতিহাসিকরা মহাবংশে উল্লেখিত অরণ্যাঞ্চল ও তার মধ্যে সিঙ্গারণকে পশ্চিম রাঢ়েই অবস্থিত বলেই মেনে নেন।

মহাবংশের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় সিঙ্গারনের রাজা সিংহবাহুর বহু সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম হল বিজয়সিংহ। তবে এই বিজয়সিংহ ছিলেন খুবই উদ্ধত প্রকৃতির। তার ঔদ্ধত্যের জন্যই তিনি পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হলে, তিনি সাত শত অনুচর সহ জলযানে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হয়েছিলেন। সেখানে নিজ শৌর্যে লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করে নিয়ে নিজ নামে সেই দেশের নামকরণ করেন সিংহল।

বঙ্গসন্তানের সেই গৌরব গাথা কবি দ্বিজেন্দ্রলালও কবিতার ছন্দে ব্যক্ত করে বলেছেন—

"একদা যাহার বিজয়-সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়।।"

অন্যদিকে ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্বভাব সুলভ ছন্দ সুষমায় সেই কথাই বলেছেন—

ঐ সিংহল দ্বীপ সিন্দুর টিপ
কাঞ্চনময় দেশ
শৈশব তার রাক্ষস আর
যক্ষের বশ হায়
আর যৌবন তার "সিংহের" বশ
সিংহল নাম যায়
....
আজো বঙ্গের বীর "সিংহে"র নাম
অন্তর তার গায়।

'মহাবংশ' ও বিভিন্ন কাব্য কবিতায় বঙ্গের গৌরব কাহিনী প্রচারিত হলেও এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা কতখানি তা নিয়ে সংশয় থাকলেও বিজয় সিংহের সময়কাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। কারণ সেই সিংহলী গ্রন্থ মহাবংশেই জানা যায় যেদিন বিজয় সিংহ লাক্ষাদ্বীপ পদার্পণ করেছিলেন সেই দিনেই কুশী নগরে ভগবান বুদ্ধ মহানির্বান লাভ করেন। তাই বলা যায় এ ঘটনা ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৪ অব্দে। [১৫] আর যার নামে সিংহল নামকরণ, (বিজয়সিংহ > সিংহল) সেই বিজয় সিংহ যে বাঙালি ছিল তার অকাট্য প্রমান হিসাবে বলা যায় সিংহলের রাজারা বাঙালি বিজয় সিংহের বংশধর বলেই পরিচয় দিয়ে থাকে। বিশেষ করে সিংহল রাজা নিঃশঙ্ক মল্ল তার শিলালিপিতেও সেই কথাই লিখেছেন— যা epigraphica ও zeylanica-র ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে তাতেও বলা হয়েছে যে, তারা বিজয়ের বংশধর। [১৬] সেদিক থেকে কবি সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা অযৌক্তিক নয়, তিনি যথার্থই বলেছেন—

"আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।"

এতো গেল রাঢ় বঙ্গের খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চ-ষষ্ঠ শতকের এক প্রাচীন কাহিনী। এর পর এই বঙ্গের দীর্ঘ দিনের কোন ঐতিহাসিক বিবরণ মিলছে না। এই সময় কালে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। খ্রিষ্ট পূর্ব ৩য় অব্দ থেকে খ্রিষ্টীয় ৩য় শতক পর্যন্ত বঙ্গের ইতিহাস সত্যই অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার পরের আর এক ঘটনা এতদ অঞ্চলের ইতিহাসকে কিছুটা স্পর্শ করেছে তাই সে প্রসঙ্গে কিছু বলার প্রয়োজন।

প্রসঙ্গটি হল প্রাচীন গোপভূমের প্রায় সংলগ্ন বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের উপর, বিপর্যস্ত এক গুহার গায়ে তিন ছত্রের এক প্রাচীন লিপি— যাতে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র সহ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই এই গুহা পুষ্করনার রাজা চন্দ্রবর্মা কর্তৃক নিবেদিত হয়েছে তা লেখা আছে। এই লিপি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন— পশ্চিমবঙ্গে এটি সবচেয়ে প্রাচীন দলিল। অক্ষরের ছাঁদ দেখে মনে হয় ৩৫০ থেকে ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল। চন্দ্রবর্মার রাজধানী পুষ্করনা এখন পোখরনা পলাশডাঙ্গা গ্রাম, দামোদরের দক্ষিণ তীরে শুশুনিয়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরে। [১৭]

এখন এই লিপির প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রবর্মাকে নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে নানা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তবে একথা নিশ্চিত যে, খ্রিষ্টীয় ৩য় শতকের শেষে বা চতুর্থ শতকের সূচনাতেই প্রাচীন বাংলা দেশ ধীরে ধীরে কৌম সমাজ ও তদানীন্তন রাষ্ট্র ব্যবস্থা অতিক্রম করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে চলেছিল এবং সংঘবদ্ধ ভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করেছিল।

সেই সময় ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যখন কুষাণ সাম্রাজ্য ছোট ছোট খণ্ডে খণ্ডিত হতে শুরু করেছিল, এবং গুপ্ত রাজারাও যখন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি এমনই সময়ে বঙ্গের জনপদ সমূহের অধিকর্তা হিসাবে 'বঙ্গেষু' অভিধায় মেহেরৌলি লৌহ স্তম্ভের লিপিতে 'চন্দ্র' নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনিই পুষ্করনার অধিপতি চন্দ্রবর্মা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গবেষক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন— এই পুষ্করনাধিপই বোধ হয় সমসাময়িক রাঢ়ের অধিপতি। কেহ কেহ মনে করেন ইনিই এলহাবাদ লিপি কথিত এবং গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত চন্দ্রবর্মা। [১৮]

এই পুষ্করনা অধিপতি চন্দ্রবর্মা সপ্তসিন্ধুর মুখ থেকে গঙ্গার মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত আযাবর্ত জয় করেছিলেন। শুশুনিয়া পাহাড়ে এঁর শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিভিন্ন তথ্য বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছিলেন— "কুতুবমিনারের কাছে যে লৌহস্তম্ভ আছে তার প্রতিষ্ঠাতা এই একই চন্দ্রবর্মা। যাঁর পিতার নাম সিংহবর্মা, ভ্রাতা নরবর্মা এবং ইনি ৪৬১ বিক্রমাব্দে (৪০৪/৫ খ্রিঃ) বর্তমান ছিলেন। [১৯] সেদিক থেকে বলা যায় "রাজাসিংহ বর্মা ও তৎপুত্র চন্দ্রবর্মা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে উল্লিখিত প্রথম দুই রাজা।" [২০] তাই এই অঞ্চল গোপভূম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাককালে বাঁকুড়া সহ সমগ্র রাঢ় বঙ্গ 'বঙ্গেষু' চন্দ্রবর্মার অধীনে শাসিত হয়েছিল।

এর পরের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা যায় চতুর্থ শতকে বঙ্গে কারা রাজত্ব করেছিলেন সে ইতিহাস স্পষ্ট নয়। তবে গুপ্ত রাজাদের শাসন কাল থেকেই বঙ্গে ধীরে ধীরে তাদের আধিপত্য শুরু হতে থাকে। অর্থাৎ গুপ্ত রাজত্ব কালেই (৩০০-৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে) বাংলার ইতিহাসের পাতা খুলতে শুরু হয়ে যায়। তবে একটানা তাদের আধিপত্য বঙ্গে

প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মাঝে মধ্যেই স্থানীয় রাজাদের আধিপত্যে তাদের প্রভাব ক্ষুন্ন হত।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শুরুর সময় কালেই রাঢ়-বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে গোপেদের আবির্ভাব শুরু হয়ে যাওয়ায় সেই পশ্চিম রাঢ় ধীরে ধীরে গোপ প্রাধান্য হেতু গোপভূম নামে পরিচিত হতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে রাঢ় বঙ্গেও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে থাকায় তাদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় ভাবে রাজপদেও ব্রতী হতে থাকে।

উত্থানের পর পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তেমনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনকালে তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বঙ্গে গোপ জাতি প্রবল হয়ে ওঠে এবং রাজপদেও আসীন হয়। সময়টা খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমদিকে। তাই বলা যায় "গুপ্ত যুগের শেষ দিকে গোপ বংশের রাজারা রাঢ়ের এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন।" (২১) তারই প্রমাণ পাওয়া যায় ফরিদপুর জেলার কোটালি পাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত পাঁচটি এবং বর্ধমান জেলার গলসী থানার মল্লসারুল গ্রামের জারুলে পুকুরের পঙ্কোদ্ধার কালে প্রাপ্ত ১টি তাম্রলিপি, মোট ছয়টি পট্টোলীতে তিনটি মহারাজাধিরাজের খবর পাওয়া যাইতেছে: গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচার দেব। ইহাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কি সম্পর্ক তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, তবে ইহারা তিনজনে মিলিয়া অন্যূন ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই রাজত্বের কাল মোটামুটি ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে তৃতীয় পাদ পর্যন্ত। লিপি প্রমাণ হইতে মনে হয়, গোপচন্দ্রই ইহাদের প্রথমতম এবং প্রধানতম, এবং ইহাদের রাজ্য বর্ধমান অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" (২২) অন্যদিকে গোপচন্দ্রের জয়রামপুর তাম্র শাসন উড়িষ্যা পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য সীমা সমর্থন করে। .... গোপচন্দ্র রাজা হন ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় দশকে। এঁর পিতার নাম ধর্মচন্দ্র, মাতার নাম গিরিদেবী। ইনি নিজের বাহুবলে রাজত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি যে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তা তার সম্রাট পদবী গ্রহণ করা থেকে বোঝা যায়। (২৩) মোট কথা "বর্ধমান সহ সমস্ত রাঢ় অঞ্চল গোপচন্দ্রের অধীনস্থ ছিল।" (২৪)

সেই গোপচন্দ্রের সময়েই বঙ্গের এক বিজয় সেন যিনি একদা মহারাজ বৈন্য গুপ্তের সামন্ত ছিলেন, তিনিও পরে এই গোপচন্দ্রের সামন্তে পরিণত হয়েছিলেন। এহেন পরাক্রান্ত গোপ রাজার সঙ্গে গোপভূমের আত্মিক সম্পর্ক নিশ্চয়ই ছিল, তাতে করে গোপভূম অতি অবশ্যই গোপচন্দ্রের সময় কালেও (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের ২য় পাদ) বর্তমান ছিল সেটাই ধরে নেওয়া সঙ্গত। তাই বলা যায় গোপভূমের বয়স কম করেও পনেরোশ বছরের মত প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য গবেষকরাও সহমত পোষণ করেছেন। যেমন 'বর্ধমান পরিক্রমা' গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীসুধীর কুমার দাঁ মহাশয় পরিষ্কার করে তার গ্রন্থে বলেছেন, ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোপচন্দ্র বর্ধমানের গোপভূমিতে রাজত্ব করতেন। গোপচন্দ্রের নাম অনুসারেই আউশ গ্রাম কাঁকসা অঞ্চল

সেকালে গোপভূমি নামে খ্যাত হয়। [২৫] দাঁ মহাশয়ের মতামতকে গুরুত্ব দিলে বলতেই হয় খ্রিষ্ট্রীয় ষষ্ঠ শতকেও এই অঞ্চল গোপভূম নামে স্বীকৃত ছিল। তিনি আরও বলেছেন— ষষ্ঠ শতকে, গোপচন্দ্র থেকে একাদশ শতকের ইছাই ঘোষ পর্যন্ত গোপভূমিতে গোয়ালাদের রাজত্ব চলছিল। প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে গোপ শক্তি ক্ষাত্রবীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছিলেন। [২৬]

আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেও যে অজয়-দামোদর বেষ্টিত এই এলাকা 'গোপভূম' নামে পরিচিত ছিল তা আজ ঐতিহাসিক সত্যে প্রমাণিত। তারও আগে গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরস্থ বঙ্গভূমি 'রাঢ়' নামে অভিহিত হত। পরে তা আবার উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই প্রাচীন দিনেও অজয় নদীর উত্তর অংশ ছিল 'উত্তর রাঢ়' আর অজয়ের দক্ষিণ অংশ ছিল 'দক্ষিণ রাঢ়'। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাই বলেছেন মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর-রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তর সীমা। [২৭] সেই দক্ষিণ রাঢ়ও একসময় সুহ্ম নামেও অভিহিত হত। সুহ্মদেশ বলতে মুখ্যত দক্ষিণ রাঢ়ের অজয় দামোদর পরিবেষ্টিত অঞ্চলকেই বোঝাত। তাই ডঃ সুকুমার সেন পরিষ্কার করেই বলেছেন— সুহ্ম মোটামুটি আধুনিক বর্ধমান ডিভিসনের পুরানো নাম। [২৮] সেদিক থেকে প্রাচীন কালের সুহ্ম, পরে দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্ত সীমাই যে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে 'গোপভূম' বা 'গোপভূমি' নামে পরিচিত হয়েছিল তা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছে।

সেই সময় কাল থেকেই এই অঞ্চলে গোপ সম্প্রদায়ের পুরুষানুক্রমিক প্রতিপত্তি ছিল। "বন্য যাযাবরের স্তর থেকে তাঁরা এই অঞ্চলের সভ্যতাকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে উন্নীত করেছিলেন। দলপতি, গোষ্ঠীপতি ও কৌমপতি থেকে তাঁদের মধ্যে অনেকে পরে 'রাজা'ও হয়েছিলেন।" [২৯] গোপভূমের প্রাচীন কালের তেমনি এক রাজা হিসাবে আমরা গোপচন্দ্রের উল্লেখ পাই। তার সম্পর্কে আলোচনা হল। যদিও গোপভূমের গোপ রাজা হিসাবে তাকে মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি থাকলেও আধুনিক কালের বহু ঐতিহাসিকই তাকে রাঢ় বঙ্গের গোপ রাজা বলে মেনে নিয়েছেন। তবে কোন সময়ে কিভাবে এই স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের অবসান হয় তা বলা যায় না। খুব সম্ভব স্বাধীন গৌড় রাজ্যের অভ্যুদয়ই এর পতনের প্রধান কারণ। [৩০]

আমরা জানি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' নামে পরিচিত গুপ্ত উপাধিধারী রাজারা উত্তর-বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের কতকাংশ নিয়ে গৌড়বঙ্গে বেশকিছু সময় রাজত্ব করেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় 'গৌড়' শব্দটি জাতিবাচক কারণ তৎকালীন বিহারে গোপজাতির পদবী ছিল গৌড়। বঙ্গের গৌড় রাজ্যে তাদের কোন প্রভাব ছিল কিনা কে বলতে পারে! সে যাই হোক সেই গুপ্তদের সময়েই গৌড় এক বিশেষ

জনপদে উন্নীত হয়েছিল। তার অনেক পরে শশাঙ্কই বাঙালি রাজগণের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি ছিলেন। রোহিতাশ্বের গিরিগাত্রে তাকে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক" বলে অভিহিত করা হয়েছে। (৩১) তিনি বিশাল বিস্তৃত রাজ্য সীমা নিয়ে রাজত্ব করেছিলেন। তার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ন। যা হিউএন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তের বিভিন্ন সংকলনে প্রমাণিত হয় যে মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর তীরবর্তী রাঙামাটি-অঞ্চলই প্রাচীন কর্নসুবর্ন। (৩২)

শশাঙ্কের পরেই বঙ্গে নেমে আসে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। সেই সময় কোন শক্তিশালী রাজশক্তির অভাবে দেশে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা স্ব স্ব প্রধান হয়ে দুর্বলের উপর অত্যাচার শুরু করে। সেই অবস্থাকেই বলা হত মাৎস্যন্যায় যুগ। তাই সেই অরাজকতার হাত থেকে উদ্ধার মানসে দেশের নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত ভাবে গোপাল নামে জনৈক প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় রাজাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলার সিংহাসনে বসান (আ. ৭৫০ খৃ) এই ভাবেই খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে বাংলার পাল বংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তারা প্রায় ৩০০ বছর রাজত্ব করেন।

এই পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের বংশ পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও রামচরিত কাব্যের সপ্তদশ শ্লোকের টীকায় তাকে ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রকূট ও কলচুরি বংশীয় রাজগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও পালগণের ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম সমর্থন করে। (৩৩) এ প্রসঙ্গে বলা যায় রাষ্ট্রকূট রাজগণের তাম্রশাসন সমূহে তাহারা আপনাদিগকে 'যদু বংশ' জাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। The Rashtrakuats are represented to have belonged to the race of Yadav. (৩৪) আর যদু বা যাদব ক্ষত্রিয়রা তো গোপবংশীয়। সেদিকে পালেদের গোপবংশ সম্ভূত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। প্রখ্যাত গবেষক মানিক সিংহ্ বলেছেন পাল পদবীটির ব্যবহার যে রাঢ়ীয় পহ্ণব গোপেদের মধ্যে সর্বপ্রথম হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। (৩৫)

প্রায় ৩০০ বছর বঙ্গদেশ পাল শাসনে ছিল। পরে তাদেরও পতনের সময় হয়ে এলে পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাঢ় বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বহু সামন্ত রাজারাও স্থানীয় ভাবে প্রধান হয়ে ওঠে। এমনই এক সময়কালে রাঢ়-বঙ্গের গোপভূমে আর এক সামন্ত গোপ রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি রাঢ় বঙ্গের অধিপতি হিসাবেই 'রাঢ়াধিপ' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে এবং একাদশ-দ্বাদশ শতকে উৎকীর্ণ ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনেও রাঢ়া-ধিপের উল্লেখ রয়েছে। এখন সেই রাঢ়াধিপের রাজধানী প্রসঙ্গে আসা যাক পরে রাঢ়াধিপের প্রসঙ্গে আসা যাবে।

রাঢ়-বঙ্গের মধ্যবর্তী অজয়-দামোদর নদীদ্বয়ের বেষ্টনে বেষ্টিত আউশগ্রাম থেকে আসানসোল পর্যন্ত বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান তখন গোপভূম নামে পরিচিত ছিল। সেই

গোপভূমেই বর্তমান দুর্গাপুরের উত্তর-পূর্বে দুর্গাপুর মুচিপাড়া-শিবপুর রাস্তার ধারে রাঢ়াধিপের রাজধানী ছিল 'রাঢ়াপুরী'— যা বর্তমানে আঢ়া বা আড়া নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে 'দুর্গাপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা স্বর্গত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— "আঢ়া বা আড়রা নামে গ্রামখানি এই রাঢ়াপুরীর স্মৃতি বহন করছে।" (৩৬)

সেই রাঢ়াপুরী বা আড়াতেই রাঢ়াধিপ আপন কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ রাঢ়ের অধিশ্বর রাঢ়েশ্বর নামে শিবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকই, বিশেষ করে সাহিত্য রত্ন ডঃ হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা এই আড়াকেই রাঢ়াধিপের রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রাম সমীক্ষাতেও দেখা গেছে বহু পুরাকীর্তির চিহ্ন বুকে নিয়ে পড়ে থাকা এবং গড় বেষ্টিত এই গ্রাম, প্রাচীন কোন, রাজধানীর স্মৃতি যে বহন করছে তা বেশ বোঝা যায়- কারণ এই গ্রামের পশ্চিম অংশ এখনও গড় দুয়ার এবং পূর্ব অংশ বাজীগড় নামে খ্যাত।

রাঢ়াধিপ প্রসঙ্গে ইতিহাস দু'জন রাঢ়াধিপের উল্লেখ করেছে। প্রথম জন প্রথম মহীপালদেব যাকে রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ লিপিতে উত্তর রাঢ়ের অধিপতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ২য় রাঢ়াধিপ হলেন ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। এখন প্রকৃত 'রাঢ়াধিপ কে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। তাকে ঘিরে ঐতিহাসিক মহলে নানা মতভেদ বর্তমান। তবুও আলোচনার প্রেক্ষিতে একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা যাক।

কলাকৃষ্টির ঐতিহ্যমণ্ডিত খাজুরাহের সদাশিব মন্দিরের গায়ে বঙ্গের এক শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে— তাতে জানা যায় যে, তিনি যুদ্ধে রাঢ়াধীপতিকে পরাস্ত করে তাঁর রানীকে বন্দিনী করে নিয়ে যান। (৩৭) এখন এই রাঢ়াধীপ সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা নগেন্দ্র নাথ বসু এই রাঢ়াধীপতি বলতে গৌড়াধীপতি প্রথম বিগ্রহ পালের উল্লেখ করেছেন, যিনি রাঢ়ের যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় বরণ করে সস্ত্রীক চন্দেল রাজের কারাগারে বাস করেছিলেন। (৩৮) কিন্তু ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তা মনে করেন না। তার মতে মহীপাল দেবের রাজত্ব কালেই ধঙ্গ রাঢ়রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। সে দিক থেকে ধঙ্গ কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত ব্যক্তি কোন ক্রমেই প্রথম বিগ্রহ পাল হতে পারে না। তাছাড়াও সময়ের হিসাবেও তাদের ফেলা যায় না, কারণ প্রথম বিগ্রহ পালের রাজত্ব কাল ৮৫৮-৬০ খ্রিঃ আর মহীপাল দেবের রাজত্ব কাল ৯৭৫-১০২৫ খ্রিঃ। আর ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে ধঙ্গ খ্রিষ্টীয়১০০২ অব্দে অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই অঙ্গদেশ ও রাঢ় জয় করেন। (৩৯) সে দিক থেকে মহীপালদেবের সময়কালেই ধঙ্গের আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল তা ধরে নেওয়াই সঙ্গত।

কিন্তু সেখানেও গণ্ডগোল। কারণ প্রথম মহীপাল দেবের বানগড় তাম্রলিপিতে

জানা যায় যে, তিনি তার রাজত্বের নবম বর্ষের [৪০] মধ্যেই সকল শত্রুকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই ধঙ্গ কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তি কোন ক্রমেই মহীপাল দেব নন। তা হলে সমস্যা তো থেকেই যায়— ধঙ্গ কর্তৃক পরাজিত রাঢ়াধিপ ব্যক্তিটি তবে কে? সেখানে ঐতিহাসিক পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ প্রপিতা মহকেই ঐতিহাসিকরা রাঢ়াধিপ হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গবেষক প্রয়াত ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

তিনি দীর্ঘ দিন ধরে আড়া, বামুন নাড়া, গৌরাঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে এখানের পুরাবস্তুগুলির নিদর্শনাদি সংগ্রহ এবং কিংবদন্তিগুলি অনুশীলন করে দেখেছেন এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে মতামত দিয়ে বলেছেন— "ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রাঢ়াপুরীর অধিশ্বর ছিলেন এবং এই জন্যই তিনি রাঢ়াধিপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।[৪১] এই মত দুর্গাপুরের ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা প্রখ্যাত গবেষক প্রয়াত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ও অনুমোদন করেছেন।[৪২]

এই প্রসঙ্গেই সাহিত্যরত্ন ডঃ হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আরও বলেছেন— ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহীপালকে বিশেষ রূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাই তিনি সম্মানিত 'রাঢ়াধিপ' পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বীরত্বাভিমানীও ছিলেন।[৪৩] ফলে কারও সাহায্যের প্রত্যাশা না করেই আপন শক্তিতেই ধঙ্গকে বাধা দিয়েছিলেন, কিংবা বৃদ্ধ বয়সে অতর্কিত আক্রমণে পরাস্ত হয়েছিলেন।

সেইহেতু ঈশ্বর ঘোষের রায়গঞ্জে আবিষ্কৃত তাম্র শাসনে তার বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে পূর্বপুরুষদের নামের উল্লেখ থাকলেও বংশের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত পদবীতে ভূষিত ব্যক্তির নাম না করেই অতীত পরাজয় কাহিনীর নায়ককে আড়াল করার উদ্দেশ্যেই "উপাধি উল্লেখ যার নাম পরিচয়" অর্থাৎ উপাধির মাধ্যমেই (রাঢ়াধিপ) তার পরিচয় ব্যক্ত করেছেন।

রাঢ়বঙ্গের প্রাচীন গোপভূমে এই রাঢ়াধিপ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গেই রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন তাই তিনি কেবল একজন দক্ষ শাসকই ছিলেন না— তিনি তার রাজ্যে বিভিন্ন পুরাকীর্তির প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। প্রমাণ হিসাবে তখনকার রাঢ়াপুরী বা আড়ায় তারই তৈরি রাঢ়েশ্বর শিব মন্দিরের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মন্দিরটি আগাগোড়া স্থানীয় বেলে ও মাকড়া বা ঝামা পাথর দিয়ে উড়িষ্যার রেখ দেউল স্থাপত্য রীতিতে তৈরি। এর অভ্যন্তরে আনুমানিক এক কূপের উপর স্বল্প পরিসরে বিরাট আকারের পিনাক সহ গ্রানাইট পাথরের শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। বারে বারে সংস্কারের ফলে বর্তমানে তার আকারের অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

এই 'রাঢ়াধিপ' ধঙ্গ কর্তৃক পরাজিত হওয়ার পরে তার বংশধরেরা তাদের রাজধানী

রাঢ়াপুরী বা আড়া থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, ফলে রাঢ়াপুরীর উন্নতি তখন থেকেই ব্যাহত হতে থাকে। তাছাড়া খুব সম্ভব ধঙ্গের আক্রমণে রাজধানী রাঢ়াপুরীর ব্যাপক ক্ষতিও সাধিত হয়েছিল। ফলে তার বংশধরেরা হয়ত এখান থেকে সরে গিয়ে এই গোপভূমের অজয় তীরবর্তী ঢেক্করী বা ঢেকুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

ঢেকুর নামকরণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের অভিমত হল যে, একদা অজয়ের উভয় তীরে এই এলাকায় লোহার অস্ত্র শস্ত্র নির্মাতা কর্মকার গোত্রীয় ঢেকারু নামে এক জাতির আধিক্য ছিল। তাদের জন্যই এই এলাকা ঢেকারু > ঢেকুর নামে নামিত হয়েছিল। বর্তমানে তাদের অস্তিত্ব প্রায় নাই তবে অজয়ের উত্তরে কর্মকার সম্প্রদায়ের লোকেরা লোহার পরিবর্তে পিতলের দ্রব্যাদি নির্মাণে রত রয়েছে— জয়দেব কেন্দুবিল্বের নিকট টিকরবেতা এমনই একটি গ্রাম।

সে যাই হোক ঢেকুর এলাকায় ঘোষ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ঈশ্বর ঘোষ তাঁর রাজধানীকে গড় বেষ্টনে সুদৃঢ় করায় তা ঢেকুর গড় নামে পরিচিত হয়। এই ঢেকুর গড় আবার শ্যামা রূপার গড় নামেও পরিচিত ছিল। কিন্তু কেন? সেখানে বলা যায়— রাঢ় বঙ্গের কিছু অংশ একদা সুহ্ম নামে অভিহিত হত এবং সুহ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন সুহ্মারূপা। কালে কালে সুহ্মারূপাই শ্যামারূপা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তদনুসারে এই গড় শ্যামারূপার গড় নামে আখ্যা পেয়েছে। (৪৪) এই শ্যামারূপার গড়েই রাঢ়াধিপের পরবর্তী বংশধরেরা রাজত্ব করেছিলেন। এবার এই রাঢ়াধিপের রাজত্বকালের কথায় আসা যাক।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গবেষক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার তাঁর 'পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত' গ্রন্থের "অভিলেখ ও পাণ্ডুলিপিতে রাজার উল্লেখ" শীর্ষক অধ্যায়ে ঢেক্করীর ঘোষ বংশজাত ঐতিহাসিক পুরুষ ঈশ্বর ঘোষের এক তাম্রশাসনের উল্লেখ করেছেন। (৪৫) যেটি দিনাজপুরের অন্তর্গত রামগঞ্জে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার তার লিপি পাঠ করেছেন। (৪৬) তাতে জানা যায় ঈশ্বর ঘোষ আঃ ১০৪০-১০৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন এবং সে তার রাজত্বের ৩৫ বছরে ঐ তাম্র শাসনটি উৎকীর্ণ করেছিলেন। ঐ লিপিতে তিনি তাঁর বংশের পর্যায়ক্রমে পূর্ব পুরুষদের নাম উল্লেখ করেছেন। তারই প্রেক্ষিতে জানা যায় রাঢ়াধিপ ছিলেন ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ প্রপিতামহ-অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর ঘোষের চার পুরুষ আগের ব্যক্তি। বিধিসম্মত ভাবে যদি প্রতি পুরুষে ২৫ বছর সময় কাল ধরা হয়, তবে রাঢ়াধিপের রাজত্বকাল ঈশ্বর ঘোষের রাজত্বকাল থেকে কমবেশি (২৫×৪)=১০০ বছরের অগ্রবর্তী হওয়াই স্বাভাবিক। সেদিক থেকে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়— গোপভূমের গোপ রাজা রাঢ়াধিপ খ্রিষ্টীয় দশম শতকে রাজত্ব করেছিলেন এবং সে সময়ে গোপভূমের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। তাই বলা যায় গোপভূমের প্রাচীনত্ব কম করেও এক হাজার বছরের অধিক প্রাচীন তো বটেই তাতে কোন সন্দেহ নাই।

গোপভূমের প্রাচীনত্বের বিষয়ে আরও বলা যায় যে, ঈশ্বর ঘোষ ও তার পূর্বপুরুষেরা সকলেই ছিলেন পাল বংশীয় রাজাদের সামন্ত রাজা। জাগতিক নিয়মে পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে তাদের কেউ কেউ স্বাধীন বা সার্বভৌম রাজা হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এখন বাংলা ভাষায় রচিত অখণ্ড বঙ্গভূমির প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে যা উল্লেখ করেছেন— তা এ প্রসঙ্গে খুবই প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন— পালরাজগণের অধীনে রাজাদিগকে ভৌমিক রাজা বলিত। তাহাদিগের অধিকৃত স্থানের নাম 'ভূম' ছিল। বাঙ্গলায় ভূম শব্দান্ত নিম্নলিখিত স্থানের নাম পাওয়া যায়— ১। মল্লভূমি, ২। বীরভূম, ৩। সেনভূম, ৪। গোপভূম, ৫। শিখরভূম, ৬। ধলভূম, ৭। বরাহভূম, ৮। সিংভূম, ৯। বরদাভূম, ১০। ব্রাহ্মণভূম, ১১। বঙ্গভূমি। সম্ভবত এই সকল ভূখণ্ডে পাল রাজবংশীয় রাজগণের অধীনতায় প্রাদেশিক শাসন কর্তা ছিলেন। (৪৭)

এখন ইতিহসের নিরিখে দেখা যায় পাল রাজ বংশ বঙ্গে খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সেদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় পাল রাজাদের শুরুর সময় কাল থেকেই যদি তাদের সামন্ত রাজাদের ভৌমিক-রাজা বা তাদের রাজ্যকে ভূম বলা হয়ে থাকে তবে গোপভূমের অস্তিত্ব যে কমকরেও বারোশ বছরের প্রাচীন তা মেনে নিতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় আলোচ্য গোপভূমের ভৌগোলিক অবস্থান প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান থাকলেও গোপভূম হিসাবে এর পরিচিতি সেও খুব কম দিনের নয়। দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষিতে যা প্রতীয়মান হয়; তাতে বেশ বোঝা যায় যে, এই এলাকা গোপভূম হিসাবে কম করেও ১২০০ থেকে ১৫০০ বছরের প্রাচীন। গোপ অধ্যুষিত এই এলাকা সেই প্রাচীন কাল থেকেই গোপশক্তির শৌর্য-বীর্যে দীর্ঘদিন ধরে আপ্লুত হয়ে তা যথার্থ ভাবেই 'গোপভূম' হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

।। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও পত্র পত্রিকা ।।

১) ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম খন্ড) হরফ প্রকাশনী।.... পৃঃ-৫৮৯
২) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য় খন্ড) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-২
৩) ঐ.... পৃঃ-৮
৪) ঐ.... পৃঃ-৮
৫) ঐ.... পৃঃ-৯
৬) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-৮

৭) বঙ্গদর্শন (১২৮৭, অগ্রহায়ণ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৮) বিশ্বকোষ (৬ষ্ঠ খন্ড) স্বাক্ষরতা প্রকাশন।.... পৃঃ-১৬৪
৯) কর্ণসুবর্ণ মহানগরী — সুধীররঞ্জন দাস।.... পৃঃ-১১৩
১০) বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খন্ড) — রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।.... পৃঃ-১৪
১১) ঐ.... পৃঃ-১৭
১২) বাংলার লোক সংস্কৃতি — আশুতোষ ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-৩
১৩) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-৩৬
১৪) বর্ধমান পরিচিতি — অনুকুলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী।.... পৃঃ-১৭
১৫) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য়) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১১
সমর্থনে— History of Bengal. Vol. R. C. Mazumdar. Page-39
১৬) বৃহৎ বঙ্গ (১ম খন্ড) দীনেশ চন্দ্র সেন।.... পৃঃ-৬৩
১৭) বর্ধমানের ইতিহাস/যৎকিঞ্চিৎ — ডঃ সুকুমার সেন।
বর্ধমান সমগ্র (১ম) সম্পাদনা — ডঃ গোপীকান্ত কোঙার। ....পৃঃ-৭
১৮) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-৩৬০
১৯) গবেষণা প্রতিবেদন — বর্ধমান চর্চা (পরিমার্জিত ও
পরিবর্ধিত সংস্করণ).... পৃঃ-XII
২০) বর্ধমানের ইতিহাস/যৎকিঞ্চিৎ। ডঃ সুকুমার সেন।
গৃহীত হয়েছে বর্ধমান সমগ্র (১ম) সম্পাদনা — ডঃ গোপীকান্ত কোঙার।.... পৃঃ-৭
২১) গবেষণা প্রতিবেদন — বর্ধমান চর্চা। (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ).... পৃঃ-XII
২২) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-৩৬৫
২৩) গবেষণা প্রতিবেদন — বর্ধমান চর্চা (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ).... পৃঃ-XIII
২৪) পালযুগের বংশানুচরিত — দীনেশ চন্দ্র সরকার।.... পৃঃ-১০৮
২৫) বর্ধমান পরিক্রমা — সুধীর চন্দ্র দাঁ।.... পৃঃ-৪৮
২৬) ঐ.... পৃঃ-৫৭
২৭) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-১১৯
২৮) বর্ধমানের ইতিহাস/যৎকিঞ্চিৎ — ডঃ সুকুমার সেন।
(বর্ধমান সমগ্র ১ম).... পৃঃ-৫
২৯) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি — বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-১৯৩
৩০) বাংলাদেশের ইতিহাস — ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।.... পৃঃ-৩৩
৩১) ঐ.... পৃঃ-৩৫
৩২) কর্ণসুবর্ণ মহানগরী — সুধীর রঞ্জন দাস।.... পৃঃ-৬৭
৩৩) বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম) — ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।.... পৃঃ-৫৪
৩৪) Bhandarkar's Early History of Dekkan (2nd Ed.).... Page-62
৩৫) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য়) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৬
৩৬) দুর্গাপুরের ইতিহাস — প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৩৯

৩৭) Epigraphic India (1st Part) ... Page-145
৩৮) বঙ্গীয় জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কান্ড) নগেন্দ্রনাথ বসু।.. পৃঃ-১৭২
৩৯) গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি — হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২৯
৪০) পাল সেন যুগের বংশানুচরিত — ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার।.... পৃঃ-১৫
৪১) গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি — হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।. .. পৃঃ-৩২
৪২) দুর্গাপুরের ইতিহাস — প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। .. পৃঃ-৩৬
৪৩) গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি — হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৩২
৪৪) শ্যামারূপার গড় — অজিত ভট্টাচার্য। সংকলিত —
বর্ধমান সমগ্র (১ম) সম্পাদনা — ডঃ গোপীকান্ত কোঙার।.... পৃঃ-২২০
৪৫) পাল সেন যুগের বংশানুচবিত — ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার।.... পৃঃ-৩১
৪৬) Inscription of Bengal, Vol.III, N. Majumder. ... Page-57
৪৭) গৌড়ের ইতিহাস (অখন্ড) রজনীকান্ত চক্রবর্তী।
সম্পাদনা — ডঃ মলয় শংকর ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-৯১-৯২

।। গোপভূমের ভূমিবিন্যাস, প্রকৃতি ও জলবায়ু ।।

ভূপ্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশ ঃ— কোন একটি দেশকে বা অঞ্চলকে সম্যকভাবে জানতে গেলে সর্বাগ্রে তার ভূপ্রকৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ ও সেখানকার জলবায়ুকে জানার প্রয়োজন। ভৌগোলিক পরিবেশই দেশের জনজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকে সর্বতোভাবে প্রভাবিত করে থাকে। কাজেই দেশের সামগ্রিক ইতিহাস জানার জন্য সেখানকার ভূপ্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশ জানার প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে, "History cannot be meaningful without a knowledge of Geography."

এখন কোন দেশের ইতিহাস বলতে কেবলমাত্র সেখানকার রাজবংশের বংশতালিকাই আসল নয়, জানতে হবে সেখানকার মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। তার জন্যই অতি অবশ্যভাবেই প্রয়োজন হয় সেখানকার ভূপ্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশকে জানার। ভৌগোলিক পরিবেশই মানুষের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়— বন্ধুর পাহাড়ি পরিবেশ— ধূ-ধূ বালি ঘেরা মরুময় প্রকৃতি মানুষকে করে তোলে স্বভাব রুক্ষ, অন্যদিকে গহন অরণ্য ঘেরা পরিবেশ মানুষকে করে তোলে দুর্ধর্ষ ও সাহসী, আবার নদী-মাতৃক সরস প্রকৃতি মানুষকে কৃষি ও বাণিজ্য নির্ভর করে তোলে। তাই মানুষের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিশেষ প্রভাব অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে দার্শনিক বডিনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন মানুষ যে অঞ্চলে বসবাস করে তার সভ্যতার ইতিহাস সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সেদিক থেকে আমাদের আলোচ্য গোপভূমের ইতিহাসকে সম্যকভাবে জানার জন্য তার ভূপ্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশকে জানতে হবে।

গোপভূমের অবস্থান সম্পর্কে সম্যকভাবে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তবুও এর ভৌগোলিক সীমা মুখ্যত বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে ঘিরেই বিস্তৃত। এই এলাকার পশ্চিমাংশই আসলে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পরিসমাপ্ত এলাকা। এখানেই পাহাড়ি পরিবেশ শেষ হয়ে সমতলের শুভ সূচনা সূচিত হয়েছে। তাই এই অঞ্চল আর্য সভ্যতা ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী সভ্যতার প্রথম সংঘাত ক্ষেত্রও বটে। পরে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিলন মিশ্রণে— ভাবে আদানপ্রদানে গড়ে

উঠেছে এক বিচিত্র সংস্কৃতি। সেইহেতু পশ্চিম বর্ধমান বা গোপভূমের সংস্কৃতি এক মিশ্র সংস্কৃতির দ্যোতক।

গোপভূমের তিনদিকে তিনটি উল্লেখ্য নদী— যেমন উত্তরে অজয়, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে বরাকর এর আবেষ্টনে আবেষ্টিত অরণ্য ঘেরা বিস্তৃত অঞ্চলই গোপভূম। এই অঞ্চলের এক অংশ অন্য অংশ থেকে এত বিপুল বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ যা সচরাচর অন্যত্র দেখা যায় না। এখানের পশ্চিমাংশ পাহাড়ি অঞ্চল। এখানে রয়েছে ছোটনাগপুর পাহাড়ের বর্দ্ধিত কিছু পাহাড়— যেমন কল্যাণেশ্বরী পাহাড়, হালদা পাহাড়, মাইথন পাহাড় ইত্যাদি। তারপরেই শুরু হয়েছে অরণ্যাবৃত উঁচু নীচু টিলা এবং সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ল্যাটেরাইট— লাল মৃত্তিকা— যার অভ্যন্তরে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত রয়েছে কালোমানিক কয়লা ও কঠিন ধাতু লোহা। তার পরে বিভিন্ন নদী গঠিত প্রশস্ত উপত্যকা অঞ্চল। তার পরে প্রায় সমতল অরণ্যাঞ্চল। ফলে একই এলাকার মধ্যে ভূপ্রকৃতির বিস্তারে বৈপরীত্য সহজেই চোখে পড়ে।

ভূপ্রকৃতিগত বিভাগ ঃ— এখন সমগ্র গোপভূমকে তার প্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (ক) পশ্চিমে অবক্ষয়িত মালভূমির তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি, (খ) প্রাচীন পলিগঠিত ল্যাটেরাইট উচ্চভূমি, (গ) প্রশস্ত উপত্যকা ও অরণ্যভূমি, (ঘ) তরঙ্গায়িত পাললিক ল্যাটেরাইটে সৃষ্ট বনভূমি, (ঙ) পলিগঠিত প্রায় সমভূমি।

(ক) পশ্চিমে অবক্ষয়িত মালভূমির তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি — এই এলাকাই প্রাচীন গোপভূমের পশ্চিম এলাকা। এটিই পাহাড়ি এলাকা নামেই খ্যাত। কারণ ভারতবর্ষের প্রাচীন পর্বতশ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পর্বত হ'ল বিন্ধ্য পর্বত। তারই সমসাময়িক পর্বত গোষ্ঠীর পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত রূপই হল এখানকার পর্বতগুলি। তাই এগুলিও প্রাচীন শিলা দ্বারা গঠিত। যদিও ঐ পর্বতগুলির উচ্চতা ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে তা টিলার আকার নিয়েছে। তাই এখানকার পর্বতগুলির উচ্চতা কোনটিই ৬০০ মিটার এর অধিক নয়। এই পর্বতগুলিকেই হালদা পাহাড় বলা হয়— যার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণেশ্বরী, মাইথন ইত্যাদি পাহাড়। এই এলাকা পূর্বাংশে ঢালু।

এদের বুক চিরে বের হয়েছে বহু পাহাড়ি নদী। তাদের কথায় পরে আসা যাবে। সেই সকল পাহাড়ি নদীর ক্ষয়কার্যের দ্বারাই এই পাহাড়ি অঞ্চল আজ তরঙ্গায়িত উচ্চভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই অংশটিই ভারতের "খনিজ ভাণ্ডার" নামে পরিচিত। ছোটনাগপুর মালভূমির পরিবর্তিত অংশ হওয়ায় এখানেও মাটির নীচে সঞ্চিত রয়েছে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ। সেকথাও পরে আলোচিত হবে। পাহাড়ি অঞ্চল তথা উচু নীচু

টিলায় এই এলাকা পরিপূর্ণ হওয়ায় এখানকার উপরিভাগ বেশ রুক্ষ প্রকৃতির। মোটামুটিভাবে বলা যায় কল্যাণেশ্বরী, চিত্তরঞ্জন, সালানপুর, কুলটি, হীরাপুর, নিয়ামৎপুর, আসানসোল ইত্যাদি অঞ্চল পাহাড়ি এলাকার অধীন এবং এখানকার মৃত্তিকাও বেশ রুক্ষ প্রকৃতির। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এই পাহাড়ি এলাকার উচ্চতা মোটামুটি ৮৫ থেকে ২৩০ মিঃ এর মধ্যে। কয়েকটি পাহাড় ও টিলা ছাড়া এই অঞ্চলের মধ্যে আসানসোল মহকুমার উচ্চতাই একটু বেশি।

(খ) প্রাচীন পলিগঠিত ল্যাটেরাইট উচ্চভূমি ঃ— গোপভূমের পশ্চিমাংশে তরঙ্গায়িত উচ্চভূমির পাদদেশ থেকে শুরু করে অর্থাৎ আসানসোল মহকুমার পূর্বাংশ থেকে শুরু করে আউশগ্রাম থানা এলাকা পর্যন্ত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চল অবস্থিত। এই ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা বলতে বোঝায় প্রাচীন পলিগঠিত কাঁকুড়ে মাটি যা সাধারণত পশ্চিমদিকের মালভূমি অঞ্চল থেকেই বিভিন্ন নদীবাহিত হয়ে এখানে সঞ্চিত হয়েছে। একেই সাঁওতাল পরিভাষায় 'রাঢ়ো' বলা হয়— যার অর্থ 'রাঙামাটি'। এই এলাকা তাই রাঙামাটির দেশ নামেও খ্যাত। আসলে এটি প্রাচীন পলিগঠিত ভূভাগ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৫০-১০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত এবং এ এলাকাও পূর্বাংশে ঢালু।

পণ্ডিতগণের অনুমান চতুর্থ তুষার যুগের শেষে (১০ হাজার বছর পূর্বে) মধ্যভারত ও সাঁওতাল পরগনা হতে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবত সেই সময়েই দামোদর ও অজয় নদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের দ্বারাই বাহিত হয়ে সেই পলি এই অঞ্চলে সঞ্চিত হয়েছিল। পরে তা সূর্যের তাপে, বৃষ্টি, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্থানভেদে ও অবস্থাভেদে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সৃষ্টি করেছে। এইভাবেই একদা পশ্চিমের পাহাড়ি অঞ্চলের পাদদেশে থেকে শুরু করে আউশগ্রাম এলাকা পর্যন্ত লাল ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার ব্যাপকতা এখানকার অজয়-দামোদর উপত্যকাতেই লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশক্ষেত্রেই এই মাটি বালি মিশ্রিত ও এর রং লাল।[১] এই কাঁকুড়ে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা তেমন উর্বর নয়।

এই এলাকা বর্তমানে কৃষিকাজে কিছুটা উন্নত হলেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই ঘন অরণ্যে আবৃত ছিল। তাই এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ছিল অরণ্যচারী যাযাবর, পরে পরে তারা পশুপালন জীবিকায় অভ্যস্ত হয়ে এখানেই স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে ছিল। তাদের পালিত পশুসমূহের মধ্যে গরুর সংখ্যাই বেশি থাকায় তাদেরকে গোপালকও বলা হত। গোপালক থেকেই তারা 'গোপ' নামেও অভিহিত হয়েছিল এবং তারাই এখানকার আদি বাসিন্দা হওয়ায় তাদেরই বসতিক্ষেত্র এই এলাকা একদা গোপভূম নামে অভিহিত হয়েছিল। তারও পরে তারা কৃষিকাজেও রপ্ত হয়েছিল।

এই অজয়-দামোদর অববাহিকায় অবস্থিত উভয় নদীর দোয়াব অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি পশ্চিমের পাহাড়ি অঞ্চলের ন্যায় এবড়ো-খেবড়ো বন্ধুর প্রকৃতির নয়, বরং তা প্রায় সমতল। আবার পূর্ব বর্ধমানের গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের মত অতি সমতলও নয়। তাই গাঙ্গেয় উপত্যকার ও এখানকার অধিবাসীগণের জীবনধারণের প্রণালীও ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। (২)

এই অঞ্চল কৃষিকাজে বর্তমানে কিছুটা উন্নত হলেও অতি প্রাচীন কাল থেকেই ঘন অরণ্যে আবৃত ছিল। ফলে এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীরা প্রায় সকলেই অরণ্যচারী যাযাবর ছিল। পরে পরে তারা পশুপালন জীবিকায় অভ্যস্ত হয়েছিল। তার পরে তারা কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে। ইদানীং দামোদর নদীর সেচখাল ও অন্যান্য নদীর জলের সাহায্যে কৃষিকাজই প্রধান জীবিকায় পরিণত হয়েছে।

সভ্যতার শুরু থেকে এই এলাকার মানুষ কৃষিকাজে রপ্ত হলেও এই অঞ্চলের আর একটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যা বঙ্গের অন্যত্র তেমন দেখা যায় না— সেটি হল এখানকার কাঁকুড়ে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার নীচেই সঞ্চিত রয়েছে কয়লা-ভাণ্ডারসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য। তার জন্যই এই এলাকা খনিজ অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমানের এই গোপভূম এলাকাকে নিয়েই তাই লোকপ্রবাদ প্রচলিত হয়েছে— নীচে কয়লা উপরে ধান
এই নিয়ে বর্ধমান।

এবার এখানকার খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। বর্ধমান জেলার একমাত্র এই গোপভূম অঞ্চলেই খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য দেখা যায়। এখানকার উল্লেখ্য খনিজ সম্পদ হ'ল কয়লা। কোন সুদূর অতীতে বিস্তৃত অরণ্য অঞ্চল মাটির নীচে চাপা পড়ে কার্বনে পরিণত হয়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রায় ৩০ কোটি বছর পূর্বে কার্বনিফেরাস উপযুগ (Carboniferous Period) থেকে ৬-৭ কোটি বছর পূর্বে টার্সিয়ারী যুগ (Tertioary Age) পর্যন্ত কয়লা গঠিত হয়েছে। তার মধ্যে এখানকার উল্লেখযোগ্য কয়লা খনিগুলি কার্বনিফেরাস যুগেই সৃষ্ট। যে কয়লায় কার্বনের পরিমাণ বেশি সে কয়লা তত উন্নত মানের। সেদিক থেকে গোপভূমের কয়লা খনিগুলি উন্নত মানের।

ভারতের মধ্যে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উত্তোলন শুরু হয় ১৭৭৪ খ্রিঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন সামনার এবং এম.জি. হিটলির উদ্যোগে এই রানীগঞ্জ অঞ্চলেই। বেসরকারি প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ শুরু হয় এবং তা সার্থক রূপ পায় ১৮১৫-১৮১৬ খ্রিঃ। কিন্তু বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা এতে অংশ নিলেও তারা লোকসানের মুখ দেখায় বিব্রত বোধ করে ঠিক তখনই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এক বাঙালি প্রতিষ্ঠান "Carr & Tagore" সেগুলি ৭০ হাজার টাকায় কিনে নিয়ে কয়লা উত্তোলন শিল্পে এগিয়ে আসেন। পরে পরে বহু সংস্থাই এতে অংশ নেয়। বর্তমানে এই এলাকায়

প্রায় আটশ'র উপর কয়লাখনি বর্তমান। একা রানীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ। (৩) এই এলাকার উল্লেখ্য খনিক্ষেত্রগুলি হল— রানীগঞ্জ, রামনগর, সালানপুর, তাপসী, পারবেলিয়া, দিসেরগড়, আসানসোল, উখরা, গৌরাঙ্গ ডি, কালীপাহাড়ী, চুরুলিয়া, শিবপুর, জামুরিয়া, সীতারামপুর, কাজোরা ইত্যাদি। বর্তমানে উৎপাদক সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল ইষ্টার্ন কোল্ড ফিল্ড (ই. সি. এফ), বেঙ্গল কোল কোম্পানী লিমিটেড (বি. সি. সি. এল) ইত্যাদি।

প্রথমদিকে এখানকার উৎপাদিত কয়লা অজয়-দামোদর নদের জলপথে পরিবাহিত হত। পরে তা সহজেই পরিবহনের জন্য প্রথম ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে ১৯০ কিঃ মিঃ দূরে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়।

অন্যান্য খনিজের মধ্যে কিছু পরিমাণে এখানে লোহাও পাওয়া যায়। এই এলাকায় প্রাচীনকাল অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার কালেও যে, লোহার ব্যবহার জানা ছিল তার প্রমাণ এখানকার বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র বিশেষ করে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে লোহার তরবারি ও বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে লোহার হাত কুঠার পাওয়াতেই তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশ দাশগুপ্ত সেই মতকেই সমর্থন করেই বলেছেন— It was decisively proved that iron was known and probably melted at this site." (৪)

প্রধানত রানীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলের আশেপাশেই লোহাও পাওয়া যায়। তবে তার পরিমাণ তেমন কিছু উল্লেখ্য নয়। স্থানীয়ভাবে গোপভূমের এই এলাকার অনেক স্থানেই যেমন আসানসোল, সরিষাতলী, জামতারা, গৌরাঙ্গডির জঙ্গলে অনেক খাদান দেখা যায়। খাদান শব্দটির অর্থ হল লোহা তোলার জন্য খাল। এই খাদান থেকে নরগুল বা কাঁকড় তুলে তা থেকে লোহা তৈরি হয়। ঐ কাঁকড় বা নরগুলই হল পিগ আয়রন বা আকরিক লোহা। প্রতি ১০০Kg নরগুল থেকে ১৫Kg লোহা পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে বহু স্থানেই নরগুল থেকে লোহা উৎপাদনের চুল্লি চোখে পড়ে। রানীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলে প্রাপ্ত লৌহ আকরিককে উপজীব্য করেই কুলটি বার্নপুরে প্রথমদিকে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে আরও বহু লৌহ-ইস্পাত শিল্প যেমন দুর্গাপুর ইত্যাদি গড়ে উঠলেও তা স্থানীয় লৌহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নাই।

এই অঞ্চলে আর একটি খনিজ বস্তু পাওয়া যায়— তা হল তাপসহ্যকারী দুর্গল মাটি (Fire clay)। আর পাওয়া যায় খুবই অল্প পরিমাণে রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে অ্যালুমিনিয়ামের কাঁচামাল হিসাবে বক্সাইট এবং লৌহ সংকর ধাতু হিসাবে ম্যাঙ্গানিজ।

(গ) প্রশস্ত উপত্যকা ও অরণ্যভূমি ঃ— গোপভূমের পশ্চিমাংশ থেকে শুরু করে

দামোদর-অজয় উপত্যকার দোয়াব অঞ্চলের বিস্তৃত অংশগুলি, নুনিয়া, সিঙ্গারণ নদীর মধ্যবর্তী প্রশস্ত উপত্যকা নিয়ে আউশগ্রামের জঙ্গল এই সীমায় পড়লেও সমগ্র গোপভূম এলাকা ঘিরেই একদা বিস্তৃত ছিল অরণ্য অঞ্চল। কিন্তু কেন? তার উত্তরে বলা যায় এই এলাকা বিভিন্ন নদ-নদীর পলি দ্বারা বিধৌত তাই উর্বরা এবং মৌসুমী জলবায়ুর জন্য বৃষ্টিপাতের আধিক্য হেতু অজয়-দামোদর দোয়াব অঞ্চল অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকার কারণেই প্রাচীনকাল থেকেই গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, গোপভূমের বেশ কিছু অংশ ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত। ভূতাত্ত্বিকগণের মতে— "ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা শাল অরণ্য বৃদ্ধির সহায়ক।" (৫) তাই এই অঞ্চলের অরণ্যে শাল বৃক্ষের গভীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে এখানকার অরণ্যে আর্দ্র ক্রান্তীয় পর্ণমোচী জাতীয বৃক্ষ যেমন শাল, পিয়াল, মহুয়া, সেগুন, শিরীষ, শিশু, মেহগিনি, পলাশ, শিমুল, খদির ইত্যাদি বহু বৃক্ষের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে এখানকার অরণ্যে রয়েছে ছায়াদানকারী আম, জাম, কাঁঠাল, বট, অশ্বত্থ, হরিতকি এবং বহরা, অর্জুন বৃক্ষসহ বিভিন্ন ধরণের বাঁশেব সমারোহ।

এখানকাব বিস্তৃত গভীর গহন অরণ্য প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যা বিবৃত হয়েছে তা হল— "অরণ্যের অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক প্রবেশের পথ মাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ পবনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে।" (৬)

এই ধরণের গভীর অরণ্যে একদা গোপভূম অঞ্চলের সমুদয় অংশ পরিব্যাপ্ত হলেও পশ্চিমাঞ্চলের ঝাড়খণ্ড ও সাঁওতাল পরগনার বনভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখনও এই বনভূমের দুর্গাপুর, ফরিদপুর, কাঁকসা, আউশ গ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের স্থানে স্থানে শাল পিয়ালের গভীর জঙ্গল দেখা যায়— যার জন্য ঐ এলাকা এখনও 'জঙ্গল মহল' নামে পরিচিত। আর এই জঙ্গল মহলই অতীতের গহন অরণ্যাঞ্চলের স্মারক চিহ্নমাত্র। পূর্বে এখানে যে গভীর জঙ্গল ছিল সে বিষয়ে তারিখ-ই-বাংলা গ্রন্থে বলা হয়েছে— "এ অঞ্চল গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল।" (৭) এবং হান্টার সাহেবও সেই কথাই উল্লেখ করেই বলেছেন, অজয়-দামোদরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের গভীর অরণ্যে বন্যহস্তী ও ব্যাঘ্রাদি বিশাল জন্তুসমূহ নির্ভয়ে বিচরণ করত। (৮)

দু'শ বছর আগেও এই গোপভূমের গুসকরা হতে বরাকর নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চলে হিংস্র জন্তু জানোয়ারে পরিপূর্ণ ছিল আর জঙ্গল এত ঘন ছিল যে, দিবালোকেও জন্তু জানোয়ার ও তস্করের ভয়ে লোকে একাকী যাতায়াত করতে ভয়

পেত— তাই তারা দলবদ্ধভাবেই যাতায়াত করত। [৯] তখনকার দিনে এই সকল গভীর অরণ্য যে তস্কর ও ঠ্যাঙাড়েদের স্বর্গরাজ্য ছিল তাতে সন্দেহ নাই। প্রখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নয়ন ছাতি' গল্প তো সেই ইঙ্গিতই প্রদান করে। তাছাড়া এই অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম নামের মধ্যে ও ঠ্যাঙাড়ে উৎপাতের প্রমাণ পাওয়া যায় যেমন 'গলসী'— মানুষ মেরে গলপাশী দেওয়া থেকেই গলসী নামের উদ্ভব বলে অনেকেই মনে করে, অন্যদিকে 'পোতনা' গ্রাম নামটি তো মানুষ মেরে পুঁতে দেওয়া থেকেই উদ্ভূত বলেই মনে হয়।

এই গভীর অরণ্যাঞ্চলে একদা বন্য জীবজন্তুদেরও বিশেষ উপদ্রব ছিল তার প্রমাণ গ্রাম নাম 'মোষখাপুর'এ বিদ্যমান। কোন এক সময় এখানকার গভীর অরণ্যে হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণে গৃহস্থদের পোষ্য মোষের প্রাণ যেত— তাই গ্রাম নাম মোষখাপুর। বর্তমানে এ গ্রামের আর অস্তিত্ব নাই এখন সেখানে অরণ্য হটিয়ে দুর্গাপুর কারখানার কর্মীদের জন্য তৈরি হয়েছে সুরম্য কোয়ার্টার।

এই অরণ্যেই বিভিন্ন হিংস্র জন্তু জানোয়ারের যে ব্যাপকতা ছিল তা Dist. Gazetteers-এ উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে— Tigers were formerly common in the district,.... wolves are scarce and are mostly in the jungles north of Kaksa. They have been known to carry off children. [১০] ঐ সব জীবজন্তুর সঙ্গে সহ অবস্থানে ছিল হায়না, সজারু, খরগোস, শিয়াল, বনশুয়োর, বনমোরগ, ময়ূর, বিষধর সর্প ও বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক পশুপক্ষী।

সেই সঙ্গে বহু গাছপালার সাথে সাথেই ছিল বনের সৌন্দর্যবর্ধক নানা লতা গুল্ম ও পুষ্প বৃক্ষ যা সহজেই প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের মনে দাগ কাটত। স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ নামে খ্যাত 'নাগেশ্বর' বৃক্ষেরও ব্যাপক অবস্থিতি ছিল এই অরণ্যে যার প্রস্ফুটিত পুষ্প সৌরভ মানুষের মনে স্বর্গীয় আনন্দের হিল্লোল তুলত কিন্তু মানুষের স্বার্থপরতায় তারাও আজ কৃপণ হয়ে গেছে তাই বর্তমানে সমগ্র বনাঞ্চলে আজ আর তাদের দেখা পাওয়া যায় না। বর্তমানে কেবলমাত্র আউশগ্রাম ২নং ব্লকের অধীন অজয় তীরবর্তী নদীর উচু বাঁধের বন্ধনে আবদ্ধ 'সাগরপুতুল' গ্রামেই তাদের স্বল্প অস্তিত্ব এখনও লক্ষ্য করা যায়। তাদের সৌন্দর্য ও মনোহরণ সৌরভ সম্ভার আজও গোপভূমের গৌরব বৃদ্ধি করছে।

এই অরণ্যাঞ্চলের বহু নামিদামি বৃক্ষসমূহের যেমন অবলুপ্তি ঘটেছে তেমনি এখানকার বনাঞ্চল থেকে বহু বন্য প্রাণীও আজ অবলুপ্ত হতে বসেছে। আর হবেই না বা কেন? কারণ বনের তো এখন— 'সেই রামও নাই— সেই অযোধ্যাও নাই' এর অবস্থা। অরণ্য তো আজ সভ্য মানুষের বহুবিধ চাহিদার কাছে যেমন— বসতের চাহিদা, কলকারখানার চাহিদা, কৃষির চাহিদা, রাস্তাঘাট ও নগরায়নের চাহিদা ইত্যাদির

কাছে সহজেই নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে বহু বন্যপ্রাণী জন্তু-জানোয়ার আজ এই অরণ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে আবার নব্য আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারায় আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে বসেছে। উদাহরণ হিসাবে আমাদের চোখে দেখা ও বহু নীতি গল্পের ধূর্ত নায়ক হিসাবে পরিচিত— "নরানাং নাপিতং ধূর্তং"-এর মতই পশুকুলের মধ্যে ধূর্ত প্রাণী জম্বুক বা শৃগালের কথায় বলা যায় যে, সেই শৃগাল জাতি আজ দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পূর্বে প্রতি রাতেই যাদের কলরব শোনা যেত— গ্রাম গঞ্জে যারা 'যাম ঘোষ' নামে খ্যাত হয়ে যামিনীর প্রতি যামে প্রহর ঘোষণা করত। তাই তাদের সম্পর্ক বলা হত 'যামিনীতে যাম ঘোষ ডাকে প্রতি যাম'— সেই যাম ঘোষকের দল আজ দ্রুত বিলুপ্তির পথে।

অবস্থার প্রেক্ষিতে বহু অরণ্য ভূমিই আজ অবলুপ্ত হলেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই নতুন নতুন বৃক্ষাদি সহ সৃষ্টি করা হচ্ছে সামাজিক বনসৃজন। এর উদ্দেশ্য সত্যই মহৎ। যে সমস্ত গাছ এতে লাগান হচ্ছে তার মধ্যে ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষ নাকি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এর দ্বারা রেয়ন ও সিনথেটিক সুতা অল্প খরচে উৎপন্ন হলেও প্রখ্যাত পরিবেশবিদ সুন্দরলাল বহুগুণার ১৯৮৯ খ্রিঃ ২২শে ফেব্রুয়ারি 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতিতে জানা যায় যে এই বৃক্ষের দ্বারা ভূমিক্ষয় নিবারিত হয় না উল্টে পরিবেশ দূষিত হয়। তাই তিনি এই বৃক্ষ আমাদের দেশে রোপণের বিরোধিতা করেছিলেন। [(১১)] এ বিষয়ে সরকারের উচিত ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কারণ উদ্দেশ্য যেখানে শিব-গড়া সেখানে বাঁদর যাতে না গড়া হয় সেটা দেখা উচিত বৈকি!

(ঘ) তরঙ্গায়িত পাললিক ল্যাটেরাইটে সৃষ্ট বনভূমি ঃ— প্রশস্ত উপত্যকার অরণ্য ভূমির লাগাও পূর্বদিকে আউশগ্রাম, গলসী ও পশ্চিম ভাতাড় থানার কিছু অংশে এই পাললিক ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা গঠিত তরঙ্গায়িত উচ্চভূমির অবস্থান। এই এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে গড়ে ৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এবং পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু। এস্থান অজয়, দামোদর, কুনুর, খড়ি ইত্যাদি ছোট বড় বহু নদীর পললসহ প্রাচীন ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় গঠিত অরণ্যময় সমতলভূমি। এখানেও এক সময় গভীর অরণ্যের পরিব্যাপ্তি ছিল। এবং সেই গহন অরণ্যে পথ চলা ছিল খুবই বিপদসঙ্কুল। প্রমাণ হিসাবে একটি ছোট্ট কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অরণ্যের প্রায় পূর্ব সীমায় একটি গ্রাম ছিল। নাম চান্না। সেখানে যেতে হলে জীবন হাতে করে যেতে হত কারণ সেখানে যাওয়া ছিল খুবই বিপদসঙ্কুল। সে সম্পর্কে একটা প্রবাদই চালু হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে বলা হত— "যদি যাবি চান্না, ঘরে উঠবে কান্না।"

সেই গ্রামেই বাস করতেন শতকের প্রখ্যাত শাক্ত কবি ও সাধক কমলাকান্ত। তিনি একদা চান্না থেকে ওড়গ্রামের ডাঙ্গা হয়ে অমরারগড়ে যাবার পথে ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় ঘন অরণ্যে লুকিয়ে থাকা ডাকাত বা ঠ্যাঙাড়েদের সামনে পড়েন। ফলে ডাকাতদের উদ্ধত খড়গে মৃত্যুরূপী সাক্ষাৎ শমনকে দেখে তার আরাধ্যা দেবীর উদ্দেশ্যে প্রাণেব অন্তিম আকুতি নিবেদন করে একটি গান ধরেছিলেন—

জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা।
কিন্তু বিপদ কালে কেউ কোথা নাই।
ঘর বাড়ী ওড়গায়ের ডাঙ্গা।। (১২)

তখনকার দিনে ঘন জঙ্গলের জন্য অনেক গ্রাম জনপদই ওড়গ্রামের ডাঙ্গার মতই বিপদসঙ্কুল ছিল। কিন্তু মানুষের অপরিসীম চাহিদার কাছে অরণ্য সত্যই পরাভূত হয়েছে। জমিদারী আমলের শুরু থেকেই বন কেটে জমি ও বসতক্ষেত্র তৈরি করে আয় বৃদ্ধির প্রবণতার ফলে বন কেটে তৈরি হতে শুরু করেছে গ্রাম, গঞ্জ, বসতভূমি ও কৃষিক্ষেত্র। এখানকার বহুগ্রাম নামেও তারই পরিচয় স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যেমন— বনগুড়ি, বনগ্রাম, বনকাটরা, বনকাটি ইত্যাদি গ্রাম তো বন কেটেই তৈরি।

বন কেটে নগর নির্মাণ সেই মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছে। তারই একটি সুন্দর বর্ণনা মধ্যযুগীয় কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সুন্দরভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে— এখানে তারই একটু অংশ তুলে দেওয়া হল—

কুলিতা চালিতা কাটিল মারাটি।।
নেয়াতি সেয়াতি বরুণা সাঁই।
বেউড় বাঁশের অবধি নাই।
কেতকী ধাতকী কাটিল বামুন হাটি।।
সিঁয়া কুল ডামাকুল শিঙ্কার বেত।
কোদালে কাটিয়া করিল ক্ষেত।। (১৩)

গোপভূমের বিস্তৃত অংশে প্রাচীনকাল থেকেই অরণ্য ঘেরা ছোট বড় বহু নদীর চরায় বিশাল বিশাল পতিত ক্ষেত্রে বহুকাল ধরে গোচারণ ক্ষেত্র হিসাবে গোপেরা ব্যবহার করত ফলে অরণ্য ঘেরা নদীচরায় গোপপল্লী গড়ে উঠেছিল। এই কারণেই এই অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই 'গোপভূম' নামেই খ্যাত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে কৃষির চাহিদা মেটাতে গিয়ে ঐ সকল গোচারণ ক্ষেত্রগুলি কৃষিকার্যে ব্যবহারের ফলে গোচারণ ক্ষেত্রগুলি সঙ্কুচিত হয়েছে। (১৪) কিন্তু তাহলে কি হয়? তালপুকুরে তালগাছের অবলুপ্তি ঘটলেও কিংবা তালপুকুরে ঘটি না ডুবলেও— তালপুকুর নাম ঘোচে না— তেমনি এই অঞ্চলে বাথান বা গোচারণ ক্ষেত্র অবলুপ্ত হলেও অরণ্য ঘেরা অজয়-দামোদর উপত্যকার বিস্তৃত অরণ্যাংশ, বর্তমানের সমগ্র পশ্চিম বর্ধমান যেখানে গোপেদের গোচারণসহ বসত ক্ষেত্র ছিল— তা আজও গোপভূম নামেই পরিচিত রয়েছে।

একদা গোপভূমের গোপেদের গোচারণসহ বনভূমিই আজ অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান কালে ১৯৫৫ খ্রিঃ দুর্গাপুরের ব্যারাজ নির্মাণের পর D.V.C. ক্যানেল ও তৎপূর্বে রনড়িহা থেকে D.C. ক্যানেল চালু হওয়ায় বন কেটে কৃষিক্ষেত্র তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে গোপভূমের খনি অঞ্চলের বহু শিল্প ক্ষেত্র সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত রূঢ় শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরকে জায়গা ছেড়ে দিতে অরণ্য ভূমি আজ অবলুপ্তির পথে; ফলে সেই অরণ্যের আশ্রিত বিভিন্ন প্রাণীও আজ সরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

(ঙ) পলিগঠিত প্রায় সমতলভূমি ঃ— গোপভূমের এই অংশের অবস্থান বলতে গলসী থানার পূর্বাংশ আউশগ্রাম ১নং ব্লক এলাকা ও অজয়কেন্দ্রিক মঙ্গলকোট হয়ে পূর্বাংশে কাটোয়া পর্যন্ত। এই এলাকার বেশির ভাগ অংশ অজয়-দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত হলেও কাটোয়ার দিকে কিছু অংশ ভাগিরথী উপত্যকার অংশবিশেষ। এই এলাকার দক্ষিণ-পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু তাই এখানকার নদীগুলি সবই দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রবর্তী হয়েছে। সমুদ্র সমতল থেকে এই এলাকার উচ্চতা কোন অংশেই ৫০ ফুটের বেশি নয়। এই অঞ্চল মোটামুটি সমতল এবং বর্তমানে পরিপূর্ণ কৃষি উৎপাদক অঞ্চলে পরিণত। বিভিন্ন নদীর জল ও সেচ প্রকল্পের আওতায় এই এলাকা অবস্থিত হওয়ায় এখানে বছরের কয়েক ধরণের ফসল সুচারুরূপে উৎপন্ন হয়। কৃষিই এখানকার প্রধান জীবিকা।

এই অংশ সমতল হওয়ায় এর উপর বিভিন্ন রাস্তাঘাট, রেলপথ প্রসারিত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত; ফলে এখানে কৃষির সাথে ব্যবসা বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছে।

জলবায়ু ঃ আলোচ্য প্রাচীন গোপভূম মুখ্যত পশ্চিম বর্ধমান। এই এলাকা মৌসুমী জলবায়ুর আওতাভুক্ত। 'মৌসুমী' শব্দটি আরবি শব্দ 'মরসুম' থেকে এসেছে— যার অর্থ ঋতু। যে জলবায়ু বছরের বিভিন্ন ঋতুতে পরিবর্তিত হয় ও বিশেষ রূপ পরিগ্রহণ করে তাকেই এক কথায় মৌসুমী জলবায়ু বলা হয়। সেদিক থেকে সমগ্র ভারতবর্ষই মৌসুমী জলবায়ুর দেশ আর পশ্চিমবঙ্গ তার অধীন হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের এই গোপভূম এলাকাও মৌসুমী জলবায়ুর অধীন এবং মৌসুমী বায়ুর বিশেষত্ব এখানকার জলবায়ুতেও পরিলক্ষিত হয়।

মৌসুমী বায়ুর বিশেষত্বগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল— এর গ্রীষ্মকাল আর্দ্র এবং শীতকাল শুষ্ক। গ্রীষ্মকালে এই বায়ু যেদিক থেকে প্রবাহিত হয় (দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে) শীতকালে তার বিপরীত দিক (উত্তর-পূর্ব) থেকে প্রবাহিত হতে থাকে।

গ্রীষ্মকালের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবেই বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় আর শীত কালে সমগ্র বঙ্গেই বৃষ্টিপাত হয় না। এই জলবায়ুতে বৃষ্টিপাত একটানা হয় না— মাঝে মাঝে তার বিরতি ঘটে। এই বৃষ্টি বেশ অনিশ্চিতও বটে। ফলে যে বছর মৌসুমী বায়ুর আধিক্য ঘটে সে বছর অতিবৃষ্টির জন্য বন্যা আর যে বছর আগমনে কার্পণ্য দেখা দেয় সে বছর খরা হয়। তার ফলে এখানকার আর্থসামাজিক পরিকাঠামোয় এর বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে এই গোপভূমের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা প্রসারিত হওয়ায় এই এলাকার জলবায়ুতেও ক্রান্তীয় আবহাওয়াও পরিলক্ষিত হয়। ক্রান্তীয় জলবায়ুর প্রধান বিশেষত্ব হল শুকনো শীতকাল এবং অতিউষ্ণ গ্রীষ্মকাল। যা এই গোপভূম অঞ্চলেও পরিলক্ষিত হয়। এখানকার গ্রীষ্মকাল উষ্ণ হলেও আর্দ্র। তাই গ্রীষ্মের শেষেই (জুন-সেপ্টেম্বর) শুরু হয়ে যায় বর্ষা; আর এই বর্ষাকালেই প্রচুর বৃষ্টি হয়ে থাকে। সমগ্র গোপভূমে কম বেশি আড়াই মাস ধরে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ১৫৫-১৭৫ সে.মি.। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৫০০ মি. মি.। তবে গড় বৃষ্টিপাত ও বৃষ্টিপাতের দিনের পরিমাণ পশ্চিম বর্ধমান তথা গোপভূমের তুলনায় পূর্ব বর্ধমানে কিছু বেশি হয়ে থাকে।

সমগ্র গোপভূম এলাকাকে দু'টি ভাগে ভাগ করলে এর পশ্চিমাংশ ছোটনাগপুর পাহাড়ী এলাকার বর্ধিত অংশ পাহাড়ি প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ায় এই উচ্চাংশের মধ্যে চিত্তরঞ্জন, বরাকর, কুলটি, সালানপুর হয়ে আসানসোল, চুরুলিয়া, জামুরিয়া সহ রানীগঞ্জ পর্যন্ত এলাকার আবহাওয়া বা জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। অর্থাৎ এখানে গ্রীষ্মের সময় উত্তাপ বেশ বেশি থাকে মোটামুটি ৩৫°- ৪০° সেলসিয়াস এর মধ্যে। শীতকালে উত্তাপ খুব কম থাকে মোটামুটি ১২°- ১৫° সেলসিয়াস এর মধ্যে। তাই এখানকার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ শীতকালে প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম।

গোপভূমের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণও বেশি। গ্রীষ্মকালে সকালের দিকে সেই পরিমাণ থাকে শতকরা ৫৫% দুপুরে তা বেড়ে হয়ে যায় ৭০%, ফলে পশ্চিমাঞ্চলে দুপুরের গরম অসহ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলে কলকারখানার আধিক্য বেশি হওয়ায় তাদের চুল্লির নির্গত উত্তাপ প্রাকৃতিক উত্তাপের সঙ্গে মিলে মিশে সেখানকার আবহাওয়াকে অতিশয় তপ্ত করে তোলে। এরপর যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়া যায় আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এক থাকলেও শীতও গ্রীষ্মের উত্তাপের কিছু হেরফের লক্ষ্য করা যায়। যেখানে রানীগঞ্জ থেকে কাঁকসা পর্যন্ত এলাকায় শীতকালীন উত্তাপ ১৫°-১৮° সেলসিয়াস থাকে আর গ্রীষ্মকালে ৩৫°- ৩৮° সেলসিয়াসের মধ্যে অবস্থান করে।

এখন গোপভূমের পূর্বাংশ অর্থাৎ কাঁকসা থেকে কাটোয়া পর্যন্ত এলাকা অজয়,

দামোদর, ভাগীরথী ও অন্যান্য বহু নদ-নদী বিধৌত পলিগঠিত সমভূমি হওয়ায় এখানকার জলবায়ু পশ্চিমের তুলনায় বেশ মৃদু তাই এই অঞ্চলের জলবায়ুকে মৃদু নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর পর্যায়ে ফেলা যায়। এই জলবায়ুর জন্যই এখানকার আবহাওয়া বেশ আরাম দায়ক ও মনোহর। এখানের গ্রীষ্মকালের উত্তাপ ৩০°-৩২° সেলসিয়াস ও শীতকালে উত্তাপ থাকে মোটামুটি ১৭°-১৮° সেলসিয়াস এর মধ্যে।

সমগ্র গোপভূম এলাকার উপর দিয়ে বছরে দু'বার ঝড় প্রবাহিত হতে থাকে। চৈত্র বৈশাখে দুপুরের পর অনেক সময ঝড় বইতে থাকে— তাকেই কালবৈশাখীর ঝড় বলা হয়। আবার আশ্বিন মাসেও মাঝে মধ্যে ঝড় বইতে থাকে— সেই ঝড়কেই আশ্বিনের ঝড় বলা হয়। ইদানিং সাগরে প্রায় নিম্নচাপ হতে দেখা যায়। এই নিম্নচাপ আশ্বিন থেকে পৌষ মাসের মধ্যেই সংঘটিত হয়ে থাকে— এর ফলে প্রায়ই ঝড়-বৃষ্টি হতে দেখা যায। শীতকালেব এই ঝঞ্ঝা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা (western disturbance) নামে অভিহিত হয। যে কোন ঝড়-ঝঞ্ঝার দৌলতে দেশে প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে। বিশেষ করে ঘড়-বাড়ি বিনষ্ট হয় ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে।

বর্ষাকালে গোপভূমের পূর্বাংশে বিভিন্ন নদ-নদী অত্যধিক বর্ষায় প্লাবিত হয়ে তাদের উচ্ছ্বসিত জলধাবায় এই অঞ্চলে ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি করে— এর ফলে হাজার হাজার মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়ে। তাদের অনেকেই বন্যার তাণ্ডবে মৃত্যুবরণও করতে বাধ্য হয়। তাই অসহায় মানুষ তখন সৃষ্টিকর্তার কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলতে থাকে—

"দয়ালরে কত লীলাই জান।
যে জলেতে তৃষ্ণা মেটাও
সেই জলেতেই কেন মরণ আন।।"

।। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও পত্র পত্রিকা ।।

১) পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয়— সুবোধ চন্দ্র বোস।.... পৃঃ-৪৬
২) District Census Hand Book, Burdwan — 1951.
A. K. Mitra. Page-11
৩) বর্ধমান ঃ সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক রূপরেখা— জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী। বর্ধমান চর্চা।.... পৃঃ-৭২
৪) Excavations at Pandu Rajar Dhibi — P. Dasgupta.
৫) ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা — সঙ্কর্ষণ রায়।.... পৃঃ-১২
৬) আনন্দমঠ উপক্রমণিকা — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/ বঙ্কিম রচনাবলী (হরফ).... পৃঃ-৬৫৬

৭) তারিখ-ই-বাংলা — মহব্বৎ জঙ্গ।.... পৃঃ-৩৮
৮) The Annals of Rural Bengal — W. W. Hunter. Page-43
৯) Bengal District Gazetteer, Burdwan — 1910.
১০) Do ... Page-14
১১) তথ্যগ্রহণ—বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১) যজ্ঞেশ্বর চৌধুবী। পৃঃ-৪৮
১২) সাধক কমলাকান্ত — বলাই দাস ভক্তিবিনোদ।.... পৃঃ-৫১
১৩) কবিকঙ্কণ চন্ডী — মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-৬০
১৪) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম) -- যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।... পৃঃ-৪৮

।। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত গোপভূমের অস্তিত্ব ।।

বর্তমান রাঢ় বঙ্গের 'গোপভূম' একটি বিশিষ্ট স্থান নাম। অতিপ্রাচীন কাল থেকেই এই স্থান বঙ্গের অঙ্গীভূত ছিল। তবে সেই প্রাচীনকালে এই স্থানের কি নাম ছিল তা আজ আব জানার কোন উপায় নাই। বঙ্গই তখন কি নামে অভিহিত হত তাবই কোন সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না, কারণ তখন এই ধরণের নামের কোন অস্তিত্বই ছিল না ঠিকই কিন্তু সেই সুদূর অতীতেও বঙ্গ দেশেব সঙ্গেই এই গোপভূমেরও ভৌগোলিক অস্তিত্ব যে ছিল তা ঐতিহাসিক সত্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বঙ্গ নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে। যার রচনাকাল হিসাবে মোটামুটি ১০০০-৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ সময়কেই ধরা হয়। সেখানে বলা হয়েছে "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের পাদ ঃ"— অর্থাৎ এই দেশ বগধদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 'বগধ' বলতে তখনকার দিনে মগধকেই বোঝাত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন— "বগধ বোধ হয় মগধ, এই অনুমান অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে। এই গ্রন্থের ঋষিরা বঙ্গকে মগধের প্রতিবেশী জনপদ বলিয়াই জানিতেন।[১]

তাছাড়াও মহাভারতের আদি পর্বে বঙ্গজনপদের উল্লেখ আছে।[২] ঐ মহাকাব্যের সভাপর্বের ২৯ অধ্যায়ে বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত এই সমুদয় পৃথক রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে"।[৩] এ প্রসঙ্গে বহু লিপি প্রমাণেও যেমন খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকে নার্গার্জুনীকোন্ড শিলালিপি, চতুর্থ শতকের রাজচন্দ্রের মেহেরৌলী স্তম্ভলিপি এবং সম্ভবত চতুর্থ শতকের কালিদাসের রঘুবংশ গ্রন্থের রঘুর দিগ্বিজয় অংশে বঙ্গের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তাই বলা যায় বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও লিপি প্রমাণে যখন বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে তখন দেশ হিসাবে আমাদের বাংলাদেশ খুবই প্রাচীন দেশ। আর তারই অঙ্গীভূত বঙ্গের দুই প্রাচীন নদী অজয়-দামোদর বেষ্টিত বর্তমান গোপভূমের অবস্থানও বিশেষ প্রাচীন। পরে পরে এই বাংলাদেশ ও তার সংলগ্ন গোপভূম বিভিন্ন ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে, ক্রমানুসারী বিভিন্ন নামের মধ্য দিয়ে বর্তমান বঙ্গ বা বাংলা এবং আলোচ্য এলাকাটিও গোপভূম নামে পরিচিতি পেয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই দেশের অবস্থিতি লক্ষ্য করলেও গঙ্গাবিধৌত বঙ্গ ভূমি পরবর্তীকালে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন ভাগে উপভাগে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে। সেই সকল পূর্বনাম ও ভাগগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল— পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, গৌড় ইত্যাদি। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত আমাদের বঙ্গভূমির উল্লেখ্য বিভিন্ন নামের স্বতন্ত্র জনপদের মিলন মিশ্রণেই এই বঙ্গের সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটেছে। পরে এই বঙ্গই স্বতন্ত্র কয়েকটি ভাগেও বিভক্ত হয়েছে, যেমন— সুহ্ম, হরিকেল, দন্ডভুক্তি ইত্যাদি। পরে এই বঙ্গের গঙ্গা নদীর পশ্চিম বরাবর এক বিস্তৃত অংশ 'রাঢ় বঙ্গ' নামে পরিচিত হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এই রাঢ় বঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন গ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্রে'। তাতে উল্লেখ রয়েছে রাঢ় দেশ বজ্জ বা বজ্রভূমি, সব্ভ বা সুহ্ম ভূমি নামে দুটি পৃথক ভাগে বিভক্ত ছিল। পরে তা উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় নামেও অভিহিত হয়। একাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোলের তিরু মলয় লিপি অনুযায়ী সেই বিভাগ আরও স্পষ্টকৃত হয়ে উত্তীর লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কন লাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়) নামে অভিহিত হতে দেখা যায়।

এখন এই রাঢ় বঙ্গের অবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য বঙ্গের এক প্রাচীন নদী ঋজু পালিকার উল্লেখ প্রয়োজন। এই ঋজু পালিকা নদীই পরবর্তী কালে পাল রাজ অজয় পালের নাম অনুসারে অজয় নদী নামে পরিচিত হয়েছিল। [৪] তবুও বলা যায এই নদী দুর্বার ও উন্মত্ত, যাকে জয় করা যায় না— অজেয় অর্থেই এই নদী অজয় নামেই পরিচিত। এখন গঙ্গার পশ্চিম বরাবর অজয় নদীর উত্তর অংশই ছিল উত্তব রাঢ় আর অজয় নদীর দক্ষিণ থেকে দামোদর বা দেবনদের দক্ষিণের বিস্তৃত অংশ নিয়ে গঠিত ছিল দক্ষিণ রাঢ়। সেই দক্ষিণ রাঢ়ের বিস্তৃত অংশ অজয়-দামোদরের মধ্যবর্তী এলাকা নিয়েই গঠিত হয়েছিল 'গোপভূম'। সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

গোপভূমের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায়— এই এলাকা অতীত কাল থেকেই ছিল ঘন জঙ্গলে আবৃত। সেখানে অরণ্যচারী হিংস্র জীবজন্তুর প্রকোপ ছিল খুব বেশী। দুর্ধর্ষ গোপজাতি ছাড়া অন্য কোন জাতি সম্প্রদায় সেখানে বসবাস করতে পারত না। বন্য জন্তুদের পোষ মানিয়ে, অন্য দিকে হিংস্র জন্তুদের দমন করে, পশুপালক জাতি হিসাবে গোপজাতিই দীর্ঘ দিন ধরে ঐ জঙ্গল মহলে বসবাস করতে থাকায়, তাদের বাসভূমি হিসাবেই ঐ স্থান 'গোপভূম' নামেই অভিহিত হয়েছিল।

প্রথম দিকে ঐ জাতি গোষ্ঠী অবণ্যের গভীর গহনে নিজেদের পালিত পশুচারণ করে বেড়াত। তাই প্রথম দিকে তারা অনেকটাই অরণ্যচারী যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। ঐভাবেই বহুকাল কেটে যাওয়ার পরে ঐ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে অরণ্যের বিস্তৃত অঞ্চল ঘিরে আপন বাসা তৈরী করে সেখানেই স্থায়ী বসতি গড়তে থাকে এবং

নিজেদের পালিত পশুচারণ সহ দুগ্ধ উৎপাদনে ব্রতী হয়।

অজয়-দামোদরের মধ্যবর্তী বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল গোপভূম নামে অভিহিত হলেও তা বঙ্গের পাল বংশের রাজত্ব কালে বিশেষ করে মহীপালের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ব্যক্তি মহামান্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের রাজত্বকাল (একাদশ শতক) কিংবা তারও পূর্বে ষষ্ঠ শতকে রাজা গোপচন্দ্রের আমল থেকেই এই এলাকা গোপভূম নামে সর্বাধিক পরিচিত হয়। কিন্তু তাব পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বা ঐতিহাসিক যুগের শুরুর দিকে এই এলাকায় ঐ ধরণের কোন নামের অস্তিত্বই ছিল না।

তা না থাক, তবে অজয়-দামোদর কেন্দ্রিক ঐ এলাকার ভৌগোলিক অস্তিত্ব অতি অবশ্যই ছিল। সে কথায় পরে আসা যাবে। এখন দেখা যাক এই অঞ্চলে মনুষ্য বসতি কি ভাবে এবং কখন গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় শুধু গোপভূম কেন সমগ্র বঙ্গেই কি ভাবে লোকবসতি গড়ে উঠেছিল তা সঠিক জানার উপায় নাই। নানান ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই পর্ব সূচিত হয়েছিল। সে বিষয়ে জানতে হলে আমাদের অনেকখানিই পিছনে ফিরতে হবে।

আমরা জানি এই পৃথিবীর বয়স কাল মোটামুটি প্রায় ৫০০ কোটি বছর। কিন্তু শুরু থেকে জীবজন্তু বা প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব হয়নি। পৃথিবীতে প্রাণীর আগমণ ঘটে প্রায় ১০০ কোটি বছর আগে, কিন্তু তখনও মনুষ্য জাতীয় কোন প্রাণীর আবির্ভাব হয়নি। কারণ পৃথিবীতে তখনও মনুষ্য জাতীয় প্রাণীর বসবাসের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়নি। পৃথিবীতে নানান্ পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভূমিরূপের পরিবর্তন, আবহাওয়া পরিবর্তন ও পরিবেশের পরিবর্তনের মাধ্যমে যখন একটা পারস্পরিক যোগসূত্র সূচিত হয় তখনই পৃথিবীতে জীবজন্তু ও প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। সেও প্রায় এক কোটি বছর আগে নয়।

এই পরিবর্তন সংগঠিত হয় বেশ কয়েকটি বিপ্লবাত্মক যুগের ক্রমানুসারী আগমন ও তাদের দ্বারা সংঘটিত বির্বতনের মাধ্যমে। সেই সকল যুগন্তকারী যুগসমূহের মধ্যে উল্লেখ্য হল প্লাওসিন যুগ, প্লাইস্টোসিন যুগ, হেলোসিন যুগ ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবথেকে গুরত্ব পূর্ণ হল প্লাইস্টোসিন যুগ। কারণ ঐ সময়েই পৃথিবীর ভূমিভাগের গঠন বর্তমান যুগোপযোগী হয়েছে। ঐ যুগ সংঘটিত হয়েছিল ৩০-৩৫ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে ১০ হাজার বছর পূর্বে। এই পর্বেই হিম যুগ ও প্লাবন যুগ পারস্পরিক প্রবাহ ধারায় চলতে থাকে। অন্যান্য দেশের মত ভারতেও তাদের প্রভাব সূচিত হয়। এই ভাবেই চতুর্থ হিমবাহ যুগে ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলের ব্যাপক পরিবর্তনের সময় বঙ্গের উপরেও তার প্রভাব পড়ে, ফলে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানেও জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়।

তবে তখনও মনুষ্যাকৃতি প্রাণীর আবির্ভাব ঘটলেও তাদের ঠিক পরিপূর্ণ মানব

জাতি বলা যায় না। ঐতিহাসিক পরিভাষায় তাদের নিয়ানডার্থাল মানুষ বলা হয়ে থাকে। কয়েক লক্ষ বছর বিবর্তনের ফলে ঐ মানুষ ধীরে ধীরে আধুনিক মানুষ বা ক্রেম্যাগনন মানুষে রূপান্তরিত হয়। সেও আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। কিন্তু সেই সময়কালের মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও এই বঙ্গেও তেমনি মানুষের অধিবসতি তখন থেকেই গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ যে একেবারেই নেই তা নয়। সেই প্রমাণগুলি একে একে উপস্থাপন করলেই বর্তমান গোপভূমের ভৌগোলিক অস্তিত্ব ও অবস্থান যে তখনও বর্তমান ছিল এবং সেখানেও যে লোকবসতি গড়ে উঠেছিল তা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

প্রথমত বলা যায়, হিমযুগ চলাকালীন ৪র্থ হিমবাহ যুগ অন্তে ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। পণ্ডিতদের মতে সেই সময়কাল ছিল ১০ হাজার বছর আগে। তখনই বঙ্গের দুই প্রাচীন নদী অজয়, দামোদরের সৃষ্টি হয়। সেই সময় থেকেই দামোদরের তীরবর্তী অঞ্চল মনুয্যবাসের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। তার বহু পরে অজয়ের তীরে তীরেও জনবসতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

উল্লেখ্য দুই নদীর দ্বারা ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল থেকে বাহিত পলল প্রস্তরাদির প্রবাহে ছোটনাগপুরের প্রান্ত সীমা পার হয়ে, তারই পূর্ব প্রান্তে অজয়-দামোদরের মধ্যবর্তী এলাকা ধীরে ধীরে গঠিত হয়। ফলে বেলে মাটির দ্বারা এই অঞ্চল গঠিত হওয়ায় সেই অজয়-দামোদরের দোয়াব অঞ্চলে ঘন অরণ্যের সৃষ্টি হয়। আর সেই অরণ্যাঞ্চলে তখন থেকেই শিকারজীবী বন্য যাযাবর শ্রেণীব জনসমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যায় অতিপ্রাচীন কাল থেকেই সেই প্রস্তর যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ শেষ প্রস্তর যুগে (Late stone age) দামোদব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে জনবসতির হদিস মেলে। প্রমাণ হিসাবে দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন দামোদরের উত্তর তীরে বীরভ্যানপুর গ্রামে ছ'হাজার বছরের প্রাচীন এক প্রত্নক্ষেত্রে প্রস্তরায়ুধ সহ একটি প্রাচীন অধিবসতি আবিষ্কৃত হয়েছে। [(৫)]

এই সব পাথুরে প্রমাণেই প্রমাণিত হয় যে, সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বর্তমান গোপভূমের এই অঞ্চলের অবস্থান ছিল এবং সেখানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। পূর্বে এই অঞ্চলের নাম কি ছিল জানা না গেলেও তখনকার দিনে সেই প্লাইস্টোসিন যুগের অন্তিমপর্বে এই এলাকা জনসমৃদ্ধও ছিল।

দ্বিতীয়ত— প্লাইস্টোসিন যুগের তৈরী পাথরের নানা প্রকার হাতিয়ার বিশেষ করে ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ সমূহ (Microlithe) প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সংস্কৃতির ক্রম, বিবর্তনের বহু পরিচয় দামোদর-অজয় দোয়াব অঞ্চলে পাওয়া গেছে। সে যুগের মানুষ এ অঞ্চলে বসবাস করেছে। প্রথম দিকে তারা যাযাবর জীবনেই অভ্যস্ত ছিল এবং শিকারের মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করত। শিকারের জন্য ব্যবহৃত প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র-

শস্ত্র বা আয়ুধসমূহ এই অঞ্চলেই আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই সমস্ত ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতির মধ্যে অধিকাংশই ছিল তীক্ষ্ণধার আয়ুধ যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সেগুলিব আয়ুষ্কাল আজ থেকে ছয় হাজার বছরের প্রাচীন। শুধু বীরভ্যানপুরেই নয় এতদ্ অঞ্চলের দেজুড়ী, মলনদিঘি, গোপালপুর, আড়া, কাঁকসা, সাগরডাঙ্গা ইত্যাদি বিস্তৃত এলাকায় প্রাচীন প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই বলা যায় এই অজয়-দামোদর দোয়াব এলাকায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অধিবসতি গড়ে উঠেছিল ৬-৮ হাজার বছর পূর্বের Late stone বা শেষ প্রস্তর যুগে।

তৃতীয়ত— সেই মাইক্রোলিথিক যুগের মানব গোষ্ঠী নিজেদের বাঁচার তাগিদেই আস্তে আস্তে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ী বসতের প্রেরণা লাভ করতে থাকে— তাই পশুশিকারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পশুপালন ও খাদ্যোৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তার ফলে শিকার এল মানুষের দোর গোড়ায়। কুকুর, ছাগল, গরু, ভেড়া— এই সব জন্তুদের মানুষ শুরু করল লালন পালন। বনের পশুরা ঘরে থেকে গৃহপালিত হল। এই বৈপ্লবিক সংস্কৃতির নাম হল নব্য প্রস্তব যুগ। [৬] এইভাবেই তারা সভ্যতার আব এক ধাপ এগিয়ে এসে 'নব পলীয়' যুগে প্রবেশ করল।

চতুর্থত— ধীরে ধীরে সেই প্রাচীন মানুষই পরবর্ত্তী কালে যাযাবর জীবন ত্যাগ কবে স্থাযী বসবাসের চেষ্টা কবতে থাকে। প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ্য যে, এই বীরভ্যানপুরেই ক্ষুদ্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শনাদির সঙ্গে এখানে আদিম মানুষের তৈরী কুটিরাদির চিহ্ন স্বরূপ কয়েকটি খুঁটির গর্তও আবিষ্কৃত হয়েছে [৭] গর্তগুলি যে বাঁশের বা কাঠেব বা পাথরের খুঁটির তা সহজেই অনুমেয়। এ অনুমানেও বাধা নেই যে, খুঁটির উপর একটি চালাও ছিল। [৮] তাই বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রাচীন গোষ্ঠীর সন্ধান তথা তাদের স্থায়ী বসতির প্রচেষ্টা সবকিছুই বর্তমান গোপভূম এলাকাতেই প্রথম দেখা যায়। তাতে দৃঢ় ভাবে প্রমাণিত হয় এই এলাকা অতি প্রাচীন কালেও বর্তমান ছিল।

পঞ্চমত— দামোদর তীরের বীরভ্যানপুরে আবিষ্কৃত প্রত্নদ্রব্যের মধ্যে পোড়ামাটির কোন জিনিষ পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই এখানে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাকে এই অঞ্চলের খনন কার্যের দায়িত্বে থাকা তৎকালীন ভারতীয় পুরাতত্ত্বের সংযুক্ত মহা নির্দেশক অধ্যাপক ব্রজবাসীলাল, প্রাক পোড়ামাটির যুগ বা (Pre Pottery age) বলে চিহ্নিত করেছেন। [৯] যা তাম্রশ্মীয় সভ্যতা (১৬ খ্রীঃপূর্ব) এর বহু বহু বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল।

ষষ্ঠত— দামোদরের উত্তর তীরবর্তী আর এক প্রত্নস্থান হিসাবে ভরতপুরের নাম উল্লেখ করতে হয়। সেখানেও খনন কার্যের ফলে প্রথম সংস্কৃতি স্তরে বা সর্বনিম্ন স্তরে

আবিষ্কৃত হয়েছে কিছু উল্লেখ্য প্রত্নবস্তু। যেমন— ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ, নবাশ্মীয় কুঠার, হাড়ের তৈরী হাতিয়ার এবং বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সহ ৪র্থ স্তরে বা সর্বোচ্চ স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে ঐতিহাসিক যুগের উল্লেখ্য পুরাবস্তু পঞ্চরথাকৃতি এক বৌদ্ধ স্তুপ ও তার কুলঙ্গীতে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তি।

কিন্তু এখানে তাম্র নির্মিত কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নি। ফলে প্রমাণ হয় এটি তাম্রশ্মীয় যুগেরও আগের পর্ব। প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই পর্ব বীরভ্যানপুরের পরবর্তী সব্যতা বলেই অনুমিত হয়। তবে এই স্থানেই অন্যান্য স্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখানে ক্রমানুসারী সভ্যতার বিকাশ ঘটতে ঘটতে তা ঐতিহাসিক যুগকেও অতিক্রম করে খ্রীষ্টীয় অষ্টম নবম শতকে উপনীত হওয়ার প্রমাণ মিলেছে এবং প্রাক আধুনিক কাল পর্যন্ত তা বিস্তারিত হয়েছে। এই চিত্র শুধু ভরতপুরেই নয়, এই গোপভূম এলাকার সকল প্রত্নক্ষেত্রেই প্রাচীন কাল থেকে ক্রমানুসারী জনবসতি ও সভ্যতার নিদর্শন স্পষ্ট হয়েছে।

সপ্তমত— গোপভূমের প্রাচীন নদী দামোদর উপত্যকায় গড়ে ওঠা সভ্যতার কথা এতক্ষণ বলা হল, এবার গোপভূমের অন্য উল্লেখ্য নদী অজয় ও তার উপনদী কুনুর উপত্যকায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের কথায় আসা যাক। এই এলাকায় উল্লেখ্য প্রত্নক্ষেত্রগুলি হল— পান্ডুরাজার ঢিবি, গোস্বামী খন্ড, বসন্তপুর, সিলুট, বনকাটি, রাণী পোতার ডাঙ্গা, ধনটিকুরীর ডাঙ্গা, মঙ্গলকোট ইত্যাদি। এই সব স্থানে প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শনের মাধ্যমে জানা যায় যে, এই এলাকা বর্তমান আকার অবয়বেই বর্তমান ছিল।

প্রমাণ হিসাবে কাঁকসা থানার বনকাটির নাম উল্লেখ করা যায়। সেখানে এক বৃক্ষের জীবাশ্ম (wood fossil) নির্মিত হাত কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতে বৃক্ষ জীবাশ্ম নির্মিত আয়ুধের বয়স আনুমানিক দেড়লক্ষ হতে দু'লক্ষ বছর। [১০] তাছাড়াও ঐ বনকাটিতে মধ্য প্রস্তর যুগের বহু প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি বীরভ্যানপুর কৃষ্টির সমগোত্রীয়। বনকাটির পশ্চিমে অর্থাৎ কয়লা খনি অঞ্চলে কার্বোনিফেরাস যুগের জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে। [১১]

এছাড়া পান্ডুরাজার ঢিবি ও অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্রেও যে সব প্রত্নদ্রব্য বা নিদর্শনাদি পাওয়া গেছে তার অধিকাংশ তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার দ্যোতক। যে সকল লোকেরা তখনকার দিনে এতদ অঞ্চলে অধিবসতি গড়ে তুলেছিল, তারা ধাতু হিসাবে তামার ব্যবহার অতি মাত্রায় করত। তাই সেই যুগকেই 'তাম্রশ্মীয়' যুগ বলেই অভিহিত করা হয়েছে। এই যুগের সময়কাল আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের প্রাচীন।

তার আগে মানুষ পার হয়ে এসেছে প্রস্তর যুগ— এই অঞ্চলের বীরভ্যানপুরেই যার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। সেই প্রস্তর যুগ অতিক্রম করে অগ্রবর্তী হতে থাকায় আসে নবোপলীয় (Neolithic) যুগ। এর সময়কাল খ্রীষ্ট পূর্ব প্রায় তিন হাজার অব্দ।

এই যুগ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী যুগ। কারণ এই যুগেই মানুষ প্রথম ভূমি কর্ষণ বা চাষের কলা কৌশল রপ্ত করে, ফলে মানুষ স্থায়ী বসতি স্থাপন শুরু করে। এই যুগেই মানুষ পশুপালন প্রক্রিয়ায় রপ্ত হয়— তাই তারা হয়ে ওঠে পশুপালক। এই পর্বে আর এক উল্লেখ্য উদ্ভাবন হল মৃৎপাত্রের ব্যবহার। কাদা থেকে হাতে গড়া পাত্রাদি রোদে শুকিয়ে পরে আগুনে পুড়িয়ে তাকে শক্ত করে নেয়। এইভাবে সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তারা তৈরী করতে থাকে। এই কাজে তারা পরে পরে পর হাতের বদলে চাকের ব্যবহার রপ্ত করে, তবে তার বহু পূর্বে তারা আগুনের ব্যবহার শিখেছিল।

আদিম মানুষ এই নবোপলীয় যুগেই বস্ত্রবয়ন প্রক্রিয়াও রপ্ত করেছিল। এখন তারা নিজেদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে সকল আয়ুধ বা যন্ত্রাদি ব্যবহার করত সেগুলিকে বেশ মসৃণ বা 'পালিশ' করত। বস্তুত নবোপলীয় যুগেই প্রথম সভ্যতার সূচনা হয়। [১২] এই পর্বেই ভারতে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার বিকাশ ঘটে বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন। সেই সভ্যতার উত্তরসূরীগণ নদীপথে দেশের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। হয়ত তাদেরই কোন শাখা বঙ্গের অজয়-নদীর তীরবর্তী এই অঞ্চলে অধিবসতি গড়ে তুলে এখানে কৃষি ভিত্তিক গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থায় তাম্রশ্মীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। তাই বলা হয়েছে, সিন্ধুসরস্বতী সভ্যতার কৃষি কেন্দ্রিক উত্তবসূরিগণ রাঢের পাণ্ডু রাজার ঢিবি, মহিষদল প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীন সমাজের বিকাশ ঘটায়। [১৩] তা ঘটালেও পণ্ডিতদের মতে এবং উভয় তাম্রশ্মীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির কার্বন-১৪ পরীক্ষার প্রেক্ষিতে জানা যায় যে, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতা, বঙ্গের অজয় তীরবর্তী তাম্রশ্মীয় সভ্যতা থেকে এক হাজার বছরের প্রাচীন।

তা হোক। তবে এখানে যে সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল তা হল তাম্রশ্মীয় সভ্যতা আর সভ্যতার প্রানবস্তু হল তামা। যাকে নিয়ে গড়ে ওঠা সভ্যতাই তাম্রশ্মীয় সভ্যতা। তাই পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক গ্রেগরী পয়সলও যথার্থই বলেছেন যে, ভারতের তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভুত্থানের মূলে ছিল তামার ব্যবহার।

ভারতের তাম্রশ্মীয় সভ্যতার উল্লেখ্য ক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ— তার মধ্যে অজয় তীরবর্তী এলাকাই ছিল সেই সভ্যতার বিকাশ ক্ষেত্র। ডঃ অতুল সুর তাই বলেছেন— বাংলায় তাম্রশ্মীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বর্ধমান জেলার অজয় নদীর তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে। [১৪] বর্ধমানের প্রখ্যাত গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীও তাই বলেছেন প্রকৃত পক্ষে পাণ্ডুরাজার ঢিবি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম প্রাচীন জনবসতির গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। [১৫]

প্রশ্ন হতে পারে এখানে তাম্রশ্মীয় সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ কেন ঘটেছিল? উত্তরে বলা যায় যে, সেই সময় বঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এই ধাতু পাওয়া যেত, তা ছাড়াও নিকটবর্তী ধলভূম এলাকা ছিল এই সভ্যতার প্রাণ-স্বরূপ তামার যোগানদার। আর তখনকার দিনে— "সাত সমুদ্দুর তেরো নদী" ফেরা বাঙালী বণিকেরা সেই তামা নিয়ে দেশ বিদেশেও পাড়ি দিত। তাই পরবর্তীকালে তামা বিক্রয়ের জন্য তামা-কে কেন্দ্র করেই দক্ষিণবঙ্গে গড়ে উঠেছিল এক বন্দর— যার নাম তাম্রলিপ্ত >তমলুক। ফলকথা তাম্রের সহজলভ্যতাই তৎকালীন বঙ্গে তাম্রশ্মীয় সভ্যতার ব্যাপক উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

সেই তাম্রাশ্ম সভ্যতাই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে সবথেকে বড় বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পশ্চিমবঙ্গ, আর সেই পশ্চিমবঙ্গের অজয়-দামোদর কেন্দ্রিক গোপভূম এলাকাই ছিল সেই তাম্রশ্মীয় সভ্যতার পীঠস্থান।

এতক্ষণ এই এলাকায় সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্বে ক্রমানুসারী সভ্যতার বিকাশ যে ঘটেছিল তা উপরের আলোচনায় জানা গেল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ধীর গতিতে তা এগিয়ে চলেছে।

পরিশেষে তাই বলি-- তাম্রশ্মীয় সভ্যতায় এসে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখল। ফলে পাথর ছেড়ে মানুষ ধাতুনির্মিত অস্ত্র আরও তীক্ষ্নধার হওয়ার তাদের সুবিধা হল। কিন্তু তাম্রশ্মীয় সভ্যতায় ধাতু হিসাবে তামার ব্যবহার হলেও তামার অস্ত্র তেমন শক্ত পোক্ত নয়— তাই তারা অস্ত্রকে আরও শক্ত বা দৃঢ় করার জন্য উপায় খুঁজতে শুরু করল। সেই প্রচেষ্টাতেই আবিষ্কৃত হল টিন নামক এক ধাতুর। তখন তারা আপন বুদ্ধি কৌশলে নয় ভাগ তামার সঙ্গে এক ভাগ টিন মিশিয়ে তৈরী করল ব্রোঞ্জ নামক এক মিশ্র ধাতু। তার তৈরী অস্ত্র-শস্ত্র বেশ শক্ত পোক্ত হল।

ইতিহাসে এই পর্বই হল মিশ্রতাম্রাশ্মীয় যুগ। যার স্থিতি কাল খ্রীষ্ট পূর্ব ১০৫০ থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত। বঙ্গের গোপভূম এলাকায় এই সভ্যতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল— তার প্রমাণ পাওয়া যায় গোপভূমের শ্রেষ্ঠ প্রত্নক্ষেত্র পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে মঙ্গলকোট পর্যন্ত সমস্ত প্রত্নক্ষেত্রে।

এরপরে সভ্যতার রথচক্র ঘূর্ণিত হয়ে চলতে চলতে একদিন মানুষ আবিষ্কার করল পৃথিবীর কঠিনতম ধাতু লোহা। ফলে মানুষ তাকেই আঁকড়ে ধরল। ফলে লোহার ব্যবহার হল শুরু। তারই ফলে পূর্বেকার সকল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে পূর্বের আবিষ্কৃত সকল ধাতুকে বাদ দিয়ে লোহাকেই দৃঢ় করে ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করল। ফলে সৃষ্ট হল লৌহ যুগ (Iron Age) যার আর্বিভাব কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৪৫০ অব্দ। লৌহ যুগের দাপট শুরু হলে তামা ও ব্রোঞ্জ ধীরে ধীরে বিদায় নিল।

লৌহযুগের প্রভাব এই রাঢ় বঙ্গের গোপভূমেও পড়তে থাকে। তাই জঙ্গল মহলের অধিবাসীরাও লৌহের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হয়েছিল, প্রমাণ স্বরূপ এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে লোহাব তৈবী বহুবিধ দ্রব্য-সামগ্রীব সন্ধান পাওয়া গেল। বিশেষ কবে গোপভূমেব শ্রেষ্ঠ পুরাক্ষেত্র পান্ডুরাজাব ঢিবিতে প্রাপ্ত এক লৌহ তববারি তাব জ্বলন্ত প্রমাণ।

তাই বলা যায় প্রাচীন গোপভূম অঞ্চলে অতি প্রাচীন কাল থেকেই— অর্থাৎ সেই প্রাগৈতিহাসিক কালেব প্রস্তব যুগ থেকে শুরু করে নবোপলীয় যুগ, তাম্রশ্মীয যুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদি পাব হয়ে এখানেব প্রত্নক্ষেত্রগুলি সহ বিশেষ কবে মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্রে আবও যে সকল প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে তার নিরিখে বলা যায় এখানে ক্রমানুসারী সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল যা ঐতিহাসিক যুগকেও অতিক্রম করে "মৌর্য যুগ, শুঙ্গ যুগ, কুষানযুগ ও গুপ্ত যুগেব নিদর্শনাবলী সহ হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও মুসলমান আমলেব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। [১৬]

এতক্ষণ ধবে গোপভূমের বিস্তৃত এলাকায় সেই প্রাচীন কাল থেকে ক্রমানুসারী এক সভ্যতা যে গড়ে উঠেছিল তা এখানকাব বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত উল্লেখ্য বিভিন্ন প্রত্নদ্রব্যের মাধ্যমেই তা সুদৃঢভাবে প্রমাণিত হল। আব সেই প্রমাণিত সত্যতার প্রেক্ষিতে বলা যায যে, এই অজয দামোদরের অঞ্চল বা গোপভূম এলাকাও অতিপ্রাচীন কাল থেকেই স্বমহিমায় অবস্থিত বা বর্তমান ছিল। তা নাহলে সেই এলাকায় অধিবসতি বা সভ্যতা গড়ে ওঠে কি করে? তাই বলি সভ্যতা যখন সেই এলাকায গড়ে উঠেছে, তখন সেই প্রাচীন কাল থেকেই সেই এলাকার অবস্থানও বর্তমান ছিল। কাজেই একথা খুবই দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যে এই গোপভূমের অবস্থান অতিপ্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান ছিল— এই সত্য সুদৃঢ় ভাবেই প্রমাণিত।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে অজয়-দামোদর দোয়াব অঞ্চলের পূর্বে কোন নাম ছিল কিনা এবং গোপভূম নামে এই এলাকা কখন থেকে নামিত হল? তাব উত্তর আজ অনুসন্ধান কবা খুবই কঠিন, কারণ ইতিহাস বিমুখ বলে বাঙালী জাতির যে দুর্নাম রয়েছে তার অতলান্ত গভীরতা থেকে কোন অঞ্চলের স্থান নামের হদিস করা সেতো সমুদ্র জলে তৃষ্ণা নিবারণের মতই দুরূহ ব্যাপার তাতে সন্দেহ নাই। তবুও আনুসঙ্গিক সহায়ক তথ্য প্রমাণসহ বিভিন্ন লিপি প্রমাণকে পাথেয় করেই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। সে দিক থেকে এই অজয়-দামোদর দোয়াব অঞ্চল কখন থেকে কিভাবে গোপভূম নামে অভিহিত হল এবং গোপভূম হিসাবে সেটি কতদিনের প্রাচীন তা জানার জন্য পরবর্তী অধ্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

।। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকা ।।

১) বাঙালীর ইতিহাস — (আদি পর্ব) নীহার রঞ্জন রায়।.... পৃঃ-১০৯
২) ঐ ,
৩) বাংলাদেশের ইতিহাস — (১ম খণ্ড) ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।.... পৃঃ-৮
৪) শ্রমণ, জ্যৈষ্ঠ — ১৩৯৪ সাল।.... পৃঃ-৪১
৫) Ancient India. Vol.-14. B. B. Lal
৬) বিশ্বকোষ (১ম) সাক্ষরতা প্রকাশন।.... পৃঃ-২৮
৭) দুর্গাপুরের ইতিহাস — প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-১৮
৮) বাঙালীর ইতিহাস — (আদি পর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-৬১
৯) Ancient India. VOL.-14. B. B. Lal.
১০) The Excavations at Pandu Rajar Dhibi - P.C. Dasgupta. Page-46-48
১১) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১৪৬
১২) ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় — ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-৩৩
১৩) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১২১
১৪) ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় — ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-৩৯
১৫) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১২৭
১৬) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১৪৭

।। প্রত্নসমৃদ্ধ গোপভূম ।।

ভূমিকা ঃ— বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পূর্বে ছিল খুবই সীমিত। কারণ তা জানার উপায় দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের কাছে অজানাই ছিল। পরে নানান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য শুরু হওয়ায় প্রাচীন লুপ্ত ইতিহাস আজ ধীরে ধীরে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। ফলে অপার বিস্ময়ে মানুষ তাদের প্রাচীন বংশধরদের ক্রিয়াকলাপ ও তাদের অধিবসতি কেন্দ্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ইতিহাস আজ জানতে পারছে! তাই লুপ্ত ইতিহাসেব বহু গুপ্ত কাহিনী ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। সেদিক থেকে রাঢ় বঙ্গের অজয়-দামোদর দোয়াব অঞ্চলের গোপভূম যে বেশ প্রাচীন এলাকা, তার বহু প্রমাণ আজ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমেই জানা সম্ভব হয়েছে।

যদিও এই প্রাচীন এবং সুসভ্য বঙ্গদেশকে আর্যরা অধিগ্রহণ করার পর, তাদের হীন প্রতিপন্ন করার জন্যই একে অসভ্য ও হীন অনার্য জাতির দেশ বলে অভিহিত করেছিল এবং তীর্থ পরিভ্রমণ ছাড়া সেদেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দিয়েছিল। সেই আর্য নিন্দিত বাংলাদেশই যে— প্রাক-আর্য সুসভ্য দেশ ছিল তা আজ সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হয়েছে যে, তা আর্য সভ্যতার বহু পূর্ববর্তী এবং আর্যদের গ্রামকেন্দ্রিক কৃষি সভ্যতার তুলনায়, তারা নগরকেন্দ্রিক আরও উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ছিল।

সেই সুসভ্য সিন্ধু সভ্যতারও বহু পূর্ব থেকেই, রাঢ় বঙ্গের অজয়-দামোদর দোয়াবের প্রাচীন গোপভূমের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র, বিশেষ করে বীরভানপুরে প্রাপ্ত প্রস্তরায়ুধের নিদর্শনাদির দ্বারা ও অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে— এই এলাকায় সেই দশ হাজার বছর আগেকার প্রস্তর যুগ হতে শুরু করে, ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত অতিবাহিত বিভিন্ন সময়কালে ধারাবাহিকভাবে মানবগোষ্ঠী এই গোপভূম অঞ্চলে বসবাস করে আসছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পুরাতত্ত্ব সংস্থা কর্তৃক মোট ৭৬টি প্রত্নক্ষেত্র এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে— তার মধ্যে রাঢ় বঙ্গের বর্ধমান জেলাতেই রয়েছে ২১টি এবং এদের মধ্যে অজয়-দামোদর নদের মধ্যবর্তী গোপভূমেই রয়েছে সবথেকে উল্লেখ্য বেশ কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্র। এখন সেই প্রত্নক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল, তবে

প্রাচীনতার নিরিখে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল। সেদিক থেকে প্রাচীনতম প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল বীরভানপুরেই, তাই বীরভানপুরকে নিয়েই আলোচনার শুরু। পরে আসবে পান্ডুরাজার ঢিপি, মঙ্গলকোট ও আরও অপ্রধান প্রত্নক্ষেত্রগুলি।

বীরভানপুর ঃ— প্রাচীন গোপভূমের অন্তর্গত, বিধান রায়ের স্বপ্ন নগরী, শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়া যাবার পথে— রেল স্টেশন ও ব্যারেজের মধ্যবর্তী এক প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম বীরভানপুর। প্রাচীনকালে দামোদর নদীর তীরে শাল-পিয়ালের ঘন জঙ্গলে ঢাকা সবুজ পরিবেশে, প্রস্তর যুগের শেষ পর্বেই এখানে দেখা গিয়েছিল শিকারজীবী এক প্রাচীন মানবগোষ্ঠীকে। কম করেও সে আজ প্রায় ৬ হাজার বছর আগেকার কথা। তাদেরই ব্যবহৃত প্রচুর প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে এই বীরভানপুরের মাটির তলায়। গ্রামটি দুর্গাপুরের গায়েই দামোদরের উত্তরেই অবস্থিত। ভৌগোলিক পরিভাষায় বলা যায় এটি ২৩° ডিগ্রী ২৯' মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭° ডিগ্রী ১৯' মিনিট দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

উৎখননের ইতিহাস ঃ— বীরভানপুরের পাশের গ্রাম নডিহার অধিবাসী জমিদার বংশীয় মাননীয় অজিত কুমার মুখার্জী, দামোদর নদীর তীরবর্তী বীরভানপুরে হঠাৎই একটি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রস্তর আয়ুধ দেখতে পান। তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগে তার স্বরূপ জানার জন্য যোগাযোগ করলে, তৎকালীন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় সুপারিনটেনডেন্ট মাননীয় ননীগোপাল মজুমদার এই এলাকাটি ঘুরে দেখে আরও কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। এ কাহিনী স্বাধীনতার পূর্বের ঘটনা।

ইতিমধ্যে দামোদর নদী দিয়ে জল অনেক গড়িয়ে গেছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হলো। তখন "পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ" সেই ভীষণ ভয়াল, অপ্রতিরোধ্য দামোদর নদীকে শাসন করার মানসে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার আওতায় ১৯৫৪ খ্রীঃ দুর্গাপুর ব্যারেজ ও ক্যানেল খননের সময় এই বীরভানপুরেই সন্ধান পাওয়া যায় বেশ কিছু প্রস্তরায়ুধ। তখন ইতিহাসমনস্ক উৎসাহী সেই অজিতবাবুই আবার যোগাযোগ করলে, পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংযুক্ত মহানির্দেশক, অধ্যাপক ব্রজবাসী লাল এই গ্রাম পরিদর্শনে এসে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং কাজ শুরু করেন। সেটি হল ১৯৫৪ খ্রীঃ কথা। কিন্তু বদলীর জন্য তাকে দিল্লী যেতে হয় তাই কাজও বন্ধ হয়। পরে তিনি পুনরায় এখানের কর্মভার গ্রহণ করেন এবং তারই প্রচেষ্টায় ১৯৫৭ খ্রীঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ পর্যন্ত এখানে খননকাজ চলে। তার ফলেই মাটির নীচে চাপা পড়া প্রাগৈতিহাসিক

যুগের লুপ্ত ইতিহাস আজ মানুষের জানার সীমায় হাজির হয়েছে— যাকে ঐতিহাসিক পরিভাষায় নবপলীয যুগেব নবাশ্মীয় সভ্যতারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। (:) সেদিক থেকে এই প্রাচীন বীরভানপুর গ্রামটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি ঃ— উপর থেকে নীচ পর্যন্ত উৎখননের ফলে এখানে মোট পাঁচটি স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করা গেছে— সেগুলি হল—

১ম স্তর ঃ— শ্বেতাভ ও ক্ষয়প্রাপ্ত বালুকা প্রস্তরের স্তর।

২য় স্তর ঃ— ঈষৎ রক্তাভাযুক্ত প্রাচীন পলি গঠিত স্তর— যা আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাবে প্রস্তরে পরিবর্তিত রূপ।

৩য় স্তর ঃ— মাকড়া পাথরের গঠিত স্তর।

৪র্থ স্তর ঃ— রুক্ষ মোটা দানা সমন্বিত মৃত্তিকা, যেখানে ক্ষুদ্রাশ্মীয় নিদর্শনাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে।

৫ম স্তর ঃ-- হালকা বাদামী রং এর বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকা।

উল্লেখিত স্তরগুলির মধ্যে চতুর্থ স্তরেই প্রচুর পরিমাণে ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধগুলি পাওয়া গেছে। এই ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধগুলির সঙ্গে প্রচুর কুচি পাথরের টুকরাও পাওয়া গেছে— যা দেখে সংযুক্ত মহানির্দেশক অধ্যাপক ব্রজবাসীলাল অনুমান করেন যে, এখানে ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধের কারখানাও ছিল। তিনি তাঁর মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ "Ancient India", VOL-14 য় এখানে প্রাপ্ত প্রস্তর আয়ুধের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাও পেশ করেছেন। সেটি এখানে তুলে দেওয়া হল—

অস্ত্রের শ্রেণী বিভাগ	—	**প্রাপ্ত অস্ত্রের সংখ্যা**	—	**শতাংশের হিসাব**
(১) পাতলা ফলক	—	১০৬	—	৩৭.৫%
(২) অর্ধচন্দ্রাকৃতি আয়ুধ	—	৪২	—	১৪.৮%
(৩) তীক্ষ্ণধার আয়ুধ	—	৬০	—	২১.২%
(৪) ছিদ্র করার যন্ত্র	—	১৯	—	৬.৬%
(৫) খুঁদিবার যন্ত্র	—	১২	—	৪.২%
(৬) চাঁচিবার যন্ত্র	—	৪৩	—	১৫.৩%
মোট প্রাপ্ত হাতিয়ার	—	**২৮২**	—	**১০০%**

আবিষ্কৃত ঐ সকল অস্ত্রাদি ছাড়াও এখানে প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন আকারের কুঠারও আবিষ্কৃত হয়েছে।

উল্লেখিত আয়ুধগুলিকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন— ১ম ভাগের অস্ত্রগুলি পশুশিকারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত, আর ২য় ভাগের অস্ত্রগুলি কৃষির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত, বীরভানপুরে প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলি মুখ্যত মাটির এক মিটার গভীরে পাওয়া গেছে। হাতিয়ার চার্ট (chart), কোয়ার্টজ (quartz), কৃষ্ট্যাল (crystal)

বা দানা পাথরে তৈরী। এগুলি হল দুর্গাপুর অঞ্চলে এই যাবৎ প্রাপ্ত আদিম মানুষের হাতে গড়া প্রাচীনতম নিদর্শন। গবেষকদের ধারণা এগুলি ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ খ্রীষ্টপূর্ব যুগের তৈরী। (২)

এখানে আবিষ্কৃত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে কোথাও কোন মৃৎপাত্রের কৌলাল আবিষ্কৃত হয়নি। আলোচ্য প্রত্নক্ষেত্রে পোড়ামাটির তৈরী কোন দ্রব্য বা সংশ্লিষ্ট কোন নিদর্শনাবলীর সন্ধান না পাওয়ায় এগুলিকে প্রাক্ পোড়ামাটিযুগের (prepottery age) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। (৩)

এই বীরভানপুর অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তেমনি এখানে প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন আকৃতির মসৃণ কুঠারও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ধরণের কুঠার বীরভানপুর ছাড়াও রাঢ় বঙ্গের অনেক স্থানেই পাওয়া গেছে। এই বীরভানপুরেই "নবাশ্মীয় পর্বের সমভূমিতে গোচর হয়েছে কয়েকটি গর্ত ঃ গর্তগুলি যে বাঁশের বা কাঠের বা পাথরের খুঁটির তা সহজেই অনুমেয়। এ অনুমানেও বাধা নেই যে, খুঁটির উপর একটি চালাও ছিল।" (৪)

প্রত্নভূমিতে আবিষ্কৃত সভ্যতার স্থিতিকাল ঃ— পন্ডিতগণের মতে এই সভ্যতার সময়কাল যা হবার কথা তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই যে একই নিয়মে মানব জাতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তা মনে করার কোন কারণ নাই। তাই রাঢ় বঙ্গের প্রাচীন নদী দামোদরের তীরবর্তী নবপলীয় যুগের প্রবক্তাগণ যে আজ থেকে অন্ততঃ ৬ হাজার বছর আগে অধিবসতি গড়ে তুলেছিল তা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বীরভানপুরে আবিষ্কৃত সভ্যতার পর্যালোচনা ঃ— বীরভানপুরে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি প্রমাণ করে যে বঙ্গে একমাত্র এখানেই প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের প্রান্তসীমায় এক অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। প্রান্তসীমা বলার কারণ হল প্রস্তর যুগকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন প্রত্ন প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ। এই নব্য প্রস্তর যুগেই মানুষ আপন প্রচেষ্টায় পাথর থেকে প্রয়োজনীয় তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করে শত্রু বা হিংস্র জীবজন্তু নিধনে ব্যবহার করত। এই যুগের শেষের দিকের অধিবসতিই এখানে গড়ে উঠেছিল কারণ এখানে আবিষ্কৃত প্রস্তরায়ুধগুলি সবই তীক্ষ্ণধার ছিল। এই যুগের সময়কাল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে হলেও আমাদের দেশে বিশেষ করে এই এলাকায় তা সংগঠিত হয়েছিল— হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার বেশ কিছু আগেই। এখানকার অধিবসতির ক্রিয়াকলাপ দেখে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা হয়েছে যে, তারা মূলত ছিল পশুশিকারী। দীর্ঘ আর্দ্রকালের অবসানের পর হেলোসিন পর্বের শেষের দিকে অনুকূল পরিবেশে

নদীতীরবর্তী গহন অরণ্য মধ্যে বিচরণশীল অরণ্যচারী জীবজন্তু ছিল তাদের জীবনধারণের প্রধান সম্বল। অর্থাৎ তারা হয়ে উঠেছিল পশুশিকারী। তার কারণ হিসাবে বলা যায় কোন এক সময়ে যুগ বিপ্লবের প্রভাবে নিরামিষাশী আদিম মানবকে মাংসাশী হতে হয়েছিল, অথচ ভগবানের সৃষ্টি প্রকরণ প্রক্রিয়ায় তারা তো তীক্ষ্ণধার নখদন্তধারী ছিল না তাই বাধ্য হয়েই তাদের পশু শিকার ও শত্রু নিধনের জন্যই তীক্ষ্ণধার প্রস্তর আয়ুধ তৈরী করতে হয়েছিল এবং তা দিয়েই তারা বনের হিংস্র জন্তুকে সহজেই পরাভূত করে পৃথিবীকে মানবের বাসযোগ্য করে তুলেছিল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাদেরই কোন গোষ্ঠী দামোদর নদী বিধৌত পেলব বঙ্গের এই অরণ্যাবৃত মনোরম অঞ্চলেই প্রকৃতির প্রভাবে শিকারী জীবনে রপ্ত হয়ে প্রাচীন মানব গোষ্ঠীর এক শাখা— এতদ অঞ্চলে প্রস্তর যুগের শেষ পর্বেও বর্তমান ছিল। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক প্রমাণে ও তাদের নির্মিত প্রস্তরায়ুধের গঠন প্রকৃতিতে এটাই প্রমাণ হয়।

ধীরে ধীরে বঙ্গের এই স্নিগ্ধ ও পেলব প্রকৃতি তাদের প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনেছিল ফলে তারা শিকারের পিছনে পিছনে ধাবিত যাযাবর জীবন ত্যাগ করে অধিবসতি গড়ে তোলার দিকেই আকৃষ্ট হতে শুরু করল। এখানে আবিষ্কৃত খুঁটিপোঁতার গর্ত ও চালার সন্ধানই প্রমাণ করে যে তারা যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসতির দিকে ঝুঁকতে থাকে এবং বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে এবং কৃষির প্রতিও তারা ঝুঁকতে থাকে, ফলে তাদের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন সূচীত হয়। পরবর্তীকালে এই রাঢ় বঙ্গে একই নদীর সমতীরে ভরতপুরে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার (খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর পূর্বে সৃষ্ট) যে সন্ধান মেলে, বিশেষজ্ঞদের মতে সেই সভ্যতার উদগাথারাই ছিল এই বীরভানপুরের প্রস্তর যুগীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ।

—ঃ পাণ্ডুরাজার ঢিবি ঃ—

অবস্থান ও নামকরণ ঃ— অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে আউশগ্রাম ১ নং ব্লকের অধীন পরিপূর্ণ গোপভূমের এলাকায় এর অবস্থান। লুপ লাইনের ভেদিয়া রেল স্টেশন হতে ৮ মাইল পশ্চিমে পূবর, পাণ্ডুক ও দীননাথপুর গ্রাম তিনটির সংলগ্ন এবং ঐ তিন গ্রামের স্মৃতি বাহক পূবর, পাণ্ডুক, দীননাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ব দিকে এক বিস্তৃত উচু ডাঙ্গায় এই ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্রটি বর্তমান। এটি এখন পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা আছে। ভৌগোলিক পরিভাষায় বলা যায় এটি ২৩° ডিগ্রী ৩৫' মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭° ডিগ্রী ৩৯' মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

এর নামকরণ ও প্রাচীন পবিচিতি প্রসঙ্গে বলা যায়— "পারিবারিক কলহে ক্লান্ত ক্ষুব্ধ পাণ্ডু শাক্য একদিন কপিলাবস্তু ত্যাগ করেন। রাঢ় বাংলার মধ্যস্থল হুগলীর পাণ্ডুয়া হল তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী। পাণ্ডুয়া হতে অজয় তীরের পাণ্ডুক পর্যন্ত ছিল

তাঁর রাজ্যসীমা। পান্ডুরাজার বাড়ীর ধ্বংস স্তূপই হল পান্ডুরাজার ঢিবি, নিকটবর্তী পান্ডুক গ্রাম অতীতের পান্ডুকের অবক্ষয়িত রূপান্তর। (৫) সে মতে এটি পান্ডুরাজার রাজ্যপাট— যা অবলুপ্ত হয়ে বর্তমানে পান্ডুরাজার ঢিবি নামে পরিচিত হয়েছে। দ্বিতীয় মতে এটি মহাভারতের বিখ্যাত রাজা পান্ডুর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে, কারণ আমাদের দেশের অনেক জায়গার নামকরণ রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক বীর বা আদর্শ পুরুষের নামানুসারেই হয়ে থাকে। সেদিক থেকে মহাভারত প্রসিদ্ধ পান্ডুরাজার নামেই এই স্থানটির নামকরণ হওয়াই স্বাভাবিক। তৃতীয় আর এক মতে দেখা যায়— এই ঢিবির খনন কার্যের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যতম আধীক্ষক তথা ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধানের গবেষক ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন যে, এই পান্ডুরাজা হল শ্রীধর ভট্টের পৃষ্ঠপোষক রাজা পান্ডুদাস— যিনি ৯৯১ খ্রীঃ বর্তমান ছিলেন। সেই রাজা পান্ডুদাসের নাম অনুসারেই এই স্থান পান্ডুরাজার ঢিবি নামে পরিচিত হয়েছে। (৬)

সে যাই হোক নামকরণ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও স্থানীয় সাধারণের বিশ্বাস এটি ছিল কোন পান্ডুরাজার রাজ্যপাট— তা সে পান্ডু শাক্যই হোক কিংবা পান্ডু দাসই হোক, পরে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পান্ডুরাজার ঢিবিতে পরিণত হয়েছে এবং এর একটু পশ্চিমে গোস্বামীখন্ড মল্লিকপুর মৌজায় বারাসতের ডাঙ্গায় উক্ত রাজার ধর্ম্মাধিকরণ এবং সৈন্যাবাস ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। পান্ডুরাজার এই ঢিবিকে স্থানীয়ভাবে রাজাপোতার ডাঙ্গাও বলা হয়। এই ডাঙ্গায় সর্বত্রই পাতলা অথচ আকারে বড় প্রাচীন ইটের ছড়াছড়ি।

প্রত্নস্থল খননের পূর্ব ইতিহাস ঃ— ইট পাথরের বিশাল স্তূপ মাথায় নিয়ে উদ্ধত রাজাপোতার ডাঙ্গা— এ অঞ্চলের জনমানসের বিস্ময় দৃষ্টি গায়ে মেখে স্বমহিমায় অবস্থিত। কি আছে এর ভিতর জানার আগ্রহ সকলের কিন্তু কে দেবে তার উত্তর? এইভাবেই দিন চলতে থাকায় হঠাৎ ১৩১৮ সনের ৩০শে জৈষ্ঠের বন্যায় প্লাবিত হয় এই পান্ডুরাজার ঢিবির কিয়দংশ। বন্যা সরে যাবার পর তার ক্ষয় ক্রিয়ার ফলেই এখানে পাওয়া যায় কিছু মৃৎপাত্র ও তাম্রাশ্মীয় যুগের নিদর্শনাদি সহ বেশ কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা— যা মানুষের মনে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে এর প্রকৃত স্বরূপ জানার জন্য। তার ফলেই এই অঞ্চলের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা এগিয়ে আসেন এর স্বরূপ উদ্ঘাটন প্রচেষ্টায়। এ বিষয়ে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব হলেন গোস্বামী খন্ডের বাসিন্দা, অধ্যক্ষ চন্ডীকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই প্রচেষ্টায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো ডঃ পঞ্চানন মন্ডল ব্যাপারটি অবহিত হয়ে স্থানটি পরিদর্শন করেন এবং বেশ কিছু নিদর্শনাদি নিয়ে এ সম্পর্কে জানার জন্য প্রচেষ্টা

চালিয়ে যায়। তার ফলে ১৯৬১ খ্রীঃ এই প্রত্নক্ষেত্রটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নবিভাগ কর্তৃক অধিগ্রহণের ব্যবস্থা হয়। এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় এখানে ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ খ্রীঃ মধ্যে ৪ বারে ৪টি স্তরে খনন কার্য শুরু হয়। (৭) পরে আরও প্রয়োজনে ১৯৮৫ খ্রীঃ আর একবার খননকাজ চলে। আর ঐ সকল খনন কার্যের ফলেই এই পান্ডুরাজার ঢিবির গভীরে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি পাওয়া গেছে, তারই নিরিখে প্রমাণ হয়েছে যে, এ অঞ্চল আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর থেকে ৩৫০০ বছরের এক সভ্যতার পীঠস্থান ছিল।

খনন কার্য ও ফলাফল ঃ— ১৯৬১ খ্রীঃ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীক্ষক দেবকুমার চক্রবর্তী ও শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রাপ্ত কিছু নিদর্শন নিয়ে তদানীন্তন অধিকর্তা পরেশ দাসগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন দাসগুপ্তও এই স্থান ঘুরে গিয়ে এখান থেকে পাওয়া কিছু কোশী পাত্র, ধূসর মৃৎপাত্র ইত্যাদি নিদর্শন নিয়ে উপরে যোগাযোগ করলে, বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ হাসমুখ ধীরাজলাল সাঙ্কালিয়া সহ বি. বি. লাল, ডঃ ওয়াই ডি শর্মা প্রমুখ বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদগণ পান্ডুরাজার ঢিবি পরিদর্শন করেছিলেন। (৮) তার পরেই এখানে খনন কার্যের উদ্যোগ নেওয়া হয়। আলোচ্য প্রত্নক্ষেত্রটির বিস্তার হিসাবে বলা যায় এটি পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ২০০ মিটার আর উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থে ১৭০ মিঃ হলেও চতুর্দিকে এটি আরও বিস্তৃত ছিল কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণে রাস্তা, উত্তরে জমি, পশ্চিমে স্কুল ইত্যাদির জন্য এর ক্ষেত্র সীমা কিছুটা সঙ্কুচিত হয়েছে। দক্ষিণে পাকা রাস্তা থেকে এই ঢিবির উচ্চতা বর্তমানে প্রায় ৫ মিটার। (৯)

প্রথম স্তরে খনন ও প্রাপ্ত প্রত্নাবলী সহ পর্যালোচনা ঃ— ১৯৬২ খ্রীঃ বসন্তকালেই এখানে খনন কার্য শুরু হয়। প্রথম স্তরটি ঢিবির সর্বোচ্চ অংশ থেকে ১৫ ফুট গভীরে সংঘটিত হয়েছিল। এই স্তরে মাকড়ার দানা মিশ্রিত রক্তাভ মৃত্তিকার উত্তর পাশে একটি নদী প্রবাহের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল— যা অজয় নদীর প্রবাহকেই স্মরণ করায়। এই মাকড়া স্তরের রক্তাভ ভূমিতেই প্রথম তাম্রযুগের অধিবসতি স্থাপিত হয়। (১০) যার বয়সকাল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের প্রাচীন।

প্রথম স্তরে খনন কার্যের দ্বারা প্রাপ্ত নিদর্শনাদিতে— এই স্তরে যে অধিবসতি গড়ে উঠেছিল তাদের কৃষ্টি ও জীবন যাত্রা প্রণালী সম্পর্কে যা জানা যায় তা হল— (i) এরা হাতে তৈরী মৃৎপাত্রের ব্যবহার জানত, তাই এরা তাদের প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র হাতেই তৈরী করে পুড়িয়ে নিত। "এই অর্দ্ধদগ্ধ এবং কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকার সহিত ধান্যের খোসা মিশ্রিত করিয়া নির্মিত হইত।" (১১) এখানকার প্রথম বসতি স্তরে আবিষ্কৃত তুঁষ মেশান মৃৎপাত্রগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গের

তৎকালীন কৃষি বিভাগীয় অধিকর্তা মাননীয় অনিল কুমার পাল সিদ্ধান্ত করেন যে মৃৎপাত্রের সঙ্গে মিশ্রিত তুষগুলি উৎপাদিত ধান হতেই পাওয়া। তাই বিশেষজ্ঞরা একমত হয়ে স্বীকার করেন যে দুই হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পান্ডুরাজার ঢিবির আদি বাসিন্দারা ধান উৎপাদন করতে জানত এবং অজয় ইত্যাদি নদ-নদী কেন্দ্রে উৎপন্ন ধানই চীন দেশে দু'হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে প্রেরিত হয়ে সেখানকার আদিম বাসিন্দাদের প্রধান খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। [১২]

এতে অনুমিত হয় যে খ্রীঃ পূর্ব প্রায় ২০০০ শতকের কাছাকাছি সময়ে জোয়ারের বিকল্প খাদ্য হিসাবে ধান চাষের পদ্ধতি এখানেও চালু ছিল। এই পর্বেই তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন মৃৎপাত্রের মধ্যে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র, খয়েরী ও লোহিতোজ্জ্বল মৃৎপাত্র, অভ্রমিশ্রিত বালি মৃত্তিকার তৈরী মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। তাছাড়াও সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য মৃৎপাত্র যা এখানে পাওয়া গেছে— তা হল থালার ভগ্ন অংশ যা পিলসুজের মত ফাঁপা নলের উপর অবস্থিত। এ ধরণের মৃৎপাত্র Dish on Stand যা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতেও আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় এখানকার অধিবসতি হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার, এমনকি দূরবর্তী দেশগুলির মধ্যে ইরাক ও পূর্ব ভূমধ্যসাগর এলাকায় কয়েক হাজার বছর পূর্বের সভ্যতারও সমসাময়িক ছিল।

(ii) এই প্রথম স্তরেই বেশ কয়েকটি সমাধিতে ৬টি মুন্ডহীন শব কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এদের দেহগুলি সবই পূর্ব থেকে পশ্চিমে শায়িত আর সেগুলি পাওয়া গেছে লালচে দানা ও ছোপ সম্বলিত বালুকা প্রস্তরেব উপর। [১৩] উক্ত নর কঙ্কালগুলির উপরের অংশ পাওয়া য্যায় নি এবং তা ভগ্ন ও বিকৃত হওয়ায় তারা কোন্ আদিম নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

এই স্তরের বালুকারাশির অবস্থান দেখে এটাই মনে হয় যে, অজয়ের প্রবল বন্যাই এই অধিবসতির পরিপূর্ণ ধ্বংসের কারণ। ধ্বংসের পর ঐ এলাকা দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। বহু পরে সেখানে আবার অধিবসতি গড়ে উঠেছিল।

প্রথম স্তরের অধিবসতির স্থিতিকাল ঃ— পান্ডুরাজার ঢিবিতে আবিষ্কৃত ১ম স্তরের নিদর্শনাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাধ্যমে পন্ডিত মহলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এখানকার সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকের সময়কালেও বর্তমান ছিল। তাই একে আদিযুগ বলাই সঙ্গত। এ সভ্যতা আজ থেকে ৩,৫০০ বছরের অধিক প্রাচীন। এ প্রসঙ্গে পুরাতত্ত্ববিদ কৃষ্ণস্বামীর অভিমত হ'ল প্রাগৈতিহাসিক বাংলায় এই সভ্যতার উত্থান হয়েছিল আরও পূর্বে, যা আজ থেকে ৪ হাজার বছর পূর্বে। সেদিক থেকে পান্ডুরাজার ঢিবির প্রথম পর্বটি সম্ভবত ধাতুপূর্ব যুগের (Pre-metallic-stage) কৃষ্টি আর তখনই পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রথম মনুষ্যবসতি স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় স্তরের খনন ঃ— পাণ্ডুরাজার ঢিবির অন্তর্নিহিত আরও ব্যাপক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ১৯৬৩ খ্রীঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী শুরু হয় এর ২য় স্তরে উৎখনন। এই শুভ কার্য উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী মাননীয় খগেন্দ্রনাথ দাস। আর খনন কার্যকে পরিচালনা করেন তদানীন্তন অধিকর্তা প্রখ্যাত প্রত্নবিদ মাননীয় পরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত।

প্রাপ্ত প্রত্নাবলী ঃ— এই স্তরে খনন কার্য শুরু হয়েছিল ৫×৫ মিঃ মাপের মোট ১৬টি ট্রেঞ্চ কেটে— যা কেন্দ্রমূলের পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল এবং এই খননে মোট ৪টি পর্ব লক্ষিত হয়। মোট ৪টি পর্ব মিলিয়ে এই ২য় স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে কি কি পাওয়া গিয়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এই খনন কার্যের অন্যতম অধীক্ষক ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকেই দেখা যাক—

১ম পর্বে পূর্বের মতই ধূসর ও হাল্কা লাল রঙের স্থূল ধরণের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যা হাতে তৈরী। মাটির সঙ্গে তুষ মেশান মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এই পর্বে পাওয়া গেছে ১টি নরকঙ্কাল যা পূর্বদিকে মাথা করে শায়িত।

২য় পর্বে পাওয়া গেছে চিত্রিত ও অচিত্রিত লাল-কালো রঙের মৃৎপাত্র (যা-চাকে তৈরী), পাথরের অল্প ক্ষুদ্রাস্ত্র, পিন্ড (Core) ও শল্ক (Flake), হাড়ের জিনিষ, তামার অল্প দ্রব্য যেমন— বালা, আংটি, নব্য প্রস্তর যুগের কুঠার ও পাথরের পুঁতি পাওয়া গেছে। মৃৎপাত্রের মধ্যে বাটি, হাঁড়ি, সরা, ডিস ও নালিযুক্ত সরা ও বাটি। বিভিন্ন ধরণের মানব সমাধি যেমন— মৃতদেহ সম্পূর্ণভাবে মাটিতে শায়িত করে সমাধি, মৃতদেহের অংশবিশেষ রেখে বাকী স্থানান্তরিত বা পুনঃপ্রথিত করে সমাধি, মৃতদেহের হাড়ের অংশ, কুম্ভ বা হাঁড়িতে রেখে সমাধি বা কুম্ভ সমাধি ইত্যাদি।

৩য় পর্বের বস্তু সমূহের মধ্যে রয়েছে লাল রঙের, চকলেট রঙের ও লাল-কালো রঙের চিত্রিত ও অচিত্রিত মৃৎপাত্র, উজ্জ্বল কালো রঙের চিত্রিত মৃৎপাত্র ও স্বল্পোজ্জ্বল কালো রঙের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যার গায়ে মাছ ধরার জাল, পাতা বা অন্য কোন জিনিষের চিত্র খোদিত আছে। তাছাড়া মসৃণ নব্য প্রস্তর কুঠার, ক্ষুদ্রাকার পাথরের আয়ুধ, তামার বালা, আংটি, হাড়ের হাতিয়ার, হাতির দাঁতের চিরুনি, পোড়ামাটির মাতৃকা মূর্তি, পাথরের ও পোড়ামাটির পুঁতি ও বর্শাফলক ও তীরের ফলা ইত্যাদি লোহার জিনিষ— এছাড়াও এ পর্বের উল্লেখ্য পুরাবস্তু হ'ল—ঃ লাল-কালো রঙের অভগ্ন চিত্রিত সনালি মৃৎপাত্র— যা এই প্রত্নক্ষেত্রে আর ২য় পাওয়া যায় নি।

৪র্থ পর্বে রয়েছে ঐতিহাসিক যুগের লাল কালো ধূসর রঙের সাধারণ মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির ডিস, কাপ ও ভৃঙ্গার (sprinkler), পোড়া মাটির মূর্তি ও পাথরের এবং পোড়ামাটির পুঁতি। এ পর্বে ঘরবাড়ির নিদর্শনের মধ্যে ১টি ইটের দেয়ালের ভগ্নাবশেষ ও ৯টি চুল্লি উল্লেখযোগ্য। [১৪]

প্রাপ্ত প্রত্নাবলীর পর্যালোচনা ঃ— এখানে পাওয়া প্রত্নসামগ্রীর নিরিখে বলা যায় যে, এই স্তরে মানুষেরা ধাতব দ্রব্য আবিষ্কারের পূর্বে তাদের প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র এই পেলব বঙ্গদেশে পাথর অপেক্ষা সহজলভ্য মাটি দিয়েই হাতে বা ছাঁচে তৈরী করে নিয়ে তা আগুনে পুড়িয়ে শক্তপোক্ত করে ব্যবহার করত। তবে এই কাজে তাদের নির্মাণ দক্ষতা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় আবিষ্কৃত তথ্যাদির দ্বারাই, কারণ মাটি দিয়েই তারা পারিপার্শ্বিক জগতের দৃশ্যাবলী খোদাই করে এবং তা আগুনে পুড়িয়ে টেরা কোটা আর্টেরও সৃষ্টি করেছিল। প্রমাণ হিসাবে অনেক মৃৎপাত্রে ছাপওয়ালা পোড়ামাটির কাজ সহ এক মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যার গায়ে উড়ন্ত পক্ষীর চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। এই স্তরের মানুষের মাটি দিয়েই হাতে তৈরী ইঁটকে রোদে শুকিয়ে পরে তা কাঠের আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিয়ে ঘর তৈরীর কাজও করেছে।

মৃৎ দ্রব্যের পর এই স্তরে মানুষেরা ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ার ও তাম্রনির্মিত দ্রব্যের ব্যবহার রপ্ত করেছিল। প্রমাণ হিসাবে এখানে পাওয়া গেছে তাম্র নির্মিত অলংকার- চুড়ি, আংটি, কাজল কাঠি, কর্ণাভরন ও মাছ ধরার বঁড়শী ও বর্শা ফলক। এছাড়া পাওয়া গেছে হাড়ের তৈরী বর্শা, হারপুন, সচ্ছিদ্র জলহস্তির দাঁতের তৈরী মাদুলি। এখানে আরও পাওয়া গেছে শিমুল তুলার তৈরী সরু সুতায় বোনা কাপড়ের টুকরাংশ আর পোড়া মাটির তকলি পাওয়ায় এটাই প্রমাণ করা সহজ হয় যে, তারা বয়ন শিল্পেও দক্ষ ছিল আর নিজেদের পোষাক সম্ভবত তারা নিজেরাই তৈরী করে পড়ত।

এই ২য় স্তরের অধিবসতি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বন্য জন্তু সহ গৃহ জন্তুর কঙ্কালের অস্তিত্ব যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, হরিণ ইত্যাদি জন্তুর অস্থি আবিষ্কৃত হওয়ায় এটাই মনে হয় যে, তারা পশুপালনেও অভ্যস্ত ছিল। এই কালেই তারা যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসতি স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিল— এটা কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। এই অধিবসতি অঞ্চলে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য যেমন— খুঁটির গর্ত, বাঁশ ও কাঠের টুকরোর চিহ্ন প্রমাণ করে যে তারা ঐ সকল প্রকরণ দিয়ে মাটির তৈরী গৃহ নির্মাণে অভ্যস্ত ছিল। তাদের ব্যবহৃত গৃহগুলি গোলাকার এবং চতুষ্কোণ ছিল। ছাউনি হিসাবে তারা পাতার ব্যবহার করত।

এখানেও প্রথম পর্বের মত মুন্ডহীন না হলেও নয়টি মানব সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে একই স্থানে তিনটি পূর্ণ বয়স্ক ও দুটি শিশুর কঙ্কাল পাওয়া গেছে— যাদের পায়ের দিকের অংশ কাটা ছিল। কিন্তু কেন? তার কারণ এখনও অজ্ঞাত। তবে এই ধরনের সমাধি ভারতবর্ষের অন্যত্র এবং পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও আবিষ্কৃত হয়েছে।

ধ্বংসের কারণ ঃ— এখান থেকে ১৫/১৬ কিঃমিঃ উত্তরে বোলপুরের সন্নিকটে কোপাই নদীর তীরে মহিষদলে অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং সেখানেও এখানকার মতই পোড়াচালের চিহ্ন আবিষ্কৃত হওয়ায় এই অধিবসতি বিনষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে পন্ডিতগণ মনে করেন যে— একই অঞ্চলে দুটি সভ্যতাকেন্দ্র কোন বহিঃশত্রু আক্রমণে অগ্নিকান্ডে বিনষ্ট হয়েছিল।

স্থিতিকাল ঃ— যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ শ্যামদাস চট্টোপাধ্যায় এখানকার একখন্ড পোড়া কাঠ কয়লাকে তেজস্ক্রিয় (Radia-carbon) অঙ্গার পরীক্ষায় প্রমাণ করেছেন যে— এই পর্যায়ের অধিবসতির স্থিতিকাল খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী। এ বিষয়ে আরও বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে ঐ সময় কালকেই এই সভ্যতার স্থিতিকাল হিসাবে পন্ডিতগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। সেদিক থেকে এই পর্বকে পরিপূর্ণ তাম্রাশ্মীয় যুগ বলা যায়।

তৃতীয় স্তরের খনন ঃ— খ্রীষ্ট পূর্ব এক হাজার বছর বা তারও কিছু আগের তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতার স্মৃতি চিহ্ন বুকে নিয়ে এই প্রত্নক্ষেত্রের তৃতীয় স্তরের অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। এই স্তরে পাওয়া প্রত্নবস্তুগুলি ২য় স্তরের প্রত্নবস্তুর অনুরূপ হলেও এর সময়কাল আরও পরবর্তী হওয়ায় প্রত্নবস্তুসমূহের গুণগত পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্যণীয়।

এই স্তরে খনন কার্য শুরু হয় ১৯৬৪ খ্রীঃ ঢিবির সর্বোচ্চ অংশের উত্তর ঢালে মোট ১২টি (৫×৫ মিঃ মাপের) ট্রেঞ্চে। এই খনন কার্যও ৪টি পর্বেই সমাধা হয়েছিল। ১ম পর্বে পূর্বের মতই হাল্কা, লাল, ধূসর মৃৎ পাত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ২য় পর্বে আগের বছরের মতই তাম্রপ্রস্তর যুগীয় উন্নত সংস্কৃতির নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে। মৃৎ পাত্রের উপর লাল কালো সাদা রং এর জ্যামিতিক চিত্রণ নিদর্শন যেমন ত্রিভূজের সারি, অনুভূমিক বা উল্লম্ব রেখা, Sigma-র মতো চিহ্ন আকৃতির অলংকরণ ও তারা মাছের অনুকৃতি ইত্যাদি। তৃতীয় পর্বেই লৌহ আয়ুধের প্রবর্তন দেখা যায়। এতে পূর্বের মত কিছু পাথরের ক্ষুদ্রাকৃতি অস্ত্র, তামার দ্রব্য, হাড়ের হাতিয়ার ও পোড়ামাটির সীলমোহর, ২টি পোড়ামাটির ফাঁপা মার্তৃকা মুন্ড— যার একটির মাথায় উপরে ত্রিপত্রাকৃতি অলংকরণ, অন্যটির উপরে সুক্ষ্মাগ্র শিরস্ত্রান। ৪র্থ পর্বে আদি ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন দেখা যায়— তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বড় সড় আকারের মৃৎ পাত্র যেমন, জল বা শস্য রাখার পাত্র বা জালা, পোড়া মাটির হাতল যুক্ত চেটালো পাত্র, ছাই-গাদা (ash-pit) একটি নব্য প্রস্তর যুগের কুঠার ও একটি তামার সূর্মাদন্ড। এই পর্বের শেষে পান্ডুরাজার ঢিবিতে মানুষের বসবাস বন্ধ হয়ে যায়। [১৫]

এই স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে সবথেকে উল্লেখ্য হল এক সারি চুনের প্রলেপ দেওয়া উনান ও তার মধ্যস্থিত ভস্ম ও অগ্নিখন্ড। এটি পাওয়া গিয়েছিল এই ঢিবির সর্বোচ্চ চূড়ার ঢালু অংশে। এখানে উল্লেখ্য এই ধরনের সুবিন্যস্ত উনান মধ্যপ্রদেশের নাভদাতোলীতেও আবিষ্কৃত হয়েছিল। (১৬)

এছাড়াও এখানে পাওয়া যায় ২য় স্তরের ন্যায় বহু পোড়ামাটির লাল কালো রংয়ের মৃৎপাত্র কিন্তু সেগুলি ২য় স্তরের থেকে নির্মাণ কৌশলে বেশ উন্নত মানের। যেমন এখানেই পাওয়া গেছে বহু ছিদ্রযুক্ত মৃৎ পাত্র সহস্রধারা, উর্বরতার প্রতীক স্বরূপা এক পোড়া মাটির মার্তৃমূর্তি, বহু বর্ণে চিত্রিত নলযুক্ত জলপাত্র। এছাড়াও উন্নত মানের কারুকার্য সম্বলিত বিভিন্ন জীব জন্তুর প্রতিকৃতি যেমন— ঝুঁটি সহ ষাড়, শুয়োর, মোরগ, মহিষ, সম্বর, হরিণ, এবং মস্তক বিহীন দীর্ঘকণ্ঠ পক্ষী যা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (পঃবঃ) এর তৎকালীন অধিকর্তা পরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের মতে ময়ূর। (১৭)

এখন এখানে প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শনগুলির মধ্যে পশুর হাড় ও শিং এর তৈরী কারু যন্ত্র সূঁচ ও তুরপুন জাতীয় যন্ত্রগুলির সাহায্যে কোন জিনিষে ছিদ্র করা, আঁচড় কাটা এবং আঁচড় কেটে চিত্রাঙ্কন বা লেখা, বিশেষ করে চিত্রলিপি (Hieroglypps) এবং প্রতীক চিত্রলিপি অংকন করা সম্ভব। (১৮)

পান্ডুরাজার ঢিবির তৃতীয় স্তরে পাওয়া কৃষ্ণ ও লোহিত রঙের মৃৎপাত্রগুলি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, কারণ সুদূর মিশর, গ্রীস, ক্রীট, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির ইরান এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মলয়, যাভা, বার্মা ইত্যাদির সংস্কৃতির সঙ্গে এখানকার সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য বর্তমান তাই স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এখানকার নদীমাতৃক আদিম অধিবাসীরা তাম্রাশ্মীয় যুগে নৌযানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিত। এবং তাদের সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে নিজ সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। (১৯)

এছাড়াও বিভিন্ন রত্ন প্রস্তর ও তামার তৈরী অন্যান্য অলংকারসহ কানের দুল ও গজদন্ত নির্মিত চিরুনী ইত্যাদি এই তৃতীয় স্তরে গড়ে ওঠা অধিবসতির তৎকালীন প্রসাধন প্রিয়তা ও উন্নত সংস্কৃতির পরিচায়ক। এই স্তরেই আবিষ্কৃত একটি গোলাকৃতি স্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত আংশিক ভগ্ন শীলমোহর যা বেশ উন্নত সংস্কৃতির পরিচায়ক (এ নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে)।

তৃতীয় স্তরের স্থিতিকাল ঃ— এই তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু বা নিদর্শনাদি লক্ষ্ণৌ এর বীরবল সাহানী ইনস্টিটিউট হতে কার্বন চতুর্দশ c-14 পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে এখানকার সভ্যতার স্থিতিকাল ছিল খ্রীষ্ট পূর্ব অষ্টম শতাব্দী। এই মত সর্বজন গ্রাহ্য হয়েছে।

চতুর্থ স্তরে খনন ঃ— এই স্তরে খনন কার্য শুরু হয়েছিল ১৯৬৫ খ্রীঃ এবং পূর্বাপর পরিচালন গোষ্ঠীর দ্বারাই সেই কাজ পরিচালিত হয়েছিল। এই পর্বে ঢিবির পশ্চিম দিকে ১৮টি ট্রেঞ্চ খনন করে পাঁচটি পর্বে এর খনন কার্য চলেছিল।

প্রথম পর্বেই এখানে মানব বসতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। জনগণ মোরাম মাটিতে চুন মিশিযে মেঝে করে কুঁড়ে ঘব তৈরী করত। এখানেও একটি মানব সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে তবে মৃতদেহের কোন মুন্ড নাই। এই পর্বে লাল কালো ধূসর রংঙের বহু মৃৎ পাত্রের হদিস পাওযা গেছে। ২য পর্বে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার প্রকাশ দেখা যায়। মৃৎ পাত্রে নানা ধরনের নক্সা দেখা গেছে। এখানেও ঘড়-বাড়ী তৈরীর বহু চিহ্ন পাওয়া গেছে। অধিকাংশই চালা ঘর ও পাতার ছাউনি ছিল।

তৃতীয় পর্বেও লাল কালো চিত্রিত ও অচিত্রিত বহু মৃৎ পাত্র পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে হাঁড়ি, কুঁজো, ফুলদানি, বাটি, ডিস এবং ১টি নব্য প্রস্তর কুঠাব, পাথরের ক্ষুদ্রাস্ত্র, তামার আংটি, বালা, পাথরের ও পোড়া মাটির পুঁতি, পোড়া মাটির মূর্তি, ডিম্বকার চুল্লি, একটি লোহার ভাঙা তরোয়াল, লোহার মল ও পাওয়া গেছে তাই অনুমান হয় এরা লোহা গালাবার কৌশল জানত। এই পর্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য পুরাবস্তু হল ১টি সোনার ভাঙা পিন, ১টি মটর দানা।

৪র্থ পর্বে আদি ঐতিহাসিক যুগের পুরাবস্তু যেমন বিভিন্ন ধরনের মৃৎ পাত্র, পাথরের ক্ষুদ্রাস্ত্র, পাথরের যাঁতা, খুব ছোট ও গোল সোনার মুদ্রা ও লোহার কিছু আয়ুধ, মাটির লাল রং এর দোয়াত, কিছু লৌহদ্রব্য যেমন— গজাল, কীলক, তীরের মুখ বা ফলা, তরোয়ালের অংশ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে।

৫ম পর্বে আদি মধ্যযুগীয় কিছু পুরাবস্তু পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত রত্নাবলীর নিরিখে চতুর্থ স্তরের পর্যালোচনা ঃ— এই পর্বে জল সঞ্চয় করার জন্য বড় জল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং গ্রীষ্মের দিনে জলকে ঠান্ডা রাখার জন্য জল পাত্রের তলায় নদীর বালি রাখার হদিস পাওয়া গেছে। মৃৎ পাত্রের গায়ে নানান নক্সা খোদিত দেখা গেছে তাতে মনে হয় তারা কাঁচা অবস্থায় সেই নক্সা তৈরী করে নিয়ে পরে তা পুড়িয়ে শক্ত করত। মৃৎ পাত্রের গায়ে নানান্ রং এর ব্যবহার করা হত, কারণ তা করার জন্য রং পাত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখানে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে একটি হাপর যুক্ত উনানও পাওয়া গেছে যা দেখে মনে করা খুবই সঙ্গত যে, ঐ উনান ধাতব দ্রব্য গলাবার কাজেই ব্যবহৃত হত। এতে বর্তমান কর্মকার সম্প্রদায় কর্তৃক ধাতব পদার্থ গলাতে যে উন্নত মানের হাপর যুক্ত উনান ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাও যে, সেই ধারার অনুবর্তী সেটাও অনুমান করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই খনন কার্যের তদানীন্তন অধিকর্তা পরেশ চন্দ্র

দাসগুপ্ত বলেছেন— "During the excavation of 1964 it was dicisively proved that iron was known and probably melted at this site." (২০)

চতুর্থ স্তরের স্থিতিকাল ঃ— এই স্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনাদির প্রেক্ষিতে পন্ডিতগণ মনে করেন যে, এই স্তরের অধিবসতিকাল ছিল খ্রীষ্ট পূর্ব অষ্টম শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ২য় শতক পর্যন্ত। অর্থাৎ এই সভ্যতার পরিব্যাপ্তিকাল আদি ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালে এখানে আরও খনন কার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে ঐ এলাকায় আরও পরবর্তী সভ্যতার নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, পরে তাও আলোচিত হবে।

পান্ডুরাজার ঢিবিতে শেষ খনন কার্য ঃ— ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত মোট ৪টি স্তরে এখানে খনন কার্য পরিচালিত হয়েছিল তাতে যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখন ঐ প্রত্নক্ষেত্র থেকে আরও তথ্যের তাগিদে পুনরায় ১৯৮৫ খ্রীঃ খনন কার্য শুরু হয়। এতে ঢিবির কেন্দ্রস্থলের কিছু দূরে ২টি ৪×৪ মিঃ মাপের ট্রেঞ্চ ও ঢিবির পশ্চিম ঢালে ১টি ৩×৩ মিঃ মাপের ট্রেঞ্চ কেটে খনন শুরু হয়। এই শেষ পর্যায়ের খনন কার্য পরিচালনা করেন তদানীন্তন অধীক্ষক ডঃ শ্যামচাঁদ মখোপাধ্যায় ও সহযোগিতা করেন অভিযান সহায়ক শ্রীসুধীন দে ও আরও অনেকে। এই ১৯৮৫ খ্রীঃ খনন কার্য মোট ৬টি পর্বে সংগঠিত হয়েছিল। এখন পর্বনুসারে নিম্নে তা আলোচিত হল।

প্রথম পর্ব ঃ— এই পর্বে পাওয়া প্রত্ন বস্তুর নিরিখে এই পর্বের স্থিতি কাল কার্বন চতুর্দশ (carbon — 14 or c — 14) পরীক্ষা যা আমেদাবাদের Physical Research laboratory অনুযায়ী ১২৯০ খ্রীঃ পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানির Kolu University অনুযায়ী ১০৪৫ খ্রীঃ পূর্ব। এই স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবু বলা যায় এতে উল্লেখ্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে জ্যামিতিক চিত্রণযুক্ত মৃৎ পাত্র— যা চাকে ঘোরান হয়েছিল। তা ছাড়াও রয়েছে পাথরের তৈরী যাঁতা, ফসিল উডের ও হাড়ের অস্ত্র সস্ত্র। সেদিক থেকে এই পর্বকে (pre-metallic) আদি যুগ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ— এই পর্বটি হল তাম্র প্রস্তর যুগ। এপর্বে নানা ধরনের ও নানা রঙের জ্যামিতিক চিত্রণ যুক্ত অচিত্রিত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তাছাড়া তামার দ্রব্য, হাড়ের হাতিয়ার, পাথরের পুঁতি, নোড়া, পোড়া মাটির পুঁতি সহ মাতৃকা মূর্তি। এ বিষয়েও আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের শেষের দিকে লোহার আয়ুধাদিও পাওয়া গেছে। এর সময়কাল হিসাবে আমেদাবাদের Physical Research Laboratory-র মতে এই পর্ব ১০৪০ খ্রীঃ পূর্ব থেকে ৯৭০ খ্রীঃ পূর্ব আর যাদবপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ের Prof. S.D. Chatterjee-র মতানুযায়ী এর সময়কাল ১১৩২ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৮৯২ খ্রীঃ পূর্ব।

তৃতীয় পর্ব ঃ— এটিও তাম্র প্রস্তর যুগ তবে ২য় পর্বের পরবর্তী সময়কাল। এই স্তর সম্পর্কেও পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের সময় বলতে খ্রীষ্ট পূর্ব অষ্টম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়কালকে বোঝান হয়েছে।

চতুর্থ পর্ব ঃ— এই পর্বে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে বলা যায় এতে হাড়ের অস্ত্র, লোহার অস্ত্রাদি, পাথর ও পোড়া মাটির পুঁতি উল্লেখ্য। এই পর্বের আনুমানিক সময়কাল ৫৯৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রী পূর্বাব্দ পর্যন্ত।

পঞ্চম পর্ব ঃ— এতে লাল, কালো ধূসর রঙের ও উজ্জ্বল কালো রঙের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল— বাটি, কাপ, নলযুক্ত পাত্র, হাতলযুক্ত কড়াই, তাছাড়াও হাড়ের তৈরী হাতিয়ার ও লোহার আয়ুধ, পোড়া মাটির মূর্তি ও পুঁতি। এই পর্বেই ১৯৬৮ খ্রীঃ পাওয়া গেছে রাজা কনিষ্কের একটি সুবর্ণ মুদ্রা। এই পর্বের আনুমানিক সময় কাল ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বে তেমন কোনো ভাল sample না পাওয়ায় তা কার্বন পরীক্ষা হয়নি।

ষষ্ঠ পর্ব ঃ— এতে আদি মধ্যযুগের লাল, কালো রঙের মৃৎ পাত্রের টুকরো পাওয়া গেছে। এই পর্বের সময় কাল আনুমানিক ৮০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই পর্বে পাল শিল্প রীতিতে নির্মিত বেশ কয়েকটি হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। এগুলি ঢিবির বর্তমান সীমানার বাইরে পূর্ব দিকে ইতস্তত পড়ে আছে। এই সব প্রত্নবস্তু নিয়ে ১৯৮৫ খ্রীঃ অধীক্ষক শ্যামচাঁদ মুখার্জ্জীর অধীন পান্ডুরাজার ঢিবির শেষ খনন পর্ব সমাধা হয়।

এতক্ষণ ঢিবির অভ্যন্তরে অবিস্থিত প্রত্নদ্রব্যের বিষয়ে আলোকপাত করা হল, এখন ঢিবির উপরের অংশে কি রয়েছে তা দেখা যাক। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— এই ঢিবির উপরের দিকে ধ্বংস প্রাপ্ত পোড়া ইটের স্থাপত্য কীর্তির যে সন্ধান পাওয়া গেছে তা উৎখননকারী পন্ডিতগণের মতে দশম একাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। এই স্থাপত্য কীর্তি হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ অথবা দুই ধর্মের মিলনে গঠিত কোন দেব স্থানও হতে পারে। এই ঢিবির ঈষৎ পূর্ব প্রান্তে উন্মুক্ত আকাশ তলে পবিত্র অশ্বত্থ মূলে শ্যাওড়াচ্ছাদিত অবস্থায় গোটা তিনেক বৃহৎ ভগ্ন মূর্তি এখনও পড়ে আছে। তার মধ্যে একটি হল কালো পাথরে নির্মিত বিরাট মূর্তি যার ওজন প্রায় ৮০ কেজির মত এবং উচ্চতায় ৫ ফুট এবং চওড়ায় ৩½ ফুট এর মত। মূর্তিটি দেখে মনে হয় এটি বিষ্ণু মুর্তির পাদ পীঠ; বিষ্ণুচরণের কিছু অংশ পীঠ শীর্ষে সংশ্লিষ্ট, নুপুর শোভিত বিষ্ণু পাদদ্বয় অপূর্ব কারু কার্য সমন্বিত একটি শতদল পদ্মের উপর স্থাপিত। [২১]

এই মূর্তির দুপাশের নিম্নাংশে ২টি মূর্তি দেখে মনে হয় এরা শ্রী ও পুষ্টি বা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। মূর্তির মুখের দিক বা উর্দ্ধ অংশ ভগ্ন হওয়ায় মূর্তির স্বরূপ চিনতে অসুবিধা হয়, উপরের দিকে লতাপাতার চালি। এটি হিন্দু মতে 'বারাহী চন্ডী' নামে খ্যাত হয়ে বর্ধমানের রাজাদের দেওয়া জমির অর্থে নিত্যপূজিতা। তাছাড়াও শারদীয়া মহানবমীতে খুবই ধূমধামে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে মহিষ বলি হত। জনশ্রুতি এই দেবীই নাকি পান্ডুরাজাদের গৃহ দেবতা ছিল।

এছাড়া আরও একটি বিরাট বিষ্ণুমূর্তি— প্রায় ৭ফুটের মত উঁচু ও তিন ফুটের মত চওড়া, তবে দ্বিখন্ডিত হয়ে নিম্ন অংশ এক অশ্বত্থ বৃক্ষে অভিলগ্ন। অপর উর্দ্ধ অংশ ঐ বৃক্ষ মূলের বিপরীত দিকে পড়ে আছে। পূজা অর্চনার অভাবে শেওলায় আচ্ছন্ন। আরও একটি বিশাল বিষ্ণু মূর্তির ভগ্ন উর্দ্ধাংশ উচ্চতায় ৪ ফুট, চওড়ায় প্রায় তিন ফুট— এখানেই অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। মূর্তিগুলি দশম একাদশ শতকের নির্মিত বলেই অনুমিত হয়।

এখন এই পান্ডুরাজার ঢিবিতে পাওয়া কয়েকটি প্রত্নবস্তু নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তাদের বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত এক শীলমোহরের কথা— যা প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বেশ কয়েকটি রেখাচিত্র সম্বলিত স্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত আংশিক ভগ্ন এই শীলমোহরটির পাঠকে কেন্দ্র করে নানা তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যেমন— প্রখ্যাত ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ মাইকেল রিড়লে একে ভূমধ্যসাগর তীরের ক্রীট দ্বীপ থেকে আগত বলেছেন এবং এতে মিনোয়ান লেখলিপি অনুযায়ী AETEA বা আতিয়া নামক এক গ্রীক নাবিকের নাম লিখিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। যদি তা সত্য হয় সেই সুদূর অতীতে এখানকার সঙ্গে ভূমধ্যসাগর তীরের দেশসমূহের সঙ্গে একটা বানিজ্যিক সম্পর্ক যে ছিল তা প্রমাণিত হয়ে যায়।

অন্যদিকে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে দেখা যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রীতিমাধব রায় মন্তব্য করেন যে— সেই সময় ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপসমূহের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসার কোন বাহ্যিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া ক্রীট দ্বীপে পাওয়া আরও অনেক শীলের সঙ্গে এই লিপির কোন মিল নাই। আর পান্ডুরাজার ঢিপিতে যে অধিবসতিকালে শীলটি পাওয়া গিয়েছিল তখনও মিনোয়ান লিপির আবিষ্কারই হয়নি। কাজই তাঁর মতে রিড়লের মন্তব্য ঠিক নয়। বরং এটিকে তিনি প্রাচীনতম সংস্কৃতের লিখিত রূপ বলে মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় প্রখ্যাত গবেষক নীহাররঞ্জন রায়ও সন্দিহান হয়েই বলেছেন— "এ ধরনের বিস্তৃত বৈদেশিক বানিজ্যের অন্য কোন প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।" (২২) তবে প্রয়াত ডঃ অতুল সুর তাঁর Pre History and Beginnings of

civilizatıon ın Bengal বইয়ে রিড়লের মন্তব্যকেই সমর্থন করে এখানে বানিজ্যকেন্দ্র ছিল তাই বলেছেন। আবাব এই খনন কার্যের দলনেতা পরেশ দাসগুপ্তও রিড়লের মতকেই সমর্থন করে 'প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা' গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন শীলমোহরের মধ্যে লেখচিত্র অনুযায়ী যে মাছের চিহ্নটি অনেকেই দেখে থাকেন— তা আসলে মাছ নয়। ঐটি তাঁর মতে একটি হাতুড়ি মুখো হাঙ্গর, আর ঐ সামুদ্রিক প্রাণী হাঙ্গর চিহ্নের দ্বারাই তিনি বলতে চেয়েছেন যে তখনকার দিনেও এখানকার লোকেরা সামুদ্রিক বানিজ্যে অভ্যস্ত ছিল।

এই মতের সমর্থনে Douald A Mackenzieর বক্তব্য উল্লেখ কবা যেতে পারে। তিনি তাঁর Myths of crete & pre Hellenic Europe— The Gresham Publishing Company, London, page– 209তে উল্লেখ করেছেন যে, ক্রীটান দেশের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এখানের নবাশ্মীয় সংস্কৃতির আদিম অধিবাসীদের সৃষ্ট সভ্যতার সাদৃশ্য ছিল এবং পারস্পরিক বানিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। যেমন ভাসিলিকি থেকে আবিষ্কৃত সনল চা পাত্র ও চ্যানেল স্পাউটেড মৃৎ পাত্রের সঙ্গে এই রাঢ় বঙ্গের নদীকেন্দ্রিক প্রত্নক্ষেত্রগুলি হতে আবিষ্কৃত মৃৎ পাত্রের হুবহু মিল দেখা যায়। তাই এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রাক আর্য সংস্কৃতির কয়েক হাজার বছর আগেই এখানকার নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে মিশর, পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং নৌযানে আসা যাওয়ার পথও ছিল। [২৩]

এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে এখানে তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত মানুষের মুখেব যে দুটি ফাঁপা টেরা কোটা পাওয়া গেছে, তাদের গঠন শৈলী নাকি পন্ডিত দের মতে বৈদেশিক প্রভাব পুষ্ট। এ বিষয়ে The Illustrated London News, November–1963, page 906 এ যা উল্লেখ আছে তা প্রনিধান যোগ্য— The trracotta heads from pandu Rajar Dhibi are partly comparable with a class of excavated long nosed terrocotta heads from Tell-el Ashdod in palestine. [২৪] কাজেই তখনকার দিনে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে জলপথে এখানকার যে যোগাযোগ সাধিত হয়েছিল তা ধরে নিতে কোন অসুবিধা নাই।

পরিশেষে বলা যায় এই প্রত্নকেন্দ্র অর্থাৎ পান্ডুরাজার টিবির অভ্যন্তরে উৎখননের ফলে যে সভ্যতা ও অধিবসতির সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা বর্তমান ছিল না। বেশ কয়েকবারই সেই ধারাবাহিকতার ছেদ পড়ে ছিল। বিশেষ করে ১ম পর্বের পরে এবং পঞ্চম পর্বের পরে তা সাময়িক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নানান্ প্রাকৃতিক কারণে, তারও পরে ষষ্ঠ পর্বের শেষের দিকে আবার তা বন্ধ হয়ে যায়। এই শেষ পর্বে অধিবসতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে পন্ডিতগণের ধারণা মুসলমান অভিযানের ফলেই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

সে যাই হোক পান্ডুরাজার ঢিবিতে উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত তথ্যাদির নিরিখে জানা যায় যে, প্রথম পর্যায়ে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি প্রমাণ করে যে এখানকার লোকেরা প্রথমে যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। ২য় স্তর যা প্রথম স্তরের বেশ পরবর্ত্তী হলেও সেখানে প্রাপ্ত নিদর্শনে জানা গেল যে, তারা ক্রমে ক্রমে ঘর বাড়ী তৈরী করে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে এবং গৃহ পালিত পশুপক্ষীর লালন পালনের মাধ্যমে এবং লাল কালো কৌলাল ও ক্রমে ক্রমে ধাতব বস্তুর ব্যবহার রপ্ত করেছে। এই স্তরেই প্রাপ্ত তকলি ও সুতি বস্ত্রই প্রমাণ করে যে তারা কৃষি উদ্ভাবনে ক্ষুন্নিবৃত্তির সুরাহা করে পরে লজ্জা নিবারনের ব্যবস্থাও পোক্ত করে স্থায়ী ও সভ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাবও পরের স্তরে আবিষ্কৃত প্রত্নদ্রব্য বিশেষ করে নক্সা সম্বলিত উন্নত মানের মৃৎ পাত্র, লাল কালো কৌলাল এবং তামার তৈরী বিভিন্ন অলংকার বিশেষ করে আংটি, কর্ণাভরন বা কানের দুল, হাতের চুড়ি, গজদন্তের চিরুণী তাদের উন্নত মাণের রুচিশীলতার পরিচয় প্রদান করে। শেষের দিকে আবিষ্কৃত হাপর সহ উনান ও লৌহ মল প্রমাণ করে যে, তারা মিশ্র ধাতু বা বিভিন্ন ধাতব পদার্থ গলন প্রক্রিয়া রপ্ত কবে আধুনিক প্রযুক্তির দিকে এগিয়ে গেছে। কাজেই বলা যায় প্রত্নবস্তুর প্রেক্ষিতে এই পান্ডুরাজার ঢিবিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল ধরে যে সভ্যতা ক্রমানুসারে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তা নিঃসন্দেহে গ্রামীন সভ্যতার এক অনন্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাতে সন্দেহ নাই।

—ঃ ভরতপুর ঃ—

ভরতপুরের গুরুত্ব ও অবস্থান ঃ—

গোপভূমের প্রত্নক্ষেত্রগুলির প্রাচীনত্বের বিচারে পান্ডুরাজার ঢিবির পরেই ভরতপুরের স্থান। কারণ এখানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর নিরিখেই জানা যায় যে এখানেও পান্ডুরাজার ঢিবির মতই সাড়ে তিন হাজার বছর বা তদূর্দ্ধ সময়কালে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতাকেন্দ্রিক অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। যদিও প্রাগৈতিহাসিককালে গড়ে ওঠা অধিবসতির বহুল প্রমাণ চিহ্ন এখানে আবিষ্কৃত হলেও পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের সময়সীমায় বিশেষ স্মরণীয় আবিষ্কার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম বৌদ্ধ স্তুপ এখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে এই প্রত্নক্ষেত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রত্নক্ষেত্রটি আমাদের আলোচ্য গোপভূমের অধীন বর্তমান বুদবুদ থানার অন্তর্গত প্রাচীন পরগনা শিলামপুরের পূর্বদিকে অবস্থিত। ভৌগোলিক পরিভাষায় এর অবস্থান হ'ল ২৩° ডিগ্রী ২৪' মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭° ডিগ্রী ২৭' মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমায়। অন্যদিকে বলা যায় শেরশাহের স্মৃতি বিজড়িত জাতীয় সড়ক জি. টি.

রোডের লাগাও পানাগড় থেকে ৬ কিঃ মিঃ দক্ষিণে শিলামপুরগামী পাকা রাস্তা ধরে এগুলেই, শিলামপুরের ঈষৎ উত্তরদিকে পূর্বগামী মোরাম ধরে অগ্রবর্তী হলেই, 'আদ্যের গঙ্গা' দামোদরের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে বাবলা বনের ফাঁকে বাস্তার উত্তরে সবুজ ঘাসের আস্তরণে ঢাকা, এক উচু ঢিবি সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। ঐ ঢিবির শীর্ষসীমায় ইটের তৈরী গোলাকৃতি এক বিশাল স্তম্ভ, ইতিহাস প্রেমিক ব্যক্তিমাত্রকেই আকর্ষণ করবে। দুর্নিবার সেই আকর্ষণে সাড়া দিয়ে এগুলেই চোখের সামনে উদ্ভাসিত হবে প্রত্নক্ষেত্র ভরতপুরে বঙ্গের প্রথম আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক বৌদ্ধ স্তূপ।

উৎখননের ইতিহাস ঃ— দীর্ঘ দিন ধরে এক লুপ্ত ইতিহাসের গুপ্ত কাহিনী বুকে নিয়ে, মূক ও বধির হয়ে পড়েছিল এই প্রত্নক্ষেত্রটি। কোন এক চাষীর গোয়াল ঘরে মাটি দেওয়ার প্রয়োজন হলে সে এই প্রত্নক্ষেত্রে মাটি নেওয়ার জন্য এসে কোদালের কঠিন আঘাত হানলে এই মূক ও বধির প্রত্নক্ষেত্র যেন হঠাৎই প্রতিবাদ করে ওঠে। কঠিন পদার্থে কোদালের আঘাত হওয়ামাত্র প্রতিবাদী শব্দে চমকে উঠে সেই কৃষক, তাই পাশের মাটি সরিয়ে কঠিন বস্তুটির সন্ধান করতে গিয়ে সেখানে কোন সৌধ চিহ্ন দেখতে পায। এই সংবাদ গ্রামে প্রচারিত হওয়ামাত্র, আরও খোঁড়াখুঁড়িতে সেই সৌধের কিছু অংশ জেগে ওঠে। এই তথ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্ণগোচর হলে, নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এখানে খনন কার্য শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। তা সেও আজ অনেক দিনের কথা। সেটা হল ১৯৭১-৭৪ খ্রীঃ। স্বল্প পরিসরে ১২.৭৫×১২.৭৫ মিঃ আয়তনে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সহ-অধিকর্তা সুশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে এই খনন কার্য পরিচালিত হয়। কাজ চলাকালীন সহ-অধিকর্তা সুশান্ত মুখোপাধ্যায় হঠাৎ পরলোকগমন করায় আজ পর্যন্ত খনন কার্যের রিপোর্ট লাল ফিতের মোড়কে আবদ্ধ আছে। কোনদিন যে সেই ফিতের গিঁট আলগা হবে তা মনে করা যায় না। তবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় মুখপত্রের প্রাথমিক রিপোর্টে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে যা জানা যায় তা নিম্নে আলোচিত হ'ল।

উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি ঃ— দামোদরের উত্তর তীরে অবস্থিত এই ভরতপুরেও পান্ডুরাজার ঢিবির মত খনন কার্যকে মোট ৪টি স্তরে বিভক্ত করেই করা হয়েছিল।

প্রথম স্তরে— অর্থাৎ সর্বনিম্ন অংশে প্রাপ্ত নিদর্শনাদিগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল পাথর ও অনুশিলার অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিবাহক চিত্রিত মসৃণ পাত্র ও কৃষ্ণ লোহিত মৃৎপাত্র, কালো রঙের পাত্রের উপর লাল রঙের কারুকার্য, ঘিয়ে রঙের পাত্রের উপর লাল রঙের অলংকরণ, জীবজন্তুর হাড়ের তৈরী যন্ত্রপাতি, রংবেরং এর পাথরের নানারকম পুঁতির মালা ও অলংকার ইত্যাদি।

পান্ডুরাজার ঢিবির মত এখানেও হাল্কাভাবে পোড়ান হাতে গড়া স্থূল ধরণের পাত্র যা অপরিশোধিত মাটির সঙ্গে তুষ মিশিয়ে তৈরী করা প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। কয়েকটি মৃৎপাত্রের গায়ে জ্যামিতিক চিত্রণ — বিশেষ করে ত্রিভুজের সারি, ঢেউ খেলান রেখা সম্বলিত চিত্রাঙ্কিত কৌলাল পাওয়া গেছে। তাছাড়া ক্ষুদ্রাকৃতি পাথরের অস্ত্র, তামার তৈরী মাছ ধরার বঁড়শি, গর্ত করার যন্ত্র, ফলা ও নব্যপ্রস্তর কুঠারও পাওয়া যায়। ঐগুলি ছাড়াও এখানে বেণুবন ও ঘাসের ছাপ সমন্বিত পোড়ামাটির নিদর্শনাবলীও পাওয়া গেছে যা থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, এইসব জনবসতির অধিবাসীবৃন্দ মাটির গৃহে বাস করত। [২৫] এখানে প্রাপ্ত কৃষ্ণ লোহিত মৃৎপাত্র যা তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন বলে পন্ডিতগণ মনে করেন এবং এই সংস্কৃতিই গ্রাম্য সমাজ সংঘটন ও উন্নততর, বিস্তৃততর কৃষিকর্মের দ্যোতক। [২৬]

দ্বিতীয় স্তরে— আবিষ্কৃত প্রত্নদ্রব্যগুলির মধ্যে চাকে তৈরী লাল-কালো রঙের চিত্রিত ও অচিত্রিত মৃৎপাত্র, ছিদ্রযুক্ত লাল রঙের পাত্র, মোটা ও স্থূল ধরণের হাতে গড়া লাল, বাদামি রঙের মৃৎপাত্র, ক্ষুদ্রাকৃতি পাথরের অস্ত্র, হাতির দাঁতের বা হাড়ের তৈরী চিরুনি, তামার আংটি ও বালা, স্টিয়াটাইটের ও পোড়ামাটির পুঁতি ইত্যাদি। ঐগুলি ছাড়াও সবথেকে উল্লেখ্য হল একটি ৫০ সেমিঃ ব্যাসযুক্ত উনান। এছাড়াও উন্নত কলা কৌশলের মৃৎপাত্র ও লৌহসহ অন্যান্য ধাতুনির্মিত দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া গেছে।

তৃতীয় স্তরে— প্রাপ্ত নিদর্শনে পন্ডিতগণ মনে কবেন যে, এই স্তর ২য় স্তরের অনেক পরবর্তী অর্থাৎ এদের উভয় স্তরের মধ্যে সময়ের বিরাট ফারাক ছিল। এই পর্বেই গুপ্ত যুগের শেষভাগের পুরাবস্তু ও মৃৎপাত্রও পাওয়া গেছে। এই স্তরেই পাওয়া নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে হাতে তৈরী মাটির ইট যা রোদে শুকিয়ে পরে কাঠে পোড়ান হয়েছে।

চতুর্থ ও শেষ স্তরে— প্রাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী সবই ঐতিহাসিক যুগের পুরাবস্তু। এই স্তরেই আবিষ্কৃত হয়েছে এখানকার সবথেকে বিস্ময়কর পুরাবস্তু বঙ্গে প্রথম আবিষ্কৃত বৌদ্ধ স্তূপ— যা ৭ম/৮ম শতকের নির্মিত বলেই অনুমিত। এই স্তূপের অভ্যন্তর দর্শনে মনে হয় এটি দামোদরের বিধ্বংসী বন্যায় বিনষ্ট কোন প্রাগৈতিহাসিক সৌধের বা মন্দিরের ব্যবহৃত ইট দিয়ে এটি পরে নির্মিত হয়েছিল। ভূগর্ভে নির্মিত তেত্রিশ সোপান সহযোগে গঠিত তাই এর ভিত্তি খুবই সুদৃঢ়। এর সব নীচে রয়েছে হলদে আভাসযুক্ত ১ মিঃ পুরু বালির স্তর তার উপর ২" পুরু পাথর কুচি ও ঘুটিং সহ কাদা মাটির ঢালাই, তারপর প্রথমে কাঁচা ইটের ভিত। এই প্রসঙ্গে বলা যায় Indian Archaeology : A review page-36 এ উল্লেখিত হয়েছে যে, "বৌদ্ধ স্তূপটির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ১০×১০ মিঃ পরিসরে খাত খনন করে দেখা গেছে যে বর্গাকার স্তূপের

নিম্নমুখী ধাপগুলি পোড়া ইঁটের নির্মিত হলেও ভিত মূল কাঁচা শুকনো ইটের তৈরী।" পরে সেই ভিতের উপর আগুনে পোড়া ইট পূর্বে কোথাও ব্যবহৃত, যা পরে সংগ্রহ করে এনে তার দ্বারা স্তূপটির গঠনকার্য সমাধা হয়েছিল। ফলে এখানে দু'ধরণের ইট ব্যবহৃত হয়েছিল যাদের আকার ছিল যথাক্রমে ৪৮×২১×৬ সেঃ মিঃ ও ৩০×২৮×৭ সেঃ মিঃ। গাঁথনির মশলার জন্য বালি ও চুনের ব্যবহার ছিল। স্তূপের উদ্গত অংশ পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত, এটিকে পঞ্চরথাকৃতি স্থাপত্য বলা হয়। (২৭) এই 'পঞ্চরথ' পরিকল্পনায় ১২.৭০, ১২.৬৫ বর্গ সেঃ মিঃ ক্ষেত্রবিশিষ্ট ইটের একটি অপূর্ব সুন্দর স্তূপ নির্মিত হয়। (২৮) গাঁথুনির বহির্ভাগেও চুনের ব্যবহারের চিহ্ন দেখা গেছে।

"পঞ্চকোণ বিশিষ্ট স্তূপের উপরের গায়ে স্থানে স্থানে পোড়ামাটির কাজ করা নকল চৈত্যে ভর্তি। এর গায়ে অনেকগুলি কুলুঙ্গি আছে।" (২৯) সেই প্রত্যেক কুলুঙ্গিতেই ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় বজ্রপদ্মাসনোপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি ছিল। বিশেষজ্ঞগণের অনুমান এই যে, স্তূপটির স্থাপত্য নিদর্শন উড়িষ্যার রত্নগিরি স্তূপের অনুরূপ। সর্বসাকুল্যে মোট এগারটি বুদ্ধমূর্তি (তন্মধ্যে ২টি ভগ্ন) আবিষ্কৃত হয়েছে। (৩০) তবে মূর্তিগুলির আকার ও আয়তন সর্বক্ষেত্রে এক নয়।

History of Bengal মোতাবেক জানা যায় যে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত "অষ্টসাহশ্রীকা প্রজ্ঞাপারমিতা" তুলাক্ষেত্র "বর্ধমান স্তূপ" এর উল্লেখ আছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার তৎকালীন অধিকর্তা মাননীয় শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয় বলেছেন যে, "সমগ্র রাঢ় বাংলায় আলোচ্য ভরতপুরের আবিষ্কৃত স্তূপটি ব্যতীত অপর কোন বৌদ্ধ স্তূপ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। সে কারণে আমরা ভরতপুরের বৌদ্ধ স্তূপটিকে তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপরূপে অভিহিত করতে পারি। স্তূপটি সপ্তম শতকে নির্মিত হয়েছিল। (৩১) এ প্রসঙ্গে বলা যায়, সামন্ত মহাশয় যখন এই রিপোর্ট দিয়েছেন তখন পর্যন্ত বঙ্গে একমাত্র আবিষ্কৃত বৌদ্ধ স্তূপ ছিল, তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু ইদানীং ১৯৯৬ খ্রীঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মালদহ জেলার জগজ্জীবনপুরে তুলাভিটায় আর একটি বৌদ্ধ স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে তা বর্ধমান জেলায় মোটেই নয়— সে দিক থেকে তুলাক্ষেত্র বর্ধমান হিসাবে ভরতপুরের দাবী এখনও নস্যাৎ করার যুক্তি নাই।

প্রত্নক্ষেত্রে গড়ে ওঠা অধিবসতির স্থিতিকাল ঃ— প্রথম পর্যায়ে উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শনাদির প্রেক্ষিতে এই পর্বের স্থিতিকাল প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত ১৩৮৫ সালের আনন্দ বাজার পত্রিকায় যা মন্তব্য করেছেন তা হল— "বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে অবস্থিত ভরতপুরের তাম্রাশ্মীয় যুগ যে খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিসহস্রকের মধ্যভাগে অতিবাহিত হয়েছে তা সম্প্রতিকালে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে রেডিও

কার্বন পরীক্ষার দ্বারা।" অর্থাৎ কিঞ্চিত অধিক খ্রীষ্ট পূর্ব দেড় হাজার বছর সময় কালেই এখানে অধিবসতি গড়ে উঠেছিল— যা গোপভূমে পান্ডুরাজার ঢিবির ১ম পর্যায়ের এবং এই স্থানের দক্ষিণে দামোদর নদীর ২ কিঃ মিঃ মধ্যে অবস্থিত পোখরনায় আবিষ্কৃত সভ্যতার সমসাময়িক।

এখানের ২য় স্তরটিও ১ম স্তরেবই পরবর্তী কিন্তু তৃতীয় স্তরের সভ্যতা ২য় বা ১ম স্তরের অনেক পরবর্তী যা গুপ্ত যুগের স্থাপত্যকেই স্মরণ করায়। সেদিক থেকে এই দুই স্তরের মধ্যে সময়ের পার্থক্য বেশ গভীর। ২য় স্তরের শেষের দিকে লৌহ দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় তাকেও প্রথম স্তরের বহু পরবর্তী বলা হয়, কারণ তাম্র প্রস্তর যুগের বেশ পরবর্তী যুগ হল লৌহ যুগ। তবে এখানে উভয় সভ্যতাই বহুদিন যাবৎ পাশাপাশি অবস্থানে ছিল। চতুর্থ বা শেষ স্তরটির সভ্যতাব ঐতিহাসিক যুগের সংঘটন— যা খ্রীষ্টীয় ৭ম থেকে নবম শতকে বর্তমান ছিল।

উপসংহার ঃ— পরিশেষে এখানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার সময়কাল থেকে এখানে এক তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তারও আগে এই দামোদর নদীর তীরেই দুর্গাপুরের সন্নিকটে বীরভানপুরে আর এক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই বীরভানপুরের সভ্যতা কিন্তু এর বহুপূর্ববর্তী পর্যায়ের। সেখানকার অধিবাসীরা ছিল মূলত যাযাবর কারণ সেখানে আবিষ্কৃত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখ্য হল অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি প্রস্তরায়ুধ বা অনুশিলা। এখানে কোন পোড়ামাটির পাত্র আবিষ্কৃত হয়নি তাই একে প্রাকপোড়া মাটির (Pre-pottery age) যুগ বলা হয়। প্রাচীন সেই বীরভানপুরের বসবাসকারী যাযাবর সম্প্রদায়ের সঙ্গে এখানকার প্রাচীন জনগোষ্ঠীর যেন একটা যোগসূত্র ছিল। শুরুর দিকে এখানকার অধিবাসীরা ছিল মুখ্যত শিকারী, তারা প্রথমে জঙ্গলে পশুপক্ষী শিকার করত পরে ঐ বৃত্তিসহ তারা নদীতে মৎস্য শিকারও করত। বিভিন্ন প্রস্তরায়ুধ ও বড়শি ইত্যাদির আবিষ্কারই তাই প্রমাণ করে। সেদিক থেকে বলা যায় বীরভানপুরের অধিবাসীরা ছিল ভরতপুরের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ।

পরবর্তীকালে এরাই পশুপালন বৃত্তি গ্রহণ করে, কারণ এখানে পাওয়া বিভিন্ন গৃহ পালিত পশু যেমন— গরু, মোষ, ঘোড়া, শূকর, মুরগি ইত্যাদির হাড় তাই প্রমাণ করে। পরে এরাই ধীরে ধীরে সেই সকল পশুকে কাজে লাগিয়ে কৃষি পারদর্শী হয়ে ওঠে। তার বহু পরে তারা লোহার ব্যবহার রপ্ত করে। আঞ্চলিক পরিমন্ডলে আকরিক লোহার প্রাচুর্য এবং লৌহ গলাবার স্থানীয় পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় এখানে খ্রীষ্টীয় ৭/৮ শতকে লৌহ দ্রব্যের ব্যবহার যে বেশ চালু হয়েছিল তা বোঝা যায়। তাই বলা

যায় খ্রীষ্ট পূর্ব দেড় হাজার বছর আগে তাম্র-প্রস্তর যুগে এখানে যে সভ্যতার বিকাশ হয়, তা পরবর্তী লৌহযুগ পর্যন্ত উভয় সভ্যতার সহ-অবস্থানে বিদ্যমান ছিল।

—ঃ গোপভূমের বৃহৎ প্রত্নক্ষেত্র মঙ্গলকোট ঃ—

বিস্তৃতি ও অবস্থান ঃ— খ্রীষ্ট পূর্ব দু'হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোয় এক প্রাচীন সভ্যতার মৃত্যুঘন্টা যখন ধ্বনিত হচ্ছে, প্রায় তখন থেকেই রাঢ় বঙ্গের অজয়-কুনুর সঙ্গম স্থলের মঙ্গলকোটে-তাম্রাশ্মীয় এক সভ্যতার সূচনা পর্ব শুরু হয়েছে। বর্ধমান জেলার প্রাচীন গোপভূমের অন্তর্গত বর্তমান মঙ্গলকোট থানার সন্নিকটে, অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বেশ কয়েকটি জনপদ যেমন— উজানী, কোগ্রাম, নূতনহাট, মঙ্গলকোট, বক্সীনগর ও পদিমপুরকে নিয়ে প্রায় ৬ কিঃ মিঃ বিস্তৃত ক্ষেত্রে এক সভ্যতার উন্মেষ হয়। এটিই বর্ধমান জেলার সর্ববৃহৎ প্রত্নক্ষেত্র। ভৌগোলিক পরিভাষায় এর অবস্থান নির্দেশ করে বলা যায়, এই প্রত্নক্ষেত্রটি ২৩° ডিগ্রী ৩০' মিনিট উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৭° ডিগ্রী ৫৫' মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। বর্ধমান-নূতনহাট বাসে সরাসরি বর্ধমান থেকে এখানে যাওয়া যায়। গুসকরা-বোলপুর থেকেও বাস যোগে এখানে যাওয়ার কোন অসুবিধা নাই।

উৎখননে ঢিলেমি ঃ— তাম্র প্রস্তর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি গোপভূমের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র হলেও এর উৎখননের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঢিলেমি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন সভ্যতার এক অধিবসতি কেন্দ্র এই প্রত্নক্ষেত্রটি থেকে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত বহু নিদর্শনাদি সহ পুরাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় বহু আগে থেকেই। ১৯১৫ খ্রীঃ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে এলেও তিনি এর সাংস্কৃতিক দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই চলে যান এর অভ্যন্তরে খননের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেন নি। পরে এখান থেকে পাওয়া প্রত্ন দ্রব্যসমূহ নিয়ে যারা যোগাযোগ করেছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হলেন ইতিহাসমনস্ক সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব শ্রী এককড়ি দাস মহাশয়। তিনি ১৯৬২ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এখান থেকে প্রাপ্ত কিছু তাম্র মুদ্রা প্রদান করেন যেগুলি বর্তমানে আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এই প্রত্নক্ষেত্রটির গুরুত্ব জনমানসে তুলে ধরার জন্য ১৯৬২ খ্রীঃ ২৭শে নভেম্বর এবং ১৯৬৩ খ্রীঃ ২১শে এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি মঙ্গলকোটের বিষয়ে লেখালেখিও করেন। তাঁর ঐ সব কাজের ফলে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে এবং এখানে খনন কার্য শুরু হওয়ার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়। এতেও লেগে যায় ২২-২৩ বছর, পরিশেষে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে খনন কার্য পরিচালিত হয়। এতে অংশ নেয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগ।

উল্লেখ্য এই প্রত্নক্ষেত্রটির বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কিংবদন্তীর সীমা পরিসীমা নাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না হওয়ায় তারা যেন পল্লবিত হওয়ার সুযোগ বেশ পুরোমাত্রায় পেয়েছিল। তবে সুখের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে এগিয়ে আসায় প্রকৃত তথ্য ও ইতিহাসের সন্ধান সামান্য হলেও মিলতে শুরু করেছে।

প্রাক খনন পর্বে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি ও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ— পরিকল্পিত খনন কার্য শুরু হবার আগেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে খোঁড়াখুঁড়িতে পাওয়া নিদর্শনাদির মধ্যে শ্রদ্ধেয় এককড়ি দাস যে সকল দ্রব্যসামগ্রী পেয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখ্য হল—

১) হস্তিপৃষ্ঠে আরোহীর চিহ্ন সম্বলিত ৪টি তামার মুদ্রা-- ঐতিহাসিক পরীক্ষায় যা খ্রীষ্ট পূর্ব ৪র্থ শতকে মৌর্য যুগে নির্মিত বলে প্রমাণিত।

২) বিভিন্ন ঢিবির নীচে পাওয়া জীব-জন্তুর অস্থির অংশ— যা ভারতীয় জীবতত্ত্ব বিভাগের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সেগুলি পশুপালক মানুষের পালিত গরু শূকরের অস্থি।

৩) বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ যেমন— পালিশ করা তৈজসপত্রের অংশ, মাটির প্রদীপ, পাথরের ভাঙ্গা থালা, কেশর বিশিষ্ট খেলনা ঘোড়া, হাতির শুঁড়-- যা তাম্রাশীয় সভ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়াও পাওয়া গিয়েছিল রোমান পটারীর অনুরূপ বাদামী রংয়ের এক পাত্রের তলদেশ। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই এসেছিল। অর্থাৎ এখানকার লোকেরা দেশীয় বাণিজ্য ছাড়িয়েও বৈদেশিক বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল।

৪) পাঠান যুগের শুরুর দিকে টেরাকোটার ফলক অংশ।

৫) পোড়া চাল ও ধানের খোসার অংশ। এগুলি কোন অগ্নিকান্ডের চিহ্ন। এ ধরনের নিদর্শন এখান থেকে ২৫ কিঃ মিঃ পশ্চিমে একই নদী এই অজয়ের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পান্ডুরাজার ঢিবি ও বীরভূমের কোপাই নদীর তীরে মহিষদলে ও নালন্দাতেও পাওয়া গেছে। এই পোড়া চালের অংশ এখনও এখানে পাওয়া যায়।

৬) ১টি খয়েরী রংয়ের বীডসহ এবং ২টি সাদা রংয়ের কৃষ্টাল।

৭) মাটির নীচে পোড়ামাটির বেড় দেওয়া বেশ কয়েকটি কূপের অংশ।

৮) ঐতিহাসিক পীর পুকুরের ঈশান কোণে ভূগর্ভস্থ পাকা ইটের গাঁথুনি— যার উপর ৮'x৪' এর একটি ছাদও ছিল।

খনন কার্যে প্রাপ্ত পর্যায়ক্রমিক নিদর্শনাদি ঃ— এই প্রত্নক্ষেত্রে উৎখনন পরিচালনা করে মোটামুটি সাতটি স্তরের হদিশ পাওয়া যায়। সেই স্তরগুলির নিরিখে এখানকার

অধিবসতি তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা বেশ বোঝা যায়। এই পর্যায়ে ১ম স্তরটি ভূপৃষ্ঠের ২ মিঃ গভীরে বিস্তৃত ছিল। এই খনন কার্যের পরিচালক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ সমীর কুমার মুখার্জীকে অনুসরণ কবে এই প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত সমুদয় প্রত্নদ্রব্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল— প্রত্নক্ষেত্রে উৎখনন পরিচালনা করে মোট ৭টি স্তরের সন্ধান মিলেছে। সেই স্তরগুলির নিরিখে এখানকার অধিবসতি তাম্র প্রস্তর যুগ হতে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটা ধাবাবাহিক উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। [৩২]

প্রথম স্তর ঃ— এখানে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল— বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্টপূর্ণ মৃৎপাত্র যেমন— চকচকে উজ্জ্বল কালো ও লাল মাটির পাত্র, সাধারণ লাল কালো মাটির পাত্র ও ধূসর রঙের মাটির পাত্র। পাত্রগুলির মধ্যে হাঁড়ি, গামলা, নলযুক্ত বাটি, দানিযুক্ত থালা, নক্সা ও চিত্রযুক্ত অচিত্রিত মৃৎপাত্র ইত্যাদি। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে পোড়া ইটের তৈরী ঘরবাড়ীর অংশ ও পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি। এর প্রারম্ভিক বসতি স্থাপনের সময় থেকেই লোহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখানেই পাওয়া গেছে লোহার তৈরী তীরের ফলা, ছুঁচের অগ্রভাগ সহ বেশ কিছু লৌহ পিন্ড। এছাড়া তামার তৈরী আংটি, বালা, পুঁতি, সূচিমুখ ফলক ও বড়শিও পাওয়া গেছে। গোবর মাটি লেপা মেঝে, খাপরার তৈরী বাড়ী, এছাড়াও পাওয়া গেছে তাম্র প্রস্তর যুগের গরু, ছাগল, হরিণ, শূকর, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীর হাড়, ছিদ্র করার যন্ত্র, পাথরের তৈরী পুঁতি, হাড়ের চিরুনি, পূর্ব-পশ্চিমে শায়িত মৃতদেহের কঙ্কাল ইত্যাদি।

এই পর্বে পাওয়া ঘর বাড়ীর অংশ ও পয়ঃপ্রণালী সমূহ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার নিদর্শনকেই মনে পড়িয়ে দেয়, তবে বিভিন্ন পোড়ামাটির প্রত্নসম্ভার পাথরের পুঁতি প্রমাণ করে যে, এটি তাম্রশ্মীয় সভ্যতারও দ্যোতক যার স্থিতিকাল কম করেও খ্রীষ্ট পূর্ব দেড় হাজার বছরের প্রাচীন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ— এই পর্বে ১.০৫ থেকে ১.২৩ মিটার গভীরে খনন কার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্তরে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি হল তাম্র প্রস্তর যুগ ও আদি প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যবর্তী সময়কালের প্রত্নসম্ভার স্বরূপ বিভিন্ন মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির নারীমূর্তি ও কিছু পুঁতি। তাছাড়াও পাওয়া গেছে লোহার তৈরী ফলা, বাটালি, কাস্তে আর হাড়ের তৈরী কিছু যন্ত্রপাতি। এই পর্বের স্থিতিকাল ছিল খ্রীষ্ট পূর্ব ৬০০-৩০০ বছৰ সময়কাল।

তৃতীয় স্তর ঃ— এই পর্বে কালো লাল মৃৎপাত্রের অবলুপ্তি দেখা যায়। তার বদলে দেখা যায় মসৃণ ও অমসৃণ লাল ধূসর, কালো রঙের মৃৎপাত্র ও উত্তর ভারতীয় রীতির চকচকে কালো পালিশ করা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। ফুলকাটা নক্সা ছাপ মাটির থালা ইত্যাদি। এই পর্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল রূপার তৈরী ছাপ যুক্ত মুদ্রা,

ছাঁচে ঢেলে তৈরী চৌকো বা গোলাকার মুদ্রা ছাড়াও তামার বালা, কবচ, লকেট, সুরমা কাঠি, পোড়ামাটির গাত্র মার্জনী, মূল্যবান পাথরের কাচের পুঁতি, ঝিনুক ও পোড়ামাটির অলংকার ছাড়াও পাওয়া গেছে শালভঞ্জিকা, পঞ্চচূড়া যক্ষী, একটি গজলক্ষ্মীর মূর্তি এবং পাটনায় আবিষ্কৃত মৌর্য যুগের নারীমস্তকের সঙ্গে তুলনীয় একটি ছোট নারী মস্তক যা সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

এই পর্বের স্থিতিকাল ছিল খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ যা মৌর্য শুঙ্গ যুগ বলে পরিচিত।

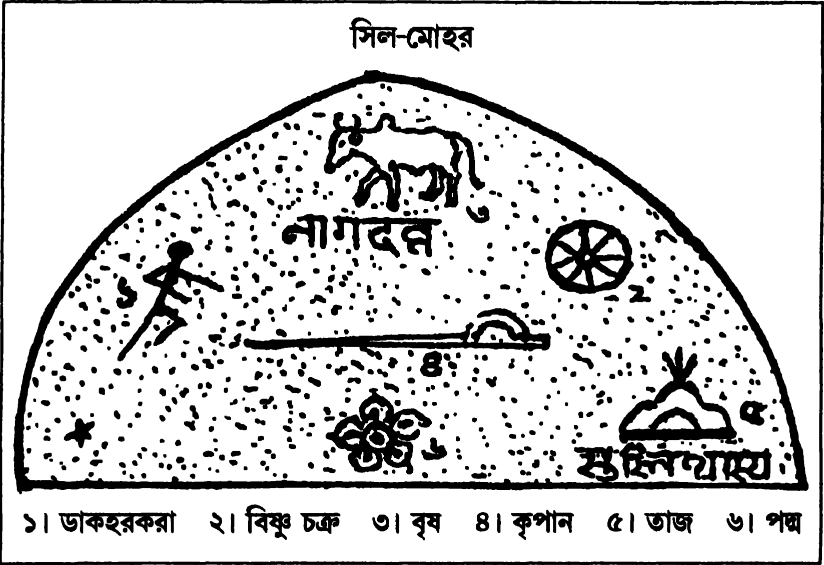
চতুর্থ স্তর ঃ— এই পর্বে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যাদির মধ্যে উল্লেখ্য হল কুশান যুগের প্রাপ্ত নিদর্শনাদি যেমন পোড়া মাটির ইটের স্থাপত্য। এখানেই পাওয়া গেছে ৪০×২৭×৭ সেঃ মিঃ, ৩৮×২৮×৫ সেঃ মিঃ এবং ২৬×২৪×৬ সেঃ মিঃ মাপের ইট। ঘরবাড়ীর সঙ্গে যুক্ত কূপ, ইট বাঁধান উঠান, ইটের জলনিকাশী নালা, সুড়কি দিয়ে তৈরী মেঝে এখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে। উৎখনন খাদ জে-১০ এবং কে. এক্স-৩ এও উন্নত গৃহস্থাপত্যের নিদর্শন ১.৪০ মিঃ ব্যাসের সাধারণের ব্যবহার্য কুয়ো এখানেই দেখা গেছে। নানা ধরণের মৃৎপাত্র যেমন— নক্সা ছাপযুক্ত হাতল দেওয়া থালা, নলযুক্ত পিচকিরি, লম্বা গলাযুক্ত সোরাই, নলযুক্ত কলস, রান্নার কড়াই এই স্তরেই পাওয়া গেছে। ৮ সেঃ মিঃ পুরু ২.৫×৩ মিঃ জায়গা জুড়ে পোড়া চালের আস্তরণ— সম্ভবত এটি একটি শস্যাগার যা আগুন লেগেই পুড়ে গিয়েছিল। এখানেই পাওয়া গেছে পোড়ামাটির গাত্রমার্জনী বা গা ঘসার ঝামা, পোড়ামাটির নানান খেলনা, ছাপ দেওয়ার যন্ত্র, ছাঁচে তৈরী পোড়ামাটির ফলকে বিভিন্ন ধরণের চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে যেমন— সূক্ষ্ম বস্ত্রে আচ্ছাদিতা নারী, নৃত্যরতা নারী, কটিদেশে তলোয়ারসহ যোদ্ধা। তা ছাড়াও আবিষ্কৃত হয়েছে একটি সিলমোহর যাতে চিত্রিত আছে একটি নারী মূর্তি আর সেই নারী মূর্তির হাতে রয়েছে প্রদীপ। এই স্তরে পূর্ব স্তরের ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের অবলুপ্তি ঘটলেও এখানে অন্যান্য মৃৎদ্রব্যের মধ্যে পাওয়া গেছে একটি ষাঁড়, পুরুষ মস্তকের অংশ, শাঁখ ইত্যাদি।

এই স্তরেই লৌহ দ্রব্যের ব্যাপক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেই সঙ্গে তামা ও হাড়ের তৈরী নানান দ্রব্যও পাওয়া গেছে। এই স্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনাদিও কুষাণ যুগের শিল্প বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনীয়। এই স্তরে পাওয়া ঘর-বাড়ী, বাঁধান উঠান, ইট বাঁধান জলনিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি লক্ষণে বোঝা যায় যে, এই সময় মঙ্গলকোট একটি সমৃদ্ধ নগর সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এই স্তরের ব্যাপ্তিকাল ছিল কুষাণ যুগীয় সময়কাল খ্রীষ্টীয় ১ম শতক থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত।

পঞ্চম স্তর ঃ— এই স্তরে ঘরবাড়ী তৈরীর ব্যাপকতা লক্ষণীয়। এ পর্বে ব্যবহৃত ইটের আকার ছিল যথা— ৩৫×২৫×৫ সেঃ মিঃ, ২৪×২৬×৬ সেঃ মিঃ ও ১৮×২৪×৮

সেঃ মিঃ। এখানে কাদার সাহায্যে ইটের গাঁথনির চল ছিল। ঘরের মেঝে ও ভিত তৈরী হত ইটের টুকরো, খোলামকুচি, কাঁকড় ইত্যাদির দ্বারা। এই স্তরে মৃৎপাত্রগুলি ছিল লাল ও ঘিয়ে রংয়ের। মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল— থালা, গামলা, কলসি, পিকদানি ইত্যাদি।

এই স্তরেই পাওয়া গেছে বহু সিলমোহর যাতে নানা ধরণের চিহ্ন প্রতীক দেখা গেছে, যেমন— বেড়ার মধ্যে গাছ, স্তূপ, পূর্ণকুম্ভ, নারীমূর্তি, শঙ্খ, ষাঁড় ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই প্রত্নক্ষেত্রেই প্রখ্যাত গবেষক শ্রদ্ধেয় আয়ুব হোসেন ব্যক্তি উদ্যোগে বেশ কিছু সিলমোহর আবিষ্কার করেছিলেন যাতে অঙ্কিত আছে ধ্বজা ও অন্যান্য চিহ্ন যেগুলিকে তৎকালীন ডাক চলাচলের প্রতীক চিহ্ন বলে মনে করা হয়েছে।



সিল-মোহর

১। ডাকহরকরা ২। বিষ্ণু চক্র ৩। বৃষ ৪। কৃপান ৫। তাজ ৬। পদ্ম

এই পর্বেই মিশ্র ধাতু হিসাবে ব্রোঞ্জ নির্মিত নিদর্শনাদির মধ্যে আংটি, বালা, কাজল কাঠি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য এই পর্বেই গজালের ব্যবহার দেখা গেছে। ছাঁচে ঢালা মুদ্রাও এখানেই পাওয়া গেছে। তাছাড়া পুঁতিসহ পুঁতি তৈরীর কাঁচা মাল আবিষ্কৃত হওয়ায় সহজেই অনুমান করা যায় যে এখানে পুঁতি তৈরীর কারখানাও ছিল। অপেক্ষাকৃতভাবে এই স্তরে পোড়ামাটির নিদর্শন কম পাওয়া গেলেও এখানকার ট্রেঞ্চ K×3 তে শস্য দানা বা জল রাখার জন্য বড় ধরণের পোড়ামাটির জালা এখানে পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যাদির নিদর্শনে জানা যায় যে এখানে গুপ্তযুগীয় সংস্কৃতির চিহ্ন বহুল পরিমাণে পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে গুপ্তযুগীয় রীতিতে

তৈরী পোড়ামাটির পুরুষ মূর্তির মস্তকাংশ ও গুপ্তযুগের মুদ্রা। এই স্তরের স্থিতিকাল ৪০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়।

ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তর ঃ— এই স্তর দুটির অবস্থান খুবই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা গেছে তবে এই স্তরে বসতির চিহ্ন বহুকাল ধরে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ইট সরিয়ে নেওয়ায় এই স্তরের ঘরবাড়ী ও বসতি বিন্যাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা খুবই কষ্টকর। মঙ্গলকোটের প্রধান রাস্তা ও কাছারিডাঙ্গা এলাকাতেই এই স্তরের বসতি নিদর্শন ব্যাপকভাবে দেখা গেছে। এখানে পাওয়া মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে লাল কালো ধূসর রঙের মৃৎপাত্রই বেশী। তাছাড়াও পাওয়া গেছে চীনামাটির পাত্রাংশ, মুসলমান রাজত্বকালের উন্নত মানের মসৃণ মৃৎপাত্র, এনামেলের প্রলেপ দেওয়া পাত্র ও ইংরাজ আমলের মুদ্রা। এখানেই পাওয়া গেছে তিনটি কঙ্কালের খন্ডাংশ সহ প্রাপ্ত মৃৎপাত্র যা থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ স্থান হয়ত কবরস্থান ছিল।

এই দুই স্তরের স্থিতিকাল হিসাবে বলা যায় ষষ্ঠ স্তর ছিল গুপ্তোত্তর যুগ অর্থাৎ ৬০০ থেকে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, আর সপ্তম বা শেষ স্তর ছিল মধ্যযুগ যা আদি থেকে শেষভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ৮০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নাবলীর নিরিখে প্রত্নক্ষেত্রের গুরুত্ব পর্যালোচনা ঃ— সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র মঙ্গলকোট প্রত্নক্ষেত্রেই, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ, এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের সময় পর্যন্ত একটানা প্রবাহমান সভ্যতার ধারা যে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্তমান ছিল তা এখানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর দ্বারাই প্রমাণ হয়। শুরুতেই বলা যায় এখানকার সর্বনিম্ন স্তরে প্রাপ্ত কৃষ্ণ লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র, বালুকা প্রস্তরে নির্মিত থালা, চিত্রিত ও চিত্রবিহীন মৃৎভান্ড বা কলস, নালীযুক্ত পানপাত্র, ধূসর বর্ণের নক্সাসহ মৃৎপাত্র, পোড়া মাটির পুতুল প্রভৃতির আবিষ্কার তাম্রাশ্মীয় যুগের স্বাক্ষর বহন করে। (৩৩)

এরপরে বলা যায় এখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে প্রস্তরায়ুধ সহ নবাশ্মীয় এক কুঠার— যা কাটোয়া মহকুমা সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এটিও তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার দ্যোতক। *এখন এখানে প্রাপ্ত উল্লেখ্য পোড়ামাটির মাতৃকা মূর্তির কথায় বলা যায়, সেটি খ্রীষ্ট* পূর্ব ১৩০০ শতকের ভাস্কর্য্যের অন্যতম নিদর্শন। এই ধরণের মাতৃকা মূর্তি পূর্ব ভারতের কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। (৩৪)

এই মঙ্গলকোট প্রত্নক্ষেত্রেই তাম্র প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সঙ্গেই এখানে তামা ও লোহার ব্যবহারের নিদর্শন দেখা গেছে, এতে প্রমাণ হয় যে, এখানে তাম্র প্রস্তর যুগের অধিবসতিদের লোহার ব্যবহারও জানা ছিল। তাই বলা যায় লৌহ শিল্পের সঙ্গেও

তাদের সম্যক পরিচয় ঘটেছিল। এখানে বিভিন্ন লৌহ ও তাম্র দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় এখানকার সংস্কৃতিকে তাম্র-লৌহ যুগ বা তাম্র-লৌহ সংস্কৃতির যুগও (Chalco-Ferous Age/Chalco Ferous Cultural Age) বলা যায়।

অন্যদিকে এখানে পাওয়া প্রত্নদ্রব্যাদির মাধ্যমে এই মঙ্গলকোট প্রত্নক্ষেত্রটিকে রাঢ় বঙ্গের তাম্র প্রস্তর সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহের এক গুরুত্বপূর্ণ ধারক ও বাহক বলা যায়। আবার এও বলা যায় যে, একমাত্র মঙ্গলকোট প্রত্নক্ষেত্রের অধিবসতিদের সঙ্গে উত্তর ও মধ্য ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সংঘটিত হয়েছিল এবং তা ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এই মঙ্গলকোটেই আবিষ্কৃত প্রত্ন দ্রব্যাদির মধ্যে বেশ কিছু সিলমোহর সহ প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন স্তরে ও সময়কালে প্রাপ্ত ধাতব মুদ্রা রয়েছে। সেগুলি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বক্তব্য যে, সেগুলি মৌর্য, শুঙ্গ-কুষাণ ও গুপ্তযুগের মুদ্রা ও সিলমোহর। সেগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐতিহাসিক পর্বের প্রাচীনতাকেই প্রমাণিত করে। পাল ও সেনযুগের অনেক দেব মূর্তি ও পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ সময়কালের সভ্যতাও এখানে বিস্তৃত ছিল সেটাও প্রমাণিত হয়।

এমনকি বঙ্গে মুসলমান আমলের প্রথম পর্বে তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী যেমন— উজ্জ্বল নীল বর্ণের পাত্র, চীনামাটির পাত্র, এনামেলের প্রলেপ দেওয়া পাত্র এখানে আবিষ্কৃত হওয়ায় এটাই অনুমিত হয় যে বঙ্গে মুসলমান আধিপত্যের সময়কালেও এখানে মুসলমান অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মুদ্রাও এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতেও প্রমাণ হয় যে সে আমলের প্রভাব এখানেও বেশ পড়েছিল। তাই বলা যায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত একমাত্র এখানেই ক্রমানুসারী এক সভ্যত্রর ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল।

এখানকার সভ্যতা মুখ্যতঃ কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতার অনুসারী হলেও মৌর্য-শুঙ্গ কালেই এখানে ঘর-বাড়ী নির্মাণ কৌশল, কূপ খনন, বাঁধান উঠান ইত্যাদির প্রেক্ষিতে বোঝা যায় সেই সময় এই এলাকা উত্তর ও মধ্য ভারতের নগর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সে ও শহর সভ্যতায় উন্নীত হয়েছিল, বিশেষ করে নদীকেন্দ্রিক এই এলাকা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলেও শহর সভ্যতায় রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

প্রত্নক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিমন্ডল ঃ— এখন ধর্মীয় প্রভাবের কথায় আসা যাক— এখানে গুপ্ত পূর্বযুগের এক জৈন তীর্থঙ্করের দিগম্বর মূর্তি পাওয়া গেছে— যা কায়াৎ সর্গ ভঙ্গিমায় দন্ডায়মান। এর দুপাশে মাল্যদানরত দুই গন্ধর্ব মূর্তি আর তীর্থঙ্করের দু'দিকে রয়েছে ২টি হংসমূর্তি। এহেন জৈন তীর্থঙ্করের প্রাপ্ত মূর্তির দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে,

একদা এখানে জৈন ধর্মের প্রভাব ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এখানে পাওয়া আর এক জৈন দিগম্বর মূর্তি বাবলাডিহি গ্রামে ন্যাংটাশ্বর শিব নামে পূজিত হচ্ছে। আসলে ওটি জৈনদের ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ। [৩৫]

দ্বিতীয়ত— এখানে বহু বৌদ্ধ মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে— তার একটি এখানকার পীঠক্ষেত্র মঙ্গলচন্ডীর মন্দিরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। এখানকার হোসেনশাহী মসজিদের স্তম্ভে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীচন্দ্রসেন' নামাঙ্কিত প্রস্তর স্তম্ভ লক্ষ্য করেছিলেন, ফলে এটি কোন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তার উপাদান দিয়েই তৈরী হয়েছিল, [৩৬] এবং এর অবস্থান উচু ঢিবির উপর হওয়ায় একে অনেকেই বৌদ্ধস্তূপের উপরেই তা নির্মিত বলে অনেকেই অনুমান করেন। তা সে সকল অনুমানের কথা বাদ দিলেও এই প্রত্নক্ষেত্রে যত্রতত্র বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় এখানে যে এক সময় বৌদ্ধ প্রভাব বেশ ব্যাপক ছিল তা বোঝা যায়।

তৃতীয়ত— এই অঞ্চল যে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুধর্মের প্রভাব পুষ্ট ছিল তার প্রমাণ হিসাবে এখানে পোড়ামাটির বহু দেবমূর্তি ও বহু প্রস্তর নির্মিত দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে।

চতুর্থত— পরবর্তীকালে এই এলাকা মুসলমান অনুপ্রবেশের সময় থেকেই মুসলমান অধিকারে এসেছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন বক্তিয়ার খলজী রাজনগর অধিকার সমাধা করে অজয় অতিক্রম কালে মঙ্গলকোটের হিন্দু রাজাকে পরাজিত করেই নদীয়া অভিযান করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮ জন আউলিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পর হিন্দু রাজা সম্ভবত বিক্রমজিৎকে পরাজিত করেই এখানে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল— তাই মঙ্গলকোটকে আঠার আউলিয়ার দেশও বলা হয়। তাছাড়া এখানে অনেক প্রাচীন মসজিদ, মাজার, পীরস্থানই প্রমাণ করে যে একদা এই অঞ্চল মুসলমান প্রভাবেও পুষ্ট হয়েছিল।

পরিশেষে এটাই বলা সঙ্গত যে, এই প্রত্নক্ষেত্রে সভ্যতার সেই উষালগ্ন থেকে প্রাচীন সভ্য মানুষেরা যে অধিবসতি গড়ে তুলেছিল— যুগ-পরম্পরায় ক্রমানুসারী বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ধর্মীয় পরিমন্ডলের মধ্য দিয়েই অবিচ্ছিন্নভাবেই আধুনিক কাল পর্যন্ত তা একটানা প্রবাহিত হয়েছিল।

এতক্ষণ রাঢ়বঙ্গের গোপভূমের উল্লেখ্য কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্রের কথা বলা হল, যেখানে পুরামাত্রায় সরকারী ও সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে খননকার্য পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়াও গোপভূমের আরও কিছু প্রত্নক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ক্ষুদ্র পরিসরে সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে খননকার্য পরিচালিত হয়েছিল তাদের সম্পর্কেও আলোচনার প্রয়োজন। এগুলি ছাড়াও আরও কিছু সম্ভাবনাময়

প্রত্নক্ষেত্র রয়েছে যেগুলি সরকারীভাবে খনিত না হলেও সেখানে অনেক সময় ব্যক্তি উদ্যোগে বা প্রকৃতিগতভাবে জল-বৃষ্টি, বন্যার প্রভাবে অনেক মূল্যবান প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। তাই সেগুলিও সম্ভাবনাময় প্রত্নক্ষেত্র। সেগুলিতে সরকাবী প্রচেষ্টায় খননকার্য শুরু হলে বহু লুপ্ত ইতিহাস অবশ্যই প্রকাশ হবে। সেহেতু তাদের বিষয়েও আলোকপাতের প্রয়োজন। তাই আলোচনাকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐ সকল প্রত্নক্ষেত্রগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। যেমন— ১) ক্ষুদ্র পরিসরে উৎখনিত প্রত্নক্ষেত্র ২) সম্ভাবনাময় প্রত্নক্ষেত্র।

—ঃ ক্ষুদ্র পরিসরে উৎখনিত প্রত্নক্ষেত্রসমূহ ঃ—

গোস্বামী খন্ড ঃ— গোপভূমের আওতায় আউশগ্রাম ২নং ব্লকের অধীন প্রখ্যাত প্রত্নক্ষেত্র পান্ডুরাজার ঢিবির ২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে ও পশ্চিম প্রান্তে D.V.C. ক্যানেল এর দক্ষিণে এই প্রত্নক্ষেত্রটি অবস্থিত। ভৌগোলিক পরিভাষায় এটি ২৩° ডিগ্রী ৩৫' মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭° ডিগ্রী ৩৮' মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

এখানে ১৯৬৩ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক খননের ফলে আউশ গ্রাম থানার সমৃদ্ধশালী ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার দ্বারা সৃষ্ট জমাট ল্যাটেরাইট পাথরের তৈরী মধ্যযুগীয় এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। সমগ্র প্রত্নক্ষেত্রটির আয়তন হল ২১.১৫ মিঃ × ১১.৪০ মিঃ তবে দেবায়তন বা স্তূপটি ৮.৪০ মিঃ × ৬.২৫ মিটার পরিমিত স্থান জুড়ে অবস্থিত।

এই ভগ্নাবশেষ দেবায়তনের প্রবেশ পথের কাছেই রয়েছে ৪টি স্তম্ভ। অতীতে এরই উপর হয়ত ছাদের অবস্থান ছিল বলেই মনে হয়। বড় মন্দিরের গায়েই এক ছোট মন্দিরের অবস্থান দেখে মনে হয় এটি হয়ত পঞ্চায়তন রীতি কৌশলেই নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্যটির দেওয়াল গাত্রে সংস্কারের চিহ্ন দেখে মনে হয় এটি পরবর্তী কোন এক সময়ে সংস্কৃত হয়েছিল।

খননকার্যের ২য় ও ৩য় পর্বে এই দেবালয়ের মেঝের সন্ধান পাওয়া গেছে। মেঝেতে পোড়ামাটির বাটি এবং কারুকার্য মন্ডিত ফলক পাওয়া গেছে আর এই পর্বে পাওয়া গেছে প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখন্ড এবং ধ্বংস স্তূপের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েকটি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি যা ঐতিহাসিকগণের মতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পালযুগের স্থাপত্যকলা বলেই অনুমিত। মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল পাথরের তৈরী ময়ূরবাহন কার্তিকের এক ভগ্ন মূর্তি আর এক সূর্য মূর্তি। তাছাড়াও এখানে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বহু নিদর্শনসহ পাওয়া গেছে শিরস্ত্রাণ পরিহিত এক মনুষ্য মূর্তির মস্তকাংশ— যা পশ্চিম এশিয়ায় পাওয়া এক প্রাচীন মূর্তির সঙ্গেই তুলনীয়।

মূল মন্দির গাত্রের এক স্থানে ইটের তৈরী ঠেস দিয়ে বসার মত জায়গা বা বেঞ্চ আবিষ্কৃত হয়েছে— সে কথা পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাসগুপ্তের লেখা The Excavation at Pandu Rajar Dhibi, P— 36-38 এ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আবিষ্কৃত মূল স্থাপত্য কীর্তিটি পাল যুগেই নির্মিত হয়েছিল— হয়ত রাজা পান্ডুদাস এটি নির্মাণ করেছিলেন। গোস্বামীখন্ডে তাঁর কাছারি ছিল বলে শোনা যায়। (৩৭)

বসন্তপুর, সিলুট ঃ— গোপভূমের উল্লেখ্য প্রত্নভূমি পান্ডুরাজার ঢিবির প্রায় ৭ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কুনুব নদীর উত্তর তীরে কাছাকাছি ২টি গ্রাম সিলুট ও বসন্তপুর। অন্যদিকে আউশগ্রাম থেকেও কিছুটা উত্তরে এগিয়ে কুনুব পার হয়েও সেখানে যাওয়া যায়। ভৌগোলিক পরিভাষায় ২৩° ডিগ্রী ৩৩' মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭° ডিগ্রী ৪১' মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমায় এর অবস্থান।

এখানকার ঢিবি হাজরাডাঙ্গা নামেও পরিচিত। পূর্বে প্রচন্ড বৃষ্টির পর এই ডাঙ্গায় মালার পুঁতি, সোনা রূপার কুচি ও প্রাচীন মুদ্রাও পাওয়া যেত। এখানে পাওয়া প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল বহু ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ যা পান্ডুরাজার ঢিবিতে পাওয়া প্রত্নবস্তুর সমগোত্রীয়। এই বসন্তপুরেই আবিষ্কৃত হয়েছিল তামার পিন্ড। (৩৮)

বসন্তপুর ঢিবি থেকেই আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত কৃষ্ণ এবং লোহিত কৌলাল, অত্যুজ্জ্বল লোহিত কৌলাল, আঁচড় কাটা কৌলাল এবং চ্যানেল স্পাউটেড্ মৃৎপাত্রের টুকরাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অত্যুজ্জ্বল লোহিত কৌলালের উপর কালো রঙে চিত্রিত সমান্তরাল রেখা, নিরেট ত্রিভুজ এবং হেলানো রজ্জু পরিকল্পিতভাবে অধ্যারোপিত করার প্রচেষ্টা বিরল হলেও এখান থেকে আবিষ্কৃত ঘটিগুলির গায়ে নিরেট ত্রিভুজ এবং বেষ্টনী ও নানান জ্যামিতিক নমুনা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও এখান হতে চকলেট লাল রঙের এক খন্ড কৌলাল পাওয়া গেছে যা ক্রীম রঙের প্রলেপ দ্বারা চিত্রিত এবং হেলান সমান্তরাল রেখাচিত্র সমন্বিত কোন ঘটির বলে মনে হয়। বসন্তপুর হতে আবিষ্কৃত কৌলাল বা মৃৎপাত্রের গায়ে অভিনব রীতির চিত্রণ মনোমুগ্ধকর। এই জাতীয় চিত্রণের পশ্চাতে এক সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্য রয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। (৩৯) বসন্তপুরের লাগাও উত্তর গায়ের গ্রাম সিলুটেও কৃষ্ণ লোহিত বর্ণের বহু মৃৎপাত্র সংগৃহীত হয়েছে। (৪০)

সাতকাহনিয়া ও বনকাটি ঃ— গোপভূমের অন্তর্গত কাঁকসা ব্লকের অধীন অজয়ের দক্ষিণতীরে জঙ্গলঘেরা পরিবেশে এই গ্রাম দু'টির অবস্থান। এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার পক্ষে ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন অধিকর্তা স্বর্গত পরেশ দাসগুপ্ত

ও অন্যতম অধীক্ষক ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এখানে প্রত্ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত শিলা, বৃক্ষাংশ থেকে নির্মিত হাত কুঠার, ছেদক, বৃক্ষাদন (choper), বাটালি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। এগুলি শেষ প্রস্তর যুগের ব্যবহৃত আয়ুধ বলে পন্ডিতগণ মনে করেন। এ জাতীয় শিকারের উপযোগী হাত কুঠার ব্রহ্মদেশের অনিয়াথিয়ান কৃষ্টির সমগোত্রীয় বলে অনুমান করা হয়। এই বৃক্ষ জীবাশ্ম নির্মিত আয়ুধের বয়স আনুমানিক দেড় লক্ষ হ'তে দু'লক্ষ বছর। [৪১] এই বনকাটিতেই আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্য প্রস্তর ও নব্য প্রস্তর যুগের বহু প্রস্তরায়ুধ যা বাঁকুড়ার বন আশুড়িয়ায় প্রাপ্ত আয়ুধ ও বীরভূম জেলার পতন্ডা ও হেতমপুর গিরিডাঙ্গায় এবং বীরভানপুরে প্রাপ্ত আয়ুধ সমূহের সমগোত্রীয়। পরে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ও এই অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে কোয়ার্টজ ও ফসিল উডের পুরা প্রস্তর যুগ ও শেষ প্রস্তর যুগের কিছু আয়ুধ সংগ্রহ করে। [৪২]

এখন ঐ দুই গ্রাম থেকে তৎকালীন প্রত্নতাত্ত্বিক অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও সহযোগী দুই অধীক্ষক দেবকুমার চক্রবর্তী ও শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়দের আবিষ্কৃত দ্রব্য সামগ্রী, বাঁকুড়ার প্রখ্যাত গবেষক মানিকলাল সিংহের বিবরণ থেকে সংক্ষেপে তুলে দেওয়া হল ঃ—

ক) শিলীভূত কাঠের দ্বারা নির্মিত হাত কুঠার— যার পার্শ্বদেশ চাপ দিয়ে সুচাল করা হয়েছে। যন্ত্রটির হাতল অর্ধত্রিভুজাকৃতি গোলাকার।

খ) কোয়ার্টজাইটে প্রস্তুত হাত কুঠার। এই আয়ুধটির আকার অনেকটা পাখীর ঠোঁটের আকারে নির্মিত। যন্ত্রের পেটের দিক খুবই উত্তল, মধ্যের শিরায় বহিঃস্তরের ঢাল স্বাভাবিক। পৃষ্ঠ ও কিনারাগুলি শল্কছেদের দ্বারা কার্যকরী। প্রান্তটিকে সূক্ষ্ম কোণের আকার দেওয়া হয়েছে।

গ) শুশুকের লেজের আকারে শিলীভূত কাঠের দ্বারা তৈরী ছেদক। এই আয়ুধটি সোহান রীতি জোঁকের আকার আয়ুধের সঙ্গে তুলনীয়।

ঘ) শিলীভূত কাঠের দ্বারা তৈরী হাত কুঠার— আয়তনে বেশ ছোট।

ঙ) কোয়ার্টজাইটে তৈরী হাত পাখার আকারের ছেদক। এর কার্যকরী প্রান্তে শল্কছেদের দাগ।

চ) শিলীভূত কাঠের তৈরী কলাই কাটা ছুরির আকারের ছোট আয়ুধ। এতে পুনরায় হস্তক্ষেপের চিহ্ন দেখা যায়।

উল্লেখ্য আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলির প্রসঙ্গে প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ডি. ডি. কৃষ্ণস্বামী শিলীভূত কাঠ দ্বারা তৈরী পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত ঐ সকল আয়ুধগুলির প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন যে, সুদুর অতীত কালে পশ্চিম ভারতের সঙ্গে পূর্ব ভারতের দ্বীপগুলিতে যাতায়াতে জলযান ব্যবহৃত হত। ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাভার সঙ্গে এই সম্পর্ক জলপথেই হত। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেও সে জাতীয় সম্পর্ক সুদুর অতীতেই গড়ে উঠেছিল। চীনের চাও

কাও কিনের কথা স্মরণ করেই বলা যায় যে, বনকাটির আয়ুধগুলি আদিম মানুষের অবদান। আদি সোহান রীতির আয়ুধ নির্মাণের কাল ৪০০০০০ হতে ২০০০০০ বছর পূর্ববর্তী। [৪৩]

আড়াগ্রাম ঃ— দুর্গাপুরের সন্নিকটে আর একটি প্রাচীন গ্রাম আড়ায়, ভূপৃষ্ঠ হতে ১.৯১ মিঃ গভীরে ১নং ট্রেঞ্চের পঞ্চম স্তরে পাওযা প্রত্নবস্তুর কার্বন-১৪ পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে, সেখানে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকে অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। Indian Archaeology, A Review 1984-85, Page-15 থেকে এ তথ্য জানা যায়। তাছাড়া আরও প্রাচীনকালের বহু প্রস্তরায়ুধ এখানেও আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত সেই সকল প্রস্তরায়ুধের প্রেক্ষিতে এটা বেশ পরিষ্কার যে প্রাগৈতিহাসিক কালেও এখানে এক আদিম মানব গোষ্ঠীর বসবাস ছিল এবং তাদের নির্মিত প্রত্নাশ্মর থেকে ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ পর্যন্ত প্রচুর প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনাবলী পাওয়া গেছে। [৪৪]

গোপালপুর ঃ— দুর্গাপুরের কাছাকাছি গোপালপুর গ্রামেও প্রস্তর যুগের শেষ পর্বের প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয় এবং বহু মৃৎপাত্র— যা তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন তাও পাওয়া গেছে। দুর্গাপুরের নিকটে যে সকল জায়গায় ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য হল— গোপালপুর, আড়া ও সগরভাঙা ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার (Directorate of Archaeology) এই সকল স্থানগুলির উপর গবেষণা করে যে অভিমত দেন তাতে জানা যায় এই রাঢ় বঙ্গে মোট ২২টি আয়ুধ নির্মাণস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে প্রত্নাশ্মর থেকে ক্ষুদ্রাশ্মর সহ প্রচুর প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনাদি রয়েছে। এই সকল নিদর্শনাদির আবিষ্কারক তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব অধিকর্তা মাননীয় পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের মতে ঐ সকল অস্ত্রাদি আর্দ্র যুগের সমাপ্তি এবং হলোসীন যুগের সূচনা পর্বে আনুমানিক ১০,০০০ বছর আগে প্রস্তর আয়ুধগুলি আদিম মানব কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। [৪৫]

—ঃ সম্ভবনাময় প্রত্নক্ষেত্র ঃ—

অতি প্রাচীণকাল থেকেই গোপভূম এলাকায় বিশেষ জনবসতি গড়ে উঠেছিল এবং সেই এলাকা প্রাচীণ সভ্যতার এক বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল তা আজ ঐতিহাসিক প্রত্ন সমীক্ষায় সুদৃঢ় ভাবে প্রমাণিত। মুষ্টিমেয় কয়েক জায়গায় খনন কার্য চালিয়েই তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও গোপভূমের বিস্তৃত এলাকায় যদি খনন কার্য চালিয়ে প্রত্ন সমীক্ষা করা যায় তবে বহু বহু প্রাচীন লুপ্ত ইতিহাস যে জনসমক্ষে উদ্ভাসিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

কারণ এই এলাকার বহু ক্ষেত্রই সম্ভবনাময় প্রত্নক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ব্যক্তি উদ্যোগ এবং প্রাকৃতিক বর্ষন ও বন্যায় অনেক স্থানেই বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির বহুতর সন্ধান আবিষ্কৃত হয়েছে। কাজেই সেই সব জায়গায় খনন কার্য সংঘটিত হলে তম্মায় ঐতিহাসিক সভ্যতার ব্যাপক নিদর্শনাদির সন্ধান পাওয়া মোটেই দুরুহ ব্যাপার নয়। সমগ্র গোপভূম এলাকায এই ধরনের সম্ভবনাময় প্রত্নক্ষেত্র যত্র-তত্র ছড়িয়ে আছে যেগুলি হল যথাক্রমে— দুর্গাপুরের উত্তরে মলানদীঘি, আড়া, পানাগড়ের উত্তরে কাঁকসা বিষ্ণুপুর, আদুরিয়া, রূপনারায়ণপুর-লালগঞ্জ সড়কের ধারে মুক্তাইচণ্ডী, আউশগ্রামের সন্নিকটে ধানাটিকরার ঢিবি, ১১ মাইলের কাছাকাছি মৌখিরা-কালিকাপুর, অজয় নদীর দক্ষিনে কোগ্রাম, কল্যানপুর, নবগ্রাম, ফুটাল, পশ্চিমপাড়া, বালিগ্রাম, বড়গ্রাম, মালিয়াড়া, বনপাড়া, চাকুলিয়া, মদপুর, কোনকাড়া, নদীমপুর, চানক, বরাগড়, বরাবাজার, জহরপুর ইত্যাদি।

এখন ঐ সকল ক্ষেত্রগুলিকে উপেক্ষা না করে তথায় প্রত্ন সমীক্ষার ব্যবস্থা করলে অনেক অজানা ইতিহাস আমাদের কাছে ধরা দেবে তাতে সন্দেহ নাই।

।। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও পত্র পত্রিকা ।।

১) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-১৮
২) ঐ.... পৃঃ-১৮
৩) An Encyclopadia of Indian Archaeology—
A. Ghosh. VOL.-2 .... Page-78,79
৪) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)— নীহার রঞ্জন রায়।.... পৃঃ-৬১
৫) বীরভূম পরিচিতি — সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২৬
৬) পশ্চিমবাংলার প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ঃ একটি রূপরেখা—
ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়। পুরাবৃত্ত (১)।.... পৃঃ-৩৮
৭) An Encyclopadia of Indian Archaeology. VOL-I. Page-330
৮) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১২৬
৯) পশ্চিমবাংলার প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ঃ একটি রূপরেখা— শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৩৮
১০) প্রাগৈতিহাসিক বাংলা— পরেশ দাসগুপ্ত।.... পৃঃ-৯৫
১১) বাংলার ইতিহাস— রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।.... পৃঃ-১৫
১২) সুবর্ণরেখা হইতে মৌরাক্ষী (অজয়)— মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৭২
১৩) The Excavations at Pandu Rajar Dhibi— P. C. Das Gupta. Page-17
১৪) পশ্চিম বাংলার প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ঃ একটি সমীক্ষা— ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৪০

১৫) ঐ " পুরাবৃত্ত (১).... পৃঃ-৪১
১৬) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১৩০
১৭) ঐ.... পৃঃ-১৩০
১৮) সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী (অজয়)— মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৭৪
১৯) ঐ.... পৃঃ-৭৫
২০) The Excavation of Pandu Rajar Dhibi— P. C. Das Gupta. Page-31
২১) পান্ডুরাজার স্তূপের কথা ও কাহিনী— ডঃ পঞ্চানন মন্ডল।
শারদীয়া বর্ধমান— ১৩৬৮।.... পৃঃ-২৮
২২) দ্রষ্টব্য—বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১৩৪
২৩) সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী (অজয়)— মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৭৬
২৪) দ্রষ্টব্য— ঐ.... পৃঃ-৭৬
২৫) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২১
২৬) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)— নীহার রঞ্জন রায়।.... পৃঃ-৬৫
২৭) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম)— যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১৪৫
২৮) বর্ধমান পরিক্রমা— সুধীরচন্দ্র দাঁ।.... পৃঃ-১৫৮
২৯) ঐ " .... পৃঃ- "
৩০) Unpublished Report of the University of Burdwan.
(Museum & Art gallery)
৩১) বর্ধমানের আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি— যা বাঙালী জাতির আদি ইতিহাস।
শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত। স্মরণিকা বর্ধমান উৎসব— ১৪০৭।.... পৃঃ-৮১
৩২) মঙ্গলকোট উৎখনন ঃ একটি প্রতিবেদন— সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়।
পুরাবৃত্ত (১ম).... পৃঃ-১৩৪-৩৯
৩৩) Indian Archaeology : A Review, 1962-63. .... Page-43
৩৪) বর্ধমানের আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি— যা বাঙালী জাতির আদি ইতিহাস।
শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত। স্মরণিকা বর্ধমান উৎসব— ১৪০৭।.... পৃঃ-৮১
৩৫) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়)— যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১৮৩
৩৬) ঐ.... পৃঃ-১০৬
৩৭) পশ্চিম বাংলার প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ঃ একটি রূপরেখা।
শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়। পুরাবৃত্ত (১)।.... পৃঃ-৬৬
৩৮) The Excavation at Pandu Rajar Dhibi— P. C. Das Gupta. Page-35
৩৯) সুবর্ণরেখা হইতে মৌরাক্ষী (অজয়)— মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৬৭
৪০) Indian Archaeology : A Review, 1982-83. .... Page-104
৪১) The Excavations at Pandu Rajar Dhibi—

P. C. Das Gupta. Page-46-48
৪২) পশ্চিমবাংলার প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ঃ একটি রূপরেখা—
ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়। পুরাবৃত্ত (১).... পৃঃ-৩৩
৪৩) সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী (অজয়)— মানিকলাল সিংহ। .. পৃঃ-৬৪-৬৬
৪৪) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-১৯
৪৫) ঐ

।। ইতিহাসের আলোয় গোপভূম ও তার রাজবংশানুচরিত ।।

অজয়-দামোদরের মধ্যবর্তী অরণ্য ঘেরা বিস্তৃত অঞ্চল যা বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান হিসাবে গণ্য-তাই অতীতে 'গোপভূম' নামে পরিচিত ছিল। এখনও এই এলাকা অরণ্যময়। অতীতে তার ব্যাপকতা খুবই গভীর ও নিবিড় ছিল। সেই অরণ্য ঘেরা বন্য পরিবেশের বিস্তৃত চারণক্ষেত্রে দুর্দমসাহসী, অকুতোভয়, দুর্ধর্ষ গোপজাতি তাদের পালিত গবাদি পশুসহ প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলে অধিবসতি গড়ে তুলেছিল তাই এই বিস্তৃত বনময় ক্ষেত্রই একদা 'গোপভূম' নামে পরিচিত হয়েছিল। কেন এই এলাকা গোপভূম এবং তার বিস্তৃতি নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন এই এলাকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মূক অতীতকে জানাই ইতিহাস। কিন্তু সেই অতীতকে জানার বাধা অনেক। কারণ এমনিতেই বাঙালী ইতিহাস বিমুখ জাতি। ইতিহাসের উপাদান সংরক্ষণের প্রচেষ্টা না থাকায় এই জাতির ইতিহাস খোঁজা খুবই কঠিন, তার উপর গোপভূমের ইতিহাস অর্থাৎ আঞ্চলিক ইতিহাস খুঁজে বের করা সে তো পঙ্গুর পর্বত অতিক্রমের মতই দুরূহ প্রচেষ্টা। তবুও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা চলে না। তাই সেই দুরূহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেই হয়। যদিও জানি ঘনায়মান অন্ধকারে বারবার প্রতিহত হবে ঐতিহাসিকের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী। কারণ অতীত যেখানে একেবারেই নীরব, সেই নীরবতার মহাসমুদ্রে অবগাহন করলে হাতের কাছে যা উঠে তা হল যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান জনশ্রুতি, প্রবাদ ও পুরাণ কাহিনী।

এই প্রবাহমান উপদানগুলি কিন্তু ইতিহাস নয়। তা না হোক— তবুও যুগ যুগ ধরে প্রচলিত প্রবাদ ও পুরাণ কাহিনীর মধ্যে খোঁজা-খুঁজি করলে ইতিহাস গন্ধী কিছুই মিলবে না তা জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ কোন কাহিনী, প্রবাদ বা কল্পনা যখন জনচিত্তে শিকড় বিস্তার করে, তখন মাটিতেও তার মূল থাকা সম্ভবপর। একই কিংবদন্তী যখন কোন স্থানে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তখন তার ঐতিহাসিক মূল্য কোন সন্ধানীই অস্বীকার করতে পারে না। [১] তাই বলা যায় "পুরাণ বা প্রবাদ ইতিহাস নহে, কিন্তু ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের সূত্রগুলি নিহিত আছে পুরানোক্ত বর্ণনা ও প্রবাদের মধ্যে। [২] পুরাণ মানেই হচ্ছে পুরাতন কালের কথা- 'পুরাভবম্' ইতি পুরাণম এবং 'ইতিহ-আস'- অতীত হয়েছে যা তাই ইতিহাস।

অতএব এই দেশের প্রাচীন পাহাড় পর্বত নদ-নদী তীর্থক্ষেত্র জনপদ ইত্যাদির বিবরণ ও বর্ণনা সম্যকভাবে জানতে হলে প্রাচীন পৌরানিক কাহিনী এবং প্রাচীন গ্রন্থ হিসাবে রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণাদি সহ বৌদ্ধ জৈন ধর্ম গ্রন্থাদির আশ্রয় নিতেই হয়। কারণ ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ যেখানে মেলেনা সেখানে ঐগুলিই তো অন্ধকারের দিশা।

এমনই এক পুরাণ কাহিনী যা প্রায় চার হাজার বছর আগের লেখা, মহাভারতের মাধ্যমেই আমাদের বঙ্গ দেশের নামের উল্লেখ পাই। তাতে বলা হয়েছে দীর্ঘতমা নামে এক অন্ধ ঋষি কর্তৃক বলিরাজা তার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচ ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করিয়ে তাদের নামে নামিত পাঁচ রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। সেই সন্তান তথা রাজ্যগুলি হল যথা ক্রমে-অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে দীর্ঘতমা খ্রীঃ পূঃ ১৬৯০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। [৩] সেই নিরিখে বলা যায় এই বঙ্গ দেশ খুবই প্রাচীন।

আরও এক প্রাচীন গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে রচিত 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থেও এই দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের পাদাঃ" তাতে বঙ্গ দেশের কথা বলা হয়েছে। খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে রচিত জৈন আচরঙ্গ সূত্রেও বঙ্গের রাঢ় দেশের নাম পাওয়া যায়।

এই বঙ্গ দেশ অতীতকালে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন— পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, সমতট ইত্যাদি। এদের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও অনেক সময়েই এগুলি বঙ্গের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। এই দেশগুলির মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন অংশ সুহ্ম নামে অভিহিত হয়েছিল এবং খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। পরবর্তী কালে এই সুহ্ম বিভাগই রাঢ় নামে পরিচিত হয়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ অবশ্য বলেছেন সুহ্ম ও রাঢ় এক এবং সমার্থক। এই রাঢ় দেশই হল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর পশ্চিমের বিস্তৃতাংশ।

সুহ্ম ও রাঢ় উভয় দেশই এক এবং অভিন্ন হলেও দীর্ঘ দিন পরে তার মধ্যেও বিভাজন শুরু হয়। একাদশ শতকে এই দেশ আবার দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে তার উল্লেখ পাই। সেখানে এই দেশকে উত্তীর লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কনলাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়) নামে ২টি ভাগে বিভক্ত হতে দেখা যায়। ভবিষ্য পুরাণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে 'রাঢ়ী খণ্ড জাঙ্গল' নামে এক জনপদের উল্লেখ তাৎপর্য পূর্ণ। এই 'রাঢ়ী খণ্ড জাঙ্গল' উত্তর রাঢ় ভূখণ্ডেরই অন্তর্গত ছিল। সাধারণ ভাবে বলা যায় বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার অংশই উত্তর রাঢ়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। [৪] তবকাত-ই নাসিরীতেও উত্তর রাঢ়ের এই সীমানাকেই স্বীকার করা হয়েছে। [৫]

এখন 'রাঢ়' শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা যায় যে, টলেমীর (Ptolemy) ভূগোলে Treatise on Geography-তে Ganga ridai কথাটির উল্লেখ আছে এবং মেগাস্থিনিসের গ্রন্থেও রাঢ়ের গঙ্গা হৃদয় (Gangaridai) নাম পাওয়া যায়। আবার আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় (৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বঙ্গে গঙ্গারিড়ি নামে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল [৬] অনেকের মতে গঙ্গারিড়ি থেকেই গঙ্গারাঢ়, তার থেকে সংক্ষেপে রাঢ় শব্দের আবির্ভাব হয়েছে। অন্যমতে এটি সাঁওতালী শব্দ রাঢ়ো থেকে নিষ্পন্ন-যার অর্থ নদী গর্ভস্থ পাথুরিয়া জমি। [৭]

সেই যাই হোক বঙ্গের রাঢ় ভূমি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ইতিহাসের বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের আলোচ্য গোপভূম অর্থাৎ পশ্চিম বর্ধমান অতি অবশ্যই দক্ষিন রাঢ় সীমায় অবস্থিত ছিল। প্রামাণ্য তথ্য হিসাবে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম দশকে উৎকীর্ণ নৈহাটি লিপির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই নৈহাটি লিপি অনুসারে উত্তর রাঢ় ও বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। [৮]

সেই উত্তর রাঢ়ের এক বিস্তৃত অংশ হিসাবে দামোদর নদের উত্তর অংশই বর্ধমান নামে পরিচিত ছিল, কারণ খ্রিঃ পূর্ব ষষ্ঠশতকে রচিত জৈনগ্রন্থ আচরঙ্গ সূত্রে উল্লেখ আছে যে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী বহু অত্যাচার সহ্য করে এই অঞ্চলে একাধিক্রমে বারো বছর অবস্থান সহ এখানকার বন্য জাতির মধ্যে জৈনধর্ম প্রচার করেছিলেন। মহাবীরের অপর নাম বর্ধমান স্বামী। তাই অনেকের মতে এই এলাকায় বর্ধমান স্বামীর অবস্থান হেতু নাম হয় বর্ধমান। সে দিক থেকে বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান যা আমরা গোপভূম হিসাবে আলোচনায় আনতে চাই তাও অতি প্রাচীন কাল থেকেই বর্ধমান ভুক্তি (প্রদেশ)র অধীন ছিল।

সে এলাকাই গোপভূম এবং তারই ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমেই দেখা যাক এই এলাকা প্রাচীন কালেও কতখানি সভ্য ছিল। সেখানের অজয়-দামোদর কুনুর নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল এক প্রাক আর্য সভ্যতা-যার ইতিহাস আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতা যারা সৃষ্টি করেছিল তারা জাতি হিসাবে ছিল প্রাচীন বঙ্গ জাতি। তারা আর্য জাতির বংশধর নয়। এ প্রসঙ্গে পোগভূমের প্রত্নক্ষেত্র অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তবুও সংক্ষেপেই বলতে হয় সেই জাতিই হল দেশের আদিম অধিবাসী। তারাই দেশীয় কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি গোষ্ঠীর সংমিশ্রনে অষ্ট্রীক গোষ্ঠী। তাদের সঙ্গে আরও অনেক গোষ্ঠী সংযুক্ত হলেও সব থেকে উল্লেখ্য দুই উন্নত গোষ্ঠী দ্রাবিড় ও আলপাইন গোষ্ঠীর সংযোজন ঘটেছে। এই আলপাইনরাও বিশেষ উন্নত কৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। এদের বংশধররাই প্রধানত বর্তমান বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষ। তাঁহারা যে বৈদিক আর্যগণ হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন এবিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন মতভেদ

নাই।[৯] পরবর্তী কালে আর্য সংমিশ্রন সম্পূর্ণ হওয়ায় বলা যায়, বঙ্গের জনসমষ্টি কোন একই অভিন্ন মানব গোষ্ঠীর বংশোদ্ভব নয়। বরং বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর সংমিশ্রনের ফলে জাত এক সংকর জাতি।[১০]

প্রসঙ্গত বলা যায় বঙ্গে আর্য প্রভাব পড়েছিল অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক পরে, কারণ শুরুতে তারা পাঞ্জাবের পঞ্চনদের উপত্যকা ও পরে আর্যাবর্তে আশ্রয় নিলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে তাদের বিজয় অভিযান চালাতে সচেষ্ট হলেও বঙ্গের অধিবাসীদের শৌর্যবীর্যের কাছে তারা বারে বারে প্রতিহত হয়েছিল, ফলে বিদ্বেষ বশতঃ বঙ্গবাসীদের তারা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত এবং তাদের ঘৃণা করেই দস্যু, অসুর, পক্ষী ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করত। তারা এই দেশকে অপবিত্র ঘোষণা করেও কেবল তীর্থ পরিক্রমা ছাড়া এদেশে প্রবেশ করলে প্রায়শ্চিত্ত করা বিধান দিয়েছিল। তাই সেই ব্রাত্য সমাজ তাদেরকে সহজে মাটি ছেড়ে দেয় নাই ফলে উভয় কৃষ্টির সংঘাত বেশ জোরালো ভাবেই সংঘটিত হয়েছিল তারই ফলে বঙ্গে আর্যদের প্রবেশ বেশ বিলম্বিতই হয়েছিল- অর্থাৎ বৈদিক যুদের শেষ পর্বেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রীষ্ট পূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ সময় কালে মৌর্যযুগে বঙ্গে আর্যদের অনুপ্রবেশ শুরু হলেও তাদের ব্যাপকতা ঘটেছিল ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তযুগ থেকে। তার বহু আগেই খ্রীষ্ট পূর্ব দুই হাজার বছর সময়কালে রাঢ় বঙ্গের গোপভূমের অজয়-দামোদর কুনুর-কোপাই নদীর তীরে তীরে বীরভানপুর, ভরতপুর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, গোস্বামী-খন্ড, মঙ্গলকোট, বসন্তপুর, মহিষাদল ইত্যাদি এলাকায় প্রাক আর্য গোষ্ঠীর দ্বারা সিন্ধু সভ্যতার সমগোত্রীয় এক তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার ব্যাপক নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় এ অঞ্চলের অধিবাসীরাও যে সুসভ্য ও উন্নত কৃষ্টির অধিকারী ছিল সে ইতিহাস আজ সর্বজন স্বীকৃত।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে গোপভূমের বহির্বাণিজ্য প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পাণ্ডু রাজার ঢিবির ৩য় স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি স্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত সিলমোহর। এই সিলমোহরটিকে ঘিরে পণ্ডিত মহলে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্কের বেড়াজাল। অনেকের মতে এটি ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রতীক। এটি এসেছে ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ক্রীট দ্বীপ থেকে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, তখনও এখানে জলপথে বহির্বাণিজ্যের চল ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের অনেকেই এটাই মনে করেন যে, এখানকার অধিবাসীরা জল পথে ভূমধ্যসাগরীয় তীরাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করত এবং সেখানকার ক্রীট দ্বীপ থেকে বণিকেরা এটি সঙ্গে এনেছিল।

এটি নিয়ে তর্ক উঠলেও অধিকাংশ প্রত্নগবেষকই মেনে নিয়েছেন যে এটি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ক্রীট দ্বীপ থেকেই আগত। কেউ কেউ একে সেলিবিস দ্বীপ থেকে আগতও বলেছেন। সে যাই হোক সেই প্রাচীন কালেও রাঢ় বঙ্গের গোপভূম

এলাকার অজয় তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরাও যে জলপথে দেশ বিদেশে যাতায়াত করে বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্ত ছিল সে ইতিহাস অঅজ বেশ স্পষ্ট হয়েছে।

এখন এই গোপভূমে আরও প্রাচীন কালে প্রস্তর যুগীয় সভ্যতাও যে এখানেই গড়ে উঠেছিল— সে ইতিহাস ও আজ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে প্রমাণিত হয়েছে। দুর্গাপুরের সন্নিকটে দামোদর নদের উত্তরে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম বীরভানপুর। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলেই আবিষ্কৃত হয় প্রচুর পরিমাণে ক্ষুদ্রাশ্মীয় প্রস্তর আয়ুধ সম্ভার। ঐ সব প্রস্তরায়ুধের নির্মাতাগণ ছিল Late stone age তথা প্রস্তর যুগের শিকারজীবী মানুষ। তারা প্রধানত ছিল যাযাবর ও পশু শিকারী। এ স্তরে আরও যা আবিষ্কৃত হয়েছিল তা হল কুটিরাদির চিহ্ন স্বরূপ কয়েকটি খুঁটি ও খুঁটির কিছু গর্ত। এর দ্বারা সেই সময়কার লোকেরা যে কুটির নির্মানে অভ্যস্ত হয়ে আসছিল তা বোঝা গেলেও তখনও তারা কৃষি কেন্দ্রিক সমাজ জীবনে অভ্যস্ত হয়নি। তখনও তারা ছিল খাদ্য সংগ্রহকারী, খাদ্য উৎপাদনকারী হয় নি। খ্রীষ্ট পূর্ব ৪০০০ বছর সময়কালেই তখন তারা ঘোরাঘুরি করছিল। তাদের বিচরণ ক্ষেত্র হিসাবে এই বীরভানপুর ছাড়াও গোপভূমের বিস্তৃত এলাকা যেমন আড়া, বনকাটি, কাঁকসা, সাগরডাঙ্গা, গোপালপুব হয়ে ক্রমশ, অজয় কুনুরের অবাবহিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

পরে পরে সেই বন্য যাযাবর শ্রেণীর মানুষ কালে কালে খাদ্য সংগ্রহের পরিবর্তে খাদ্য উৎপাদনের কলা কৌশল আবিষ্কার করে তারা নবপলীয় যুগে উন্নীত হয়েছে। সেও খ্রীষ্টপূর্ব ২ হাজার বছর আগেকার কথা। তারও পরে তারা শিখেছে ধাতুর ব্যবহার। বিশেষকরে তামার ব্যবহার রপ্ত করার পর তাম্রাশ্মীয় সভ্যতায় (১২০০ খ্রীঃ পূর্বব্দ) উন্নীত হয়েছে। এই সময়ের আগেই তারা খাদ্য উৎপাদনের কলা কৌশল রপ্ত করে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে। এইভাবে দিন এগিয়ে চলতে থাকায় তারাও ক্রমশ উন্নত হয়ে লোহার ব্যবহার শিখেছে। পরে ফলাযুক্ত অস্ত্রের ব্যবহার সহ প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য সম্ভার তৈরীর কলাকৌশল রপ্ত করে ধীরে ধীরে উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এই ভাবে এই গোপভূমের মানুষ প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে ক্রমবিবর্তিত হতে হতে উন্নততর সভ্যতার দিকে এগিয়ে গেছে— তারই সুদৃঢ় প্রমাণ নির্ভর ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে এখানকার অজয় দামোদর কুনুর নদীর অববাহিকায়।

এতক্ষণ গোপভূমের ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের পর্বে ছিলাম। এবার পুরাণ কাহিনী, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির প্রেক্ষিতে এতদ অঞ্চলের ইতিহাসের কিছু কাহিনী ও ঘটনাবিন্যাস লক্ষ্য করা যাক। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই পালি ধর্মগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশের কথা উল্লেখ্য। তাতে বলা হয়েছে এই রাঢ় বঙ্গের গোপভূম এলাকার এক অতীত গৌরব কাহিনী তথা ঐতিহাসিক কাহিনী। সে কাহিনীটি হল— "বর্তমান বর্দ্ধমান জেলায় সিংহারণ

নদের তীরবর্তী সিংহপুর নগরে সিংহবাহু নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ প্রজা পীড়ন দোষে নির্ব্বাসিত হইয়া খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সাত শত অনুচর সহ লঙ্কাদ্বীপে গিয়া তথাকার রাজা হন। তদবধি লঙ্কার 'সিংহল' নাম হইয়াছে। [১১] সিংহলী ঐতিহ্যের মতে এই ঘটনার তারিখ এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্বানের তারিখ (অর্থাৎ ৫৪৪ খ্রীষ্ট পূর্ব) একই। [১২] অর্থাৎ যে দিন বুদ্ধদেব মহানির্বান লাভ করেছিলেন সেই দিনই বঙ্গের দামাল ছেলে বিজয় সিংহ লংকা বিজয় করেছিলেন তারই নামে সেই দ্বীপ ভূমের নাম হয়েছিল 'সিংহল'- যা বর্তমানে 'শ্রীলঙ্কা' নামে পরিচিত।

এবার আসা যাক ঐতিহাসিক নিদর্শনে গোপভূমের কথায়। অতীতে এই বর্ধমান কেবল রাঢ়বঙ্গের সামান্য অংশ মাত্রই ছিল না। একদা এই বর্ধমান রাষ্ট্র বিভাগে রূপান্তরিত হইয়া বর্ধমান ভুক্তি নাম লইয়া শুধু উত্তর ও দক্ষিণ বাঢ় দেশকেই নয়, দণ্ডভুক্তি মন্ডলকেও গ্রাস করেছিল। [১৩] এ প্রসঙ্গে বলা যায় বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা, গোপচন্দ্রের মল্লাসারুল শাসন, কম্বোজ বংশীয় নয়পালের ইরদাশাসন এবং বল্লাল সেনের নৈহাটি ও লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর শাসনে বর্ধমান ভুক্তির নাম দেখা যায়। [১৪] ফরিদপুর অঞ্চলের পাঁচটি এবং বর্ধমানের মল্লসারুলে পাওয়া তাম্রশাসন সহ মোট ৬টি তাম্র শাসনেই তিন মহারাজাধিরাজের খবর পাওয়া যায় তার মধ্যে সবথেকে উল্লেখ্য হল ১৯৩৯ খ্রীঃ গলসী থানার মল্লসারুল গ্রামের জারুলে পুকুরে পঙ্কোদ্ধার কালে পাওয়া বিজয় সেনের তাম্রশাসন।

এই তাম্রশাসনে উল্লেখ্য মহারাজ বিজয়সেনের রাজত্বকাল ছিল ৫০৭ খ্রীঃ থেকে ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং এই লিপিতেই বর্ধমান ভুক্তির সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে। [১৫] যেমন "পুণ্যোত্তর জনপদাধ্যামিতায়াং সতত ধর্মক্রিয়া বৰ্দ্ধমানায়ং বৰ্দ্ধমান ভুক্তৌ।" অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে গুপ্তশাসনের শেষ পর্বে বৈন্যগুপ্তের পরেই (৫০৭ খ্রীঃ) অর্থাৎ সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গোপচন্দ্র বঙ্গদেশে স্বাধীন হন। [১৬] উল্লেখ্য তিন রাজা হলেন গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব। এদের রাজ্য বর্ধমান অঞ্চল হতে আরম্ভ করে একেবারে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কেন্দ্র স্থলে ছিল ফরিদপুর। তাদের ঐ রাজ্য দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল— একটি বর্ধমান ভুক্তি, অন্যটি নব্যাবকাশিকা। বর্ধমান অঞ্চলের যে বিজয় সেন একদা ছিলেন মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সামন্ত এখন সামন্ত হলেন গোপচন্দ্রের। [১৭]

এহেন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত বর্ধমানের অনেক অজানা তথ্যই আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। এটি আসলে একটি ভূমিদান পত্র। প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদারের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, এতে পাশাপাশি বেশ কিছু গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সম্পত্তি ক্রয় করে তা কৌণ্ডিণ্য-

গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে প্রদান করা হয়েছে। এতে তখনকার দিনে বেশ কিছু উল্লেখ্য রাজ কর্মচারীর পদবীর উল্লেখ আছে। যেমন-অগ্রহারিক (গ্রামদান কারী) বিথ্যাধিকরণ (গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিক), বাহনায়ক (পথঘাট যানবাহন নিয়ন্ত্রন-কারী) এতে বোঝা যায় তখনকার দিনে গোপচন্দ্রের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে দক্ষিণে উৎকল ও পূর্বে ফরিদপুর পর্যন্ত বিশাল ভূখন্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ছিল এবং তা দেখভালের জন্য কর্মচারীও নিযুক্ত ছিল।

অন্যদিকে এতে বর্ধমান ভূক্তির বহু গ্রাম নামের উল্লেখ রয়েছে যেগুলি যুগপরম্পরায় অপভ্রংশিত হযেও এই অঞ্চলেই অবস্থিত রয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনকে অনুসরণ করে তাদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। যেমন— গোধগ্রাম > গোহগ্রাম, বিন্ধপুর > বিষ্ণুউর > বিজুর, বক্কত্তম > বাক্‌তা, অর্দ্ধকরক > আদরা, কোড্ডগ্রাম > কোড্ডেগ্রাম, শাল্মলীবাটক > সারুল বা মল্লসারুল ইত্যাদি। [১৮] এগুলি সবই পশ্চিম বর্ধমানের গলসী থানার অধীন গ্রাম। এই তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় সুদূর অতীতেও পশ্চিম বর্ধমানের এই এলাকা আমরা যাকে গোপভূম বলছি তার ঐতিহাসিক উপাদানের কিছু পাথুরে প্রমাণ আমাদের করায়ত্ত হয়েছে, এর ফলে এই অঞ্চলেও যে কিছু অতীত ইতিহাস ছিল তা সুদৃঢ় ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

গোভভূমের গোপরাজা ঃ— গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে গোপভূমকে কেন্দ্র করেই গোপেদের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। এই তথ্য আমরা প্রথম জানতে পারি মল্লসারুলে তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর। সেদিক থেকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে বিচার করলে এই তাম্রশাসনটির গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস স্বীকৃত প্রথম গোপরাজ হিসাবে যার নাম ওতে পাওয়া যায় তিনি হলেন মহারাজ গোপচন্দ্র। তৎকালীন বঙ্গের সামন্ত রাজা বিজয় সেন যিনি একদা মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সামন্ত ছিলেন তিনিই পরে এই গোপচন্দ্রের অধীন সামন্তরাজে পরিণত হয়েছিলেন। মোট কথা গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে এই গোপভূমের গোপেদের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল।

ঐতিহাসিক বিচারে তিনি রাজা হয়েছিলেন ৬ষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় দশকে। তার বংশ পরিচয় সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তাতে তার পিতা ছিলেন ধনচন্দ্র আর মাতা ছিলেন গিরিবালা। তিনি নিজ বাহুবলে রাজত্ব লাভ করেছিলেন। গোপচন্দ্রের রাজ্যসীমা শুধু গোপভূমেই সীমাবদ্ধ ছিল না— তা বিস্তৃত হয়ে সমগ্র রাঢ় সহ সমুদয় বঙ্গ ছাড়িয়েও ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শুধু তাই নয়, তার জয়রামপুর তাম্রশাসনে জানা যায় যে, তার রাজ্য সীমা উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি যে প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন তা তার সম্রাট পদবী গ্রহণে বেশ স্পষ্ট।

সম্রাট পদবীধারী মহাপরাক্রমী গোপচন্দ্রের সময়ে তিন মহারাজাধিরাজের খবর পাওয়া যায়। তারা হলেন গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচার দেব। এদের

মধ্যে গোপচন্দ্রই ছিলেন প্রথমতম এবং প্রধানতম। অনেকের মতে গোপচন্দ্রের নাম অনুযায়ী অজয়-দামোদরের মধ্যবর্তী পশ্চিম বর্ধমানাঞ্চল 'গোপভূম' নামে দৃঢ় ভাবে পরিচিতি পেয়েছিল। তবে ঐতিহাসিক নিবিখে জানা যায় তাব রাজত্বকাল খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

তা না হোক, তবে বঙ্গের অরণ্য ঘেরা গোপভূমে গোপেদের একাধিপত্য যে দীর্ঘদিন বজায় ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ঐ দুর্ভেদ্য গহন গভীর অরণ্যাঞ্চলে একমাত্র তারাই একাধিক্রমে কখনও মণ্ডলাধিপতি, কখনও সামন্তরাজ, কখনও রাজন্য পদে, আবার কখনও বাঢ়ের অধিপতি হিসাবে 'রাঢ়াধিপ' ইত্যাদি নামে অধিষ্ঠিত থেকে গোপভূমে তাদের নিরবচ্ছিন্ন আধিপত্য বিস্তৃত রেখেছিল। তাই বর্ধমানের প্রখ্যাত গবেষক শ্রদ্ধেয় সুধীর দাঁ মহাশয় যথার্থই বলেছেন— "ষষ্ঠ শতকে গোপচন্দ্র বর্ধমানের গোপভূমিতে রাজত্ব করতেন। ষষ্ঠ শতকে গোপচন্দ্র থেকে একাদশ শতকে ইছাই ঘোষ পর্যন্ত গোপভূমিতে গোয়ালাদের রাজত্ব চলেছিল। প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে গোপশক্তি ক্ষাত্রবীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। সেদিক থেকে গোপভূমে গোপরাজত্ব তথা গোপ প্রাধান্য দীর্ঘ পাঁচশ বছরের মত সময় কালে নিরবচ্ছিন্ন ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

রাঢ়াধিপ ঃ— রামগঞ্জ তাম্র শাসনে ঈশ্বর ঘোষ যে বংশ পরিচয় দিয়েছেন তাতে প্রথমেই উলেখিত হয়েছে রাঢ়াধিপের কথা। এই রাঢ়াধিপ অর্থাৎ রাঢ়ের অধিপতি হলেন মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ঈশ্বর ঘোষের প্রায় একশ বছর আগেই তিনি রাঢ় বঙ্গের অধিপতি ছিলেন কারণ ঈশ্বর ঘোষের সময় কাল ছিল একাদশ শতক আর যেহেতু তিনি ঈশ্বরের ৪র্থ পূর্বপুরুষ তাই তিনি কম করেও একশ বছরের অগ্রবর্তী ছিলেন। এখন ঈশ্বর ঘোষ ছিলেন সার্বভৌম রাজা আর তার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন গোপভূম সহসমগ্র রাঢ়ের অধিপতি। রাঢ়ের এক বিশেষ অংশই তখনকার দিনে গোপভূম নামে পরিচিত ছিল।

ঈশ্বরের বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে রামগড় তাম্রশাসনে বলা হয়েছে রাঢ়াধিপের পুত্র লব্ধ জন্মা শত্রুকুলের গর্বনাশকারী, নৃপ বংশের কেতুস্বরূপ শ্রীধূর্ত ঘোষ। তার পুত্র সমর ব্যবসায়ে কুশল, বৈরী বর্গের নিধনকারী অমিততেজা মার্তন্ড প্রতাপ বালঘোষ। এই বাল ঘোষের পুত্র বজ্রস্বরূপ ধবল ঘোষ-যিনি সীতার ন্যায় পতিব্রতা, লক্ষ্মী সদৃশা, ভবানী মূর্তি স্বরূপিনী সম্ভবা নাম্নী রমনীকে পত্নীরূপে পেয়েছিলেন এবং সেই অতুলনীয়া সম্ভবার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রদীপ্ত সূর্য সম মহাতেজা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ।

এই ঈশ্বর ঘোষের ৪র্থ পূর্ব পুরুষ ছিলেন রাঢ়াধিপ। বঙ্গে দুজন রাঢ়াধিপের উল্লেখ রয়েছে। অন্য আর এক রাঢ়াধিপ হিসাবে ১ম মহীপাল দেবকে বোঝায়।

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমইল লিপিতে একে উত্তর রাঢ়ের অধিপতি বলা হয়েছে। কিন্তু 'রাঢাধিপ' বলতে রামগঞ্জ তাম্র শাসনে যার কথা বলা হয়েছে তিনি ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ প্রপিতামহ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাক এই রাঢ়াধিপতির রাজধানী কোথায় ছিল? তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত নাট্যকার কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নামক নাটকে 'রাঢ়াপুরী'র নাম উল্লেখ রয়েছে। রাঢ়াপুরি প্রসঙ্গে 'গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি'র রচয়িতা, 'বীরভূম বিবরণ' এর রূপকার, সাহিত্য রত্ন শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দুর্গাপুর শিবপুর পাকা রাস্তার ধারে রাঢ়েশ্বর শিবকে বুকে নিয়ে আরও বহু প্রাচীন পুরাকীর্তির সম্ভারে সমুজ্জ্বল এক ঐতিহ্যবাহী গ্রাম আড়ার উল্লেখ করে বলেছেন— "আমাদের মনে হয় এই আড়াই প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের রাঢ়াপুরী"। তাছাড়াও তিনি আরও বলেছেন— "জয়দেব কেন্দুলী হতে প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণস্থিত 'আড়া' গ্রামই প্রাচীন রাঢ়াপুরীর স্মৃতি বহন করছে।"

আর এক উল্লেখ্য গবেষক "দুর্গাপুরের ইতিহাস" গ্রন্থের প্রণেতা প্রয়াত প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করে আড়াগ্রামে ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো পুরাকীর্তির আধিক্য লক্ষ্য করেই এটি যে একটি প্রাচীন রাজধানী ছিল সেই মতই পোষণ করেছেন। তিনিও শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতকেই সমর্থন করে এই আড়াগ্রাম কেই রাঢ়াপুরি বা প্রাচীন রাঢ়ের রাজধানী বলেই মত পোষণ করেছেন। সেদিক থেকে ঐ সব গুণী জনের অভিমতকে শ্রদ্ধা জানিয়েই বলা যায় প্রাচীন রাঢ়ের রাজধানী রাঢ়াপুরিই হল বর্তমানে দুর্গাপুরের সন্নিকটে অবস্থিত আড়া গ্রাম।

এই আড়া গ্রামেই একদা রাঢ়ের রাজধানী অবস্থিত ছিল এবং তখনই রাঢ়ের অধিপতি পরম শৈব রাঢ়াধিপ রাঢ়ের ঈশ্বব স্বরূপ রাঢ়েশ্বরের উদ্দেশ্যে এক বিশাল প্রস্তর নির্মিত শিব মন্দির নির্মাণ করে তার গর্ভদেশে আপন ইষ্ট রাঢ়েশ্বর শিবকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই আড়া গ্রামেই। এখনও সেই শিব মন্দির রাঢ়েশ্বর শিব নামে বর্তমান আছে। গোপবংশজাত সেই রাঢ়াধিপ এই অঞ্চলে প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিলেন। ঐতিহাসিক লিপি প্রমাণে জানা যায় তার বৃদ্ধাবস্থায় চান্দেল্লরাজ ধঙ্গ কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হন এবং প্রবল যুদ্ধের পর তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। সেই সময়েই ধঙ্গের সৈন্য সামন্ত কর্তৃক সাজানো-গোছান রাঢ়াপুরি, বিভিন্ন পুরাকীর্তিতে সমুজ্জ্বল ঐশ্বর্যময় রাঢ়াপুরি, সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছিল। পরবর্তী কালে তার বংশধরেরা এখান থেকে সরে গিয়ে অজয়ের দক্ষিণ তীরস্থ জঙ্গলমহলের ঢেক্কুরে বসতি স্থাপন করে রাজত্ব শুরু করেছিল। ফলে তখন থেকেই রাঢ়াপুরির দৈন্যদশা শুরু হয়ে যায়।

রাঢ়াধিপের পরবর্তী গোপ রাজারা ঃ— পরবর্তীকালে রাঢ়াধিপের বংশধরেরা

কিন্তু থেমে যায়নি। তাবাও আপন শক্তি ও শৌর্যবীর্যের দ্বারা এই গোপভূমে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখে রাজত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন। কারণ রামগঞ্জের তাম্র শাসনেব মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে রাঢ়াধিপের পুত্র ধূর্ত ঘোষ ছিলেন শত্রুকুলেব ত্রাস ও সর্বনাশকাবী, কাজেই তিনিও দীর্ঘদিন শত্রুদের পরাভূত রেখে আপন শৌর্যেব দ্বারা গোপভূমের গোপরাজা রূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার সম্পর্কে corpus of Bengal Inscriptions গ্রন্থে ইংরাজি অনুবাদে যা বলা হয়েছে তা হল— From the ruler of Radha was born the illustrious Dhurtaghosa, asterrible as the hot-rayed sun an banner to the family of kings : by the edge of his sharp sword he extinguished completely The pride of his host of enemies [১৯]

পরে তার পুত্র বালঘোষও আপন শক্তি সামর্থে কোন অংশেই কম ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন অমিততেজা এবং সুর্যসম ভাস্মর। তার ভযে শত্রুরা কাছেই আসতে পারত না। এহেন যুদ্ধপাবদর্শী শক্তিধর পুরুষ বালঘোষও দীর্ঘদিন এই গোপভূমেই রাজত্ব কবেছিলেন।

তাবপর বাল ঘোষের কাল কেটে গেলে তাব পুত্র ধবল ঘোষও ইন্দ্রের বজ্রসম মহাতেজা ব্যক্তি ছিলেন। ফলে তার সময়েও গোপভূমে অন্য কোন শত্রুর প্রবেশাধিকার ছিল না। তাই আপন বাহুবলে ও অমিত পরাক্রমে তিনিও দীর্ঘদিন গোপভূমে শান্তি শৃঙ্খলার সঙ্গেই রাজ্য শাসন কবেছিলেন। অবশ্য রাজা হিসাবে তারা সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে না পারলেও সামন্তরাজ পর্যাযভুক্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। পরবর্তী কালে তারই সুযোগ্য পুত্র মহামাণ্ডলিক সার্বভৌম রাজা ঈশ্বর ঘোষের আবির্ভাব ঘটে। তিনি আপন শক্তি ও সামর্থের দ্বারা গৌড়েশ্বরের বশ্যতাকে অস্বীকার করে স্বাধীন সার্বভৌম রাজায় পরিণত হয়েছিলেন। এইভাবে বংশানুক্রমিক ভাবে এই গোপ বংশ সমগ্র গোপভূমে তথা রাঢ় বঙ্গেও প্রচণ্ড দাপটে রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন। গোপভূমের একমাত্র সার্বভৌম গোপরাজা সেই ঈশ্বর ঘোষ সম্পর্কে বিভিন্ন পৌরাণিক তথ্য, ঐতিহাসিক নিদর্শন ও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যাদির প্রেক্ষিতে এবার বিস্তৃত অলোচনায় আসা যাক।

গোপভূমে মহামাণ্ডলিক গোপরাজা ঈশ্বর ঘোষ ঃ— বঙ্গের প্রাচীন দুই নদী অজয়-দামোদরের দোয়াবে অবস্থিত সুপ্রাচীন গোপভূমে প্রাচীন কাল থেকে যে সমস্ত রাজা মহারাজারা রাজত্ব করেছেন তাদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখ্য হল গড় জঙ্গলের গোপরাজা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ।

"সখলু ঢেক্করীত ঃ মহামাণ্ডলিক ঃ শ্রীমদীশ্বর ঘোষঃ কুশলী"— রামগঞ্জের তাম্র শাসনে ও তিনি ঢেক্করীর রাজা এবং ঘোষ কুলোদ্ভব মহামাণ্ডলিক বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেন? সেখানে বলা যেতে পারে যে, আভিধানিক অর্থে

'মণ্ডল' শব্দের অর্থ— "স্যান্মণ্ডলে দ্বাদশরাজকে চ ইতি বিশ্বপ্রকাশ" অর্থাৎ দ্বাদশটি সামন্ত রাজের উপর যিনি প্রভুত্ব কারণ, তিনিই মাণ্ডলিক এবং মাণ্ডলিকের বা মাণ্ডলিকগণের উপর যিনি কর্তৃত্ব করেন তিনি মহামাণ্ডলিক। রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারকের পরেই মহামাণ্ডলিকের স্থান। (২০) পাল যুগীয় তাম্র-শাসনগুলির মধ্যে এক মাত্র ঈশ্বর ঘোষকেই মহামাণ্ডলিক অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে।

বংশ পরিচয় ঃ— ঈশ্বর ঘোষের বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে রামগঞ্জ তাম্রশাসনে যা বলা হয়েছে, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় ধবল ঘোষের পুত্র হিসাবে ঈশ্বর ঘোষকে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষের পিতা হিসাবে সোম ঘোষ বলা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের অসামঞ্জস্য কেন? তার উত্তরে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ যা বলেছেন তা সত্যিই প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন— "তাম্রশাসন ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের বংশ পরিচয়ে মিল নাই। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ প্রাচীন রাজকাহিনীকে মঙ্গল কবিরা কুল পঞ্জি মিলিয়ে কাব্যে রূপায়িত করেন নি।... একাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক কাহিনী কয়েকশ বছর মুখে মুখে লোক গাথা ও লোক কথায় পল্লবিত হয়ে এসে ধর্মমঙ্গল কাব্যে স্থান পেয়েছে।" (২১) ফলে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও তাতে কিছু আসে যায় না। "ঐতিহাসিক চরিত্র লৌকিক কাব্যে যেভাবে কল্পণার সোনার কাঠির স্পর্শে রূপান্তরিত হয় ধর্মমঙ্গল কাব্যেও তাই হয়েছে। তাই বলে তা একেবারে কাল্পনিক নয়। কাহিনীর অন্যতম নায়ক 'ইছাই ঘোষ' ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ঐতিহাসিকদের কাছে যিনি ঢেক্করীর ঈশ্বর ঘোষ বলে খ্যাত, তিনি ঢেকুরের ইছাই ঘোষ এবং বর্ধমান জেলার গোপভূম রাজ্যের অন্যতম গোপরাজ বংশধর উত্তর রাঢ়ের স্বাধীন সামন্তরাজা।" (২২)

ঈশ্বর ঘোষের কাল ঃ— গোপভূমে ঈশ্বর ঘোষ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে প্রশ্ন হতে পারে তিনি কোন সময়ে গোপভূমে রাজত্ব করেছিলেন? অর্থাৎ তার কাল কখন? উত্তরটা দেওয়া খুব সহজ ব্যপার নয় কারণ তার সময় কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য রয়েছে। তবুও তারই মধ্য থেকে তথ্য নির্ভর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

১৮৩৩ খ্রীঃ বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার রানী সঙ্কৈল থানার অধীন রামগঞ্জ নামক স্থানে রাঢ়েশ্বর ঈশ্বর ঘোষের এক তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হয়। তাতে তার বংশ পরিচয় অন্তে বলা হয়েছে ঈশ্বর ঘোষ ঢেক্করী হইতে পিয়োল্ল মণ্ডলান্তঃ পাতী গাল্লিটিপ্যক বিষয়ে দিগ্‌ঘাসোদিয়াগ্রাম, ভার্গব গোত্রীয় ভট্টশ্রীনিবোক শর্ম্মা নামক জনৈক যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণকে মার্গশীর্ষের সংক্রান্তিতে জটোদায় স্নান করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন (২৩)। শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার

করিয়াছেন। তখন এব অক্ষর দেখিয়া তিনি মন্তব্য কবিয়াছেন যে, এই তাম্রশাসনখানি বিজয় সেন অথবা বল্লাল সেনের তাম্রশাসনের পূর্বে উৎকীর্ণ হইয়াছে।" [২৪] এখন এই তাম্রশাসনখানি সেন রাজাদের অগ্রবর্তী হলে তা স্বাভাবিক ভাবে পাল যুগের কোন এক সময়ে লিখিত হয়েছিল। আর তা হলে ঈশ্বর ঘোষ পাল বাজত্বে বর্তমান থেকেই তা করেছিলেন এটাই ধরে নিতে হয়। ফলে ঈশ্বর ঘোষ যে সেন যুগের অগ্রবর্তী পাল আমলের লোক ছিলেন তাতে সন্দেহ করার কাবণ নাই।

অনেকেই তাকে ২য় মহিপালেব (১০৭০-৭১খ্রীঃ) কিংবা ১ম মহিপালের (৯৭৭-১০২৭খ্রীঃ) সমসামযিক বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ২য় মহিপাল তার সিংহাসন আরোহনকালে অন্যান্য ভাইদের কারাবদ্ধ করেছিলেন ফলে "এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে সম্ভবতঃ সামন্ত ও প্রদেশ শাসকেবা আপনাদের স্বার্থ সাধনের চেষ্টায় বিদ্রোহ কবেছিলেন। এব মধ্যে দিব্বোক নামক জনৈক কৈবর্ত জাতীয় কর্মচারী সম্ভবতঃ বিগ্রহ পালের আমলে উত্তব বাংলার শাসন কর্তা ছিলেন। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে ২য় মহীপাল নিহত হন এবং ববেন্দ্র দেশে দিব্যের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।" [২৫] অর্থাৎ ২য় মহীপালের সময়ে তাকে পবাজিত ও নিহত করেই দিব্যক উত্তর বঙ্গে নিজে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সেখানে ঈশ্বর ঘোষ ২য় মহিপালের সমসাময়িক হলে স্বাধীনতাকামী দিব্যকের নাম শোনা গেলেও ঈশ্বর ঘোষেব নাম এ প্রসঙ্গে শোনা নিশ্চয়ই যেত কিন্তু তা শোনা যায় না, কাজেই ধরে নিতে হবে ঈশ্বর ঘোষ ২য় মহীপালের অগ্রবর্তী ১ম মহিপালের সমসাময়িক হবার সম্ভবনাই বেশী। কারণ তার সময়েও বাজ্যে চূড়ান্ত বিপর্যয় শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বিনয়বাবু ও বলেছেন— "মহীপালের রাজত্ব কালেও বৈদেশিক আক্রমণে (চোল ও কলচুরী) পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, সেই সুযোগেই মনে হয় ঈশ্বর ঘোষ বর্ধমানের গোপভূমের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে ঢেকুরে রাজধানী স্থাপন করেন।" [২৬]

এ প্রসঙ্গে 'দুর্গাপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ও অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে, "একাদশ শতাব্দীতে পাল রাজত্বের আভ্যন্তরীন রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সুযোগে তিনি যে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন তাই নয়। তাঁর নেতৃত্বে হয়তো স্থানীয় বহু নৃপতি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পাল শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কারণ ইছাই ঘোষকে বলা হয় ত্রিষষ্ঠীগড়ের অধিপতি। ত্রিষষ্ঠী কথাটির অর্থ তেষট্টি অর্থাৎ এক সময় তেষট্টি সংখ্যক গড়ের অধিপতি তার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। ইছাই ছিলেন তাঁদের মুখপাত্র বা দলপতি বিশেষ। এখনো অনুসন্ধান করলে এই অঞ্চলে তেষট্টিটি গড়ের অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে। যেমন— অমরার গড়, বলাগড়, পানাগড়, রাজগড় (দেবশালা), বড়গড়,

বাঁশগড়, ঝাঁঝরাগড়, শেরগড় (উখরা) নরোত্তমেরগড় (চুরুলিয়া), ডিসেরগড় (ডিহি +শেব+গড়), উদয়গড় প্রভৃতি স্থানগুলি সেই স্মৃতি বহন করছে।" [২৭] এছাড়া উদয়গড়ই উৎগড় নামে পরিচিত ছিল, এখানে তাহা সাতকাটার জঙ্গল নামে পরিচিত এবং কাঁকসা গ্রামের ৩/৪ মাইল উত্তরে। [২৮]

অন্যদিকে বাঙালীর ইতিহাসে নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় বলেছেন যে, "মহীপালের পুত্র নয়পালের (আঃ ১০২৭-১০৪৩ খ্রীঃ) রাজত্ব কালে কলচুরীরাজ কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের যুদ্ধ হয়, কিন্তু তিব্বতী সাক্ষ হইতে মনে হয় এই যুদ্ধ জয় পরাজয়ে মীমাংসিত হয় নাই।... লক্ষ্মী কর্ণের হাত হইতে উদ্ধার সম্ভব হইলেও পশ্চিমবঙ্গ বোধহয় বেশি দিন আর পাল সাম্রাজ্য ভুক্ত থাকে নাই। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নামে এক সামন্ত রাজা এই সময়ে বর্ধমান অঞ্চলে স্বাধীন স্বতন্ত্র মহারাজাধিরাজ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহার কেন্দ্র ছিল বর্ধমান জেলার ঢেক্করী নামক স্থানে। [২৯] ঈশ্বর ঘোষের কাল প্রসঙ্গে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ যা বলেছেন খালিম পুর তাম্র শাসনের প্রেক্ষিতে তাও সত্যে প্রমাণিত। তিনি বলেছেন যে সেন বংশের পূর্ববর্তী সময়ে লব সেনের অভ্যুদয় হয়েছিল। [৩০] এবং তার সঙ্গেই ইছাই এর যুদ্ধ হয়ে থাকলে তাও যে পাল যুগেই হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই তাই তারানাথকে অনুসরণ করেও বলা যায় ঈশ্বর ঘোষের আবির্ভাব পাল যুগেই হয়েছিল।

পালরাজ মহীপালের (৯৭৭-১০২৭ খ্রীঃ) পরবর্তী উল্লেখ্য রাজা রামপালের (১০৭২-১১২৭ খ্রীঃ) প্রসস্তি গেয়ে কলিকালের বাল্মীকি বলে নিজেকে পরিচিত করার কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত নামে একটি কাব্য আছে। যা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল থেকে ১৮৯৭ খ্রীঃ আবিষ্কৃত হয়ে বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। তাতে পাল যুগের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। সেই রামচরিতে ঢেক্করীরাজ প্রতাপসিংহের উল্লেখ রয়েছে।

কৈবর্তরাজ দিব্যকের হাত হতে পিতৃ রাজ্য উদ্ধারের জন্য রামপাল দিব্যকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাদের অধীন বহু সামন্ত রাজার সাহায্য চেয়েছিলেন, তার মধ্যে ঢেক্করীর প্রতাপসিংহও একজন। সেদিক থেকে প্রমানিত হয় যে, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ ছিলেন মহিপালের সমসাময়িক এবং প্রতাপসিংহের পূর্ববর্তী ঢেক্করীর স্বাধীন রাজা। তাই রামপাল ঈশ্বর ঘোষের সাহায্য না চেয়ে প্রতাপসিংহের সাহায্য চেয়ে ছিলেন। কারণ ঈশ্বর ঘোষ তার অনেক অগ্রবর্তী প্রপিতামহ মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন রামপালের নয়। আর রামপালের সমসাময়িক হলে তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর ঘোষের সাহায্যই চাইতেন।

অতএব উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এটাই স্থির হয় যে ঈশ্বর ঘোষ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে বঙ্গের পাল রাজা মহিপালের সমসাময়িক ছিলেন। অন্যদিকে ঈশ্বর

ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসন তার রাজত্বের ৩৫ তম রাজ্যাঙ্কে প্রচারিত হওয়ায় এটাও নিশ্চিত যে, তিনি অন্তত পক্ষে ৩৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নাই। পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে অনেক সামন্ত রাজাই স্বাধীন রাজায় পরিণত হয়েছিলেন। ঈশ্বর ঘোষও তাদের অন্যতম। তবে তিনি মহামাণ্ডলিক ছাড়া 'মহাবাজ' বা 'মহারাজাধিরাজ' জাতীয় কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু তিনি আসলে একজন স্বাধীন সার্বভৌম রাজাই ছিলেন। তাই ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন— There can be hardly any doubt that chiefs like Isvaraghosh were independent rulers for all practical purposes, though they did not openly assume royal epithet. [৩১]

ঈশ্বরের রাজধানী ও তার রাজ্য সীমা ঃ— ঈশ্বব ঘোষের সময়কাল নিয়ে যেমন মতান্তর রয়েছে তেমনি ঈশ্বর ঘোষের রাজধানী ঢেক্কুরী নিয়েও মতাপার্থক্য লক্ষ্য কবা যায়। বিশেষ করে ঈশ্বর ঘোষের সম্পাদিত তাম্রশাসন উৎসর্গ প্রসঙ্গে যেখানে বর্ণিত হয়েছে—

সখলু ঢেক্করীতঃ মহামাণ্ডলিকঃ শ্রীমদীশ্বর ঘোষ কুশলী...
ভট্টশ্রী বাসুদেব পুত্রায় ভট্টশ্রী নির্ব্বোক শর্ম্মণে
ভার্গবসগোত্রায় জমদগ্নিঔব্বা— আপ্লুবান্
ঔর্ব্ব জামদগ্ন্যচ্যবন ভা... ঋজুর্ব্বেদা ধ্যায়িনে
মার্গ সংক্রান্তো জটোদায়াস্নাত্বা তিলগর্ভপবিত্রপুর্বকং
ভগবন্তং শঙ্কর ভট্টারক মুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য
যশোভিবৃদ্ধয়ে তাম্র শাসনীকৃত পদত্তোহস্মাভিঃ।

—তারই প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য যে, রাঢ়ে জটোদা বলে কোন নদী নাই। বর্তমান আসামের গোয়ালপাড়া শহরের উত্তর পূর্বে যেখানে মানস ও জয়া (পৌরাণিক জটোদা) মিলিত হইয়াছে; সেই স্থান অদ্যাবধি পূণ্যতীর্থ বলিয়া পরিচিত। এই অঞ্চলে বহুতর শৈব কীর্তির নিদর্শন বিদ্যমান। ইহারই নিকটে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের শাসন কেন্দ্র ঢেক্করী থাকা সম্ভব [৩২] তিনি কালিকা পুরাণে আসাম নিহিত জটোদা নদীর উল্লেখের প্রেক্ষিতেই এই অভিমত প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তার সেই যৎসামান্য তথ্যের ভিত্তিতে বলা কথা বর্তমান ঐতিহাসিকেরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এ প্রসঙ্গে 'দুর্গাপুরের ইতিহাস' প্রণেতা প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত হল— ঈশ্বর ঘোষ ছিলেন একজন তান্ত্রিক সাধক। তার 'শ্যামারূপা' তো তান্ত্রিকদেবী। তাই কোন একটা ভাল কাজ করার আগে তন্ত্রাচারী ঈশ্বর ঘোষের পক্ষে তান্ত্রিক মহাপীঠ কামরূপে পুণ্য স্নানের জন্য যেয়ে থাকলে সেটাই হবে তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। [৩৩] তাই তিনি সেখানে

গিয়ে যদি জটোদায় স্নান সেরে কামরূপে দেবী কামাখ্যার পূজান্তে আপন দেশে ফিরে ভূমিদান পর্ব সমাধা করেছিলেন সেটা ধরে নিতে অসুবিধা নাই।

অন্যদিকে তাম্রশাসনটির শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে "বভূব রাঢ়াধিপ"... ইত্যাদি কথাগুলি। যদিও তিনি তার বংশ পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে "রাঢ়াধিপ' বলতে তার বৃদ্ধ প্রপিতামহের কথাই বলেছেন। তবুও তারা বংশানুক্রমিক ভাবেই রাঢ়েই রাজত্ব করেছিলেন। তাই তারা রাঢ়ের অধিপতি, সেখানে তাদেরকে কামরূপে নিয়ে যাওয়ার কোন যৌক্তিকতা নাই। তিনি রাঢ়ের অধিপতি হয়ে রাঢ়েই অবস্থিত অজয় তীরবর্তী ঢেক্করীর রাজাই ছিলেন। এখন মুশকিল হয়েছে এই তাম্রশাসনটি বহুজনে বহুভাবে পাঠ সমাধা করেছেন এবং তার ফলে পাঠান্তর হেতু অর্থের ভিন্নতাও দৃষ্ট হচ্ছে। সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানেই। বিশেষ করে জটোদায়ং কথাটি নিয়ে। পণ্ডিত ননীগোপাল মজুমদারের পাঠে আছে জটোদয়াং যা শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমারের মতে গঙ্গার নামান্তর। [(৩৪)] তা যদি হয় তাতে সুবিধা অনেক। কারণ বাড়ীতে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করতে গেলে মানুষ এখনও গঙ্গাস্নান করেই তা করে থাকে। সে দিক থেকে ইশ্বর ঘোষও তার ৩৫ তম রাজ্যাঙ্কে উপনীত হয়ে তার রাজধানী ঢেক্কুর থেকেই এক মার্গ সংক্রান্তিতে গঙ্গা-স্নান সেরে জনৈক ভার্গব গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নির্ব্বোক শর্মাকে 'দিগঘাসদিকা' নামের গ্রাম দান করেছিলেন, সে কথাই তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে তাতে অসুবিধার কিছু নাই।

ভিন্নভাবেও বলা যায় ঈশ্বর ঘোষের রাজধানী ছিল ঢেক্কুর গড়ে কিন্তু কালিকা পুরাণ অনুযায়ী আসামে জটোদা নদীর অবস্থান ও তৎসংলগ্ন গোয়ালপাড়া জেলার অধীনে গৌরীপুর রাজ্যের জমিদারী এলাকা 'ঢেকরী' নামে অভিহিত হলেও এই দুটি স্থান এক নয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নগেন্দ্র নাথ বসু ঢেকুর ও ঢেক্কুরীকে এক বলে মনে করেন না। তার মতে ঢেক্কুরী অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই অবস্থিত। শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অক্ষয় কুমার মৈত্রও একই মত পোষণ করেন। তাদের মতে ঢেক্করী বর্ধমান জেলায় অবস্থিত।

প্রাচীনকালে অজয়তীরে বিস্তৃত এলাকায় লোহার অস্ত্র নির্মাতা ঢেকারু নামে এক জাতির বাস ছিল এবং সেই কালেও এই এলাকা লৌহজাত দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করত। সেই ঢেকারু জাতির অবশিষ্টাংশের কিছু কিছু এখনও এখানে দেখা যায় তবে তাদের সেই কর্মদক্ষতা ও আধিপত্য এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। সম্ভবত সেই জাতির নাম অনুসারেই এই এলাকার নাম ঢেক্কুরী হয়েছিল। আর ঈশ্বর ঘোষ সেই এলাকাতেই অজয়ের দক্ষিণে জঙ্গলঘেরা পরিবেশেই বন্য ও দুর্ধর্ষ জাতি গোষ্ঠীদের নিয়ে আপন রাজ্য ঢেক্কুরীগড় স্থাপন করেছিলেন।

দীর্ঘক্ষণ এই আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাঢ় বঙ্গের জঙ্গলময় পরিবেশে

গোপভূমের বিস্তৃত এলাকা নিয়েই ঈশ্বর ঘোষের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আর অজয়ের দক্ষিণে ঢেক্কুর গড়েই তার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন বিভিন্ন পণ্ডিতগণের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় ঢেক্করী গড়ই ত্রিষষ্ঠী গড় নামে খ্যাত ছিল। এবিষয়ে আলোচ্য মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষেব কাহিনী নিয়ে পরবর্তী কালে মধ্যযুগে যে সকল ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখ্য কবি রূপরাম ও ঘনরাম চক্রবর্তী ঐ একই মতামত প্রকাশ করেই বলেছেন—

যার নাম ঢেকুর ত্রিষষ্ট তারে কয় (রূপরাম) (৩৫)
ত্রিষষ্ঠী ঘুচায়ে নাম হয়েছে ঢেকুর। (ঘনরাম) (৩৬)

আর ত্রিষষ্ঠী যে তেষট্টি গড়ের সমন্বয়ে গঠিত সে কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। সেই তেষট্টি গড়ের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে তিনি নিজেকে যে মহামাণ্ডলিক বলে ঘোষণা করে স্বাধীন সার্বভৌম রাজা রূপেই রাজত্ব চালিয়ে ছিলেন। তেষট্টি গড়ের বিস্তৃত এলাকাই গোপভূম নামেই খ্যাত যা বরাকর, আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়, কাঁকসা, কসবা, গলসী, মানকর, ভাল্কী, অমরারগড়, দিগনগর, আউশ গ্রাম, গুসকরা, মঙ্গলকোট কাটোয়া ও মৌখিরা, কালিকাপুর, দেবশালা, বসুধা, গৌরাঙ্গপুর ইত্যাদি নিয়ে এককথায় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম বর্ধমানই ছিল তখনকার দিনের গোপভূম। আর সেই সমুদয় গোপভূমই ছিল ঈশ্বর ঘোষের রাজ্য এবং সেই রাজ্যের প্রায় মধ্যস্থলে অজয় নদীর দক্ষিণে পরিপূর্ণ জঙ্গল ঘেরা পরিবেশে গৌরাঙ্গপুর, দামোদরপুর, খেরওবাড়ী, ও শ্যামারূপার গড় বেষ্টনীর মধ্যে, দুর্ভেদ্য অরণ্যকন্দরে ঢেক্করী ছিল ঈশ্বর ঘোষের রাজধানী। বর্ধমানের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীও বলেছেন— ইছাই ঘোষের রাজধানী বা গড় ছিল বনজঙ্গলে ঘেরা। অজয় নদের দক্ষিণ তীরে আউশগ্রাম থানার রুক্ষ মাটির দেশে গভীর জঙ্গলে গৌরাঙ্গপুর, গড়কিল্লা, খেড়োবাড়ী অঞ্চলের মধ্যে তাঁর রাজধানী ঢেকুরগড় বা ত্রিষষ্ঠী গড়ের অবস্থিতি ছিল। (৩৭) তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে এটাই প্রমাণিত হয় যে ইছাই ঘোষের রাজধানী ঢেকুর গড়েই অবস্থিত ছিল। সেই ঢেকুর গড়ের ভৌগোলিক অবস্থান হল— ২৩°৩৮ মিঃ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭°৩৪ পূর্ব দ্রাঘিমায়। এখন ইছাই ঘোষের রাজধানী ঢেকুরী আর রামচরিতে সন্ধ্যাকর নন্দী বর্ণিত প্রতাপ সিংহের রাজধানী ঢেকুরী যে একই তা অনেক ঐতিহাসিক তথা গবেষকই মেনে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীও বলেছেন— "উভয় ঢেক্করী এক এবং অভিন্ন।" (৩৮)

ঈশ্বর ঘোষের জাতি বিচার ঃ— গোপভূমের ঢেক্করী গড়ের মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর জাতিতে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন তা নিয়েও অনেক মত পার্থক্য দেখা যায়। বহু সম্প্রদায়ই তাকে আপন আপন গোষ্ঠী ভুক্ত করার দাবী জানায়। বিশেষ করে কায়স্থ সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে সদগোপ সম্প্রদায় তাকে নিজ গোষ্ঠী ভুক্ত করার জন্য বেশ

উদগ্রীব। এর পিছনের কারণটি হল অনেকেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন শৌর্যশালী বা প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বকে আপন জ্ঞাতি ভুক্ত করতে পারলে কিছুটা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। বিপরীতে আপন জাতিভুক্ত অতি সাধারণ ব্যক্তিদের নিজ গোষ্ঠী বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন। এ এক ধরনের হীন মানসিকতা— যা অনুরনিত হয় আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা। কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখতে হবে আবেগ ও বাস্তবতা এক নয়। আবেগ চালিত হয় হৃদয়ানুভূতির দ্বারা আর বাস্তব বা ইতিহাস চালিত হয় যুক্তিনিষ্ঠ সত্যানুসন্ধানের দ্বারা। ইতিহাস পর্যালোচনায় আবেগের কোন স্থান নাই। সেখানে যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যই সেই পথের প্রধান দিশারি।

প্রথমেই বলা যায় ঈশ্বর ঘোষ তার রামগঞ্জ তাম্রশাসনে শুরুতেই নিজেকে 'ঘোষকুলোদ্ভব' বলে উল্লেখ করেছেন। কোথাও সদগোপ বা কায়স্থ বলেন নাই। ইতিহাসের নিরিখে বলা যায় রাঢ় বঙ্গে ইছাই ঘোষ যখন রাজত্ব করেছিলেন, সে সেই একাদশ শতকের কালে। তখনও গোপজাতির বিভাজন হয়নি। সে বিভাজন কোন মতেই চারশ বছরের আগে নয়। সে প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, এখন থাক। কাজেই ইছাইকে সদগোপ হিসেবে দাবী করার কোনই যৌক্তিকতা নাই। আর কায়স্থ বলা তো চলেই না কারণ প্রতিটি ধর্মমঙ্গল কাব্যের সকল কবিই তাকে গোয়ালা বলেই উল্লেখ করেছেন। যেমন রূপরাম চক্রবর্তী তার ধর্মমঙ্গলের সর্বত্রই ঈশ্বর ঘোষকে গোয়ালা রূপেই পরিচিত করেছেন, তাই তিনি বলেছেন—

কাঞ্চন বিজুরি তার সীমা দিতে নাই।
ইছাই গোয়ালা পূজে দেবী মহামাই।। (৩৯)

অন্যত্র ঐ ইছাই সম্পর্কেই বলেছেন—

লাউসেন বলে ধন্য ইছাই গোয়ালা।
ধন্য শ্যামারূপা দেবী রঙ্কিনী বিমলা।। (৪০)

এবার ধর্মমঙ্গলের আর এক উল্লেখ্য কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও ঈশ্বর ঘোষ সম্পর্কে যা বলেছেন—

কি কহিব ভাগ্য কত গোয়ালা বাঞ্ছিল যত,
মহামায়া পুরিল কামনা।
কনক প্রতিমা করি, শ্যামারূপা মহেশ্বরী,
গড়ে গোপ করিল স্থাপনা।।
নিতি নিতি করে পূজা, দিয়ে মেষ মোষ অজা,
রাজা হলো গোয়ালা প্রবল। (৪১)

তিনি অন্যত্রও ঈশ্বরের শৌর্য প্রসঙ্গে বলেছেন—

পুরন্দর প্রভৃতি সভয় সুরবর্গ।
প্রতাপে গোয়ালা বেটা পাছে লয় স্বর্গ।। (৪২)

ধর্মমঙ্গলের প্রাচীন কবি বলে পরিচিত ময়ূরভট্ট বিরচিত ধর্মমঙ্গলেও রয়েছে—

ঢেকুরের গড় তাহে ইছাই গোয়ালা রহে
রাজকর না দেয় য়ামার।
তুমি বট ধর্ম্মপুত্র তোমার য়কথ্য কীত্য
জয়করি দেহ দুরাচার।। (৪৩)

কবিরা যদিও কল্পনা বিলাসী হয়ে থাকেন তবুও কাহিনী ভিত্তিক কাব্য-কবিতায় বাস্তবকে অনুসরণ করতেই হয়। সেদিক থেকে সব কবিই যখন ইছাই ঘোষকে এক বাক্যে গোয়ালা বলে উল্লেখ করেছেন তখন তাতে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি কিছু আছেই সেটা ধরে নেওয়াই কাম্য। তা ছাড়া আবহমান কাল ধরে বহুল প্রচলিত স্থানীয় লোক-শিল্পীদের লোক সঙ্গীতেও যেখানে ধ্বনিত হয়—

শনিবার সপ্তমী সম্মুখে বারবেলা।
আজি রণে যেওয়ারে ইছাই কোয়ালা।। (৪৪) ইত্যাদি।

তখন ধরে নিতেই হয় ঈশ্বর ঘোষের গোয়ালা পরিচয়ের মধ্যেই ঐতিহাসিক সত্যতাই স্বীকৃত হয়েছে— অন্য পরিচয়ের প্রশ্নই ওঠে না। সেদিক থেকে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী যথার্থই বলেছেন যে, ইছাই ঘোষ— "তিনি জাতিতে কায়স্থ বা সদগোপ ছিলেন না।" (৪৫) তা না থাকলে তিনি তার রামগঞ্জ তাম্র শাসনে উল্লিখিত 'ঘোষ কুলোদ্ভব' বলতে নিজেকে গোপ বা গোয়ালা বংশ জাত বলেই উল্লেখ করেছেন। তাই বলি উল্লেখ্য তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ইছাইকে রাঢ়ের গোপভূমের স্বাধীন গোয়ালা রাজা বলেই মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে ঈশ্বর ঘোষের গুরুত্ব ঃ— পুর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ঈশ্বর ঘোষ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কেবল মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ধর্মমঙ্গলের কল্পকাহিনীর এক বলিষ্ঠ নায়ক ছিলেন না, বরং তার ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্বই লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে পরবর্তীকালে ধর্মমঙ্গলের এক অনন্য নায়কে পরিণত হয়েছেন। সেদিকে ধর্মমঙ্গলের অন্যতম নায়ক ইছাই ঘোষ ও বঙ্গের পাল রাজত্ব কালে একাদশ শতকে বিরাজিত ঢেক্কুরীর মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ একই ব্যক্তি। বঙ্গের সকল ঐতিহাসিকই এক বাক্যে তা মেনে নিয়েছেন।

এ যুগের ইতিহাস অনুসন্ধান খুবই কষ্টকর ব্যাপার, কারণ তখনকার দিনে কোন লিখিত ইতিহাস বা বিবরণ নাই। তবুও অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর মত কিছু রাজা মহারাজাদের তাম্রশাসন, শিলালেখ কেই ভরসা করেই এগুতে হয়। সেই রকমই একটা ভরসার কেন্দ্র বিন্দু হল ঈশ্বর ঘোষ প্রচারিত তারই তাম্র শাসন যা তিনি তার ৩৫তম রাজ্যাঙ্কে কোন এক মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ন) মাসের সংক্রান্তিতে প্রচার করেছিলেন। যদিও উহাতে কোন সাল তারিখের উল্লেখ নাই তবুও এর হরফ,

অক্ষরাদির ছাঁদ, খোদাই এর রীতি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ এর কাল নির্ণয় করেছেন। তাতে ঠিক হয়েছে তিনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের লোক এবং পাল রাজ মহিপালের সমসাময়িক। সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। এখন তার প্রচারিত তাম্রশাসনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে কিছু আলোকপাত করা যাক।

এটি আবিষ্কৃত হওয়ায় বিভিন্ন ঐতিহাসিকের প্রচেষ্টায় ঐ অন্ধকারময় যুগের অনেক অনাস্বাদিত অধ্যায় জনমানসে আজ উদ্ভাসিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ বলেছেন— বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যত তাম্রলিপি ও শিলা লিপি পাওয়া গেছে তার মধ্যে ঈশ্বর ঘোষের এই তাম্রশাসনখানির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি। [৪৬] কারণ এক মাত্র ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনেই তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বহু ধরণের রাজ কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া যায়, যা অন্য কোন লেখমালায় পাওয়া যায়নি। সে দিক থেকে এর গুরুত্ব সত্যই অপরিসীম।

সেই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসনে ঢেক্করীর মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ স্বাধীন রাজার মতই নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখে যে সমস্ত রাজ কর্মচারী ও ব্যক্তি বর্গের উপর আদেশ জারী করেছেন তাদের তালিকা পাওয়া যায়। তার মধ্যে বেশ কিছু উচ্চ পর্যায়ের রাজ কর্ম্মচারী (Officer)-র সাক্ষাৎ মেলে। যেমন— কয়েকজন মহাতন্ত্রাধিকৃত (খুব সম্ভবত উচ্চ শ্রেণীর পুরোহিত), শিরোরক্ষিক (রাজার দেহরক্ষীদের প্রধান), মহাকরণাধক্ষ (কেরানিদের প্রধান), অন্তঃপ্রতিহার (রাজগৃহের অভ্যন্তরের রক্ষক), আভ্যন্তরিক (অন্তপুরের অধিকর্তা), কুমারামাত্য, মহাসন্ধি বিগ্রহিক, মহাপ্রতিহার, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাক্ষপটলিক, মহাসর্বাধিকৃত, মহাসেনাপতি, মহাপাদমূলিক, মহাভোগপতি, মহাব্যুহপতি, মহাদণ্ডনায়ক, মহাকয়স্থ, মহাবলাকোষ্টিক, দণ্ডপানিক, কোট্টপতি, হট্টপতি, ভুক্তিপতি, বিষয়পতি, ঔখিতাসনিক, মহাবলাধিকরনিক, মহাসামন্ত, মহা কটুক ঠক্কুর, আঙ্গিকরণিক, অন্তঃপ্রতীহার, দণ্ডপাল, খণ্ডপাল, দুঃসাধাসাধনিক, চৌরোদ্ধরণিক, উপরিক, তদানিযুক্তক, আভ্যন্তরিক, বাসাগারিক, খড়্গগ্রাহ, শিরোরক্ষিক, বৃদ্ধধানুষ্ক, রাজন, রাজ্ঞী, রাজন্যক, রাণক, রাজপুত্র, কুমারামাত্য ছাড়াও একসারকখোল, দূতগমাগমিক, লেখক, দুতপ্রৈষনিক, পানীয়াগারিক, সান্তকিক, কর্মকর, গৌলমিক শৌলকিক ও আরও নানাবিধ রাজাজ্ঞাধীন কর্মচারী। [৪৭]

এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগতে পারে যদি ঈশ্বর ঘোষ একজন সামন্ত রাজা হন তবে তার পক্ষে কি করে রাজা ও রাজপদে অধিষ্ঠিত রাজ কর্মচারীদের হুকুম জারী করা সম্ভব? অথচ তাম্রশাসনে তিনি কোথাও নিজেকে মহারাজা বলে উল্লেখ করেন নাই কেবল মহামাণ্ডলিক ছাড়া। এ প্রসঙ্গে আগেই ডঃ রমেশ মজুমদারের মতামত ব্যক্ত করেই জানান হয়েছে যে তিনি রাজাধিরাজ, মহারাজ ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ না

করলেও আসলে একজন সার্বভৌম মহারাজাই ছিলেন। তিনি আপন বাহুবলে সামন্তরাজাদেব বশীভূত কবে তেষট্টি গড়ের আধিপত্য আপন হাতে নিয়ে রাঢ়েব অধিপতি রূপে সার্বভৌম রাজায় পরিণত হয়েছিলেন। এবং নিজের বিশেষ কর্মক্ষমতায় সেই তিমিরাচ্ছন্ন যুগেও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মারক সম্পাদনে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল হয়েছিলেন।

ঈশ্বর ঘোষের ধর্মীয় মানসিকতা ঃ— ঈশ্বর ঘোষ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ইতিহাসে তাব যে বিশেষ ভূমিকা ছিল সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এখন তার ধর্মীয় মানসিকতা কেমন ছিল তা নিয়ে অলোচনা করা যাক। আমরা জানি গুপ্ত যুগে বৌদ্ধ ধর্মেব ব্যাপকতা থাকলেও পাল যুগে এসে তা স্তিমিত হবার সময় বহু তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেব-দেবীই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে হিন্দু ধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। ডাকার্ণব গ্রন্থে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পীঠস্থানগুলিব মধ্যে এক ঢিক্কর নামক স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক গবেষক স্বর্গত বিনয় ঘোষের মতে ডাকার্ণবের সেই 'ঢিক্করই ঢেক্করী বা ঢেকুর ছাড়া অন্য কোন স্থান নয়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের পীঠস্থান ছিল ঢেকুর।" (৪৮) সেহেতু বিনয় বাবু মনে করেন পাল যুগেব গোপরাজা ইছাই তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাই তার আরাধ্যা দেবী ছিল তান্ত্রিকদেবী শ্যামারূপা।

অন্যদিকে দুর্গাপুরের ইতিহাস প্রণেতা স্বর্গত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা পাল বাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তখন দেশে হীনযান মহাযান প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদই প্রধান ছিল। তখনকার দিনে জৈন, শৈব প্রভৃতি ধর্মেও তন্ত্রাচারের প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। "বস্তুতপক্ষে দেশে তখন তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের জোয়ার এসেছিল। এমত অবস্থায় ঢেকুরী রাজ ইছাই ঘোষও স্বভাবতই এর প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। বিশেষত তার আরাধ্যা দেবী যখন হলেন শ্যামারূপা, তিনি তো ব্রাহ্মণ্য ধর্মোক্ত কোন দেবী ছিলেন না? তান্ত্রোক্তদেবী দেবী হওয়াই খুব স্বাভাবিক। আজও তিনি তান্ত্রিক বিধানেই কল্যানেশ্বরী নামে পূজিতা হচ্ছেন।" (৪৯)

ঐতিহাসিক ইছাই ঘোষের শৌর্যবীর্যই পরবর্তী কালে তাকে ধর্মমঙ্গলের নামক হিসাবে উন্নীত করেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাসের প্রতিচ্ছায়া কাব্য কবিতার কল্প কাহিনীতেও অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ধর্মমঙ্গলে অনুরণিত হয়েছে। ফলে ধর্মমঙ্গলের অনেক কবিই বিশেষ করে ঘনরাম চক্রবর্তীও ঈশ্বর ঘোষের দেব আরাধনার বিষয়ে তার তন্ত্রোক্ত দৈবী সাধনার উল্লেখ করে বলেছেন—

আবাহন তন্ত্রে মন্ত্রে,
আরাধিতে হেমযন্ত্রে,
মন্ত্র বসে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী। (৫০)

সেই তন্ত্রাধিত শ্যামারূপা পার্ব্বতীই ছিল ঈশ্বরের আরাধ্যা দেবী। শুরুতে ভক্ত প্রবর ঈশ্বর ঘোষ—

"কণক প্রতিমা করি
শ্যামারূপা মহেশ্বরী
গড়ে গোপ করিল স্থাপন।"

এই ভাবেই শ্যামারূপার কণক প্রতিমা স্থাপন করে শ্যামারূপার গড়ে সাধক ঈশ্বর ঘোষ তার পূজা শুরু করেন এবং তা অনুষ্ঠিত হতে থাকে, শুদ্ধাচারে নিতিনিতি অজা মেষ ও মহিষ বলি দিয়ে। পরম ভক্ত ঈশ্বরের নিবেদিত নৈষ্ঠিক পূজায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দেন—

আজি হৈতে ঢেকুরে ইছাই তুমি রাজা।
স্মরণ করিলে দেখা দিব দশভূজা।। (৫১)

দেবীর এই কথা দেওয়াটি কিন্তু নেহাতই কথার কথা নয়। কারণ ইছাই ঘোষ বিপদে পড়ে দেবীর স্মরণ নেওয়া মাত্র দেবী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সন্তানের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। সে প্রমাণ বিভিন্ন ধর্মমঙ্গল কাব্যেই পাওয়া যায়। যেমন দেবীর কৃপাতেই ইছাই ঘোষ কর্ণসেনের আক্রমণ প্রতিহত করে তার ছয় পুত্রকে নিধন করতে পেরে ছিলেন। তাছাড়াও দেখা যায় লাউসেন যখন প্রথম বার ইছাইকে আক্রমণ করতে আসে, তখন দেবীর কৃপাতেই অজয়ের জল হঠাৎ প্রবল স্ফীত হয়ে ওঠে। যেমন—

আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেন।
তা দেখে সচিন্তিত বড় রাজা লাউ সেন।। (৫২)

ফলে দেবীর কৃপায় লাউসেনের পক্ষে তখনকার মত নদী পার হওয়া সম্ভব হয়নি। তাই দেখা যায় দেবী ইছাই এর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। আর তান্ত্রিক ইছাইও পরম নিষ্ঠায় দেবীর পূজায় ব্রতী ছিলেন।

তবুও তিনি তার নিত্য সেবার জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই পুরোহিত কারা? এ প্রসঙ্গে বলি, ক্ষেত্র সমীক্ষায় গিয়ে বর্তমান দুর্গাপুরে অবস্থিত কাঁটাবেড়িয়া গ্রাম নিবাসী কবি ও নাট্যকার মাননীয় সুশীল রায় মহাশয়ের নিকট জানা গেল, তিনি তার পরিবারিক বহু প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধান ও পারিপার্শ্বিক বহু তথ্যের উদঘাটন করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঈশ্বর ঘোষ তাদেরই পূর্বপুরুষ বীরভূমের সুগড়াধিপতি গোপাল রায়ের বংশধর বিনোদ বিহারী রায় কে তার আরাধ্যা দেবী শ্যামারূপার পূজক নিযুক্ত করেছিলেন। দেবীর বর্তমান পূজকদের বাড়ী শ্যামারূপার গড়ের নিকটেই বিষ্ণুপর গ্রামে এবং তাদেরও উপাধি 'রায়' হওয়ায় মাননীয় সুশীল বাবুর দাবীকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে সেই প্রাচীন

পুরোহিত হিসাবে কথিত বিনোদ বিহারী রায়ের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানতে চাইলে বর্তমান পুরোহিত, যারা ছয় পুরুষ ধরে দেবীর পুজা করে আসছেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্য ভূতনাথ রায়ও তেমন কিছু আলোকপাত করতে পারলেন না।

ইছাই ঘোষ ও শ্যামারূপা ঃ— ইছাই ঘোষ প্রতিষ্ঠিত দেবী আসলে ভবানী বা পার্ব্বতী। ইছাই পূজিত দেবী মূর্তি ছিল কণক প্রতিমা। ঈশ্বর পরম নিষ্ঠায় সেই কণক প্রতিমার পূজা করতেন। দেবীও ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ স্নেহশীলা হওয়া সত্ত্বেও সে হেন ভক্তের যুদ্ধে মৃত্যু হওয়ায় ক্ষুব্ধ পুরোহিত সেই মূর্তি নিকটস্থ দীপা সায়রে বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং সে মূর্তি আর পাওয়া যায় নি। পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিও ইছাই ঘোষের মানস কন্যা কল্যানী কর্তৃক কল্যানেশ্বরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজতি হচ্ছেন। এমন অনেকেই বিশ্বাস করেন, বিশেষ করে কল্যানেশ্বরীর পূজক দেঘরিয়া রাও তাই বলেন। স্থানীয় লোককথা ও লোক সঙ্গীতেও ধ্বনিত হতে শোনা যায়—

পূর্বে বাড়ী সেন পাহাড়ী ছিলেন মা কল্যাণী।
শ্যামারূপা নাম ধর মা গহন বাসিনী।। (৫৩)

এখন সেখানে দশভূজা সিংহবাহিনী মহিষাসুর মর্দ্দিনীর প্রস্তর মূর্তি শ্যামারূপা নামেই পূজিতা হচ্ছেন। কিন্তু কেন এমন নাম? তার উত্তরে এক লোক কাহিনীতে জানা যায় পুর্বে তান্ত্রিক উপাচারে পূজিত এই তান্ত্রিক দেবী শ্যামারূপার পূজায় নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। কিন্তু নিকটস্থ অজয় নদীর উত্তরে সাধনরত পরম বৈষ্ণব সাধক ও কবি জয়দেবের তা আদৌ মনঃপুত ছিল না। তাই একদিন কবি নদী পার হয়ে শ্যামারূপার আটনে উপস্থিত হয়ে পুজারী কাপালিক কে জানায় যে, সে তো নরবলি দিয়ে মায়ের আরাধনা করেন— মা সেই পূজা উপাচারে কতখানি সন্তুষ্ট সেটি দেখাবার জন্য মাকে উপস্থিত করাতে হবে। যদি মা উপস্থিত না হন তবে জানতে হবে যে মা এই পূজায় তুষ্ট নন। আর যদি সত্যই কাপালিক ব্যর্থ হন তখন তিনি দেখাবেন তার শ্যামকে; তবে শর্ত তারপর আর নরবলি দেওয়া যাবে না।

কাপালিক এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে তার আরাধ্যাদেবীকে দেখাতে ব্যর্থ হলে তখন কবির কাতর প্রার্থনায় শ্যাম সম্মুখে হাজির হলেন। কাপালিক তা দেখে মুগ্ধ হয়ে পরাজয় স্বীকার করেন। ফলে তখন থেকেই মায়ের কাছে নরবলি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর যেহেতু শ্যামামা রূপ পরিবর্তন করেই হয়েছিলেন শ্যাম, তাই এখানের দেবী হলেন শ্যামরূপা— তা থেকেই হয়েছেন শ্যামারূপা। (৫৪)

যদিও এই কাহিনী লোক কাহিনী এবং এর মধ্যে যদি কিছু মাত্র সত্যতা থেকেও থাকে তবে জয়দেবের কাল ইছাই এর অনেক পরবর্তী (ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিক) কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি ইছাই গত হওয়ার অনেক পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল তাই বহু ধর্মমঙ্গলেই ইছাই পুজিত দেবী হিসাবে শ্যামারূপার নামই উল্লেখ আছে।

গবেষকের দৃষ্টিতে ইছাই ঘোষের পারিপার্শ্বিকতা ঃ— এতক্ষণ ঈশ্বর ঘোষের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হল। তাতে জানা গেল যে, ঈশ্বর ঘোষ গোপভূমেরই লোক, জাতিতে গোয়ালা এবং সার্বভৌম রাজা। ধর্মীয় মানসিকতায় তিনি ছিলেন ভবানী ভক্ত। বংশ পরম্পরায় ঘোষ বংশ দীর্ঘদিন গোপভূমে রাজত্ব করেছিল এবং সেই বংশের মধ্যমণি স্বরূপ শৌর্য বীর্যে তিনি অতুলনীয়, তাই তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। প্রধানত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, নিদর্শনাদি সহ নানান কাহিনী বিন্যাস ও লোকশ্রুতি ও লোককাহিনীর প্রেক্ষিতে ঈশ্বর ঘোষের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল। পরিশেষে এতদঅঞ্চলের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গবেষক সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রয়াত সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজে এই অঞ্চল ঘুরে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল হিসাবে মূল্যবান গ্রন্থ বীরভূম বিবরণের ২য় খণ্ডে [৫৫] ঈশ্বর ঘোষ ও তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে যে সকল মতামত প্রদান করেছেন তারই কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল।

তিনি বলেছেন— সেন পাহাড়ের উপরে প্রাচীন দুর্গের বিপুল ধ্বংসাবশেষ আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। দুর্গের নাম ছিল ত্রিষষ্ঠী গড়। ইছাই ঘোষ সে নাম পরিবর্তন করিয়া নাম রাখে ঢেক্করি বা ঢেকুর। ইছাই এর প্রতিষ্ঠিত শ্যামারূপা দেবীর নামানুসারে লোকে সংজ্ঞা দিয়েছে শ্যামারূপার গড়। ইছাই ঘোষের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের সেনাপতি লাউসেনের যে স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল তার নাম কাঁদুনে ডাঙ্গা তার পাশেই 'টুমুনি' মামে একটি ক্ষুদ্র নদী দ্বীপাকারে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে বেষ্টন করেই অজয়েই মিলিত হয়েছে। এরই দক্ষিণে ছিল সুবৃহৎ গড়ের বহিঃপ্রাচীর যার ধ্বংসাবশেষ এখন ধানক্ষেতের মধ্যে দেখা যায়। এই প্রাচীরগুলিকে 'মুরুচা' বলা হত। আর এই মুরুচার দক্ষিণে ছিল বিশাল পরিখা রক্তনালী নামে একটি নদীতে পরিণত হইয়াছে। এরই গায়ে রয়েছে বিশাল বিল যা এখন ধানখেতে পরিণত হয়েছে। বিলের এক অংশের ঠাকরুন পুকুর থেকে নির্গত হয়ে রক্তনালী পরিখাটি পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে কোটাল পুকুর নামক গ্রামের পার্শ্বে গিয়া অজয়ের সহিত মিশিয়াছে। এই কোটাল পুকুর গড়ের পূর্ব দিকের সেনা নিবাস ছিল।

কোটালের (গড় রক্ষকের) থানা ছিল বলিয়া কোটাল পুকুর নাম। এই কোটাল পুকুরের দু'মাইল পশ্চিমে রয়েছে ইছাই ঘোষের দেউল ও তারই প্রতিষ্ঠিত নগরের ধ্বংসাবশেষ যা পাহাড়ি ও জঙ্গল এলাকায় বিস্তৃত এবং এখন 'সেন পাহাড়ি' নামে খ্যাত। অজয় নদীর বাঁধ থেকে তাকালে এটি যে একটি পাহাড়ি এলাকা তা বেশ বোঝা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমারও তাই মনে হয়েছে। আসলে এই সেন পাহড়ী পশ্চিমের ছোটনাগপুর পাহাড়ের বিস্তৃত ক্ষয়িত রূপ। এখানে দুই ছোট নদী টুমুনি ও

রক্তনালীর অবস্থান দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তারা এই গড় এলাকাকে চারিদিকে স্বাভাবিক জল পরিখায় বেষ্টিত করে রেখেছিল। সে দিক থেকে ইছাই ঘোষের ঢেকুর গড় চতুর্দিকে পরীক্ষা বেষ্টিত হয়ে বেশ সুরক্ষিত ছিল।

সেন পাহাড়ী এলাকার দক্ষিণে রয়েছে লোহাটাপুরী বর্তমানে লোহা গুঁড়ি, রক্ষিৎপুর ও হাড়িকি প্রভৃতি গ্রাম। লোহাটা পুরীতে ইছাই এর সেনাপতি লোহাটাবজুরের সেনা নিবাস ছিল। লোহাটার নামেই লোহাটা পুরী হয়েছে। রক্ষিৎপুরের রক্ষিৎ উপাধির তাম্বুলি সম্প্রদায় এখনও মনে করেন তারা এখানকার আদি বাসিন্দা এবং তাদের পূর্ব পুরুষগণ ইছাই ঘোষের রসদ সরবাহক ছিলেন। এখানেরই কোন কোন স্থান খয়রা পাড়া, চোয়ড়ি কোন্দা নামে পরিচিত যা একদা ইছাই এর লোয়ার, খয়ড়া, চোয়াড় প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর সৈন্যগণ ঐ স্থানে বাস করত।

তাদের প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও তথায় ''কালীতলার মাঠ''নামে খ্যাত রয়েছে। এরই কিছু পশ্চিমে গড় গোপালপুর বা গড় গোয়াল পাড়া নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। জন কয়েক গোয়ালা এখনও তথায় বাস করে। ইছাই ঘোষের স্বজাতি গোপসৈন্যগণ তথায় বাস করত। বর্তমান গোয়ালাগণের পূর্বপুরুষগণও ভয়ানক বলবান ও লাঠিয়াল ছিল। এই গোয়ালাগণকে এতদ্ অঞ্চলের লোকে দক্ষিণের গোয়ালা, গড়ের গোয়ালা বা গোড় গোয়ালা বলত। বলা বাহুল্য তাদের দৈহিক সামর্থ দেখিয়াই তাহাদের ঐ বিশেষ অ্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছিল। এখনও এই অঞ্চলে ও আশে পাশে বেশ কিছু গোয়ালা প্রধান গ্রাম রয়েছে যেমন— গোয়ালপুর, গড় গোপালপুর, নবগ্রাম, শিবপুর, বনগ্রাম ইত্যাদি। উপরি উক্ত পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে ধরে নেওয়া সহজ যে, একদা এই বিস্তৃত অঞ্চলে ইছাই ঘোষ তার স্বজাতি ও নিম্ন সম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ সৈনিকদের নিয়ে স্বাধীনভাবেই এখানে রাজত্ব করেছিলেন।

তাছাড়া লাউসেনের সঙ্গে ইছাই ঘোষের যুদ্ধ হয়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্য এবং অজয়ের উত্তরে যেখানে লাউসেন ঢেক্করীর ইছাইকে পরাজিত করার জন্য সেনাস্থাপন করেছিলেন সেই স্থান এখনও লোক মুখে লাউসেন তলা নামে খ্যাত। লাউসেন তলার অনতি দক্ষিণে প্রবাহিত অজয় নদ পূর্বাভিমুখে সুরধুনীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিয়াছে। ইছাই ও লাউসেনের যুদ্ধক্ষেত্র এক্ষণে অজয় গর্ভে বিলীন হইয়াছে। লোকে বলে যুদ্ধক্ষেত্রের নাম 'কাঁদুনেডাঙ্গা'। ইছাই শ্যামারূপার খুব আদরের ভক্ত ছিলেন। মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও যুদ্ধে গিয়ে ইছাই মারা যাওয়ায় মা শ্যামারূপা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন তাই এই স্থান কাঁদুনে ডাঙ্গা। কাঁদুনে ডাঙ্গায় ইছাই এর আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন করাও স্বাভাবিক। যোদ্ধার ক্রীড়া ক্ষেত্র যে এতদ্ অঞ্চলের লোকের নিকট কাঁদুনে ডাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ''কালস্য কুটীল গতি''।

লাউসেনের প্রধান সেনাপতি প্রখ্যাত কালু ডোমও যেখানে নিহত হয়েছিল সেই স্থানে এখনও এতদ অঞ্চলের ডোমেরা বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেত হয়ে ১৩ই বৈশাখ তাদের জাতীয় বীর কালুডোমের উদ্দেশ্যে পূজা দিয়ে যায়। কে জানে কোন অজ্ঞাত কারণে সেই গোময় কুন্ডের সুরভি কমল আজিও তাহার স্বজাতিগণের নিকট হইতে ভক্তির অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতেছে। সে স্থানটিও লাইসেনের কথিত সেনানিবাস লাউসেন তলার লাগাও এবং প্রাচীন ঢেক্কুরীর তথা অজয়ের উত্তরে অবস্থিত।

সেনা পাহাড়ের উপরে প্রাচীন দুর্গের বিপুল ধ্বংসাবশেষ আজিও দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে পাহাড়ের পূর্বে অনতি দূরে ইছাই ঘোষের দেউল ও একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। এখনও এই জঙ্গলের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো কাঠ কয়লায় পোড়ান পাতলা চারাকোনা ইটের গাঁথুনি চোখে পড়ে যা এখানকার লোকরা ঈশ্বর ঘোষের গড়ের ধ্বংসাবশেষ বলেই মনে করে। প্রায় দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়া বহু সংখ্যক নাতি উচ্চ টিলা বিদ্যমান। একটি টিলা হইতে অন্য টিলায় পৌছুবার কোনও উপায় নাই। সুগভীর খাত সমূহ তাহাদের পার্থক্য রক্ষা করিতেছে। একটি হইতে অপর টির ব্যবধান প্রায় ৩০/৪০ হস্ত পরিমিত হইতে পারে। টিলার উপরে কোথাও বেউড় বাঁশের ঝাড়, কোথাও বা কন্টকিত লতাগুল্ম। লোকে বলে এখন যেমন আছে তখনও তেমনি ছিল। লোকশ্রুতি পূর্বে এখানে ৮/১০ খানি সাবেকী জং ধরা মাঝারি মাপের কামানও দেখা যেত।

ইছাই ঘোষ মহামাণ্ডলিক রাজা হলেও ছিলেন শ্যামারূপার ভক্ত। এখনও এই জঙ্গলে শারদীয়া অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে তোপধ্বনি শোনা যায়— যা শুনে এলাকার যাবতীয় দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণের বলিদান নিষ্পন্ন হয় কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার সেই তোপধ্বনি কোথা থেকে নির্গত হয় তা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। [৫৫]

এতক্ষণ আমরা ঈশ্বর ঘোষ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনলাম তাতে ঐতিহাসিক পুরুষ ইছাই ঘোষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন ছিল তা জানা গেল। দীর্ঘক্ষণ গোপভূমের প্রখ্যাত গোপ রাজা ইছাই ঘোষের বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যাদি ও প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রেক্ষিতে তার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হল। এবার এই গোপভূমের অন্যান্য রাজন্যবর্গের বিষয়ে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় যার কথা তিনি হলেন রাজা প্রতাপ সিংহ।

রাজা প্রতাপ সিংহ ঃ— পালরাজ রাম পালের সান্ধি বিগ্রহিকের পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত কাব্য 'রামচরিত' অনুযায়ী তৎকালীন বঙ্গ দেশের অনেক তথ্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাতে জানা যায় তখনকার দিনে একাদশ-দ্বাদশ শতকে এ বঙ্গভূমে ও তার আশে পাশে বেশ কিছু সামন্ত রাজন্যবর্গের অবস্থান ছিল। তাদের রাজ্য সীমা ছোট হলেও শৌর্যবীর্যে তারা স্বাধীন রাজাদের মতই আপন আপন এলাকা শাসন করত।

সেই সব শাসকদের মধ্যে উল্লেখ্য হল— মগধ এবং পীঠীর অধিপতি ভীম যশঃ, কোটাট বীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তিরাজ জয় সিংহ, দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ বাল বলভীর বিক্রম রাজ, অপর মান্দারের অধিপতি এবং আটাবিক সামন্তচক্রের প্রদান লক্ষ্মীশূর, কুজবটির শূর পাল, তৈল কম্পের রুদ্র শিখর, উচ্ছালের অধিপতি ময়গল সিংহ, ঢেক্করীররাজ প্রতাপ সিংহ, কজঙ্গলের অধিপতি নরসিংহার্জুন, সঙ্কট গ্রামের চণ্ডার্জুন, নিদ্রাবলয়ের বিজয় বাজ, কৌশম্বীপতি ঘোরপবর্দ্ধন, পদুবম্বার সোম [৫৬] এদেরই চতুর্দ্দশ সামন্তচক্র বলা হয়ে থাকে। এই সামন্তচক্রের এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন ঢেক্করীর প্রতাপ সিংহ।

প্রতাপ সিংহকে ঢেক্করীর রাজা বলা হয়েছে। কিন্তু এই ঢেক্করীর অবস্থান কোথায়? সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঢেক্করীর নগর উত্তর রাঢ়ে অবস্থিত ছিল এবং অদ্যাবধি ইহা ঢেকুরী নামে সুপরিচিত। [৫৭] হর প্রসাদ শাস্ত্রীর মতে রাজা প্রতাপ সিংহের রাজধানী ঢেকুর গড়ের অবস্থিতি হল অজয় নদের দক্ষিণ তীরে আউশগ্রাম থানার গৌরাঙ্গ পুরে। [৫৮] সেদিক থেকে ঐ এলাকা পরিপূর্ণভাবে গোপভূমের সীমায় অবস্থিত ছিল। কৈবর্ত রাজ দিব্যক কর্তৃক ২য় মহীপাল নিহত হলে পর রামপাল সিংহাসনে আরোহন করেন। কৈবর্তরাজ ভীমের হাত থেকে পিতৃরাজ্য উদ্ধার কল্পে চতুর্দ্দশ সামন্ত রাজাদের সাহায্য নিয়ে তিনি ভীমকে পরাভূত করে বরেন্দ্র অধিকারে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সময় যে সকল সামন্ত রাজাদের সাহায্য নিয়েছিলেন তাদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে গোপভূমের প্রখ্যাত সামন্তরাজা প্রতাপ সিংহ ও একজন উল্লেখ্য সামন্ত রাজা ছিলেন এবং তিনি সর্বোতভাবে রামপালকে সাহায্য করেছিলেন। [৫৯]

তাই প্রতাপ সিংহ যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তা প্রমাণিত হয়। এখন তার কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে আসা যাক। সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম চরিতে তাকে "ঢেক্করী রাজ" বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ঢেক্করী হল অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বিস্তৃত অরণ্যানীর মধ্যে গড় বেষ্টিত রাজধানী। যেখানে একদা এই গোপভূমের প্রবল প্রতাপশালী গোপরাজা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ রাজত্ব করেছিলেন। যিনি ২য় বিগ্রহ পালের পুত্র মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন। সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এই ঢেক্করী রাজ প্রতাপ সিংহ নিংসন্দেহেই ছিলেন ঈশ্বর ঘোষের পরবর্তী ঢেক্করীর রাজা, তা নাহলে পিতৃ রাজ্য উদ্ধারের জন্য রামপাল মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের কাছেই সাহায্য চাইতেন। কিন্তু তিনি তা না চেয়ে চতুর্দ্দশ সামন্তচক্রের অন্যতম প্রতাপ সিংহের সাহায্য চেয়েছিলেন। সে দিক থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর ঘোষের পরবর্তী ঢেক্করীর রাজা ছিলেন প্রতাপ সিংহ।

সেটাই নিশ্চিত, কারণ ঈশ্বর ঘোষ মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন আর প্রতাপ

সিংহ ছিলেন রাম পালের সমসাময়িক। এখন এদের মধ্যে কয়েক পুরুষের ব্যবধান, আর সময় হিসাবেও বলা যায় রামপাল (মহীপাল (৯৭৭-১০২৭ খ্রীঃ) নয়পাল (১০২৭-৪৩খ্রীঃ) ৩য় বিগ্রহ পাল (১০৪৭-৭০খ্রীঃ) ২য় মহীপাল (১০৭০-৭১খ্রীঃ) ২য় শূরপাল (১০৭১-৭২খ্রীঃ) রামপাল (১০৭২-১১২৭খ্রীঃ) (৫৯) মহীপালের থেকে কিঞ্চিদধিক একশ বছরের পরবর্তী তাতে সন্দেহ নাই।

সেই সময় কার ঘটনা নিয়েই বঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে কোন ধর্মমঙ্গলেই প্রতাপ সিংহের উল্লেখ নাই। "ধর্মমঙ্গলকারগণ এদেশের লোক। তাঁহাদের শ্রুত জনশ্রুতি অনেকাংশে সঠিক হওয়াই সম্ভব।" (৬০) তাই ধর্মমঙ্গলের দিকে আমাদের ঝোঁক। কিন্তু কোন ধর্মমঙ্গলে প্রতাপ সিংহের উল্লেখ না থাকলেও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। রামচরিত কাব্যটির কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কারণ এই কাব্যটি রামপালের সন্ধি বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী রচনা করেছিলেন। নন্দী পরিবার সরাসরি পাল রাজবংশের সঙ্গে জড়িত থাকায় সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা রামচরিতে তৎকালীন ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। সেদিক থেকে এই গ্রন্থে উল্লেখিত সামন্তরাজা হিসাবে ঢেক্করীর প্রতাপ সিংহ নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

দ্বাদশ শতকে প্রতাপ সিংহ ঢেক্করী অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গেই রাজত্ব করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি আর এক সামন্ত রাজা সামন্তসেনের সঙ্গে যৌথ অভিযান করে বর্তমান বর্ধমান জেলার গঙ্গাতীরবর্তী উত্তর পূর্বভাগ ও পরে এই জেলার পশ্চিম ভাগও তারা অধিকার করে নেন। তাদের যৌথ আক্রমণেই এক সময় শূর রাজাদের রাজধানী শূরনগরী বিপর্যস্ত হয়ে যায় ফলে শূর বংশীয় রাজারা রাঢ় বঙ্গে তাদের অধিকার হারায়।

রাজা হরিশ্চন্দ্র ঃ— ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নানান ছোটখাট উপাদানকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক ইতিহাস পর্যালোচনায় অনেক সময় বহু কাহিনীই দৃষ্টি গোচর হয়ে যায়। সেই সমস্ত কাহিনীর মধ্যেও যে ইতিহাস নিহিত থাকে না তা নয়। অনেক সময় তাদের সত্যাসত্য বিচার করতে পারলে যথার্থ ইতিহাসও উদঘাটিত হয়ে আসে। যেমন বহু ধর্মমঙ্গলে উল্লেখিত ইছাই ঘোষ-লাউসেনের কাহিনী আজ ঐতিহাসিক নিরিখে বিশেষ করে রামগঞ্জ তাম্রশাসনের আবিষ্কারে এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ঈশ্বর ঘোষ কেবল ধর্মমঙ্গলের কল্পকাহিনীর নায়কই নয় তিনি রীতিমত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তার সম্পর্কে আজ অনেক তথ্যই উদঘাটিত হয়েছে। সে কাহিনী পূর্বেই এই অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে।

অনুরূপ ভাবেই ইতিহাসের পাদ প্রদীপের সামনে হাজির হয়েছে রাজা প্রতাপ সিংহ তার কথাও সদ্য আলোচিত হল। এখন রাজা হরিশ্চন্দ্র ও অনুরূপ ভাবেই

ইতিহাসের আলোয় আলোকিত হতে চলেছেন। হরিশ্চন্দ্র ও একজন রাজা ছিলেন তার কথা বহু ধর্মমঙ্গলেই উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে ধর্মমঙ্গলের দুই প্রখ্যাত কবি রূপরাম ও ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র পালা নামে একটি অধ্যায়ই সূচিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তার মহিষী মদনা দু'জনেই ধর্মরাজের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং ধর্মের কৃপায় তারা পার্থিব জগতের যাবতীয় সুখ সম্পদের অধিকারী।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে জানা যায় সেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার অমরাবতী অমর নগরী। ধর্মমঙ্গলেই বলা হয়েছে— "আদ্যের অমরাবতী শ্রীবর্ধমান।" আর সেখানকার রাজা রানী সম্পর্কে বলা হয়েছে— "মদনা মহিষী আর হরিশ্চন্দ্র রাজা'। [৬১] অর্থাৎ বর্ধমান জেলার অমরাবতী নগরীতে রাজা হরিশ্চন্দ্র পত্নী মদনাকে নিয়ে রাজত্ব করতেন। ধর্মের আরাধনায় তাদের লুইচন্দ্র নামে পুত্র লাভ হয়েছিল। ধর্মের পরীক্ষায় সেই পুত্র ছেদন করে ছদ্মবেশী ধর্মরাজকে আহার করালে ধর্মের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখে ধর্মরাজ তুষ্ট হয়ে তাদের সপুত্র পার্থিব জগতে পরম সুখী করেছিলেন— এটাই ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালার মূল বক্তব্য।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গবেষক মহলেও গুঞ্জন ওঠে- হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য। কিন্তু নানাভাবে চেষ্টা হলেও ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্যের দ্বারা তাকে ঠিক প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না। তার বাড়ী সম্পর্কেও গবেষকদের মধ্যে রয়েছে মত পার্থক্য। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর প্রেক্ষিতে ভট্ট শালী মহাশয়ের বক্তব্য হল তিনি ঢাকা জেলার সভারের রাজা ছিলেন যা, ধর্মমঙ্গলের পরিপন্থী কিন্তু আচার্য যোগেশ চন্দ্র বিধ্যানিধির মত হল যে তিনি বঙ্গের বর্ধমানের অন্তর্গত অমবার গড়ের রাজা ছিলেন। [৬২] আসলে ঐ সব বক্তব্যই অনুমান ভিত্তিক। এর পিছনে কোন জোরালো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

হরিশ্চন্দ্রকে অনেকেই ঈশ্বর ঘোষের সমসাময়িক বলতে চেয়েছেন কিন্তু তার পিছনেও কোন জোরালো যুক্তি নাই। ঐতিহাসিক প্রমাণাদির দ্বারা আমরা জেনেছি ঈশ্বর ঘোষের কাল ছিল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক, পাল রাজা মহীপালের তিনি সমসাময়িক ছিলেন— এটাই ইতিহাস স্বীকৃত। আর মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে তার বহু পরে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক বা তারও পরে— কাজেই দীর্ঘকাল পরে রচিত মঙ্গলকাব্যে হরিশ্চন্দ্রের কোন প্রামাণ্য অবস্থিতি না থাকায় তাদের দু'জনকে সমসাময়িক বলার কোন যুক্তি নাই। তাছাড়া ধর্মীয় প্রকৃতির দিক থেকেও ওরা ছিল পরস্পর বিপরীত ধর্মী, কারণ ঈশ্বর ঘোষ ছিলেন ভবানী ভক্ত আর হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ধর্মরাজ ভক্ত। কাজেই ধর্মীয় মানসিকতায় এরা সমমানসিকতার লোকও ছিল না। তবে মঙ্গ-লকাব্যের যুগে বঙ্গে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন তা সত্য। কারণ

সংস্কৃতি প্রমাণ তার থাকলেও "ঐতিহাসিক প্রমাণ হরিশ্চন্দ্রের নেই (৬৩) তাই হরিশ্চন্দ্রকে ঈশ্বর ঘোষের সমসাময়িক বলার পিছনেও যুক্তির অভাব।

তারই পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায় বর্ধমানের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বরাকর বা বেগুনিয়া মন্দির চত্বরে। যেখানে অনেকগুলি পাথরের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ মুখে ডাইনে বামে প্রথমে যে ২টি মন্দির পড়বে তাতে বাম দিকের মন্দিরের দরজায় পাথরের বাজুতে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালে চোখে পড়বে মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি ফলক বা লিপি। অভিনিবেশ সহকারে দেখলে দেখা যাবে তাতে লেখা রয়েছে—

"ওঁ।। শাকে নেত্র বসুত্রিচন্দ্র গণিতে
পুণ্যে বুধাহেতিথাবষ্টম্যাং
রুচিরং প্রতিষ্ঠীতাবতী পক্ষেসিতে ফাল্গুনে।
ঐশম্ দেবকুলম যথাবিধি
হরিশচন্দ্রস্য ভুরিশ্রিয়ো ভুশক্রস্য
হরিপ্রিয়া প্রিয়তমা উচ্চৈঃ ফল প্রাপ্তয়ে।"

অর্থ করলে যা দাঁড়ায় তা হল রাজা হরিশ্চন্দ্র তার স্ত্রী হরিপ্রিয়া দেবীর নামে ১৪৬১ খ্রীঃ এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ডান দিকেও যে মন্দিরটি তাতে কোন লিপি না থাকলেও অনুমান করা খুবই সহজ যে, এই মন্দিরটিও একই ব্যক্তির দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। কারণ এদের গঠন শৈলীতে একই রীতি অনুসৃত হয়েছে, তাছাড়াও পূর্বের ঐ প্রতিষ্ঠা লিপির নীচে আর একটি লিপি বর্তমান তাতে জানা যায় ১৫৪৬ খ্রীঃ মন্দির ২টি সংস্কৃত হয়েছে, সে প্রসঙ্গে মূল লিপির নীচের লিপিতে উল্লেখিত হয়েছে—

"হরিশ্চন্দ্রস্য নৃপতেঃ কির্ত্তির লুপ্তা ভবিষ্যতি।।
তৎকীর্ত্তিম্ রক্ষনার্থায় পুনঃ কীর্ত্তিম্ করোম্যহম্।"

অর্থাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কীর্তি নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্যই তার উত্তরসূরীরা ঐ মন্দির ২টি ১৫৪৬ খ্রীঃ পুনরায় সংস্কার করেছিলেন। এতেই প্রমাণ হয় যে ঐ দুটি মন্দিরই রাজা হরিশ্চন্দ্রের দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল। এতেই বোঝা যায় যে হরিশ্চন্দ্র নামে বঙ্গে এক রাজা ছিল এবং তা প্রাচীন গোপভূম বা পশ্চিম বর্ধমানের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। তবে মন্দির নির্মাতা রাজা ও ধর্মমঙ্গলের রাজা হরিশ্চন্দ্র এক ব্যক্তি নয়। কারণ ধর্মমঙ্গলের রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীর নাম হরিপ্রিয়া। সে দিক থেকে বিচার করলে এরা দু'জন এক ব্যক্তি নয়।

যার দানে বরাকরে ২টি মন্দির নির্মিত হয়েছিল সেই হরিশ্চন্দ্র ছিলেন শিখর ভূমের রাজা, তিনি গোপভূমের অমরার রাজা নন। এ প্রসঙ্গে বর্ধমানের উল্লেখ্য গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন— "শিখর ভূমের রাজা হরিশ্চন্দ্র ইছাই ঘোষের প্রায় ৫০০ বছরের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে

পঞ্চদশ শতকে বরাকরের মন্দির লিপিতে। বরাকরের মন্দিরগুলি (৪র্থটি বাদে) ১৩৮৩ শকাব্দে (১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে) হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।" (৬৪)

এখন এমনই এক সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন হবে যে, হরিশ্চন্দ্র নামে এক জন রাজা গোপভূমে ছিলেন— ধর্মমঙ্গলের বিবরণ অনুযায়ী তিনি গোপভূমের অমরার গড়ে রাজত্ব করতেন— যে অমরার গড়ে ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। যাদের কথা পরে আলোচিত হবে। অন্যদিকে বরাকর মন্দির গাত্রে যে আর এক হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি ছিলেন শিখরভূমের রাজা। এই শিখর ভূমের কথা সর্বপ্রথম জানা যায় সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম চরিত কাব্যে। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে শিখর ভূম হল "Sikharbhum or Shergarh the mahall to which Raniganj belongs". (৬৫) প্রাচীন দ্বাদশ ভূমের মধ্যে শিখর ভূম অন্যতম। সেদিক থেকে আসানসোল মহকুমার রাণীগঞ্জ ও পঞ্চকোট জনপদকেই শিখরভূম বলা হয়ে থাকে এক কথায় পশ্চিম গোপভূমই ছিল শিখর ভূম। আর সেখানকার রাজাই ছিলেন বরাকরে মন্দির নির্মাতা হরিশ্চন্দ্র।

বঙ্গের অজয় দামোদরের মধ্যবর্তী অরন্যাঞ্চলের গোপভূমে পূর্বে গোপজাতির প্রাধান্য ও আধিক্য ছিল— একথা ঐতিহাসিক সত্য তাতে সন্দেহ নাই। শুরুতে অরন্যচারী এই জাতি অসীম সাহসী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হওয়ায় যুদ্ধ বিদ্যায় তারা বেশ পারদর্শী ছিল। রাঢ়ের প্রখ্যাত গবেষক সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও এই মত পোষন করেই বলেছেন- "রাঢ়দেশে এই শৌর্যবীর্যশালী যোদ্ধৃজাতির বহু নিদর্শন আছে।" তারই প্রমাণ হিসাবে আমরা পূর্বেই ত্রিষষ্ঠী গড়ের গোপরাজা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের শৌর্যবীর্যের কথা উল্লেখ করেছি।

এখন গোপভূমের আরও কিছু গোপ গোষ্ঠীভুক্ত রাজাদের রাজত্বের কাহিনী আলোচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রথমেই রাজা ভল্লুপদ ও তার বংশধরদের কথায় আসা যাক— যারা প্রথমে ভাল্কীতে ও পরে অমরার গড়ে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। পরে পরে তাদেরই বংশধরেরা অনেকেই দিগনগর, কাঁকসা, ভরতপুর, মঙ্গলকোট ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

গোপভূমে ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত গোপরাজ বংশ ঃ— এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে বিস্তৃত রয়েছে বহু কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির বেড়াজাল। ইতিহাসও সেখানে নীরব। তাই প্রথমে কিংবদন্তীগুলিকে উন্মোচন করে তাদের আবেষ্টন উৎরে তার মধ্য থেকেই আসল সত্যটুকু উদঘাটনের চেষ্টা করতে হবে। প্রথম কিংবদন্তী অনুযায়ী জানা যায় এই এলাকার এড়াল নিবাসী এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ একদা পারিবারিক কোন কাজে গড়ের নিকটবর্তী দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবার কালে বনস্থ ভালুকের গুহায় এক সদ্যজাত মানব শিশুর ক্রন্দন শুনে কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে সেখানে হাজির

হলে এক মানব শিশুর দেখা পায়। সাহসে ভর করে সেই নির্জন বন থেকে ক্রন্দনরত সেই শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে, সন্তান কামনায় বুভুক্ষু আপন ব্রাহ্মণীর কোলে তাকে তুলে দেয়। ফলে সেই ব্রাহ্মণ দম্পতির পরম স্নেহে শিশুটি ব্রাহ্মণ গৃহেই পালিত হতে থাকে। যেহেতু তাকে ভল্লুকের গুহায় পাওয়া গিয়েছিল তাই ব্রাহ্মণ দম্পতি তার নামকরন করেন ভল্লুপদ।

বয়সকালে তার মধ্যে অমিতবিক্রম, মল্লনৈপুণ্য এবং অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারে অপূর্ব দক্ষতা সহ তার মধ্যে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণাদি দেখা যায়। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সে একসময় বেশ কিছু অনুগত সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জঙ্গলের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন কবেন— এই ভাবেই ভল্লুপদর প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম হয় ভাল্কী।

২য় আর এক কিংবদন্তী কেন্দ্রিক অভিমতে রীবভূম বিবরণ (৩য়) খণ্ডের লেখক মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী বলেছেন— "মহাভারতোক্ত বিদুরের পুত্র ধর্মবান পর্বতে ভালুকের পদতলে রক্ষিত হয়েছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশ ভল্লুপাদ নামে পরিচিত হয়।" এই বংশীয় কোন ব্যক্তি সৌরাষ্ট্র থেকে নীলাচলের উদেশ্যে তীর্থ পরিক্রমণে সপারিষদ পূর্ণগর্ভা স্ত্রী সহ এসে গড়ের জঙ্গলে ছাউনী ফেলেন। সেই বনেই স্ত্রী প্রসব করেন এক পুত্র সন্তান। কিন্তু সন্তানের কোন সাড়া শব্দ না পাওয়ায় তাকে মৃত ভেবে বনেই ফেলে রেখে সদলবলে চলে যান। পরে তাকে এক সন্ন্যাসী উদ্ধার করে লালন পালন করেন। সেই সন্ন্যাসী তাকে ভল্লুপাদ বংশ জাত জানতে পেরে তার বাসগ্রামের নাম রাখেন ভাল্কী। .

৩য় আর এক কিংবদন্তী নির্ভর স্থানীয় কবি দেবেন্দ্র নাথ চটোপাধ্যায় লিখিত শিবাক্ষাকিঙ্কর কাব্যে ভল্লুপদর বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে—

পিতামহ তাঁর ক্ষত্রিয় কুমার
ভল্লুপাদ নাম জানে সর্বজন।
ভালুকে তাহারে করিল পালন।
জাতীয় প্রকৃতি লুকাবার নয়
শৈশবে সে শিশু নির্ভয় হৃদয়
মৃগয়া করিত শ্বাপদ বধিত
বনের বরাহ করিয়া বিজয়। (৬৬)

এখানেও কবি কিংবদন্তীর শোনা কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই তাদের সরাসরি বহিরাগত ক্ষত্রিয় বলেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এটাই নতুন সংযোজন তাছাড়া আর সবই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

এখন কিংবদন্তীর মায়াজালকে পাশ কাটিয়ে সেই কিংবদন্তীর মোহ অঞ্জন

আবেশিত কুলজি গ্রন্থকারদের আঙ্গিনায় একটু যাওয়া যাক। সেখানেও দেখা যায় এই বংশ নিয়ে তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মত পার্থক্যের কচকচানি। এ প্রসঙ্গে কুলজি গ্রন্থ প্রনেতাদের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার তাঁর 'সদগোপ জাতির ইতিহাসে' বলেছেন- রাঘব সিংহ ভল্লুপদ নামে এক ব্যক্তি সৌরাষ্ট্র বা সুরাট দেশ থেকে এসে বর্ধমানের অমরার গড় অঞ্চলে বসতি গড়েন। তিনি সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শী ও প্রকৃতিতে বীরশ্রেষ্ঠ। তিনি এখানে রাজত্ব শুরু করে রাজধানীর নামকরণ করেন ভাল্কী।

'সদগোপ কুলীন সংহিতা' নামে আর এক কুলজি গ্রন্থ প্রণেতা ও ভল্লুপদকে ভালুক সেবিত রাজপুত্র বলে উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি জানিয়েছেন সৌরাষ্ট্র নয় অযোধ্যার এক নরপতি, পুরী নয় গঙ্গাসাগর যাবার উদ্দেশ্যে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরের ঘটনা প্রায় একই।

এখন কুলজি গ্রন্থগুলিতে ভাল্কীর রাজ বংশ সম্পর্কে যে সকল বিবরণ বর্ণনা আছে তা প্রায় সবই কিংবদন্তী নির্ভর। কিংবদন্তীগুলিকে বাদ দিয়ে তারা কিছুই এগুতে পারে নাই। তবে কি বলা যাবে কিংবদন্তীগুলি একেবারেই মূল্যহীন? সেকথাও জোর দিয়ে বলা যায় না বরং বলা যায়— কিংবদন্তী নিয়ে গবেষণা হয়নি বলেই এই সব লোককথা ও জনশ্রুতিগুলি ভিত্তিহীন একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। স্থানীয় জনসাধারণ বংশানুক্রমে যে সব কিংবদন্তী শুনে আসছেন তার একটা মূল্য নিশ্চয়ই আছে। (৬৭) সে দিক থেকে এই কিংবদন্তী বা জনশ্রুতিগুলি একেবারেই অবান্তর তা ভাবার কোন কারণ নাই। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সংস্কৃতি গবেষক বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে বলেছেন— "কোন কাহিনী, প্রবাদ বা কল্পনা যখন জন চিত্তে শিকড় বিস্তার করে তখন মাটিতেও তার মূল থাকা সম্ভবপর।" (৬৮) তাই সেই মূল সন্ধানে আমাদের অবশ্যই প্রবৃত্ত হতে হবে। কিন্তু তা হয়েছে কই? বরং অধিকাংশ কুলজি গ্রন্থকার অতিমাত্রায় পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে কুলজি গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন— তাই সেগুলি আদৌ ইতিহাসের মর্যাদা পায়নি কারণ তথ্য প্রমাণের অগ্নি পরীক্ষায় সেগুলি অনুত্তীর্ণ, তাই সেগুলি অনেক সময় ইতিহাসের ধারে কাছেও যেতে পারে নাই। পরে পরে এ নিয়ে যথা সময়ে আলোচনা করা যাবে।

এখন গোপভূমের ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের কথায় আসা যাক। এই রাজবংশ সম্পর্কে জনশ্রুতি জানা যায় তারা বহিরাগত সৌরাষ্ট্র, অযোধ্যা ইত্যাদি স্থান থেকে এসে এখানে সন্তান রেখে যান। একথা বলার উদ্দেশ্যই হল এই রাজবংশকে বহিরাগত ক্ষত্রিয় বংশ বলে প্রতিপন্ন করা। আর সেটা না করলে রাজা বলে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ রাজা হলেই তাদের বা'র থেকে আসা ক্ষত্রিয় হতে হবে— এমন কষ্ট কল্পিত কল্পণাই যেন এখানে কার্যকরী হয়েছে।

একটা কথা এখানে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা প্রয়োজন সেটি হল এরা গোপভূমে

গোপরাজা হিসাবেই স্বীকৃত। আর সে প্রসঙ্গে বলতেই হয় যে গোপেরা এমনিতেই যাদব ক্ষত্রিয়। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। স্বয়ং যদুপতি কৃষ্ণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই যদু বংশেই এদের জন্ম তাই এরা যাদব ক্ষত্রিয়। যতদিন না গোপেদের মধ্যে বিভাজন পর্ব সমাধা হয়েছিল ততদিন ওরা গোপই ছিল। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে ১৩১০ সালে চন্দননগর পণ্ডিত সভা বঙ্গীয় সদগোপ সভাকে জানায় যে, বঙ্গীয় সদগোপরাও ব্রজভূমি হতে আগত নন্দবংশীয় গোপগণের বংশধর।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য মেদিনীপুরের নারাজোল রাজ্যের পরবর্তী বংশধর রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর বঙ্গীয় সদগোপ সভার শ্রীরামপুর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে, বলেছেন যে সদগোপগণ পশ্চিম ভারতের আহীরদের বংশধর। অন্যদিকে সদগোপ কুলতিলক অধ্যাপক ডঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের বক্তব্য সদগোপগণ উত্তর পশ্চিম ভারতের গুর্জরগণের বংশধর। আর বাংলার গোপ আহীর গণও জাঠ গুর্জর বংশের লোক। তারা মথুরা বৃন্দাবনের যদু বংশীয় ক্ষত্রিয়। কাজেই শুরুতে গোপ সদগোপ একই জাতিভুক্ত হওয়ায় এরা যে ক্ষত্রিয় তাতে সন্দেহ নাই। পরে বহু পরে গোপ সম্প্রদায় কৃষি ও গোপালনকে কেন্দ্র করে ২টি ভাগে বিভক্ত হয়ে কৃষিকে বৃত্তি হিসাবে নিয়েছিল যারা, তারা সদগোপ আর যারা গোপালন সহ কৃষি নির্ভর তারা গোপ নামে অভিহিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন জেলা ও দায়রা জর্জ শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র ঘোষ যিনি বঙ্গীয় সদগোপসভার সভাপতি ছিলেন তিনি তার 'সদগোপজাতির ইতিহাস' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন যে, ৩০০ বছর পূর্বে সদগোপ সমাজ গোপসম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়েছে। এখন তার কথায় গুরুত্ব দিলে বলতেই হয় এই বিভাজন অনুষ্ঠিত হয়েছে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে। ইতিহাসের নিরিখে দেখা যায় গোপভূমে ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাজেই তখনও গোপসমাজের বিভাজন অনুষ্ঠিত হয়নি। সেদিক থেকে ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে গোপ রাজা বলাই শ্রেয়। পরবর্তী কালে এই বংশের বংশধরেরা গোপ থেকে বিভাজিত হয়ে সদগোপ সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ায় অতীত গৌরব স্মরণ করে এখানকার রাজাদের সদগোপ হিসাবে চিহ্নিত করতে চায়। আর অনেক লেখকই এই সম্প্রদায়ের কালসীমাকে উপলব্ধি করতে না পেরে অনেকেই ভ্রম বশত তাদের সদগোপ বলেই মেনে নেয় কিন্তু শুরুতে ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ গোপবংশই ছিল।

গোপভূমে ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত বংশের সঙ্গে ভালুকের নিবিড় সম্পর্কের কথা বহুল ভাবে প্রচলিত আছে। সে সম্পর্কেও কিছু বলার প্রয়োজন। বনে পড়ে থাকা এক মানব শিশুকে বন্যপ্রাণী ভালুক কর্তৃক পরিপালনের কথা এতদ অঞ্চলে বহুশ্রুত লোককাহিনী। তারই প্রেক্ষিতে ঐ বংশের সঙ্গে বন্য প্রাণী ভালুকের সঙ্গে এক গভীর

সখ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক এবং সেটাই হয়েছে ফলে শোনা যায় ঐ বংশে পালিত কোন ভালুক মারা গেলে ওরা অশৌচ পালন করে থাকে। এটা অন্য কিছু নয়— এর দ্বারা ঐ বংশের সঙ্গে ভালুকের এক বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির স্ফূরণই পরিলক্ষিত হয়।

অন্য দৃষ্টিতে দেখলে এই সত্যই বেরিয়ে আসে যে, এরা একদা পশুপালক জাতি ছিল। বন্য জীবজন্তু তারা পালন করত। দিন এগিয়ে চলতে থাকায় একদা কৃষি আবিষ্কারের পর, তারা গৃহপালিত জীবজন্তু পালন ও তাদের নিয়ে চাষ আবাদে নিযুক্ত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ বলেছেন— "ভল্লুক টোটেম এবং ভল্লুকসম্পর্কে সমস্ত কাহিনী পশুপালক সমাজের নির্দেশক।" তাই পশুপালক জাতি হিসাবে ভল্লুক তাদের টোটেম হতে পারে— এতে অবাক হবার কিছু নাই কারণ এখনও অনেক বন্যপ্রাণী যেমন বাঘ, সিংহ, কুকুর, বেড়াল ও অনেক পশু পক্ষিকেও বহু জাতির টোটেম হিসাবে দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মনখমর নামক এক জাতির উপাস্য টোটেম মহিষ, বঙ্গের বাউরীদের টোটেম কুকুর ইত্যাদি। সেদিক থেকে ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত বংশের টোটেম ছিল ভল্লুক। আর শুরুতে এরা পশুপালক গোপ জাতিই ছিল, কারণ তখনও গোপজাতির বিভাজন হয়ে সদগোপ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়নি, আব তা যদি হত তবে তাদের শাসিত রাজ্যসীমা গোপভূমের পরিবর্তে সদগোপভূম নামেই পরিচিত হত।

গোপরাজ ভল্লুপদর কাল বিচার ঃ— বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ভল্লুক আশ্রিত হওয়ায় তাকে ভল্লুপদ বলা খুবই সংগত কিন্তু পরে কোন কোন কুলজি গ্রন্থকার বিশেষ করে জ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার তার 'সদগোপ জাতির ইতিহাসে' তার নামকরণ করেছেন রাঘব সিংহ ভল্লুপদ। পরে পরে সেই নামকরণ অন্যান্য কুলজি গ্রন্থ প্রণেতারাও মেনে নিয়েছেন। এখন ঐ রাঘব সিংহ ভল্লুপদর আবির্ভাব কাল নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এ বিষয়েও নানা মুনির নানা মতই প্রচলিত, আর সত্য কথা বলতে কি ঐ পুর্বোল্লিখিত কুলজি গ্রন্থগুলি সবই কিংবদন্তি নির্ভর তবুও তার থেকেই প্রকৃত সত্যকে বরে করার প্রয়াস নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া যাক গোপাল মুখোপাধ্যায়ের লেখা "বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়' গ্রন্থের প্রতি। ঐ গ্রন্থেই জানা যায় যে, রাঘব সিংহ ভল্লুপদ ৮৪৮ বঙ্গাব্দে এদেশে আসেন এবং ভাল্কীতে রাজ্য স্থাপন করেন।

অন্যদিকে সদগোপ জাতির ইতিহাস গ্রন্থে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার তার বিরোধিতা করে বলেন যে রাঘব সিংহ ৪৪২ বঙ্গাব্দে এদেশে এসেছিলেন। আবার বীরভূম বিবরণ' গ্রন্থে মহিমা রঞ্জন চক্রবর্তী তার আবির্ভাব কাল হিসাবে ৫৪২ বঙ্গাব্দকে ধরেছেন। আর এক আধুনিক চিন্তাবিদ ও বিশিষ্ট গবেষক সদগোপ কুলতিলক সদ্য প্রয়াত ডঃ

অতুল সুর মহাশয় ও তার 'সদগোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিষয়টির উপর কোন অলোকপাত করেন নাই। বরং কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে রচিত বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয় গ্রন্থের মতবাদই গ্রহণ করেছেন। তার মত হল রাঘব সিংহ ৮৪৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৪৪২ খ্রীঃ) মানকরের নিকট এক বিস্তীর্ণ বনাকীর্ণ স্থানে এসে বাস করেন। (৬৯) তাই ডঃ সুরের মতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ রাঘব সিংহের রাজ্যকাল। অন্য আর এক গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তিনি তার 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন— আদি পুরুষ রাঘব সিংহ ১০৩৫ খ্রীঃ রাজ্য স্থাপন করেন। (৭০)

এখন একই বিষয়ে বিভিন্ন জনের উল্লেখ্য বিভিন্ন সময়কালগুলির প্রেক্ষিত আলোচনা করা যাক। প্রথমেই বলি বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয় ও সেই সঙ্গে অতুল সুরের বক্তব্যকে অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না। কারণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে সামগ্রিক ভাবে বিষয়টিকে সম্যক রূপে বিচার করলে ঐ সময়কালকে কোন মতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায় বঙ্গে মুসলমান আধিপত্য শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে। বঙ্গে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পরে গোপভূমে গোপরাজাদের রাজ্যেও তাদের আক্রমণ ধীরে ধীরে শানিত হতে থাকে, তাদেরই অধীনস্থ মঙ্গলকোট রাজ্যে সেই আক্রমণ প্রথম সূচিত হয় এবং তা বিজিতও হয়। পরে মুসলমানরা আরও পশ্চিম অগ্রবর্তী হয়ে অমরারগড়ের গোপ রাজাদের আর এক শাখা যারা কাঁকশায় রাজত্ব করছিলেন তাদের আক্রমণ করেন। ফলে "খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সৈয়দ বোখারী কাঁকসা জয় করে নেয়।" (৭১) তা যদি হয় তবে ভল্লুপদর চতুর্থ অধস্তন পুরুষ রাজা মহেন্দ্রর জামাতা কঙ্কেস রায় কি করে খ্রীঃ চতুর্থ শতকে নিহত হতে পারে? ডঃ সুর ও গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতে তখনও তো বঙ্গে ভল্লুপদর আর্বিভাবই ঘটেনি। তাদের মতে ভাল্কীতে ভল্লুপদর আবির্ভাব হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে কাজেই তাদের ঐ মতকে কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না।

২য় মত হিসাবে জ্ঞানেন্দ্র বাবু জানিয়েছেন রাঘব সিংহের আগমণ কাল ৪৪২ বঙ্গাব্দ। খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী হবে ১০৩৬ খ্রীঃ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ও এই মতকেই সমর্থন করেছেন। অনেকে আবার তাকে ১ম মহীপাল এর সমসাময়িক বলেও মনে করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত যে, ঐ সময় উত্তর ও দক্ষিণ উভয় রাঢ় অঞ্চলই মহীপালের অধীন ছিল না। (৭২) সুতরাং ঐ সময় রাঘব সিংহের মত কোন ব্যক্তির পক্ষে মানকর অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করা অসম্ভব কিছু নয়। (৭৩)

অন্য আর এক মতে স্থানীয় গবেষক মহিমা রঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয় তার 'বীরভূম

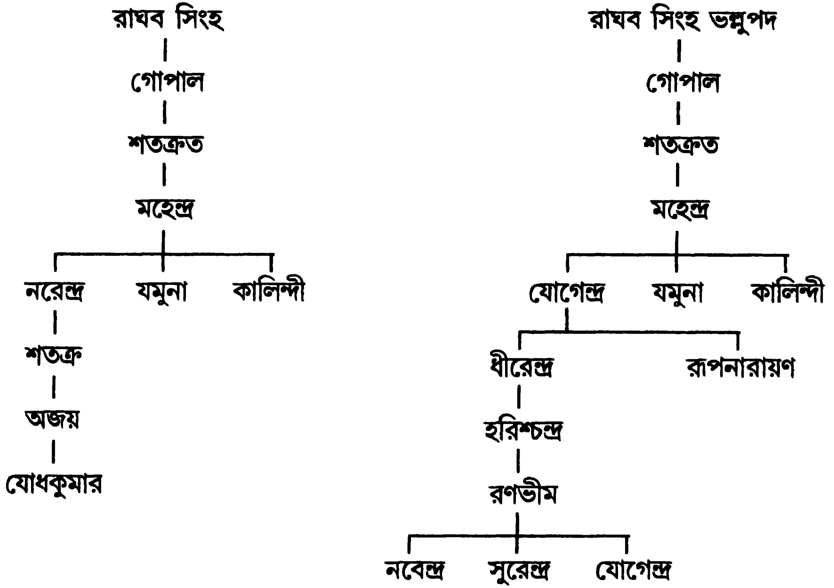
বিবরণ' (৩য়) খণ্ডে রাঘব সিংহ ভল্লুপদর সময়কাল ৫৪২ বঙ্গাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন— যা পূর্ববর্তী অভিমতের আরও একশ বছর পরবর্তী কাল। অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ১১৩৬ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ দ্বাদশ শতক।

এতক্ষণ ধরে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে বিভিন্ন মতামতের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মোটামুটি একাদশ শতকের শেষ ও দ্বাদশ শতকের মধ্যেই রাঘব সিংহ ভল্লুপদ এই ভাস্কী এলাকায় রাজত্ব করেছিলেন তা ধরে নিতে কোন অসুবিধা নাই। তা ছাড়া প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক গবেষক বিনয় ঘোষও গোপভূমে ভল্লুপদ রাঘব সিংহের রাজত্ব কালকে একাদশ শতাব্দী হিসাবেই অনুমান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে বঙ্গে অজয় তীরবর্তী ঢেক্কুরীর গোপরাজা ইছাই ঘোষ বঙ্গেশ্বর ১ম মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজ রাজধানী ঢেক্কুরীকে ত্রিষষ্ঠীগড়ে পরিণত করেছিলেন এবং তিনি ত্রিষষ্ঠী (৭৪) গড়ের অধিপতি ছিলেন তার মধ্যে ভাস্কী তথা অমরার গড়ও একটি। কাজেই তিনি রাঘব সিংহের অগ্রবর্তী এবং একাদশ শতকেই রাজত্ব করেছিলেন আর রাঘব সিংহ ভল্লুপদ তার পরবর্তী তাই তার রাজত্বকাল একাদশের শেষ ও দ্বাদশ শতকের মধ্যে হওয়াই সম্ভব।

পরিশেষে বলি ১৭৪৪ খ্রীঃ বর্ধমানরাজ চিত্রসেন কর্তৃক গোপভূম বিজিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গবেষকদের মতামত ও বর্তমান বংশধরদের কাছ থেকেও পাওয়া তথ্যে জানা যায় যে, এই বংশ মোটামুটি ৩০ পুরুষ রাজত্ব করেছিলেন। তা যদি হয় তবে তাদের সময় কাল হবে (৩০×২৫) ৭৫০ বছর। গোপভূম বিজিতের সময় ১৭৪৪ থেকে ৭৫০ বছর (কিছু বাদসাদ দিয়ে ৭০০ বছর) পিছিয়ে গেলে রাঘব সিংহের সময় (১৭৪৪-৭০০=১০৪৪) বছর যা একাদশ শতকই হয়। বিভিন্ন গ্রন্থ ও রাজ বংশের প্রবীণ ব্যক্তিদের দেওয়া এই বংশের যে বংশ তালিকা পাওয়া গেছে তাতেও শুরুর দিকে ৯।১০ পুরুষের তালিকা পাওয়া যায়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ২টি তালিকা দেওয়া হল। (৭৫)

উল্লেখিত ২টি বংশ তালিকার মধ্যে প্রথমটি বিভিন্ন কুলজি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। আর ২য়টি বংশের প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া। ২টি বংশ তালিকায় উল্লেখ্য ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু কিছু মত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ যে ভল্লুপদ রাঘব সিংহ তাতে সন্দেহ নাই। এখানে উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠা পুরুষের গৃহীত উপাধি সিংহ হলেও এই বংশের পরবর্তী রাজারা কিন্তু রায় উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। রাজা > রায়, সেদিক থেকে 'রায়' রাজা শব্দেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

এখন বংশ বিশ্লেষণে দেখা যায় ভল্লুপদর পুত্র গোপাল এবং গোপালের পুত্র শতক্রত এখানে মতান্তর আছে। অনেকে বলেছে ভল্লুপদর ছেলে হল শতক্রত আর শতক্রতর ছেলে হল গোপাল। তবে ভল্লুপদর প্রপৌত্র মহেন্দ্র তাতে দ্বিমত নাই। উক্ত



গোপাল সম্পর্কে জনশ্রুতি— তিনি সিংহাসনে বসে বাহুবলে ৩৫০টি পরগণা জয় করে জাঁকিয়ে রাজত্ব করেছিলেন। তার পরে মহেন্দ্র রাজা হন। মহেন্দ্রই এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রমী রাজা ছিলেন। তিনিই রাজধানী ভাল্কী থেকে অমরার গড়ে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

রাজা মহেন্দ্রর মৃত্যুর পর পুত্র নরেন্দ্র রাজা হন। এখানেও মতান্তর বর্তমান। অনেকের মতে মহেন্দ্রর পুত্র যোগেন্দ্র। এখান থেকেই উভয় বংশ তালিকার মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে বংশধরেরা ও কুলজিকারেরা আপন আপন পথে চলতে থাকায় এই মত পার্থক্য দূরীকরণের কোন পথই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা না পাওয়া গেলেও একটা ব্যাপারে বেশ সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়, সেটি হ'ল মহেন্দ্রর পরবর্তী বংশধরেরা কেউ তেমন উল্লেখ্য নয়। তাই তাদের ব্যাপারে কিছু জানাও যায় না। কুলজি গ্রন্থকারেরাও এ ব্যাপারে আশ্চর্যজনক ভাবেই নীরব। তবে এই বংশের শেষতম রাজা যে বৈদ্যনাথ সে ব্যাপারে সকলেই একমত। আর সেই বৈদ্যনাথই বর্গী হাঙ্গামায় নিহত হন। বর্গীদের লাগাম ছাড়া লুটতরাজে এই রাজ বংশ সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পরে ১৭৪৪ খ্রীঃ বর্ধমানের রাজা চিত্র সেন সমগ্র গোপভূম জয় করে নেন। তার ফলে এই রাজ বংশের রাজত্বের অবসান হয়, তবে বর্তমান বংশধরেরা এই গ্রামে বেশ স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে

পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত দেব কীর্তির সুষ্ঠু সেবাদি পরিচালনায় কালাতিপাত করছেন। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় গবেষক শ্রদ্ধেয় গোস্বামী দাস রায়ও একই অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন—"রাজা বৈদ্যনাথ এই বংশের শেষ রাজা। ইনি বর্গীর হাঙ্গামার সময় নিহত হন ও বর্গীরা নির্মম ভাবে অমরার গড় ধ্বংস করে ও ব্যাপক লুটতরাজ চালায়।... তখন হতেই অমারার গড়ের রাজবংশধরগণ সম্মানের সহিত মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করে আসছেন। [৭৬]

এই বংশের প্রকৃত অবস্থান ঃ— আমরা শুরুতেই দেখেছি, বিভিন্ন কুলজি গ্রন্থের বিশ্লেষণে দেখান হয়েছে যে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ভল্লুপদ নাকি অযোধ্যা কিংবা সৌরাষ্ট্র ইত্যাদি স্থান থেকে আগত কোন ক্ষত্রিয় সন্তান- এখানকার বনে পরিত্যক্ত হয়ে ভল্লুক দ্বারা পালিত হয়েছিল। এগুলি নেহাতই কিংবদন্তির মায়াজালে পল্লবিত কল্পকাহিনী। তাই ওগুলিকে কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না।

এরকম প্রচারের উদ্দেশ্যও বেশ স্পষ্ট। তা হল এই রাজাদের বহিরাগত ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করা। কারণ তাদের মতে ক্ষত্রিয় না হলে ঠিক রাজা হিসাবে মানা যায় না- তাই ঐ অপচেষ্টা। তবে এরা যে ক্ষত্রিয় তা সঠিক ভাবেই প্রমাণ করা হয়েছে তার জন্য বহিরাগত বলা প্রয়োজন নাই। এখন প্রশ্ন হল এদের সঠিক অবস্থান কোথায়? তার প্রেক্ষিতে বলা যায় এরা কোন বহিরাগত নয়। এরা এই বঙ্গের গোপভূমেরই লোক।

এ প্রসঙ্গে সদগোপ বংশের কৃতি সন্তান প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক গবেষক শ্রদ্ধেয় ডঃ অতুল সুর যথার্থই বলেছেন যে, "তাদের আদি বাসস্থান ছিল গোপভূমে বা বর্ধমান-বীরভূম জেলায়। সেখান থেকেই তারা অন্যত্র গমন করেছে। [৭৭] অন্যকোন স্থান থেকে তারা এখানে আসে নাই বরং এখান থেকেই তারা অন্যত্র ছড়িয়েছে। এখানকার এই গোপ বংশই গোপ সদগোপ বিভাজনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গে সদগোপ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এরাই। এখান থেকে পরবর্তীকালে বঙ্গের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষও বলেছেন—এই বংশগুলিই পরে 'ভাল্কীর খোঁচ', 'দিগনগুরে খোঁচ', 'কাকসার খোঁচ' বলে পরিচিত হয়ে [৭৮] বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়েছে। প্রমাণ হিসাবে আরও বলা যায় ষোড়শ শতকে এখানকার এক সন্তান দ্বারপাল, পোলবা থানার অন্তর্গত মহানাদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেই স্থানের নাম হয়েছিল 'দ্বারপাল বাসিনী'। এখানকার সদগোপেরা মুখ্যত পূর্ব ও পশ্চিম কুলীয়-২টি ভাগে বিভক্ত। সেই পূর্বকুলীয়দের একটি শাখা মহানাদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী চিনির ব্যবসায়ে ধনী মহানাদে ১৮৩০ খ্রীঃ তৈরী করেন নবরত্নের বিখ্যাত রটন্তীকালী মন্দির ও বিগ্রহ। [৭৯] কাজেই অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এখান কার সদগোপেরা পরবর্তীকালে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এখন কিছু পারিপার্শ্বিক প্রমাণের কথা বলা যেতে পারে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় বহু জনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আপন অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করা যাক। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় গ্রামের উত্তরে বর্তমানে একটি চটানে পুকুর রয়েছে। সেই পুকুরটির স্থানীয় নাম 'ধলার' যা ধনাগারেরেই অপভ্রংশ। আর সেই ধনাগার হল অমরার গড়ের রাজাদেরই ধনাগার। লোক বিশ্বাস এই ধলার সংলগ্ন উত্তরের ডাঙ্গা যা এখন মাঝি পাড়া নামে খ্যাত সেই স্থানেই পূর্বে রাজবাড়ী ছিল। এখনও এর যত্র-তত্র খুঁড়লে ছোট ছোট ইটের গাঁথনি চোখ পড়ে। আজ থেকে প্রায় ২৫।২৬ বছর আগে ধলার থেকে বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হয়েছে— তার মধ্যে উল্লেখ্য হল একটি অনুপম ভাস্কর্যের প্রতীক এক বিষ্ণু মূর্তি। বর্তমানে এটি চট্টোপাধ্যায় পরিবারে শিব মন্দিরে শিব লিঙ্গের পাশে পূজিত হচ্ছে।

মূর্তি ফলকটির উচ্চতা ৫৭ সেঃমিঃ এবং চওড়ায় ২৬ সেঃমিঃ। মূর্তিটি উন্নত মানের কালো ব্যাসল্ট শিলায় নির্মিত। মূর্তিতত্ত্বের বিচারে বিগ্রহটি বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি রূপ ভেদে শ্রীধর মূর্তি। পাদপীঠে একটি স্বমৃণাল প্রস্ফুটিত পদ্ম। তার উপর মূল বিগ্রহটি আভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান। মূর্তির উপরের বাম ও দক্ষিণ হাত যথাক্রমে শঙ্খ ও চক্রাবৃত। নীচের দুটি হাতই দশম একাদশ ভাস্কর্য বৈশিষ্ট অনুসারে বরদা মুদ্রায় দুটি প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পের উপর ন্যস্ত। [৮০]

সেদিক থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনাদির দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে এখানকার রাজা একাদশ-দ্বাদশ শতকে বাংলার পাল যুগের সমসাময়িক ছিল। উক্ত মূর্তি ছাড়াও এখানে এক কেন্দু বৃক্ষের নীচে বেশ কয়েকটি কালো ব্যাসল্ট পাথরের ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে। তাছাড়া ধারে কাছে এই রাজবংশের পল্লবিত শাখা প্রশাখার রাজধানী হিসাবে অবস্থিত কাঁকসা, দিগনগর ইত্যাদিতেও যে সকল প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে তা ও পাল আমলের সময়কালকেই সূচিত করে ফলে এখানকার রাজবংশের সূচনা পাল পর্বের মধ্য যুগে বিস্তৃত হয়েছিল তা সহজেই ধরা যেতে পারে এবং বঙ্গে বর্গী হাঙ্গামার কাল (১৭৪২-৫১) পর্যন্ত তারা প্রায় ছয়শ বছর ধরে গোপভূমে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। পরে পরে এই বংশ থেকেই আরও অনেকেই স্থানীয় কাঁকসা, ভরতপুর ও দিগনগরে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজ্যের সীমা বা বিস্তৃতি ঃ— জনশ্রুতির দৌলতে জানা যায় "ভাল্লুক পালিত বা ভাল্লুকাকৃতি" [৮১] বিশিষ্ট এক বালক বড় হয়ে গোপভূমের যেখানে রাজ্যপাট শুরু করেছিলেন তার নাম হয় ভাল্কী এবং তার প্রতিষ্ঠিত বংশই ভল্লুপদ রাজবংশ নামে খ্যাত। ইতিহাসে এদের উল্লেখ না থাকলেও আঞ্চলিক কাব্য-কাহিনীতে এরা কখনও কখনও পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। ইতিহাসে রাজা বলতে যা বোঝায় এরা তা না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ভূস্বামী বা সামন্তরাজা হিসাবে নিজেদের

প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ভল্লুপদর শৌর্য-বীর্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের নীলপুরের অধিপতি মতান্তরে দেরিয়াপুরের রাজা তাহাকে কন্যাদানপূর্বক অমরার গড় ও তৎসন্নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রাম যৌতুক স্বরূপ দান করেন। (৮২) তাছাড়া তিনি আপন উদ্যোগে বেশ কিছু গ্রাম অধিগ্রহণ করে নিয়ে ভাল্কীতে স্থায়ীভাবে রাজত্ব শুরু করেন। পরে তার পৌত্র মতান্তরে প্রপৌত্র মহেন্দ্র— যিনি এই রাজবংশের সর্বাধিক পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন তারই প্রচেষ্টায় ভাল্কী থেকে রাজধানী পাশেব গ্রামে অমরার গড়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহ্য ঃ—

ভল্লুপদ ঃ— অজয় দামোদরের ঘেরাটোপে গোপভূমের জঙ্গল গর্ভে আজ থেকে প্রায় নয়শ বছর আগে এক গোপ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভল্লুপদ রাঘব সিংহ। কিংবদন্তি কাহিনী অনুযায়ী জানা যায় তিনি মা বাবা কর্তক পরিত্যক্ত হয়ে বনের এক ভল্লুকের দ্বারা পরিপালিত হয়েছিলেন বলেই তিনি ভল্লুপদ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। আর যে স্থানে তিনি রাজত্ব শুরু করেছিলেন সেই স্থান ভাল্কী নামে পরিচিত হয়। আপন উদ্যমে বন্য সাগরেদদের সহায়তায় গহন বনেই সৃষ্টি করেছিলেন এক রাজ্যপাট।

পরে সেই ব্যক্তি যৌবনে পদার্পণ করলে তার অপরিসীম শৌর্য-বীর্য ও রূপ লাবণ্যে আপ্লুত হয়ে দেরিয়াপুরের রাজা তাকে কন্যাদান করেন ও সেই সঙ্গে যৌতুক বাবদ অমরার গড়ের সন্নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রামও দান করেন। অন্যদিকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার এর মতে তিনি বর্ধমানের অন্তপাতি নীলপুরের তৎকালিন অধিপতির কন্যার পানিগ্রহণ করেন। (৮৩) তাতে করে তার রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত হতে থাকে। পরে তিনি আপন বাহুবলে এলাকার ধারে কাছের অনেক গ্রাম দখল করে নিয়ে রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করে চলেন। কিন্তু এই রাজা ও তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের ঐতিহাসিক কোন স্বীকৃতি নাই। নাই কোন লেখা-জোখা ইতিহাস।

কিন্তু বহু কিংবদন্তি নির্ভর কুলজি গ্রন্থ যেমন— সদপোগ জাতির ইতিহাস— জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়-গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সদগোপতত্ত্ব-শরৎ চন্দ্র ঘোষ, স্থানীয় কবি দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের শিবাখ্যাকিঙ্কর কাব্য, এমনি কি ডঃ অতুল সুরের-সদগোপজাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মহিমা রঞ্জন চক্রবর্তীর বীরভূম বিবরণ ও বিনয় ঘোষের পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি ইত্যাদি গ্রন্থে ভল্লুপদর কাহিনী তথা এই রাজ বংশের কথা উল্লেখিত হয়েছে। ফলে তিনি যে একজন পদমর্যাদায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তার দ্বারা সেই প্রাচীন কালে আনুমানিক একদশ-দ্বাদশ শতকেও এক রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

গোপাল ঃ— গোপভূমে ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশের তিনি হলেন ২য় উল্লেখ

ব্যক্তি। পিতা ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে তিনি আরও বেশী বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বেদাদি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি বিশেষ উন্নত মার্গেরও লোক ছিলেন। স্বীয় ভূজবলে ৩৫০ খানি মৌজা অধিকার করেন। তার নাম অনুসারে সমস্ত পরগণার নাম রাখা হয় গোপালভূম।[৮৪] সেদিক থেকে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন। তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মল্লভূমের রাজা তাকে স্বীয় কন্যা দান করেছিলেন।

রাজা মহেন্দ্র ঃ— ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন রাজা মহেন্দ্র। তিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ভল্লুপদর প্রপৌত্র ছিলেন তাতে কোন দ্বিমত নাই। তিনি আপন পরাক্রম, শক্তি ও প্রচেষ্টায় এই রাজ্যের সীমা বহুদূর বিস্তৃত করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষের বিশ্বাস তার রাজ্য নাকি কাটোয়া থেকে পঞ্চকোট পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। এই রাজা মহেন্দ্রর গুণকীর্তন করেই স্থানীয় কবি বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় 'শিবাখ্যা কিঙ্কর কাব্য' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সুরগড়ের রাজা ধীরেন্দ্র সিংহের পরমাসুন্দরী কন্যা অমরার বিবাহের জন্য সয়ম্বর সভার আয়োজন করেছিলেন এবং তাতে বহু স্বাধীন সার্বভৌম রাজারা আমন্ত্রিত হলেও কন্দর্প কান্তি বীর শ্রেষ্ঠ রাজা মহেন্দ্রকেই রাজকন্যা অমরা বর মাল্য দিয়েছিলেন। এতে বাড়াবাড়ি সূচিত হলেও কবির কথায় উল্লেখিত হয়েছে—

কিন্তু স্বয়ম্বরা অমরা যুবতী
পরিহারি আর ভূপালগণ।
বরিলা মহেন্দ্রে ইন্দু নিভাননী
দময়ন্তী সতী নলে যেমন।।[৮৫]

রাজা মহেন্দ্রই তার প্রপিতামহের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ভাল্কী থেকে রাজ্যপাট সরিয়ে এনেছিলেন মানকরের সন্নিকটে এক গ্রামে এবং সেই স্থানের নামকরণ করেছিলেন আপন প্রিয়তমা পত্নী অমরার নামে অমরা। পরে সেই রাজধানীকে তিনি উচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে তার চারিদিকে পরিখা খনন করে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে তাকে রীতিমত সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করেছিলেন বলেই তার রাজধানীর নাম হয়েছিল অমরার গড়।

এই রানী অমরার গর্ভেই পুত্র নরেন্দ্র মতান্তরে যোগেন্দ্র ও দুই কন্যা যমুনা ও কালিন্দীর জন্ম হয়। পুত্র নরেন্দ্র পরে অমরার রাজা হয়েছিলেন। শূর গড়ের রাজা শিবাদিত্যের সঙ্গে যমুনার ও কাঁকসারাজ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে কালিন্দীর বিবাহ হয়েছিল। কুলজি গ্রন্থকারদের মতে মহেন্দ্রর তিন রাণী। তার মধ্যে ২য় রাণী মল্লভূমের রাজকন্যা গৌরী দেবী। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, আর তৃতীয় রাণী কাঞ্চন কুমারী—তার সন্তানগণ দিগনগরে বসবাস করতেন।

রাজা মহেন্দ্র খুবই প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি একদা "স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাটোয়ার সন্নিকটবর্তী খুজুরডিহি গ্রামে উগ্রক্ষত্রিয় জমিদার জগৎ সিংহের গৃহ হতে বলপূর্বক দশভূজা সিংহবাহিনী মূর্তি নিয়ে এসে অমরার গড়ে প্রতিষ্ঠা করেন।" (৮৬) এই দেবী দশভুজা সিংহবাহিনী দুর্গা হলেও এর পদতলে এক শিবা মূর্তি খোদিত থাকায় দেবীর নাম শিবাখ্যা। এই শিবাখ্যাই রাজা মহেন্দ্রর আরাধ্যাদেবী ছিলেন এবং এখনও ঐ দেবী এই রাজ বংশের দ্বারা পূজিত হয়ে চলেছেন।

রাজা মহেন্দ্র তার দুই কন্যার নামে ২টি বড় দিঘি খনন করেছিলেন। বড় কন্যা যমুনার নামে 'যমুনা দিঘি' যা গুসকরা বুদবুদ রাস্তার দক্ষিণ গায়ে অমরার গড়ের পূর্বে অবস্থিত। বর্তমানে সেখানে সরকারী উদ্যোগে মৎস চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার বিশাল আয়তন সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর দ্বিতীয় কন্যা কালিন্দী মতান্তরে শৈবলিনীর নামে উৎসর্গীকৃত। 'শৈবলিনী' অপভ্রংশিত হয়ে হয়েছে 'শ্যাওলা' —তাই এই দিঘি 'শ্যাওলা দিঘি' নামে ভাক্ষী থেকে সুয়াতা আসার পথে রাস্তার পশ্চিমে বিস্তৃত রয়েছে।

রাজা বৈদ্যনাথ ঃ— রাজা মহেন্দ্রর পরবর্তী বংশধরেরা কেউ তেমন উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন না। তাই বংশ তালিকাতেও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কুলজি গ্রন্থকারেরাও এই ব্যাপারে ভীষণ ভাবেই নিশ্চুপ। তবে এই বংশের সর্বশেষ রাজা হিসাবে সকলেই বৈদ্যনাথের নাম উল্লেখ করেন। মহেন্দ্রের পরবর্তী কালে কেবল তিনিই ছিলেন কিছুটা ভাস্বর আর সব ম্রিয়মান। তার সময়কাল পর্যন্ত রাজ পরিবারের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। তবে তারই সময়ে বঙ্গে বর্গী হাঙ্গামা শুরু হয় (১৭৪২-১৭৫১খ্রীঃ) এবং সেই বর্গী হাঙ্গামায় তিনি নিহত হন এবং বর্গীদের লাগামছাড়া লুটতরাজে এই রাজবংশ সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তারপর মাথা তুলে ওঠার আগেই বর্গী হাঙ্গামার অব্যবহিত পরেই ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন কর্তৃক গোপভূম অধিকৃত হওয়ায় এই রাজবংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। এর ফলে গোপভূমে আরণ্যক পরিবেশে শান্ত স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা গোপ রাজবংশ যা দীর্ঘ ছয়শ বছর নিজেদের অস্তিত্ব ক্ষুদ্র বা সামন্তরাজা হিসাবে টিকিয়ে রেখেও কালের করাল গ্রাসে একদিন বিলীন হয়ে গেল!

ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশের অতীত গৌরব ও পুরাকীর্তি ঃ— খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে গোপভূমের গহন অরণ্যে ভল্লুপদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোপ রাজবংশ দীর্ঘ ছয়শ বছর ধরে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এই দীর্ঘদিন ধরে ছোট বড় বহু রাজাই আপন কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ বহু কীর্তি কলাপের চিহ্ন রেখে গেছেন তাতে সন্দেহ নাই। তবে কালের নিয়মে সেই সমস্ত কীর্তিকলাপ আজ প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে তবুও সন্ধান করলে তাদের কিছু কিছু নিদর্শণ যে মিলবে না তা নয়। তাদেরই কিছু নিদর্শন এই পর্বে খোঁজার চেষ্টা করা যাক।

এই রাজ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন মহেন্দ্র। বহুল পরিমাণে তিনি বেশ কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি রেখে গেছেন সে সম্পর্কে পূর্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এই বংশের দীর্ঘদিনের রাজত্বে আরও অনেকেই যে কিছু কৃতিত্ব রেখে যায়নি তা জোর দিয়ে বলা যায় না। এখন সামগ্রিকভাবেই দেখা যাক এই রাজবংশের পুরাতাত্ত্বিক কি কি রয়েছে। এ বিষয়ে প্রথমেই আমরা মহেন্দ্রের প্রসঙ্গেই ফিরে আসি।

রাজা মহেন্দ্রই ভাল্কী থেকে অমরার গড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করে তাকে উঁচু পাঁচিল ও তার চারদিকে পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করেছিলেন তাই রাজধানী 'অমরারগড়' নামে খ্যাত। এখন সেই "গড় বা দুর্গের কোন চিহ্ন নেই আজ। গড়ের রেখা আছে, ঢাকা। রাজা নেই রাজ্যও নেই। শূন্য নামের প্রতিধ্বনি আছে ফাঁকা মাঠে— হাতশালা (হাতিশালা), ভাল্লুকশোল (ভালুক শালা), রঙ্গাল (রঙ্গালয়) ধলার (ধনাগার), মরাইতলা।" [৮৭] ইত্যাদির মধ্যে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে খুঁজতে গেলে প্রাচীন সেই সব ঐতিহ্যপূর্ণ দিনের অনেক স্মৃতিচিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে যা ঐ নামগুলির মধ্যেই তাদের অতীত পরিচয় ব্যক্ত করছে। তাই গ্রাম প্রান্তের চারিদিকে খুঁজতে গেলে এখনও বহুক্ষেত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইটের সন্ধান পাওয়া যাবে যা এককালের গড়ের পাচিলের ধ্বংসাবশেষ। এখনও গ্রামের চারিদিকে খালা জায়গা গোলাকার ভাবে গ্রামকে আবেষ্টনে আবিষ্ট করে রেখেছে— যা অতীতের গড়খাই বা পরিখারই নিদর্শন বলে মনে হয়। গ্রামের উত্তর প্রান্তে মাঝি পাড়ায় খুঁজলে রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনও লক্ষ্য করা যাবে। ঐ মাঝি পাড়ার দক্ষিণে মাটি কেটে কেটে বর্তমানে যে চটানে পুকুর লক্ষ্য করা যায় তার 'ধলার' নাম তো ধনাগারেরই অপভ্রংশ। সেখানেই পাওয়া গেছে প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি যা পাল যুগের শিল্প নিদর্শন তাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ ঐতিহাসিক পাল যুগেই এখানের রাজারা রাজত্ব করেছিলেন তা ধরে নেওয়া যায়।

রাজা মহেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিবাখ্যা দেবী তো এখনও গ্রামে স্বমহিমায় বর্তমান। শিল্প নৈপুণ্যে এও খুব প্রাচীন পুরাকীর্তি। আর রয়েছে প্রাচীন শৈব স্মারক হিসাবে দুগ্ধেশ্বর শিব। যার মন্দিরটিও রেখ দেউলের রীতিতে গড়া প্রাচীন নিদর্শন যা এখানকারই কোন রাজাদের তৈরী। এছাড়াও গ্রামের মধ্যে রয়েছে খড়ের চালের ধাঁচে তৈরী অনুপম দুর্গাবাড়ীকে ঘিরে, বেশ কয়েকটি শিবমন্দির ও তার মাঝে পঞ্চচূড়ার বিষ্ণুমন্দির সবই প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। গ্রামে ঘুরলে আরও দেখা যাবে বেশ কয়েকটি প্রাচীন দেব-দেউল যা টেরাকোটা শিল্পের অপূর্ব শিল্পকলায় সুসমৃদ্ধ। সেগুলি শিল্প রসিকদের এখনও আকর্ষণে পারঙ্গম। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে নির্জন মাঠের মাঝে রয়েছে বর্ধমান রাজকুলগুরু তথা রাঢ়ের শাক্ত সাধনার উজ্জ্বল স্তম্ভ স্বরূপ, সাধক কমলাকান্তের স্মৃতিধন্য সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ী।

অন্য গোপ বংশ ঃ— গোপভূমে গোপরাজাদের কথা বলতে গিয়ে অমরার গড়ের রাজপরিবারের কথা যেমন উল্লেখের দাবিদার-তেমনি কাঁকসার গোপরাজাদের কথাও বলতে হয়। কারণ অমরার গড়ের গোপরাজাদের প্রায় সমখুঁট আর এক গোপরাজ বংশ প্রায় সমান্তরাল প্রবাহে অগ্রবর্তী হয়েছিল। ফলে তাদেব কথাও বলতে হবে। এখন কাঁকসার রাজ পরিবারের কথায় আসা যাক। তার আগে শুরুতেই বলে নিই এরা কেউ ইতিহাস স্বীকৃত রাজা নয়। তবুও আঞ্চলিক ইতিহাসে এদের ভূমিকা অস্বীকার করারও উপায় নাই। তাই লোকশ্রুতি প্রবাদ ও কিংবদন্তিকেই পাথেয় করেই এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু কুলজি গ্রন্থকারদের ইতিহাস বিমুখ লেখা ও বিবরণকেই পাথেয় করেই আসল বস্তুর সন্ধানে এগুতে হয়। সেই চেষ্টাই করা যাক।

তার আগে একটা কথা বলে নেওয়া যাক। অমরার গড়ের রাজবংশের মতই এবাও শুরুতে ছিল গোপ। পরে বহু পরে গোপ-সদগোপ বিভাজনের পর এরা সদগোপ হলেও প্রথম দিকে গোপই ছিল। সেদিক থেকে এরাও ভগবান কৃষ্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এরাও সেই যুদপতি কৃষ্ণের বংশধর তাই এরাও যাদব ক্ষত্রিয়। পরে এদের পরবর্তী বংশধরেরা নিজেদের সদগোপ হিসাবে পরিচিত করেছে; তখন এরা কৃষি কর্মকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন— গো-পালনকে নয়। তাই কৃষিজীবী। কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে দক্ষিণ বঙ্গে কৈবর্ত সম্প্রদায় পরে কৃষি কেন্দ্রিক জীবন যাপন করতে শুরু করায় জালিক বা হালিক কৈবর্ত থেকে নিজেদের 'মাহিষ্য' বলে পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু এই গোপভূমের সদগোপরা বঙ্গের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়লেও তারা কিন্তু মাহিষ্য নন। এখন আর জাত নিয়ে জাতাজাতি করার প্রবণতা মানুষের নাই এবং তা না থাকাই ভাল তবুও জাতির ইতিহাস নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গেলে এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। তাই বলি সদগোপেরা গোপ সম্ভুত, কোন দিনই চাষীকৈবর্ত বা কৃষিজীবী মাহিষ্য নয়।

এখন প্রসঙ্গ পরিবর্তণে সাবেক প্রসঙ্গ গোপভূমের উল্লেখ্য আর এক গোপ রাজবংশ কাঁকসার রাজ পরিবারের কথায় আসা যাক।

কাঁকসার রাজ পরিবার ঃ— দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে কিংবা ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগেই গোপভূমের কাঁকসা গ্রামে সুদূর রাজপুতানার সূর্যবংশীয় কঙ্কসেন রাও নামে কোন রাজপুরুষ এখানে এসে আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি ছিলেন পরম শৈব। তিনিই এখানকার জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তৃত এলাকা পরিষ্কার করে সেখানে কঙ্কেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ সহ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তার পূজা আরাধনা শুরু করেন। সেই সঙ্গে তিনি এই এলাকায় আপন আধিপত্য বিস্তার পূর্বক রাজ্য পরিচালনার কাজও চালাতে থাকেন। এইভাবেই কাঁকসায় পরিণত হয়। এ কাহিনী জানা যায় এই অঞ্চলের

প্রাচীন কিংবদন্তি ও জনশ্রুতির উপর ভরসা করে স্থানীয় রবীন্দ্র কুমার নাগের রচিত 'কঙ্কেসা বংশের ও কাঁকসা গ্রামের ইতিহাস' নামক রচনা থাকে। [৮৮]

আলোচ্য বংশের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ২য় অভিমতে আসা যাক। এ বিষয়ে প্রখ্যাত গবেষক তথা সদগোপ কুলতিল ডঃ অতুল সুরও কিছু আলোকপাত করেছেন। তিনি তার 'সদগোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য' গ্রন্থে এখানকার রাজ বংশের উৎপত্তি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে ভবানীপতি কাঁকসা নামে কোন ব্যক্ত দাক্ষিণাত্য থেকে বঙ্গ দেশের এই স্থানে আবির্ভূত হন এবং এখানে ধীরে ধীরে রাজ্য বিস্তার শুরু করেন। তারই প্রতিষ্ঠিত বংশ কর্তৃক শাসিত এলাকা কাঁকসা নামে পরিচিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই বশের বংশ তালিকাও প্রদান করেছেন যা অপরাপরের প্রদত্ত বংশ তালিকার সঙ্গে মিলছে না। তাই বলা যায় তিনি ঐতিহাসিক যুক্তি নির্ভর আলোচনায না গিয়ে কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে রচিত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয গ্রন্থের অনুকরণে মতামত ব্যক্ত করেছেন। [৮৯]

তৃতীয়ত ঃ— কিংবদন্তির আশ্রয়ে আশ্রিত বহুজনের মত ও সেই সঙ্গে প্রাচীন ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণে কনকসেনের প্রতিষ্ঠিত নগরীই কাঁকসা নামে খ্যাত। অনেকের মতে এই বংশের শেষ বংশধরই হলেন কনকসেন যার সময়ে বাংলায় মুসলমান আক্রমণ সংঘটিত হয় এবং সেই মুসলমান আক্রমণেই তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যান।

সে যাই হোক এখানে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই বংশের প্রতিষ্ঠা পুরুষেরা বিভিন্ন জনের মতে বিভিন্ন ব্যক্তি হলেও তাদের সকলেই একটা বিষয়ে অভিন্নমত প্রকাশ করেছেন— সেটি হল প্রতিষ্ঠা পুরুষেরা সকলেই বহিরাগত। কিন্তু কেন? তার উত্তরে বলা যায়— বহিরাগত না হলে তাদের ঠিক ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করা যায় না! আর রাজা যখন তখন ক্ষত্রিয় না হলেও মানায় না! এ প্রসঙ্গে বিনয় বাবুও বলেছেন— "রাজ বংশ হলেই 'ক্ষত্রিয়' হতে হবে এবং উত্তর ভারত থেকে আসতে হবে, এরকম একটা বিজাতীয় ধারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন এদেশের রাজারা আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির আশায়"। [৯০] সেই প্রচেষ্টায় কুলজি গ্রন্থকারেরা রাজাদের অনুরোধে ঐ ধরণের কাহিনী বিন্যাস করেছেন তা সে ভাল্কীর ভল্লুপদ বংশই হোক, আর মল্লভূমে মল্লরাজ বংশই হোক কিংবা কাঁকসায় রাজ বংশই হোক। এ বিষয়ে পূর্বে ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য যে এরাও গোপভূমের গোপ রাজা।

এখন একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার তা হল এদের রাজা বলা হলেও এরা কি ধরণের রাজা? সে প্রসঙ্গে বলা যায় 'রাজা' বলতে এরা তেমন কিছু উল্লেখ্য বা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রাজা নয়। ইতিহাসে এদের কোন হদিসই নাই। আগের দিনে একটু আর্থিক স্বাচ্ছল্য সম্পন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি মাত্রেই রাজাবাবু নামে খ্যাত হত।

এরা সেধরণের না হলেও প্রথম দিকে দলপতি গোষ্ঠপতি কৌমপতি পরে স্থানীয় জমিদার বা তা থেকেও কিছু বড় ধরনের ভুস্বামী বা সামন্ত রাজায় পরিণত হয়েছিল। এই রাজ বংশ ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশের মতই দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ও তার বংশ ঃ— বেশ কয়েকজন ব্যক্তিই কাঁকসার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠা পুরুষদের কিছু নামের তালিকা প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন 'সদগোপ জাতির ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, 'বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়' গ্রন্থের প্রণেতা গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং 'সদগোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য' এর রচয়িতা সদগোপ কুলতিলক ডঃ অতুল সুর ইত্যাদি। এরা সকলে মিলে যে বংশ তালিকা প্রদান করেছেন তাতে দেখা যায় বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠা পুরুষ হলেন ভবানী পতি কাঁকসা। তার পুত্র বরেন্দ্র সিংহ কাঁকসার পুত্র জয় সিংহ কাঁকসার পুত্র সুরেন্দ্র সিংহ কাঁকসার পুত্র নীল কণ্ঠ কাঁকসার পুত্র চন্দ্রকান্ত কাঁকসার পুত্র বিনোদ সিংহ কাঁকসা ইত্যাদি। [৯১]

অন্যদিকে 'কঙ্কেসা বংশের ও কাঁকসা গ্রামের ইতিহাস' এর রচয়িতা রবীন্দ্র নাথ নাগ এই রাজবংশের যে বংশ তালিকা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাতে দেখা যাচ্ছে বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন—

কঙ্কসেন রাও
|
কনক সেন
|
প্রতাপাদিত্য। [৯২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই উভয় তালিকাই বিভিন্ন কুলজি গ্রন্থ ও লোকশ্রুতি নির্ভর। ফলে তা ইতিহাস নির্ভর নয়। তবুও ওরই মধ্যে ২য় তালিকার উল্লেখিত কনকসেনের নাম বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অঞ্চলের প্রাচীন প্রাচীনাদের অনেকের মধ্যেই শোনা যায়। কিন্তু প্রথম তালিকায় উল্লেখিত ব্যক্তিদের নাম তেমন শোনা যায় না।

অন্যদিকে কঙ্কসেন রাও এর পুত্র কনকসেন ও তার পুত্র প্রতাপাদিত্যদের নাম শোনা যায়। কনকসেনের পুত্র প্রতাপাদিত্যের সঙ্গেই অমরার গড়ের প্রখ্যাত গোপ রাজা মহেন্দ্রর কনিষ্ঠা কন্যা কালিন্দী দেবীর বিবাহ হয়েছিল। তাই বলা যায় অমরার গড়ের রাজা মহেন্দ্রর সময়েই এখানেও আর এক গোপ রাজবংশ সমান্তরাল গতিতে রাজত্ব চালিয়েছিল।

ইতিহাস গন্ধী আলোচনায় জানা যায় খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সৈয়দ বোখারি কাঁকসা জয় করেন-বর্ধমান পরিচিতি গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় অনুকূল চন্দ্র সেন ও নারায়ন চৌধুরী সেই মতই ব্যক্ত করেছেন। একই মত পোষন করে ডঃ অতুল সুরও বলেছেন— "কঙ্কেশ্বর রাজ্য সৈয়দ বোখারি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল।" এই আক্রমণ

চতুর্দশ শতকে সংঘটিত হওয়ার সময় তখন এই রাজ্যের রাজা ছিলেন কনকসেন, মতান্তরে তস্যপুত্র প্রতাপাদিত্য। সম্ভবত এই প্রতাপাদিত্যই শেষ রাজা। কারণ তিনি তার দুই স্ত্রী মহেন্দ্র কন্যা কালিন্দী ও উৎগড়ের রাজকন্যা যোগমায়ার গর্ভজাত মোট সাত পুত্র যথা— রণসিংহ বায়, জ্ঞানসিংহ, খাওয়ান সিংহ, অমরসিংহ, ভবানীপতি রায়, পৃথ্বীধর রায ও শত্রুভানকুমার রায় সহ রাজচ্যুত ও বিতাড়িত হয়ে কাঁকসার ৩।৪ মাইল উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত উৎগড় বা উদয়গড় নামক গড়ে আত্মগোপন করে থাকেন। যা বর্তমানে সাতকাটির জঙ্গল নামে পরিচিত। এই জঙ্গলের মধ্যে এখনও ঐ গড়ের ভগ্নাবস্থা দৃষ্ট হয়। [৯৩]

কাঁকসা গ্রামে সৈয়দ বোখারির বংশধর বলে পরিচিত কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয় মুসলমান বাস করছেন। তাদের মতে সৈয়দ বোখারি ছিলেন বখতিয়ার খিলজির বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ। গ্রামের মাঝে পুরাতন মসজিদ পাড়ায় বৃক্ষপল্লবের মাঝে সৈয়দ বোখারির সমাধি এখনও বর্তমান দেখা যায়। মুসলমান আক্রমণে এই রাজবংশ ধ্বংস হলেও খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকে শুরু করে চতুর্দশ পর্যন্ত এই বংশ প্রায় ৫০০ বছর গোপভূমে রাজত্ব করেছিল।

বংশের উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব ও বঙ্গে এই বংশের বিস্তার ঃ— বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ছিলেন কঙ্কসেন রাও। তার প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশের পরবর্তী সন্তানেরা রায় উপাধি গ্রহণ করেন। শেষের দিকে এই বংশে খ্যাতিমান পুরুষদের মধ্যে দুই জন বিশেষ উল্লেখ্য ছিলেন। তার মধ্যে একজন হলেন ভুবনেশ্বর রায়। যিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের অধীনে জমিদার ছিলেন। এবং নিধিরাম রায় বাংলা, সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বীরপুরুষ ছিলেন। [৯৪]

১৫৭৬ খ্রীঃ মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক রাজমহলের যুদ্ধে বঙ্গেশ্বর দায়ুদ খাঁ নিহত হওয়ায় সমগ্র বঙ্গ মুঘল অধিকার ভুক্ত হয়। কিন্তু তা হলেও তখনও বাংলার বার ভুঁইয়ারা আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করে বেশ কয়েক বছর ধরে বঙ্গে অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকলে, বঙ্গে শান্তি বিধানের উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবর মানসিংহকে সুবেদার পদে নিযুক্ত করে বঙ্গে পাঠান। সেই সময় নিধিরাম রায়ের বীরত্বের সম্যক পরিচয় পেয়ে মানসিংহ ষোড়শ শতকের শেষের দিকে তাকে সৈন্যাধক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। পরে পরে এই নিধিরামের কর্ম্মদক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে স্বয়ং বাদশা তাঁকে সম্মান সূচক 'চতুর্ঘরীন' > চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকেই এই পরিবার নিজেদের পদবী হিসাবে রায় চৌধুরী অনেকক্ষেত্রে শুধু 'চৌধুরী' ও ব্যবহার করতে থাকে। পরবর্তী কালে ঐ বংশেরই মোক্ষদা প্রসাদ রায় চৌধুরী 'সদগোপ কুলীন সংহিতা' গ্রন্থের রচনা করেন। [৯৫]

কাঁকসার রাজ বংশ দীর্ঘদিন ধরে এখানে রাজত্ব করলেও তাদের মধ্যে উল্লেখ্য

রাজ পুরুষ বলতে তিন জনই স্মরণীয়। তাদের মধ্যে প্রথম জন হলেন প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ রাজা কঙ্কসেন। ২য় জন তার পুত্র কনকসেন এবং তৃতীয় জন ছিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য। শৌর্যে-বীর্যে এই তিনজনই ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তবে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকেই বাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেই এই রাজ্য মুসলমান অধিকারে যায়। ঐ সময়েই সৈযদ বুখারি কাঁকসা আগমণ করেন এবং কাঁকসার সদগোপ রাজাদের রাজত্বের অবসান ঘটান। (৯৬)

কাঁকসার রাজ বংশ গোপভূমে দীর্ঘদিন রাজত্ব করলেও পরে পরে তাদের বংশ ধবেরা এই বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন— "প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রণসিংহ রায়ের এক বংশধব রামেশ্বর রায় হুগলী জেলার অন্তর্গত নন্দপুর, চক্রপুর, রাধাকৃষ্ণপুব প্রভৃতি কতকগুলি গ্রামে জমিদার হন।" (৯৭) পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রতাপাদিত্যের অন্য পুত্ররা উৎগড় বা উদয় গড়ে বসতি করেছে। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র শত্রুভান কুমার নিকটবর্তী বিলাসপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি গড়েছে। অন্যান্য পুত্রগণ কাঁকসা ও উৎগড় ত্যাগ করে বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যেমন— বর্ধমানেব অন্যত্র, বীরভূম, হুগলী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনা জেলায় বসতি গড়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র রণসিংহ রায়ের বংশধর রামেশ্বর রায় হুগলী জেলার নন্দনপুর, রাধাকৃষ্ণপুর, চক্রপুর, কোটারপুর প্রভৃতি গ্রামে জমিদার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও এই রাজ বংশের পদবী মুখ্যত রায় ও রায় চৌধুরী হলেও এরা বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি গড়ে নিজেরা কোথাও রায়, রায় চৌধুরী, চৌধুরী, কুমার বা কোনার· এবং সিংহ ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেছে।

কাঁকসার পুরাকীর্তি ঃ— কাঁকসার রাজাদের আর অস্তিত্ব নেই ঠিকই তবে তাদের কীর্তি কাহিনী এখনও মুছে যায় নি। তাই কাঁকসা অঞ্চলে সেই প্রাচীন রাজাদের সৃষ্ট অনেক পুরাকীর্তি এখনও যত্রতত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। পরিশেষে সে প্রসঙ্গে কিছু বলে এই পর্বের শেষ করতে চাই। প্রথমেই আসা যাক কঙ্কেশ্বর শিবের কথায় এটি এই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ রাজা কঙ্ক সেনের প্রতিষ্ঠিত বলেই জনশ্রুতি এবং এই শিবের নামেই গ্রাম নাম কাঁকসা হয়েছে।

কাঁকসা গ্রামে এই শিবলিঙ্গটি স্থানীয় বেলে পাথরে তৈরী অমসৃণ প্রস্তর খণ্ড বিশেষ। মনে হয় এর প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে ঐতিহাসিক পর্বের ও আগের ঘটনা, বীর স্তম্ভের প্রভাব। (৯৮) যা প্রাচীন কালের মেনহিরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সংস্কৃতি গবেষক প্রয়াত বিনয় ঘোষ বলেছেন— মেনহির হল অচ্ছেদিত (Undressed) রুক্ষ স্বাভাবিক সরল রেখার শিলাস্তম্ভ বা 'মেনহির' ক্রমে ক্রমে ছেদিত মার্জিত মেনহিরে পরিবর্তিত হয়ে শিবলিঙ্গের রূপধারন করেছে এবং শৈব সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আদিম সমাজেও 'শিব' বলে পূজিত হচ্ছে।... বাংলার শিবের

উৎপত্তির আভাষ এর থেকেই পাওয়া যায়। [৯৯] এখানকার কঙ্কেশ্বর শিবলিঙ্গটিও প্রাচীন বীরস্তম্ভ অন্যথায় মেনহিরের প্রতিরূপ বলেই মনে হয়। সেদিক থেকে এটি খুবই প্রাচীন কীর্তি তাতে সন্দেহ নাই। তাছাড়া এই গ্রামের বিভিন্ন স্থান বিশেষ করে জীবিত কুণ্ড বা শিবগড়ে থেকে বহু প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল ২টি ব্রোঞ্জ মূর্তি— যা বর্তমানে দেবপদ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে রয়েছে। তার একটি লোকেশ্বর বুদ্ধ মূর্তি, অন্যটি যম্ভল মূর্তি। এই মূর্তিগুলির বয়স কাল বিবেচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতক। এছাড়াও গ্রামের বহু ক্ষেত্রে বিশেষ করে জীবিত কুণ্ড বা শিব গড়ে থেকে বহু প্রস্তর মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখ্য কিছু হল সুশীল বসু মহাশয়ের বাড়ীতে থাকা ২টি ভগ্ন বিষ্ণু মূর্তি এবং বিজন চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে থাকা ছাই রংয়ের বেলে পাথরের তৈরী বিষ্ণু মূর্তি। মূর্তিগুলি ওরা গ্রামের থেকেই মাটি তোলার কালে পেয়েছিলেন। এ গুলিরও সময় কাল নির্ণীত হয়েছে পাল যুগের মধ্যবর্তী কাল, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতকে। কাঁকসার গোপ রাজাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত ঐ সকল দেববিগ্রহ সমূহের মূর্তিগুলির প্রাপ্তিতে এটাই ধরে নেওয়া যায় যে, অমরারগড়, ভালকী, কাঁকসার গোপ বংশের ঐতিহ্য একাদশ শতকের পূর্ববর্তী বলেই মনে হয়। [১০০]

।। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও পত্র পত্রিকা ।।

১) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (অখণ্ড)— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২০৪-২০৮
২) বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য়)— যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১
৩) গৌড়ের ইতিহাস— সম্পাদনা মলয় শংকর ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-২২
৪) কর্ণসুবর্ণ মহানগরী— সুধীর রঞ্জন দাস।.... পৃঃ-১১১
৫) বাঙালীর ইতিহাস— নীহার রঞ্জন রায়।.... পৃঃ-১১৯
৬) বাংলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি— ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-১৮
৭) গৌড়ের ইতিহাস— রজনী কান্ত চক্রবর্তী।.... পৃঃ-২৮
৮) বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)— নীহার রঞ্জন রায়।.... পৃঃ-১১৯
৯) বাংলা দেশের ইতিহাস— ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।.... পৃঃ-১৫
১০) বাংলার লোক সংস্কৃতি— আশুতোষ ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-২
১১) গৌড়ের ইতিহাস— রজনীকান্ত চক্রবর্তী।.... পৃঃ-২৯
১২) বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)— নীহার রঞ্জন রায়।.... পৃঃ-৩৫
১৩) ঐ ....পৃঃ-১০৯
১৪) পালপর্ব যুগের বংশানুচরিত— ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার।.... পৃঃ-৫৬
১৫) *Epigraphia Indica*— Vol-XXII. Page-155
১৬) বাংলা দেশের ইতিহাস (১ম)— ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।.... পৃঃ-৩২

১৭) বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)— নীহার রঞ্জন রায়।.... পৃঃ-৩৬৫
১৮) দ্রষ্টব্য- বাংলা স্থান নাম— ডঃ সুকুমার সেন।.... পৃঃ-৮৮
১৯) ঐ বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্তি— (২য়) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-৪৬
২০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস— নগেন্দ্র নাথ বসু।.. . পৃঃ-১৪৭
২১) পশ্চিমবঙ্গেব সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২২১
২২) ঐ ... পৃঃ-২১৭
২৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা— ১৩২০, ২৪শ বর্ষ,.... পৃঃ-১৭২-৭৭
২৪) বাংলার ইতিহাস (১ম)— রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২৬৮
২৫) পাল সেন যুগের বংশানুচরিত— ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার।.... পৃঃ-৮৭
২৬) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।. .. পৃঃ-২২১
২৭) দুর্গাপুবের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৫৩
২৮) ঐ ... . পৃঃ-৮৫
২৯) বাঙালীব ইতিহাস— নীহার রঞ্জন রায়।.... পৃঃ-৩৯৩
৩০) Indian Antiquary— Vol. IV .. Page-366
৩১) History of Bengal— Dr. R.C. Majumdar. Vol. I Page-275
৩২) বঙ্গেব জাতীয় ইতিহাস (রাজণ্যকাণ্ড)— নগেন্দ্র নাথ বসু।.... পৃঃ-২৪৯-৫০
৩৩) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৫২
৩৪) সাহিত্য পত্রিকা— ১৩২০ সাল, বৈশাখ সংখ্যা।.... পৃঃ-৩৯
৩৫) ধর্মমঙ্গল— রূপরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-১৯
৩৬) ঐ .... পৃঃ-১৯
৩৭) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য়)— যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-৪৭
৩৮) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য়)— যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-৪৬
৩৯) ধর্মমঙ্গল— রূপরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-৩০
৪০) ঐ .... পৃঃ-২৭৮
৪১) শ্রীধর্মমঙ্গল— ঘনরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-১৭
৪২) ঐ .... পৃঃ-১৮
৪৩) ধর্মমঙ্গল— ময়ূরভট্ট।.... পৃঃ-৭৪
৪৪) প্রচলিত ছড়া, সংকলক— হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বীরভূম বিবরণ ২য়).... পৃঃ-২৩০
৪৫) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য়)— যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-৪৭
৪৬) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (অখণ্ড)— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২১৯
৪৭) বর্ধিষ্ণু বর্ধমান— ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য।.... পৃঃ- ২৮
ও
৪৮) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৫২
৪৮) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২২২
৪৯) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৫১

৫০) শ্রীধর্ম মঙ্গল— ঘনরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-১৬
৫১) ধর্ম মঙ্গল— রূপরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-২৩
৫২) শ্রীধর্মমঙ্গল— ঘনরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-২২৭
৫৩) লোকগীতি-সংগ্রাহক— হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বীরভূম বিবরণ ২য়)।.... পৃঃ-২৪৫
৫৪) বর্তমান পত্রিকা (বিশেষ ক্রোড়পত্র)— ১৯শে আগষ্ট, ১৯৯৮
৫৫) বীরভূমবিবরণ (২য়)— হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। মহিমারঞ্জন সম্পাদিত।..পৃঃ-২৩০-৩৩
৫৬) বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম)— রাখাল দাসবন্দ্যোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২২৮
৫৭) ঐ .... পৃঃ২৩৩
৫৮) রামচরিত কাব্য— সন্ধ্যাকর নন্দী।.... পৃঃ-২৮
৫৯) পালসেন যুগের বংশানুচরিত— ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার।.... পৃঃ-৮১-৮৯
৬০) বীরভূম বিবরণ (২য় খণ্ড)— হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২৩৪
৬১) ধর্মমঙ্গল— রূপরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-৪৬
৬২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩০ খণ্ড।.... পৃঃ-৭৭
৬৩) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২২২
৬৪) J.A.S.B. 1936, p-24.দ্রষ্টব্য-বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য়)— যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-৪৫
৬৫) Contribution to Geography and History of Bengal— H. B. Lock mann. Page-16
৬৬) শিবাখ্যাকিঙ্কর কাব্য— দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৪১২
৬৭) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টাপাধ্যায়।.... পৃঃ-৫১
৬৮) পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২০৫
৬৯) সদগোপজাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য— ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-১২
৭০) বাংলার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস— ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-৭১৩
৭১) বর্ধমান পরিচিতি— অনুকূল চন্দ্র সেন ও নারায়ন চৌধুরী।.... পৃঃ-৩২
৭২) বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)— রমেশ চন্দ্র মজুমদার।.... পৃঃ-৯৬
৭৩) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৭৪
৭৪) ঐ .... পৃঃ-৭৬
৭৫) তথ্য দাতা— অনিল রায়। অমরার গড়, বর্ধমান।
৭৬) অমরার গড়েদেবী শিবাখ্যা ও সদগোপ রাজ— গোস্বামী দাস রায়। বঙ্গীয় সদ্গোপ সভা— স্মারক পুস্তিকা, ১৯৯২
৭৭) বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়— ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-৫৩
৭৮) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২০৬
৭৯) বর্তমান পত্রিকা— ২৬।১০।১৯৯৭
৮০) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৭৪
৮১) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২০৬

৮২) সদগোপ জাতির ইতিহাস— (১ম খণ্ড) জ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার।.... পৃঃ-৩৪,৫৪
৮৩) সদগোপ জাতির ইতিহাস— (১ম খণ্ড) জ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার।... পৃঃ-৩৪
৮৪) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্রাপাধ্যায়।.... পৃঃ-৭৬
৮৫) শিবাখ্যা কিঙ্কর কাব্য— দেবেন্দ্র নাথ চটাটাপাধ্যায়।.... পৃঃ-১৭
৮৬) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-২০০
৮৭) পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি (অখণ্ড) বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২০৪
৮৮) কঙ্কেসা বংশের ও কাঁকসা গ্রামের ইতিহাস— রবীন্দ্র কুমার নাগ। কঙ্কেশ্বর বাণী-পত্রিকা, দীপাবলী সংখ্যা।
৮৯) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৮৬
৯০) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২০৫
৯১) দ্রষ্টব্য-দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৮৪
৯২) ঐ .... পৃঃ-৮৪
৯৩) কঙ্কেশ্বর মহাদেব ও কাঁকসার সদ্গোপরাজ— গোস্বামী দাস রায় বঙ্গীয় সদগোপ সভা স্মারক পুস্তিকা-১৯১১
৯৪) ঐ
৯৫) ঐ
৯৬) কাঁকসা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পত্রিকা। ১৯৯২-৯৪.... পৃঃ-কাঁকসা-৬
৯৭) বঙ্গীয় সদ্গোপ সভা, স্মারক পুস্তিকায় গোস্বামী দাস রায়ের লেখা হতে।
৯৮) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৮২
৯৯) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (অখণ্ড) বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-১১২
১০০) দুর্গাপুরের ইতিহাস— প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৭৫

।। গোপভূমের জাতি বিন্যাস ।।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই গোপভূমের অবস্থান ও অধিবসতি নিয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, এই এলাকা অতি প্রাচীন কাল থেকেই রাঢ়ে দুই প্রাচীন নদী অজয়-দামোদরের বেষ্টনীর মধ্যেই বর্তমান ছিল এবং তাতে অধিবসতিও ছিল। তবে পূর্বে তার নাম যাই থাক না কেন এবং জনগোষ্ঠীরাও আদিম, প্রটোঅস্ট্রো লয়েড বা প্রাক-আর্য যে সম্প্রদায় ভুক্তই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। মোট কথা প্রাচীনকাল থেকেই এই এলাকার অবস্থান ও অধিবসতি দুই ছিল।

বহু বহু যুগ অতিক্রান্তের পর রুজি রোজগারের আশায় এক সময় এখানে অরণ্যচারী পশুপালকদের আবির্ভাব ঘটে। পশুচারকদের পালিত পশুর মধ্যে গরুর সংখ্যাই বেশি থাকায় তারা এখানে গোপ নামে খ্যাত হয় এবং তাদের অধীনে এই এলাকা দীর্ঘদিন পরিপালিত হওয়ায় এই এলাকাও 'গোপভূম' নামে পরিচিতি পায়।

তখনকার গোপভূমে অন্য কোন সম্প্রদায়ের তেমন অস্তিত্বই ছিল না কারণ ঐ এলাকা বন্য শ্বাপদ সঙ্কুল, গভীর গহন অরণ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল তাই সেখানে বাস করা ছিল খুবই কষ্ট সাধ্য। অত্যধিক সাহসী দুর্ধর্ষ এবং শক্তি সামর্থ না থাকলে সেখানে—সেই জঙ্গল মহলে বসবাসের প্রশ্নই ওঠে না। সেদিক থেকে গোপ সম্প্রদায় চিরকালই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হওয়ায় এবং তাদের পোষ্য জীবজন্তুদের চারণের জন্য অরণ্য ও নদী চড়া তাদের কাছে খুবই ঈপ্সিত স্থান ছিল। তাই সেই অরণ্যাঞ্চলে গোপরাই বসতি গড়ে তুলেছিল।

তারও পূর্বে ঐ এলাকায় আদিম জনগোষ্ঠীর বসতি থাকলেও গোপ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের সংঘাত শুরু হয় এবং আদিম গোষ্ঠীর অনেকেই সেই স্থান ত্যাগ করে উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর অরণ্যাঞ্চলের দিকে চলে যায় আর যারা রয়ে যায় তাদের সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মেলামেশায় কৃষ্টির বিনিময় হতে থাকে। শুরুতে পালিত পশুর দুগ্ধ, মাংস তাদের আহার্য রূপে গৃহীত হত। পরে সভ্যতার ক্ষেত্রে এক বিশেষ উত্তরণ শুরু হয়। সেটি হল কৃষির উদ্ভাবন। কৃষির উদ্ভাবনের পর ঐ সম্প্রদায় পশুপালন এবং তাদের পালিত পশুকে কাজে লাগিয়ে চাষ আবাদ শুরু করে। এইভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকার পর গোপ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন পর্ব শুরু হয়।

যারা চাষ আবাদকেই মুখ্য জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করল তারা নিজেদের 'সদ্‌গোপ' হিসাবে পরিচয় দিল, তারা গোপালনের দিকে গেলই না। আর যারা গো পালন সহ চাষ করতে শুরু করল তারা 'গোপ' নামে অভিহিত হল। এইভাবেই দীর্ঘদিন যাবৎ গোপভূমে এই দুই সম্প্রদায়ের অধিবসতি থাকার পরে বন্য পরিবেশ ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকায় এবং কৃষির পরিবেশ প্রশস্ত হওয়ায় তখন অনেক সম্প্রদায়ই আস্তে আস্তে রুজি রোজগারের আশায় গোপভূমে ভিড় জমাতে থাকে। আর দেশে তখন বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়ে গেছে। ফলে বিভিন্ন কৌলবৃত্তিধারীর অনেকেই গোপভূমে বসতি গড়তে আগ্রহী হয়।

তারই বহিঃপ্রকাশ মধ্যযুগীয় বহু মঙ্গলকাব্যেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। একাদশ শতাব্দীর সময়কালে রাঢ় বঙ্গের গোপভূমে অজয় নদীর দক্ষিণে জঙ্গল মহলে এক শক্তিশালী গোপরাজা ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষের আবির্ভাব হয়। তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে রাজ্যপাট নির্মাণ করেন এবং নিজ রাজ্যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বহু প্রজাও বসিয়েছিলেন। ফলে গোপভূমে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সমাবেশ সুদৃঢ় হয়েছিল। তাই 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ যথার্থই বলেছেন— "একাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক কাহিনী কয়েক'শ বছর মুখে মুখে লোকগাথা ও লোককথায় পল্লবিত হয়ে এসে ধর্মমঙ্গল কাব্যে স্থান পেয়েছে।" তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ইছাই ঘোষের রাজ্যপাট নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

চৌদিকে পাহাড়, বেড়ি বাড়ি গড়,
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর, বসাল নগর,
রাজার বসত বাটী।। পৃঃ - ১৭

রাজা ইছাই ঘোষ তার রাজ্যে কিভাবে বিভিন্ন বৃত্তিধারী প্রজাদের বসিয়ে ছিলেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐ কবিই বলেছেন—

হয়ে হরষিত, বসিল নাপিত,
তাপিত আছিল যত।
পসারি তামুলী, তাঁতি তেলি মালী,
কুতুহলে বসে কত।।
ধার্ম্মিক ধনিক, পঞ্চসে বণিক,
যতেক কুর্ম্মি-কুমার।
উগ্র ধর্মধারী, বসিল আগুরি,
শাঁকারি করমকার।।
মদক বারুই, আদরে এ দুই

বসিল সজ্জাতি যত।
এই সবাকার নাহি ব্যবহার
হেন হীন জাতি কত।। পৃঃ - ১৭

এইভাবে বিভিন্ন কাব্যের প্রেক্ষিতেও বোঝা যায় যে, একদা অরণ্য সঙ্কুল গহন-গভীর জঙ্গলাকীর্ণ গোপভূমেও ধীরে ধীরে বিভিন্ন বৃত্তির জাতিগোষ্ঠীর সমাবেশ হয়।

আলোচ্য অধ্যায়ে বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, রীতিনীতি ও কৃষ্টির কথা বলার চেষ্টা হয়েছে। গোপভূমে তাদের আবির্ভাব ও অবস্থানের বিষয়ে আলোচনা করেছি। তবে সকল সম্প্রদায়ের কথা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় করতে পারি নাই। ক্ষেত্র ও সুযোগ এলে চেষ্টা করা যাবে। এখন গোপভূমে অবস্থিত বিশেষ কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর কথাই বলা হল।

গোপ সম্প্রদায়

প্রাগৈতিহাসিক কালে বন্য মানুষের অনেকেই ছিল পশুপালক। শুরুতে তারা যাযাবর জীবনযাপন করত। পরে বন্য জীবজন্তুকে পোষ মানিয়ে তাদের গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করল। এই কাজ করতে সেই প্রাচীন মানুষদের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। তবুও তাদের মধ্যে বেশ কিছু লোক নদী তীরবর্তী এলাকায় চারণক্ষেত্র দেখে সেই সব গৃহপালিত পশুদের নিয়ে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলল। সেই পর্ব সভ্যতার এক বিশেষ উত্তরণ পর্ব এবং তা পার হয়েও কিছু লোক গবাদি পশুপালনে আত্মনিয়োগ করল। তার জন্যই সেইসব লোকেরা গোপালক > গোপ নামে অভিহিত হল। এইভাবেই একদিন গোপালক বা গোপ জাতির আবির্ভাব ঘটল। তাই প্রখ্যাত সংস্কৃতি গবেষক শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ বলেছেন— প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে গোপজাতি প্রথম পশুপালন করে স্থায়ী উন্নত সভ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছিল।(১)

সেই দৃষ্টিকোণে বিচার করলে এই জাতি খুবই প্রাচীন এবং কৃষ্টিসম্পন্ন জাতিও বটে। তার কারণ আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বিশেষ করে বেদের বহু ক্ষেত্রে গোপজাতি ও তাদের কার্যকারণের কথা (ঋগ্বেদের ৮ম মন্ডলের ৪১ সুক্তে ও দশম মন্ডলের ২১, ২৩, ৮৮ ইত্যাদি সুক্তে) উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরা বৈদিক জাতি এবং আর্যদের থেকেও প্রাচীন। আর্যদের সঙ্গে এদের সাযুজ্যও বর্তমান। কারণ আর্যরাও প্রধানত গোপালকই ছিলেন, গরু তাদের পবিত্র সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। তাই বলা যায় এই জাতি কোন নব সৃষ্ট সংকর জাতি নয় বরং বর্ণভেদ সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই এদের অবস্থান প্রমাণিত হওয়ায় এরা যে মৌলিক ও প্রাচীন জাতি তাতে সন্দেহ নাই।

এই জাতি শৌর্যবীর্যেও প্রথম থেকেই উন্নত। সে সত্যও আজ বহুভাবেই প্রমাণিত।

এই সম্প্রদায় যদু বংশ জাত হওয়ায় এরা ক্ষত্রিয় এবং যাদব ক্ষত্রিয় হিসাবেই সমধিক পরিচিত। বিশ্বপূজ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এদের বংশধর কারণ তাঁরাও যদুবংশ সঞ্জাত। এই গোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকেই মধ্যভারতের গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অঞ্চলে গোপালনে ব্রতী হলেও শৌর্য-বীর্যের জন্য তারা রাজন্যরূপে দেশ শাসনও করেছিলেন। তাই এরা রাজার জাতিও বটে। ঐতিহাসিক কর্ণেল টডও এদের বীরত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন— The Ahir or Yadava soldıers are great heroes.

পরে পরে দেশ-বিদেশ থেকে আসা অনেক জাতিগোষ্ঠী যেমন— শক, ক্ষত্রপ, পহ্লব ইত্যাদি পশুপালক গোষ্ঠীও এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। পরে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেলে তাদের অনেকেই গঙ্গা-যমুনা তীরবর্তী অঞ্চল ত্যাগ করে দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরই এক শাখা দ্বারবঙ্গের ভিতর দিয়ে বঙ্গের অজয়-দামোদর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করে অধিবসতি গড়ে তোলে এবং সেই গোপ সম্প্রদায়ে অধিবসতি এলাকা হিসাবে গড়ে ওঠায় এই এলাকা সেই প্রাচীনকাল থেকেই 'গোপভূম' নামে পরিচিত হয়।

তাই রাঢ়বঙ্গের অজয়-দামোদর নদের মধ্যবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলই গোপভূম। সেখানে অতি প্রাচীনকাল থেকেই গোপেদের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। তার কিছু কারণও যে নাই তা নয়। যেমন— এই দুই নদীবেষ্টিত অঞ্চলে গোচারণের আধিক্য বর্তমান। দ্বিতীয়ত— পশুপালনই যখন তাদের জীবিকা, তখন এই চারণক্ষেত্র তাদের কাছে খুবই কাম্য। তৃতীয়ত— এই অরণ্যভূমে হিংস্র বন্য শ্বাপদদের সঙ্গে লড়াই করে বসবাস করার সাহসিকতা ইত্যাদি কারণগুলির জন্যই অতি প্রাচীনকাল থেকেই অরণ্যাবৃত গোপভূমেই গোপেদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে অরণ্যের গভীরতা ও নিবিড়তা হ্রাস পাওয়ায় ধীরে ধীরে অন্যান্য বহু জাতিগোষ্ঠী এখানে বসবাস শুরু করে। তাদের বিষয়ে বলার আগে গোপভূমের নামকরণ যাদের নিয়ে সেই গোপজাতির কথাই প্রথমে বলা যাক।

গোপজাতি মূলত গোপালক। আর "গোপালন করেন যারা, তারাই গোপ বলে পরিচিত।" (২) পরবর্তীকালে তারা গোপালনের সঙ্গে অন্যান্য পশুও পালন করতে থাকলেও পরে আর্যরাই গরুর বিশেষ মর্যাদা দেওয়ায় এঁরা কেবল গোপালক বলে পরিচিত হয়েছেন। (৩) তাছাড়া সভ্য সমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি হয়েছিল গোপালন বা পশুপালনকে কেন্দ্র করেই। কারণ গরু থেকেই দুধ ও পশু থেকে মাংস এইভাবেই যে খাদ্য উৎপাদন তা বড় কম উদ্ভাবন নয়।

সভ্যতার সেই বিকাশ লগ্ন থেকে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর পরবর্তীকালে মানুষ সভ্যতার আর এক ধাপ অগ্রবর্তী হয়ে আবিষ্কার করল কৃষি। সেই কৃষি উদ্ভাবনের পর এই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন পশুপালন সহ চাষ আবাদও করতে থাকে।

এইভাবে বহু যুগ অতিবাহিত হবার পর, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন এসে যায়। তাতে এই গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু লোক নিজেদের কেবল চাষ আবাদে ব্যাপৃত রাখল ফলে তারা গোপের আগে 'সদ' শব্দ যোগ করে নিজেদের সদ্‌গোপ নামে অভিহিত করল— "তাই কৃষিকর্মী যাঁরা তাঁরা সদগোপ এবং পশুপালকরা গোপ বলে পরিচিত।"(৪)

এখন গোপ জাতি সম্পর্কে বলতে এসে বলা যায় যে এই সম্প্রদায় শুরুতে কেবল পশুপালকই ছিল পরে কৃষিকেও তারা তাদের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করে। পূর্বে এই জাতি অরণ্যের মধ্যে বহু বিস্তৃত জায়গা অধিগ্রহণ করে কয়েকটি পরিবার মিলে গঠন করত গোপ-পল্লী আর সেই সঙ্গে তাদের পালিত পশু চারণের জন্য তৈরি করত চারণক্ষেত্র বা গোষ্ঠ— পরবর্তীকালে যাদের 'বাথান' বলা হত। এইভাবে অরণ্যের মধ্যে বেশ কয়েক মাইল অন্তর অন্তর গড়ে উঠত এক একটি গোপ-পল্লী। পরে পরে অন্যান্য জাতির মত এই গোপ জাতিও কয়েকটি আভ্যন্তরীণ থাক বা ভাগে বিভক্ত হয়। সেই বিভাগ বা থাকগুলির মধ্যে উল্লেখ্য থাক হল— আভীর বা আহির এবং পল্লব বা পহ্লব।

পন্ডিতদের মতে "এই জাতি পূর্ব ইরাণ অথবা মধ্য এশিয়া হতে বহুল সংখ্যায় শক ও উচিয় (কুষাণ) দের সহিত খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে অনেক বড় সংখ্যায় প্রবেশ করেন এবং ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্যভারতে সম্প্রসারিত হইয়াছিল।"(৫) অন্যদিকে বাঁকুড়া নিবাসী প্রখ্যাত গবেষক মানিকলাল সিংহের মতে এই জাতি চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের মনুষ্যগোষ্ঠীগুলির চাক (Man-hive) হইতে ইউচি ইত্যাদি জাতিদের দ্বারা তাড়িত হয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে। শক পহ্লব জাতির সঙ্গে রাঢ়ীয় পল্লব গোপদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আজও পল্লব গোপদের মধ্যে প্রচলিত বহু সংস্কার শক-পল্লব-ক্ষত্রপদের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে, তাই এই শকদের সমগোত্রীয় বা সম্পর্কিত পল্লব জাতির মানুষই রাঢ়ীয় পল্লব গোপদের পূর্বপুরুষ। (৬)

গোপ জাতি আভীর ও পল্লব দুটি আভ্যন্তরীণ ভাগে বিভক্ত হলেও মূলত এরা একই জাতি এবং জীবিকায় পশুপালক— তাই তৃণভূমি নির্ভরতাই এদের বিশেষত্ব। আর তৃণের জন্যই এবং শুরুতে যাযাবর জীবনও যাপন করেছিল। পরে আভীর গোপেরা সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, চম্বল, শোন বিধৌত উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্যভারতের মথুরা-বৃন্দাবন কেন্দ্রিক পলিবহুল (Alluvial-soil) তৃণভূমে বসতি গড়ে। এই আভীর বা আহিরদের সম্পর্কে বলা যায়— পশুপালক জাতিসমূহের মধ্যে উত্তর ভারতের আহির বা আভীররা সমধিক প্রসিদ্ধ। সুপ্রাচীনকালেই আভীরদের উপজাতি থেকে জাতি পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছিল। প্রাচীন সাহিত্য ও লেখমালায় আভীরদের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি ইতিহাসে আভীর রাজবংশেরও সন্ধান মেলে। বর্তমানে আভীর

বা আহির, আহার প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এরা তিন শাখায় বিভক্ত যেমন— গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের উত্তর-পশ্চিমে যদুবংশী, মধ্যাঞ্চলে নন্দবংশী এবং পূর্বাঞ্চলে আহির।[৭]

এখন এদের সম্পর্কে ইতিহাস কি বলে দেখা যাক। Dr. A. P. Karmaker, Professor of Indian History & Ancient Indian Culture, Ramnarayan College Bombay & Teacher Bombay University wrote in his paper Religion & Philosophy of the Epic Mahabharata (1937) "...... Confederancy of the Yadavas of Mathura." তাঁর মতে মথুরার যাদব জাতিগোষ্ঠীর বা কনফেডারেশনের এক জাতিগোষ্ঠী আভীর বা আহীর।

According to Mrs. Debala Mitra, Asst. Supdt. of Archaeology, Indian Museum, Calcutta 1937 (Vide cultural Heritage of India – p. 622-623). In the second century we find (AVIRAS) allaining high ranks even seizing political power, "...... Sourastra inscription of A. D. 181 (AVIRS) rose to royal rank in the Northern Maharashtra". Puran also recognise the rule of ten Abhir Princess covering a period of sixty seven years after Satbahans.

They (AVIRS) also contributed to the development of Indian music, all most all the musical works recognise the ragini (Tune) Abhiri or Ahiri.[৮]

একদা গুজরাট দেশের নীচ হইতে তাপ্তী অর্থাৎ যমুনা নদীর পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ও বিন্ধ্যাচলের সমস্ত শাখাতে আহীরগণ বাস করিত বলিয়া এই দেশকে আভীরিয়া দেশ বলিত।[৯] তাই বলা যায় আভীর গোপেরা ভারতে একদা বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল।

এতক্ষণ আভীরদের কথা বলা হল। এখন পল্লব গোপদের কথায় আসা যাক। শুরুতে রাঢ় বঙ্গে আভীরদের তেমন অনুপ্রবেশ না ঘটলেও রাঢ় বঙ্গে পল্লব গোপদেরই প্রাধান্য। তাই পরবর্তীকালে ধর্মমঙ্গলেও উল্লেখ করা হয়েছে— "গণ্যগোপ যত করিল বসত"— গোপ অবতংস কত রাজবংশ।[১০] এই গোপভূমেই প্রাচীনকাল থেকেই ব্যাপক পরিমাণে গোপ সম্প্রদায়ের অধিবসতি গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে পরবর্তীকালে অনেকেই স্থানীয় ভূস্বামী থেকে শুরু করে রাজা মহারাজা পর্যন্ত হয়েছিলেন। পরে পরে সে কাহিনীতে আসা যাবে। শুরুতে রাঢ়ের অভ্যন্তরে বিশেষ করে নদীবেষ্টিত গোপভূমের অরণ্যাঞ্চলে ছোট ছোট পল্লীতে বিভক্ত হয়ে এই পল্লব গোপদের পল্লীগুলি অবস্থিত ছিল।

সেখানে নদীর উভয় পার্শ্বের পতিত জমি বহু কাল ধরে গোচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। ফলে এক শ্রেণীর পেশাদার গোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সেগুলিকে ব্যবহার করত এবং প্রধানত নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই গোপ পল্লীগুলি গড়ে উঠেছিল।[১১] তাই এখনও এই জেলার পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চল গোপপ্রধান।

এই পল্লব গোপেরাই মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারত হতে রাঢ়ের উপকণ্ঠে ও রাঢ়ের অভ্যন্তরে বসবাস বিস্তার করে। এখানকার নিবিড় অরণ্যের অভ্যন্তরে একদা ছোট ছোট পল্লব গোপ পল্লীগুলি গড়ে উঠতে থাকে। গোপ পল্লী আকারে ছোট, লোক সংখ্যাও স্বল্প কিন্তু পশুপালনের জন্য বনভূমির অনেকখানি অঞ্চল তারা অধিকার করত। একটি গোপ পল্লী হতে অন্যগুলি বেশ দূরে দূরে অবস্থিত ছিল। (১২) তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীও ছিল বেশ সহজ সরল।

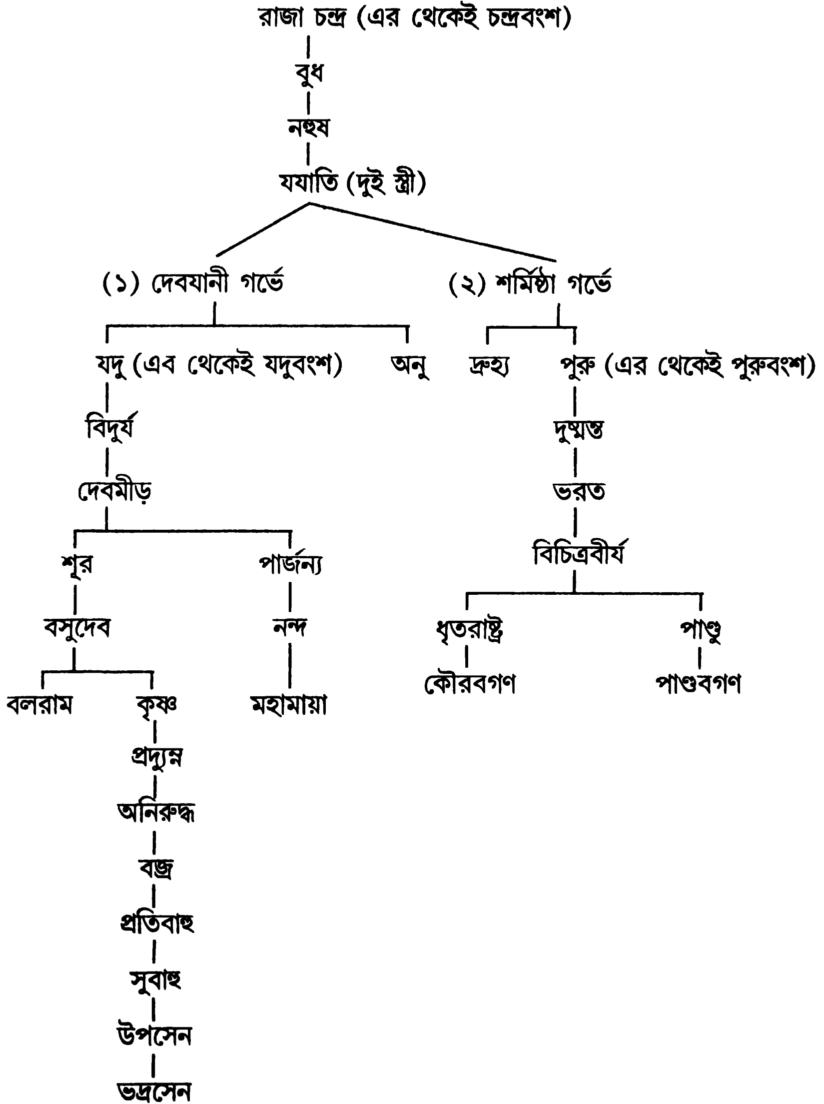
সংস্কৃতি গবেষক শ্রদ্ধেয় মানিকলাল সিংহের মতে তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল তখ-াকার দিনে অনেকটাই আর্য ঋষিদের মত কারণ আর্য ঋষিরাও বনে জঙ্গলে বসবাস করত এবং বন্য ফলমূল, শাক-সবজি আহরণ সহ গোপালনে রীতিমত অভ্যস্ত ছিল। তবে তাদের সঙ্গে গোপেদের জীবনযাত্রায় যা মৌলিক পার্থক্য ছিল তা হল— আর্যরা এক মহান আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে রত থাকতেন আর গোপেদের জীবন যাপন পদ্ধতি ছিল খুবই সরল ও সাধারণ। কিন্তু তারা সমাজসেবা ও দেশ গঠনের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। সাহসী ও ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী হওয়ায় সুদূঢ় অতীত থেকেই তারা ক্ষাত্রবীর্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ রক্ষা এবং রাজ্য শাসনও করে এসেছেন— সমগ্র ভারতের ঐতিহাসিক তথা পৌরাণিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আমাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যেমন— মনুসংহিতা, হরিবংশ, ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদিতে এদের রাজ্য শাসনের বহু উল্লেখ আছে। পুরুবংশীয় ও যদুবংশীয়দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। যদুর বংশধরদেরই যাদব বলা হয়। ভাগবত ও হরিবংশে উল্লিখিত হয়েছে যে চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুস-এর পুত্র যযাতি। যযাতির পুত্র যদু ও পুরু। যদুর পুত্র বিদুর্য এবং বিদুর্যের পুত্র দেবমীড়। দেবমীড়ের দুই পুত্র শূর ও পার্জন্য। শূরের পুত্র বসুদেব, পার্জন্যের পুত্র নন্দ গোপ। এরা সকলেই ক্ষত্রিয়। নন্দ ও ক্ষত্রিয় গোপালন হেতু মহান গোপ উপাধিতে ভূষিত। ঋষি বাণীতেও তাই বলা হয়েছে— "নন্দঃ ক্ষত্রিয়ঃ গোপালনাৎ গোপঃ"। (১৩) ফলে দেখা যাচ্ছে নন্দগোপ এবং বসুদেব পরস্পরের ভাই। পরের পৃষ্ঠায় এদের বংশতালিকা প্রদত্ত হল— যা লক্ষ্য করলে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার সুবিধা হবে। (এই বংশ তালিকায় কেবলমাত্র উল্লেখ্য ব্যক্তিদেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে।)

এই বংশতালিকায় দেখা যাচ্ছে যে— নন্দ গোপ বসুদেবের খুল্লতাত ভাই। (১৪) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকে বসুদেব নন্দকে ভাই বলেই উল্লেখ করেছেন। যেমন— বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম

দত্ত করং রাজ্ঞ যযৌতদব মোচনম।

অন্যদিকে 'হরিবংশ' গ্রন্থ যা মহাভারতের পরিশিষ্ট বলেই বিবেচিত, তাতেও



বসুদেবকে গোপ বলা হয়েছে এবং বহু স্থলে গোকুলবাসীগণকে 'যাদব' ও 'সাত্বত' বলা হয়েছে। আরও দেখা যায় যদুবংশের যদুর ভাই পুরুর বংশধর বিচিত্রবীর্য এবং এই বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। সেই পাণ্ডুর সঙ্গেই নন্দভ্রাতা বসুদেবের ভগ্নী কুন্তীর বিয়ে হয়েছিল— যার গর্ভে পাণ্ডবদের জন্ম। অন্যত্রও দেখা যায় যদুকুলোদ্ভব

আহুকের দুই পুত্র— দেবক ও উগ্রসেন। উগ্রসেনের আট পুত্রের মধ্যে উল্লেখ্য হল কংস। কংসভগিনী দেবকীর সঙ্গে শূরের পুত্র বসুদেবের বিয়ে হয়েছিল। তাই দেখা যায় নন্দ ঘোষের সঙ্গে উগ্রসেন সহ কৌরব ও পাণ্ডবদের সম্পর্ক ছিল। এখন এই সব পারস্পরিক আত্মিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় হিসাবে বসুদেব ইত্যাদি যদি যাদব এবং ক্ষত্রিয় হয় তবে নন্দ তার ভাই হয়ে তারও যাদব ক্ষত্রিয় না হওয়ার কোন কারণ নাই। অতএব গোপেরা নিজেদের যাদব ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিলে তা মোটেই অযৌক্তিক নয়। তাই গোপেরাও যাদব ক্ষত্রিয়।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, গোপ এবং যাদব উভয়ই একার্থবোধক। কেবল প্রভেদ যা আছে তা হল— 'গোপ' শব্দের দ্বারা মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রদেশে কেবল তা জাতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর 'যাদব' বলতে সমগ্র ভারতে সেই জাতির বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিচয় সূচিত হয়— যারা প্রকৃত অর্থেই শৌর্য বীর্যে পরিপূর্ণ, ক্ষাত্রধর্মে উদ্দীপ্ত মহারাজ যদুর বংশজাত যাদব ক্ষত্রিয়। আমরা যদিও জানি এক সময় বহু জাতিই নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় দেবার কষ্টকল্পিত প্রয়াস করেছেন— সেখানে যাদবদের ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃত স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাদের ক্ষত্রিয় বলতে দ্বিধা করার কোন কারণ নাই।

এখন প্রশ্ন হতে পারে প্রভাসতীর্থে স্বয়ং কৃষ্ণের উপস্থিতিতেই মুষল প্রসব ঘটনায় যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল— তাহলে আর যাদবরা আসছে কোথা হতে? এর উত্তরে সঙ্গতভাবেই একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, পরশুরাম তো একুশ বার ধরণীকে নিক্ষত্রিয় করেছিলেন তাঁহলে এখনও ক্ষত্রিয়রা রয়েছেন কি করে? তাই কোন তর্কে না গিয়েও বলা যায় ভীষণ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া একটা জাতির সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাই কিছু যাদব নিশ্চয়ই রয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া শাস্ত্রজ্ঞরা জানেন প্রভাসে স্বয়ং.কৃষ্ণই বংশ রক্ষার্থে আপন সারথি দারুককে ডেকে, পুত্র প্রদ্যুম্নের সন্তান অনিরুদ্ধ তনয় বজ্রকে পাঠিয়েছিলেন আপন রথে সেই মথুরায়। ফলে যদুবংশজাত কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের বংশধরেরা তো রয়েই গেল যাদব ক্ষত্রিয় রূপে।

গোপজাতির সঙ্গে শাস্ত্রীয় সম্পর্কের বিষয়ে বলা যায় বহু পৌরাণিক গ্রন্থ এমন কি ভাগবতেও দেখা যায় যে, মথুরার দুরাচারী রাজা কংসকে দমন করার জন্যই কংস কারায় বসুদেব-দেবকীর ৮ম সন্তান হিসাবে আবির্ভূত হলেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রমতে এই কৃষ্ণ চতুর্ভুজ হয়ে এসেছিলেন এবং তাঁকে রক্ষার জন্য বসুদেব যমুনা নদী পার হয়ে গোকুলে জ্ঞাতিভ্রাতা নন্দের গৃহে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, নন্দপত্নী যশোদাও যমজ সন্তান এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করে মহামায়ার প্রভাবে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। যশোদার পুত্র কিন্তু দ্বিভুজ ছিলেন।

বসুদেব তার পুত্রকে সেখানে দিয়ে কন্যা নিয়ে ফিরে গেলেন আর তখন চতুর্ভুজ কৃষ্ণ দ্বিভুজে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেন। ফলে রয়ে গেলেন দ্বিভুজ কৃষ্ণ।

তাই সংশয় থেকেই যাচ্ছে সেই কৃষ্ণ নন্দসূত না বসুদেবসূত? পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে তো পরিষ্কার করেই বলেছে যে কৃষ্ণ নন্দ গোপের প্রিয় আত্মজ বা ঔরসজাত সন্তান। সেখানে বলা হয়েছে— "অনাদিমাদিং সর্ব্বেষাম্ নন্দ গোপ প্রিয়াত্মজম।" এছাড়াও ভাগবতেও "নন্দাত্মজং শ্রীকৃষ্ণং" এর উল্লেখ আছে এবং বৈষ্ণব পদাবলীর বহু পদেই কৃষ্ণকে নন্দসূত বা নন্দাত্মজ বলে উল্লেখ করায় এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ভাগবতেই উল্লেখ রয়েছে গোপীরা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য যে কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন তাতে তাদের প্রার্থনাই ছিল— অন্য কোন কৃষ্ণ নয়, নন্দ গোপসূত কৃষ্ণকেই যেন তারা পতিরূপে পায়— কাত্যায়নিঃ মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।

নন্দ গোপ সুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে নমঃ।

(দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক)

শাস্ত্র অলোচনায় আরও দেখা যায় যে হিন্দুদের তিন প্রধান দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ছিলেন গোপবংশের জামাতা। প্রমাণ হিসাবে বলা যায় একদা ব্রহ্মা এক বিরাট যজ্ঞের অয়োজন করেছিলেন। যজ্ঞে পত্নী সহ দীক্ষা গ্রহণই বিধি, কিন্তু বার বার স্ত্রী সাবিত্রীকে ডেকেও গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকায় তাকে কাছে না পাওয়ায় ব্রহ্মা তার উপযুক্ত পত্নী খোঁজার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে আদেশ দিলেন। দেবরাজ ত্রিলোক অন্বেষণ করে মর্তের স্বরূপ গোপের সুলক্ষনা কন্যা গায়ত্রী দেবীকে নিয়ে গেলে ব্রহ্মা তাকেই বিয়ে করেন। তাই বেদমাতা গায়ত্রী গোপকন্যা। "স্বরূপ গোপস্য তনয়া"— পদ্মপুরাণ। ফলে ব্রহ্মা গোপ জামাতা।[১৫] অন্যদিকে গোলকপতির সহধর্ম্মিনী সুশীলা ও স্বধাদেবীও গোপকন্যা।[১৬] আর দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী মহামায়া— তিনি তো নন্দগোপের কন্যারূপেই আবির্ভূতা হয়েছিলেন শ্রী শ্রী চণ্ডীতে তাই বলা হয়েছে— "নন্দ গোপ গৃহে জাতা যশোদা গর্ভসম্ভবা"।[১৭] সে কাহিনী তো সকলের জ্ঞাত । ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গোলকপতির অঙ্গ হতেই গোপ ও গোপীর জন্ম এবং তারাই সেবার মাধ্যমে পরম পুরুষকে আনন্দ দিতে পেরেছিলেন বলেই তারা গোপ। কারণ "গোপায়তে যঃ সঃ গোপ" অর্থাৎ অন্যকে আনন্দ দেওয়াই যাদের ব্রত তারাই গোপ।[১৮] এইভাবে শাস্ত্র অলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, এই জাতির সঙ্গে বহু দেব দেবীর নিবিড় সম্পর্ক ছিল এবং এরা খুবই প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জাতি হিসাবে স্বীকৃত।

গোপ জাতির সঙ্গে শাস্ত্রীয় সম্পর্ক শীর্ষক আলোচনার পরিশেষে আর একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। কৃষ্ণ যদু বংশজাত যাদব ছিলেন এবং সেই যদুবংশীয়

যাদব কৃষ্ণ আজ জগৎ পূজ্য। অন্যদিকে দেখা যায় বিশ্বের ভক্তবৃন্দ যে পরম নিষ্ঠায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির পূজা করে থাকেন তাতে সেই রাধাও যে গোপ কন্যা ছিলেন সে বিষয়েও সংশয় নাই। কারণ গোকুলে আর একঘর ধনী ও সম্ভ্রান্ত গোপ রাজ পরিবার ছিল এবং তার প্রধান ছিল রাজা বৃষভানু। বৃষভানু নন্দের মতই গোপ বা গোয়ালা ছিলেন এবং সেই সঙ্গে রাজাও। তাই রাধাকে বলা হয় বৃষভানু রাজনন্দিনী। সেই বৃষভানু রাজনন্দিনীর বিয়েও হয়েছিল আয়ান ঘোষের সঙ্গে। তাই রাধাকে আয়ান ঘরনিও বলা হয়। সেই গোপকন্যা রাধাও আজ বিশ্বের বৈষ্ণব ভক্তদের দ্বারা পরম শ্রদ্ধায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুগলে পূজিত হচ্ছেন। কাজেই এটি গোপজাতির কাছে পরম গৌরবের বিষয় তাতে সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে গোপ-গোপীদের মাহাত্ম্য সংক্রান্ত বহু শ্লোক বিদ্যমান। এখন যদি হিন্দু শাস্ত্র থেকে গোপ ও গোপী শব্দ দুটি তুলে দেওয়া হয় তবে অর্ধেকের উপর ধর্মগ্রন্থ যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সেটা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায় আর এও বলা যায় যে গোপ জাতিকে বাদ দিলে হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে বসে। তাই বেদ-সংহিতা পুরাণাদি অসংখ্য পবিত্র প্রাচীন গ্রন্থে এমন কি জাতকাদি বৌদ্ধ গ্রন্থেও গোপজাতির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হয়েছে— সেখানে অন্য কোন জাতি সম্পর্কে তার কণা মাত্র উল্লেখিত হয় নাই। সেদিক থেকে বলা যায় এ জাতি প্রাচীন জাতি এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দিক থেকে খুবই উন্নত জাতিগোষ্ঠী।

এ জাতির কাজ-কাম্ এবং বৃত্তিও সেবামূলক। তাই এই জাতি সম্পর্কে বিহারীলাল শাস্ত্রী ন্যায়ভূষণ বলেছেন— ভারতবর্ষের সর্বত্র এই জাতি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত স্থানে এই জাতি উচ্চ জাতি বলিয়া পরিগণিত। ইহারা গোপালন ও দুগ্ধ ব্যবসা করিয়া দেশের যে কি মহৎ উপকার করিতেছে তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। দেশে ব্রাহ্মণ না থাকিলে চলিতে পারে। দেশে কায়স্থ না থাকিলে দেশের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু যদি গোপ জাতি না থাকে তাহা হইলে কত শিশু সন্তান, কত রোগী অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয় জানি না।(১৯)

সেই গোপালক জাতি সমাজে নিন্দনীয় হবেন কেন? অনেকেই তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। সে সবই শিক্ষা-দীক্ষার অভাব। নচেৎ আর্যরাও তো গোপালন করতেন, গো দুগ্ধের মত গোমাংসও তাদের প্রিয় ছিল। "আর্যগণ এত বেশি গরু খাইতেন যে, অতিথি অসিলেই একটি গরু মারিতে হইত। এইজন্য অতিথির এক নাম "গোঘ্ন" (২০)। কিন্তু গোপেরা তাদের পালিত গরুর মাংস কোনদিনই ভক্ষণ করে নাই। কারণ গরু তাদের কাছে ছিল পবিত্র ভগবতী সদৃশ। গো-পালন তাদের কাছে ধর্মীয় ব্রত। তবুও তাদের নিন্দা বা অবজ্ঞা করার প্রবণতা অনেককেই পেয়ে বসেছিল।

আর্যরা যাকে ভগবান বলে স্বীকার করে পূজা করছেন সেই নন্দসুত কৃষ্ণ নিজেই

তো পরম আগ্রহে গোচারণ করেছেন, অন্য দিকে মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ তো মক্কার মাঠে মাঠে পশুচারণ করেছেন আর খ্রিষ্ট ধর্মের প্রর্বতক যীশুখ্রিষ্টও তো মেষচারণ করেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে ধর্মপ্রবর্তকরা নিজেরাই যেখানে ঐ কাজ করেছেন সেখানে কোন জাতি তা করলে দোষের হবে কেন? বরং তাতে সে জাতির মহত্বই প্রমাণিত হবার কথা!

তাছাড়া এক সময় গরুই ছিল ধনের মাপকাঠি। তখন যার যত গরু সে তত ধনী বলে পরিগণিত হত। তাই সে সময় যে ভাবেই হোক গো-ধন বৃদ্ধির প্রবণতা অনেককেই পেয়ে বসেছিল। তাই তৎকালে বহু রাজা মহারাজাকেই গোধন চুরির মত হীন কাজেও নামতে হয়েছিল তার বহু প্রমাণ পুরাণ কাহিনীতেও পাওয়া যায়। সেদিক থেকে নন্দ ঘোষের তো নবলক্ষ ধেনু ছিল— ফলে সে ছিল তখনকার দিনে খুবই সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তি— তাই তিনি নন্দ মহারাজ।

নন্দ ক্ষত্রিয় হওয়া সত্বেও গোপালন হেতু গোপ অভিধায় অভিহিত হয়েছেন তেমনই এই সম্প্রদায় যদুবংশ জাত যাদব-ক্ষত্রিয় হয়েও গোপালনের কারণে এরা গোপ। আর্য সমাজ ব্যবস্থার চতুর্বণাশ্রম এবং গীতায় জ্ঞান যোগে কৃষ্ণ ভগবান "চাতুর্বর্ণ্যম ময়া সৃষ্টং" বলে যে চতুর্বর্ণের উল্লেখ করেছেন এই গোপসম্প্রদায় তার ২য় বর্ণক্ষত্রিয় পর্যায়ে পারে। যদিও তারা গোধন পালন হেতু দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা বিক্রয়ের ব্যবসায়ে রত, তাই অনেকেই তাদের বৈশ্য পর্যায়ে ফেলতে চায় কিন্তু আসলে তারা যদুবংশ সম্ভুত যাদব ক্ষত্রিয়। সেখান থেকে কোন মতেই তাদের অবনমিত করার উপায় নাই। শাস্ত্রীয় আলোচনায় দেখা গেল এই গোপ জাতির সঙ্গে বিভিন্ন দেব-দেবীর আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে ফলে বংশ মর্যাদায় তারা সম্ভ্রান্ত তাতে সন্দেহ নাই। এখন শাস্ত্রীয় পরিমন্ডল থেকে সরে এসে রাঢ় বঙ্গে এই জাতির অবস্থান, ক্রমবিকাশ ও তাদের সম্যক পরিচয় প্রসঙ্গে আসা যাক।

গোপ জাতি মূলত আভীর ও পল্লব এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। অন্য বিভাগ যে ছিল না তা নয়। সে সকল কথা যথা সময়ে বলা হবে। সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারতে, গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে আভীরদের প্রাধান্য ছিল আর রাঢ় বঙ্গে ছিল পল্লবদের প্রাধান্য। পল্লবদের ব্যাপক অংশ শুরুতে গোপভূমের জঙ্গল মহলে বসতি গড়েছিল সে কাহিনী এই গ্রন্থের 'গোপভূমের প্রাচীনত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। তাই সে প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না।

শুরুতে এই পল্লব গোপেরা রাঢ় বঙ্গে সগৌরবে অধিকার বহাল রেখেছিল। পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিভিন্ন রাজ শক্তির সৈন্যসামন্ত হিসাবে আহির বা আভীররা দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসতি গড়েছিল। তারই দু'একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য যে, লক্ষ্মনাবতীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইউয়জ এব সময় (১২০৮ - ১২২৬

খ্রিঃ) পশ্চিম রাঢ় আক্রমণের কালে তার সৈন্যবাহিনীতে গঙ্গা পাড়ের বহু আহির গোপ যুদ্ধের জন্য উত্তর রাঢ়ে এসেছিলেন এবং তারা পরে রাঢ় বঙ্গের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

আরও পরে সম্রাট আকবরের নির্দেশে সেনাপতি মানসিংহের নেতৃত্বে ১৫৭৬ খ্রিঃ বাংলা দেশ অধিকৃত হলে সেই অভিযানে বহুসংখ্যক আহির গোপ তথা যাদব ক্ষত্রিয়রা সৈনিক হিসাবে এসে এদেশে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। পরবর্তী কালে বহুবার দিল্লি কর্তৃক বাংলা আক্রমণ সংঘটিত হলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যুদ্ধ ব্যবসায়ী আহির গোপেরা বহু সংখ্যায় এদেশে আসে এবং এই বঙ্গেই থেকে যায়। তাছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্য ও রুজিরোজগারের আশায় সুজলা সুফলা বঙ্গে আহির গোপদেরও আবির্ভাব ঘটেছিল ফলে বাংলায় ধীরে ধীরে পল্লব গোপদের সঙ্গে আহির গোপদের সংমিশ্রণ ঘটে এবং এই গোপভূমেও আহির পল্লব মিলে মিশেই বসবাস করতে থাকে।

গোপভূমের অবস্থান নিয়ে পূর্বেই অলোচনা হয়েছে তবুও বলা যায় বঙ্গে এই জাতি সুদূর অতীত থেকেই মধ্যভারতের গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল হতে অধিক সংখ্যায় এসে রাঢ় বঙ্গের অজয় দামোদরের পক্ষপুটে অরণ্যঘেরা পরিবেশে বসতি গড়ে তোলে, তাই এই অঞ্চল গোপভূম হিসাবেই পরিচিত হয়। সে দিক থেকে বঙ্গেব গোপভূমে গোপজাতির অধিবসতির প্রথম শুরু। দীর্ঘদিন ধরে এখানে তাদের আধিক্য থাকলেও আর্থসামাজিক কারণে ধীরে ধীরে তারা সমগ্র বঙ্গেই ছড়িয়ে পড়ে।

সমগ্র ভারতে পশুপালক জাতি হিসাবে গোপ জাতি সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আপন ঐতিহ্যে মহিমাময়। কারণ বৈদিক কালের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাদের বহু উল্লেখ থাকায় এবং পৌরাণিক বহু কাহিনীতে তারা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকায়, তাদের প্রাচীনত্ব আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সে কাহিনী পূর্বেই আলোচিত হয়েছে তবুও বলা যায় অনাদি অতীত সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিভিন্ন ক্রমানুসারী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ওরা বৈদিক যুগ, পরে পৌরাণিক যুগ, তারও পরে ঐতিহাসিক যুগ অতিক্রম করে সারা ভারতে আজ স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সেদিক থেকে গোপালক গোপজাতি নিঃসন্দেহে এক সুপ্রাচীন ও মৌলিক জাতি। সেই অতীত কাল থেকেই এরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করে আজ সমগ্র ভারতেই বিকশিত হয়েছে। যেহেতু এরা এক সুপ্রাচীন জাতি তাই এই দেশের বুকে অতীত কাল থেকে বর্তমান থাকায় এদের নিজস্ব কিছু কৃষ্টিও গড়ে উঠেছে। এখন সংক্ষেপে তার কিছু আলোকপাত করা যাক।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় যে, এই গোপ জাতি সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে। খাদ্য হিসাবে দুগ্ধের উৎপাদন এরাই উদ্ভাবন করেন। ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায়, কৃষির প্রসার ঘটায়। বন্য জীবজন্তুকে পোষ মানিয়ে চাষের কাজে ব্যবহার এদেরই কৃতিত্ব।

দ্বিতীয়ত— প্রকৃতিতে দুর্ধর্ষ হওয়ায় এরা প্রথম থেকেই গোষ্ঠীপতি সমাজপতি থেকে অনেকেই রাজ শক্তিরও অধিকারী হয়ে ওঠে। তাই প্রাচীন কাল থেকেই এরা মথুরা বৃন্দাবন সহ গঙ্গা-যমুনা নদীকেন্দ্রিক বহু স্থানেই রাজকার্য পরিচালনা করেন। শাস্ত্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণেব নারায়ণী সেনাও সেই প্রাচীন কালে এই গোষ্ঠী নিয়েই তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী কালে ভারতের বিভিন্ন স্থানেই আহির ও পল্লব গোপগোষ্ঠীর অনেকেই রাজত্ব পবিচালনা করেছিল। আলোচ্য গোপভূমেও এদের শৌর্য-বীর্যের সম্যক পরিচয় পাওযা যায় যেমন গোপচন্দ্র, রাঢ়াধিপ, ইছাই ঘোষ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তৃতীয়ত— এই প্রাচীন সম্প্রদায় ক্ষাত্রবীর্যে উদ্দীপ্ত হয়ে বহুক্ষেত্রে রাজত্ব পরিচালনা কবলেও তারা শিল্পনৈপুণ্যেরও পরিচয় দিয়েছেন। যেমন দক্ষিণ ভারতের পহ্লব রাজারা বিশেষ স্থাপত্য বীতিব পরিচয় দিয়ে মহাবলীপুরম, কাঞ্চিপুরম ও আরও বহু স্থানে দেব-দেবীর মন্দিরাদি নির্মাণে তাদেব স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গের মধ্যে গোপভূমেও প্রস্তব নির্মিত রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির (আড়া), ইছাই ঘোষের দেউল (গৌরাঙ্গ পুব) ইত্যাদি নির্মাণে স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দিয়েছেন।

চতুর্থত— শুধু গোপালন, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং দেশ শাসনই নয় এরা সূক্ষ্ম নান্দনিক শিল্প নৈপুণ্যেরও অধিকারী ছিল। সেদিক থেকে এই সম্প্রদায় নাচে গানেও পারদর্শী ছিল। আহির-ভৈরব বাগিণী তো এদেরই নিজস্ব সঙ্গীত কৃষ্টির পরিচায়ক।

পঞ্চমত— গরুই এদের প্রধান পালিত প্রাণী। গরুকে এই সম্প্রদায় খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পালন করে থাকেন। গরু এদের কাছে দেবতা তুল্য, ভগবতী সদৃশ। ফলে এই জাতি গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে গরুর প্রতি পূজা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে যেমন ভাদ্র মাসে গোয়াল পূজা থেকে শুরু করে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার সময়ে গরুর পরব খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। গরুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ও পূজানুষ্ঠান গোপ সম্প্রদায়ের নিজস্ব কৃষ্টি। রাঢ় বঙ্গে বহু স্থানেই গোপদের দেখাদেখি অন্যান্য সম্প্রদায়, যারা গো পালন করে থাকে তারাও গরুর পরব পালন করে থাকে। ইদানীংকালে শালুকশাপলা ফুলের মালা পরিয়ে, গায়ে নানা রং-বেরংয়ের ছাপছোপ দিয়ে মুসলমানরাও ঐ পরব পালন করে থাকে।

ষষ্ঠত— স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এদের সন্তান আর কৃষ্ণহ্লাদিনী শক্তি রাধাও এদের ঘরের মেয়ে। তাই রাধাকৃষ্ণ এদের প্রাণের দেবতা— সেই হেতু এই সমাজে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন— জন্মাষ্টমী, রাধার জন্মদিন— রাধাষ্টমী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সমস্ত উৎসবই এরা সাড়ম্বরে পালন করে। এই সব উৎসব পরিপালনই এই গোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি।

জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎসব এই সমাজের এক পরম আদরণীয় উৎসব। কৃষ্ণ-ভগবানকে, সন্তান রূপে ঘরে পেয়ে গোপ সমাজ আনন্দে মেতে ওঠে। নাচে-গানে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উদ্বেলিত নরনারীর কণ্ঠে তাই শোনা যায়—

কি আনন্দ হল রে কি আনন্দ হল।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।।
স্বর্গে নাচে দেবগণ পাতালে নাচে বলি।
অন্দরে যশোদা নাচে দিয়ে কর তালি।।
খই ছ'রাঘ দই ছরায় আর ছরায় কড়ি
নন্দ ঘোষের মা নাচে ঠেঙা ধরা বুড়ি।।
নন্দু নাচেরে নন্দু নাচেরে - নন্দন পাইয়া
ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।।

এ সকল উৎসব ছাড়াও গোপ সমাজে বিভিন্ন ব্রতও পালিত হত। ব্রতগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, কাত্যায়নী, গোকালব্রত ইত্যাদি ব্রত। নন্দসুত কৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য গোপীরা কাত্যায়নী ব্রত পালন করেছিলেন সে কাহিনী পুরাণ-ভাগবতেও উল্লেখিত হয়েছে।

এখন উদাহরণ হিসাবে আর এক ব্রতের উল্লেখ করি। ব্রতটি হল গোকাল ব্রত। এই ব্রত শুরু হয় চৈত্র সংক্রান্তি থেকে এবং শেষ হয় বৈশাখ সংক্রান্তিতে। এতে কুমারী মেয়েরা মাসাবধি গরুকে কাছে রেখে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গরুকে সেবা পূজা করে থাকে। মুখ্য উদ্দেশ্যই হল গো সেবা। তার বিনিময়ে তারা গোদেবতার কাছে স্বর্গবাসের কামনা জানিয়ে বলে—

গোকুলে গোকুল বাস,
তোমার মুখে দিলাম ঘাস।
আমার যেন হয় সগ্‌গ বাস।। [২১]

এই সকল ব্রতানুষ্ঠান গোপ কৃষ্টির নিজস্ব পরিচায়ক।

সপ্তমত— আমরা শুরুতেই বলেছি এই জাতি শক, পহ্লব, ক্ষত্রপগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত। তাই শক কৃষ্টির বহু নিদর্শন এদের মধ্যেও বর্তমান ছিল। নমুনা হিসাবে কিছু বলা যাক। আমরা জানি 'শক' শব্দটি বৎসর অর্থে ব্যবহৃত। গোপেরা শুরুতে বছর গণনার ক্ষেত্রে শকরীতি অনুসরণ করত। শকেরা বর্ষারম্ভের কাল অর্থাৎ আষাঢ় মাস থেকেই বর্ষ গণনা শুরু করত। সেই প্রাচীন রীতি গোপসমাজের মধ্যেও বহুকাল প্রচলিত ছিল। তাই কি মহাকবি কালিদাস সেই প্রাচীন রীতিকে সম্মান জানিয়ে তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যটিতে বর্ষারম্ভের শুভদিন হিসাবে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' উল্লেখ করেছিলেন? যাক সে কথা, বর্ষ গণনার গোপকৃষ্টি হিসাবে সেই সব রীতিকাহিনী এখন লুপ্ত ইতিহাস মাত্র।

অষ্টমত— এরা রাধাকৃষ্ণের পূজক হিসাবে বৈষ্ণব কৃষ্টির দ্যোতক হলেও শৈব এবং শাক্ত আরাধনাতেও সম্যক ভাবে অভ্যস্ত ছিল। বিশেষ করে গভীর বনে গোচারণে যাওয়া গাভী কর্তৃক কোন গুপ্ত প্রস্তর খণ্ডে দুগ্ধ প্রদান ও তাকে কেন্দ্র করে গোপ কর্তৃক শিবক্ষেত্রের আবিষ্কার ও প্রচারের পিছনে গোপকৃষ্টির অবদান অনস্বীকার্য। দেবী মহামায়া এদের ঘরের মেয়ে তাই শাক্ত আরাধনাতেও এরা সম্যকভাবে আগ্রহী। তাছাড়া অন্যান্য দেব-দেবীর প্রতিও এরা সহানুভূতিশীল। তাই বহু দেব দেবীর এরা সেবক, পূজক ও দেয়াসিন। বিশেষ করে ধর্ম ও মনসা মঙ্গলের গানও এরা অনেক ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক ভাবেই গেয়ে থাকেন তাই এই গোপসম্প্রদায়ের অনেকেই গায়ক > 'গায়েন' পদবিতেও পরিচিত।

পরিশেষে আরও কিছু পালনের কথা বলি— যা রাঢ় বঙ্গে সম্যক ভাবে প্রচারিত হলেও, পণ্ডিত মহলের ধারনা তা সবই গোপ কৃষ্টি সম্ভূত। গোয়াল পূজার কথা আগেই বলা হয়েছে এখন 'শাকপালার' কথা বলি। ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে গ্রামের মেয়েরা শাক পালন করে থাকেন। এতে ১৪ রকমের শাক কচু পাতায় বেঁধে উঠানে নিবেদিত হয়। ঐ শাকগুলির মধ্যে থাকে হিঞ্চা, শিশুনি, বেতো, পনকা, নটে, শালিঞ্চী, পটলপত্র, সরিষাপত্র ইত্যাদি তবে এদের মধ্যে ওল শাক অতি অবশ্যই থাকবে তাই বলা হয়— "চৌদ্দশাকের মাঝে আমার ওল পরামানিক"। আরও কিছু অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি হল 'অরন্ধন'। শিবকন্যা মনসার উদ্দেশ্যে এটি একটি পালন। এটিও ভাদ্র মাসের শনি-মঙ্গলবারে পালিত হয়ে থাকে। এর বিশেষত্ব হল সেদিন উনানে হাড়ি না চড়িয়ে অর্থাৎ রান্না না করে খই-মুড়কি, চিড়া-দই, ফল-মিষ্টি খেয়ে কাটাতে হয় তাই একে অরন্ধন বলে।

এই জাতি যে খুবই প্রচীন সে কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এদের ঐতিহ্য ও গৌরব গাথার বিষয়ে কিছু বলা যাক। প্রকৃতিতে এরা দুর্ধর্ষ হওয়ায় প্রাচীনকাল থেকেই এরা যুদ্ধ-বিগ্রহে পারদর্শী ছিলেন। বহু ক্ষেত্রেই এরা রাজকার্য পরিচালনা করেছে ও যোদ্ধা হিসাবেও শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছে। বহু স্থানেও এই গোপেরা রাজত্ব করেছে। প্রমাণ হিসাবে বলা যায়— "If monumental Inscriptions be trusted, the Ahirs were for sometime the universal monarch of India"[(২২)]। তাই শৌর্যবীর্যের দিক থেকে এরা খুব প্রসিদ্ধ জাতি।

বহু ঐতিহাসিক বংশ ও ব্যক্তিত্ব এই জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল যেমন— "জগদ্বিখ্যাত মৌর্যবংশ, বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ পাল বংশ, রৈবতক রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ পবিত্র আভীর বংশ, গুজরাটের শাহবংশীয় যাদবরাজগণ, মহীশূরের যাদব রাজবংশ, দ্বারসমুদ্রের যাদব রাজবংশ ও মহারাষ্ট্রের দেবগিরি রাজবংশ, কৃষ্ণানদীর তীরস্থিত বাতাপিপুরের রাজবংশ।" [(২৩)] বঙ্গের পালরাজ সম্পর্কে আরও বলা যায়— ১১

শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশ পাল অর্থাৎ গোপবংশীয় রাজাদিগের অধীনে ছিল। পাল বংশীয় রাজারা আহীর অর্থাৎ গোপ ছিলেন।[(২৪)]

এছাড়াও মারাঠা বীর শিবাজীর মাতা জীজাবাঈও ছিলেন গোপকন্যা। মেবারের গৌরব রবি রাণা হামীরের মাতাও গোপকন্যা ছিলেন। রাজস্থানের সতী-লক্ষ্মী প্রাতঃ স্মরণীয়া কর্ম্মদেবীও ছিলেন গোপকন্যা। বঙ্গের পলাসীর যুদ্ধে ইংরাজদের বিরুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্য বাহিনীতে লালপল্টন রূপে বহু গোপ সৈন্য যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য বীর মোহনলাল যিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করেও বেইমান চূড়ামণি মিরজাফরের বেইমানিতে মৃত্যুবরণে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই বলি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার বিশ্লেষণ করলে ভারত ইতিহাসের প্রায় সর্বত্রই এই গোপ জাতির শৌর্যবীর্যের বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এতক্ষণ এই জাতির প্রাচীনত্ব, মহত্ব, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি নিয়ে অলোচনা করা হল। এখন এদের কিছু অসুবিধার কথাও বলতে হয়। আমরা জানি ভারতবর্ষে এই জাতি খুবই প্রাচীন ও মৌলিক জাতি। প্রাচীনত্বের দৌলতে অনেক জাতির মধ্যেও বহু সময়ে এসে যায় শৈথিল্য, মালিন্য, ফলে সেই সকল জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক সময় অবনমনও ঘটতে দেখা যায়। গোপ জাতির মধ্যেও সেই ধরনের কিছু অসুবিধাও পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। এর পিছনে কারণ যে ছিল না তা নয়।

প্রথম কারণ হল এরা মুখ্যত গোপালক। সুদীর্ঘ কাল ধরে এরা গোপালন ও গোপরিচর্যা করে আসছে। আর গোপালন বা পরিচর্যা হল সাধারণ কাজের থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কাজ, এটিকে শুধু কাজ বললে ছোট করা হবে। এটি আসলে একটি সেবা মূলক কাজ। কারণ বেশ কিছু অসহায় অবলা জীব যাদের বাকস্ফূর্তি নাই, তাদের মনের ভাব বুঝে তাদের চাহিদা মত পরিচর্যা করা সত্যই কঠিন কাজ তাই এটি শুধু গো-পালন নয়— এটি প্রকৃত অর্থে গো সেবা।

এমনই একটি মহৎ কাজে এই সম্প্রদায়কে সারা দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়, ফলে এরা অনেকটা বদ্ধ জীবন-যাপনে ব্যস্ত থাকে। কারণ সকালে গোয়াল বা গোস্থান পরিষ্কার করা, পরে গরুদের বাগানে চারণের জন্য নিয়ে যাওয়া। সেখানে গোচারণ করিয়ে আবার তাদের বাড়িতে এনে যত্ন সহকারে দিবস-রাত্রি তাদের সেবা পরিচর্যা করা, ফলে তাদের দিন-রাত ঐ কাজেই ব্যাপৃত থাকতে হয়। সেহেতু তাদের অন্যকিছু দেখা বা করার সুযোগ অপরাপর সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক কম। তাই এক ধরনের বদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত থাকায় এদের শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ খুবই কম থাকায় এরা বেশ অনুন্নত।

দ্বিতীয়ত— নিজেদের পালিত গরু বাছুর নিয়ে বন জঙ্গলের চারণ ক্ষেত্রে বা বাথানে বাথানে আরণ্যক পরিবেশে এক রকম বদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত থাকায় সভ্য

সমাজের সংস্পর্শে আসতে না পারায় এরা অনেকখানি বন্য প্রকৃতির হয়ে পড়ে। ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধায় বঞ্চিত হয়ে তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে অনেকখানি পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত— আন্তরিক নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে ব্রতপালনের ন্যায় নিজেদেব পালিত পশুর সেবা ও পরিচর্যায় নিজেদের নিয়োজিত রাখায় তারা সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই অন্যান্য জাতির তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষার তেমন সুযোগই পায় নাই। তবু তাবা ছিল খুবই সরল। তাদের সেই সারল্যের সুযোগ নিয়ে অনেকেই তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ পর্যন্ত করত। তবুও তাদের সারল্য, দেবতার প্রতি ভক্তি দেশের প্রতি মমত্ব বোধ ও অসীম সাহসিকতার কোন ঘাটতি ছিল না। তবে ঘাটতি যেখানে ছিল— সেই শিক্ষা-দীক্ষার দিকটিও তারা পরে পূরণের উদ্দেশ্যে অগ্রণী হয়ে উঠল।

জাগতিক নিয়মে চিরকাল কারও সমানে যায় না। পরিবর্তনশীল জগতে দিনে দিনে বহু কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। তাই প্রাচীন কৃষ্টি সম্পন্ন এই জাতির মধ্যেও দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। এর পিছনেও বেশ কিছু কারণও বর্তমান আছে।

কারণগুলি হল— যথাক্রমে রাস্তাঘাটের বিস্তৃতি ফলে যানবাহনের বিশেষ সুবিধা। অগে যেখানে প্রত্যন্ত এলাকায় রাস্তাঘাটের তেমন প্রসার ছিল না তাই মানুষ সভ্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক হীন অবস্থায় দিনযাপন করতে বাধ্য হত। কিন্তু এখন সেখানে রাস্তাঘাটের বিস্তার ঘটায় দেশের প্রত্যন্ত অংশও সহজেই সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে গেছে।

দ্বিতীয়ত— শিক্ষার বিস্তার। আগে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবই ছিল শহর বা নগর কেন্দ্রিক। ফলে শহর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ তেমন পাওয়া যেত না, বিশেষ করে শহর থেকে বহুদূরে নদী ও তার আরণ্যক পরিবেশে গড়ে ওঠা গোপ পল্লীগুলির তো শিক্ষার কোন সুযোগই ছিল না। কিন্তু এখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটায় মানুষ শিক্ষালাভের সুযোগ হাতছাড়া করছে না। ফলে সর্বত্রই শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। আর শিক্ষাই জ্ঞানের আলোক প্রজ্জ্বলিত করে তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে গোপজাতিও আজ জ্ঞানালোকে ভাস্বর হয়ে উঠছে।

তৃতীয়ত— কৃষির ফলন বৃদ্ধি। কৃষির প্রসারের জন্য দেশে বিভিন্ন পরিকাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন— নদী পরিকল্পনা ও ভূগর্ভস্ত জলের ব্যবহারে সেচের সুরাহা, বৈজ্ঞানিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে কৃষির উৎপাদন ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এক ফসল জমি অনেকক্ষেত্রে দু'তিন ফসলে পরিণত হয়েছে। রাসায়নিক সারের সঙ্গে বাড়িতে থাকা জৈব সারের প্রয়োগে এরা কৃষি উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা

নিয়েছে। তাছাড়া কৃষির উদ্যোক্তা হিসাবে এই জাতি চিরকালই পরিশ্রমী তাই তাদের পরিশ্রমে এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োগে তারা ব্যাপকভাবে কৃষি ফসল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

চতুর্থত— উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি, ফলে কৃষি নির্ভর গোপ সমাজের হাতে আর্থিক স্বাচ্ছল্য এসেছে। পূর্বে যেখানে অর্থিক দুরবস্থা এদের নিত্য সঙ্গী ছিল এখন তাদের আর্থিক অবস্থা অনেক মজবুত হয়েছে।

পঞ্চমত— দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মূল্যও বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সেই সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপক উন্নতি হওয়ায় দুগ্ধ উৎপাদকেরা অর্থাৎ গোপজাতি সহজেই তাদের উৎপাদিত পণ্য সম্ভার শহরে নিয়ে হাজির হতে পারায় উপযুক্ত মূল্য হাতে পাচ্ছে। তাই তাদের আর্থিক অবস্থা অতীতের থেকে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, আর আর্থিক অবস্থা বৃদ্ধি পেলে সামাজিক অবস্থাও বৃদ্ধি পায়। কারণ এ দুটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত হওয়ায় গোপ সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থা বেশ দৃঢ় হয়েছে।

পরিশেষে বলি, শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গৃহসুখী বা ঘরকুনো এই সম্প্রদায় আজ ব্যাপকভাবে শহরমুখীন হওয়ায় বহুবিধ ব্যবসা বাণিজ্য চাকুরির সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। ফলে বিভিন্ন কর্মসংস্থানে জড়িয়ে পড়ায় এই জাতি গোষ্ঠী এখন বেশ উন্নত, তাই দীর্ঘ দিনের আর্থিক অভিশাপ মুক্ত হয়ে এরাও সবিশেষ উন্নত হয়েছে।

এবার আসা যাক এই গোপ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাগ বিভাজন নিয়ে। আমরা জানি বঙ্গের সমস্ত জাতি গোষ্ঠিই পূর্বে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশ কয়েকটি ভাগে পরস্পরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। জাতির মধ্যে এই বিভাগগুলি উপ বিভাগ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার কথা। অবশ্য এই বিভাগগুলি অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিসীমায় সীমায়িত হত আবার অন্য কারণেও তারা বিভক্ত হত।

এর কারণ অনুসন্ধানে যেটুকু বোঝা যায় তা হল বঙ্গে সেন যুগীয় জাতি বিন্যাস তথা কৌলিন্য কুল মর্যাদা জনিত বিভাজনেরই বিষময় ফল বলেই মনে হয়। কারণ এতে কোন সুফল তো পাওয়া যায়ই নি এবং সেটা উদ্দেশ্যও ছিল না বরং তার উদ্দেশ্যই ছিল জাতিগুলিকে দুর্বল করা, সেটি পরিপূর্ণ মাত্রায় চরিতার্থ হয়েছিল।

এখন অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মত গোপজাতির পারস্পরিক বিভাগগুলির কথায় আসি। এই গোপ সম্প্রদায় প্রধানত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন— রাঢ়ী বা গৌড়ীয়, বারেন্দ্র, পল্লব, আহির ও নকুলী।

রাঢ়ী বা গৌড়ীয় গোপ বলতে রাঢ় দেশ বা গৌড় দেশীয় গোপেদেরই বোঝায়। বারেন্দ্র গোপ হল ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা গোপ। এছাড়া বঙ্গের গঙ্গা নদীর পশ্চিমাঞ্চলের গোপেরাই পল্লব গোপ। যারা সাধারণত তাদের

পোষ্য জীব জন্তুকে ঝোপঝাড় ও গাছের পল্লব ভেঙে প্রতিপালন করত। আর আহির গোপ হল গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের গোপ। এবা আসলে আভীর > আহির নামে খ্যাত। এই আহির ও পল্লব গোপদেব সম্পর্কে পূর্বে বিস্তৃত ভাবেই বলা হয়েছে। এছাড়া নকুলী গোপ বলতে বলা হয়েছে— "গো-চিকিৎসা গোপঃ সর্ব্বে নকুলাঃ।" অর্থাৎ গোপ সমাজের পালিত গোবৎসাদির চিকিৎসা যারা করত, এক কথায় গোচিকিৎসক গোপদেরই নকুলী বলা হত।

এখানেই শেষ নয়। সমগ্র গোপ সমাজ আরও বহু বহু ভাগে বিভক্ত ছিল তাদের সকল বিভাগগুলির কথা বলা সম্ভব না হলেও উল্লেখ্য বেশ কিছু বিভাগের কথা উল্লেখ করতে চাই। আব এত ব্যাপক ভাগে বিভক্ত হওয়াব জন্য এই সম্প্রদায় অন্য আর পাঁচটি জাতি সম্প্রদায়ের তুলনায় খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই বহুধা বিভক্ত বিভাগগুলি হল যথাক্রমে— পুবালী, মেড়ালী, রেনিটি, মধুগোপ, উজ্জয়িনী বা উজনে, কনৌজ বা কনজে, নন্দা, মাদুরহাটী, মান্দারন, ভুইয়া, গোপপুরী, গোলা, মীরানী, বঙ্গ, পূর্বকুল, পশ্চিমকুল, পালমা, বানলী, ভার্গব, মথুরাপুরী, মালীয়, গুর্জর, মথুরাবাসী ইত্যাদি।

উক্ত বিভাগগুলির মধ্যে পূর্বদেশীয় গোপেরা পুবালী, পূর্বকুল, অনুরূপ পশ্চিম দেশীয়রা পশ্চিমকুল, ভেড়া পালনকারীরা মেড়ালী, আবার স্থান নামে ও বিভাগের নাম হয়েছে, যেমন— বঙ্গের বাসিন্দা বঙ্গ, মথুরা থেকে মথুরাবাসী, মথুরাপুরী, উজ্জয়িনী থেকে উজনে, কনৌজ থেকে কনজে, অনুরূপ মাদুরহাটী, মান্দারন, গোপকুরী, গুর্জর, রেনিটি, আবার ব্যক্তি কেন্দ্রিক বিভাগও হয়েছে, যেমন— নন্দা, মধু, ভাগর্ব অন্যদিকে ভূসম্পত্তির অধিকারী থেকে ভুঁইয়া ইত্যাদি।

এতক্ষণ গোপজাতির বিভিন্ন বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা করা হল। এবার ঐ জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের গ্রহণীয় পদ-পদবী-উপাধি এবং গোত্র ও টোটেম ট্যাবুর বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে ভালবাসে কিন্তু তা করলেও মনের কোণে আপন জাত্যাভিমান এবং বংশ মর্যাদা প্রকাশের বাসনাও সুপ্ত থাকে। তাই আপন পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে নিজস্ব বংশ পরিচয়ের দ্যোতক হিসাবে আপন আপন উপাধি, পদ-পদবী ও গোত্রের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। ফলে "পদবী শুধু আত্ম পরিচয়ই নয়, পারিবারিক তথা বংশপরিচয়"ও বটে।[(২৫)] সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাই আপন আপন পদ-পদবী, গোত্র ও পারিবারিক বাধানিষেধ স্বরূপ টোটেম ট্যাবুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পদ-পদবী সম্পর্কে আমাদের একটা সম্যক ধারণা থাকলেও টোটেম-ট্যাবুর বিষয়ে বলা যায় যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু বিধি নিষেধ থাকে সেগুলিই হল টোটেম বা ট্যাবু।

এ সম্পর্কে আরও বলা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন জীবজন্তু ও উদ্ভিদ ইত্যাদির একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল— যা বিভিন্ন পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিধান করত। তাই একে প্রাণী জগতের সঙ্গে ভাবসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা বলেও মনে করা হয়। তাছাড়াও অনেক নৃবিজ্ঞানী একে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সঙ্গে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বলেও মনে করেন। টোটেম সম্পর্কে বিশ্বকোষে বলা হয়েছে— মানব সমাজে কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে নানা শ্রেণীর জীবজন্তু, গাছপালা, প্রাকৃতিক বা জড়বস্তুর সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের অতি অন্তরঙ্গ জৈব সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়। সম্পর্কের নিদর্শন হিসেবে ঐ সকল গোষ্ঠী বস্তুগুলির নামানুসারে গোষ্ঠীর নামকরণ করে। গোষ্ঠীগুলির আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির মধ্যে বস্তুর প্রতি ঘনিষ্ঠ আনুগত্য, আবেগ, আন্তরিকতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এই বস্তুই টোটেম।[২৬] উদাহরণ হিসাবে বলা যায় গোপভূমের ভল্লুপাদ প্রতিষ্ঠিত ভাল্কীর রাজ পরিবার পূর্বে ভালুক পুষত এবং সেই ভালুক মারা গেলে তারা অশৌচ পালন করত। কাজেই এও এক ধরনের পারিবারিক টোটেম। (তারা কেন এমন করত সে কাহিনী যথাসময়ে বলা হবে।)

এখন বিভিন্ন প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে এবং বহুবিধ পুস্তকাদি ও পত্র পত্রিকার সাহায্যে গোপজাতির যে সকল পদবীর সন্ধান পেয়েছি তাদের বর্ণানুক্রমিক উল্লেখ করতে চাই। প্রসঙ্গত বলে রাখি বঙ্গের অন্যান্য জাতির তুলনায় এদের ব্যবহার্য পদবীর সংখ্যা প্রচুর এবং সেগুলি বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। কেন তা হয়েছে পরে সে বিষয়ে আলোচনা করব। এখন বিভিন্ন পদবীর প্রেক্ষিতে যাদের গোত্র ও পারিবারিক নিষেধাদি (Totam) এর কথা জানা গেছে তারও উল্লেখ অবশ্যই করা হবে। প্রথমে গোত্র ও তাদের পারিবারিক নিষেধাদির উল্লেখ করার পর গোত্রের আদ্যক্ষর যা গোত্রের পাশেই দেওয়া থাকবে সেগুলি পরে উল্লেখ্য পদবীর পাশে ব্রাকেটেই দেওয়া হবে, যাতে পাঠকবর্গের সেই সমস্ত পদবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের গোত্র ও পারিবারিক নিষেধাদি জানার সুবিধা হবে। এ প্রসঙ্গে জানাই গোপভূম সহ সমগ্র বঙ্গে এখন পর্যন্ত আমি প্রায় ৩০৮ পদবীর সন্ধান পেয়েছি, যা একান্তভাবেই বঙ্গীয় গোপ সমাজের ব্যবহৃত পদবী। সর্বভারতীয় গোপজাতির ব্যবহার্য পদবী এখানে উল্লেখিত হয়নি। এখন গোত্র ও গোত্রগত পারিবারিক নিষেধাদির কথা উল্লেখিত হল—

গোত্রের নাম	পারিবারিক নিষেধ
গোত্র কাশ্যপ (কা)	এদের পারিবারিক নিষেধ হল এরা কচ্ছপ খায় না
” ষাণ্ডিল্য (ষা)	” ” ” ” ” ষাঁড় বয় না বা সাঞ্চা শাক খায় না
” মৌদ্গল্য (মৌ)	” ” ” ” ” মধু খায় না, মধুর চাক ভাঙে না।

,, মধু (ম) ,, ,, ,, ,, ,, মধু খায় না।
,, আনন্দ (আ) ,, ,, ,, ,, ,, আকন্দ ফুল ছিঁড়ে না।
,, অলক (অ) ,, ,, ,, ,, ,, আড় মাছ খায় না।
,, গৌতম (গৌ) ,, ,, ,, ,, ,, গুঁতে মাছ খায় না।
,, নাগ (না) ,, ,, ,, ,, ,, সর্প মারে না বরং প্রণাম করে।
,, ভরদ্বাজ (ভ) ,, ,, ,, ,, ,, ভেলে মাছ খায় না।
,, শঙ্খঋষি (শ) ,, ,, ,, ,, ,, শঙ্খকে অশ্রদ্ধা করে না, প্রণাম করে।
,, সপ্তর্ষি (স) ,, ,, ,, ,, ,, সাপ মারে না।
,, পরাশর (প) . ,, ,, ,, ,, ,, পলাশ গাছ কাটে না।

এখন গোপজাতির ব্যবহার্য পদবীর বর্ণানুক্রমিক উল্লেখ ও তাদের পারিবারিক নিষেধাদির সংকেত প্রদত্ত হল ঃ—

বর্ণ পদবী ও উল্লেখ্য গোত্রাদির পারিবারিক নিষেধ।

অ— অধিকারী।

আ— আদক, আলু (কা), আহির (কা), আউলী, আড়ু, আহির (কা), আহির-ঘোষ।

উ— উপাধ্যায়।

ও— ওঝা (কা)।

ক— কাপাস (কা), কাঁঠাল (কা), কর, করকড়ি, কলামুড়ি (ষা), কোলে, কুঁকড়ী, কাউরী, কাঁড়ার, কপাট, কাপড়ী, কাঁপাস, কাঁউর, কুমার, কোটাল, কুণ্ডল, কাটরা, কাঁড়ি, কামুর, কৃষ্ণমাতারী, কাটালী, কাথুরিয়া, কাবড়ী, কুইলা, কাঁহাল, কোঙার, কবি, কুলসী, কড়ি (কা)।

ক্ষ— ক্ষীরহরি।

খ— খাঁ (কা), খান, খাম, খোসাল, খাঁড়া, খামকাট, খাওয়াস (ষা)।

গ— গায়েন (কা), গোপ (কা), গিরি (ষা+মৌ), গোড়ে (কা), গের, গোঁড়ি, গোয়ালা, গোস্বামী, গায়েস, গৌড়, গোপাল, গরাই, গোপ-বৃহস্পতি, গাড়ুয়া, গোপালচারী, গোপালাচার্য্য, গোপালন, গোপ-যাদব, গাঁতাইত, গোড় (কা)।

ঘ— ঘোষ (কা+ষা+মৌ+ম+অ), ঘুঘু (কা), ঘাউ, ঘাঁটি, ঘুসকি, ঘোড়ুই, ঘোষ-চৌধুরী, ঘোষ-শিকদার, ঘোষ-মজুমদার, ঘোষ-যাদব, ঘোষ-গোস্বামী।

চ— চাই (কা), চাঁই, চাপ, চল, চিকি, চানক (কা), চচ্ছড়ী, চন্দ্রনিধি, চৌধুরী, চল-চনক, চড়চড়ি।

ছ— ছাট।

জ— জোয়াল (ষা), জেটি, জোয়ারদার, জোতদার, জাগিরি।

ঝ— ঝামড়ী, ঝুড়ি, ঝাপড়ী।

ট— টকাল, টাক।

ড— ড্যাং, ডকাল, ডাঙ্গর, ডাবর, ডাঁগর (কা)।

ঢ— ঢালিত, ঢোলে।

ঢ়— ঢ়াং।

ত— তরফদার (ভ), তালিত, তালুকদার, তেলি, তিলি।

দ— দণ্ডপত (কা), দেউটি (ভ), দলুই, দেয়াটি, দেব, দাশ, দই, দাড়ি, দিয়ান, দাস, দণ্ডপাট (কা), দেওয়ান, দেবাংশী, দিগ, দত্তপাট, দেন, দ্বারি, দলাই, দেয়াসী, দেয়ান।

ধ— ধূলা (যা), ধোলে (মৌ), ধাড়া, ধামালী, ধুতি, ধলে, ধুলিয়া, ধনুসেবক, ধর।

বর্ণ পদবী ও উল্লেখ্য গোত্রাদির পারিবারিক নিষেধ।

ন— নাগ (কা+মৌ), নায়েক (কা), নাড়ু (শ), ন্যাড়, নেগেল, নায়ক, নাইকেল, নিয়োগী, নামাতা, নারায়ণ, নাঙ্গল, ন্যাজ (কা)।

প— পৌলিক (কা), পাইন (কা), পাঁজা (কা), পাল (ষা), পালুই (ষা), পান (ষা), পালিয়ান, পাড়ুই, পাত্র (কা), পর্ব্বত, পেয়ালী, প্রামাণিক, প্রান্তি, পল্লব, পান্ত, পাণ্ডা, পাটল, পুরকাইত, পড়িয়া, পঁড়া, পিছলি, পান্না, পানি, পুষ্টি, পণ্ডিত, প্রসাদ, পুঁড়িত (কা), পাতর (কা)।

ফ— ফেঁসো, ফুষ্টি, ফেঁতড়ি (ষা)।

ব— বাগানী (কা), বারিক (কা), বাকুলী, বালি, বালতি, বাগুই, বাগ, বর (ষা), বেলেল, বাঁক, বাদুড়ী, বাঙ্গাল, বিশ্বাস, বাগাল, বিজলী, বাজারী, বিশুই, বৈরাগ্য, বেহু, বাউরি, বকসী, বাসুগোপাল, বেমাল (কা), বারি, বেরা, বাখুলে (কা), বক্রবর্ত্তী, ব্যাওড়া (কা)।

ভ— ভদুড়ি (কা), ভৌমিক (কা), ভুঁইয়া (যা), ভটক, ভোঁড়, ভেবলী, ভর, ভড়, ভট্টক, ভগত, ভুই, ভুল।

ম— মাহাতো (কা), মল্লিক (কা), মণ্ডল (কা+ষা+মৌ+অ), মাকুড় (কা+না), মাল, মজুমদার (স), মাইতি, মাটি (ষা), মোশেল, মারিক, মাপদার, মুন্সী, মিত্র, মেটিয়া, মাইসেল, মোট, মোড়ল, মাজি, মাভৈ, মাকাল, মল্লদে, মৌরমাঝি, মেহেতো, মাড়ু, মহাকুল, মাউর, মরাই, মেঝিয়া, মঞ্জল, মজুরী (ষা), মোক্তার।

য— যাদব (কা), যদু, যাদবাচার্য।

র— রায়, রাই, রানা, রাউত, রোহান, রেড্ডি।

ল— লাউ (কা), লাঙ্গল (ষা), লুড়কী, লহরী (কা), লা, লাহা, লাহিড়ী, ল্যাদাড়ি (কা), লাইকেল (কা)।

শ— শুরুল, শূর, শাস্ত্রী, শুয়ালি (ষা)।

স— সাউ (কা), সিংহ (কা), সেনাপতি (কা), সামুই (ষা), সাইনি (ষা+মৌ), সেন, সানি, সাঁপুই, সিংহা, সিং, সুরুল, সরকার, সিকদার, সাঁতাইত, সান্ডেল, সার, সাউনি, সাট, সাহু, সাণ্ডিল্য, সরদার, সাউ।

হ— হোড় (কা), হাজারী (কা+ষা), হাইট (ষা), হালদার, হাইত, হাটুই, হাতি, হাজরা, হাল, হাউলি।[২৭]

গোপ সম্প্রদায়ের উপরি উল্লিখিত বিচিত্র পদ-পদবী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। এই সম্প্রদায় মূলত ছিল পশুপালক এবং এদের পালিত পশুর মধ্যে গরুই হল প্রধান তাই গোপালক হিসাবে এরা 'গোপ' উপাধি সাদরে গ্রহণ করেছে। এখন গোপ শব্দে একটি জাতিকে বোঝায়— যারা গোপালন করে। সেই জাতি তাদের পালিত পশুর দ্বারা উৎপাদিত দুগ্ধসামগ্রী গ্রামে গঞ্জে ঘোষণা সহকারে বিক্রয় করে থাকে বলেই তারা 'ঘোষ' পদবীতে ভূষিত। এই ঘোষ পদবীই এই সম্প্রদায়ের মৌলিক পদবী।

শুরুতে পশুপালক হলেও কৃষি উদ্ভাবনের পরেই কৃষিকাজেও সংযুক্ত তাই কৃষি যন্ত্রপাতির অনেকগুলিকে এরা পদবী হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং কৃষি দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত বহুবিধ দ্রব্যাদিকেও পদবী হিসাবে নিয়েছে। যেমন— লাঙ্গল, জোয়াল, শুয়ালি, হাল, সরাই, ঝুড়ি, বালতি, পালুই, বাখুলে ইত্যাদি। তাছাড়াও তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির অনেকগুলিকেই তারা পদবী হিসাবে নিয়েছে। যেমন— আলু, কাপাস, পান, লাউ, কাঁঠাল, দই, ক্ষীর।

এরা যদুবংশজাত তাই এদের অনেকের পদবী— যদু, যাদব, যাদবাচার্য, ঘোষ-যাদব, গোপ-যাদব। যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে প্রথম থেকে যুক্ত থাকায় এরা যোদ্ধার জাত, তাই এদের পদবীতেও তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন— সেনাপতি, নায়েক, হাজারী ইত্যাদি। পেশায় গোপালক হলেও এরা শৌর্যশালী জাত ফলে প্রথম থেকেই এই সম্প্রদায় গোষ্ঠপতি, দলপতি, ভূম্যধিকারী ও রাজন্য পদে ব্রতী ছিল তাই এদের বহু পদবীতেই তার প্রমাণ মেলে। যেমন— মণ্ডল উপাধিটিও তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ কোন অঞ্চল বা মণ্ডলের অধিপতি হওয়ায় তারা অনেকক্ষেত্রে মণ্ডল পদবী গ্রহণ করত। অনুরূপভাবে তারা অরণ্যের বিশেষ কোন এলাকা গোচারণের জন্য দখল করে গোষ্ঠপতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করত। তাই গোষ্ঠপতি, গোষ্ঠাধ্যক্ষ তাদের বিশেষ পদবী। ঠিক একই কারণে ভূমির অধিকারী হিসাবে ভৌমিক, ভুঁইয়া, মল্লিক

এমনকি রাজন্য থেকে রাজা > রায় ইত্যাদি। সম্ভ্রান্ত পদের অধিকারী হিসাবে দেওয়ান, সরকার, হালদার, তালুকদার, জোতদার, জোয়ারদার, মজুমদার ইত্যাদি উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন।

কৃষ্টিসম্পন্ন এই সম্প্রদায়ের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের গান গেয়ে থাকেন বা কথকথার কাজও করে থাকেন। তাই গান গাওয়া থেকে অনেকের পদবী হয়েছে গায়েন (গান গাওয়া > গায়ক > গায়েন)। অনেকেই বিভিন্ন দেবদেবীর সেবাপূজায় দেয়াসির কাজে নিযুক্ত থাকায় তারা দেয়াসি, দেবাংসি বা দেয়াসিন পদবীর অধিকারী হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই আপন আপন কর্মকুশলতার দৌলতে অনেক সময় সম্মানজনক উপাধিও পেয়েছেন— তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল— রায়, রায়চৌধুরী, চৌধুরী, মণ্ডল, গোপালাচার্য, পণ্ডিত, অধিকারী, শাস্ত্রী ইত্যাদি।

আপন আপন কাজের দ্বারাও মানুষ পরিচিত হয় যেমন ফলের দ্বারাই বৃক্ষকে চেনা যায় (A tree is known by its fruits) তেমনি প্রাচীনকাল থেকে পেশাভিত্তিক জাতি নিরূপণের ব্যবস্থায় কর্মের দ্বারাই মানুষের পরিচিতি নিরূপিত হয়েছে এবং সেই পরিচিতি অনেক ক্ষেত্রে তাদের পদবীতেও প্রতিভাত হয়। এই জাতির মধ্যেও তেমনি বৃত্তি ভিত্তিক কিছু পদবীও রয়েছে। যেমন— দুগ্ধ দোহন করেন তাই দোহক, দুগ্ধ মন্থন করেন তাই মন্থনী, দুধের কারবারী তাই দুধিয়া, গোপালন করেন তাই গোপাল, গোপতি ইত্যাদি।

সেই নিরিখেই বঙ্গের গোপ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাল পদবীটিও এসেছে। এ সম্পর্কে বলা যায় পল্লব গোপেরা পশুর খাদ্য হিসাবে পত্রযুক্ত শাখাপ্রশাখাগুলি ব্যবহার করত। তাই পল্লব > পালা > পাল,পালুই শব্দগুলি জাত হয়েছে এবং তা ওদের পদবী হিসাবেও পরে গৃহীত হয়েছে, ফলে বঙ্গীয় পল্লব গোপেদের মধ্যে পাল পদবীটি ওদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। "উক্ত পাল পদবীটির ব্যবহার যে রাঢ়ীয় পল্লব গোপেদের মধ্যে সর্বপ্রথম হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পত্র শব্দের মূলে *পাত্র এবং পাতর পদবী দুইটি আগত*"।[২৮]

পরিশেষে এই সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি-নীতির বিষয়ে কিছু বলে নিই। এরা যে খুব প্রাচীন জাতি এবং মৌলিক জাতি সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এদের সামাজিক রীতি-নীতির বিভিন্ন বিষয়ে বলতে গিয়ে এই সম্প্রদায়ের বিবাহের প্রসঙ্গেই প্রথমে আসা যাক। আমরা পূর্বেই বলেছি এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক থাক বা বিভাগ বর্তমান ছিল। একই জাতিভুক্ত হয়েও নিজেদের বিভিন্ন থাকের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিতে আগ্রহী ছিল না। বিবাহের ব্যাপারে আপন আপন থাকের মধ্যেই তা সম্পন্ন করত। সেদিক থেকে এরা বেশ গোঁড়া ছিল। তাই বলা যায় সামাজিক রীতির ক্ষেত্রে বিবাহের ব্যাপারে এরা পরিপূর্ণভাবেই অন্তর্বিবাহের (Endogamy) পক্ষপাতী ছিল।

দীর্ঘদিন যাদব আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে। সেদিক থেকে বিবাহের ব্যাপারে এরা থাকগত কাঠিন্য অনেক দূরে সরিয়ে দিয়ে একই জাতির মধ্যে পারস্পরিক থাকের মধ্যে বিবাহের প্রচলন শুরু করেছে। ফলে এদের মধ্যে বহির্বিবাহের (Exogamy) প্রচলন শুরু হয়েছে। পরে পরে এদের মধ্যে উচ্চগোষ্ঠী বা বংশেও বিবাহ শুরু হয়েছে (Hypergamy)। ফলে বিবাহের রীতিতে এই জাতি বেশ প্রগতিবাদী (Dynamic) ভূমিকা পালন করছে তাই প্রথম দিকে সগোত্রে বিবাহে আপত্তি থাকলেও এখন তা দূরীভূত হয়েছে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত গোপজাতির বিয়েতেও ৪টি কঞ্চির দ্বারা ছাদনাতলা তৈরি হয়ে থাকলেও এই সম্প্রদায় যে পূর্বে বনে-জঙ্গলে অধিবসতি গড়ে তুলেছিল তার নমুনা হিসাবে এবং তাদের বন্যজীবনের সঙ্গে একীভূত হওয়ার চিহ্নস্বরূপ এখনও অনেকক্ষেত্রে বিবাহ বাসরে এদের অনেকের মধ্যে কঞ্চির বদলে ৪টি সপত্র সালের ডাল পুঁতে ছাদনাতলা নির্মাণের রেওয়াজ দেখা যায়।

এই জাতি যদুবংশ সম্ভূত তাই এরা নিজেদের যাদব ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। তবে গো সেবায় নিযুক্ত থাকায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেকের তুলনায় বেশ অনগ্রসর। বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করে নিয়ে এদের Other Backward Classes বা O.B.C. পর্যায়ভুক্ত করেছে। তার বহু আগে থেকেই এই সম্প্রদায় আপন প্রাচীন ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে স্মরণ করে নিজেদের উন্নতি মানসে যাদব আন্দোলন গড়ে তোলে। তার ফলে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হতে থাকে। সেই যাদব আন্দোলনের ফলেই গোপজাতি যাদবক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচিত হয়ে অনেক ক্ষত্রিয় আচার ও নিয়ম বিধি পালনের সাথে সাথে মৃতের অশৌচ পালনের ক্ষেত্রেও এক মাসের বদলে ১২ দিনে তা সম্পন্ন করতে থাকে এবং অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মতই নানাবিধ শ্মশানকৃত্য সহ দাহ করে মৃতের সৎকার করে থাকে।

গোপজাতি মুখ্যত গোপালক হওয়ায় তাদের পালিত গবাদি পশুর রোগব্যাধি প্রতিরোধের দায়িত্ব এরা নিজেরাই গ্রহণ করেছিল। অন্য কোন সম্প্রদায়কে এই দায়িত্ব তারা ছাড়ে নাই। যারা এই দায়িত্বে ব্রতী হয়েছিল অর্থাৎ গবাদি পশুর চিকিৎসায় রত হয়েছিলেন তারা সমাজে নকুলগোপ নামে পরিচিত ছিল।

পরিশেষে বলি শৌর্য বীর্যে উদ্ভাসিত এই প্রাচীন জাতি দীর্ঘ ষষ্ঠ শতক থেকে একাদশ শতক ও তদুর্দ্ধকাল পর্যন্ত রাঢ়ের আরণ্যক পরিবেশে পরিব্যাপ্ত গোপভূমে দুর্দান্ত প্রতাপে নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজ্য পরিচালনার কাজে সুদৃঢ় অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এই জাতি মুখ্যত ছিল পশুচারক। তাই তাদের পোষ্য জীবজন্তু নিয়ে অনেকখানি বদ্ধ জীবনযাপনে বাধ্য থাকায় তথাকথিত সভ্য সমাজের সঙ্গে তেমন সুসম্পর্ক রাখতে না পারায় অনেকেই তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখতে থাকে। কিন্তু যাদের একাত্ম সেবায়

দেশের অগুনতি শিশু ও অসুস্থেরা প্রাণ পায়— তাদেরই অবজ্ঞা করায় এক অখ্যাত কবির কবিতার একটি পংক্তি মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছেন— "মধু পান করব আমি নিন্দা করব মৌমাছিকে"। সত্যইতো মধু পান করতে গেলে মধুপকে নিন্দা করা চলে না। যাদের অক্লান্ত সেবায় সমাজ পোক্ত হয়, তাদের নিন্দা করার মত মূর্খতা আর কি হতে পারে!

তবে সুখের বিষয় এই যে, এদের মধ্যেও নবজাগরণ দেখা দিয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়ে আর দশজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এরা আর পরান্মুখ নয়। তাই চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে এরা যেমন এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামোয় চাষ আবাদেও এরা সুদৃঢ় হওয়ায় মা লক্ষ্মীর কৃপালাভে বঞ্চিত নয়।

।। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও পত্র পত্রিকা ।।

১) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (অখন্ড) বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-১৯২
২) ঐ ... পৃঃ-৪৩
৩) ঐ .... পৃঃ-৪৩
৪) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (অখন্ড) বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-৪৩
৫) যদুবংশের ইতিহাস— কেশবচন্দ্র ঘোষ। যাদবকেশরী, চৈত্রসংখ্যা, ১৩৮০।.... পৃঃ-৩৯০
৬) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য়) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৯
৭) ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা— ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-৯৮
৮) যাদবকেশরী— অগ্রহায়ণ সংখ্যা— ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।.... পৃঃ-১৪
৯) ভারত ও বাংলার গোপ-আহির-যাদব আন্দোলনের ইতিবৃত্ত (২য়) আশুতোষ ঘোষ।.... পৃঃ-৭২
১০) শ্রীধর্ম্মমঙ্গল— ঘনরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-১৭
১১) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-৪৮
১২) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য়) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-২
১৩) নন্দবংশ প্রদীপ— দুর্গা দত্ত শাস্ত্রী ও ব্রহ্ম পুরাণ দ্রষ্টব্য।
১৪) শ্রীমদ্ভাগবত (দশমস্কন্ধ) মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী সঙ্কলিত (১ম খন্ড).... পৃঃ-৬৮
১৫) পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খন্ড দ্রষ্টব্য।
১৬) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ দ্রষ্টব্য।
১৭) শ্রীশ্রীচন্ডী।
১৮) অমৃতকথা— কৃষ্ণতত্ত্ব ও গীতাসার থেকে, বর্তমান পত্রিকা, ১১ই কার্তিক ১৪০৪।
১৯) ব্যগ্রক্ষত্রিয় পুরাণ— বিহারীলাল শাস্ত্রী ন্যায়ভূষণ।.... পৃঃ-৩৭
২০) বৃহৎ বঙ্গ (১ম খন্ড) দীনেশ চন্দ্র সেন।.... পৃঃ-১৩৭

২১) গৃহীত হয়েছে— ভারত ও বাংলার গোপ-আহির-যাদব আন্দোলনের ইতিবৃত্ত (৩য়) আশুতোষ ঘোষ।.... পৃঃ-৭৮
২২) Asiatic Researches IX VOL. Richardson & Chard. ঐ ... পৃঃ-১৭৭
২৩) ভারত ও বাংলাব গোপ-আহির-যাদব আন্দোলনের ইতিবৃত্ত (২য) আশুতোষ ঘোয।.... পৃঃ-৭১
২৪) Asiatic Researches VOL IX. দ্রষ্টব্য ঐ .... পৃঃ ১৭৭
২৫) আমাদের পদবীর ইতিহাস— লোকেশ্বর বসু।... পৃঃ-৪১
২৬) বিশ্বকোষ (দ্বাদশ খন্ড) লোকশিক্ষা প্রকাশন।... পৃঃ-৮৮
২৭) এই পর্বে যে সব পুস্তক ও পত্রপত্রিকাব সাহায্য নেওযা হয়েছে সেগুলি হল—
ক) ভারত ও বাংলার গোপ-আহির-যাদব আন্দোলনেব ইতিবৃত্ত (৩য়) আশুতোষ ঘোষ।
খ) বাঢেব জাতি ও কৃষ্টি (২য) মানিকলাল সিংহ।
গ) যাদবকেশবীব বেশ কিছু সংখ্যা।
ঘ) যাদব বার্তা— হাওড়া জেলার যাদব সভার মুখপত্র, শারদ সংখ্যা, ১৪ই আশ্বিন, ১৪০৯।
২৮) রাঢেব জাতি ও কৃষ্টি (২য)— মানিকলাল সিংহ।. . পৃঃ-৭

সদ্‌গোপ সম্প্রদায়

গোপভূমে আর একটি উল্লেখযোগ্য জাতিগোষ্ঠী হল সদ্‌গোপ। শুরুতে এই সদ্‌গোপ ও গোপ সম্প্রদায় একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। এই উভয় গোষ্ঠীর মিলিত বাসভূমিই ছিল 'গোপভূম'। সভ্যতার সেই উষালগ্ন থেকেই গোপ সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের পশুপালন ও কৃষি সভ্যতার ধারক ও বাহক।

অরণ্য পরিবৃত বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে অজয় দামোদর নদীবেষ্টিত বিস্তৃত অঞ্চল গোপভূম হিসাবে স্বীকৃত ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই এখানকার অধিবাসীরা বন্য যাযাবরের স্তর থেকে ধীরে ধীরে সভ্যতাকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে উন্নীত করেছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে তারা সেই সভ্যতার রথচক্রকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। পরবর্তীকালে এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সভ্যতার বহুবিধ নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় তা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর গোপ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন শুরু হয়। ফলে এই সম্প্রদায়েরই এক দল চাষ আবাদকে জীবিকা করে স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। ফলে তারা নিজেদের সাবেক গোপ উপাধির পূর্বে

এক 'সদ্' শব্দের সংযোজন কবে নিজেদের 'সদ্গোপ' বলে পরিচিত করল। আর সাবেক গোপ সম্প্রদায়— যাবা গোপালনকেই প্রধান জীবিকা ও তৎসহ চাষ আবাদকে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে নিজেদের গোপ নামেই পরিচয় দিল। এইভাবেই একদিন রাঢ়ের অরণ্যচারী এক দুর্ধর্ষ জাতিগোষ্ঠী দুটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষেব এক উক্তিতে এই গোপজাতির বসতক্ষেত্র হিসাবে গোপভূমের উল্লেখ ও তাদেব এই বিভাজনেব আভাস মেলে। তিনি বলেছেন— প্রাগৈতিহাসিক যুগে বন্য শিকাবীরাই যে এখানে বাস করত, পশু শিকার করত, অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ করে জীবনধারণ কবত, তা কল্পনা করতে আজও এতটুকু কষ্ট হয় না। ... এই বন্য শিকারীরাই পরে পশুপালন করতে শিখেছে এবং চাষবাস করেছে। হয়ত একদল পশুপালন করেছে এবং আর একদল কৃষিকাজে মন দিয়েছে। বর্ধমান জেলার বর্তমান গোপদের আদিপুরুষ তাবাই যারা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রথম পশুপালন করে স্থায়ী উন্নত সভ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছিল। কৃষির পত্তন করেছিল যারা, তারাই বর্তমান সদ্গোপদেব আদিপুরুষ। আর বর্ধমান জেলাব এই অঞ্চলের নাম আজও তো গোপভূম। (১)

অন্যদিকে গোপালনকারী গোপ বা গোয়ালা থেকে সদ্গোপ সম্প্রদায় পৃথক হয়ে এক নতুন জাতি গঠন করেছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে L S S O Mallyর (Bengal District Gazetteers, Bırbhum) থেকে। সেখানে উল্লিখিত হয়েছে— They say that their original name was Gop and their home was Gopbhum The country between Ajai and Damodar, the name of which survives ın the Gopbhum Pargana of Burdwan (২) অন্যত্রও বলা হয়েছে Sadgops are according to Jatimala essentially the same as Gop as. (৩)

তবে জাতি হিসাবে এদের বিভাজন খুব বেশিদিনের নয়। কারণ এই সদ্গোপ জাতি খুব প্রাচীন হলে আমাদের বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে গোপেদের মত এদেরও উল্লেখ থাকত। এ প্রসঙ্গে মহানাদ নামক গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে— "কিন্তু পুরাণ বা হিন্দুগ্রন্থে এই সদ্গোপ জাতির নামগন্ধও পাওয়া যায় না।" (৪) আর জাতি হিসাবে এরা প্রাচীন হলে এদের অধিবসতি ক্ষেত্রও সদ্গোপভূম হতে পারত। যেমন গোপভূমকে অনেক সময় গয়লাভূমও বলা হয় কিন্তু সেরকম কোন স্বীকৃতিও নাই। তাই J.C.K. Peterson তার Bengal District Gazetteers (Burdwan) এ সঠিকই বলেছেন— "The Sadgops are undoubtedly a modern caste. (৫) বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার সভাপতি শরৎচন্দ্র ঘোষ তিনিও তাঁর "সদ্গোপজাতির ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন যে, ৩০০ বছর পূর্বে সদ্গোপ সমাজ আলাদা হয়েছে। (৬)

সেদিক থেকে নবসৃষ্ট এই জাতি সম্প্রদায় সদ্গোপ নামে পরিচিত হবার পর নবশাখ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সম্পর্কে ঐ গেজেটিয়ার্সে আরও বলা হয়েছে—

They distinguish themselves from the goalas. They rank among the Nabasakhs, i.e., the nine clean sudras, from whom the higher castes will take water. (৭) হীতেশ রঞ্জন সান্যাল ও তার Social Mobility in Bengal গ্রন্থে ঐ একই কথাই বলেছেন— "তারা নতুন জাতি ও নতুন সামাজিক মর্যাদা পেলেন সদ্‌গোপ হিসাবে, 'জলচল' সৎশূদ্রস্তরে।"

সদ্‌গোপ হওয়ার পর যদিও এরা নবশাখের অন্যতম হয়ে সৎশূদ্রে পরিণত হল, তবুও এরা নিজেদেরকে অনেক সময় ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস ছাড়ল না। অনেক জাতিই নিজেদের ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াসী। এ প্রসঙ্গে তাদের উৎপত্তির বিষয়ে যে কিংবদন্তী কাহিনী প্রচলিত তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

সেখানে বলা হয়েছে, স্বর্গের গোমাতা সুরভি। তার কন্যা কামধেনু। সেই কামধেনু নন্দিনী নামেও পবিচিত। একদা দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য মহামুনি বশিষ্ঠ তপস্যায় বসেন। তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবতারা তাকে একটি বর দিতে চাইলে তিনি সুবভিকন্যা কামধেনুকে চেয়ে বসেন, ফলে দেবতারা তাকে সেই কামধেনু দান করেন। কল্পতরুব ন্যায় এই কামধেনু বশিষ্ঠের সমস্ত প্রার্থনাই পূরণ করত।

এইভাবে দিন চলতে চলতে একদিন মহারাজ বিশ্বামিত্র সপারিষদ বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে শিকাবে এসে গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ঘুরতে থাকেন। সারাদিন ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে আসন্ন সন্ধ্যায় কোনরকমে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হয়ে আশ্রয় ও আহার্য প্রার্থনা করেন। এত লোকের কি ব্যবস্থা করবেন ভেবে মুনিবর বিপদে পড়েন। বিপদ নিরসনের জন্য মুনিবর কামধেনুর কাছে প্রার্থনা জানালে, কামধেনুই তৎক্ষণাৎ অতিথিদের উপযুক্ত আশ্রয়, বিশ্রাম ও আহার্যের ব্যবস্থা করে দেয়। রাজা এই ব্যবস্থায় খুবই তুষ্ট হন এবং পরদিন সকালে যাত্রাকালে সকল কর্মযজ্ঞের আসল হোতা সেই কামধেনুটিকে চেয়ে বসেন। কিন্তু মুনিবর তা দিতে রাজি না হওয়ায় বিশ্বামিত্র জোর করে তা গ্রহণ করতে চাইলে অসহায় মুনি কামধেনুকে রক্ষার জন্য করুণভাবেই ঐ কামধেনুর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন সেই কামধেনুই মুনির করুণ অবস্থা উপলব্ধি করে তাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি হলে সেই কামধেনুর প্রতি লোম থেকে এক একজন যোদ্ধার আবির্ভাব ঘটে এবং তারা বিশ্বামিত্রের দলবলকে পরাজিত করে, সেই কামধেনুকে রক্ষা করে। (৮) এই পৌরাণিক কাহিনীর প্রেক্ষাপটে সেই কামধেনুর প্রতি লোমকূপ হতে নির্গত যোদ্ধারাই নাকি বঙ্গীয় সদ্‌গোপ জাতির আদিপুরুষ। (৯)

উল্লেখিত গল্পটির ঐতিহাসিক সত্যতা ও প্রামাণিকতা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। তাই সে প্রসঙ্গে না গিয়েও এর মধ্যে যে মূলতত্ত্বটি সন্নিবেশিত রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনায় যাওয়া যেতে পারে। তাই এই গল্পের প্রেক্ষিতেই বলা যায় যে এই গল্পের মধ্য দিয়ে সদ্‌গোপ জাতির সঙ্গে গোসম্পর্কিত সম্পর্কই সূচিত হয় এবং যেহেতু তারা শুরুতেই যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছিল তাই তারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার। কিন্তু বাঙালির

ইতিহাস প্রণেতা প্রখ্যাত গবেষক নীহার রঞ্জন রায় এদের উত্তম সংকর পর্যায়ে ফেলেছেন। (১০)

বাংলার পালযুগের পব সেনযুগ শুরু হলে সেনরাজ বল্লাল সেন তার আমলে (১১৬০-৭৬) সমগ্র বাংলার জাতি গোষ্ঠীকে একটি বিশেষ বিন্যাসের আওতায় নিয়ে আসে। তারই আভাস 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' পাওয়া যায়— যা পরবর্তীকালে সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকে রচিত হয়েছিল। এই বৃহদ্ধর্মপুবাণে অব্রাহ্মণ সমুদয় জাতিকে ৩৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল— যা থেকে লোক-চলতি 'ছত্রিশ জাতেব' কথা শুনা যায়। পরে আরও পাঁচটি জাতি এতে সংযোজিত হয়ে এই সংখ্যা মোট ৪১এ দাঁড়ায়। এই সমুদয় জাতিকে আবার তিনটি সংকর বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে যথা— উত্তম সংকব, মধ্যম সংকর ও অধম সংকর বা অন্ত্যজ। এরা সকলেই মিশ্র জাতি। সেখানে বলা হয়েছে— যাদের পিতা-মাতা উভয়ই চতুর্বর্ণভুক্ত তারা উত্তম সংকর, যাদেব মাতা চতুর্বর্ণভুক্ত কিন্তু পিতা উত্তম সংকর তারা মধ্যম সংকব, আর যাদের পিতা-মাতা উভয়ই সংকর তারা অধম সংকর। সেদিক থেকে সদ্‌গোপরা উত্তম সংকর পর্যায়ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে সদ্‌গোপ কুলতিলক প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক পন্ডিত সদ্যপ্রয়াত ডঃ অতুল সুর বলেছেন— "বাংলার সকল জাতিই সংকর জাতি তবে তাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে যথা উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর ও অন্ত্যজ সংকর। সদ্‌গোপরা উত্তম সংকরভুক্ত পরে মধ্যযুগে এরা নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। (১১)

এই জাতির গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে এসেছে। যেমন শুরুতে যখন তারা কৃষি, গোরক্ষা ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করেছেন তখন তারা বৈশ্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কারণ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন— "কৃষি গৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।" অর্থাৎ কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যেব স্বভাবজাত। (১২) পরে যখন এই জাতি দেশরক্ষা ও রাজকার্য পরিচালনা করেছেন তখন ক্ষত্রিয়ের ভূমিকা পালন করেছেন, পরে সেন আমলে এসে যখন এরা নবশাখভুক্ত হয়েছে তখন শূদ্রের পর্যায়ে এসে গেছে। কারণ নবশাখরা শূদ্রের পর্যায়েই পড়ে। নবশাখ বলতে যে প্রচলিত ছড়া চলে আসছে তা হল—

গোপ নাপিত গোছালি তিলি মালী তাম্বুলী।
কামার কুমার পুঁটুলী— এদের নবশাখ বলি।।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা যাদের হাতে জল গ্রহণ করবে এমন জলচল নয়টি জাতিকেই নবশাখ বলা হয়। এরা হল— গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, তিলি, তাঁতি, তাম্বুলী, মোদক ইত্যাদি। এখানে গোপ অর্থে সদ্‌গোপকেই বোঝায়। তাই এই সম্প্রদায় শূদ্রের পর্যায়ে এসে গেলেও এরা বল্লাল সেনের জাতি বিন্যাসে ও তৎপরবর্তী

বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ঐ জাতীয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও এদের সৎশূদ্র হিসাবে উল্লেখ কবা হয়েছে।

এরা মুখ্যত চাষ আবাদে ব্যাপৃত থাকলেও শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ উন্নত। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন বাজদববারে চাকুরি ও স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ ও অনেক সময় সামন্তরাজ বা ভূম্যধিকাবী হিসাবে নিজেদেব প্রতিষ্ঠিত করায় এই সম্প্রদায় খুবই সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে পরম শ্রদ্ধেয় সাহিত্যরত্ন স্বর্গত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি স্মবণ কবা যেতে পারে। তিনি বলেছেন— "সদ্‌গোপ জাতির একটি গৌরবান্বিত অতীত আছে। বাংলার ইতিহাসেব কযেক পৃষ্ঠা এই জাতির কীর্তি কথায় ভরপুর। অতীতে এই জাতি বৈশ্য বৃত্তিতেই অর্থাৎ কৃষি, গোরক্ষা ও ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারাই শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহ করিতেন না, এই জাতিব অনেকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রাঢ়দেশে এই শৌর্যশালী যোদ্ধাজাতির বহু নিদর্শন আছে।"

এই সদ্‌গোপদেব বৈশ্য বা শূদ্র যাই বলা যাক না কেন— এরা যে এক সময় নিজেদের ক্ষত্রিয়েব ভূমিকায প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং একদা রাঢ়বঙ্গের বিস্তৃত গোপভূম অঞ্চলে এবং সমগ্র বাঢবঙ্গের বহু ক্ষেত্রেই সামন্ত রাজা হিসাবে এরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল ইতিহাসে তার বহু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত প্রখ্যাত সংস্কৃতিবিদ বিনয় ঘোষের বক্তব্যকে স্মরণ করে বলা যায়— "যাই হোক এরকম একাধিক সদ্‌গোপ রাজবংশ রাঢ়দেশে ছিলেন এবং তাঁবা দূরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। বর্ধমান জেলার গোপভূম পরগনা সদ্‌গোপ রাজ্যের অতীত স্মৃতি আজও বহন করছে। ... বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নয় শুধু, সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও যে সদ্‌গোপদের যথেষ্ট মূল্যবান দান আছে তা তাঁদের ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা থেকে আজও পরিষ্কার বোঝা যায়।" (১৩)

এই সদ্‌গোপ গোষ্ঠী প্রধানত চাষ আবাদে নিযুক্ত থেকে কৃষিভিত্তিক বঙ্গীয় সংস্কৃতি রূপায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এরা বেশ উন্নত। বিভিন্ন রাজদরবারে সৈনিকের কাজ, এমনকি রাজ্য পরিচালনার কাজেও বিশেষ দক্ষ ছিল। বিশেষ করে গোপভূম এলাকায় অতীতে এরা শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়ে নিজেরাই বহু জায়গায় রাজকার্য ও রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন। সদ্‌গোপ জাতি কায়স্থ জাতি অপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যাতে কোন অংশে হীন ছিলেন না। (১৪)

এই সদ্‌গোপ সম্প্রদায় গোপভূমের বেশ কিছু জায়গায় সামন্ত রাজা হিসাবে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিল। সেই সব স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল— সুয়াতা-ভাল্কী, অমরার গড়, মানকর, কাঁকসা, ভরতপুর, দিগনগর, মৌখিরা-কালিকাপুর, রাজগড়, মঙ্গলকোট ইত্যাদি। ঐ সকল স্থানে তারা বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গেই রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন। রাজত্ব পরিচালনার কালে তারা আপন আপন রাজ্যকে গড় পরিখা

ইত্যাদি নির্মাণ করে বেশ সুদৃঢ় করেছিলেন। অনেকেই সুন্দর মন্দিরাদিসহ আপন আপন কুলদেবতাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শিবাখ্যা নামক কুলদেবীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অমরার গড়ের প্রখ্যাত সদ্‌গোপ রাজা মহেন্দ্র। প্রমাণ হিসাবে তাঁর প্রণাম মন্ত্রে এখনও উচ্চারিত হয়—

রাঢ়ে চামরার গড়ে সদ্‌গোপ রাজ পূজিতে।
শিবাখ্যামীষ্ট দেবতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ।।
মহেন্দ্রেশ প্রতিষ্ঠিতং শিবাখ্যাং বরদাং দেবীং।
ধর্মার্থকাম মোক্ষায় তং নমামি মহেশ্বরীম্‌।।

দিগনগরে এক বিশাল বটবৃক্ষতলে একই মন্দিরে, এখানকার রাজপরিবার 'রায়' বংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের কুলদেবতা চতুর্ভুজা ও অখিলেশ্বরী দেবী। রায়েরাই এখানকার রাজা ছিলেন, সম্ভবত এরা অমরার গড়ের রাজা মহেন্দ্রর বংশধর। 'রায়' শব্দটি সংস্কৃত 'রাজ' শব্দ থেকেই এসেছে।

অন্যদিকে কাঁকসায় কঙ্কেশ্বর শিব যে সদ্‌গোপ রাজবংশেরই প্রতিষ্ঠিত তারও প্রমাণ ঐ শিবের প্রণাম মন্ত্রেই পাওয়া যায়। যেমন—

কঙ্কেশ্বরং মহাদেবম্‌ অনাদি লিঙ্গ রূপিনং।
সভৈরবং কাঁকসা সদ্‌গোপ রাজ কুলদেবম্‌।।
কাঁকসা গ্রামেহধিষ্ঠিতাং ভবসাগর তারকং
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরুং প্রণমামি বারংবারম্‌।। (১৫)

এছাড়াও গোপভূমের দেবশালা বা রাজগড়ে ও মঙ্গলকোটেও গোপ রাজাদের নির্মিত দুর্গ বা গড়সহ অন্যান্য বহু পুরাকীর্তির লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এইভাবে তারা গোপভূমের বহু স্থানেই আপন আপন আধিপত্য ও কৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়েও গোপভূমের বাইরেও বঙ্গের বহু জেলাতেই নিজেদের আধিপত্য ও রাজ্যের বিস্তার সাধন করে নিজস্ব কৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিল। সেই সকল স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল— হুগলী জেলার গোঘাট, মহানাদ, বাঁকুড়ার মল্লভূমের বহু স্থানে, পাত্রসায়েরের কাছাকাছি হদলনারায়ণপুর, বীরভূমের কির্ণাহার, সিউড়, মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়, কর্ণগড়, মুকসুদপুর ইত্যাদি। তারা রাজ্য পরিচালনার সাথে সাথে সর্বত্রই শিক্ষাদীক্ষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিস্তার কল্পে বহুবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দীর্ঘিকা খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা ও দেবকীর্তি স্থাপন করেছিলেন।

তা করেছিলেন সত্য তবে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হওয়া সদ্‌গোপেরা অধিকাংশই গোপভূমের উল্লেখ্য গ্রামগুলি থেকেই অন্যত্র সম্প্রসারিত হয়েছিল। তার কারণ গোপভূমের সদ্‌গোপেরা যখন পশুপালনবৃত্তি পরিত্যাগ করে চাষ আবাদে ব্রতী হল তখন গোপ সম্প্রদায় থেকে নিজেদের পৃথক জাতিতে পরিণত করল তখন তারা

গোপেদের তুলনায় অনেকখানি মুক্ত জীবনের স্বাদ পেল। ফলে তাদের পক্ষে জীবন জীবিকার সন্ধানে স্বচ্ছন্দে বাইরে বেড়িয়ে পড়া সম্ভব হয়েছিল। তাই তারা গোপেদের তুলনায় অধিক সংখ্যায় অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তা পড়লেও তারা যে এখানকার লোক এবং এখান থেকেই যাওয়া তার প্রমাণ হিসাবে তাদের সৃষ্ট বংশগুলিই পরে "ভাল্কীর খোঁচ, দিগনগরের খোঁচ, কাঁকসার খোঁচ বলে পরিচিত হয়।" (১৬)

এতক্ষণ গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজাদের রাজ্যবিস্তার ও তাদের ঐতিহ্য, পুরাকীর্তি ও কৃষ্টির কথায় ছিলাম। এখন জাতি হিসাবে সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের বিভাজন ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথায় আসা যাক।

সদ্‌গোপ জাতিকে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— (১) মৌলিক ও (২) কুলীন। কুলীনরা আবার দুটি ভাগে বিভক্ত যেমন— পূর্ব কুলীয় ও পশ্চিম কুলীয়, মতান্তরে উত্তর কুলীয়। (১৭) ঐ বিভাগে বিভক্ত হয়ে সদ্‌গোপ জাতি চলতে থাকার পরে গোপভূমের প্রখ্যাত সদ্‌গোপ রাজা মহেন্দ্র তিনি তাদের কৌলীন্য ব্যবস্থাকে কিছু সংশোধিত করেন।

তিনি নিজেদের ঘরকে প্রথম ঘর কুলীন হিসাবে ভালকী কুলীন বলে পরিচিত করেন। এদের কুলদেবী শিবাখ্যা এখনও অমরার গড়ে পূজিত হচ্ছেন। তিনি তার বড় জামাই শুরগড়রাজা শিবাদিত্যের ঘরকে ২য় ঘর কুলীন হিসাবে 'শিউড়' আখ্যা দেন। এদের কুলদেবী রামেশ্বরী (দশভূজা)। শিবাদিত্যের প্রথমা মহিষী মহেন্দ্র কন্যা যমুনার সন্তানেরা 'সিংহরায়' এবং ২য় মহিষীর সন্তানেরা 'কুঙর' বা কুমার উপাধিতে ভূষিত হয়। কনিষ্ঠ জামাতা কাঁকসার প্রতাপাদিত্যের ঘর তৃতীয় ঘর কুলীন নামে খ্যাত হয় এবং তারা 'কাঁকসা' আখ্যা পান। এদের কুলদেবতা কঙ্কেশ্বর মহাদেব। এই তিন ঘর কুলীনের গোত্র কাশ্যপ। এদের সঙ্গে কন্যা আদান প্রদানের জন্য আরও পাঁচটি সমাজঘর কুলীন স্থাপিত হয়। তারা হলেন যথাক্রমে (১) ওড়ম্বর (২) ঘটম্বর (৩) প্রতিহার ও কির্ণাহার (৪) বৈঁচি (৫) শিশুনাগ বা শুশনে। ওড়ম্বরের গোত্র কাশ্যপ, এদের কুলদেবী ত্রৈলোক্যতারিণী (দশভূজা)। ঘটম্বরের গোত্র শাণ্ডিল্য— কুলদেবী কালীমা। প্রতিহারের গোত্র কাশ্যপ— কুলদেবতা কেলে সোনা। কির্ণাহারের গোত্র আলিমান— কুলদেবী কালীমা। বৈঁচির গোত্র মৌদ্‌গল্য, কুলদেবী অভয়া এবং শিশুনাগ বা শুশনের গোত্র ও মৌদ্‌গল্য— কুলদেবী তারাখ্যা।

এতক্ষণ এই সম্প্রদায়ের কৌলীন্য প্রথার বিষয়ে কথা হল। এখন এদের নিজস্ব পদ পদবী গোত্রের সঙ্গে সম্ভবমত টোটেম ট্যাবু বা পারিবারিক নিষেধাদির উল্লেখ করতে চাই।

পদবী	গোত্র	টোটেম/পারিবারিক নিষেধ
ঘোষ	কাশ্যপ	কচ্ছপ খায় না
রায়	,,	ভাল্লুক পালন করতে চায়, মারে না
মন্ডল	,,	কচ্ছপ খায় না
পাল	,,	,,
সামন্ত	,,	,,
বক্সী	,,	,,
কোঙার	,,	,,
নিয়োগী	,,	,,
শূর	,,	,,
কোলে	,,	,,
হাজরা	ষাণ্ডিল্য	ষাঁড় বোয়ায না ও সাঞ্চাশা খায় না।
মণ্ডল	,,	,,
ভুঁই	,,	,,
সাহানা	,,	,,
রায়	,,	,,
নিয়োগী	,,	,,
ঘোষ	,,	,,
পাল	,,	,,
পান	,,	,,
বেজ	,,	,,
মল্লিক	,,	,,
সিংহ	,,	,,
পাত্র	,,	,,
সামুই	,,	,,
শূর	,,	,,
পাঞ্জা	পলাশ	পলাশ ফুল ছিঁড়ে না
মণ্ডল	অলকঋষি	আড় মাছ খায় না
ভুঁই	মৌদ্গল্য	মৌচাক ভাঙে না, মধু খায় না
মণ্ডল	বামঋষি	বান মাছ খায় না
বারিক	নাগ	সাপ মারে না
ভুঁইয়া	বাৎস্য	আড় মাছ খায় না। [১৮]

এগুলি ছাড়াও আরও অনেক পদবী এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে তবে সেগুলি ব্যাপক ব্যবহৃত হয় না অনেকখানি বিরল ধরণের। যেমন— বালা, খাঁড়া, মহাপাত্র, সাঁতরা, ঘোষাল, খান, বেরা, দুয়ারী, জানা, মাইতি, পাঁজা, সরকার, চৌধুরী, বিশ্বাস, দিগপতি, সিকদার, বজর, মাজি, খরুই, চরণ, নেজ, মালস, মাল ইত্যাদি।

এখন জানাই এই সদ্গোপ সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে আপন আপন থাক বা বিভাগগুলি কঠোরভাবে মেনে চলত। ছেলেমেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক সম্প্রদায় মৌলিক ঘরই পছন্দ করত। আর কুলীনরা কুলীন ঘরেই ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিত। তারা পারতপক্ষে অন্য ঘরে যেত না। সেদিক থেকে এরা কড়াকড়িভাবেই সমগোত্রীয় (Endogamous) বিবাহের অনুরাগী ছিল। তাই পরিবর্তনশীল জগতের ছায়া পরে পরে তাদের মধ্যে শৈথিল্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করলেও প্রথম প্রথম কুলীন ঘরের পাত্র, মৌলিক ঘরে গেলেও কৌলিন্যের দাবি হিসাবে বিশেষ কিছু বরপণ দাবি করত। কিন্তু বর্তমানে সেই কাঠিন্য দূরীভূত হয়েছে। তার ফলে এই সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে থাকগত বিভেদ পরিত্যাগ করে কুলীন অকুলীনের বেড়া টপকে নিজেদের মধ্যে অসবর্ণ (Exogamous) বিবাহের প্রচলন শুরু করেছে।

অন্যদিকে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতাশৌচে এক মাস অশৌচ পালনের বিধি ছিল কিন্তু সেখানেও পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। ফলে এক মাসের সময় সীমা বহুক্ষেত্রেই সঙ্কুচিত হয়ে ১২ বা ১৫ দিনে দাঁড়িয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নত এই সম্প্রদায়ের অনেকেই আজ কাজের তাগিদে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে দীর্ঘ এক মাস কাল বাড়িতে বসে কাল অশৌচ পালন অনেকের পক্ষেই সম্ভব না হওয়ায় পুরাতন রীতি আজ পরিবর্তিত হয়েছে।

পরিশেষে বলি একদা রাঢ়-বঙ্গের গোপভূমে কৃষিকেন্দ্রিক সদ্গোপ সম্প্রদায়ের প্রাণঢালা ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই অরণ্যঘেরা ঊষর গৈরিক কাঁকুড়ে মাটির বিস্তৃত অংশই সবুজ ও শ্যামলে রূপান্তরিত হয়েছিল— আর সেই রূপান্তরিত সবুজ শ্যামল প্রকৃতিকেই তারা পরিবর্তিত করেছিল ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে।

।। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও পত্র পত্রিকা ।।

১) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (অখন্ড) বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-১৯২
২) Bengal District Gazetteers (Birbhum) L.S.S.O. Malley. Page-35
৩) The caste system in Bengal — S. N. Gupta. Page-85
৪) মহানাদ/বাংলার গুপ্ত ইতিহাস— প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৩৩৬
৫) Bengal District Gazetteers (Burdwan) J.C.K. Peterson. Page-82
৬) সদ্গোপ জাতির ইতিহাস— শরৎ চন্দ্র ঘোষ।

৭) Bengal District Gazetteers (Birbhum) L.S.S.O. Malley. Page-35
৮) পৌরাণিক অভিধান— সুধীর চন্দ্র সরকার।.... পৃঃ-৩২৭
৯) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য়) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৩৪
১০) বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-২৪৬
১১) ভাবতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয— ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-১৮৩
১২) শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা— ১৮/৪৪
১৩) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয ঘোষ।.... পৃঃ-২০৯
১৪) মহানাদ/বাংলাব গুপ্ত ইতিহাস— প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।.. পৃঃ-৩৩৬
১৫) বঙ্গীয় সদ্‌গোপ সভা (দুর্গাপুর) পত্রিকায় শ্রী গোস্বামী দাস বায়ের লেখা প্রবন্ধ থেকে ধ্যান মন্ত্র ২টি গৃহীত।
১৬) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।.... পৃঃ-২০৬
১৭) ভারতীয় জাতি বর্ণপ্রথা— ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-২৮৬
১৮) রাঢ়েব জাতি ও কৃষ্টি (২) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৩৭

শিল্পজীবী সম্প্রদায়

শিল্পজীবী সম্প্রদায় সমূহের উৎপত্তি এবং গোপভূমে তাদের বিস্তার—

বঙ্গে বেশ কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে যারা শিল্প সৃষ্টিতে বা শিল্প শৌকর্যে বেশ পারদর্শী— তাই এদেব শিল্পজীবী সম্প্রদায়ও বলা হয়। যেমন— কুম্ভকার, কর্মকার, কাংসকার, শঙ্খকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায় ইত্যাদি।

এই জাতিগোষ্ঠীগুলি উদ্ভবের ব্যাপারে আমাদের অনেক পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যেমন— বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, স্কন্ধ পুরাণ ইত্যাদিতে এদের দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— স্কন্ধ পুরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাগর খন্ডে বিশ্বকর্মার কুলচন্দ্রিকায় বলা হয়েছে—

দারুকারঃ স্বর্ণকারঃ শিলাকারস্তথৈবচঃ।
অয়স্কারঃ তাম্রকারঃ পঞ্চৈতে রথকারকঃ।।
বিশ্বকর্মা সুতাহ্যেত রথকারস্তপঞ্চচ।।— এর অর্থ করলে যা দাঁড়ায় তা হল বিশ্বকর্মার পঞ্চ সন্তানের বংশধরগণ— লৌহকার, তাম্রকার, শিলাকার ও সুবর্ণকার— এই পাঁচ শ্রেণীই রথকার পদবাচ্য।

এখন শাস্ত্রকার ঐ বক্তব্য যে সঠিক তা মেনে নেওয়ার যে বহুবিধ অসুবিধা আছে তা আলোচনা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় মানুষকে সরাসরি দেব সন্তান এই কল্পনাটাই বেশ কষ্টকর কল্পনা বলেই মনে হয়। এর মধ্যে অন্য উদ্দেশ্য নিহিত আছে। ধরা যেতে পারে এতে আর্যেতর কিছু জাতিগোষ্ঠীকে আর্যীকরণ করার

হীন চক্রান্তই এতে কার্যকরী হয়েছে, আর সেই আর্যীকরণ করতে গিয়েই আর্য দেবতাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক টানাটাই তারা শ্রেয় মনে করেছেন। কারণ একমাত্র এর দ্বারাই তাদের উদ্দেশ্য অতি সহজেই সিদ্ধ হতে পারে। কাজেই তাদের সেই প্রচেষ্টাও গ্রহণীয় নয়। তাছাড়া ঐ সকল জাতিগোষ্ঠীদের উৎপত্তি সম্পর্কে আর্য ঋষিরা যেটা বলতে চেয়েছেন যে তারা একই সময়ে উৎপন্ন হয়েছিল তাও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ আমরা জানি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পরিবর্তনশীল জগতে সকল শিল্পগোষ্ঠী একই সময়ে উৎপন্ন না হয়ে যুগের প্রয়োজনে তারা পরে পরে আবির্ভূত হয়েছে এটাই পরীক্ষিত সত্য। তাই শাস্ত্রীয় প্রবচনকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেই ঐতিহাসিক নিরিখে এই সকল জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব-ইতিহাস পর্যালোচনা করাই শ্রেয়।

ক্রমানুসারী আগমন— শিল্পগোষ্ঠী জাতিসমূহের মধ্যে সবথেকে প্রাচীনত্বের দাবীদার হল তাম্রকারেবা। এদের আবির্ভাব হয়েছিল সেই তাম্রাশ্মীয় যুগে— যা খ্রিষ্টজন্মের প্রায দেড় হাজার বছর আগেকার কথা। তখন সেই যুগকেই বলা হত তাম্রাশ্মীয় যুগ। এই যুগে আর এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল তারা হল মৃৎশিল্পী যাদের বংশধরেরা পরবর্তীকালে কুম্ভকাররূপেই পরিচিত হয়েছিল।

তার বহু পরে খ্রিষ্টজন্মের এক হাজার বছর পূর্বের সময়কালে এলো লৌহযুগ। তখনই আবির্ভূত হয়েছিল আয়স্কার সম্প্রদায় বা লৌহদ্রব্য প্রস্তুতকারক জাতিগোষ্ঠী। এই দুই সম্প্রদায়ের পরেই কৃষিকার্য শুরু হয়ে গেলে আবির্ভূত হয়েছিল আর এক শিল্পগোষ্ঠী সম্প্রদায়— যারা বস্ত্র বয়নে পাবদর্শী ছিল— পরবর্তীকালে যাদের তন্তুবায় বলা হয়েছে। এদের পরেই আবির্ভাব ঘটেছিল সেই সম্প্রদায়ের যাদের শাস্ত্রকাররা শিলাকার বলেছেন। তবে এই শিলাকার বলতে যদি প্রস্তর মূর্তি নির্মাতা বা ভাস্কর শিল্পীদের বোঝায় তবে তাদের সময়কাল হল— ঐতিহাসিক যুগের প্রথমদিকে গুপ্তপর্বে। কারণ গুপ্ত ও পাল যুগে ও পরবর্তীকালে সেনযুগেও বঙ্গে প্রস্তর খোদাই বা মূর্তিশিল্পের ব্যাপকতা দেখা গিয়েছিল। আর সবশেষে প্রাক-আধুনিক পর্বে, পাল সেন যুগের সময়কালেই আবির্ভূত হয়েছিল স্বর্ণশিল্পী গোষ্ঠীর।

তাম্রকার— স্কন্ধ পুরাণে তাম্রকারের উল্লেখ থাকলেও বঙ্গে তাম্রকার বলে কোন বিশেষ জাতির অস্তিত্ব নাই। তবে অতি প্রাচীন সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এদেশে তাম্রের বহু দ্রব্যসামগ্রী ও অলংকারাদি নির্মিত হয়েছে— তার প্রমাণ তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন হিসাবে আমাদের গোপভূমেই অজয় দামোদর কুনুর কোপাই নদীর তীরবর্তী বহু প্রত্নক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। অর্থাৎ কোন এক সম্প্রদায় যে ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করত তার প্রমাণ অকাট্য। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে যে, যখন সেই তাম্রাশ্মীয় যুগে স্থানীয় খনিজ দ্রব্য হিসাবে তাম্রের প্রাচুর্য থাকায়,

প্রাচীন মানুষ তা থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করত। কিন্তু তখন তো সমাজ বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতি নিয়ে গঠিত হয়নি। তাই জাতি বর্ণের কোন ব্যাপারই তখন ছিল না। তাই তাম্রকার হিসাবে কোন বিশেষ জাতি ছিল না।

পরবর্তীকালে লৌহযুগে লোহার ব্যবহার জানার পর তার অনুশীলনে বহুদিন পার হয়ে যাওয়ার পরে, ধীরে ধীরে যখন মানুষ ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করল এবং তারও পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় প্রভাবে এসে জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি হলে লৌহের কারবারী হিসাবে সৃষ্টি হল লোহার জাতি— যারা প্রধানত লৌহদ্রব্যই তৈরি করত তবে অল্প স্বল্প তামার দ্রব্যও নির্মাণ করত। ফলে বঙ্গে তাম্রকার হিসাবে বিশেষ কোন জাতির উদ্ভব হয়নি। তবে বিহারের রাঁচি জেলার তামার অঞ্চলে কিছু জাতিগোষ্ঠী আছে যারা তামার জিনিসপত্র নির্মাণ করে, কিন্তু বঙ্গে তাদের কোন অস্তিত্ব নাই। তাই তাম্রকারদের কথায় না গিয়ে কর্মকার প্রসঙ্গেই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

লোহার— জাতিগোষ্ঠী হিসাবে কর্মকার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে, রাঢ়ে আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত লোহাকে স্থানীয় পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করে— তা থেকে নানা ধরণের লৌহদ্রব্য তৈরি করার কাজে নিযুক্ত এক প্রাচীন বা আদিম জাতির কথা বলতে হয়। সেই জাতি হল লোহার। এই জাতি লোহাকে কেন্দ্র করে আপন জীবন জীবিকা নির্বাহ করত, অর্থাৎ লোহার সঙ্গেই তারা ওতপ্রোতভাবেই জড়িত ছিল তাই তাদেরকে লোহার বলা হত। এই লোহারদের তৈরি বহু দ্রব্যসামগ্রী— বিশেষ করে কুড়াল, কাটারি, শাবল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগেও তা বহুক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে।

এই লোহার সম্প্রদায় অতি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী। এদের মধ্যেও কয়েকটি থাক বা উপবিভাগ লক্ষ্য করা যায়, যেমন— কাঁসাইকূলা, তেঁতুলিয়া, সিংহাজারী ও আঙ্গারা। এদের বিবাহ আদি পূর্বে আপন আপন গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারা সাধারণত ১২ দিনেই মৃতাশৌচ পালন করত। এদের বসতি ছিল— বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় বঙ্গে যেমন— মানভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মল্লভূম ও মেদিনীপুরে। এরা উৎকৃষ্ট ইস্পাত নির্মাণেও খুবই পারদর্শী ছিল। তাদের তৈরি ইস্পাত ও লোহা দিয়েই মল্লভূমের বিখ্যাত দলমাদল ইত্যাদি বহু কামান স্থানীয় কর্মকারেরা নির্মাণ করেছিল। তারা মুখ্যত লৌহ নিষ্কাশনে পোক্ত ছিল তবে লৌহ দ্রব্যও নির্মাণ করত। তাই তাদের বর্তমান কর্মকারদের পূর্বসূরীও বলা যেতে পারে। অন্যদিকে প্রখ্যাত গবেষক মানিকলাল সিংহ মহাশয় বলেছেন— "লৌহশিল্পীদের লোহার জাতি যত প্রাচীন তাহার নবসংস্করণ কামার জাতি তত প্রাচীন নয়।" [১] কিন্তু বর্তমানে এই লোহার জাতি তাদের সেই পূর্ব গৌরব হারিয়েছে, হারিয়েছে তাদের সেই বিশেষ দক্ষতা ও আসুরিক ক্ষমতা আর ভুলেছে তাদের বংশগত অধিত বিদ্যা— তাই তারা এখন দক্ষিণ রাঢ়ে অবস্থিত এক

অনুন্নত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে চাষ আবাদের হত-দরিদ্র ক্ষেতমজুর, কোথাও বা পথঘাট নির্মাণের নগণ্য কুলি হিসাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে।

কর্মকার— রাঢ়েব কর্মকার সম্প্রদায়ের সৃষ্টির ব্যাপারে শুরুতেই কিংবদন্তীব কুহক থেকে একটি রূপকাশ্রয়ী পৌবাণিক গল্পের অবতারণা করে, বাঁকুড়া জেলার অন্যতম কৃতী সন্তান, রাষ্ট্রীয় পুবস্কারপ্রাপ্ত, নৃতাত্ত্বিক ও গবেষক ডঃ মানিকলাল সিংহ তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি' [২] তে উল্লেখ করেছেন যে, একদা অশুভ শক্তির অধিকারী ত্রিলোক-ত্রাস দুর্দান্ত প্রতাপ লোহাসুব, যখন স্বর্গ মর্ত্য পাতালের লোককে অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত করেছিল— তখন দেবকুল তার হাত থেকে বাঁচার জন্য সমবেতভাবে দেবাদিদেব মহাদেবের স্মরণাপন্ন হলে, আশুতোষ শিব নিজের দুই বাহু থেকে অষ্টালই ও বীরালই নামে অমৃততেজা দুই পুরুষের সৃষ্টি করলেন। এরাই শিব নির্দেশে মহাদেবের মাথাটিকে নেহাই (লোহা ঠোকার যন্ত্র) হিসাবে ব্যবহার কবে--- মহাদেবের তৃতীয় নয়নের অগ্নি— যাতে করে তিনি একবার কামদেব মদনকে ভস্ম করেছিলেন— সেই আগুনে অসুর-রূপী কঠিন লোহাকে গলিয়ে তাতে একজন বালি আর অন্যজন মুগুরের ঘায়ে পিটিয়ে লোহাসুরকে হত্যা করে। এইভাবেই যে দু'জনের কঠিন আঘাতে দুর্বিনীত ধাতু লোহাকে বশে এনে তৈরি করা শুরু হল নানান প্রয়োজনীয় লৌহদ্রব্য— তারাই হল কর্মকার সম্প্রদায়ের দুই আদিপুরুষ। তাই সেই আদি পুরুষদ্বয়ের নাম অনুযায়ী কর্মকার সম্প্রদায় প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন— (১) অষ্টালই কর্মকার (২) বীরালই কর্মকার। পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে আরও কয়েকটি বিভাগ সংযুক্ত হয়েছে, যেমন— রানা কর্মকার, ঢেকরা কর্মকার।

বঙ্গে অন্যান্য জাতির ন্যায় কর্মকারও সংকর জাতি তাতে সন্দেহ নাই। এদের উৎপত্তির প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বলা হয়েছে এরা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও অপ্সরা ঘৃতাচীর সন্তান। অন্যদিকে বলা হয়েছে, শূদ্র পিতা ও বৈশ্য মাতা— মতান্তরে শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান। শাস্ত্রকাররাও এক মত নয়। সংকরায়নের দিক থেকে এদের কখনও উত্তম সংকর কখনও বা মধ্যম সংকর পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এদের সৎশূদ্রের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। পরিশেষে জলচল জাত হিসাবে এদের নবশাখ পর্যায়েও ফেলা হয়েছে। এই নবশাখ পর্যায়ে রয়েছে আরও কয়েকটি শিল্পজীবী জাতি যেমন কাংসকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, শঙ্খকার, চিত্রকার, মালাকার, সূত্রধর ও তন্তুবায় ইত্যাদি।

এখন শাস্ত্রীয় বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এই জাতিগোষ্ঠীকে শিল্পজীবী সম্প্রদায় হিসাবেই দেখব। সেদিক থেকে এদের আবির্ভাবকাল খুব বেশি প্রাচীন নয়, তবে ঐতিহাসিক যুগে যে এদের আবির্ভাব হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। তবে তখনকার সমাজে এদের তেমন বিশেষ ভূমিকা ছিল না। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক হতেই প্রাচীন বাংলা

সমাজ কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে। কৃষিই তখন ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় হয়ে ওঠে ফলে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য ধনোৎপাদনের প্রধান ও প্রথম উপায় আর থাকে নাই এবং সেইজন্যই রাষ্ট্র ও সমাজে ইহাদের প্রাধান্যও আর থাকে নাই। (৩) তবে কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণে এরা সহায়ক ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

এখন রাঢ় বঙ্গে এই সম্প্রদায়ের পদবী গোত্র ও টোটেম নিয়ে আলোচনা করা যাক। পদবীর ক্ষেত্রে দে, দাস, প্রামাণিক, পাত্র, কাঁসারি, রানা— এরা কাশ্যপ গোত্রীয় এবং টোটেম হিসাবে এরা কেউ কচ্ছপ খায় না। কামিল্যা, শিকারী, নাগ, দাস, হালদার, দে, পাল— এরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এবং টোটেম হিসাবে এরা কেউ শাল মাছ খায় না। কর্মকার, ডাব, কবিরাজ— এদের গোত্র গৌতম— এরা কেউ গুঁতে মাছ খায় না। কাইতি, দাস, দত্ত উপাধির কিছু কর্মকারের গোত্র হল সিন্ধু ঋষি। এরা কেউ সিঙ্গেল মাছ খায় না। মৌদগল্য গোত্রধারী দাস, দে পদবীর কর্মকারেরা মৌচাক ভাঙে না। দত্ত, চন্দ্র উপাধির মধ্যে গোত্র রয়েছে কৃষ্ণঋষি— এদের কোন টোটেম নিষেধ নাই। উল্লেখ্য পদবীগুলি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা বাদশাদের দেওয়া বহু পদবীও আছে। যেমন— মজুমদার, রায়, বিশ্বাস, চৌধুরী, হালদার খাঁ, মল্লিক ইত্যাদি।

লোহাকে গলিয়ে তা থেকে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী যারা তৈরি করত তাদেরকেই বলা হত লোহার। সেদিক থেকে লোহাররাই হল কর্মকারদের আদিপুরুষ। বর্তমান কর্মকাররাও লোহাকে উপজীব্য ধাতু হিসাবে ব্যবহার করেই তা থেকে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে থাকে। বঙ্গে প্রধানত দুই শ্রেণীর কর্মকার রয়েছে যেমন— অষ্টালই ও বীরালই। এরা উভয়েই লোহা থেকেই সমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে থাকে। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে এই কর্মকারদের মধ্যেই অনেকেই কর্মকার হওয়া সত্ত্বেও লোহা ছাড়া অন্য ধাতু যেমন কাঁসা, পিতল গালিয়ে তা থেকে জিনিষপত্র তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে— তাদের কর্মকার হওয়া সত্ত্বেও কাংসকার বলা হয়। অন্যদিকে অনেকেই আবার সোনা রূপার দ্রব্য তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে তাই তাদের স্বর্ণকার বা স্বর্ণশিল্পীও বলা হয়। সেদিক থেকে কর্মকাররা কেবল লোহাকেই জীবিকার একমাত্র উপজীব্য ধাতু হিসাবে আঁকড়ে না ধরে বর্তমানে তাদের জীবিকার পরিধি আরও বাড়িয়ে নিয়ে কাঁসা-পিতল ও সোনা-রূপাকেও উপজীব্য ধাতু হিসাবে গ্রহণ করেছে।

পূর্বে উল্লেখিত কর্মকার সম্প্রদায়ের চার গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে অষ্টালই কর্মকাররাই অনেকেই পিতল কাঁসা, ভরণ, জার্মান সিলভার ইত্যাদি বহুবিধ ধাতব দ্রব্য থেকে নানান জিনিষপত্র তৈরি করে থাকেন। তবে তাদের এই কাজ করতে গিয়ে ঐ সকল মূল্যবান ধাতু ক্রয় করতে হয় যা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সাধ্যের বাইরে হয়ে যায়— তখন বাধ্য হয়ে তাদের মহাজনদের শরণাপন্ন হতে হয়। ফলে মহাজনরাও

সুযোগ বুঝে তাদের নিজেদের প্রয়োজনমত সামগ্রী তাদের দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়ে তাদেরকে বানি বা কাজের পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে ফলে এই শ্রেণীব কর্মকারেরা অনেকেই মহাজন নির্ভর হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে বিরালই কর্মকার গোষ্ঠী এক এক গ্রামে বহু সংখ্যায় বসতি না করে দু'চার ঘর মিলে বসতি করে, কারণ কর্মের অভাব হয়ে পড়াব ভযেই তাদের এই কাজ করতে হয়। এরা গ্রামে বসতি করে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন— কোদাল, কুড়ুল, কাস্তে, বঁটি, ফাল, লাঙ্গল ইত্যাদি কৃষি দ্রব্যসামগ্রী বংশানুক্রমিক যজমানি ব্যবস্থায় তৈরি করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে।

এখন রানা কর্মকারদের কথায় আসা যাক। শুরুতে এরা বিহার থেকে বাঁকুড়ার মল্লভূমে বসতি গড়েছিল, পরে পরে তারা বঙ্গের বিভিন্ন স্থানেই ছড়িয়ে পড়ে। সেই রানা কর্মকাররাও প্রথমে পিতলের আংটি, পায়ের আঙ্গুলে পড়ার আংটি— যাকে আংগট বলা হত এবং হার, কঙ্কণ, নূপুর ইত্যাদি নানান সূক্ষ্ম শিল্প দ্রব্য ছাড়াও সৌন্দর্যময় নাবীমুখের আদলে তৈরি পানের ডিবা. পরীর মূর্তিসহ হুকা রাখাব স্ট্যান্ড, নানান জীবজন্তুর আকারে বা মুখাবয়বে তৈরি অলংকার রাখার বাক্স ইত্যাদি শৌখিন ধাতব দ্রব্য তৈবি করত।

চতুর্থ পর্যায়ে ঢেকরা কামারদের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এরাও মূলতঃ ভিন প্রদেশ থেকে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য মুখ্যত 'লষ্ট ওয়াকস' পদ্ধতি অর্থাৎ দাহ্য পদার্থের মূর্তি তৈরি করে তাকে মাটির ঠোলে পুরে আগুনে পুড়িয়ে তাপ দিয়ে সেই পদার্থ বের করে দিয়ে সেখানে পিতল গালিয়ে ঢোকান হয় এবং পরে মাটির ঠোলের কাঠামো ভেঙে আসল শিল্পদ্রব্যটি পাওয়া যায়। একেই লষ্ট ওয়াকস পদ্ধতি বলা হয়।

এই পদ্ধতিতে তারা গৃহসজ্জার জন্য নানান পুতুল, বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি, বিভিন্ন দেবমূর্তি ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন শৌখিন দ্রব্যাদিসহ শস্য দ্রব্য পরিমাপেব জন্য পাই বা কুনকে ইত্যাদি তৈরি করে। এই গোষ্ঠীর কর্মকাররা খুবই স্বল্প সংখ্যায় বঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমানে রয়েছে। তবে এরা এখন অবলুপ্তির পথে এবং খুবই হতদরিদ্র অবস্থায় কালাতিপাত করছে।

গোপভূমের গন্নাদেরিয়াপুরে কয়েক ঘর মাত্র ঢেকরা কর্মকারের বাস। সংখ্যায় এরা অল্প হলেও শিল্পকলায় বেশ উন্নত। তাই কয়েক ঘর নিয়ে গঠিত পল্লীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চারজন শিল্পী এখানেই বর্তমান এটা কম গৌরবের কথা নয়।

অন্যান্য শিল্পীজাতির মত কর্মকার গোষ্ঠীর কর্মকুশলতা সত্যই প্রশংসার দাবি রাখে। প্রমাণস্বরূপ কাঞ্চননগরের নাম আমরা এখনও ভুলি নাই। একদা সে স্থান ছুরি কাঁচি তৈরিতে খুবই উন্নত ছিল। পূর্বে অজয় নদীর দক্ষিণ পারেই ঢেক্কুর গড়—

যেখানে ইছাই ঘোষের রাজত্ব ছিল— সেই ঢেক্কুর গড় (বর্তমানের শ্যামারূপার গড়) অঞ্চলে এক ধরনের কর্মকার গোষ্ঠীর বাস ছিল তারা কাঁসা পিতলের শৌখিন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত ছিল। সেই ঢেক্কুর গড়ের ঢেকারু কর্মকারদের কিছু কিছু শিল্প নিদর্শন এখনও দেখা যায়।

বর্ধমান জেলার গোপভূমের নিকটবর্তী কামারপাড়ায় প্রচুর কর্মকার সম্প্রদায়ের বাস। এরা নিজ জাতি বিদ্যায় অতীতকাল থেকেই পারদর্শী। লোকশ্রুতি এখানকার এক কর্মকার উৎকৃষ্ট তীক্ষ্ণধারের দৃঢ় এক তরবারি তৈরি করে বঙ্গের তৎকালীন নবাব সরফরাজকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। এবং তা দিয়ে নবাব এককোপে দণ্ডায়মান একটি গাছকে আস্ত কেটে ফেলেছিলেন। ফলে নবাব খুবই সন্তুষ্ট হয়ে সেই কর্মকারকে প্রভূত ধনরত্ন প্রদান করেছিলেন। তাছাড়া বর্তমানে এই কামার পাড়ার কর্মকার শিল্পীরা তাদের বিভিন্ন জাতি কর্মে খুবই পারদর্শী। বিশেষ করে তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমান ভারতবর্ষের নামিদামি বিভিন্ন শহর গঞ্জে স্বর্ণশিল্পী তথা ডিজাইনকার রূপে নিজেদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন।

গোপভূমের মানকর গ্রামের কর্মকাররা কৃষি যন্ত্রহিসাবে দুনি তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া পিতলের রথ তৈরিতেও মানকরের কর্মকারদের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। এখানকার কেদার নাথদের তৈরি পিতলের রথ মানকরের রায়পুরের বিষ্ণুমন্দিরে বর্তমান— যা বাংলার ১৩১৮ সালে তৈরি হয়েছিল এবং এখনও সেই রথে দেব বিগ্রহ নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা হয়ে থাকে।

কর্মকারদের এই. রথ শিল্পের আর একটি উৎকৃষ্ট নমুনা দেখা যায় গোপভূমের বনকাটি গ্রামে। এখানে পঞ্চচূড়া মন্দিরের আদলে তৈরি অদ্ভুত শিল্প সৌন্দর্যের এক মহান নিদর্শন এই পিতলের তৈরি রথটি ১২৪২ বঙ্গাব্দে ১৫ই আষাঢ় নির্মিত হয়েছিল। এটি উচ্চতায় ১৫ফুট। দূর থেকে একে একটি পঞ্চচূড়ার মন্দির বলেই মনে হয়। এর গায়ে নানান দেবদেবী ও লতাপাতার শিল্পসমৃদ্ধ গঠন ভঙ্গীর সন্ধান পেয়ে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু তাঁর বিশ্বভারতীর কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সেখানে গিয়ে সেই অলংকরণের ড্রইং করে বা ছাপ তুলে নিয়ে আসেন এবং তারই আদলে মাটির তৈরি বহু নক্সা শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবাসের মাটির দেওয়ালের শোভা বর্ধন করছে।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে মারাঠা-বিধ্বংসীরূপী দলমাদল এবং মুর্শিদাবাদের জাহান কোষা ইত্যাদি কালজয়ী কামান সে তো বঙ্গের কর্মকারদেরই অতীত কৃতিত্বের স্বাক্ষর!

অন্যান্য জাতির মত এই কর্মকার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যে সকল থাক বা উপ-বিভাগ রয়েছে তার মধ্যে বিবাহাদি ব্যাপারে পূর্বে খুবই কাঠিন্য ছিল কিন্তু বর্তমানে আর তা নেই। বিভিন্ন থাকের গণ্ডী টপকে পারস্পরিক লেনদেন এখন চালু হয়েছে। শ্রাদ্ধাদি পালন এক মাসই ছিল এখন তাও কমিয়ে ১৫ দিনে আনা হয়েছে। শিক্ষায়

উন্নত হওযায় ছেলেরা অনেকেই জাতি বিদ্যা ছেড়ে অন্যান্য পেশায় ও কর্মক্ষেত্রে ব্রতী হয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে।

বঙ্গীয় কর্মকাব গোষ্ঠী বিশ্বকর্মার সন্তান হওয়ায় এদের জাতিদেবতা হল বিশ্বকর্মা। তাই এই দেবতাব পূজা এরা নিষ্ঠার সঙ্গেই করে থাকে। ভাদ্রের সংক্রান্তিতে প্রায় প্রতি ঘরেই দেবমূর্তি অভাবে ঘটে পটেও এই দেবতার পূজা এরা করে থাকে। অন্যদিকে এদের কুলদেবী লক্ষ্মী তাই এই দেবীর পূজাতেও এদের ঐকান্তিকতার অভাব নাই।

সামাজিক ক্ষেত্রে কর্মকারদের অন্যান্য থাকের মধ্যে পারস্পবিক চল শুরু হলেও বাঢ় বঙ্গে ঢোকরা কর্মকাবদের নিয়ে অন্যান্য কর্মকাররা এখনও চলেনা বলেই মনে হয়। তাব কাবণও আছে। এরা বহিবাগত ভিন প্রদেশী এবং এদের জীবনযাপন পদ্ধতিও খুবই নিম্নমানের এবং আদিবাসী সম্প্রদায় সদৃশ চাল চলনের জন্য দেশীয় কর্মকাররা এখনও এদের এড়িয়েই চলে। এদের অবস্থা খুবই শোচনীয। পদবীতে এরা কর্মকার হওযায তফশিলি সম্প্রদায়ের আওতায পড়ে না অথচ আর্থিক অবস্থায় নিদারুণ দবিদ্র হওয়া সত্বেও সবকারি সাহায্যে বঞ্চিত এক দুর্বিসহ দুঃখ যন্ত্রণার শিকাব।

—ঃ তন্তুবায় ঃ—

উদ্ভব ও স্তর বিন্যাস ঃ— রাঢ়ে তন্তুবায় সম্প্রদায়ও একটি শিল্পজীবি সম্প্রদায়। শাস্ত্রে এদের উদ্ভব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এদের আদি পুরুষ শিবদাস। এই শিবদাস শিবকর্তৃক সৃষ্ট। অন্যদিকে সেই শিবই কুশ থেকে সৃষ্টি করলেন কুশাবতী নামে এক নারী। এখন শিবদাস ও কুশাবতীই হল তন্তুবায় সম্প্রদায়ের আদি মাতা-পিতা। এদের সন্তান-সন্ততিই হল তন্তুবায় সম্প্রদায়। শিবদাসের সন্তানগণ হল যথাক্রমে— উদ্ধব, মধুসূদন, বলরাম ও জনার্দ্দন।

শিবদাসের চার সন্তানের নাম অনুযায়ী এই জাতির প্রধান চারটি থাক যথা— উত্তরকুল, মধ্যকুল, দক্ষিণকুল ও বর্ণকুল। এই চাব থাক ছাড়াও তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মধ্যে মেড়ালী, পাটরা, পাটলি, পাটরাঙ্গা, মধুতাঁতি, বর্ধমেনা, মান্দারণ্যা ইত্যাদি থাক বা উপভাগ রাঢ়ীয় তন্তুবায়গণের মধ্যে বিদ্যমান। [৪] এছাড়াও আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে রাঢ়ীয় তন্তুবায় জাতির আদি মাতা পিতা কুশবতী আর শিবদাসের জন্ম বলিয়া তন্তুবায়গণ নিজেদের আশ্বিন তাঁতি বলিয়াও অভিহিত করেন। [৫]

সংকরায়ন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে বঙ্গের সকল জাতিই যখন সংকর জাতি পর্যায়ভুক্ত তখন অর্বাচীন কয়েকটি শাস্ত্র গ্রন্থ যেমন বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত ইত্যাদিতেও বলা হয়েছে এরা শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান। তাই এরা উত্তম সংকর পর্যায় ভূক্ত, পরে এদের সৎশূদ্র পর্যায়েও ফেলা হয়েছে এবং পরিশেষে বহুল কথিত বল্লাল সেনের জাতি সংস্কার কালে এদের নবশাখ পর্যায়ভূক্ত করা হয়েছে।

প্রাচীনত্ব ঃ— কৃষি আবিষ্কারের বহু পরে মানুষ বস্ত্র বয়ন রপ্ত করেছিল— তা ধরে নেওযা যেতে পারে। সভ্যতার বিকাশ পর্বের কোন এক সময়ে মৎস্যজীবী জেলেরাই জাল বুনতে গিয়েই ঘন বুননের জাল থেকেই কাপড় তৈরির কলা কৌশল আবিষ্কার করেছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক মানিকলাল সিংহ যা বলেছেন তা হল— "মৎস্য-শিকারী মানুষই যে কাপড়ের আবিষ্কারক তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় সুইজারল্যাণ্ডের লেক কনট্যান্সের প্রাচীন অধিবাসীদের ধ্বংস-স্তূপ হইতে প্রাপ্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম কাপড়ের নমুনাগুলি হইতে।" (৬)

সে যাই হোক বঙ্গে কাপড় বোনার কৃতিত্ব বঙ্গীয় তন্তুবায় সম্প্রদায়ের তাতে কোন সন্দেহ নাই এবং তারা এই কলা কৌশল খ্রিষ্ট জন্মের আগেই যে রপ্ত করেছিল তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় খ্রিষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে রোমান ঐতিহাসিক মমসেনের বিবরণী হতে জানা যায় যে, তখনকার দিনে রোমের সভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র পড়ে যখন রাজপথে যাতায়াত করতেন, তা দেখে প্রাচীন পন্থীরা আতঙ্কিত হয়ে তা আর না পড়ার জন্য প্রতিবাদ করলে রোমেব বাজারে বঙ্গীয় মসলিন বিক্রয় বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই এই শিল্প খ্রিষ্ট জন্মের পূর্বেই যে বাঙালিরা রপ্ত করেছিল তা বেশ বোঝা যায়।

প্রসঙ্গত শিল্পীরা শুরুতেই একেবারে মসলিন তৈরি রপ্ত করেছিল তা বলা যায় না। প্রথমে তারা কৃষিলব্ধ তুলা থেকে সুতা বের করে সাধারণ বস্ত্রই তৈরি করেছিল, পরে তাদের অভিজ্ঞতা আরও পুষ্ট হলে তুলা থেকেই প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিন তৈরিতে হাত দিয়েছিল। সে দিক থেকে ধরা যায় বঙ্গে তন্তুবায়েরা বস্ত্র বয়ন শুরু করেছিল খ্রিষ্ট জন্মের কয়েক শ' বছর আগে— মোটামুটি মৌর্য-শূঙ্গ যুগের কাছাকাছি সময়কালে। তাই বলা যায় বঙ্গে তন্তুবায় সম্প্রদায় বেশ প্রাচীন সম্প্রদায়।

অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বের রচনা হিসাবে যে সব চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতেও তুলা ধুনা ও তা থেকে বস্ত্র তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে শান্তিপাদের এক চর্যাপদে বলা হয়েছে—

'তুলা ধুঁনি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুঁনি ধুঁনি নিরবর সেসু।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গীয় কিছু উন্নত জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত দত্ত, রক্ষিৎ, পাল, শীল, মিত্র ইত্যাদি পদবীগুলি বৌদ্ধগন্ধি অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে জড়িত। সেদিক থেকে এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঐসকল পদবীর বহুল প্রচলন দেখা যাওয়ায় ধরে নেওয়া যেতে পারে এরাও বৌদ্ধ ধর্মের একদা পৃষ্ঠপোষক ছিল তাই এরাও বেশ প্রাচীন সম্প্রদায় তাতে সন্দেহ নাই।

সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি ঃ— প্রাচীন এই তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন থাকের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন বিবাহাদি দেওয়ার ব্যাপারে বলা যায় যে, এই সম্প্রদায় অন্যান্য জাতির মতই প্রথম দিকে থাক ও বিভাগের কাঠিন্য মেনে চলত। অর্থাৎ শুরুতে এবা সমগোত্রীয় বিবাহেরই পক্ষপাতী ছিল। পরে সমাজে শৈথিল্য আসায় এখন তা উঠে গিয়ে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক গোত্র বাধা না মেনেই বিবাহের চল শুরু হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পূর্বে এদের সমাজে বিবাহে মেয়ের বাবাকে কন্যাপণ দিতে হত, কারণ হিসাবে বলা যায়— মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে তাঁতেব কাজে পরিপূর্ণ শ্রম দান করত তাই তখনকার সমাজে কন্যারা আদৃত ছিল বলেই কন্যাপণ আদায় হত। তাদের সেই ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজে একটি প্রবাদ বোধ হয় চালু হয়েছিল। প্রবাদটি হল—

কন্যার মা কাঁদে।
টাকার হাঁড়ি বাঁধে।

কিন্তু পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের দেখাদেখি সেই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে, উল্টো হিসাবেই বরপণ আদায় শুরু হয়ে গেছে।

শুরুতেই বলা হয়েছে এদের আদি মাতা-পিতার সৃষ্টি কর্তা শিব। তাই এদের জাতি দেবতা শিব-দুর্গা। ফলে শারদীয়া দুর্গাপূজা এরা নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে এবং মহা অষ্টমীর দিনটিতে তাঁত বন্ধ রাখে। আর শৈব উৎসব হিসাবে শিবচতুর্দশী ও শিব গাজনেও এরা তাঁত বন্ধ রেখেই পূজাদি সহ তা পালন করে।

অন্য দিকে আশ্বিন তাঁতিদের মধ্যে সংস্কার চালু আছে যে, ওদের আদি মাতা পিতার উদ্ভব হয়েছিল আশ্বিন মাসের একাদশী তিথিতে, তাই ঐ তিথিটিতে ওরা কুলপূজা করে থাকে এবং ঐ দিনও তাঁত বন্ধ রাখে। পূর্বে বৌদ্ধ মতাবলম্বী হলেও পরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ব্যাপকতা শুরু হলে ওরাও তার প্রভাব পুষ্ট হয়ে হিন্দুধর্মের যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গেই আপন আপন রুচি অনুযায়ী নিজেদেরকে সমযুক্ত করে নিয়েছে। তবুও বলা যায় এরা নাগদেবী মনসারও পূজক। কারণ হিসাবে বলা যায় শিববলে পাওয়া ওদের প্রধান যন্ত্র তাঁত-রজ্জু অভাবে শিব নির্দেশেই সর্পরূপ রজ্জুর দ্বারা প্রথমে সেই তাঁত বাঁধা হয়েছিল— তাই এরা সর্পকে সন্তুষ্ট রাখতে মহা ধুমধামে সর্পদেবী মনসার পূজা করে থাকে এবং এদের দ্বারা মনসার যাবতীয় পালন নিষ্ঠার সঙ্গেই পালিত হয়। দশহরার দিন মনসা পূজার পর ঘুড়ি ওড়ানো হয়ে থাকে। শিল্পজীবী জাত হলেও দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজায় এদের তেমন আগ্রহ নাই।

তন্তুবায় সম্প্রদায়ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত শবদাহ করে মৃতের সৎকার করে। পূর্বে এরাও একমাস ধরে মৃতাশৌচ পালন করত এখন আর সকলেই তা করে না। সময় সীমা কমিয়ে এখন অনেকেই তা পনের দিনে নিয়ে এসেছে।

তন্তুবায় সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিকতা ও শিল্প সম্ভার ঃ— এই সম্প্রদায় যেখানেই বসবাস করুক না কেন তাদের প্রধান জীবিকা তাঁত শিল্প। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজন শহর বা গঞ্জ তাই তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন শহর, গঞ্জ ও তৎসংলগ্ন এলাকাতেই বসবাস করে। এই শিল্পে কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক পুঁজি দুই বিশেষ প্রয়োজন। যাদের তা নেই তারা অনেকেই চাষ আবাদে বা অন্য কোন জীবিকায় আত্মনিয়োগ করেছে। যাদের পুঁজির অভাব তাদের অনেককেই মহাজনদের শরণাপন্ন হতে হয় ফলে তাদের মুনাফার ভাল অংশই চলে যায় মহাজনদের হাতে।

তন্তুবায় সম্প্রদায় বাড়িতে তাঁত বসিয়ে মেয়ে পুরুষ সকলে মিলে তাতে আত্মনিয়োগ করে থাকে। কেউ তকলি দিয়ে সুতো তৈরি করে, কেউ সুতায় রং করে, কেউ তাঁত বোনে, কেউ নক্সার কাজে নিযুক্ত থাকে— যাতে নতুন নতুন চিন্তাভাবনার ফসল তাদের নির্মিত বস্ত্রে প্রতিফলিত হয়। এইভাবেই গোটা পরিবারটাই এই শিল্প প্রস্তুতিতে নিয়োজিত থাকে। তারা যেসকল দ্রব্য উৎপাদন করে তার মধ্যে মসলিনের কথা আগেই বলা হয়েছে। এখন তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে শাড়ী ধুতি ইত্যাদি সাধারণ সূতি বস্ত্র, তসর ও রেশম বস্ত্র, বিভিন্ন দেশীয় গাছ গাছড়ার নির্যাস দিয়ে তৈরি বাহারি রং এ রাঙান বিষ্ণুপুরী, লাল, হলুদ ও সাদা রং এর পাট বস্ত্র, নীল সবুজ রংয়ের মুর্শিদাবাদী রেশম ও সূতি বস্ত্র তৎসহ বহুবিধ চেলিবস্ত্র সহ সূক্ষ্ম কারুকার্যের বালুচরি বস্ত্র, টাঙ্গাইল তাঁত বস্ত্র, ঢাকাই সহ চন্দননগর ও মেদিনীপুরের মসলিন বস্ত্র ও বিষ্ণুপুরী শাড়ী ও বিভিন্ন ধরনের খাদি ও তাঁত বস্ত্র ইত্যাদি।

তন্তুবায় সম্প্রদায়ের গোত্র, পদবী ও টোটেম ঃ— বঙ্গীয় তন্তুবায়দের মধ্যে প্রধান পদবী গোত্র ও টোটেম সম্পর্কে বলা যায়, এদের মধ্যে দত্ত, কুন্ডু, দাস, গুঁই, বারিক, মণ্ডল ইত্যাদি পদবীধারীরা কাশ্যপ গোত্রীয় এবং টোটেম বা ট্যাবু হিসাবে এরা কচ্ছপ খায় না। দাস, দে, পাল, দত্ত, গুঁই, নন্দী, আস— এরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, এরা শাল মাছ খায় না। দাস, চন্দ, লোক্ষন— এরা মৌদগল্য গোত্রীয় এবং এরা মৌচাক ভাঙে না। সেন, শীল, লো, সু— এদের গোত্র গৌতমঋষি; এরা ওঁতে মাছ খায় না। রুদ্র, দাস-এরা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, টোটেম হিসাবে এরা ভেল করা মাছ খায় না। কীত ও দাস— এরা চন্দ্রঋষি গোত্র এবং এরা চাঁদকে বংশের আদি পুরুষ মনে করে। সাধু শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে (সাধু > সাহু > সাউ) সাউ পদবীর তন্তুবায়েরা শান্তিঋষির গোত্র। হংসঋষির গোত্রের দে উপাধির তন্তুবায়েরা হাঁস মারে না ও খায় না। তাছাড়াও রয়েছে দুর্বা ঋষি গোত্রের পাত্র উপাধির তন্তুবায়েরা টোটেম মেনে দুর্বা ঘাস ছিঁড়ে না।

অতীত গৌরবান্বিত জাতির বর্তমান পরিণতি ঃ— প্রাচীন কাল থেকেই এই জাতি

গোষ্ঠী আপন কর্মদক্ষতায় এতই নিপুন যে, অতি জটিল তাঁত যন্ত্রের উদ্ভাবন ও তার সূক্ষ্ম ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিব সার্থক রূপায়ণ, নানাবিধ রং উৎপাদনে রাসায়নিক জ্ঞান ও প্রক্রিযার প্রযোগ, নামিদামি বস্ত্র বুননে বৈচিত্রপূর্ণ নানান নক্সা ও শিল্প কৌশলে বিজ্ঞান তথা ফলিত গণিতের দুরূহ হিসাবের সমন্বয়-সত্যই এই জাতি গোষ্ঠীকে এক বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছে, তবুও বর্তমান সমাজে এরা অতীত মর্যাদা হারাতে বসেছে। এবা যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় আর্থিক বিড়ম্বনায় ব্যতিব্যস্ত ও ক্রমক্ষয়িষ্ণু।

এই অবস্থায় এই জাতি গোষ্ঠীকে সরকারি সহায়তায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই জাতির কর্তব্য। তাদের উন্নতির জন্য সরকারি সাহায্য যে আদৌ দেওয়া হয়নি তা নয়, তবে তা সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যের মতই যৎসামান্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো চাপের বশবর্তী হয়ে অন্যান্য বহু জাতিব মত এই জাতিকেও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভূক্ত করেছে ঠিকই কিন্তু তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সরকারি অবহেলাই চূড়ান্ত হওয়ায় কার্যক্ষেত্রে তার কোন ফলই এই সম্প্রদায় পাচ্ছে না। ফলে তাদের অবস্থা শোচনীয়। নিরুপায় হয়ে অনেকেই এই বৃত্তি ত্যাগ কবে অন্য পেশায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। একদা এই সম্প্রদায় তাঁতকে কেন্দ্র কবেই জীবন জীবিকায় মত্ত ছিল তাই এরা তাঁতি নামেও খ্যাত। তাঁতই ছিল তাদের ধ্যান জ্ঞান। পরিবারের সকলেই তাঁতকে কেন্দ্র করেই কর্মযজ্ঞে নিযুক্ত থাকত। অতীতের কোন এক সময়ে বিভিন্ন কারণে এই সম্প্রদায়ের অনেকেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তা করলেও তাঁতকে তারা ছাড়ে নাই। তাই সেই মুসলমান তাঁতিরা এখনও জোলা তাঁতি নামে পরিচিত।

দীর্ঘদিন ধরে আপন বৃত্তিতে টিকে থাকা সেই তাঁত কেন্দ্রিক তন্তুবায় সম্প্রদায় এখন বিশেষ দুর্দশায় পড়েছে কারণ শিল্প বিপ্লবের দৌলতে বিদেশী শিল্প গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, যন্ত্রদানবের সঙ্গে লড়াই করে হস্তচালিত তাঁত শিল্পীরা আজ পিছু হঠছে। তদুপরি সরকারি অবহেলা ও ঔদাসীন্য এদের বৃত্তিচ্যুত করতে বাধ্য করছে। এহেন অবস্থায় এর প্রতিবিধান অবশ্যই প্রয়োজন। তাই এদের টিকিয়ে রাখার জন্য অতীত ঐতিহ্যবাহী সেই জামদানি, টাঙ্গাইল, সিল্ক, তসর, বালুচরি ইত্যাদি অপূর্ব শিল্প সৃষ্টির সেই সৃষ্টি কর্তা শিল্পী কুল তন্তুবায় সম্প্রদায়কে উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতায় টিকিয়ে রাখা সরকার তথা জাতির মহান কর্তব্য বলেই মনে হয়।

গোপভূমে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বিস্তার ঃ— জীবন জীবিকার আশায়, রুজি রোজগারের সন্ধানে মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই কারণেই তন্তুবায় সম্প্রদায়ও রাঢ় বঙ্গের অন্যান্য স্থান থেকে একদা এই গোপভূমেও স্থিতু হয়েছিল। গোপভূমের মধ্যে বেশ কিছু প্রাচীন গ্রাম ও শিল্পগঞ্জ ও শহর রয়েছে। যেমন— দীর্ঘনগর, মানকর, উজানী, মঙ্গলকোট, কাটোয়া,

গুসকরা, গলসী, সাঁকো, শিলামপুর, কাঁকসা, রানীগঞ্জ ইত্যাদি। ঐ সকল স্থানে বা তার আশে পাশে বহু তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বাস।

গোপভূমের তন্তুবায় সম্প্রদায়ের উল্লেখ্য পীঠস্থান ছিল কাটোয়া। এই কাটোয়াকে কেন্দ্র করে অতীতে তাঁত শিল্পের প্রাধান্য ছিল, কাটোয়ার তাঁতি পাড়া' নামেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানেও কাটোয়াকে কেন্দ্র করে সেই ঐতিহ্য বর্তমান। তবে সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য স্বাধীনোত্তর কালে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত তন্তুবায়দের ভূমিকাই প্রধান। এরা কাটোয়াকে কেন্দ্র করে ঘোষহাট, পানুহাট, এমনকি দাঁইহাট পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বসতি গড়ে এই শিল্প প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

গোপভূমের বিভিন্ন এলাকায় বিস্তৃত তন্তুবায় সম্প্রদায় প্রাচীন কাল থেকেই আপন আপন তাঁতে বিভিন্ন বস্ত্রসম্ভার তৈরি করে নিকটবর্তী গঞ্জে বা বাজারে তা বিক্রয় করত। উল্লিখিত গ্রাম-গঞ্জ ছাড়াও গোপভূমের বহু গ্রামেই তা সংঘটিত হত। এ বিষয়ে মানকরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। একদা মানকরে মুগা সুতা ও তসর বস্ত্র ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হত। তাই মানকর সম্পর্কে এক প্রবাদই চালু হয়েছিল যাতে বলা হয়েছে—

পড়ে তসর খায় ঘি
তার আবার অভাব কি?

সেই তসর শিল্পীরা আজ কোথায়? একদা মানকর গ্রামের সর্বত্রই চলমান তাঁতেব ঠকাঠক আওয়াজে সদা মুখরিত হত। কিন্তু সে সব কাহিনী তো আজ কেবলই ইতিহাস মাত্র।

—ঃ কুম্ভকার ঃ—

প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রাচীন মানুষ তা প্রায় খ্রিষ্ট জন্মের দু'হাজার বছর আগে থেকেই তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র মাটি দিয়ে তৈরি করে তা রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নিয়ে, পরে তা আগুনে পুড়িয়ে মজবুত করে নিয়েই ব্যবহার করতে শেখে। তারও পরে শিল্পী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার উপর নানান নকসা ও রংয়ের প্রলেপ দিয়ে তাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করতে থাকে। এই ভাবেই মৃৎশিল্পীদের আবির্ভাব হয়। সে দিক থেকে শিল্পজীবী জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এই মৃৎশিল্পীরাই হল সবথেকে প্রাচীন গোষ্ঠী। মাটি দিয়েই প্রধানত কুম্ভ ও অন্যান্য তৈজস পত্র তৈরি করে বলেই এদের মৃৎশিল্পী বা কুম্ভকার বলা হয়।

বিস্মৃত অতীতের কোন অন্ধকারময় যুগে এদেরই পূর্বপুরুষদের তৈরি মৃৎপাত্রের ভগ্ন অংশ আজ বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়ে, পাত্রের রং ও বর্ণের নিরিখে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালক্রম নির্ণয়ে সহায় হয়েছে। সেদিক থেকে বলা যায় তাম্রাশ্মীয়

সভ্যতার শুরু থেকে (খ্রিষ্ট জন্মের ১৫শ' বছর আগে) তাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

প্রাচীনত্ব ও উদ্ভব ঃ— বঙ্গেও এই জাতি যে বেশ প্রাচীন তারও প্রমাণ রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিপিটকে এবং তারও পরে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত ধর্মদাস কৃত "বিদগ্ধ মুখমণ্ডল" গ্রন্থে। সেই প্রাচীন কুম্ভকার জাতির উৎপত্তি বিষয়ে পুরাণাশ্রয়ী কিংবদন্তীতে জানা যায় যে একদা শিবের বিবাহকালে সকল দ্রব্যসামগ্রী সংগৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত মঙ্গলঘট সংগৃহীত না হওয়ায় শিব বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ক্ষণকাল চিন্তার পর তিনি তাঁর গলদেশে বিরাজিত রুদ্রাক্ষের মালা থেকে একটি কাঠি ভূতলে নিক্ষেপ করেন। তা করা মাত্র এক দিব্যকান্তি পুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই পুরুষ তার স্রষ্টা শিবকে প্রণাম করে তাকে কি করতে হবে জানতে চাইলে, শিব তাকে বিয়ের জন্য মঙ্গলঘট তৈরি করতে আদেশ দেন। তখন সেই পুরুষ মাটি দিয়ে মঙ্গলঘট নির্মাণ করে শিবকে উপহার দেন। সেই দিব্যকান্ত পুরুষেরই নাম রুদ্রপাল— আর তিনিই কুম্ভকারদের আদি পিতা। সেদিক থেকে তন্তুবায়দের সঙ্গে এদের উদ্ভব সাদৃশ্য বর্তমান।

বিভাগ ঃ— অন্যদিকে বঙ্গের অন্যান্য শিল্পজীবী সম্প্রদায়ের মত এদেরও বিশ্বকর্মার সন্তান বলা হয়ে থাকে। বঙ্গে আরও বহু জাতির মত সংকরায়নের দিক থেকে এদের কখনও উত্তম সংকর পর্যায়ে আবার কখনও সৎশূদ্রের পর্যায়েও ফেলা হয়েছে। রাঢ়বঙ্গে এই জাতি বেশ কয়েকটি থাকে বা বিভাগে বিভক্ত হয়েছে। যেমন— মগরা, গৌড়া, সাততপা। এছাড়াও আছে— সিংহজারী, বারহাজারী, গণগণ্যা, রাজনহাটী। বর্তমানে আরও দুটি থাক সংযুক্ত হয়েছে, যেমন— ভেরা (ভার বহনকারী), বাজারা (বাজার গমনকারী) ইত্যাদি।

ধর্মীয় ও সামাজিক আচারানুষ্ঠান ঃ— রাঢ়ের কুম্ভকারগণ ধর্মীয় ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধি-বিধান পালন করে থাকে যেমন— এদের আদিপুরুষ রুদ্রপাল শিবজাত হওয়ায়, শিব এদের কাছে জাতিদেবতা। তাই শিব সংক্রান্ত যাবতীয় পর্ব ও অনুষ্ঠান এরা নিষ্ঠার সঙ্গেই উদযাপন করে থাকে। সেই সঙ্গে পূজাদি সহ নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর সৃষ্টিকারী মূল উৎস হিসাবে প্রধান যন্ত্র চক্র বা চাকাও বন্ধ রাখে। এছাড়াও তারা বছরে চারটি অষ্টমী যেমন— জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, জিতাষ্টমী ও দুর্গাষ্টমী পালন করে থাকেন এবং চাকও বন্ধ রাখে। এই কুম্ভকার সম্প্রদায় সর্পদেবী মনসার উপাসকও বটে— তাই মনসা সংক্রান্ত চারটি পঞ্চমী ছাড়াও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার ঝাপানাদি অনুষ্ঠানে পূজাসহ অংশ নেয় এবং তাদের চাক বন্ধ রাখে।

বিবাহের ব্যাপারে এরা নিজ থাকের মধ্যে অনুষ্ঠানাদির পক্ষপাতীই ছিল কিন্তু বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ঐ কাঠিন্য শিথিল হয়ে গেছে, ফলে আপন

জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন থাক বা উপবিভাগের মধ্যেও বিবাহাদি চল হয়েছে। তন্তুবায়দের মত এদেরও মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মাটির কাজে অংশ নিত তাই এদের সমাজে মেয়েদের প্রয়োজনীযতা বা মূল্য ছিল। তাই বিবাহে কন্যাপণ দিতে হত। এখন তাও উঠে গিয়ে বরপণ চালু হয়েছে।

এরা মৃতদেহ দাহ করেই সৎকার করে আর মৃতাশৌচ একমাস পালনের পক্ষপাতী তবে বর্তমানে ছেলেমেয়েদেব মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার চল হওয়ায় এবং তারা অনেকেই কর্মক্ষেত্রেব বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ায় সে মেয়াদ কমিয়ে ১৫ দিনে আনা হয়েছে।

পদবী, গোত্র ও টোটেম ঃ— কুম্ভকারদের মধ্যে প্রধানত যে সকল পদ-পদবী ও টোটেম চালু আছে সেগুলি হল— পাল, কুম্ভকাব, দিয়াসী, সন্ন্যাসী, বাবিক— এরা কাশ্যপ গোত্রীয়, টোটেম ট্যাবুর জন্য এরা কচ্ছপ খায় না। খাঁ, দাস, প্রামাণিক, পাল, কুম্ভকার, পাত্র— এরা ষান্ডিল্য গোত্রীয়। টোটেমের জন্য ষাঁড় বোয়ায় না, শাল গাছ ও সাঞ্চা শাক খায় না। মৌদগল্য গোত্রীয় বারিক ও কুম্ভকাররা মৌচাক ভাঙে না। এদের মধ্যে কুম্ভকার পদবীযুক্ত কিছু প্রাচীন সম্প্রদায়ের মাঝে গাছ নামীয় ঋষি গোত্রও চালু আছে, যেমন— শিশু ঋষি, শিরিষ ঋষি, সেগুন ঋষি ইত্যাদি। ঐ গোত্রীয় কুম্ভকারেরা ঐ ধরনের কোন গাছ কাটে না বা পোড়ায় না। উদ্ভিদের নামে নাম ঐ বিশেষ গোত্রগুলি সচরাচর অন্য কোন জাতি— এমনকি অরণ্যচারী জাতির মধ্যেও দেখা যায় না। তাছাড়াও এদের মধ্যে অদ্ভুত এক পদবীও দেখা যায় যা সচরাচর দেখা যায় না— সেটি হল 'খাওয়াস'— যাদের গোত্র কপিল ঋষি।

গোপভূমে এদের বিস্তার ঃ— অতীতে গোপভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে মৃৎপাত্রের ব্যবহারের ব্যাপকতা ছিল— তাই এখানকার অধিকাংশ প্রত্নক্ষেত্রে যেমন— পাণ্ডুরাজার ঢিবি, গোস্বামী খণ্ড, সিলুট বসন্তপুর, ভরতপুর, কাঁকসা, মঙ্গলকোট, বনকাটি, গোপালপুর ইত্যাদি স্থানে প্রভূত পরিমাণে তাম্রাশ্মীয় যুগ ও তারও পরের যুগের ব্যবহৃত বহু মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে রাঢ় বঙ্গের অন্যান্য স্থানের মত এই গোপভূমেও প্রায় সব গ্রামেই কুম্ভকারদের বসতি রয়েছে। তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী নিকটবর্তী হাটে-বাজারে, শহরে-গঞ্জে নিয়ে গিয়ে তা বিক্রয় করে। গোপভূমের গলসী থানার চম্পাই নগরী বা কসবায় ও তার কাছাকাছি কিছু গ্রামে বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ির মত মনসার ঘট বাড়ি তৈরি হয়। তাছাড়া প্রায় সব গ্রামেই কুম্ভকারেরা সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন— মাটির হাঁড়ি, কলসী, ঘট, পাত্র, মুড়ি ভাজার খোলা-খাপুরী, গরু মোষের খাবার জন্য বা ধান সেদ্ধ করার জন্য পাতনা বা ডাবা, পূজার সামগ্রী যেমন— মৃৎপ্রদীপ, ধুপুসী, ঘট ইত্যাদিও তারা তৈরি করে বিক্রয় করে। তাছাড়াও অনেকে মৃৎপ্রতিমাও তৈরি করে থাকেন। তবে বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ি গ্রামের মত উন্নত শিল্পসামগ্রী যেমন মাটির হাতি, গলালম্বা ঘোড়া, টেরাকোটার কাজ সম্বলিত

দ্রব্যসামগ্রীর মত দ্রব্যাদি এখানে তৈরি হয় না এখানে যা তৈরি হয় তা শিল্প সৌকর্যে উন্নত না হলেও, প্রয়োজনভিত্তিক দ্রব্যসামগ্রী ব্যাপকভাবে তৈরি হয়।

অন্যান্য সম্প্রদায় ঃ—

—ঃ কায়স্থ ঃ—

উদ্ভব ঃ— বঙ্গে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটি উল্লেখ্য জাতিগোষ্ঠী হল কায়স্থ। শুরুতে এরা রাজা মহারাজাদের লিপি খোদাই বা লিপি লেখার কাজ করত। তাই এদের করণ বলা হত। লেখালেখিব কাজ করার জন্যই এরা অক্ষবজ্ঞান সম্পন্ন ছিল। পরে এরাই রাজা মহারাজাদের রাজ্য পরিচালনায় হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করত, পরে রাজস্ব আদায় ও তার সংরক্ষণাদির দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। এরা সবসময় রাজা মহারাজাদের শরীর স্পর্শ করে বামদিকে দাঁড়িয়ে তাদের হিসাবপত্র বোঝাতেন। তাই রাজাদের কায়া বা শরীর স্পর্শ করেই দাঁড়াতেন বলে এদের কায়স্থ নামে অভিহিত করা হত। শুরুতে এরা করণ কায়স্থ নামে অভিহিত হলেও ধীরে ধীরে করণ শব্দের অবলুপ্তি ঘটায় পরবর্তীকালে কায়স্থ নামেই পরিচিত হয়।

অন্যান্য জাতির মত এদেবও উদ্ভব বিষয়ে অনেক পৌরাণিক গল্প, কাহিনী, উপন্যাস চালু আছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল যে, একদা মৃত্যুর অধিপতি যমরাজ কলিকালে পাপীর সংখ্যা অন্য যুগের তুলনায় প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাওয়ায়, তাদের হিসাবাদি নিরপেক্ষভাবে রাখার জন্য একজন সৎ হিসাবরক্ষকের আবেদন জানালে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর শরীর থেকে এক দিব্যাঙ্গ পুরুষের সৃষ্টি করে, যমরাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই ব্যক্তিই যমের হিসাবরক্ষক চিত্রগুপ্ত নামে পরিচিত। ইনিই হলেন রাঢ়ীয় কায়স্থদের আদিপুরুষ। (১)

এই উদ্ভব কাহিনীতে সামান্য মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষ করে কুম্ভকার, তন্তুবায়, মোদক ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা হলেন শিব আর এই কায়স্থ সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা হলেন ব্রহ্মা। সে যাই হোক— এই চিত্রগুপ্তই পরে মর্তের এক রাজা ধর্মযজ্ঞের দুই মানবী কন্যা মতী ও সতীকে বিবাহ করেন এবং যথাসময়ে চিত্রগুপ্তের ১১ জন সন্তান জন্মে। তাদের নাম হল যথাক্রমে— মতিমন্ত, দাশরথ, অতিক্রান্ত, গুহ্যক, দুর্ধষ, দুর্বাক্য, দুর্বাসা, কুথু, শশঙ্ক, পৌলব ও সহস্রাক্ষ। (২) এই এগারো জন পুত্রের মধ্যে তিনজন মিত্র, ঘোষ, বসু পদবীধারী কুলীন বংশ আর দেব, দত্ত, দাস, সেন, সিংহ, গুহ, পালিত, কর— এই আট পদবীধারীদের নিয়ে সিদ্ধ মৌলিক কায়স্থ বংশের সৃষ্টি হল।

ধর্মীয় নিরিখে দেখা যায়— এই কায়স্থ জাতি চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য

ও শূদ্র পর্যায়ে ঠিক পড়ছে না। ব্রহ্ম পুরাণে তাই এদের সৎ-শূদ্র পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। সংকরায়নের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে এরা মিশ্র বর্ণের। কারণ হিসাবে এদের উত্তম সংকর ও সৎশূদ্র পর্যায়ে ফেলা হয়েছে।

প্রাচীনত্ব ঃ— ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় এই কায়স্থ জাতি খ্রিষ্টীয় নবম-দশম শতক থেকেই জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কারণ এই সম্প্রদায় শুরু থেকে লেখাপড়া জানা মার্জিত রুচিসম্পন্ন হওয়ায় বিভিন্ন রাজ দরবারে প্রাচীনকাল থেকেই রাজকীয় উচ্চপদে আসীন ছিল। প্রমাণ হিসাবে বেশ কিছু উল্লেখ্য কায়স্থ সন্তানের কার্যকাল উল্লেখ করা যেতে পারে। [৩] যেমন— (১) মহাদেব নামে এক কায়স্থ সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি নবম-দশম শতকে কিনসরিয়া লিপির লেখক। (২) দঙ্গদাস— ইনি পাল রাজত্বের রাজকর্মচারী। (৩) শ্রী গোবিন্দ— রাজা বৈদ্যদেবের কর্মৌলি লিপিতে উল্লেখ্য। (৪) ভীমদেব— ইনি পাল রাজত্বে একজন সান্ধিবিগ্রহিক.ছিলেন। (৫) সন্ধ্যাকর নন্দী— ইনি পাল রাজত্বে 'রামচরিত' কাব্যের রচয়িতা। (৬) উমাপতি ধর সহ শ্রীধর দাস, শালাড্ডনাগ, নারায়ণ দত্ত, নাঞ্রী সিংহ, কোপি বিষ্ণু ও হরি ঘোষ— এরা সকলেই সেন রাজত্বের দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। [৪]

পরবর্তীকালে আরও যে ছিল না তা নয়। আরও আছে। যেমন পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের রচয়িতা বর্ধমানের কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বসু— যিনি 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অন্য আর একজন হলেন ষোড়শ শতকে কবিতায় মহাভারত অনুবাদক কবি কাশীরাম দাস। এরা 'দেব' উপাধিধারী হয়েও বৈষ্ণবীয় বদান্যতায় 'দাস' উপাধি ব্যবহার করতেন।

ষোড়শ শতাব্দীর আর এক কবি যিনি মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন তিনি হলেন কবি নারায়ণ দেব। তাই লক্ষ্য করলে দেখা যায় খ্রিষ্টিয় নবম শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সাতশ' বছরের ইতিহাসের বিচারে বলা যায় এই জাতি বেশ প্রাচীন ও কৃষ্টিসম্পন্ন জাতি ছিল।

বিভাগ ঃ— আমরা জানি পূর্বে পেশা ছিল, বৃত্তিও ছিল কিন্তু জাতি ছিল না। জাতি বহু পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়। তাই প্রাচীনকালে কায়স্থ বলতে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীকেই বোঝাতো। 'কায়স্থ' শব্দটি ইতিহাসে প্রথম দেখা যায়— কুশান বংশীয় সম্রাট বাসুদেবের রাজত্বকালে (১৭১ খ্রিষ্টাব্দে)-র অভিলেখে। পরে পরে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্তযুগে রচিত যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও কায়স্থ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তারও পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে 'প্রথম কায়স্থ', 'জ্যেষ্ঠ কায়স্থ' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানে 'কায়স্থ' শব্দ কোন জাতি অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে রাজ-পদ (Designation) হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। এই সকল পদে ব্রাহ্মণ সহ যোগ্য

ব্যক্তিরাও যোগ দিতে পারত। তাই তখনকার দিনে মুখ্যত লেখালেখি, হিসাবরক্ষক, রাজস্ব আদায়, জমি জরিপ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বেই ছিল কায়স্থরা— তাই বহু জাতির মিলন-মিশ্রণে সৃষ্ট কায়স্থ পদ থেকে পরবর্তীকালে বিশেষভাবে শিক্ষিত তথা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কখন যেন কায়স্থ জাতে পরিণত হয়ে গেল। ইতিহাসের বিচারে তা সে নবম-দশম শতকের কথা।

তখনকার দিনে শিক্ষিত এই জাতি শুরুতে আপন কুল গৌরব বৃদ্ধির জন্য নানান অবাস্তব গ্রন্থ প্রণয়নে নিজেদের ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করা ও সেই সঙ্গে কুলীন প্রতিপন্ন করার জন্য বহুবিধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের কায়স্থ কাণ্ড, রাজন্য কাণ্ড সহ বহু কুলজী গ্রন্থ যেমন— বঙ্গের আদি কায়স্থ সমাজ ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে বহু ভাগ ও উপবিভাগের সৃষ্টি করেছিল। যেমন— চার ঘর, আট ঘর, ১৫ ঘর, ২৭ ঘর ইত্যাদি বিভাজন সৃষ্টি করে তার উপর কৌলীন্যের পরশ বুলিয়ে অনেকেই আত্মপ্রসাদ লাভ কবত। তাই ঐ সব অবাস্তব তথ্যপূর্ণ কুলজী কৌলীন্যে না গিয়ে এই জাতিকে ভৌগোলিক কারণে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবেই ছয়ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— রাঢ়দেশের দক্ষিণে অবস্থিত কায়স্থরা দক্ষিণ-রাঢ়ী, উত্তরে অবস্থিতরা উত্তর-রাঢ়ী, বঙ্গের বাসিন্দারা বঙ্গজ, বরেন্দ্রর বাসিন্দারা বরেন্দ্র, শিলেটের অধিবাসীরা শিলেটী ও গোলাম ইত্যাদি।[৫] এছাড়াও সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে এই জাতিকে আরও বহু ভাগে ভাগ করা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ না করলেও চলে, তবে আগ্রহী ব্যক্তিদের কৌতূহল নিবারণের জন্য এখানে তাও উল্লেখ করা হল। যেমন— উত্তর ভারতীয় কায়স্থরা শ্রীবৎস, করণ, অম্বষ্ঠ, শাক্যসেনী, কুলশ্রেষ্ঠী, ভটনগরী, মাথুরী, সূর্যধ্বজ, বাল্মীকি, অষ্টমা, নিগম, গৌড়, উনাই প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। উড়িষ্যার করণ, মহারাষ্ট্রের প্রভু, অন্ধ্রের করণম, কর্ণাটকের কনক্কন, সানভোগ এবং তামিলনাড়ুর বেল্ললাররা সামাজিক অবস্থান ও পেশার দিক থেকে কায়স্থদের কাছাকাছি।

পদ-পদবী ও টোটেম ঃ— কায়স্থ জাতির প্রধান প্রধান পদ-পদবী ও টোটেম সম্পর্কে বলা যায় এদের মধ্যে বসু, দে, দেব, দত্ত, পালিত, সিংহ, কর, রক্ষিত পদবীধারীরা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, টোটেম বা ট্যাবু নিষেধ হেতু এরা ভেল করা মাছ খায় না। গুহ, দাস, হোড়, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিদিত, তেজ, আইচ, অর্ণব, আস, রাউৎ, বল, বর্ধন, অঙ্কুর, গুঁই, লুই, বেশ, পই, যশ, ধরণী, হেম, ক্ষেম, ঘাম, খঞ্জ ইত্যাদি পদবীর কায়স্থরা কাশ্যপ গোত্রীয়, এরা কচ্ছপ খায় না। দেব, সিংহ, কর, চন্দ্র, নাগ, রাজ, বিন্দু, বন্ধু, ভুঁই, কুণ্ডু— এরা মৌদগল্য গোত্রীয় এবং টোটেম নিষেধ বাবদ মৌচাক ভাঙে না। দাস, চন্দ্র, নন্দী, আদিত্য, গন, ভদ্র, ধনু, বাস, স্বর, শক্তি, সম, দানা, শালা, শূর, গন্দ, কীর্ত্তী, দাহা, মান, বর্মা এরা ষাণ্ডিল্য গোত্রীয়— এরা ষাঁড় বয় না আর সাঞ্চা শাক খায় না।

একই পদবী কিন্তু ভিন্ন গোত্রীয়ও রয়েছে যেমন— দে, দেব— এরা আবার আলিম্যান গোত্রীয়ও রয়েছে এবং এরা আড় মাছ খায় না। দত্ত পদবী আবার গর্গঋষি গ্রোত্রীয় রয়েছে। 'সেন' পদবীধারী বাসুকী গোত্রীয় কায়স্থ যারা, তারা সাপ মারে না।[৬]

সামাজিক, লৌকিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঃ— এই জাতির মধ্যে কৌলীন্য ব্যবস্থা চালু থাকায় শুরুতে এরা বড় ছেলের বিয়ে ও মেয়েদের বিয়ে কুলীন ঘরেই দিত, অন্য ছেলেদের বেলায় তেমন বাছবিচার না করলেও আপন থাক ও বিভাগাদি মেনে বিবাহ নিষ্পন্ন করত ফলে থাকগত কাঠিন্য বজায় থাকত। কিন্তু যুগ এগিয়ে যাওয়ায় এখনকার সেই পূর্ব কাঠিন্য নাই ফলে বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়া কর্ম নিজেদের পারস্পরিক থাকের মধ্যেও চালু হয়ে গেছে। বিবাহে অন্যান্য জাতিব মত এদের কোনদিনই কন্যাপণের ব্যবস্থা ছিল না— শুরু থেকেই এরা বরপণের পক্ষপাতী।

কায়স্থরা শবদাহ করেই মৃতের সৎকার করত এবং এখনও করে। পূর্বে এদের মধ্যে মৃতাশৌচের মেয়াদ একমাসই ছিল। বর্তমানে তাকে কমিয়ে ১২ কিংবা ১৫ দিনে নামানো হয়েছে।

উৎপত্তির কিংবদন্তীতে এরা ব্রহ্মাসৃষ্ট হলেও ব্রহ্মাপূজার চল এদের মধ্যে আদৌ দেখা যায় না। তাই এদের মধ্যে কোন জাতি-দেবতা নাই। এরা ইচ্ছামত বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজানুষ্ঠান পালন করে। বঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর এদের অনেকেই বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে বাড়িতে শালগ্রাম শিলা, গোপাল বিগ্রহ ও যুগল মূর্তির উপাসনা করে থাকে। তাই বলে শাক্ত ও শৈব দেবদেবীর প্রতি এদের কোনরূপ অনীহা নাই বরং বহুক্ষেত্রেই এরা পরম নিষ্ঠায় ঐ সকল দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে থাকে।

গোপভূমে এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ঃ— কায়স্থ যে প্রাচীন জাতি সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রাঢ়বঙ্গে এদের যে অবস্থান ছিল তা তাদের বিভাগ বিভাজনের নামকরণের মধ্যেই বোঝা যায়। উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থরা যে সমুদয় রাঢ় বঙ্গে বিস্তৃত ছিল তাতে সন্দেহ নাই। তবে গোপভূম প্রাচীনকাল থেকেই ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেখানে গোপালন ও কৃষি ছাড়া জীবিকার তেমন সংস্থান ছিল না। তাই সহজেই অনুমেয় যে এই সম্প্রদায় প্রথম দিকে গোপভূমে তেমন বিস্তৃত ছিল না।

অনুমান যাই হোক না কেন মধ্যযুগীয় বহু মঙ্গলকাব্যে বিশেষ করে ধর্মমঙ্গল কাব্য যা গোপভূমের রাজন্য ইছাই ঘোষকে কেন্দ্র করে লেখা সেই ধর্মমঙ্গলের গোপরাজ ইছাই কর্তৃক প্রজাপত্তনের প্রসঙ্গে কায়স্থ সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। সেখানে কায়স্থ সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসতি স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থিত হওয়ায় বোঝা যায় যে গোপভূমেও এদের বিস্তৃতি গড়ে উঠেছিল। সেখানে বলা হয়েছে—

করি বন্দোবস্ত, বসিল সমস্ত,
কুলীন কায়স্থ কত।
পবিত্র চরিত্র, ঘোষ বসু মিত্র,
মাৰ্জ্জিত মৌলিক যত।।
সিংহ দাস দত্ত, আদি যে মহত্ত্ব
বসিল উত্তর-রাঢ়ী। (৭)

কাব্যিক প্রমাণে বোঝা যায় গোপভূমেও এই সম্প্রদায়ের কুলীন-অকুলীন উভয় গোষ্ঠীই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

জাগতিক নিয়মে গোপভূমেও বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে গোপভূমের অরণ্যও আজ বিলুপ্তির পথে এবং সেখানে আজ শহর নগর জনপদের আধিক্য দেখা দেওয়ায় এবং কর্ম সংস্থানের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থ-সামাজিক কারণে বরাবরের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী এই সম্প্রদায় গোপভূমেও বসতি গড়ে তুলেছে। ফলে গোপভূমের বহু বহু গ্রামেই তাদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লক্ষ্য করার বিষয়।

—ঃ মোদক ঃ—

রাঢ় বঙ্গে আর একটি জাতি গোষ্ঠী রয়েছে— যারা ঠিক শিল্পীজীবী পর্যায়েও পড়ে না অন্যদিকে বণিক পর্যায়েও পড়ে না। অথচ তাদের কাজ কাম খানিকটা শিল্পাশ্রয়ীও বটে। এই সম্প্রদায়টি হল মোদক বা ময়রা। এদের মিষ্টান্ন শিল্পীও বলা হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্যের কালে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব-দেবীর পূজা ও সেবার জন্য তখনকার দিনে সমাজে শুঁড়ি ও নাপিত জাতির আবির্ভাব ঘটেছিল। অনুরূপভাবে বঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের পূজার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সকল দেবসেবার ভোগ রাগের প্রয়োজনে বঙ্গে মোদক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। তাই রাঢ় বঙ্গে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আবির্ভাবকাল পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, এই জাতি অন্যান্য জাতির তুলনায় বেশ নবীন।

উদ্ভব কাহিনী ঃ— এখন ধর্মীয় বাতাবরণের প্রেক্ষিতে এই মোদক জাতির আবির্ভাব বিষয়ে যে কিংবদন্তী চালু আছে— তাতে দেখা যায়, একদা জগৎ-জননী মহামায়ার কোলে তাঁর শিশু পুত্র গণেশ খুবই ঝোঁক ধরে কাঁদতে শুরু করে। মা তাকে কিছুতেই শান্ত করতে না পারায় এবং তার নাস্তানাবুদ অবস্থা অনুভব করে শিব উৎকণ্ঠিত বোধ করেন এবং সেই অবস্থায় আপন জটার কিছু অংশ ছিন্ন করে মাটিতে ফেলামাত্র এক সৌম্যকান্তি দিব্যদর্শন পুরুষের আবির্ভাব হয়। তখন সে তার স্রষ্টাকে প্রণাম নিবেদন করে তাকে কি করতে হবে জানতে চাইলে, মহাদেব তাকে তাঁর অশান্ত পুত্রকে ভুলিয়ে

শান্ত করতে বলায়, সে তৎক্ষণাৎ ছানা, চিনি, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি সংগ্রহ করে এক সুস্বাদু নাড়ু তৈরি করে শিবপুত্র গণেশকে প্রদান করেন। গণেশ তার কিছু খেয়ে তার সুমিষ্ট আস্বাদে আনন্দিত হন এবং তৎক্ষণাৎ মাতৃকোল থেকে নেমে নাচতে নাচতে খেলতে শুরু করেন ও অবশিষ্ট নাড়ু ভক্ষণ করেন। সেই নাড়ু বা মিষ্টি প্রস্তুতকারক শিবসৃষ্ট সুদর্শন পুরুষই ময়রা জাতিব আদিপুরুষ, আর যেহেতু তিনি শিবনন্দন গণেশকে তুষ্ট করতে পেরেছিলেন তাই সিদ্ধিদাতা গণেশই হল ময়রা জাতির কুলদেবতা। অন্যদিকে সন্তুষ্ট কুলদেবতাও তাব সন্তুষ্টির স্বীকৃতি স্বরূপ নাড়ু হাতে ধারণ করে আছেন। তাই সর্বত্রই এই গণেশ মূর্তিব এক হাতে নাড়ু দেখা যায়।

জাতি উদ্ভবে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী অন্যান্য জাতি যেমন তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার ইত্যাদির মতই এই জাতিও শিব কর্তৃক সৃষ্ট। সে যাই হোক পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ও সংকরায়ন-এর ক্ষেত্রে এই জাতির উদ্ভবের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এবা ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান। এদের একদিকে উত্তম সংকর এবং অন্যদিকে সৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত কবা হয়েছে। [৮]

বঙ্গে বিস্তৃতি ঃ— বঙ্গে এই জাতি সর্বত্রই বিস্তৃত— তার কারণ হল বঙ্গে বাঙালি জাতি দেব আরাধনায় অতিমাত্রায় আসক্ত। তাই তাদের বাড়িতে আর পাঁচজন পোষ্যের মত বেশ কয়েকটি দেব-দেবীও বর্তমান, ফলে তাদের সেবা, আরতি ও ভোগের জন্য মিষ্টান্নের প্রয়োজন। তাছাড়াও বাঙালি জাতি ভোজনরসিক বলে আখ্যাত। তাই একদিকে দেব আরাধনা, অন্যদিকে রসনা তৃপ্তির জন্য বাংলায় এই জাতির বিশেষ কদর লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে এদের পরিপূরক হিসাবে আর একটি জাতির উল্লেখ করতে হয়। সেটি হল গোপ জাতি। পূর্বে যেখানেই কোন দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হত তার পাশেই বসান হত এক ঘর গোপ ও এক ঘর মোদক। গোপেদের উৎপাদিত দুধ, ছানা, ঘি, মাখন, দই, ক্ষীর ইত্যাদিই হল মোদকদের মিষ্টান্ন শিল্পের প্রধান উপযোগী দ্রব্য— তাই এই দুই জাত পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

সাহিত্যে স্বীকৃতি ঃ— অন্যান্য জাতির তুলনায় এই জাতি নবীন হলেও মধ্যযুগীয় বহু সাহিত্যে এদের সবিশেষ উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় এবং এরা যে কত রকমের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারত তারও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়।

রামায়ণের বাঙালি অনুবাদক কবি কৃত্তিবাস ওঝা রাম-সীতার বিবাহ উপলক্ষে মিষ্টান্ন প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন—

ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস।।

চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেও কৃষ্ণদাস গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

মুদ্গ বড়া, মাষবড়া, কলার বড়া মিষ্ট।
ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি যত পিঠা ইষ্ট।।

দেবতৃপ্তির জন্য তখনকার দিনেও মোদকদের দিয়ে সুন্দর করে বহুবিধ মিষ্টান্ন তৈরি করানো হত। উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যায়—

তিলের কদম্বা নাড়ু কর ভাল মতে।
চিক্কন করিবা কৃষ্ণ রুচি হয় জাথে।। (৯)

দেবতৃপ্তি ও সেই সঙ্গে মানুষেরও রসনা তৃপ্তির জন্য মধ্যযুগে মোদক সম্প্রদায় বিভিন্ন ধরণের সুস্বাদু মিষ্টান্ন তৈরি করে গ্রামে গঞ্জে তা বিক্রয় করত। মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে সে বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেছেন—

মোদক প্রধান জনা করে চিনি কারখানা
খণ্ডলাড় করয়ে নির্ম্মাণ।
পসরা করিয়া শিরে নগবে নগরে ফিরে
শিশুগণে করয়ে যোগান।।

প্রথম দিকে মাথায় করে মিষ্টান্ন ফেরি করলেও দিন পরিবর্তনের সঙ্গে পরবর্তীকালে মোদক সম্প্রদায় শহর ও গঞ্জে স্থিতু হয়ে স্থায়ী বিপণন কেন্দ্র খুলে মিষ্টান্ন শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছে।

সৃষ্টি সম্ভার ঃ— প্রাচীনকাল থেকে এই সম্প্রদায় যে সকল মিষ্টান্ন তৈরি করত তাদের অনেকের নাম মাধুর্য যেমন ছিল অতীব সুন্দর, তেমনি সেগুলি স্বাদেও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু সেই সকল সুন্দর নামবিশিষ্ট ও সুস্বাদু অনেক মিষ্টিই আজ হারিয়ে গেছে বা অবলুপ্ত হয়েছে তবুও বিভিন্ন বৈষ্ণব পদাবলী ও কাব্যকাহিনী ঘেঁটে এবং প্রবীণদের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা কিছু প্রাচীন মিষ্টান্নের নাম— যা মোদকরাই তৈরি করত তা উল্লেখিত হল। যেমন— কাঞ্চনলতিকা, লবঙ্গলতিকা, মৌক্তিকাক্ষ বা মোতিচুর, ক্ষীরপুলি, ক্ষীরখন্ড, ক্ষীরমোহন, বৈকুণ্ঠভোগ, গোপালভোগ, কমলাভোগ, সারদাভোগ, রাজভোগ, বাদশাভোগ, দিলখুশ, দরবেশ, তোতাপুরি, রসমাধুরী, রসমালাই, বালুসৈ, পেড়া, মালপোয়া, হীরামণি, কালাকাঁদ, মৌচাক, চিত্তরঞ্জন।

এখন অঞ্চলকেন্দ্রিক বিশেষ স্থানের কিছু প্রখ্যাত মিষ্টির নাম করা যেতে পারে। যেমন— বাঁকুড়ার মেচা, বরাকরের জিলাপি, দুবরাজপুরের বাতাসা, মানকরের কদমা, জয়নগরের মোয়া, সাহেবগঞ্জের খইচুর, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, মাহাতার ক্ষীরতক্তি, সিউড়ির মোরব্বা।

এছাড়াও সুস্বাদু সন্দেশের কথা বাদ দিলেও বর্তমানে সব থেকে আকর্ষণীয় মিষ্টি তুলতুলে, রসেভর্তি, নরম রসগোল্লার কথায় বলা যায়, যা ১৮৬৮ খ্রিঃ কলকাতার বাগবাজারের নবীন চন্দ্র দাস কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বর্তমানেও তা বিশেষভাবে আদৃত। (১০) এর পরে বলা যায় বর্ধমানের

বিখ্যাত মিষ্টি সীতাভোগ ও মিহিদানার কথা। এগুলি ১৯০৪ খ্রিঃ বর্ধমানের রাজা বিজয়চাঁদ মহাতব তাঁর বিশেষ অতিথি লর্ড কার্জনকে মিষ্টিমুখ করাবার জন্য বর্ধমানের প্রখ্যাত মিষ্টান্ন শিল্পীকে দিয়ে ঐ দু'টি নতুন মিষ্টি তৈরি করিয়েছিলেন। তখন থেকেই তা জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। (১১) তাই দেখা যায় যুগে যুগে মোদক সম্প্রদায় বিভিন্ন নামের, বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টি তৈরি করে দেবতার ভোগ ও মানুষের তৃপ্তি সাধন করছে।

উপবিভাগ ঃ— বঙ্গের আর পাঁচটি জাতির মতই এই মোদক জাতিও নিজেদের মধ্যে কতকগুলি উপবিভাগে বিভক্ত। যেমন— রাঢ়ী, মুর, ওঝাউৎ, ধর্মসূত, মধু, কুড়ি ও কুলে ইত্যাদি। এই বিভাগগুলি সাধারণত আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত। যেমন— রাঢ়ী মোদক বলতে প্রধানত দক্ষিণ রাঢ়ের মোদকদেরই বোঝায়, মুর হলো মৌরাক্ষী নদী অঞ্চলের বাসিন্দা, ওঝাউৎ হলো মেদিনীপুরের বাসিন্দা আর পুরুলিয়া অঞ্চলের মোদকরা হলো ধর্মসূত। মধু সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা যায়— এদের পূর্বপুরুষ ছিল নাপিত সম্প্রদায়ের মধু নাপিত, কিন্তু কলিযুগতারণ, নদীয়ানন্দন নিমাই, সন্ন্যাস গ্রহণকালে কাটোয়ায় মধুর কাছেই মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন। তাই মহাপ্রভুর আশীর্বাদে যে হাতে মহাপ্রভুর মাথা মুড়িয়েছিলেন সেই হাতে আর ক্ষৌরকর্ম না করে দেব ও মানবের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে টারু ধরে মোদক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন— তাই তার বংশধরেরা মধু-মোদক নামে খ্যাত। এছাড়া কুড়ি সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা যায় যে রাঢ়ের কুড়ি ঘর ময়রা পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসতি করে— পরে তারাই সেখানে কুড়ি মোদক নামে খ্যাত হয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আরও দুটি থাক লক্ষ্য করা যায়— তারা হল— জাতি ও কুলে।

পদ-পদবী, গোত্র, টোটেম ঃ— এই সম্প্রদায়ের পদ-পদবী, গোত্র, টোটেম বিষয়ে বলা যায় যে, এদের মধ্যে দাস, দত্ত ও নাগেরা হলো মৌদগল্য গোত্রীয় এবং টোটেম বা ট্যাবু হিসাবে এরা মৌচাক ভাঙে না। বরাট, সেন, রুজ ও উজ— এরা হলো ষাণ্ডিল্য গোত্রীয়, এরা ষাঁড় বয়না ও সাঞ্চা শাক খায় না। কাশ্যপ গোত্রীয় দে, কর, মিত্র— এরা কচ্ছপ খায় না। লাহা, রক্ষিত ও গুঁইরা হলেন গৌতম গোত্রীয়। এরা কেউ গুঁতে মাছ খায় না। এছাড়া ভদ্রদের মধু ঋষি, সিংহদের অমৃত ঋষি, কুণ্ডদের ব্যাস ঋষি (যারা বিড়াল মারে না) ইত্যাদি গোত্রও দেখা যায়।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা চালু ছিল এবং তাদের উপাধিগুলি হ'ল যথাক্রমে— আস, দাস, নন্দী, বরাট। এছাড়াও মোদক সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও কিছু পদবী বর্তমান। যেমন— সিংহ, ভদ্র, কুণ্ডু, প্রামাণিক, সাউ, মোদক, রানা।

সামাজিক আচার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ঃ— এই সমাজে কৌলীন্য প্রথা চালু থাকায় বিশেষ করে কুলীনরা আপন আপন গোত্র বিভাগের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের

বিবাহ কার্য সমাধা করত। কিন্তু দিন পাল্টে যাওয়ায় এখন আর সেই কৌল কাঠিন্য নাই। বিবাহেব ক্ষেত্রে থাক বিচার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আজ উঠে গেছে। সেদিক থেকে এদেব মধ্যেও তা শিথিল হয়ে গেছে। পূর্বে এই সম্প্রদায়েব মধ্যে কন্যাপণ চালু ছিল কিন্তু বর্তমানে বরপণই চালু হয়েছে।

মৃতের পব শবদাহ কবে একমাস অশৌচ পালনই বিধি ছিল। বর্তমানে তাও কমিয়ে এনে ১৫ দিনে করা হযেছে। ধর্মীয অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিবকে এরা সৃষ্টিকর্তা হিসাবেই মান্য করে তাই শিব-দুর্গা সংক্রান্ত যাবতীয অনুষ্ঠান এবা নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে। আর যেহেতু গণেশ এদেব দ্বারা তৃপ্ত হয়েছিল তাই গণেশও এদের আবাধ্য দেবতা। তাছাড়া বঙ্গের শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণব— এই ত্রিধারা ধর্মস্রোতে ইচ্ছামত এরা অবগাহন করে থাকে।

গোপভূমে মোদক সম্প্রদায়ের বিস্তার ও প্রভাব ঃ— পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে— যেখানে দেব-দেউল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই মোদক জাতির প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে গোপভূমে দেব-দেউলের তো অভাব নেই তাই প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলে মোদকদের একটা বিস্তৃত অংশ সবিশেষ বিস্তৃত। শুধু বিস্তৃতই নয় তারা গোপভূমের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ ধরণের মিষ্টান্ন তৈরি করে আপন আপন কৃতিত্বেরও পরিচয় প্রদান করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল মানকরে তাদের সৃষ্ট কদমা যা বঙ্গের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এখানকার কদমা ছোট থেকে শুরু করে ৫/৬ কেজি পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে যা সচরাচর অন্য কোথাও দেখা যায় না। এ ব্যাপারে মানকরের সেই অতীত ঐতিহ্য এখনও বর্তমান আছে।

গোপভূমের সর্বত্রই এই জাতির বাস এবং প্রতি গ্রামেই এই সম্প্রদায়ের মিষ্টির দোকান লক্ষ্য করা যায়। তবে শহর ও গঞ্জে এদের জমজমাট মিষ্টির দোকান সর্বত্রই দেখা যায়। সেদিক থেকে মিষ্টির কারবারে এদের সবিশেষ প্রভাব দেখা গেলেও এই শিল্পে ওদের পূর্বের সেই জাঁকজমক ও একাধিপত্য অনেকখানিই হারিয়ে গেছে। তার কারণ হিসাবে উল্লেখ্য হল— প্রথমত— পূর্বে এরা আপন দেশীয় পদ্ধতিতে নিজেরাই গুড় থেকে চিনি তৈরি করত এবং সেই চিনি দিয়েই মিষ্টি তৈরি হত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে দেশে চিনি কল তৈরি হওয়ায় ওদের সেই প্রভাব বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হল। দ্বিতীয়ত— এই শিল্পে এখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রবেশ ঘটে গেছে। ফলে এই ব্যবসায়ে মোদকদের একাধিপত্য অনেকখানিই হ্রাস পেয়েছে। তৃতীয়ত— বর্তমান প্রজন্মে ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকেই জীবন সংগ্রামের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ করায় আপন বৃত্তি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই বলা যায় এই সম্প্রদায় তার আপন বৃত্তির ক্ষেত্রে পূর্বের সেই প্রাধান্য ও জৌলুস অনেকখানিই

হারিয়েছে, তবুও রাঢ় বঙ্গে দেবসেবা ও মানবের রসনা তৃপ্তিতে এরা এখনও সবিশেষ পারদর্শী।

—ঃ তাম্বুলী ঃ—

তাম্বোলি বন্দর ও তাম্বলী সম্প্রদায়ের বিকাশ— প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণাংশের দণ্ডভুক্তি অঞ্চলের এক সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। এই বন্দর তখনকার দিনে আরও বিশেষ বিশেষ নামে খ্যাত ছিল। যেমন— তমালিকা, তাম্রলিপ্তা, স্তম্ভপুর, দামলিপ্ত, তাম্বোলি ইত্যাদি। এই নামগুলির সঙ্গে দক্ষিণী জাতি তামিল ও তাদের ভাষা তামিলের বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান। [১২] আর সেই দেশ ও জাতিবাচক 'তামিল' শব্দটির সঙ্গে বঙ্গের বিশেষ জাতি তাম্বলী সম্প্রদায়ের ক্ষীণ সম্পর্কও লক্ষ্য করা যায়।

একদা এখানকার বাসিন্দারা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাই তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমেই তারা দেশ বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করত। সেই সকল ব্যবসায়ীদেরই বলা হত বণিক। সেই বণিক সম্প্রদায় বিশেষ বিশেষ পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ নামে খ্যাত ছিল। যেমন— যারা গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করত তারা গন্ধবণিক, যারা স্বর্ণদ্রব্য বিক্রয় করত তারা সুবর্ণবণিক, যারা শঙ্খদ্রব্য বিক্রয় করত তারা শঙ্খবণিক, যারা কাঁসার দ্রব্য বিক্রয়ে লিপ্ত ছিল তারা কংসবণিক, আর যারা মণিমুক্তা জাতীয় দ্রব্যাদির বিক্রেতা— তারাই মণিবণিক নামে খ্যাত ছিল। শেষোক্ত মণিবণিকদেরই একটি গোষ্ঠী, রূপনারায়ণ যেখানে পতিতপাবনী চিরশুদ্ধা ভাগীরথীর সঙ্গে গভীর আশ্লেষে মিলিত হয়েছে— সেখানেই তাম্বলি নামে এক বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলে।

সেখানকার অধিবসতিদের নিয়েই খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সেই তাম্বলিতেই দেব রক্ষিত নামে এক রাজা রাজত্ব শুরু করেন। অনেকের মতেই সেই রাজা দেব রক্ষিতই তাম্বুলী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা পুরুষ। যেহেতু সেই দেব রক্ষিত তার রাজ্যপাট তাম্বলিতেই শুরু করেছিলেন তাই তার সম্প্রদায় গোষ্ঠী 'তাম্বুলী' নামে পরিচিত হয়। (তাম্বলি > তাম্বুলী) পরবর্তীকালে সেই তাম্বুলী সম্প্রদায় রুজি-রোজগারের আশায় বিভিন্ন নদীপথে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে বসতি গড়ে তোলে।

আমরা জানি বঙ্গের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীই মিশ্র কৃষ্টির ফলে সৃষ্ট। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশে অতি সুসভ্য গোষ্ঠী হিসাবে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল— যারা আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এই দেশে প্রাচীন সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল যেমন হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতা ও তৎপরে অজয়-দামোদর, কোপাই-কুনুর তীরে গঠিত সভ্যতা, যা বর্তমানের গোপভূমের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, ভরতপুর, মহিষদল ইত্যাদিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই সভ্য জাতির সঙ্গে বহু পরে আগত আর্যজাতির প্রথমে সংঘাত

ও পরে পারস্পরিক মেলামেশায় উভয় কৃষ্টির সংমিশ্রণে বর্তমান বাঙালি জাতির সৃষ্টি— তাতে সন্দেহ নাই। এইভাবেই বঙ্গের আর পাঁচটি জাতির মতই একদিন দ্রাবিড়, আলপাইন এবং আর্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে তাম্বুলী জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল, [১৩] সেটা জোর দিয়েই বলা যায়।

উদ্ভব ও ইতিহাস ঃ— বঙ্গে এখন যে সকল জাতিগোষ্ঠী বর্তমান তা সবই মিশ্র কৃষ্টির অবদান। বঙ্গে কোন জাতিরই রক্তের বিশুদ্ধতা নাই, কেউ জোর করে সে দাবিও করতে পারেন না, কারণ যেখানে আর্য ও অনার্য কৃষ্টির মধ্যে সংঘাতের বদলে সংমিশ্রণ শুরু হল সেখানে রক্তের বিশুদ্ধতা আশা করা অর্থহীন। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডঃ অতুল সুর এই মতের সমর্থনেই বলেছেন— "জগতের আর সব জাতির রক্তই কলুষিত।" [১৪] বিশেষ করে সমাজে অনুলোম (উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মহিলার বিবাহ) চালু থাকায় রক্তের বিশুদ্ধতা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থেও তার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই রকমই এক শাস্ত্র গ্রন্থ বৃহদ্ধর্ম পুরাণে উল্লেখিত হয়েছে যে, বৈশ্য পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার (প্রতিলোম) মিলিত সন্তান হল তাম্বুলী সম্প্রদায়। সেদিক থেকে এদের উত্তম সংকর পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। কোথাও বা এদের সৎশূদ্রও বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে বল্লাল সেনের কালে নবশাখ বিভাগেও ফেলা হয়েছে। [১৫] নবশাখ বিষয়ে বলা হয়েছে—

গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মদক বারুজী।
কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।।[১৬]

এই নয়টি জাতিগোষ্ঠীকেই নবশাখ বলা হয়। নবশাখ বলতে বোঝায় এরা জলচল জাতি অর্থাৎ যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করেন। [১৭]

কৌম সমাজব্যবস্থা ঃ— পূর্বে সমাজে জাতিভেদ প্রথা চালু ছিল না। যা ছিল তা হল কৌম সমাজ। অর্থাৎ বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। তারপরে যা এল তাতেও জাতিভেদ ছিল না, ছিল পদাধিকারী ঘটিত বৃত্তিভেদ। পরে আর্যায়নের ফলে এল চতুর্বর্ণ বিভাজন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বিভাগ। শুরুতে এই বিভাজনের মধ্যেও সামাজিক সচলতা ছিল অর্থাৎ শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারত। তাই দেখা যায় ক্ষত্রিয় কুলতিলক বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন।

পরবর্তীকালে পালযুগেও সমাজ উদার ছিল। তারপরে সেনযুগে এসে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য সুদৃঢ় হওয়ায় নতুন করে জাতিবিন্যাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল। তাতে ব্রাহ্মণ ছাড়া সকল সম্প্রদায়কেই বর্ণসংকর বলে অভিহিত করা হল। কিন্তু তা আদৌ সঠিক সিদ্ধান্ত নয়— পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সময়েই বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব দৃঢ় হয়। তখনই ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত সম্প্রদায়কেই বণিক বলে চিহ্নিত করা হয়। সেই বণিক সম্প্রদায়ের

মধ্যেও বিভিন্ন বিভাজন সৃষ্টি করে যারা মণি-মুক্তার ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল তখন তাদের মণিবণিক বলে অভিহিত করা হ'ল। এদের বসতি ছিল প্রধানত সমুদ্রকূলে। পরে তাদেরই এক শাখা বিভিন্ন নদীপথে রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে বারুই জাতির উৎপাদিত পানকে পণ্য হিসাবে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে তা ক্রয় বিক্রয়ে লিপ্ত হল। এইভাবে তাম্বুল বাগান তাদের বিক্রয় পণ্য হওয়ায় তারা 'তাম্বুলী' নামে খ্যাত হল। পান কেনাবেচা করে বলেই গ্রাম-গঞ্জে অনেকেই এদের 'পান্তি'ও বলে। এইভাবেই তাম্বুলী জাতি বা সম্প্রদায় বৈশ্য জাতিতে পরিণত হয়।

সামাজিক বিভাগ ঃ— বঙ্গে তাম্বুলী সম্প্রদায়কে অঞ্চল বিশেষে বিশেষ কয়েকটি থাকে বা বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন— প্রাচীন তাম্রলিপ্ত, বর্তমানে তমলুক সন্নিহিত তাম্বুলী সম্প্রদায় তমলুক তাম্বুলী, বর্ধমানের তাম্বুলীরা বর্ধমানী তাম্বুলী, আরামবাগের জাহানাবাদ অঞ্চলের তাম্বুলীরা জাহানাবাদী ও রাজহাট অঞ্চলের তাম্বুলীরা রাজহাটী তাম্বুলী ইত্যাদি নামে বা বিভাগে খ্যাত।

ধর্মীয় রীতি ও সামাজিক অনুষ্ঠান ঃ— ধর্মকর্মের দিকে শুরুতে এই জাতি বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল— তার প্রমাণ অতি প্রাচীনকালের বহু শিলালেখ, তাম্রশাসন ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। শুরুতেই যাকে এই জাতিগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে সেই দেব রক্ষিতও বৌদ্ধ ছিলেন।

খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে রাঢ় বঙ্গের বহু পরিবারই বৌদ্ধ ছিলেন তন্মধ্যে তাম্বুলী বংশোদ্ভুত বহু রক্ষিত পদবী ও দত্ত পদবীর উল্লেখ্য ব্যক্তি, যেমন— শান্ত রক্ষিত— যিনি ওদন্ত বিহারের অনুকরণে তিব্বতে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন, কল্যাণ রক্ষিত— ইনি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন, শাক্য রক্ষিত— বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ 'হে বজ্রাভিসময় তিলক' গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। চক্রপাণি দত্ত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত— এরাও খ্রিষ্টীয় দশম শতকের বিখ্যাত বৈদ্য ছিলেন এবং এরা সকলেই তাম্বুলী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাছাড়াও সাঁচিস্তূপ নির্মাণেও অনেক বাঙালি বৌদ্ধমতাবলম্বী তাম্বুলীগণ বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন তার বহু প্রমাণ বিদ্যমান। এতে বোঝা যায় এই তাম্বুলী সম্প্রদায় বেশ প্রাচীন। শুরুতে এরা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পুষ্ট হলেও সেনযুগে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাড়-বাড়ন্ত শুরু হয় তখন ঐ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আওতায় এসে যায়।

ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি নীতি ঃ— রাঢ়ের গন্ধবণিকেরা যেমন তাদের জাতিদেবতা হিসাবে দেবী গন্ধেশ্বরীর পূজা করে থাকেন, বঙ্গে তাম্বুলী সম্প্রদায়ের তেমন কোন বিশেষ উপাস্য দেবতা না থাকলেও গোপভূমে ঐ সম্প্রদায়— যারা হাট মশলা ও লটকনের দোকান করেন তারাও গন্ধবণিকদের উপাস্য দেবী গন্ধেশ্বরীর পূজাও করে থাকেন। তাছাড়াও তারা বঙ্গের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন

প্রবাহ যেমন— শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব রসধাবায় আপন আপন ইচ্ছা অনুযায়ী অবগাহন কবে থাকেন।

তাম্বুলী সম্প্রদাযের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ অনুষ্ঠানে আগে থাকগত কঠোরতা পালন কবা হত, কিন্তু কালক্রমে তা দূরীভূত হয়ে গেছে। পূর্বে মৃতের অশৌচ পালনেব ক্ষেত্রে এরা এক মাসই পালন করত। বর্তমানে অনেক পরিবারই সেই মেয়াদ কমিয়ে বারো দিনে নামিয়ে এনেছে।

পদ-পদবী ও টোটেম ঃ— এখন রাঢ বঙ্গে তাম্বুলী সম্প্রদায়ের কিছু উল্লেখ্য উপাধি, গোত্র ও টোটেম বিষয়ে উল্লেখ কবে বলা যায় যে, এদের মধ্যে রক্ষিত, সেন, দে, কুণ্ডু, কব— এবা কাশ্যপ গোত্রীয় এবং টোটেম হিসাবে কেউ কচ্ছপ খায় না। দত্তরা ব্যাসঋষি গোত্রীয় এবং এরা বিড়াল মারে না। পাল, রক্ষিত, হালদার, পিরি, কর— এরা যান্ডিল্য গোত্রীয় এবং ষাঁড় বয় না। দাঁ, সিংহ, রক্ষিত, কর— এরা মৌদগল্য গোত্রীয়— মৌচাক ভাঙে না। সিংহ, লাহা, কব— এরা ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং টোটেম হিসাবে এবা ভেল করা মাছ খায় না। পবাশর গোত্রীয় দত্তরা পলাশ গাছ কাটে না। গৌতম গোত্রীয দাসেরা শুঁতে মাছ খায় না। সপ্তর্ষি গোত্রীয কুণ্ডুরাও সাপ মাবে না আব যজ্ঞঋষি গোত্রীয় নন্দীরা যজ্ঞডুমুরের গাছ কাটে না ও যজ্ঞডুমুর খায় না। [১৮]

—ঃ শৌণ্ডিক/শুঁড়ি ঃ—

প্রাচীনত্ব ও নামকরণ ঃ— বঙ্গে শৌণ্ডিক জাতি যে খুবই প্রাচীন তার বহু প্রমাণ বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে জাতিগোষ্ঠীর বর্তমান পরিকাঠামোর বহু পূর্বে বৌদ্ধধর্মীয় তান্ত্রিকতায় শৌণ্ডিক জাতির বিশেষ উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনত্বের দিক থেকে বলা যায় যে, "বৌদ্ধ তন্ত্র যত প্রাচীন, জৈন ও হিন্দুতন্ত্র তত প্রাচীন নয়।" [১৯] সেই বৌদ্ধতন্ত্রের বহু দেব-দেবীব পূজায় মদ্য ছিল প্রধান উপকবণ আর সেই মদ্য যারা প্রস্তুত করত, তারাই হল শৌণ্ডিক সম্প্রদায়। তাই এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য।

বাংলা ভাষার উৎপত্তির সূচনা পর্বে খ্রিষ্টীয় নবম-দ্বাদশ শতকে সৃষ্ট আধ্যাত্মিকতার জারক রসে জারিত চর্যাগীতির বহু পদেও শৌণ্ডিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ লক্ষ্য কবা যায়। তারই একটি পদে বলা হয়েছে—

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅন বাকলঅ বারুনী বান্ধঅ।।

এক ঘুড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল।। [২০]

এখানেও এক শৌণ্ডিক মহিলার ও নলবিশিষ্ট যন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। এখন এই জাতির নাম শৌণ্ডিক কেন? তার উত্তরে বলা যায়— "শুণ্ডক যন্ত্রের সাহায্যে মদ্য প্রস্তুতকারীদের নাম দেওয়া হয়েছে শৌণ্ডিক।" [২১] শুণ্ডক যন্ত্র হ'ল— নলবিশিষ্ট পাত্রের দ্বারা তরল পদার্থরূপী সুরা বা মদ্যের উৎপাদন। এই তরল পদার্থটিই নল থেকে নির্গত হওয়ায় তাকে শুণ্ডা বা সুরা বলা হয়। আর যে সম্প্রদায় এই যন্ত্রের সাহায্যে সুরা বা মদ্য প্রস্তুত করে তাদেরই শৌণ্ডিক বলা হয়ে থাকে যা অপভ্রংশে শৌণ্ডিক > শুড়ি হয়েছে। সেদিক থেকে এই জাতির বৃত্তি হ'ল মদ উৎপাদন ও তা বিক্রয় করা। এ বিষয়ে West Bengal District Gazetteers এ বলা হয়েছে— "Although liquor making happens to be their traditional occupation very few of them engaged in household industries." [২২]

মদ তৈরির জন্য এই সম্প্রদায় বিভিন্ন গাছ-গাছালি দিয়ে বাখর তৈরি করে। পরে বিভিন্ন ফল বা ভাতের সঙ্গে চিনি বা গুড় মিশিয়ে তাতে সেই বাখর মিশিয়ে, বর্তমানে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি ঈস্ট মিশিয়েও এক ধরণের জারক তৈরি করে নিয়ে তা শুণ্ডক যন্ত্রে ফেলে মদ তৈরি করে থাকে।

উৎপত্তি ও বিভাগ ঃ— এই প্রাচীন শৌণ্ডিক জাতির উৎপত্তি বিষয়ে কয়েকটি অর্বাচীন পুরাণ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

"গোপাচ্ছূদ্রা গর্ভ জাতৌ ধীবর শৌণ্ডিকৌ তথা"। অর্থাৎ গোপের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে ধীবর ও শৌণ্ডিকের জন্ম। অন্যদিকে আর এক শাস্ত্রকার পরাশরের 'পরাশর পদ্ধতি'তে বলা হয়েছে—

"ততো গন্ধিক কন্যায়াং কৈবর্তাদেব শৌণ্ডিকঃ"। অর্থাৎ কৈবর্তের ঔরসে গান্ধিক কন্যার গর্ভে শৌণ্ডিকের জন্ম। [২৩] এইভাবে বিভিন্ন পুরাণকার ও শাস্ত্রজ্ঞের মধ্যে এই জাতির উৎপত্তি বিষয়ে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও একটা কথা বেশ স্পষ্ট যে, এই সম্প্রদায় সংকর গোষ্ঠীভুক্ত। অবশ্য ভারতে সকল সম্প্রদায়ই যেখানে সংকরায়নের প্রভাবপুষ্ট সেখানে এই গোষ্ঠীও তাই হবে তাতে বলার কিছু নাই। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' বাংলার সকল জাতিকেই সংকর জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে তাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে যথা— (১) উত্তম সংকর, (২) মধ্যম সংকর এবং (৩) অন্ত্যজ। [২৪] সেদিক থেকে এই সম্প্রদায়কে মধ্যম সংকর পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। শাস্ত্রে এদের শূদ্র হিসাবে পরিগণিত করা হলেও সমাজে এরা মদ উৎপাদন ও বিক্রয়জনিত ব্যবসা পরিচালনা করায় এরা বৈশ্যবৃত্তিতে নিযুক্ত।

ব্যবসায়ী বা বণিকদের অনেক সময় 'সাধু' বলা হয়। সেই সাধু থেকে > সাহ, তা থেকেই এরা সাহায় পরিণত হয়েছে। (সাধু > সাহ > সাহা) সে যাই হোক এই 'সাহা'

পদবীই শৌণ্ডিকদের প্রধান পদবী। এই সম্প্রদায়ের আর একটি প্রধান পদবী হ'ল 'মণ্ডল'। পদবীটি সম্ভবত অন্য কারণে এসেছে— তা হ'ল সমাজে একদা এদের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি থাকায়, গ্রাম্য-বিচারাদিতে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে এরা সেখানকার প্রধান হওয়ায় পরে মণ্ডল পদবীতে ভূষিত হয়ে যায়।

বিভাগ ঃ— অন্যান্য সকল জাতির মত এই জাতির মধ্যেও মূলত ৪টি থাক বা বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। তবে এই বিভাগগুলি সবই অঞ্চলভিত্তিক বিভাগ। যেমন— মৈথিলি, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বাঙ্গ্য। এদের মধ্যে রাঢ়ীয় শৌণ্ডিক থাকের আবার ২টি শ্রেণী বর্তমান। যথা— (১) চতুরাশ্রম (২) সপ্তগ্রাম। এখন চতুরাশ্রম বলতে মুখ্যত চারটি গ্রাম বা অঞ্চল যথা নগর, মায়াপুর, ফুরফুরে ও বর্ধমানের শৌণ্ডিক সম্প্রদায় সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করায় তাদের থাককে 'চতুরাশ্রম' বলা হয়। এদের সম্পর্কে একটি চলতি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কেষ্টা ফুরফুরে মায়াপুর
বর্ধমানে আশ্রম চতুর।

অন্যদিকে হাওড়া, পোড়ো বসন্তপুর, গোপডাঙ্গা, বহরমপুর, বনগাঁ, সপ্তগ্রাম ও বর্ধমান— এই সাতটি গ্রামে এক সমাজবদ্ধ হয়ে যারা বাস করেন তারা 'সপ্তগ্রাম' নামে পরিচিত।

এছাড়াও রাঢ়ীয় শৌণ্ডিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু ভিন্ন ভিন্ন নামে বা থাকে বিভক্ত হয়েছেন যেমন— চতুরাশ্রম থাকের যারা বার ঘর একত্রে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করেন তারা বারোঘরিয়া ও ময়না বনগ্রামে একযোগে বাস হেতু ময়নাবুনী নামেও পরিচিত হয়েছেন। যেসব রাঢ়ীয় চতুরাশ্রম শৌণ্ডিক সিংহাজারী অঞ্চলে বাস করেন তারা 'সিংহাজারী' শৌণ্ডিক, যারা দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী জয়বালিয়া গ্রামে বাস করেন তারা 'জয়বালিয়া' শৌণ্ডিক, অন্যদিকে হুগলী জেলার মান্দারণ পরগনায় বসবাসকারী চতুরাশ্রমভুক্ত শৌণ্ডিকগণ 'মান্দারণ' শৌণ্ডিক নামে পরিচিত হন। [(২৫)]

পদবী, গোত্র ও টোটেম ঃ— এখন এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান পদ-পদবী, গোত্র ও টোটেম বিষয়ে আলোচনায় আসা যাক। এ প্রসঙ্গে বলা যায় 'পদবীর কোন জাত নাই। পদবী সার্বজনীন। যে কেউ যে কোন বর্ণের পদবী ব্যবহার করতে পারেন এবং করছেনও।" [(২৬)] তবুও এই সম্প্রদায়ের সাবেক পদবী, গোত্র ও টোটেম প্রসঙ্গে বলা যায় 'সাহা' এদের প্রধান পদবী হলেও এই সাহাদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন গোত্র দেখা যায়। যেমন— ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, আনন্দঋষি ও বানঋষি ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের জন্য এদের আবার টোটেম ও আলাদা। যেমন— ভরদ্বাজ গোত্রীয়রা ভেল করা মাছ খায় না, কাশ্যপ গোত্রীয়রা কচ্ছপ খায় না, শাণ্ডিল্য গোত্রীয়রা ষাঁড় বয় না ও

সাঞ্চা শাক খায় না। বামঋষি গোত্রীয়রা বানমাছ খায় না ইত্যাদি। এছাড়াও এ সম্প্রদায়ের আর এক প্রধান পদবী হল 'মণ্ডল'। মণ্ডলদের মধ্যেও ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, মেঝ ঋষি, মার্কণ্ড ঋষি, গর্গ ঋষি ইত্যাদি গোত্রও রয়েছে— তার মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত গোত্রগুলির টোটেম নিষেধ একই, কেবল মেঝ ঋষিরা ময়ুর মারে না।

এছাড়া লায়েক, বাগ, খাঁ, মল্লিক, প্রামাণিক, বিশুই ইত্যাদি পদবীর গোত্র কাশ্যপ। এরা কচ্ছপ খায় না। চেল, সাহানা, মই, বিশুই, মিদ্যা— পদবীধারীরা ষাণ্ডিল্য গোত্রীয়— এরা ষাঁড় বয় না। এগুলি ছাড়াও 'সো-মণ্ডল' পদবীর গোত্র নাগ ঋষি— এরা সাপ মারে না।

পূজ্য দেব-দেবতা ঃ— রাঢ়ের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মত এই জাতিও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবপুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহু দেবদেবীকেই পূজা করে থাকে। প্রাচীনকালে এরা প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম ও পরে জৈন ধর্মের প্রভাব পুষ্ট ছিল। সে সময় বৌদ্ধ ও জৈন তান্ত্রিক সব দেব-দেবীদের পূজাতেই মদ ছিল প্রধান উপকরণ আর সেই উপকরণের এরাই ছিল একমাত্র সরবরাহকারী। তাই তখন সমাজে এদের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য শুরু হওয়ায় তাদের আরাধ্য দেব-দেবতার পূজায় মদের প্রয়োজন না হওয়ায়, বিশেষ করে যুগবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য শুরু হওয়ায়, তাদের গুরুত্ব কমে গিয়ে মিষ্টান্ন প্রস্তুত কারক মোদক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখা দিল। এখনও বৌদ্ধ প্রভাব প্রসূত কেবল মাত্র ধর্মঠাকুরের পূজায় মদের প্রয়োজন হয় এবং তা এই সম্প্রদায়ই প্রদান করে।

সে যাই হোক— যেহেতু মদ তৈরি করতে চাল বা ভাতের প্রয়োজন হয় আর ঐ চাল বা ভাত লক্ষ্মীরূপা— তাই এই সম্প্রদায় এর কাছে কুল দেবতা হিসাবে লক্ষ্মী বিশেষভাবে পূজিত হয়। এরা বাড়িতে কোজাগরী পূর্ণিমায় মৃন্ময়ী লক্ষ্মীর পূজা করেন এবং যেহেতু বঙ্গে বৃহস্পতিবারকে লক্ষ্মী বার হিসাবে মানার সংস্কার থাকায় সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার তারা মদের দোকান না খুলে মদ বিক্রয় বন্ধ রাখে।

লক্ষ্মী ছাড়াও তারা অন্যান্য দেব-দেবীদেরও পূজা করে থাকে এবং নানান হিন্দু সংস্কারও তারা মান্য করে থাকে। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা, বৌদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজা ও শিবের গাজন কোন কিছুই বাদ দেয় না।

সামাজিক অনুষ্ঠান ঃ— এই সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্বে থাক বা বিভাগের কাঠিন্য বেশ সুদৃঢ় ছিল কিন্তু যুগপরম্পরায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত এদের মধ্যেও সে ব্যাপারে বেশ শৈথিল্য এসে গেছে। পূর্বে এই জাতির মধ্যে কন্যাপণই চালু ছিল। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপকতা শুরু হওয়ায় শিক্ষিত উপার্জনক্ষম পাত্রদের পণ দেওয়াই এখন রীতিতে পরিণত হয়েছে। মৃতের ক্ষেত্রে শবদাহ করাই

রীতি এবং অশৌচ পালন এক মাসে করা হ'ত কিন্তু এখন তা কমে ১৫ দিনে এসে গেছে।

গোপভূমে বিস্তৃতি ঃ— রাঢ় বঙ্গের গোপভূমেও এদের বিস্তৃতি লক্ষণীয়। রাঢ়ীয় শৌণ্ডিক সম্প্রদায়ের চতুরাশ্রম ও সপ্তগ্রাম উভয় থাকের শৌণ্ডিকরাই গোপভূমে বিস্তৃত ছিল। শুরুতেই বলা হয়েছে এরা বেশ প্রাচীন জাতি। সেই বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের কাল থেকেই এরা এখানে বসবাস করে আসছে। গোপভূমে অরণ্যচারী অনুন্নত ও অন্ত্যজশ্রেণীর সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ বিক্রয়ের জন্যই শৌণ্ডিক সম্প্রদায় অরণ্যসঙ্কুল গোপভূমে বসবাস শুরু করেছিল। কথায় বলে 'অন্নের সুখে অরণ্যে বাস'। সেই মহাজন বাক্য শিরোধার্য করেই তারা এই অঞ্চলে বসতি গড়েছিল।

শুরুতেই বলা হয়েছে এরা বৌদ্ধধর্মীয় প্রভাব পুষ্ট ছিল। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ় বঙ্গে বৌদ্ধদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকায় তখন পর্যন্ত এই জাতি আপন প্রতিপত্তি বজায় রেখেছিল। পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকায় সমাজে বৌদ্ধ দেব-দেবীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তাদেরও প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে। বিশেষ করে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে সমাজে মোদক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি যেমন বাড়তে থাকে তেমনি এদের প্রতিপত্তি কমতে থাকে। ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারক ও পোষক ব্রাহ্মণদের বিষ নজরে পড়ে এরা সমাজে অচ্ছুৎ হয়ে পড়ে এবং ব্রাহ্মণদের জল অচল জাতে পরিণত হয় এবং পরে তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। West Bengal District Gazetteers এও বলা হয়েছে— "They belong to the Scheduled Caste". [(২৭)]

তা সে যাই হোক সমাজে এদের তৈরি মদ বেশ আদরের সঙ্গেই বিক্রীত হয়ে থাকে। তাই গোপভূমের প্রায় প্রতিটি গ্রামে এবং শহর ও গঞ্জে জাঁকজমকের সঙ্গে এদের মদের ব্যবসা চলছে। মদ তৈরি ও বিক্রি এদের জাতিগত বৃত্তি হলেও আজ অন্য সম্প্রদায়ের অনেকেই এই বৃত্তিতে অনুপ্রবেশ করেছে। তবুও এই জাতি আপন বৃত্তি সহ ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিকাজে উন্নতি করেছে। বর্তমানে শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নত হয়ে এবং সরকারি আনুকূল্যে চাকুরি লাভের বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়ে বেশ উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েছে।

—ঃ কৈবর্ত ঃ—

আগমন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ— কৈবর্ত জাতি মূলত সমুদ্রকূলের অধিবাসী। মাছ ধরার কাজেই এরা নিয়োজিত অর্থাৎ মৎস শিকারই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। সেদিক থেকে বলা যায় "কৈবর্ত জাতির মানুষ দক্ষিণ ভারতের আদিম জন।" [(২৮)] পরবর্তীকালে নদীপথের ব্যাপক উন্নতি হওয়ায় তারা অনেকেই সমুদ্র সৈকত ত্যাগ

করে রাঢ়ের উল্লেখ্য নদী ভাগীরথী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, দামোদর, অজয়, মৌরাক্ষী ইত্যাদি নদীপথে রাঢ়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রাঢ় বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অধিবসতি গড়ে তুলেছে। এই সম্প্রদায়েরই কিছু অংশ প্রাচীন গোপভূমে আশ্রয় নিয়ে এখানকার নদীনালা, খালবিলে মৎস্য শিকার করলেও সহায়ক বৃত্তি হিসাবে কৃষিকাজকেই জীবিকার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে।

কৈবর্ত জাতির উৎপত্তি বিষয়ে পৌরাণিক অভিমত নিতে গিয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে কৈবর্তদের সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে বৃহদ্ধর্মপুরাণে ঐ সম্প্রদায় সম্পর্কিত ধীবর ও জালিকদের কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই কৈবর্তদের উল্লেখ রয়েছে। কৈবর্তদের উদ্ভব বিষয়ে ঐ পুরাণেই উল্লেখ রয়েছে যে, কৈবর্তরা ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান। [২৯] পরে এই সম্প্রদায় ধীবরদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই ওরা ধীবর নামে পরিচিত হয়েছে এবং ধীবর বৃত্তিগ্রহণ করেছে। [৩০]

সংকরায়নের ক্ষেত্রে বাংলার সকল জাতিই যেখানে সংকরায়িত হয়েছে সেখানে কৈবর্তদের মধ্যেও যে সংকরায়নের প্রভাব পড়বে তাতে অবাক হবার কিছু নাই। দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত বাঙালি স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট কৈবর্ত গোষ্ঠীকে অন্ত্যজ পর্যায়ে ফেলেছিলেন। অন্যদিকে পাল পর্বে এরা শৌর্যশালী হয়ে পালরাজাদের পরাভূত করায় পরবর্তী পালরাজা রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রাজশত্রু কৈবর্তদের 'দস্যু', 'কুৎসিত কৈবর্ত নৃপ' এবং 'ভবস্য আপদম্' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করলেও আসলে শাস্ত্রমতে এরা মধ্যম সংকর পর্যায়ে পড়েছিল। তবুও এদের মধ্যে শৌর্যের অভাব তো ছিলই না বরং শিক্ষায়-দীক্ষায় বেশ উন্নত ছিল। তখনকার দিনে ১২০৬ খ্রিঃ সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃত কাব্যে কৈবর্ত কবি পপীপ রচিত গঙ্গাস্তবের ছন্দবদ্ধ এক বিনয় মধুর পদেই প্রমাণ হয় যে, এরা সাহিত্য চর্চাতেও পারদর্শী ছিল এবং বেশ উন্নত কৃষ্টিসম্পন্ন জাত ছিল।

এই কৃষ্টিসম্পন্ন জাত আপন কর্মকৌশলে ভূমাধিকারীর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছিল। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পাল আমলেই এদের প্রথম রাজনৈতিক পাদপ্রদীপে আসতে দেখা যায়। সেখানে দিব্য নামে এক বারেন্দ্রী কৈবর্ত নায়ককে আবির্ভূত হতে দেখি। "অনন্ত সামন্ত চক্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পাল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরায়ণ হইয়া রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন, এবং বরেন্দ্রী কাড়িয়া লইয়া সেখানে কৈবর্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।" [৩১] এইভাবে কৈবর্ত সম্প্রদায় একদা প্রাচীন বরেন্দ্র বঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। তার রাজধানী ছিল ডমরনগর যা সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের এক শ্লোকে জানা যায়। [৩২] কৈবর্তাধিপতি দিব্যই কেবল রাজত্ব করেছিলেন তা নয়, তার পরেও আরও দু'জন যেমন দিব্যর পর তার ভাই রুদোক ও তার পুত্র ভীমও

কৈবর্ত রাজত্বকে দীর্ঘায়িত করেছিলেন। তবে দ্বিতীয় মহীপালের পুত্র রাম, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া ও সেই সঙ্গে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের মানসে, চতুর্দশ সামন্ত চক্রকে নিজ পক্ষে টেনে নিয়ে সম্মিলিত আক্রমণে ভীমকে বন্দী ও নিহত করেন। তার পরেও হরি নামে এক কৈবর্ত সামন্ত, কৈবর্তদের সমবেত করে আক্রমণ হানলেও, রামপুত্র রাজ্যপালের হাতে বন্দী হযেছিল। ভাগ্যক্রমে তাহাদের রাজত্ব 'কৈবর্ত বিদ্রোহ'' নামে কলঙ্ক ললাটে ধারণ কবিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। (৩৩) তবুও বলা যায় এই জাতি বরেন্দ্রভূমে মোটামুটি ১০৭৫-১১০০ খ্রিঃ পর্যন্ত কিছুদিন রাজত্ব করেছিল। সেদিক থেকে জাতিগোষ্ঠী হিসাবে এরা বেশ প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

প্রাচীনত্ব ঃ— এই সম্প্রদায যে খুবই প্রাচীন— বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থেও তাব প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন প্রাচীন বিষ্ণুপুবাণে কৈবর্তদেব অব্রাহ্মণ্য বলা হয়েছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি বহির্ভূত। মনুস্মৃতিতে এদের দাস হিসাবে উল্লেখ কবলেও জাতি হিসাবে এদেরকে কৈবর্ত হিসাবেই উল্লেখ কবেছেন এবং উপজীবিকা হিসাবে নৌকার খেয়া পাবাপারের মাঝিরূপে উল্লেখ করেছেন। এদু'টি প্রাচীন সাক্ষ্য হতে বোঝা যায় যে কৈবর্তরা কোন আর্য-পূর্ব কোম বা গোষ্ঠী ছিলেন, এবং তাঁহারা ক্রমে আর্য সমাজের নিম্নস্তরে স্থান লাভ কবিয়াছিলেন। বৌদ্ধ জাতকের গল্পেও মৎস্যজীবীদের বলা হইয়াছে কেবত্ত = কেবর্ত। (৩৪) পরে ঐ 'কেবর্ত'ই কৈবর্ত হযেছে। শাস্ত্রে এদের যাই বলা হোক জাতি হিসাবে এরা যে খুবই প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই এবং এরা যে শৌর্যশালী জাত সে প্রমাণ তো পাল যুগেই পাওয়া গেছে।

জাতি হিসাবে এরা খুবই প্রাচীন। জীবিকা হিসাবে মৎস্য শিকাবের সঙ্গে নৌকা বাওয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও বর্তমানে তার সঙ্গে চাষ আবাদও যুক্ত হয়েছে। চাষ আবাদ যুক্ত হওয়ায় এরা কোথাও কোথাও চাষি কৈবর্ত হিসাবেও স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষ করে মেদিনীপুরে বহু জমি-জমা নিয়ে এবং তালুক-মুলুক নিয়ে এরা বেশ সম্ভ্রান্ত অবস্থায় স্থিত। সে যাই হোক প্রাচীনকালের কৈবর্ত, কেবট, পরে মাহিষ্য ও চাষি কৈবর্ত, এমনকি জেলে, কেওট সবই একাকার হয়ে বর্তমান কৈবর্তে পরিণত হয়েছে।

বিভাগ ঃ— এই জাতি শুরুতে দুইভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন— জালিক ও হালিক। এই জালিকরাই মৎস্যজীবী ধীবর বা কৈবর্ত নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গে এখনও এদের অবস্থান বেশ লক্ষ্য করা যায়। অন্য গোষ্ঠী হালিকরা হাল নিয়ে চাষ আবাদে নিযুক্ত তাই তাদেরকে হালিক বলা হয়। এই হালিকরাই পরবর্তীকালে মাহিষ্য নামে খ্যাত হয়ে চাষি কৈবর্ত হিসাবে পরিগণিত হয়। শুরুতে মাহিষ্য ও কৈবর্তদের মধ্যে বনিবনা ছিল না কারণ সেন-বর্মণ-দেব পর্বেও এদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের

কোন নিদর্শন তৎকালীন কোন শাস্ত্রগ্রন্থ বা পুরাণ স্মৃতিতেও উল্লেখ নাই। তাই বোঝা যায় এই বিভাগ এবং বিভাগগত গোষ্ঠীর সংযোজন পরবর্তীকালেই সংঘটিত হয়েছিল।

পালপর্বে এই জাতিকে হীন চোখে দেখা হলেও, পরে পালেদের শত্রু সেনপর্বে এসে, সেনেরা পালযুগে কৈবর্তদের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টার প্রতিবাদে এবং বল্লাল সেনের প্রীতিভাজন হওয়ার প্রেক্ষিতে, ভবদেব ভট্টের অন্ত্যজ বলা সত্ত্বেও তাদের জলচলনীয় জাতে উন্নীত করা হয়েছিল। এবং পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায় তাদের মধ্যে দু'টি ভাগ জালিক (ধীবর) ও হালিক (চাষি কৈবর্ত বা মাহিষ্য) দের মধ্যে বিভাগগত কাঠিন্য দূরে সরিয়ে গিয়ে পরস্পরের একীভূত হযে যায়।

এখন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাগগত পার্থক্য অবলুপ্ত হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত এদের মধ্যেও অঞ্চলগত কিছু ভাগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী। অর্থাৎ দক্ষিণের সমুদ্র অঞ্চলসহ মেদিনীপুরের কৈবর্তরা দক্ষিণ রাঢ়ী আর বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কৈবর্তরা উত্তর রাঢ়ী নামে খ্যাত হলেও এদের মধ্যে আর একটি বিশেষ থাক লক্ষ্য করা যায় যাদের তুতিয়া বলা হয়। এর অর্থ এই সম্প্রদায়ের কিছু লোক আপন বৃত্তি ছাড়াও তুঁতগাছ ও গুটিপোকার চাষ করে থাকে তাই তাদের তুতিয়া কৈবর্ত বলা হয়। (৩৫) এছাড়াও সমগ্র কৈবর্ত জাতিকে আরও চারটি উপভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— লালচাটিয়া, একসিধে, দোসিধে ও মাকুন্দ। এই থাকগুলির বিশেষত্ব হল— একচেটিয়ারা বিবাহের আসরে লাল রং এর চাটাই বা মাদুরে বসতেন। একসিধেরা বিবাহের সময় কন্যার পিতার বাড়িতে কোন আহার্য গ্রহণ না করে কন্যার কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে প্রয়োজনীয় খাবারদাবার বা সিধা পাঠিয়ে দিয়ে সেখানে একবেলা খাওয়া দাওয়া করতেন। দোসিধারা দু'বারের জন্য সিধে পাঠিয়ে দিয়ে কন্যার বাড়িতে রন্ধন করিয়ে দু'বেলা আহার করতেন। আর মাকুন্দ থাকের ব্যক্তিরা কনের বাপের বাড়িতে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য লইয়া গিয়া কনের বাপের বাড়ির লোকজন এবং প্রতিবেশী হালিক চাষীদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করেন। (৩৬)

এই ধরণের বিলি ব্যবস্থা এখন আর নাই ঠিকই তবুও আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে এই ব্যবস্থা এখনও দেখা যায়। সেদিক থেকে বিবাহকালীন আহার্য গ্রহণের এই ধরণের পূর্ব নিয়ম চালু থাকার জন্যই কিনা জানিনা— অনেক সমাজবিজ্ঞানী এদের কোন আর্য-পূর্ব কোম বা গোষ্ঠী বলে অভিমত প্রদান করেছেন। পরে আর্যীকরণের প্রভাবে ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায়ের উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই।

উপরিউক্ত থাকবিভাগ ছাড়াও কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও তিনটি উপবিভাগ চালু আছে। যেমন— গজেন্দ্রী, উত্তর পালিয়া ও লক্ষ্মীনারায়ণ।

পদ-পদবী, গোত্র ও টোটেম :— সমগ্র কৈবর্ত সমাজের পদ-পদবী, গোত্র ও

টোটেম বিষয়ে আলোচনায় বলা যায় এদের মধ্যে পাল, পাত্র, গিরি, মণ্ডল, গায়েন, বেরা, ভৌমিক, দাস, ধাড়া, হাজরা, আদক, সাঁতরা, প্রধান ইত্যাদি পদবীর গোত্র হল যাণ্ডিল্য। এরা টোটেম ট্যাবুর নিষেধ বাবদ ষাঁড় বোয়ায় না ও শাল মাছ খায় না। মালা, মণ্ডল, গিরি, মৈশান, দাস, মহাপাত্র, রায়, হাতি, বঙ্গ, সেন, সামন্ত, ডিঙ্গল, পয়ড্যা, ঘাট, ঢক, গুছাইত, গুড়িয়া, মোড়াই, চাউলিয়া, প্রামাণিক, পড়িয়া, পাকড়াশী ইত্যাদি পদবীধারীবা কাশ্যপ গোত্রীয়। তারা কচ্ছপ খায় না। বাঘ, মাইতি, মান্না, মহাপাত্র, দাস, দাস কৈবর্ত, সিংহ, সাহু, শী এরা ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং টোটেম হিসাবে ভেল করা মাছ খায় না।

পরাশর গোত্রীয় মাইতি, মণ্ডল, দে এরা টোটেম বাবদ পলাশ গাছ কাটে না। বাউল, দে, মণ্ডল, গাড়ু, মাইতি, মেইকাপ, দাস, লুজাইত, সিংহ, বাউল, ব্যবর্তরা মৌদগল্য গোত্রীয়, এরা মধু খায় না বা মৌচাক ভাঙে না। এছাড়া নাগ গোত্রীয় মাকুড়রা সাপ মারে না বরং পূজা করে। তেমনি ব্যাস ঋষি গোত্রীয় বাঙ্গাল, মাঝি, মাইতি, মণ্ডল ও ধাড়ারা বিড়াল মারে না। (৩৭)

সামাজিকতা ঃ— পূর্বে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাগ ও থাকগত কাঠিন্য ব্যাপক থাকায় বিবাহের ক্ষেত্রে এরা আপন থাক ছাড়া অন্য থাকে বিবাহ দিত না, অর্থাৎ প্রথম দিকে এরা সগোত্র বিবাহের পক্ষপাতী ছিল। পরে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হওয়ায় নিজেদের মধ্যে থাকগত কাঠিন্য দূর হওয়ায় এখন ওরা বিবাহের ক্ষেত্রে আর থাকগত বাধা মানে না। বিবাহের ক্ষেত্রে বরপণই চালু আছে।

মৃতের ক্ষেত্রে এরা মৃতদেহ পুড়িয়েই সৎকার করে। মৃতাশৌচ পূর্বে এক মাস পালিত হলেও এখন তা কমিয়ে ১৫ দিনে করা হয়েছে। সামাজিক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে এরা গ্রাম্য বিচারের পক্ষপাতী। এতে গ্রাম মুখ্যা, ডেকো মুখ্যা ও পঞ্চভদ্রের প্রয়োজন হয়। তাতে ফয়সালা না হলে অঞ্চল বিচার ও পরে দেশ বিচারে যাওয়া যায়। সেখানকার বিচারই শেষ বিচার হিসাবে মেনে নেওয়া হয়।

ধর্মকর্ম ঃ— প্রাচীনকালে এই কৈবর্ত সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবপুষ্ট ছিল। তাই দেখা যায় সম্রাট অশোক এদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের নদী-নালায়, খালে-বিলে, হ্রদ ও জলায় অবাধ মৎস্য শিকারের অধিকার দিয়েছিলেন সে প্রমাণ তাঁর পঞ্চম স্তম্ভ লিপিতে (Piller Edict V) সবিশেষ লক্ষ্য করা যায়।

শুরুতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় বৌদ্ধদের বিভিন্ন তন্ত্রাচারে তারা অভ্যস্ত হয়ে ছিল। তাই বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানের আওতায় তারাও এসেছিল। তাই মন্ত্রযানীদের মন্ত্র বা চর্যায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

তরিত্তা ভব জলধি জিম করি মাঅ সুইনা
মাঝবেণী তরঙ্গম মুনিআ

পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুয়াল
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল।। (৩৮) এতে বলা হয়েছে—
মাঝনদীতে পারাপার কালে জাল ফেলে মাছ ধরাকে ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মোড়কে মায়াজালের উল্লেখ আছে।

পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাবল্যে বৌদ্ধধর্ম যখন ম্রিয়মাণ সেই সময় বৌদ্ধ দেবতা "নিরঞ্জনং নিরাকারং নৈরাকাং ব্রহ্মাদিসুর বন্দিতং" (৩৯) ধর্ম ঠাকুরের রূপ ধরে তাদের আশ্রয়ে আশ্রিত হয়। ফলে রাঢ় বঙ্গে ধর্মের প্রধান আশ্রয় দাতা ডোম পণ্ডিতদের মতো এই সম্প্রদায়কেও বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা যায়। তাই ডোম পণ্ডিতদের মতো এদের অনেককেই তামার বালা যা ব্রাহ্মণদের পৈতার মতই তাও ধারণ করতে দেখা যায়।

পরে পরে এই সম্প্রদায় যখন পরিপূর্ণভাবে হিন্দুধর্মের আওতায় এসে যায় তখন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীকে এরা পূজা করতে শুরু করে। এই সম্প্রদায়ের জাতিদেবতা তেমন কিছু না থাকলেও এরা শীতলা পূজাও বেশ ধুমধামেই করে। আবার নদীনালায় মাছ ধরতে যাওয়ায় সর্পাঘাতের সম্ভাবনা বেশি থাকায় এরা সর্পদেবী মনসাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বর্ষাকালে ঝাপান সহ মনসার পূজা করে থাকে। তাই মনসা এদের কাছে কুলদেবীর মতই পূজিত হয়। সর্বোপরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনে এরাও বিশেষভাবে স্নাত হয়। এ ব্যাপারে বৈষ্ণব সাধক ও পদকর্তা বাসু ঘোষ এদের বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষায় সাহায্য করেন।

গোপভূমে বিস্তার :— পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কৈবর্ত জাতি সমুদ্র অঞ্চলেরই অধিবাসী। পরে তারা বিভিন্ন নদীপথ ধরে রাঢ় বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। তারাই এখানকার নদী-নালা, খালে-বিলে, পুকুর ও ডোবায় মৎস্য শিকার সহ চাষ আবাদে নিযুক্ত আছে। সেই রাঢ় বঙ্গে ছড়িয়ে পড়া কৈবর্ত জাতির বেশ কিছু অংশ নদীকেন্দ্রিক গোপভূমেও বহুদিন ধরে বংশানুক্রমিকভাবেই বসতি গড়ে তুলেছে। সমগ্র গোপভূমে এদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। প্রায় সব গ্রামেই এদের কিছু কিছু দেখা যায়, বিশেষ করে নদীর ধারে ধারেই এদের সংখ্যা বেশি।

কৈবর্ত সম্প্রদায়ের আধিক্য সমুদ্র সংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলেই সবথেকে বেশি এবং সেখানে এরা শিক্ষায়-দীক্ষায়, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে বেশ উন্নত, সেই তুলনায় গোপভূমে এদের তেমন উন্নত অবস্থায় দেখা যায় না। এই সম্প্রদায় গ্রামে গঞ্জে মাছ ধরা ও মাছের চাষে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে থাকে। নদী ও তার দহগুলি বাদে এরা গ্রামের ছোট বড় প্রায় সব পুকুরেই মাছ চাষ করে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাদের উৎপাদন ও প্রজননের বৃদ্ধি ঘটিয়ে গ্রাম-গঞ্জে মাছের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এই কাজের ফাঁকে তারা আপন আপন জমিতে চাষ আবাদও করে

থাকে। তবে পূর্ব বঙ্গ থেকে উঠে আসা রিফিউজিরা মৎস্য চাষে ও মৎস্য শিকারে ব্যাপকভাবে অংশ নেওয়ায় ইদানীংকালে মাছ-চাষের কাজে তাদের একক আধিপত্য অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এখানকার কৈবর্তদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টায় সরকার বিশেষ আগ্রহী। তাই তাদের তফশিলি সম্প্রদায়ের আওতায় ফেলে সরকারি সহায়তার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। আর এরাও সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করে শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নত হয়ে সরকাবি সহায়তায় চাকুরি লাভে ও অন্যান্য বহুবিধ আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভে নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হযেছে।

ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ঃ—

—ঃ গন্ধবণিক ঃ—

নামকরণ, বৃত্তি ও উদ্ভব ঃ— রাঢ় বঙ্গে কৃষিজীবী জাতি শিল্পজীবী জাতি ছাড়াও আর এক শ্রেণীর জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপকতা ছিল— তারা হল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা বণিক সম্প্রদায়। দেশের মধ্যেতো বটেই, অনেক সময় দেশের সীমা ছাড়িয়েও তারা বিদেশেও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করত। তাই এরা বণিক নামেই খ্যাত ছিল। এই বণিক সম্প্রদায়কে আবার কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, যেমন গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, কংসবণিক, শঙ্খবণিক ইত্যাদি। এদের মধ্যে কেবল মাত্র গন্ধবণিকরাই অন্যান্য বণিকদের যেমন কংসবণিক, শঙ্খবণিক ও স্বর্ণবণিকদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে তা অন্যত্র বিক্রয় করত— অর্থাৎ তারা সেইসকল দ্রব্যের উৎপাদক ছিল না, কেবল মাত্র বিক্রয়কারক ছিল। সে অর্থে তারা বণিক কিন্তু তাদের গন্ধ-বণিক বলার কারণ হল— তারা অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে প্রধানত গন্ধ জাতীয় দ্রব্য সামগ্রীই বেশি বিক্রয় করত তাই তারা গন্ধবণিক নামে খ্যাত ছিল।

অতীতে স্থলপথের ব্যাপকতা না থাকায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত জল পথেই পরিচালিত হত। বিভিন্ন স্থান থেকে দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করে তা দেশীয় বাজারে বা দেশের সীমা ছাড়িয়েও অন্য দেশে বিক্রয় করে সেখান থেকে মূল্যবান দ্রব্য সকল ক্রয় করে নিয়ে এসে আপন দেশে বিক্রয় করত। এতে করে তারা প্রকৃতিতে ছিল বেশ সাহসী, সেই সঙ্গে দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করারও পক্ষপাতী ছিল।

এই গন্ধবণিক জাতির উৎপত্তি বিষয়ে যে পৌরাণিক কিংবদন্তী বা কাহিনী চালু আছে, তা রাঢ়ের তন্তুবায়, কর্মকার, মোদক ইত্যাদি জাতির মতই একই গোত্রীয়। সেখানে বলা হয়েছে যে, তারকাসুরকে বধ করার উদ্দেশ্যে শিব বীর্যে কার্ত্তিকেয়র

জন্মের জন্যই শিবের বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বিয়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়ে, শিব গন্ধ দ্রব্য সংগ্রহ করতে না পারায় তিনি নিজ দেহ থেকে চার জন দৈবপুরুষের সৃষ্টি করে তাদের গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করতে আদেশ দিলেন।

এই চারজন ব্যক্তি হল যথাক্রমে বিম্বট গুপ্ত, দেবদাস, শঙ্খভূতি ও আবট দত্ত। এখন শিবাদেশে বিম্বট যাত্রাকালে নারদের নির্দেশে গন্ধেশ্বরীর পূজা করে দেবীকে তুষ্ট করলে, গন্ধেশ্বরী দেবী গন্ধ দ্রব্যের অধিকারী গন্ধাসুরকে নিধন করলে বিম্বটের পক্ষে গন্ধ দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তখন দেবাদিদেব মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হবার বর দেন। পরে অন্যরাও তা সংগ্রহ করলে মহাদেব তাদেরও আশীর্বাদ করে গন্ধ দ্রব্যেব ব্যবসা বাণিজ্য করলে তাদের উন্নতি হবে জানান। ফলে সেই চারজনেরই বংশধরেরা গন্ধবণিক হিসাবে পরিচিত হয় এবং তারাই চার জনে গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ হিসাবে বিবেচিত হন।

সংকরায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থে এদের উৎপত্তির ব্যাপারেও মতান্তর রয়েছে। যেমন-- কোথাও বলা হয়েছে এরা ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান, আবার অন্যত্রে বলা হয়েছে— এরা অম্বষ্ঠ পিতা ও রাজপুত মাতার সন্তান। সে যাইহোক এদের উত্তম সংকর ও সৎ শূদ্র পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। (৪০)

প্রাচীনত্ব ও বিভাগ ঃ— বঙ্গে এই সম্প্রদায় যে খুবই প্রাচীন তার বহু প্রমাণ বিদ্যমান। বৌদ্ধ আমলেও এদের অবস্থান বেশ স্পষ্ট ছিল। রাঢ় বঙ্গে পাল যুগেও এদের রমরমা অবস্থা ছিল। এখানকার গন্ধবণিক অনেকেই সাঁচি বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণে সাহায্য করেছিল— তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল উজানির মূলাদত্ত, সঙ্খ দত্ত ইত্যাদি। জলপথে নৌকাযোগে এই জাতি বহু প্রাচীন কাল থেকেই বহির্বাণিজ্যে ও অন্তর্বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মধ্য যুগের বহু মঙ্গলকাব্যে বিশেষ করে চাঁদ বেনে ও ধনপতি-শ্রীমন্তর বাণিজ্য যাত্রায় তার স্পষ্ট আভাস লক্ষ্য করা যায়। "মৌর্য-শুঙ্গ আমল বা তাহারও পূর্ব হইতেই ইহাদের অভিযাত্রা সুরু হইয়া ইংরাজ আমলের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলিয়াছে। অবশ্য জল পথে অভিযান সেন আমল হইত মন্দীভূত হইতে হইতে ইংরাজ আমলের বহু পূর্বেই একেবারে স্তব্ধ হইয়াছে।" (৪১)

প্রাচীনতার দাবিদার এই জাতি গোষ্ঠীকে পূর্বে উল্লেখিত চারজন আদি পুরুষের নাম অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং পরে পরে তাদের মধ্যে আবার বহুবিধ ভাগ-উপভাগেরও সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, "বৌদ্ধযুগে বেনেদের ভিতর চারিটি আশ্রম ছিল— ছত্তিক আশ্রম, দেশ আশ্রম, সঙ্খ আশ্রম ও রাউত আশ্রম। যাহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধুপ, ধুনা, অগুরু, চন্দন বেচিত; তাহাদিগকে সঙ্খ-আশ্রম বলিত। যাহারা ছাউনীতে আতর গোলাপ ও অন্যান্য সখের জিনিষ বেচিত তাহাদের আশ্রম রাউত-আশ্রম। যাহারা দশ

গাঁয়ে গিয়া রান্নার মশলা ও পানের মশলা বেচিত, তাহাদিগকে দেশ-আশ্রম বলিত। আর যাহারা নগরে বসিয়া ছত্রিশ জাতিকে নানা বিধ সুগন্ধ দ্রব্য বেচিত, তাহাদের আশ্রমের নাম ছত্তিক আশ্রম"। (৪২)

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বে কৌলিন্য প্রথাও চালু ছিল। কেবল মাত্র ওর্ব্য ও দুর্বাসা ঋষিগোত্রীয় দত্ত ও লাহারাই ছিল কুলীন, বাকী অন্যান্য পদবীধারীরা ছিল মৌলিক শ্রেণী ভুক্ত। গন্ধবণিকদের মধ্যে বিশেষ করে কুলীনরাই বহির্বাণিজ্যে বিশেষ পটু ছিল।

পদ-পদবী ও টোটেম ঃ— এখন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পদ-পদবী, গোত্র ও টোটেমাদির বিষয়ে বলা যায়, এদের মধ্যে দত্ত, দাঁ, নাগ, ভদ্র, খাঁ, দাস, মল্লিক, সেনেরা ওর্ব্য ঋষি গোত্রীয়। এরা টোটেম-ট্যাবুর নিষেধ হেতু বোয়াল মাছ খায় না। এছাড়াও দাস, দত্ত, বণিক এরা দুর্বাসা মুনি গোত্রীয়, এবং ট্যাবু হিসাবে দুর্বা ঘাস ছিঁড়ে না বরং ভক্তিভরে প্রণাম করে। সিংহ, দত্ত, কুন্ডু, সোম, তালবন, প্রামানিক, সিঁট, ইত্যাদি পদবী ধারীরা কাশ্যপ গোত্রীয়, এরা কচ্ছপ খায় না। কর, ঘর, সেন, শেঠ, বিষ্ণু, রুদ্র, এরা ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং ভেল করা মাছ খায় না। বিদ, কর, চন্দ্র, রুম, সিংহ পদবীর গন্ধ বণিকরা মৌদগল্য গোত্রীয় এরা মৌচাক ভাঙে না। দে, চন্দ, হালদার, চণ্ড, সাঁই, সাহা, হাটি, শেঠ, এরা গৌতমঋষি গোত্রীয়, এরা শুঁতে মাছ খায় না। দত্ত মৌলিক, নাগ, এরা ভৃংঋষি গোত্রীয় এবং টোটেম হিসাবে ভ্রমর মারে না। খাঁটি এবং পাল-যারা ষাণ্ডিল্য গোত্রীয় তারা ষাঁড় বয় না ও সাঞ্চাশাক খায় না। এদের মধ্যে গান্ধি পদবীও চালু আছে। তাছাড়াও আরও বহু পদবীও আছে, তবে বহু মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত সাধু ও সদাগরেরা আসলে ওর্ব্য ঋষি বা দুর্বাসা ঋষি গোত্রীয় দত্ত।

সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ড ঃ— এই সম্প্রদায় আপন আপন থাক বা বিভাগাদির মধ্যেই পুত্র-কন্যাদের বিবাহ নিষ্পন্ন করার পক্ষপাতী ছিল। কুলীনরাও আপন আপন জাতের মধ্যেই কন্যাদের বিবাহ দিত তবে ছেলেদের ক্ষেত্রে অনেক সময় তারা অন্য থাক তথা মৌলিকদের মধ্যে বিবাহ নিষ্পন্ন করত। পরবর্তী কালে নিজেদের মধ্যে থাকগত কাঠিন্য আরও শিথিল হওয়ায় এখন আর বিভাগগত বাছবিচার আর করা হয় না।

বিবাহে এদের মধ্যেও পূর্বে কন্যাপণের রেওয়াজ ছিল। প্রমাণ হিসাবে বলা যায়— চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের বিয়ের সময় কন্যাপণ চালু থাকা সত্ত্বেও সদাশয় কন্যা পক্ষ তা না নিয়ে কন্যাদান করতে চেয়েছিলেন এমন কথা মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি কেতকা দাস ক্ষেমানন্দও বলেছেন যেমন—

পনাপন নাহি লবে দানেতে বিবাহ দিবে
তোমার ছাওয়াল লখিন্দরে। (৪৩)

পরবর্তী কালে সেই কন্যাপণ পরিবর্তিত হয়ে অন্যান্যদের মত বরপণই চালু হয়ে গেছে। বঙ্গে আর পাঁচটি জাতির মত এরাও মৃতের দাহ করেই সৎকার করে এবং অশৌচাদি পালনের ক্ষেত্রে এক মাসই পালনের বিধান মানত, বর্তমানে এরাও তা কমিয়ে এনে ১৫ দিনে দাঁড় করিয়েছে।

ধর্মীয় পরিমণ্ডল ঃ— প্রাচীনকালে এই সম্প্রদায় যে বৌদ্ধ প্রভাব পুষ্ট ছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের পর এরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি আসক্ত হতে থাকে এবং এরা পরে পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব রীতিনীতিতেই অভ্যস্থ হয়ে ওঠে।

সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কাহিনীর প্রেক্ষিতে দেখা যায়, এদের আদিপুরুষ বিম্বট গন্ধেশ্বরী পূজা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেই গন্ধ দ্রব্য পেয়েছিলেন তাই এই সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী গন্ধেশ্বরী— যাঁর পূজা বৈশাখী পূর্ণিমায় ধূমধামে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। দেবী চতুর্ভূজা সিংহবাহিনী। দেবীর উপরের ডান দিকের হাতে শঙ্খ, বামদিকের উপর হাতে পদ্ম, ডানদিকের নীচের দিকে ত্রিশূল— যার দ্বারা দেবী গন্ধাসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন আর বাম দিকের নীচের হাতে রয়েছে ব্যবসায়ের প্রতীক তুলাদণ্ড। এই দেবীই গন্ধবণিকের জাতিদেবতা।

অন্যদিকে এদের আদিপুরুষগণ শিব কর্তৃক সৃষ্ট তাই শৈবও বটে। প্রমাণ হিসাবে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের নায়কদের বিশেষ মনসামঙ্গলের চাঁদ বেনে ও চণ্ডী মঙ্গলের ধনপতি ও শ্রীমন্তকেও আমরা শৈব হিসাবেই দেখতে পাই। চাঁদের কাছে মনসা বার বার পূজা চাওয়ায় চাঁদ একই উত্তর দিয়ে বলেছিলেন—

যে হাতে পূজেছি আমি শিব শূলপাণি
সে হাতে পূজিব না চ্যাঙমুড়ির কানি।

সেদিক থেকে চাঁদ সদাগরের শৈবভক্তি গন্ধবণিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল— তাই গন্ধবণিকরা অনেকেই শৈব। পরবর্তী কালে চৈতন্য প্রভাবে অনেকেই বৈষ্ণব ধর্মেও আকৃষ্ট হয়েছেন।

এদের মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা চালু থাকলেও এরা কিছু ব্রত পালনও করে থাকে। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল মকর সংক্রান্তিতে পালিত সুয়ো-দুয়োর ব্রত। এতে বয়স্ক মায়েরা সারাদিন উপবাসে থেকে সন্ধ্যার পর কলার ভেলায় বিভিন্ন পূজা উপকরণসহ ঘৃতের প্রদীপ জ্বেলে তা নদীতে ভাসিয়ে দেয় এবং ছেলেমেয়েরা শঙ্খ, ঘন্টা, ঝাঁঝর ইত্যাদি বাজিয়ে জোরে জোরে বলতে থাকে—

সুয়ো-দুয়ো যায় ভেসে।
সাত ভাই আসে হেঁসে।।

এই ব্রতের কাহিনী প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায়, একদা সাতভাই বহির্বাণিজ্যে গিয়ে

এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল— যারা ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত এবং তখন বাড়িতে না থেকে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। তাই তাদের মা সাত ভাইদের ফন্দি-ফিকির করে আটকে রাখার চেষ্টা করছিল যাতে তারা ফিরে এসে ওদের সর্বস্ব হরণ করতে পারে। কিন্তু ঐ বাড়িতেই সাত ভায়েদের একমাত্র বোন বধূ হিসাবে ছিল। সে ভাইদের চিনতে পেরে আপন পরিচয় গোপন করে তাদের তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলায় সেকথা শুনে তাবা নৌকা ছাড়ার পরেই ডাকাতরা ফিরে এসে তাদের আক্রমণ করতে গেলে, তারা তখন ডাকাতদের আওতার বাইরে সমুদ্রে ভাসতে থাকায় আর কোন ক্ষতি করতে পারে নি কারণ তাদের বাড়িতে তখন মায়েরা সুয়ো-দুয়োর ব্রত করছিল। তাই বাণিজ্যে গিয়ে যাতে ছেলেরা নিবাপদে ফিরতে পারে তার জন্য বণিক সমাজে এখনও সুয়ো-দুযোর ব্রত পালিত হয। এতে করে তারা যে এককালে বহির্বাণিজ্য করত তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

যেহেতু মনসা কর্তৃক বণিক প্রধান চাঁদ সদাগরের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল এবং বেহুলা বাসর ঘরেই বিধবা হয়েছিল— তাই মনসার কোপ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাব জন্য এখনও এই সমাজে অনেকেই মনসার পূজা করে থাকেন এবং ছেলেমেয়েদের বিয়ের আগে বাড়িতে মনসা দেবীকে এনে তার পূজা করা ও কয়েক দিন ধরে মনসা মঙ্গলের গান গাওয়া হয়ে থাকে।

গোপভূমে এদের বিস্তার ও প্রাধান্য ঃ— এই সম্প্রদায় মূলত বণিক তাই নদী বা সমুদ্রাঞ্চলেই এদের বসতি ছিল। তাই বঙ্গের প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত ও পরে সপ্তগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করেই এই সম্প্রদায়ের অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। পরে বিভিন্ন নদীপথে তারা রাঢ় বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তখনই কোন এক সময়ে ওরা অজয়-দামোদর নদী ধরেই এই দুই নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল বা গোপভূমেও বসতি গড়ে তোলে। গোপভূমে বসতি গড়ে ওরা বিভিন্ন নদীপথে অন্তর্বাণিজ্য গড়ে তুললেও সমুদ্র বাণিজ্যের নেশা ওদের রক্তের মধ্যেই মিশে থাকায়, সেখান থেকেই দুই প্রধান নদী অজয়-দামোদর ধরেই গঙ্গা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে থাকে— সে প্রমাণ আমরা মধ্যযুগীয় বহু মঙ্গলকাব্য ও সাহিত্যেই পেয়ে থাকি।

গোপভূমের বণিক প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রথমে উজ্জয়িনীর নাম উল্লেখ করতে হয়। সেখানে বণিকশ্রেষ্ঠ ধনপতি সদাগর ও তার পুত্র শ্রীমন্ত সদাগরের বাসভূমি সম্পর্কে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন—

গৌড়েতে বিখ্যাত যার নাম উজ্জয়িনী।
মহাকুল দত্ত বংশ সবামধ্যে গণি।। [৪৪]

সেই উজ্জয়িনী থেকে ধনপতি ও তার পুত্র সিংহলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল তার উল্লেখ প্রসঙ্গে কবি মুকুন্দরাম যে পথনির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে অনেক গ্রামই

যেমন— চাকদা, থানাঘাট, কুণ্ডারপুর, চরকি, বাগুনকোলা, শাঁখারিঘাট, কাটোয়া ইত্যাদি সবই প্রাচীন গোপভূমেই অবস্থিত।

অন্যদিকে কবি কঙ্কনেই উল্লেখ রয়েছে গোপভূমের একদা রাজধানী ভাল্কীতেও বণিকদের প্রাধান্য ছিল। সেখানের সোমচন্দ্র বণিকেরও উল্লেখ রয়েছে। সেখানে ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে আত্মীয়দের যাতায়াত প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে—

সাঁকো হইতে বেনে আইসে নামে শঙ্খ দত্ত।
রাত্রি দিন বহে যার আট ঘোড়ার রথ।। [৪৫]

এই সাঁকোও গলসী থানার অধীন গোপভূম এলাকায় অবস্থিত। এই সকল উক্তির মাধ্যমেই জানা যায় একদা গোপভূমে গন্ধবণিকদের ভালই বসতি ছিল এবং তাদের প্রাধান্যও ছিল।

এখন মনসামঙ্গলের প্রেক্ষিতে বলা যায়— একদা গোপভূমের দামোদর নদের তীরে চম্পাই নগরীতে ছিল পরম শৈব চাঁদ সদাগরের বিশেষ রমরমা অবস্থান। সেখানে দেবতার সঙ্গে মানবের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত দেবতাকেই পরাভব বরণ করতে হয়েছিল। সে হেন দুর্দান্ত প্রতাপ চাঁদ সদাগর বহুবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করেছেন সুন্দর সুন্দর বাণিজ্যতরী নিয়ে। তার সেই বাণিজ্য তরীগুলির নামই বা কি সুন্দর! নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণকে অনুসরণ করে তাদের নামগুলি উল্লেখ করা হল, যেমন— মধুকর, আগল-পাগল, চন্দনপাট, টিঞা, ঠুটি, যাত্রাবর, সুতারেখি, মাণিক্যমেড়ুয়া, শঙ্খচূড়, লক্ষ্মীপাসা, কাজলরেখি, উদয়তারা, দুর্গাবর, খরসান, হংসগলা ইত্যাদি।

এই গন্ধবণিক চাঁদ সদাগরের এতই প্রতাপ ছিল যে রাঢ় বঙ্গ ছাড়াও উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম, বিহার ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানের লোকেরা চাঁদকে তাদের অঞ্চলের লোক বলে দাবি করে কিন্তু মনসামঙ্গলের বিভিন্ন কবিরা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলার যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়ে যে সকল গ্রাম ও ঘাটের কথা উল্লেখ করেছেন তা সবই দামোদর নদের তীরবর্তী বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। শুরুতেই চাঁপাতলার ঘাটের কথায় আসা যাক, যা কসবা চম্পাই নগরীর দক্ষিণে এখনও অবস্থিত। তাছাড়া নবখণ্ড, দুবরাজপুর, জুজুটি, গোবিন্দপুর, দেউল্যার ঘাট, আমাদিপুর (আমাদপুর), শিআল্যা (শিল্যা) ইত্যাদি। এ সকল বাস্তব নিদর্শনের প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত গবেষক মানিকলাল সিংহ যথার্থই বলেছেন যে, "চাঁদ সদাগর বর্ধমান জেলার দামোদর তীরবর্তী কসবাই চম্পার অধিবাসী এবং বাঁকুড়া জেলার সীমানার অনতিদূরে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত কসবাই চম্পা সমস্ত দিকের বিচারে, চাঁদ সদাগরের রাজধানী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।" [৪৬] তাই যথার্থই বলা যায়, একদা প্রাচীন গোপভূম থেকেই গন্ধবণিক চাঁদ সদাগর বহির্বাণিজ্য

পরিচালনা করতেন। ঐতিহাসিকদের মতে এই চাঁদ সদাগর সেন যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাই বলা যায় বাঢ় বঙ্গের এক গৌরবময় অংশ এই প্রাচীন গোপভূমে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী মিলে মিশে স্মরণাতীত কাল থেকে সংস্কৃতির রঙ্গমঞ্চে যারা একে তিলে তিলে তিলোত্তমায় পরিণত করেছে— তাদের মধ্যে উল্লেখ্য অবদান যুগিয়েছে এই গন্ধবণিক সম্প্রদায়। বিভিন্ন জাতির শৌর্য, বীর্য, মহত্ব ও উদারতার সমন্বয় এর পিছনে কার্যকরী হলেও সেই কৃষ্টির প্রদীপটিতে পলতে উস্কে দিয়ে তাকে আরও উজ্জ্বলতর করেছে এই জাতির অসীম সাহিসকতা। এরা জলপথে, স্থলপথে অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও সেই অতীত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আপন সংসারের মায়া-মমতার বেড়াজাল অতিক্রম করে ভীষণ ভয়াল সমুদ্র যাত্রায় জীবনের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপন্ন করে বিদেশীয় কৃষ্টির সঙ্গে আপন কৃষ্টির মহামিলন ঘটিয়েছে। তাই সেই অন্ধকারময় যুগেও এই গোপভূমের বণিকরাই যে সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত ক্রীটদ্বীপিয় শীলমোহরেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

গন্ধবণিক জাতি, তাদের জাতি-ব্যবসা হিসাবে বিভিন্ন গন্ধদ্রব্য প্রাচীনকাল থেকেই বিক্রয় করে আসছে। তাই ওদের সম্পর্কে চণ্ডীমঙ্গলে বলা হয়েছে—

পুরে বসে গন্ধবেণ্যা গন্ধ বেচে ধূপ ধূনা
পসরা সাজিয়ে চলে হাটে। (৪৭)

বর্তমানে এরা গ্রামে গঞ্জে স্থায়ী দোকানদারী করে বিভিন্ন গন্ধদ্রব্য সহ অন্যান্য বহু দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে। বিভিন্ন শহর গঞ্জে ব্যবসায় এদের একাধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। তবে বর্তমানে শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নত হয়ে অনেকেই চাকুরীজীবীও হয়েছে। আবার অনেকে কৃষিকাজেও আত্মনিয়োগ করেছে। তা করলেও, ব্যবসায়েই এদের অধিক নিষ্ঠা। তাই ব্যবসানিষ্ঠ এই জাতি সকালে উঠে স্নান সেরে আপন ব্যবসা-বাণিজ্যে বের হয় এবং ফেরার কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না, তাই এদের সম্পর্কে চলতি প্রবাদে শোনা যায়—

গন্ধ বেন্যা উত্তম জাত।
সকাল সিনান ভোজন রাত।।

—ঃ সুবর্ণবণিক ঃ—

জাতির ক্রমবিকাশ ঃ— বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখ্য এক জাতিগোষ্ঠী হল সুবর্ণবণিক। বঙ্গে বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিষয়ে যেমন বহুবিধ উপাখ্যান কাহিনী শোনা যায় এ সম্প্রদায় সম্পর্কে তেমন কিছু শোনা যায় না। তবে মধ্যযুগীয়

মঙ্গলকাব্য চণ্ডীমঙ্গলে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, বণিকশ্রেষ্ঠ ধনপতি সদাগর, অযোধ্যা থেকে আসা পাঁচ জন সুবর্ণবণিককে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড় থেকে নিজ বাসভূমি উজানীতে এনে বসতি করিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

অজয নদের তটে করিয়া নিবাস।
সুবর্ণবণিক হল উজীনে প্রকাশ।
বণিক শঙ্করনাথ, বারাণসী চন্দ্র।
নরহরি বড়াল, কর্ণদাস, দে নিরানন্দ।।

শোনা যায় রাঢ় বঙ্গে সুবর্ণবণিকদের নাকি আদিপুরুষ হলেন ঐ পাঁচজন। যদিও এবিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ চণ্ডীমঙ্গলের নায়কদের কার্যকাল খুব বেশী প্রাচীন হলে সেন যুগের অগ্রবর্তী নয়। কিন্তু মৌর্য-পূর্ব যুগ হতে বঙ্গের তাম্রলিপ্ত বন্দরকে কেন্দ্র করে বঙ্গে সুবর্ণবণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের চল ছিল। সম্ভবত তাদের পূর্বপুরুষেরা ভারতের বিভিন্ন উল্লেখ্য স্থান যেমন— উজ্জয়িনী (মালব), কৌশম্বী, শ্রাবস্তী, অযোধ্যা, বৈশালী, মথুরা থেকে এসে বঙ্গের তাম্রলিপ্ত ও পরে সপ্তগ্রাম ইত্যাদি বন্দর অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে সুবর্ণবণিক সমাজ থেকে প্রকাশিত 'আমাদের গৌরব' গ্রন্থের ২য় পৃষ্ঠায় সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের ১৬টি বংশের প্রতিষ্ঠা পুরুষ হিসাবে যে ষোল জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন যথাক্রমে-— জয়পতি চন্দ্র, সোমদেব দে, শূলপাণি দত্ত, শ্রীধর আঢ্য, মেঘু শীল, রাজারাম সিংহ, শ্রীপতি ধর, কমলাকান্ত বড়াল, গুণাকর পাল, গণেশ্বর নাথ, হরিপুর নন্দী, বানেশ্বর মল্লিক, হিরণ্য বর্ধন, দিবাকর দাস, মহানন্দ লাহা ও পুরন্দর সেন।

শুরুতে এরা গন্ধবণিকদের মতই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বহির্বাণিজ্যে অংশ নিত। আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে এরা খুবই সঙ্গতি সম্পন্ন ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন বাণিজ্যপোতের এরাই ছিল মালিক। ব্যবসার জন্য এরা বণিকদের বাণিজ্যপোত সরবরাহ্ করত। তাই এদের অন্যতম উপাধি ছিল পোদ্দার (পোত + দার)।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক প্রয়াত মানিকলাল সিংহ বলেছেন এই জাতির মধ্যে— "দত্ত এবং সেন বংশীয়রা বহির্বাণিজ্যে যাইতেন, বাকি পরিবারগুলি অনেকেই পোতের মালিক ছিলেন। এই জাতীয় পোতের মালিকানা বাদেও সুবর্ণবণিকগণ ব্যাঙ্কার হিসাবে দেশের তৎকালীন অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। [৪৮] আর যারা তা না করত তারা সোনা রূপা ক্রয় বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত ছিল। এইভাবে দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে এদের বিশেষ গৌরবময় ভূমিকা ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ ওরা সেই ভূমিকা ধরে রাখতে পেরেও ছিল। তবে কালের নিয়মে ধীরে ধীরে বহু পরিবর্তনও সূচিত হতে দেখা গেল।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই যেখানে আমাদের দেশে তামা, পিতল, সোনা রূপার অলংকাব নির্মাণে স্যাকরা কামারগণ আত্মনিয়োগ করেছিল— সেখানে এই সুবর্ণ বণিকগণ একদা বহির্বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও দেশে সোনা রূপার কারবারি হয়ে দেশের আর্থিক পরিকাঠামোকে সুদৃঢ় হাতে ধরে রেখেছিল। কালের বিপর্যয়ে সেই সম্প্রদায় ধীরে ধীরে স্যাকরা কামারদের বৃত্তিকেই জীবন জীবিকার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ কবে বসল। আব তাদের সেই আর্থিক স্বাচ্ছল্য অনেকখানিই যেন ম্লান হয়ে গেল। অবশ্য এর পিছনে সেন যুগের সংকীর্ণমনস্ক বাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে সুবর্ণবণিকদের বিবাদ এবং নব ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে ব্রাহ্মণদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রবণতা এই কাজে রাজাকে প্রভাবিত করায় রাজরোষে পড়ে সুবর্ণবণিকরা বিশেষভাবে অবদমিত হয়ে গেল। রাজা বল্লাল সেনের আদেশেই এই সম্প্রদায় পতিত হল। [৪৯]

প্রাচীনতা ঃ— মৌর্য-শুঙ্গ পর্বে এই জাতি সামুদ্রিক ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করেছিল এবং দেশীয় বাণিজ্যেও এরা সিদ্ধহস্ত ছিল। যুগ ধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এরা প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল। পাল পর্ব যুগে বৌদ্ধধর্মের রমরমা কালে এরা বহু বৌদ্ধবিহার ও চৈত নির্মাণে মুক্ত হস্তে দানও করেছিল— তার বহু প্রমাণও পাওয়া যায়। সেদিক থেকে এই জাতির প্রাচীনত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই। 'কথাসরিৎ সাগর' ও বহু প্রাচীন কাব্য কাহিনীতেও এই জাতির সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিভাগ ঃ— বঙ্গের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় এই জাতি সম্প্রদায়ও কয়েকটি অঞ্চলগত ভাগে বিভক্ত। যেমন— রাঢ়ের উত্তরের বাসিন্দারা উত্তর রাঢ়ী, অন্যদিকে দক্ষিণের বাসিন্দারা দক্ষিণ রাঢ়ী নামে পরিচিত। তাছাড়াও রয়েছে দেশী, সপ্তগ্রামী, কটকী, ঢাকাই ও ভক্তকূল ইত্যাদি বিভাগ। সামাজিক দিক থেকে এরা আবার শতেকী, পঞ্চাশী ইত্যাদি উপ বিভাগেও বিভক্ত।

পদ-পদবী, গোত্র ও টোটেম ঃ— সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দে, চন্দ্র, কর, শীল, বর্ধন, সিংহ, দাস, মল্লিক, নাথ ইত্যাদি পদবীধারীরা কাশ্যপ গোত্রীয়। এরা টোটেম নিষেধ বাবদ কচ্ছপ খায় না। অন্যদিকে দে, সেন, শীল, বর্ধন, দত্ত, ধর, বড়াল, মল্লিক, নাথ পদবীর সুবর্ণবণিকদের গোত্র শাণ্ডিল্য এবং টোটেম হিসাবে এরা শাল মাছ খায় না, ষাঁড় বয় না ও সাঞ্চা শাক খায় না। মৌদগল্য গোত্রীয় সুবর্ণ বণিকদের পদবী হল দে, পাল, চন্দ্র, কর, আঢ্য, বড়াল, পাইন ইত্যাদি। এরা টোটেম স্বরূপ মৌচাক ভাঙে না। গৌতম ঋষি গোত্রীয়দের মধ্যে উল্লেখ্য পদবী হল দে, পাল, শীল ইত্যাদি। এরাও টোটেম বাবদ শুঁতে মাছ খায় না। ভরদ্বাজ গোত্রীয় সুবর্ণবণিকদের পদবীগুলি পাল, কর। এরা ভেলকরা মাছ খায় না। উল্লেখ্য গোত্র ছাড়াও এদের মধ্যে আরও কিছু গোত্র চালু আছে যেমন— সেনেরা সুরঋষি, দাঁয়েরা ব্রহ্মঋষি, মল্লিকরা

কৌশিকঋষি গোত্রীয়। উল্লেখ্য পদবী ছাড়াও আরও বেশ কিছু পদবী এদের মধ্যে চালু আছে যেমন— লাহা, পোদ্দার, নন্দী, সাধু, সেপুয়া, চাপড়ী ইত্যাদি।

সামাজিক বিধি বিধান ঃ— এই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্বে থাক বা আশ্রমের কাঠিন্য ছিল কিন্তু বর্তমানে তা শিথিল হয়ে গেছে। পূর্বে কন্যাপণই চালু ছিল। বিবাহের অনুষ্ঠানে এখনও নানাবিধ স্ত্রীআচার বর্তমান। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কন্যাপণের বদলে বরপণই চালু হয়েছে।

মৃতের ক্ষেত্রে শবদাহ করেই সৎকার করা হয়। পূর্বে অশৌচ পালন বিধি এক মাসই ছিল এখন তা কমিয়ে ১৫ দিন করা হয়েছে।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ঃ— বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যকালে এরা অনেকেই বৌদ্ধধর্মে অনুরক্ত ছিল। পরে পরে এরা আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মেই অনুরক্ত হয়ে পড়ে। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা এরা করে থাকে। গন্ধবণিকদের মত এদের কোন নিজস্ব গোষ্ঠীদেবতা না থাকলেও মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে বিশেষ এক দেবীর পূজা করেন। দেবীর নাম 'বাগীশ্বরী'। চতুর্ভূজা এই দেবীর দক্ষিণের উর্দ্ধ হস্তে রয়েছে অক্ষমালা, নীচের হাতে বরদা মুদ্রা, বামদিকের নিম্ন হস্তে আছে পদ্ম আর উর্দ্ধ হস্তে দেখা যায় নিক্তি বা সোনা রূপা ওজন করার ছোট তুলাদাঁড়ি। এ যেন ওদের জাতি ব্যবসায়ে ব্যবহৃত সোনা রূপা দ্রব্য ওজনের প্রতীক। আর এই দেবীও যেন ওদের ব্যবসায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এছাড়াও এই সম্প্রদায়ের অনেকেই মকর সংক্রান্তিতে চতুর্ভূজা মহামায়ার পূজাও করে থাকেন। আর এক শাক্ত দেবী বাঘেশ্বরীর পূজাও এদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই দেবীর দক্ষিণের সর্বনিম্ন হাতটি বরদা মুদ্রায় থাকলেও বাকি সব হাতেই তীর, ধনুক, চক্র, ত্রিশূল, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্র শোভা পায়। ইনি অষ্টভূজা।

শৈব আরাধনাও এদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবধারাও প্রকটিত হয়। ব্রত উপাচারের মধ্যে মকর সংক্রান্তিতে সূর্যপূজাকে কেন্দ্র করে এক ধরণের ব্রত ও সেই সঙ্গে গন্ধবণিকদের মত সুয়ো-দুয়ো ব্রতও এদের মধ্যে চালু আছে।

প্রাচীন ঐতিহ্য ও কৃষ্টি ঃ— বঙ্গে বৈশ্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই উন্নত কৃষ্টির অধিকারী। শুরু থেকেই এদের মধ্যে আর্থিক স্বাচ্ছল্য বর্তমান। তাই বিভিন্নভাবেই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণে এনে দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে সুদৃঢ় করেছিল এবং তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণেও রেখেছিল।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ উন্নত ছিল। প্রমাণ হিসাবে বলা যায় পাল আমলে কমল শীল, এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন এবং তিনি আনুমানিক ৭৫০ খ্রিঃ নাগাদ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তদানীন্তন বৌদ্ধ দার্শনিক শান্ত রক্ষিতের তিনি শিষ্য ছিলেন। নিজে বেশ কয়েকটি

গ্রন্থও প্রনয়ণ করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল— 'ন্যায়বিন্দু পূর্বপক্ষ' ও 'তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা'।

এই সমাজের কৃষ্ণ দত্তের নামও উল্লেখ্য— কারণ তিনিও আনুমানিক খ্রিষ্টীয় দশম শতকে আবির্ভূত হযেছিলেন। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন এবং বারাণসীর দন্ডীসভার বিচারে জয়লাভ করে 'পুরুষোত্তম শর্মা' অভিধায অভিহিত হয়েছিলেন।

এবার আধ্যাত্মিকতার দিকে আসা যাক। উল্লেখ্য কৃষ্ণ দত্তের বংশেই ১৪৮২ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেছিলেন গৌরাঙ্গ ভক্ত ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত। তার বংশ পরিচয়ে জানা যায়—

শ্রীকর নন্দন দত্ত উদ্ধারণ ভদ্রাবতী গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাই এর দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত।।
ষান্ডিল্য প্রবর শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর সুবর্ণ বণিক খ্যাতি।
রাধাকৃষ্ণ পদধ্যায় নিরন্তর, বৈশ্যকূলে উৎপত্তি।।

জন্মসূত্রে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও সাধক উদ্ধারণ দত্ত গৌরসুন্দরকে ধ্যানজ্ঞান করে নিতাই পদে আশ্রয় নিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করেছিলেন। তিনিই কাটোয়ার উত্তরে গঙ্গা নদীর ঘাট বাঁধিয়ে দিয়ে সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার বাঁধান ঘাট থেকেই ঐ জায়গার নাম হয়েছিল উদ্ধারণপুরের ঘাট। তিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। তার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন তাব এক আত্মীয় হলধর সেন। পরে হলধর সেনের বংশেই জন্মেছিলেন এই জাতির অন্যতম গৌরবপুরুষ দানবীর গৌবী সেন। তার অকাতর দানে তখনকার বাংলা আপ্লুত হয়েছিল ফলে তিনি প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাই শোনা যায়— "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"। এই গৌরী সেনের দানের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

এখানেই শেষ নয়। অতীতকে ছেড়ে দিলেও বর্তমানেও এই জাতি তাদের অতীত ঐতিহ্যকে যে ধরে রাখতে পেরেছে তার বহু প্রমাণ বর্তমান। রাজরোষে পড়া এই জাতিকে অবদমিত করার প্রভূত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই জাতি আপন প্রচেষ্টায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এখনও শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-গৌরবে, অর্থ কৌলীন্যে, আধ্যাত্মিকতা ও কৃষ্টির সর্বক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছে। অবক্ষয়িত ইংরাজ আমলেও এদের উন্নয়নের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই দেখা যায় স্বামী অভেদানন্দজীর মত মহাপুরুষ, অক্ষয় কুমার দত্তের মত বরণীয় কবি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক ও বর্তমান যুগের সঙ্গীত সুধাকর মান্না দের মত দিকপাল গায়ক এবং বর্তমান যুগেও ধর্মীয় জগতে আলোড়ন সৃষ্টি পুরুষ যিনি বহির্বিশ্বে কৃষ্ণনাম প্রচারে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি লাভ করে ইস্কনের প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই ভক্তি বেদান্ত স্বামীও এই জাতির সন্তান ছিলেন।

গোপভূমে এদের বিস্তার ঃ— অন্যান্য বণিক জাতির মত এরাও একসময় রাঢ়

বঙ্গের বিভিন্ন নদীগুলিকেই অনুসরণ করে একদা গোপভূমে বিস্তৃত হয়েছিল। গোপভূমের বহু গ্রাম-গঞ্জেই তাই এদের প্রাচীন বসতি লক্ষ্য করা যায়। শুরুতে এরা বিভিন্ন নদীপথে অন্তর্বাণিজ্যে অংশ নিত। পরে রাস্তাঘাট তৈরি হওয়ায় বিভিন্ন গ্রাম ও গঞ্জে স্থলপথেও বিভিন্ন পণ্যের ব্যবসা পরিচালনা করত। এরা মুখ্যত সোনা রূপার কারবারী তাই সোনা রূপার দোকান ও মহাজনী পেশায় নিযুক্ত। গোপভূমের বহু বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে গঞ্জে ও শহরে এদের কারবার।

সোনা রূপার অলংকার নির্মাণ ছাড়াও বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবসায়েও এরা লিপ্ত ছিল। যেমন মানকরের দত্তরা একদা তামাকের ব্যবসায়ে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাছাড়া বননবগ্রাম, আউশগ্রাম, গুসকরা, বুদবুদ, পানাগড় ইত্যাদি বহু স্থানেই এরা বর্তমান স্বর্ণশিল্পী হিসাবে বিশেষ খ্যাতির সঙ্গেই ব্যবসা পরিচালনা করছে। এখানকার স্বর্ণশিল্পীরা বঙ্গের বাইরেও বহু স্থানে ছড়িয়ে পড়ে শৌখিন অলংকার ও অলংকারের ডিজাইন মেকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নতি ঘটিয়ে অনেকেই বিভিন্ন কর্ম উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেও সোনা রূপার দ্রব্য প্রস্তুত ছাড়াও অন্যান্য বহুবিধ ব্যবসায়ে এরা ব্যাপকভাবে লিপ্ত আছে এবং আর্থিক সাচ্ছল্যের অধিকারীও বটে।

অন্ত্যজ সম্প্রদায়

রাঢ় বঙ্গের বিস্তৃত·অঞ্চলে তফসিল সম্প্রদায়ভুক্ত বহু জাতিগোষ্ঠী সহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহুল বিস্তার আমাদের চোখে পড়ে। এই রাঢ় বঙ্গের সামান্য অংশীদার হিসাবে পশ্চিম বর্ধমান বিশেষ করে অজয়-দামোদর ঘেরা বেষ্টনীর অরণ্য অঞ্চল গোপভূমেও তাদের বিস্তার বেশ লক্ষ্য করা যায়। বর্ণহিন্দুরা এদের অন্ত্যজ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে সযত্নে এদের স্পর্শ এড়িয়ে যায়। এ ব্যবস্থা শুধু আজকের নয়। সেই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি পর্ব থেকেই তা চলে আসছে। উদাহরণ হিসাবে মধ্যযুগের ষোড়শ শতাব্দীর উল্লেখ্য বাঙালি কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র উল্লেখ করা যায়। সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে—

অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।।

এই রাঢ় বলতে কোন জাতি না কোন দেশের অধিবাসীকে বোঝায় তা নিয়ে সংশয় আছে। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন— "রাঢ় নামে কোনও জাতির খোঁজ পাওযা যায় নি। [৫০] তা যদি হয় তবে কোন দেশ হওয়াই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে বঙ্গের মাঝ বরাবর প্রবাহিত ভাগীরথীর পশ্চিম অংশের বাংলাকেই রাঢ়

বলে অভিহিত কবা হল।, সেই রাঢ়কেই আবার ২টি ভাগে ভাগ করা হযেছিল যেমন— উত্তর রাঢ ও দক্ষিণ রাঢ়। অজয় নদী মাঝে পড়ে এই দুই রাঢ়ের সীমা নির্দেশ করল। অর্থাৎ অজযেব উত্তর দিক উত্তর রাঢ় আব দক্ষিণ দিক দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত হয়েছিল।

এখন এই রাঢ় দেশের জনবসতি সম্পর্কে প্রাচীন ধ্যানধারণা যাই থাকুক না কেন ইতিহাসের নিরিখে বলা যায় এবা বেশ উন্নত সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তারা কৃষিকাজ দ্বারাই জীবনধাবণ করত এবং গ্রামে বসবাস করত। মোট কথা আর্য-জাতির আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এই অংশে এক উন্নত সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, তারা এক উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারীও ছিল। বর্তমানে বর্ধমান জেলার পশ্চিমে গোপভূমের দামোদর, অজয়, কোপাই, কুনুর ইত্যাদি নদীতীরে বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র যেমন— পাণ্ডুরাজাব ঢিবি, ভরতপুর, কাঁকসা, বনকাটি, অযোধ্যা, সাতকাহনিয়া, সিলুট, বসন্তপুর ইত্যাদি থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নসম্ভারে সেটাই প্রমাণ হয়েছে। তাই বলা যায় এদেশের কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় আদিম জাতি দেখা যায়, ইহাবাই বাংলার আদিম অধিবাসীগণের বংশধর।[৫১] কিন্তু আর্যাভিমানী জাতিগোষ্ঠীব কাছে ঐ সকল আদিম সম্প্রদায় এখন অন্ত্যজ সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত। এখন সামগ্রিকভাবে তাদের উৎপত্তি প্রাচীনত্ব ও জাতিকৃষ্টি নিয়ে আলোকপাত প্রসঙ্গে গোপভূমে তাদের আবির্ভাব তথা অবস্থান নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তবে সীমিত পরিসরের জন্য তাদের সকলকে নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়— তাই তাদেব মধ্যে মাত্র কয়েকটি সম্প্রদায়ের বিষযে বলা হবে। প্রথমে 'বাউরি' জাতিগোষ্ঠীব প্রসঙ্গেই আসা যাক।

—ঃ বাউরি ঃ—

উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী ঃ— একদা মা দুর্গা নদীতে স্নান করতে গিয়ে নদীজলে গা রগড়াতে রগড়াতে দেখেন যে তাঁর গা থেকে প্রচুর পরিমাণে কালো রং এর ময়লা নির্গত হচ্ছে এবং সেই সকল ময়লা থেকেই কালো কালো বলিষ্ঠ চেহারার বহু লোকের উদ্ভব হ'ল। ঐ সকল নিকষ কালো বলিষ্ঠ জনগণই বাউরি জাতির পূর্বপুরুষ বলে পৌরাণিক এক কিংবদন্তী চালু আছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, এরা শিব-দুর্গার বিয়েতে বররূপী শিবকে পালকি করে বয়ে নিয়ে হিমালয়ে গিয়েছিল। সেখানে বরকে নামিয়ে দিয়ে, সকল বরযাত্রীদের জন্য রক্ষিত সোনা রূপার আসনে সঙ্কোচহেতু না বসে এক বটবৃক্ষের তলায় বিশ্রামের জন্য বসেছিল। সেই অপরাধে তারা হিমালয় কর্তৃক অভিশপ্তও হয়েছিল। হিমালয় তাদের বলেছিলেন— যেহেতু তারা সোনা রূপার আসনে না বসে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল তাই তাদের আশ্রয়স্থলই হবে গাছতলা আর তারা শিবকে পালকিতে বয়েছিল তাই তাদের বৃত্তি হবে পালকি বহন।

এখন বিভিন্ন জাতি ও তাদের বৃত্তি নিয়ে এবং বিভিন্ন বিষয়েও বহুবিধ কিংবদন্তী শোনা যায়। কিন্তু এই সকল কিংবদন্তীগুলির যৌক্তিকতা বিষয়ে কিছু বলার আছে। আমরা কিংবদন্তীর কথা শুনলেই অনেক সময় নাসিকা কুঞ্চন করি বা তাদের সত্যাসত্য নিয়ে অবজ্ঞাও করি কিন্তু তা করা উচিৎ নয় কারণ কিংবদন্তী সম্পর্কে বহু পণ্ডিতই আশার বাণী শুনিয়েছেন। যেমন— ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— "কিংবদন্তীর মূলেও কিছু না কিছু সত্য থাকিতে পারে"। অন্যদিকে শ্রদ্ধেয় গবেষক বিনয় ঘোষ বলেছেন— "কোন কাহিনী প্রবাদ বা কল্পনা যখন জনচিত্তে শিকড় বিস্তার করে তখন মাটিতেও তার মূল থাকা সম্ভবপর।" অন্য আর এক গবেষক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— "অবশ্য গবেষণা হয়নি বলে ঐসব লোককথা ও জনশ্রুতিগুলি ভিত্তিহীন একথা জোর করে বলা যায় না। স্থানীয় জনসাধারণ বংশানুক্রমে যেসব কিংবদন্তী শুনে আসছেন তার একটা মূল্য নিশ্চয়ই আছে।" তাই বলা যায় কিংবদন্তী মানেই যে তা একেবারেই অসার আষাঢ়ে গল্প তা ধরে নেওয়ার কোন যুক্তি নাই।

খোঁজ-খবর নিলে তার মধ্য থেকেও কিছু তথ্য বের হতেও পারে। অনেক সময় দেখা যায় ধর্মভীরু বাঙালিদের মধ্যে কোন জিনিষ সহজে বিশ্বাস করাবার জন্য তাতে ধর্মীয় প্রলেপ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন এখানে বাউরি সম্প্রদায় এর গায়ের রং কালো কারণ আজন্ম মাঠ ময়দানে ঘোরা, জলে ভেজা, রোদে পোড়া কালোবরণ শক্ত-সামর্থ দেহাধিকারী সম্প্রদায়কে সাধারণ মানুষের কাছে সহজে গ্রহণীয় করার জন্যই তাদের উদ্ভবকে পৌরাণিক কাহিনীর মোড়কে যে মোড়া হয়েছে তা ধরে নিতে কোন অসুবিধা নাই।

পৌরাণিক উপাখ্যানে যাই বলা হোক না কেন রাঢ় বঙ্গে বাউরি জাতির প্রাচুর্য রয়েছে এবং এরা বৃত্তি হিসাবে পালকি বোয়াত এটা সত্যি; পরে পরে তারা কৃষি শ্রমিক ও কৃষিকাজেও আত্মনিয়োগ করেছে। শুরুতে পালকি বওয়া থেকেই যে তারা বাউরি (বহন > বওয়া > বাউরি) হয়েছে তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। **Bengal District Gazetteers (Burdwan)** এ এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে— **"The Bauris are a low aboriginal caste who works cultivators, agricultural labourers and palki-bearers."** [৫২] অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই কালো-কোলো সুঠাম ও শক্তিমান লোকগুলি কৃষিপ্রধান এই দেশে কৃষির শ্রমিক হিসাবেই কাজ করে থাকে তবে বিবাহ ইত্যাদি উৎসবানুষ্ঠানে এরা পালকিও বয়ে থাকে। শুধু উৎসবানুষ্ঠানেই নয় যে কোন প্রয়োজনে ওরা পালকি বা দোলা বইয়ে থাকে— মঙ্গলকাব্যেও তা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে—

গমনের শুভ বেলা বাউরি যোগায় দোলা
তাতে বীর কৈল আরোহণ।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গাড়ি ঘোড়ার যুগে ওদের আসল বৃত্তি অবলুপ্ত হতে বসেছে। তবে পশুপালক হিসাবে এরা শূকর পালনও করে থাকে, কাজেই এটাও ওদের একটা পেশা।

জাতিগত বিভাগ ঃ— এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিভাগ বর্তমান। তবে শুরুতে এরা সকলেই মূলা বা মলা বাউরি হিসাবেই পরিচিত ছিল, কারণ ওরা তো মা দুর্গার গায়ের ময়লা থেকে সৃষ্ট তাই ওরা মূলা বা মলা নামেই অভিহিত হত। পরে ওদেব মধ্যে আঞ্চলিকভাবে আরও কয়েকটি থাক বা বিভাগ সৃষ্ট হয়েছে। যেমন— ধলভূমের বাউরিরা ধুলা বা ধুলিয়া, পঞ্চকোটের বাউরিদের বলা হত শিখরা, মালভূম বা বর্তমানের পুরুলিয়ার বাউরিদের বলা হত মানা ইত্যাদি। মল্লভূমের বাউরি আবার বিশেষ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন— সিংহাজারী, সাততপা, জয়বেলা ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন বৃত্তির জন্যও এরা পাততুলা, গোবরা, কাঠুরিয়া ও পাথুরিয়া ইত্যাদি উপবিভাগেও বিভক্ত। তবে দামোদর এলাকার বাউরিরা 'গোবরা' নামেই সমধিক পরিচিত।

সামাজিক অনুষ্ঠান ঃ— বিবাহ— ছেলেমেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে এরা এখনও কঠোরভাবেই আপন থাক বা বিভাগকেই মেনে চলার চেষ্টা করে তবে যুগ প্রভাবে অনেকক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না। রিজলে সাহেবও এদের মধ্যে ৯টি শ্রেণী বা উপজাতির উল্লেখ করেছেন যারা একে অন্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা দূরে থাক একত্রে আহারাদিও করতেন না বলে উল্লেখ করেছেন। (৫৩) এদের সমাজে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের বিবাহের চল ছিল। সেখানে মা-বাপের পছন্দ মোতাবেক বিবাহ নিষ্পন্ন হত। বিবাহে কন্যাপণই চালু ছিল তবে তার পরিমাণ অল্প। বিবাহে অন্য জাতির মত এদের কোন ব্রাহ্মণ নাই তাই তাদের মধ্যে মুখ্যা বা মোড়লই বিবাহে পৌরহিত্যের দায়িত্ব পালন করত তবে ব্রাহ্মণ বাড়ির জলের প্রয়োজন হয়। উভয় পক্ষই ব্রাহ্মণ বাড়ি থেকে জল এনে এবং তা বিবাহবাসরে একত্রিত করে মোড়ল কর্তৃক সেই জল ছিটিয়ে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হত।

বিবাহের জন্য বরপক্ষ কন্যাপক্ষের বাড়িতে উপস্থিত হলে তাদের হাত পা ধুয়ে তাল বা খেজুরের তালাইয়ে বসতে দিয়ে জলযোগ করান হত। পরে বরপক্ষকে ধূমপানের ব্যবস্থাদি দিলে উভয় পক্ষ বসে ধূমপানকালে উভয়ের মধ্যে কিছু প্রশ্নাদি করার রেওয়াজ ছিল। এর দ্বারা তারা কিছু বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করত। তার নমুনা হিসাবে বাঁকুড়ার প্রখ্যাত গবেষক মানিকলাল সিংহ সংকলিত একটি নমুনা তুলে দেওয়া হ'ল— যেমন,

হুঁকো করে ভুড় ভুড় কলকে করে সাঁই।
ধরিলাম হুঁকো মারিলাম ফুঁক।
শুদ্ধ করিলাম কল্‌কের মুখ।। ইত্যাদি।

বাউরি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ চালু আছে। গ্রামের মুখ্যাদের বিচারে বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। প্রয়োজন মনে হলে বর-কনে আবার অন্যত্র বিবাহ করে। একে 'সাঙ্গা' বলা হয়। সাঙ্গা শব্দটি সম্ভবত সঙ্গী বা সঙ্গম শব্দের অপভ্রংশ।[৫৪] এতে কোন স্থায়ী মূল্য বা মর্যাদা নাই। এ যেন কেবল স্থূল যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতেই নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। তাই একে ওরা 'কুকুরে পীরিত'ও বলে থাকে। এ ব্যাপারে একটি ছড়া চালু আছে তা হ'ল—ওল গুড় গুড় মানের পাত

ধর ধুম্‌ড়া ধুমড়ীর হাত
কুকুর করে কাঁই
বাউরীর সাঙ্গা হলো তাই।[৫৫]

বিভিন্ন কারণেই সাঙ্গা সংঘটিত হতে পারে। তেমনি এক বিশেষ কারণের উল্লেখ করে সাঙ্গা করার প্রসঙ্গে একটি ছড়ায় বলা হয়েছে—

যা ছিল রুজি পুঁজি, বড় বহু নিল গুঁজি
ছুট বহু পালায় বাপের ঘর
অ দাদা, ইবার সাঙ্গা কর।[৫৬]

এতো গেল সাঙ্গার কথা। এখন আর এক ধরণের বিয়ের কথা বলা যায়। যাকে 'ধরা' বিয়ে বলে। বাউরি সমাজে জোর করে কোন মেয়েকে ভালবেসে বা বলাৎকার করে ঘরে আনা ও তাকে নিয়ে সংসার করার রীতি চালু আছে, তাকেই ধরা বিয়ে বলা হয়— যা গান্ধর্ব বা রাক্ষস বিয়ের তুল্য।

সামাজিক বিচার ব্যবস্থা ঃ— সামাজিক দোষাদোষের ক্ষেত্রে এরা গণতান্ত্রিক বিচার পদ্ধতির পক্ষপাতী। বিচারের নমুনা হিসাবে বলা যায় বিবাদমান দুই পক্ষকে সামনে রেখে প্রথমে গ্রামের মুখ্যাদের নিয়ে বসা হয় এবং তাতে সমস্যার সমাধান না হলে অঞ্চলের মুখ্যাদের আহ্বান করা হয় বিচারের জন্য। সে বিচার কোন পক্ষের মনঃপূত না হলে পরগনার মুখ্যাদের ডাকা হয়— তাতেও সমাধান না হলে শেষে দেশের মুখ্যাদের নিয়ে বিচারে বসা হয়। দেশের মুখ্যা বলতে কম করে ৭০/৮০টি গ্রামকে বুঝায়। সেই সকল গ্রামের মুখ্যারা যে বিচার করে দেয় তা সকলকে মানতে হয়। এদের সামাজিক শাসন এতই পোক্ত ছিল যে দেশের মুখ্যাদের কথা সকলকে মানতেই হত। আর সেটাই ছিল তাদের কাছে শেষ বিচার।

সামাজিক বিধি বিধান ও উৎসব ঃ— অন্যান্য জাতির মত এরাও মৃতের দাহ করেই সৎকার করে আর অশৌচ পালন করে ১২ দিনে এবং শ্রাদ্ধে যেমন ক্ষমতা লোকজন খাইয়ে থাকে। তবে যে কোন অনুষ্ঠানেই মদের ব্যাপক চল আছে।

শুরুতেই বলা হয়েছে এরা মা দুর্গার গাত্র ময়লা থেকে সৃষ্ট। তাই এরা প্রকৃতিতে মাতৃভক্ত। মা দুর্গার অন্য রূপ হিসাবে এরা চণ্ডীর প্রধান উপাসক— তারপরে মনসা

ও আরও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা এবং উৎসব পালন করে। যেকোন উৎসবে এরা বোতল বোতল মদ উৎসর্গ করে থাকে এবং দেবপূজা নিজেরাই করে থাকে। বাউরিদের বিশেষ পূজা 'বাগরাই' সেখানে প্রচুর মাটির ঘোড়া প্রদান করা হয় এবং অনেক হাঁস মুরগিসহ শূকর বলিদান করা হয়, তবে ছাগল বলি দিতে দেখা যায় না।

সমগ্র গোপভূম ছাড়াও বঙ্গের অন্যত্রও এরা পৌষ সংক্রান্তির সময়কালে কয়েক দিন উৎসবে মেতে ওঠে। ওই সময় ওরা অনেকক্ষেত্রে আদিবাসীদের মাদনা পরবের মত নিজেরা মদ-মাংস খেয়ে মাদল বাজিয়ে তুষু ভাসান ও সেই সঙ্গে মনসা, বড়াম, চণ্ডী ইত্যাদি সকল দেবতার পূজায় মেতে ওঠে। এ বিষয়ে একটি ছড়ায় ওদের অবস্থা প্রকাশ করে বলা হয়েছে—

চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর, এখান, সেখান, সাঁই, সুঁই।
তার পরদিন আসবি তুই।। (৫৭)

অর্থাৎ এতে বলা হয়েছে চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর সংক্রান্তি, পিঠে পরব, তুষু ভাসান ইত্যাদি কেন্দ্র করে আকণ্ঠ মদ্যপান ও উদ্দাম নাচ-গানে ব্যস্ত থাকবে, সেই সময়ে ৮/৯ দিন কাজে যাওয়ার কোন প্রশ্নই নাই। এসব চুকে যাওয়ার পর কাজে যাবার উদ্দেশ্যে বলাব জন্য মনিবকে আস্তে বলা হয়েছে।

পদবী-গোত্র ও টোটেম ট্যাবু ঃ— আর পাঁচটি জাতির মতই এদের মধ্যেও বেশ কিছু পদবী দেখা যায়। যেমন— মাজি, সর্দার, মণ্ডল, সরকার ইত্যাদি। গোত্র হিসাবে কাশ্যপ গোত্রই প্রধান। জাতি হিসাবে এরা বেশ শক্ত সামর্থ জাত। তাই বিভিন্ন সময়ে রাজা-বাদশা ও ভূস্বামীদের সৈন্যবাহিনীতে সৈনিক, পাইক, বরকন্দাজ ও দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করত। সেজন্য এদের অনেক সময় সর্দার, মণ্ডল, সরকার ইত্যাদি উপাধিতেও ভূষিত করা হত এবং পরবর্তীকালে সেগুলিই ওদের উপাধি বা পদবীতে পরিণত হয়েছে।

বঙ্গে আর পাঁচটি প্রাচীন জাতির মত এদের মধ্যেও বেশ কিছু টোটেম-ট্যাবু চালু আছে। যেমন এরা ঘোড়া, ঝুটিওয়ালা কানা বক, চিতি সাপ, চাঁদকুড়ো মাছ কুকুর ইত্যাদিকে টোটেম হিসাবে মান্য করে। তাছাড়া কিছু গাছকেও টোটেম হিসাবে মানে। যেমন শালগাছ এদের কাছে টোটেম সদৃশ। এই অদ্ভুত ধরণের আদিবাসীয় টোটেম ট্যাবুর জন্য এদেরকে সহজেই সেই সুপ্রাচীন কালের দ্রাবিড় ও আলপাইন গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতি বলে অনেকেই ধারণা করে। এরা কোন প্রাচীনকালে বন্যপ্রাণী কুকুরকে বশ করে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে শিকারের কাজে ব্যবহার করত। তাই কুকুর এদের খুব প্রিয় জন্তু, ওদের কুকুর মারা গেলে ওরা এখনও অশৌচ পালন করে থাকে। বিবাহের সময় কুকুরের কান্নাকে এরা অশুভ বলে মনে করে। কুকুর সম্পর্কে এদের আন্তরিকতা প্রসঙ্গে গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে— "Dogs also are sacred, so

much so that a Bauri will on no account kill a dog or touch a dead dog's body." (৫৮)

গোপভূমে এদের বিস্তার ও বর্তমান অবস্থা :— গোপভূমের প্রায় সব গ্রামেই এবং দলবদ্ধভাবে বিশেষ পাড়ায় বসত করে। তবে এরা অধিকাংশই দারিদ্র সীমার নীচেই অবস্থান করে। এরা প্রধানত কৃষি শ্রমিক। আধুনিক যুগের শৌখিন যন্ত্রযানের ব্যবহারই কাম্য হওয়ায়, তাদের অন্যতম বৃত্তি হিসাবে বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবাদিতে পালকি বহন এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এদের অনেকেই এখন কলে-কারখানায় শিল্পশ্রমিক হিসাবে নিজেদের নিয়োগ করছে ফলে অনেকেই এখন গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী। তাই বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টির প্রভাবে এরা কিছুটা উন্নত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই ছোটখাট চাকুরীলাভে সমর্থ হয়ে উন্নত জীবনযাপনে এগিয়ে চলেছে।

—ঃ বাগদি ঃ—

শৌর্য ও প্রাচীনত্ব ঃ— আর্যায়নের আগে থেকেই রাঢ় বঙ্গে বেশ কয়েকটি প্রাচীন জাতি আপন শৌর্য ও শক্তির দাপটে বঙ্গে বেশ প্রভাব ফেলেছিল— তাদের মধ্যে বাগদি জাতি অন্যতম। ওরা তখনকার দিনে রাজন্যবর্গের সৈন্যবাহিনীতে সৈনিকের কাজ করত। তাই তাদের মধ্যে এখনও চার সেনা, আঠারো সেনা ও বারো সেনা ইত্যাদি বিভাগ দেখা যায়। ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এই সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষরাই একদা দেশের রাজাদের চতুর্থ সেনাদলে, দ্বাদশ সেনাদলে ও অষ্টাদশ সেনাদলে সৈনিকের কাজ করত। তাই এরা বেশ দুর্ধর্ষ ও প্রকৃতিতে স্বাধীন বলেই এদের সম্পর্কে একটি চলতি প্রবাদও চালু আছে, তাতে বলা হয়েছে—

বাঘ বাগ্দী হড়েল পাখী।
পোষ মানে না এ তিন জাতি।।
যদি বাগ্দী পোষ মানে।
শুয়ে শুয়েও বাতা গোনে।। (৫৯)

(শেষ লাইনের অর্থ হ'ল এরা নিদ্রাকালেও জাগ্রত প্রহরী)

পরে পরে রাঢ় বঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার শুরু হলে এদের অনেকেই সেই ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়। পরবর্তী কালে বঙ্গে সেন রাজাদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি কালে এরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আওতায় এলেও, তাদের মধ্যে পূর্ববর্তী জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনেক অবলুপ্ত লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন— বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী জাঙ্গুলীর মনসায় রূপান্তর ও তার পূজা এবং বৌদ্ধদের শূন্য বা নিরাকার দেবতা ধর্মরাজে রূপান্তর ও তাদের পূজা— এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ভাবে এখনও চলে

আসছে। সেদিক থেকে এরা বঙ্গের আদিম দ্রাবিড়িয়ান জাতিগোষ্ঠী, ক্রমে ক্রমে বহু পরিবর্তনে বর্তমানে এই রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও প্রমাণিত যে, এদের মধ্যে ৩০% দ্রাবিড় শোণিত বর্তমান। তাই বলা যায় এরা খুবই প্রাচীন জাতি।

উদ্ভব ও উৎপত্তি ঃ— এই জাতি সম্পর্কে Gazetteers এও বলা হয়েছে— "The Bagdis are a caste of non-Aryan origin, who account for their genesis by a number of legends. One of these is to the effect that they originally came from Cooch-Behar and were the ofspring of Siva and Parvati." (৬০)

সে দিক থেকে বঙ্গে অন্যান্য বহু জাতিই যেমন শিব, ব্রহ্মা ইত্যাদি দেব-দেবী থেকে উৎপন্ন বিষয়ে অনেক কিংবদন্তী শোনা যায়— এদের সম্পর্কেও তেমন শোনা যায় যে এরাও শিব-দুর্গার সন্তান।

বাগদি শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় মানিকলাল সিংহ মহাশয় দেখিয়েছেন যে, বাগ+তি = বাগতি > বাগদী। এখানে উল্লেখ্য বাঘ হিংস্র জন্তু তার সঙ্গে অষ্ট্রীক 'তি' যার অর্থ নদী যুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, এই জাত একদা বনের হিংস্র জন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই করে তাদের পরাভূত করত আর নদীর ভীষণতাকেও তুচ্ছ করে সেখান থেকেও মৎস শিকারে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করত। তাই বাঘের হিংস্রতা ও নদীর ক্রুরতা— দুইই এদের কাছে পরাভূত হওয়ায় প্রকৃতিতে এরা দুর্দমনীয় ছিল। সেদিক থেকে বাগদিজাতি বাঘের মত তেজস্ব শক্তিমান ও স্বাধীনচেতা ছিল। তাই সৈনিক বৃত্তি এদের আদর্শ বৃত্তি ছিল। অর্থাৎ শত্রু দমনে এরা অদ্বিতীয় ছিল। তাই প্রবাদে শোনা যায়— "দিনে বাগদি, রাতে বাঘটি।" কিন্তু দিন পাল্টে যাওয়ায় এরা পরে পরে একদা ভুঁইয়া জমিদারদের দেহরক্ষী বা লেঠেলে পরিণতও হয়েছিল। (৬১) অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে এই বীর্যবান জাতি নিজেদের ব্যগ্র-ক্ষত্রিয় হিসাবে দাবি করেছিল-যা পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হতে হতে বাগদিতেই পরিণত হয়েছে। যেমন ব্যগ্র > বাগ, আর ক্ষত্রিয় > ছত্রি যুক্ত হয়ে হয় বাগছত্রি তা থেকে বাগত্রি > বাগদি। (৬২)

বিভাগ ঃ— রাঢ় বঙ্গের অন্যান্য জাতির মত এই বাগদি জাতিও প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত। যেমন— তেঁতুলিয়া ও কাসাই কুল্যা। দুই-ই অঞ্চল নির্দেশক। যেমন— দক্ষিণ কলিঙ্গ বর্তমান তামিলনাড়ু তেঁতুল গাছের প্রাধান্য বেশি। সেখান থেকেই ঐ জাতি একদা বঙ্গে প্রবেশ করে। টোটেম হিসাবে তেঁতুলকে গ্রহণ করে নিজেদের তেঁতুলিয়া ভাগে বিভক্ত করেছে। আর অপর অপর ভাগ দক্ষিণ বঙ্গের কাঁসাই নদ-কুল সম্ভূত। পরবর্তী কালে এই দুই সম্প্রদায় বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাগদি সমাজের অন্যান্য বিভাগগুলি হল যথাক্রমে চিড়াকোটা বাগদি, লউড়া বাগদি, মেটে বাগদি, ডুলে বাগদি, মেটে, কুশমেটে, মল্ল মেটে, গুবুরে, লোহার ও খয়রা বাগদি

ইত্যাদি। বাগদি সমাজ বহু উপবিভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত হলেও আসলে তারা সকলেই যোদ্ধা। তাই দেশ রক্ষার কাজে যে কোন যুদ্ধ বিগ্রহে তারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করত। তাই শোনা যায়—

তেঁতুলি বাগ্‌দি সঙ্গে হাজার ধানুকী।
সমরেতে বিশারদ বানে হয়্যা লুকি।।
কুশরেট্যা রণোজে দুরন্ত যোগ্যতা।
কেহ বা ধনুক ধরে কেহ ধরে ছাতা।। (৬৩)

বাগদি জাতির একটি গোষ্ঠী কৃষকের ঘর থেকে ধান কিনে তা থেকে চিড়ে কোটার কাজে লিপ্ত এবং সেই চিড়ে বিক্রয় করে তাবা জীবিকা নির্বাহ করে তাই তারা চিড়াকোটা বাগদি নামে খ্যাত। এই বাগদি সম্প্রদায়ের এক গোষ্ঠী নদীতে লগি ঠেলে নৌকা পারাপার করে ফলে এরা মাঝি বাগদি বা না-পারাপারের জন্য লাউড়া বাগদি নামে পরিচিত।

বাগদি সম্প্রদায়ের অধিকাংশেরই দীর্ঘ দিনের বৃত্তি হল মৎস শিকার। পুরুষেরা বড় বড় নদী বা জলাশয়ে জাল নিয়ে সারাদিন মাছ ধরে আব মেয়েরা আটসাঁটো পোষাকে সকাল থেকে পুকুর ও খালে-বিলে ছোট জাল নিয়ে মাছ ধরে এবং তা বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বাগ্‌দিনীদের পোষাক বিষয়ে রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যেও কবি মা দুর্গা যখন বাগ্‌দিনী বেশে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন তার পোষাকের বর্ণনাতেও ঐ অটোসাঁটো করে কাপড় পড়ার কথাই উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে—

"দুহাতে দুগাছা মেটে, কাপড় পরেছে এঁটে, খাট করি হাঁটুর উপর।" (৬৪) বাগদিরা মাছ ধরে বলেই এদের মেছো বাগদি > মেটে বাগদিও বলা হয়। তাছাড়াও বাগদিদের আর একটি উপবিভাগ হল ডুলে বাগদি। এরা দোলা বা পালকি বইত। এদের সম্পর্কে District Gazetteers বলছে— Dulia sub-caste has to take the palanquin or duli on his shoulder as a sign of his acceptance of their hereditary occupation (৬৫)

বাগদি জাতির উপবিভাগ যতই থাকুক না কেন এদের আসল বৃত্তি মৎস শিকার, সেকথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মাছ ধরার জন্য এদের অনেক সময় দুর্গম নদী-নালায় যেতে হয় তাই বহু ক্ষেত্রে এরা বিষধর সাপের দংশনে দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়, ফলে তারই প্রতিকার মানসে এরা বিষহরি দেবীর পূজা করে ও সেই সঙ্গে বনে জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে সর্প বিষ হারি ওষুধ আবিষ্কার করে এদের মধ্যে অনেকেই ওঝায় পরিণত হয়। সে যাই হোক "রাঢ়ের বাগদিরা জেলেদের মতই সুপ্রাচীন কেঅট জাতিরই একটি উপভাগ, অন্যান্য আদিম জাতিগুলির সহিত মিলিয়া,

মিশিয়া নিম্নগামী হইয়াছে।" (৬৬) তাহোক তবু তারা বীরের জাতি-যুদ্ধ বিগ্রহ ও সমাজ রক্ষায় তারাই ব্রতী ছিল। তাই শোনা যায়—

"বাগদি নিবসে পুরে নানা অস্ত্রধরি করে
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।" (৬৭)

গোত্র ও পদবী ঃ— দু'একটি সাধারণ গোত্র যেমন— কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ছাড়া বাগদিজাতির মধ্যে অদ্ভুত ধরণের বেশ কিছু গোত্র চালু অছে। যেমন— শঙ্ক, পলাশ, বাঘ, কাল (কৃষ্ণ সর্প) সূর্য, বক, কাঠ ফড়িং, চড়ুই, চাঁদ ইত্যাদি। এদের পদবীগুলি হল— রাউত, লাড়া, লাড়ু, দিগর, মেটে, বাগ্দী, প্রতিহার, সর্দার, মাঝি, সাঁতরা, বাঘ, পোড়েল, পাল, রায়, ওঝা, কুশমেটে।

বিবাহ ও সমাজিক অনুষ্ঠান ঃ— এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে বিভাগের কাঠিন্য তেমন নাই। এদের মধ্যে বাল্য বিবাহের বেশ চল ছিল। বিবাহে কণ্যাপণই চালু ছিল। বর্তমানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের দেখাদেখি বরপণই চালু হয়েছে। এদের বিবাহে তেমন কাঠিন্য নেই, যে কোন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে তবে এ ব্যাপাবে গ্রাম্য মুখ্যাদেব মতামত প্রয়োজন হয়। ছাড়াছাড়ির পর সাঙ্গা হয়ে থাকে— এই সাঙ্গাও বহুবার হতে পারে।

মৃতের পর শবদেহ দাহ করার রীতি এদের মধ্যেও চালু অছে। অশৌচ ১২ দিনে পালিত হয়। শ্রাদ্ধে ক্ষমতা মত আত্মীয় পরিজন খাওয়ানো রীতি আছে। যে কোন সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠানে মদ্যপানের বাহুল্য আছে।

ধর্মানুষ্ঠান ঃ— বাগদিরা শুরুতে জৈন বা বৌদ্ধ প্রভাবে প্রভাবিত হলেও পরবর্তী কালে এবা হিন্দুয়ানায় অভ্যস্ত হয় এবং দেবতাদের মধ্যে শিবঠাকুর, ধর্মঠাকুর, ক্ষেত্রপাল ইত্যাদি দেবতার পূজা করে, আর দেবীদের মধ্যে মনসা, শীতলা, চণ্ডী ছাড়াও লক্ষ্মীর উপাসনা করে কারণ লক্ষ্মীই এদের কুল দেবতা। শিবদূর্গাও এদের কাছে পরম পূজনীয় কারণ এরাই এদের জনক-জননী।

ধর্ম ও শিবের গাজনে এরা খুবই আগ্রহী। এতে আত্মনিপীড়ন মূলক অনুষ্ঠান যেমন— বাণ ফোঁড়া, আগুন সন্ন্যাস, চড়ক ইত্যাদিতেও অংশ নেয়। এছাড়া মকর সংক্রান্তির আগের দিন এরা বিশেষ ভাবে একটি পূজা বা উৎসব পালন করে থাকে যাকে আঁধার পূজা বলা হয়। প্রখ্যাত গবেষক মানিকলাল সিংহের মতে প্রাচীন মিশর দেশের God of darkness এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা রোজাগিরি করে তারা তো বটেই, তাছাড়াও এই সম্প্রদায়ের অনেকেই মনসা দেবীর পূজায় বিশেষ ভাবে অংশ গ্রহণ করে। দশহারা, নাগ পঞ্চমী, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংক্রান্তিতে এরা আপন আপন পল্লীতে খুবই ধুমধামের সঙ্গে সর্পদেবী মনসার পূজা করে থাকে। সেই পূজাকে কেন্দ্র করেই ঝাপান গানের

আসর বসে। তখন বিষধর সাপ নিয়ে গুনিনরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগিতামূলক 'সাঁকি' গান সহ সাপের খেলা দেখায়। ঝাপানের ধুয়ো হল— "বাজুক বিষম ঢাকি, চলুক ঝাপান"— এর মাঝেই এরা মনসার বন্দনা ও সেই সঙ্গে মনসা মঙ্গলের পালা গানও গেয়ে থাকে।

যেমন— চম্পক নগর মাঝে নানা রূপ বাদ্য বাজে
ঘরে ঘরে মনসার পূজা।
মহোৎসব কোলাহল বাজায় খমক ঢোল
সর্প খেলে ঝাপানিয়া ওঝা।

গোপভূমে এই জাতির বিস্তার ঃ— বর্ধমানের পশ্চিম অংশে গোপভূম অঞ্চলের প্রায় সবগ্রামেই এই বাগদি সম্প্রদায়ের বিশেষ বসতি লক্ষ্য করা যায়। এরা আসলে কৃষি শ্রমিক। দীর্ঘদিন ধরেই এরা চাষের সঙ্গে জড়িত। তবে বর্তমানে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠায় অনেকেই শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। তা হলেও কৃষির সঙ্গেই এদের যেন নাড়ির টান। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে কৃষি কাজ বা চাষ আবাদই সকলের কাম্য। একাজ যে হেয় নয় এবং বাগদি সমাজও যে ছোট নয় তাই দেখানোর জন্য অনেক কবিই শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে স্বর্গের আদিদেবতা দেবাদিদেব মহাদেব ও মহেশ্বরী দুর্গা দু'জনে মর্তে বাগদি বাগ্‌দিনীর বেশে যে চাষ করেছেন তা দেখান হয়েছে। চাষ যে মহৎ জীবিকা তা ঐ কাব্যে উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

আঁতে পুতে চাষ ভাল অভাবে সোদর।
অন্যথা হা-ভাতে হেলা বিকায় সত্বর।। (৬৮)

তাই শিব বাগদি হয়ে চাষ করায় এখানকার বাগ্দী সম্প্রদায় মূলত চাষ আবাদেই মত্ত।

গোপভূম অনেক অনেক নদ-নদী দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় এবং যত্রতত্র অজস্র পুকুর খাল বিল থাকায় মৎস শিকারী এই জাতি গোপভূমের বিস্তৃত এলাকায় বসতি স্থাপন করে মৎস শিকারের মাধ্যমে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ইদানিং কালে কল-কারখানায় শিল্প শ্রমিক হিসাবে অংশ নেওয়ায় তাদের মধ্যে ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদান স্পৃহা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অনেকেই চাকুরীজীবী হয়ে আর্থিক স্বাচ্ছল্য পেয়েছে।

পরিশেষে গোপভূমে এই জাতির কৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা যায়— এরা বার মাসে তের পার্বণ প্রতিপালন করলেও ভাদু ভাঁজো টুসুর সঙ্গে মনসা পূজার ব্যাপক চল দেখা যায়। তার কারণ হিসাবে বলা যায় গোপভূমের চম্পাই নগরী বা কসবায় ছিল মনসা মঙ্গলের নায়ক— বিষহরি বৈরী চাঁদ সদাগরের বাড়ি। এখানেই চাঁদ বণিক মনসার চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পূজা চালু করেছিলেন, তাই বঙ্গে প্রচারিত মনসার প্রথম পূজাস্থানকে ঘিরেই এখানকার অন্ত্যজ সম্প্রদায় বিশেষ করে বাগদিদের মধ্যে মনসা

পূজার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। গোপভূমের যত্রতত্র দশহরা থেকে শুরু করে বিভিন্ন নাগ পঞ্চমী, শ্রাবন ও ভাদ্র সংক্রাতিতেও মনসার পূজা উপলক্ষে ঝাপান অনুষ্ঠান সহ মনসা মঙ্গলের বিভিন্ন পালা গান বেশ কয়েক দিন ধরে নিজেরাই গেয়ে থাকে। সেই সময মনসার পূজা উপলক্ষ্যে ঘট আনতে যাবার কালে বা ঘট নিয়ে ফেরার কালে গ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় আনা মনসা পূজকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা মূলক এক ধরণের গান এখনও গাওয়া হয়— তাকে সাঁকি বলে। তারই নমুনা স্বরূপ সূচনাংশের কিছু উল্লেখ করা হল—

মাকে আনতে যাবো গো ক্ষীর নদীর কূল।
মায়ের হাতে দেব চাঁদ মালা পায়ে দেব ফুল।।
ওমা চলগো তোমায় নিতে এসেছি
ক্ষীর নদীর কূলে বসে একা কর কি?
তোমার হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম
মাথায় চাঁচর চুল।।
মাকে আনতে যাবো গো ক্ষীর নদীর কূল।।

—ঃ ডোম ঃ—

সাহিত্যে স্বীকৃতি ঃ

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহরি কুড়িআ। (কুঁড়েঘর)
ছোঁই ছোঁই যাইসি ব্রাহ্মণা নাড়িআ।। (নেড়ে ব্রাহ্মণ)
আলো ডোম্বি তোত্র সম করিব সো সাঙ্গ। (সাঙা/বিবাহ)
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ। (যোগী) (উলঙ্গ)
এক সো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী। (পাপড়ী)
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ী।। (ডোমনীও কাপালিক) (৬৯)

বাংলা ভাষার উৎপত্তি কালে অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে যখন তা উন্নত রূপ পরিগ্রহ করছিল— সেই সময়কার ফসল হিসাবে চর্যাপদগুলিকে ভাষাচার্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় খ্রিষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলে অভিমত দিয়েছেন। সে হেন প্রাচীন কালেও সমাজে ডোম জাতির বিশেষ স্বীকৃতি ছিল। যদিও তারা নগরের বাইরে কুঁড়ে বেঁধে বাস করত এবং সমাজে অছুতই ছিল তবুও তারা নাচ গানে বেশ পটু ছিল। চৌষট্টি পাপড়ির প্রষ্ফুটিত পদ্মে সুন্দরী ডোম কন্যার নৃত্য অনেক যোগী পুরুষেরও ধ্যান ভঙ্গ করত।

বাংলা সাহিত্যের উষা কালে সৃষ্ট বহু চর্যাপদেই ডোম জাতির ক্রিয়া-কলাপ ও কর্ম নৈপুণ্যের বহুল নিদর্শন তখন কার দিনেও দেখা গেছে। তাই সেই সময়েও যে তারা

বেশ উন্নত মানের কৃষ্টিময় জীবন যাপন করত তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরে পরে রাঢ়ের আর পাঁচটি অনুন্নত জাতির মতই সামাজিক ও সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক নিষ্পেষনে নিপীড়িত হয়ে এরা বর্তমানে চূড়ান্ত অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

উৎপত্তি কাহিনী ঃ— এখন এই জাতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গবেষক মানিকলাল সিংহ মহাশয় তাঁর "রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি" গ্রন্থে একটি চলতি গল্পের উল্লেখ করেছেন— তাতে জানা যায় তিন সহোদর ঋষি ভ্রাতা প্রায়ই গো-মেধ যজ্ঞ করতেন এবং নিজেদের সাধন গুণে সেই বলি প্রদত্ত গোধনটিকে পুনরায় বাঁচিয়ে তুলতেন।

একবার বলি দেওয়া গরু থেকে বড় ভাই অন্য ভাইদের না জানিয়ে নিজে খাবার জন্য কিছু মাংস গোপনে সরিয়ে রাখে, ফলে অন্য ভাইয়েরা চেষ্টা করেও সেই গরুটিকে আর বাঁচাতে না পেরে তারা ধ্যানে বসে আসল ব্যাপারটা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে বড় ভাইকে যবন হওয়ার অভিশাপ দেন। তাই বড় ভাই যবন হয়ে যায়, আর সরিয়ে রাখা মাংস থেকে পিঁয়াজ রসুনের সৃষ্টি হয়। এবার কোন একদিন অবশিষ্ট দুই ভায়ের মধ্যে ঝগড়া বাঁধলে ছোট ভাই ক্রোধান্ধ হয়ে মেজ ভাইয়ের পৈতে ছিঁড়ে ফেলে। তখন মেজ ভাই ছোটকে অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, সে নীচ জাতির যাজক হবে। তখন ছোট নিজের ভুল বুঝতে পেরে দাদার পা ধরে কাঁদতে থাকলে দাদা অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে বলেন যে, ঋষি বাক্য মিথ্যা হবার নয় তবে তুমি ডোম জাতির পণ্ডিত হয়ে ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা করবে— যা অন্য কোন ব্রাহ্মণ করতে পারবে না— ফলে তোমার সম্মান অন্য ব্রাহ্মণের চেয়ে উঁচু হবে। এর ফলে তিন ভাই এর মধ্যে বড় হল যবন, ছোট ডোম পণ্ডিত, আর মেজ ব্রাহ্মণ। আর তারা আপন আপন পূজাদি নিজেরাই করতে লাগল— অন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হল না— তাই কথায় বলে

বামনা যবনা ডোমনা।

তিনের পুরুত আপনা আপনা।। [৭০] গল্পটির ঐতিহাসিক মূল্য না থাকলেও তাৎপর্যবহ বটে। "নৃতত্ত্বের বিচারে এরা প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং ইলিয়ট সাহেবের মতে ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর অন্যতম।" [৭১]

বিভাগ ঃ— ডোম জাতির বিভাগ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রাঢ়ের অন্য জাতিগোষ্ঠীর মতই এই জাতির মধ্যেও বেশ কয়েকটি থাক— বিভাগ বা উপবিভাগ বর্তমান। বিভাগগুলি হল— আঁকুড়ে, মাহেলী, কাটারি, ধাড়া ও কালিন্দী। এই প্রধান পাঁচটি বিভাগ ছাড়া আরও কিছু আঞ্চলিক বিভাগ দেখা যায়। যেমন— মান্দারণ্যের বাসিন্দাদের বলা হয় মান্দারণ্য আর বর্ধমানের ডোমেদের বলা হয় বর্ধমেন্যা। এগুলি বাদেও ডোম জাতির মধ্যে আরও কিছু বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন— তুড়ি, ছকুড়ি, ন'কুড়ি ইত্যাদি।

গোত্র, পদবী ও টোটেম ঃ— ডোম সম্প্রদায়ের গোত্রগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল—

কাশ্যপ, ব্রহ্মঋষি, আদ্যঋষি, ফেঁকঋষি ইত্যাদি। এদের পদবীর মধ্যে রয়েছে সাঁতরা, রানা, থান্ডার, কোটাল, ধারা, মণ্ডল, দুয়ারী, মাঝি, বাগ, ষাঁড়, প্রতিহার বা পড়ের, সর্দ্দার, খান, দলুই, খাড়াৎ।

গোত্র অনুযায়ী টোটেম ট্যাবুর নিয়ম মেনে কিছু নিষেধ বিধি মান্য করে। যেমন— কাশ্যপ গোত্রীয়রা কাছিম মারে না বা খায় না। অন্যদিকে এরা অনেকেই টোটেম হিসাবে লম্বা ঠোঁটবিশিষ্ট মাছরাঙা পাখী মারে না। অনেকেই শাল মাছ খায় না।

সামাজিক অনুষ্ঠান ঃ— বিবাহের ক্ষেত্রে এরা থাকগত বিভাগকে বর্তমানে তেমন মান্য করে না। তবে মা বাবার পছন্দমত বিবাহ কার্য সমাধা হয়ে থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদ সহজেই হয়ে থাকে তাতে গ্রাম্য মুখ্যাদের মতামতের প্রয়োজন হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর পুনরায় বিবাহ বা সাঙা করার রীতি আছে।

বিবাহ বা পূজানুষ্ঠানে এরা নিজেরাই পৌরহিত্যের কাজ করে থাকে অন্য কোন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে গ্রাম্য মুখ্যা ও আকুড়ে ডোমেদের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। মৃতের ক্ষেত্রে শবদাহ করে সৎকার করাই রীতি। তবে অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে এরা ব্রাহ্মণদের মত মাত্র দশ দিনে অশৌচ পালন করে থাকে। অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে লোকজন খাওয়ানোর প্রথা আছে। যেকোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ খাওয়া একটা সাধারণ রীতি।

ধর্ম সাধনা ঃ— অতি প্রাচীনকাল থেকেই এরা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। বৌদ্ধ সাধকদের সঙ্গে এদের গভীর সম্পর্ক ছিল। চর্যায় বহু সিদ্ধপুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়— তাদের মধ্যে ডোম্বীপাদ, কাহ্নপাদ, বীণাপাদ ইত্যাদি উল্লেখ্য। অনেকক্ষেত্রেই সেই সকল সিদ্ধাচার্যদের সাধনসঙ্গিনী হত ডোম কন্যারা। তাই বৌদ্ধ সাধকদের সাধনতত্ত্বে নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে ডোম কন্যাদের তুলনা করা হত। প্রাচীনকাল থেকে এরা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও ধর্মীয় বিবর্তনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির কালে এরা ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের দিকেই ভিড়তে থাকে। তা ভিড়লেও ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ ধর্মাচারের প্রভাবপুষ্ট 'নিরাকার'শূন্য মার্গীয় বৌদ্ধ দেবতাকে 'ধর্মরাজ'রূপে পূজা ও প্রতিষ্ঠা ডোম জাতিরই অবদান, তাতে সন্দেহ নাই। এ প্রসঙ্গে ডোম পণ্ডিত রামাই পণ্ডিতের অবদান অনস্বীকার্য। রাঢ় বঙ্গে ডোম পণ্ডিতরাই ধর্মরাজের প্রধান উপাসক ও প্রচারক। ধর্মরাজ ছাড়াও হিন্দু দেবতাদের মধ্যে কালী, তারা, দুর্গা, শিব, মনসা, চণ্ডী ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজাও এরা করে থাকে।

বৃত্তি বা পেশা ঃ— পূর্বে এই ডোম জাতি বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, চেঙারীসহ তালপাতা দিয়ে বহু দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করত এবং সেটাই ছিল তাদের জীবিকা। প্রাচীন চর্যাপদেও তার উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে—

"তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর না চাঙ্গেড়া" (৭২)

আর এখনও সেই ট্রাডিশন সমানে চলে আসছে অর্থাৎ গ্রামগঞ্জে ডোমেরাই ঝুড়ি, চেঙারী ইত্যাদি তৈরি ক'রে এখনও জীবিকা নির্বাহ্ করছে।

তাছাড়াও এই জাতিগোষ্ঠীর এক শাখা নদীমাতৃক এই বঙ্গের নদীতে খেয়া পারাপারের কাজ পূর্বেও করত এবং এখনও করছে। তাই তাদের মাঝিও বলা হয়ে থাকে। বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীন চর্যাপদেও ডোম কন্যার নদী পারাপারের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় যেমন—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআলীলে পার করেই।।
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইলা উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅপ এ জাইব পুনু জিনউরা।। (৭৩)

অর্থ— সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে সত্বর মিলিত হওয়ার বাসনায় যোগীপুরুষ চঞ্চলা ডোমকন্যাকে গঙ্গা-যমুনা পার করার অনুরোধ করছে আর ডোমকন্যা অবলীলাক্রমে উত্তাল নদী পার করছে। অর্থাৎ নদী পারাপার তাদের পূর্বের পেশা ছিল এখনও তা বর্তমান আছে। তাছাড়াও বর্তমানে তারা অনেকেই কৃষিশ্রমিক, সেই সঙ্গে কলকারখানাতেও বহু জনে কাজ করে থাকে।

শৌর্য-বীর্য ও কৃষ্টি ঃ— এই জাতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাই তৎকালীন অনেক রাজা-রুজির সৈন্যবাহিনীতে এরা যোদ্ধার কাজ করত। ঘোড়সওয়ার সৈনিক হিসাবে এদের খ্যাতিও ছিল। লৌকিক ছড়াতেও তাই শোনা যায়—

আগা ডোম বাগা ডোম ঘোড়া ডোম সাজে।
ঝাঁঝ ঘন্টা কাঁসর বাজে।।

ডোম সম্প্রদায়ের সেই প্রাচীন যুদ্ধকাহিনী শিল্পকীর্তি হয়ে এখনও বহু মন্দিরগাত্রে টেরাকোটার শিল্পকর্মে বিধৃত হয়ে শোভা পাচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন আঙ্গিকে ডোম সৈনিকের যুদ্ধযাত্রা ও শিকার কাহিনীর অতুলনীয় দৃষ্টিনন্দন চিত্র সম্ভার শিল্প রসিকদের বিস্ময় উৎপাদন করছে। এ সম্পর্কে Gazetteer of India, 1994 এ বলা হয়েছে— According to the myths, legends and folk-lore of Radha, the Doms used to be the soldiers and mercenaries in the armies of the chiefs, chieftains, feudatories, independent and semi-independent Rajas and Zamindars of Radha during the medieval times and the early modern period. (৭৪)

সুদূর অতীতে খ্রিষ্ট পূর্ব ৪র্থ শতকেও এ জাতির অস্তিত্ব ও প্রাধান্য ছিল। তার কারণ এরাই মগধাধিপতি মহাপদ্মের কলিঙ্গ অভিযানের বিরোধিতা করে যুদ্ধ করেছিল। পরে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় এরাই সম্রাট অশোকের সৈন্যদলে সক্রিয় অংশ নিয়ে কলিঙ্গাভিযানে মত্ত হয়েছিল। এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই জাতি অতি প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে পরে পরে বহু স্বাধীন রাজা থেকে সামন্ত রাজা— তারও

পরে দেশীয় জমিদারদের সৈন্যবাহিনীতে সৈনিকের কাজ করেছিল। সেদিক থেকে এরা যে বরাবরই যোদ্ধার জাত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

নান্দনিক দিকের সকল ক্ষেত্রেও এরা সমান পারদর্শী ছিল। নাচগানে এই জাতি যে খুবই পটু ছিল সেকথা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবুও বলা যায় মার্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগরাগিণী যেমন— ভৈরবী, তোড়ী, ইমন, কেদার, পূরবী, দীপক ইত্যাদিসহ সকল রাগাশ্রয়ী সঙ্গীতে এদের পরিপূর্ণ অধিকার ছিল। নৃত্যের তাল, লয়, ঠাঠ ও অঙ্গ ভঙ্গিমা সম্পর্কে এদের অনেকেরই সম্যক ধারণা ছিল। নৃত্য-গীত পটীয়সী লাস্যময়ী ডোমকন্যারা যে বহু বহু যোগীর ধ্যান ভঙ্গ করেছিল সে কাহিনী প্রাচীন সাহিত্যেও উল্লেখ আছে। এই সেদিন পর্যন্ত বিভিন্ন বিবাহ বাসরে ও অনুষ্ঠানাদিতে সানাই সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে লোককে আনন্দ দিত। এখনও অনেকেই এই কাজে লিপ্ত রয়েছে। বাদ্যযন্ত্র বাজানোতে পারদর্শিতার জন্য এদেব এক গোষ্ঠীকে বাইতি ডোম বলা হয়।

গোপভূমে এদের বিস্তার ও প্রভাব ঃ— বঙ্গেব অন্যান্য স্থানের ন্যায় গোপভূমের বিস্তৃত অঞ্চলেই এদের বসবাস পূর্বেও ছিল এখনও রয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এরা এখানে বসতি গড়েছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে বঙ্গেশ্বর মহীপালের সময় গোপভূমের মহামাণ্ডলিক রাজা ইছাই ঘোষের রাজত্ব ছিল। আব তার সৈন্যবাহিনীকে মহাপরাক্রমশালী করে তুলেছিল এই অঞ্চলের ডোম সৈনিকরা। সেই সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিল ডোম সৈনিক লোহাটা বর্জর। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "বাংলার সামন্ত রাজাদের অন্যতম ছিলেন অজয় উপকূলবর্তী ঢেকুরগড়ের অধিপতি ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ। বাংলার অন্যান্য স্বল্প শক্তিশালী সামন্তরাজাদের অনেককে ঈশ্বর ঘোষ শক্তিবলে পরাভূত করেছিলেন। ঈশ্বর ঘোষের সকল শক্তির উৎস ছিল অজয় তীরের গোপভূমের বন্য উপজাতি ডোমেরা।" (৭৫) কাজেই ডোমেরা প্রাচীনকাল থেকেই এই গোপভূমে আপন শৌর্য-বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গেই এই অঞ্চলে বসবাস করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় ইছাই ঘোষকে পরাভূত করার জন্য বঙ্গেশ্বর লাউসেনের সেনাপতিত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন— তাদেরও নেতৃত্বে ছিল ডোম সম্প্রদায়। সেই দলের প্রধান সেনাপতি ছিল এই অঞ্চলেরই লোক কালু ডোম। সে ছিল এই গোপভূমের প্রবল শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব এবং সেও এই যুদ্ধে মারা যায়। ফলে তার সম্প্রদায় আপন গোষ্ঠীর প্রধান শক্তিকে হারিয়ে শোকে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তখন থেকেই কালুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যই প্রতি বছর ১৩ই বৈশাখ গভীর নিষ্ঠায় পূজা নিবেদন করে থাকে। গোপভূমে ঘোরার সময় বহুস্থানেই কোন শিলাখণ্ডকে সামনে রেখে কালুর উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া লক্ষ্য করেছি। বিশেষ করে জয়দেব

কেন্দবিশ্বের কিছু পূর্বে অজয়ের উত্তর তীরে কাঁদুনেডাঙ্গায় জঙ্গলাকীর্ণ এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় কালো পাথর বাঁধান তিনদিক ঘেরা দক্ষিণমুখী একটি আটন দেখেছি।

কথিত আছে এখানে ঈশ্বর ঘোষ লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। ভবানী ভক্ত ঈশ্বর ঘোষ মারা যাওয়ায় প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে দেবী ভবানী (শ্যামারূপা) নাকি শোকে কেঁদেছিলেন বলেই এই স্থান 'কাঁদুনেডাঙ্গা' নামে খ্যাত। এখনও এই স্থানে প্রতি বছর ১৩ই বৈশাখ— এই অঞ্চলের ডোমেরা সমবেত হয়ে কালুর উদ্দেশ্যে বাদ্যযন্ত্রসহ পাঁঠাবলি দিয়ে পূজা করে থাকে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "কে জানে কোন অজ্ঞাত কারণে সেই গোময় কুণ্ডের সুরভিকমল আজিও তাহার স্বজাতিগণের নিকট হইতে ভক্তির অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতেছে।" (৭৬)

এতো গেল প্রাচীনকালের ডোমেদের শৌর্যের কথা। বর্তমানেও তাদের বলিষ্ঠ গড়ন ও সাহসিকতা প্রাচীন সৈনিক জাতির ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দুর্গাপুর অঞ্চলের আড়া গ্রামের নিকট কালিগঞ্জে বেশ কয়েক ঘর ডোম জাতির বসতি রয়েছে— যাদের উপাধি 'খাড়াৎ'। এই খাড়াৎ শব্দটি যে 'খড়্গধারী' শব্দ থেকেই এসেছে তা বেশ বোঝা যায়। অর্থাৎ এরা যে এক সময় খড়্গ হাতে যুদ্ধের কাজেই নিযুক্ত ছিল তা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না।

বর্তমানে এই গোপভূমের প্রায় সব গ্রামেই এদের দেখা যায়। এরা এখন মূলত কৃষি শ্রমিক। তাছাড়াও বাঁশের ঝুড়ি, চ্যাঙারি, তালপাতার পাখা, পেকে, টোকা ইত্যাদি তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করে। এছাড়াও বিবাহ ও সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে নহবতে সানাই বাজিয়ে থাকে। ডোমেদের মধ্যে বাইতিরা ঢাক-ঢোল বাজিয়েও জীবিকা নির্বাহ করে। সমগ্র গোপভূমের বিস্তৃত অঞ্চলে এরা আপন আপন পল্লীতে ধর্ম ঠাকুরের পূজায় সক্রিয় অংশ নিয়ে থাকে। বর্তমানে এরা দুর্গাপুর ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলে শিল্পশ্রমিকের কাজেও নিযুক্ত হয়েছে। তবে তাদের সেই প্রাচীন ঐতিহ্য আজ ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। সেসব কথা ভাবলে অবাক হতে হয় কারণ— তাদের সেই অনন্ত শৌর্য-বীর্য, নৃত্য-গীত, বিভিন্ন রাগরাগিণী আশ্রিত হৃদয়-হারী গানবাজনা— যা এক সময় মানুষকে মোহাবিষ্ট করে রাখত— সেই অতুলনীয় কৃষ্টি কলা আজ না জানি কোন অপসংস্কৃতির অশুভ স্পর্শে কোথায় হারিয়ে গেল!

—ঃ হাড়ি ঃ—

প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্য ঃ— অজয়-দামোদরের দোয়াবে অবস্থিত গোপভূমে যে সকল নিম্ন সম্প্রদায়ের জাতিগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখ্য জাতি হ'ল হাড়ি। হাড়ি শব্দটি সম্ভবত সাঁওতালি ভাষা 'হড়' শব্দ থেকে উদ্ভুত। (৭৭) এরা খুবই প্রাচীন জাতি। শূর রাজত্বকালেও এদের সন্ধান পাওয়া যায়। রাঢ়ের হাড়ি বৌদ্ধতন্ত্রের

বজ্রযান, কালযান ও সহজযানের সঙ্গেও জড়িত ছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এ জাতি খুবই প্রাচীন।

একদা হাড়ি জাতির পুরুষেরা বন্য হাতিকে বশে এনে তাকে গ'ড়ে পিঠে যুদ্ধের বাহন বা রণহস্তীতে পরিণত করে তা রাজাদের প্রদান করত। তাই প্রাচীনকাল থেকেই এই সম্প্রদায় মৌর্য, শুঙ্গ, শূর, পাল, সেন এমনকি মল্লভূমের মল্লরাজাদেব পর্যন্ত রণহস্তী সরবরাহ করত, আর নিজেরাও যোদ্ধা বা সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত। তারা যে যোদ্ধা ছিল তার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ত্রিপুরাধিপ, ধনমাণিক্যের সময়ে তাঁহার সেনাদলের মধ্যে হাড়ি-সৈন্য অতি দুর্ধর্ষ ছিল। খাসিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধকালে হাড়ি সেনাপতিদের ভয়ে খাসিয়ারাজ রণক্ষেত্রে না যাইয়া ত্রিপুরেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। সেই হাড়ি সৈন্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া।
হাড়িয়া ডগর বাদ্য চলে বাজাইয়া ......
উত্তরের হাড়ি চলে আগে লৈয়া বানা।
বঙ্গদেশী হাড়ি সব মধ্যে থাকে থানা।।
দক্ষিণ দিগের হাড়ি চট্টগ্রাম আদি।
তার সেনা মাঝে চলে মহাশব্দ বাদি।।
ডেমস ডগর বাজে নাচে উর্দ্ধ হাতে।
শূকর-খেদান লাঠি পাকাইয়া মাথে।।" (৭৮)

এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রাজশক্তির সৈন্যসম্ভারে প্রাণীবাহিনীর মধ্যে হাতি ও ঘোড়ার পরিচালনার দায়িত্বেও থাকত। আর মেয়েরা প্রাচীনকাল থেকেই ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে প্রসূতি মেয়েদের পারদর্শিতার সঙ্গেই প্রসব কাজে নিযুক্ত ছিল, সেই সঙ্গে শিশু ও প্রসূতিগণের নানা রকমের রোগ ব্যাধির নিরাময় কৌশল আয়ত্তে রেখে মৃতবৎসার সুষ্ঠ প্রতিকার ও সন্তান উৎপাদনে বাধাপ্রাপ্ত 'বাধক' রোগের প্রতিকার করে বহু নারীর সন্তান ধারণে সাহায্য করত। তাই ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তারা সমগ্র বঙ্গে ধাইমা, ফুলমা ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত হয়েছে। সেদিক থেকে এরা বরাবরই সমাজ জীবনে পরম হিতৈষী জাতি হিসাবে আদরণীয় ছিল। গ্রামস্থ বহু পরিবারের প্রসূতিদের প্রসব সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করে এরা বংশানুক্রমিকভাবেই সেই সকল পরিবারের সঙ্গে যজমানি সম্পর্ক স্থাপনে বদ্ধ হয়েছিল। এখনও পাড়াগাঁয়ে তাদের ঐ ভূমিকাতেই দেখা যায়।

থাক বা বিভাগ ঃ— বঙ্গে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মত এই হাড়ি জাতির মধ্যেও বেশ কয়েকটি বিভাগ ছিল। তবে এই বিভাগগুলি মূলত আঞ্চলিক ও বৃত্তিকেন্দ্রিক

ছিল। প্রথমে বৃত্তির কথায় আসা যাক। যারা চাষ আবাদ ও কৃষিশ্রমিকের কাজ করত তাদের বলা হত চাষি বা ভুঁইমালী। ধাই এর কাজ যারা করত তাদের ধাই বা ফুলহাড়ি বলা হত। যারা পালকিবাহকের কাজ করত তাদের বলা হত কাহার বা বাহক। যারা মাছ ধরার বৃত্তি গ্রহণ করেছিল তারা 'ক্যাওড়া' নামে খ্যাত ছিল। এছাড়াও ছিল মেথর ও কদমা। আঞ্চলিকতার দিক থেকে এরা বাঙ্গালি, মগরা, বাঁশওয়ারী, সিংহজারী (এরা দক্ষিণ বাঁকুড়ার অধিবাসী), শিখর্যা (শিখরভূম অর্থাৎ দামোদর ও বরাকর নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী), মান্দারন্যা (গড় মান্দারনের অধিবাসী), সাততপা (বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর অঞ্চলের উত্তরের অধিবাসী) ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত ছিল।

গোত্র ও পদবী এবং টোটেম ঃ— পদ-পদবীর ক্ষেত্রে এদের মধ্যে বিশুই, সর্দার, হাজরা, সিং, বাগ, দুয়ারী, দাস, বক্সী, মাঝি ইত্যাদি পদবী চালু আছে। আর গোত্র হিসাবে এদের মধ্যে কচ্ছপ, শালগাছ, শালিক পাখী, টেকসনা ও চুনকুটী পাখীর চল আছে। টোটেম হিসাবে এরা উল্লেখিত গোত্রজ পশুপক্ষী মারে না ও খায় না। আর শাল গাছও কাটে না। বাউরি জাতি যেমন কুকুর মারা গেলে অশৌচ পালন করে তেমনি এরাও পোষা ঘোড়া মরলে অশৌচ পালন করে।

বিবাহ ও সামাজিক আচার আচরণ ঃ— বিবাহের ক্ষেত্রে এরা আপন থাকেব মধ্যেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ নিষ্পন্ন করতেই বিশেষ আগ্রহী। তবে বর্তমানে সব জাতির মতই এদেরও থাক কাঠিন্য বহুলাংশেই হ্রাস পেয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তেমন কাঠিন্য নেই তবে গ্রাম্য মুখ্যাদের বিচারে বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত হলে পর এরা ২য় বিবাহ বা সাঙা করতে পারে।

মৃতের সৎকার এরা দাহ করেই সম্পন্ন করে। অশৌচাদি ১২ দিনেই পালিত হয়। শ্রাদ্ধে সাধ্যমত আত্মীয় কুটুম্বদের খাওয়ানোর রীতি আছে তবে খাদ্য তালিকায় মদ একটি প্রধান পানীয় হিসাবে স্বীকৃত।

সামাজিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে এদের কিছু অবশ্য পালনীয় কর্তব্য রয়েছে যেমন— কালীপূজার পরদিন এরা পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা পালনের জন্য নতুন হাঁড়ি ব্যবহার করে এবং স্বর্গত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নয়টি শালুক পাতায় সেই অন্ন ব্যঞ্জন নিবেদিত হয়। ৭ই আষাঢ় তারা এদেশীয় বীরপুরুষ কালু বীরের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করে থাকে। এই কাজে পূজার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হয়। পূজায় মদ ও পাঁঠা নিবেদিত হয়।

পোষ্য জন্তু হিসাবে এরা শূকর পালন করে থাকে এবং বিভিন্ন পূজা পার্বণে সেই শূকর বলিদান করা হয়। বিচার ব্যবস্থায় এরাও বাউরিদের মত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রাম্য, অঞ্চল ও দেশ বিচারের পক্ষপাতী।

পূজ্য দেব-দেবী ঃ— এরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। তবে চণ্ডী,

মনসা, ক্ষেত্রপাল ও বাগরাই ছাড়াও বর্ণহিন্দুদের বিভিন্ন দেব-দেবী যেমন— কালী, দুর্গা, ষষ্ঠী ইত্যাদির পূজাও করে থাকে। এদেব বিভিন্ন পূজায় মদ একটি সাধারণ উপকরণ। পূজায় শূকরই মুখ্য বলি তাছাড়াও হাঁস, মুরগিও বলি দেওয়া হয়। হাড়িদের পূজায় পূর্বে কোন পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিল না, গ্রাম্য মুখ্যারাই পূজা করত কিন্তু বর্তমানে তাদেবও ব্রাহ্মণ জুটেছে।

গোপভূমে এদের অবস্থান ঃ— গোপভূমের প্রায় সব গ্রাম-গঞ্জেই হাড়িদের বাড়-বাড়ন্ত থাকলেও তারা খুবই গরীব। অধিকাংশ লোকই ক্ষেতমজুরের কাজ করে থাকে তবে ইদানীং অনেকেই শহরের কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ করছে। আর মেয়েরা দাইমায়ের কাজ কবে, তবে বর্তমানে চিকিৎসাশাস্ত্র বেশ উন্নত হওয়ায় এবং প্রায় গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠায় ওদের সেই বৃত্তি প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে। তাই আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ।

—ঃ চর্মকার ঃ—

বঙ্গে যে সমস্ত অন্ত্যজ সম্প্রদায় বা তপশিলি সম্প্রদায়ের বাস তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল মুচি বা চর্মকাব গোষ্ঠী। এদের মুচি নাম করণের কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায় যে হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের দক্ষিণে তরাই অঞ্চলে মেচি নামে এক নদী প্রবাহমান। সেই নদীর অববাহিকায় এক ধরনের বিশেষ জাতির বাস লক্ষ্য করা যায়, যারা প্রধানত ব্যাধ সম্প্রদায ভুক্ত। তাদের কাজই হল বিভিন্ন বন্য জীবজন্তু শিকার করে তাদের মাংস ও চর্ম বিক্রয় করা। বৃত্তিতে ব্যাধ হলেও মেচ নদীর তীরে বসবাস করার জন্য এরা মেচিনামে অভিহিত ছিল।

ঐ মেচিদের নিকট চর্ম কিনে কিংবা মৃত জীবজন্তুর চর্মমোচন করে একধরনের জাতিগোষ্ঠী সেই চামড়া শুকিয়ে তা থেকে মানুষের ব্যবহারের জন্য জুতা তৈরি ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ছাওয়ানর কাজে নিযুক্ত হয়। তাদের নির্মিত দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি ঐ ব্যাধ সম্প্রদায়ও ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হতে থাকে এবং তাদের দেখাদেখি তারাও চর্মজাতদ্রব্যাদি নির্মাণে হাত লাগায়, ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ মাখামাখি শুরু হয়। এই ভাবে মেচ নদী তীরস্থ মেচিদের সঙ্গে মেলা মেশার ফলেই ঐ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে মুচি নামে পরিচিত হয়। এইভাবেই চর্মের কারিগরেরা মুচি বা চর্মকার নামে সমাজে অভিহিত হয়।

পরে রুজি-রোজগারের আশায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তারা ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গেও ব্যাপকভাবে তাদের আবির্ভাব ঘটে এবং এই বঙ্গেও তারা মুচি নামেই পরিচিত হয় ও চর্মকেন্দ্রিক রুজিরোজগারে লিপ্ত হওয়ায় বঙ্গে তারা মুচি ছাড়াও চর্মকার ও চামার নামেও অভিহিত হয়। পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায়ের অনেকেই তাদের গোষ্ঠীর

মহান ব্যক্তিত্ব, সাধক রুহিদাসের নামকে স্মরণ মানসে তার নামে নামিত হয়ে নিজেদের রুইদাস নামেও পরিচয় দেয়। এরা আসলে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের অধীন চর্মকার। তবে বঙ্গেদেশের চামাররা তাদের উদ্ভব সন্ত রবিদাস থেকেও বলে দাবি করে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অধিকাংশ চর্মকারই রবিদাস পন্থী। তাছাড়াও এখানকার চর্মকারদের অনেকেই আবার শ্রীনারায়ণ সম্প্রদায় ভুক্ত।

প্রাচীনত্ব— এই সম্প্রদায় অন্ত্যজ ভুক্ত হলেও বেশ প্রাচীনগোষ্ঠী তাতে সন্দেহ নাই। ভারতীয় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ পুরাণে সরাসরি মুচি বা চর্মকারদের উল্লেখ নাই ঠিকই কারণ তখন জাতিভেদের আদৌ কোন কাঠিন্যই ছিল না। তবে চর্মসংক্রান্ত দ্রব্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে তখনকার দিনেও চর্মদ্রব্য ব্যবহারের রীতি ছিল কাজেই সে গুলি তৈরি করার লোকও ছিল। সেদিক থেকে চর্মকাদের অস্তিত্বও ছিল।

এবার মহাভারতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক, তাতে দেখা যায় হস্তিনাপুরে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরামর্শে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। এখন এই চর্মজীবি সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্য গ্রহণের আশায় ঐ সমাজের বেশ কিছু জ্ঞানী গুণী লোকের সান্নিধ্যে যাওয়ার সময় জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, তখনকার দিনে অর্থাৎ মহাভারতের কালে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক পরম কৃষ্ণভক্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি কৃষ্ণের নির্দেশে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পঙক্তিভোজনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজে অন্ত্যজ গোষ্ঠী ভুক্ত, সাধারণে স্পর্শ না করায় গ্রাম প্রান্তে অচ্ছুত অবস্থায় অবস্থিত নীচ জাতি হওয়ায়, দীনতা হেতু সঙ্কোচ বশত সেই আমন্ত্রণে যাননি। অন্তর্যামী ভগবান কৃষ্ণ ভক্তের মনের কথা বুঝে সেই মানসিকদীনতাকে কাটাবার জন্যই মধ্যমপাণ্ডব মহাবলী ভীমকে দিয়ে তাকে কাঁধে তুলে আনান এবং পঙক্তি ভোজনে বসান। সেখানে সুপাচিকা দ্রৌপদী কর্তৃক প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি পরিবেশিত হলে তিনি সমুদয় ব্যঞ্জনাদি একত্রে মিশিয়ে তার পরম আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করার পর সেই আহার্য গ্রহণে গ্রাস তুলেছিলেন। কিন্তু তার এই অদ্ভুত খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি দেখে দ্রৌপদী তার রাঁধা প্রতেকটি ব্যঞ্জনের যে বিশেষ স্বাদ তা ঐ মহাত্মা গ্রহণে অপারগ হওয়ায় ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসেছিলেন। তাতে তার কিছু আসে যায়নি। সেই পরম ভক্তের নিবেদনান্তে গৃহীত প্রতিটি গ্রাসই ভগবান গ্রহণ করেছিলেন। তার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি গ্রাসে গ্রাসে অন্তরিক্ষে ঘন্টাধ্বনি হয়েছিল।

ঐ কাহিনীর প্রেক্ষিতে এটাই ধরে নিতে হয় যে এই কর্মকার সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব মহাভারতের কালেও বর্তমান ছিল। আর মহাভারতের সময়কাল সম্পর্কে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের গণনার নিরিখে তার 'বৃহৎসংহিতা'য় জানা যায় যে পাণ্ডু-পুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ৬৫৩ কল্যাব্দে, যা খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ২৪৪৮

খ্রীষ্ট পূর্ব অব্দে। এই মতকে তখনকার দিনে আর এক উল্লেখ্য জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টও সমর্থন করেছিলেন।[৭৯] কাজেই আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগেও এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল এবং এই জাতি গোষ্ঠী যে খুবই প্রাচীন গোষ্ঠী তাতে সন্দেহ নাই।

এতক্ষণ আমরা পৌরাণিক সময়কালে ছিলাম। এবার আসা যাক ঐতিহাসিক কালে। তা সেও প্রায় সওয়া ছয় শ বছর আগেকার কথা। শিখ গুরু নানকের সময় এই মুচি সম্প্রদায়ের আর এক পরম ভক্ত সাধক রুইদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনিও খুব উচ্চদরের সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন দু'জোড়া করে জুতা তৈরি করতেন এবং তার থেকে একজোড়া কোন সাধক বৈষ্ণবদের দান করতেন আর এক জোড়া বিক্রয় করে কোন মতে ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটিয়ে কালাতিপাত করতেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী বিরচিত শ্রী শ্রী ভক্তমাল গ্রন্থে তাই উল্লেখিত হয়েছে—

দুই জুড়ি জুতা প্রতিদিন বানাইয়া।
এক জুড়ি দেন তিনি বৈষ্ণব দেখিয়ো।।
একজুড়ি বেচি করে দেহ নির্ব্বাহন।[৮০]

এইভাবে সংসারে থেকেও সংসার বিমুখ, বৈভব-ত্যাগী, ইষ্ট-নিষ্ঠ পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি কতখানি ত্যাগী পুরুষ এবং ঈশ্বর মুখী ছিলেন তার প্রমাণ নেওয়ার জন্য সাধুবেশী ইষ্টদেব তাকে এক খণ্ড পরশ পাথর দিয়েছিলেন। যার দৌলতে তিনি ইচ্ছা করলে অতি সহজেই পার্থিব জীবনে অতুল বৈভবের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু ইহজগতের সামান্য বিষয় বৈভবের তিনি আদৌ প্রত্যাশী ছিলেন না। তাই পরম ত্যাগী রূপসনাতনের মতই সেই অমূল্য পরশ পাথর চালের বাতায় তুলে রেখে ছিলেন।

অন্যদিকে বিষয় বৈভবের আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে বৃন্দাবনের যমুনা তটে রূপ সনাতনের কাছে ছুটে যাওয়া মানকরের জীবনগোস্বামী যে বিষয় বৈভবের চাবি কাঠি স্বরূপ পরশ পাথর হাতে পেয়েও বৈষ্ণবের পরশধন্য হয়ে মুহূর্তে পার্থিব জগতের কথা ভুলে গিয়ে বলতে পেরেছিলেন—

যে ধনে হইয়া ধনী মনিরে মান না মণি
তাহারি খানিক।
মাগি আমি নতশিরে" এত বলি নদী নীরে
ফেলিলা মাণিক।।[৮১]

সেহেন জীবনগোস্বামীর সঙ্গেও রুইদাসের মিল নাই। কারণ তিনি পার্থিব বিষয় সম্পত্তি কোন দিনই চাননি। তিনি বরাবরই ত্যাগী পুরুষ ছিলেন।

সেই সর্বত্যাগী নিরাসক্ত ভক্তপুরুষ অন্ত্যজ সম্প্রদায় ভুক্ত হলেও তার ত্যাগ ও

মহত্বের সৌরভ তখন দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল। তাই সমাজের উচ্চস্তরের মহিমময়ী মহারাণী বালিদেবী পরম আগ্রহে রুইদাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় জনশ্রুতি বলছে তদানিন্তন পরম সাধিকা গিরিধারী লালের একনিষ্ঠ প্রেমিকা, পার্থিব জগতে সংগ্রাম সিংহের পুত্রবধূ চিতোরের ভোজ রাজের পরিণীতা স্ত্রী মীরাদেবীও নাকি রুইদাসের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, ঝালিদেবী একবার গুরু রুইদাসকে নিমন্ত্রণ করে নিজ প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পঙক্তি ভোজনে বসিয়ে ছিলেন ফলে বারাণসীর গোড়া ব্রাহ্মণেরা মুচির সঙ্গে পঙক্তি ভোজনে বসতে রাজি না হওয়ায় তার কাছ থেকে সরে সরে বসতে লাগল কিন্তু আশ্চর্যর ব্যাপার তারা যতই সরতে থাকে ততই রুইদাসকে তাদের পাশেই দেখতে পায়। ভক্তমাল বলছে—

রুইদাস পাশ হৈতে দুরে গিয়া বৈসে।
সেখানেও দেখে রুইদাস বসি পাশে।।
পুনর্ব্বর তথা হইতে দুরে গিয়া বৈসে।
পুনঃ দেখে রুইদাস বসিয়াছে পাশে।। (৮২)

এরা অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের হলে কি হবে এদের মধ্যেও যুগে যুগে বহু ভক্ত সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। এখন আর এক ভক্ত জনের কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। ভক্ত রবিদাস বাড়িতে বসে জুতা তৈরি করছে সামনে কৌটাতে জল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে। এমন সময় পাশ দিয়ে এক ব্রাহ্মণকে গঙ্গা স্নানে যেতে দেখে তিনি তাকে তার তোলা কিছু ফুল দিয়ে অনুরোধ করলেন সেগুলি গঙ্গাকে নিবেদন করতে। ব্রাহ্মণ মুচির দেওয়া ফুল নিতে ঘৃণা করলেও শেষ পর্যন্ত গামছায় বেঁধে নিয়ে গেলেন। স্নান শেষে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ রবিদাসের দেওয়া ফুলগুলির কথা মনে পড়ায় গামছা খুলে পাড় থেকে সেগুলি অবজ্ঞাভরে নদীতে ফেলে দিয়ে অবাক হয়ে দেখেন যে, জলের ভিতর থেকে শ্বেতশুভ্র শঙ্খ বলয় পরিহিত দুটি সুন্দর পেলব হাত প্রসারিত হয়ে পরম আগ্রহে ফুলগুলি গ্রহণ করছে। ব্রাহ্মণ ফেরার পথে রবিসাদকে সে কথা জানিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলে রবিদাস খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল— "মন চাঙ্গা কটোতে মে গঙ্গা"।

এই সম্প্রদায় লোকচক্ষে অচ্ছুত অস্পৃশ্য হলেও এরা বেশ প্রাচীন জনগোষ্ঠী এবং ভক্তি প্রবণও বটে তাই কলি যুগের সাক্ষাৎ ভগবান্, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এদের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন— "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণভজে"।

জাতি হিসাবে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির অভাব ছিলনা। তাই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া গেছে ভারতীয় সংবিধানের রূপকার ডঃ বি. আর. আম্বেদকর মত গুণী জনকে, সেই সঙ্গে স্বাধীনত্তর যুগের কংগ্রেস রাজত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে বাবু জগজীবন রামকে।

জাতি গোষ্ঠী— বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুযায়ী এই জাতি গোষ্ঠী হল অধমসংকর পর্যায় ভুক্ত উপবর্ণ বিশেষ। সনাতন হিন্দু ধর্মে যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বর্তমান এরা তাদের আওতায় পড়ে না। "অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যাযে ৯টি উপবর্ণ (মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বকড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলা বাহী, মল্ল); ইহারা সকলেই বর্ণাশ্রম বহির্ভূত। অর্থাৎ, ইহারা অস্পৃশ্য এবং ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে ইহাদের কাহারও কোনও স্থান নাই।" (৮৩) তবে এবা অসৎশুদ্র পর্যাযে পড়ে।

বৃত্তি— বঙ্গে সকল জাতিব আপন আপন বৃত্তি আছে। সমগ্রদেশে কৌলিকবৃত্তি হীনজাতি নাই। সকল জাতিব কিছু না কিছু জাত ব্যবসা বা কৌলিক বৃত্তি আছেই। সে দিক থেকে এই জাতির ও কৌলিক বৃত্তি হচ্ছে মৃত জীবজন্তুর চর্ম মোচন ও তাকে শুকিয়ে করে তা থেকে জুতা তৈবি ও বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রাদি ছাওয়ার কাজ। বর্তমান যুগে অনেক জাতি যে আপন কৌলিক বৃত্তি থেকে সবে যাওয়ার চেষ্টা করছে না তা নয়। তবে সে ক্ষেত্রে প্রাচীন কৌলিক বৃত্তির পবিবর্তে তাদের পছন্দ মত অন্যকোন জাতির কৌলিক বৃত্তিকে তারা গ্রহণ করছে ফলে সে ক্ষেত্রে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই অন্য জাতিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যেমন— সদ্গোপ- যারা আগে গোপ বা গোয়ালা ছিল পরে কৃষি কর্মকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে, বা চাষাধোপা— যারা আগে রজকতা করত পরে পেশা বদলে কৃষিজীবী হয়েছে। (৮৪)

এরা কিন্তু সে রকম আপন কৌলবৃত্তি পরিত্যাগ করে নাই। তবে বর্তমান পরিবর্তন শীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকেই শহর নগরে স্থিতু হয়ে বৃত্তির উন্নতিকরণ ঘটিয়ে নানা বাদ্য যন্ত্র ছাওয়ানোর দোকান, সেই সব বাদ্যযন্ত্র বিক্রয়ের দোকান এবং অনেকে জুতার দোকানদারিতেও নিযুক্ত রয়েছে। অপেক্ষাকৃত গরীবেরা জুতো পালিশ ও মেরামতের কাজ করছে।

তবে গ্রাম-গঞ্জে এই সম্প্রদায় এখনও জীবজন্তুর চর্মমোচন করে ও তা থেকে বাদ্য যন্ত্র ঢাকঢোল, বাঁয়া-তবলা ইত্যাদি ছাওয়ার কাজ করে এবং এদের অনেকেই পূজা অর্চনায় ও নানা মাঙ্গলিক শুভানুষ্ঠানে বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র যেমন ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাগরা, ডগর ও সানাই এবং ব্যান্ড পার্টির বাজনাও বাজিয়ে থাকে। মোট কথা চর্মজাত দ্রব্যাদি তৈরি ও মেরামত এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ছাওয়ানো ও তা বাজানই এদের বৃত্তিগত মুখ্য কাজ। কিন্তু সারা বছর ঢাক ঢোল বাজাবার ডাক না থাকায় পাড়াগ্রামে এরা বর্তমানে ব্যাপক ভাবে কৃষি শ্রমিক, বর্গদার ও প্রান্তিক চাষীতে পরিণত হয়েছে আর শহরাঞ্চলে অনেকেই কলে কারখানায় শ্রমিকের কাজে এবং লেখা পড়ায় শিখে অফিস আদালতেও কাজ করছে। তবে এখনও আপন বৃত্তি থেকে সরে যায়নি।

বিভাগ— বঙ্গের অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মত এদের মধ্যেও অন্তত চারটি বিভাগ বেশ স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। সেই বিভাগগুলি হল যথাক্রমে— আড়ি, বাদ্যকর, ঋষিদাস ও বাইতি।

আড়ি শব্দটি এসেছে সম্ভবত 'রাঢ়' শব্দ থেকে বঙ্গের এক বিশেষ অংশ হল রাঢ় বঙ্গ। সেই রাঢ় বঙ্গে বসতি গড়ে তোলায় এরা রাঢ়রাঢ়ীআড়ি নামে অভিহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাড়াগ্রামে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 'র' এর শুদ্ধ উচ্চারণ অনেকের মধ্যেই স্পষ্ট হয় না। এরা 'র' এর বদলে 'অ' বা 'আ' এর উচ্চারণ করে। যেমন রস এর উচ্চারণ ওরা অনেকেই অস করে থাকে তেমনি 'রাম' ওদের অনেকের কাছেই 'আম' হয়ে যায়। তাই রাঢ়ী থেকে সহজেই আড়ি হয়েছে।

আড়ি গোষ্ঠী আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। যেমন বহিরাগত ও দেশী। মুচি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর মোটামুটি ষাটের দশকে নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে রাজস্থানের চর্মকাদের হাতের পাঞ্জার সঙ্গে এখানকার আড়ি সম্প্রদায়ের চর্মকারদের হাতের পাঞ্জার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়েছে। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে এই সম্প্রদায় কোন এক সময়ে ঘুরতে ঘুরতে এই রাঢ় দেশে এসে স্থিতু হয়েছে। রাজস্থানের চর্মকারদের যাদের গায়ের রং ফর্সা তারা মোটামুটি একই গোষ্ঠী বলেই মনে হয় তাই এরা বহিরাগত সম্প্রদায় ভুক্ত আর এখানের ঐ গোষ্ঠীর চর্মকার যাদের গায়ের রং কালো তারাই আদি রাঢ়ী গোষ্ঠীর দেশী সম্প্রদায় ভুক্ত।

চর্মকার সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বিভাগটি হল বাদ্যকর। এরা পশুচর্ম মোচন করে তাকে শুকিয়ে তা থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ছাইয়ে থাকে এবং সেই সকল যন্ত্র দক্ষতার সঙ্গে বাজিয়েও থাকে। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বনে এরাই বিভিন্ন বাদ্যভান্ড বাজিয়ে থাকে তাই এরা বাদ্যকরগোষ্ঠী ভুক্ত।

মুচি সম্প্রদায়ের তৃতীয় বিভাগটি হল ঋষিদাস। এরাও চর্মকার সম্প্রদায় ভুক্ত তবে এরা রাঢ়ীয় সম্প্রদায় বা বাদ্যকর ভুক্ত নয়। এরা সাধারণত পূর্ব দেশীয় বা পূর্ব বঙ্গীয় চর্মকার। এদের প্রধান বৃত্তি হল চর্মজাত দ্রব্যাদি নির্মাণ করা। এরা দীর্ঘদিন এই রাঢ় বঙ্গে এসে বসবাস করলেও এবং চর্ম সংক্রান্ত দ্রব্যাদি নির্মাণ করলেও এরা নিজেদের ঋষিদাস নামেই পরিচিত করে। কারণ এদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই অতীতে রুইদাস, রবিদাসের মত হয়ত কোন ঋষিতুল্য ঋষিদাসের আবির্ভাব হয়েছিল। তাই তাদের সেই বংশ জাত ঋষিদাসকে স্মরণ করেই এরা এখনও নিজেদের ঋষিদাস নামেই পরিচয় দিয়ে থাকে।

এই সম্প্রদায়ের চতুর্থ থাক বা বিভাগটি হল বাইতি। এই বাইতি কথাটি বাজিয়ে থেকে এসেছে। যারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকে তাদেরই বাইতি বলা হয়। ডোম

সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাদ্যযন্ত্রাদি বাজিয়ে থাকে তাই তাদের বাইতিডোম বলা হয়। সে দিক থেকে বাইতি শব্দটি বাজক অর্থেই প্রযোজ্য। তা যদি হয় তবে এই সম্প্রদায়ের বাদ্যকর নামে একটি আলাদা গোষ্ঠী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আবার বাইতি বিভাগটি কেন? তার উত্তরে বলা যায় এই বাইতিরা কেবলই বাজনদার। এরা বাদ্য দ্রব্যাদি ছাওয়ার কাজ করে না কিন্তু বাদ্যকরেরা বাদ্য যন্ত্র যেমন ছাইয়েও থাকে তেমনি তা বাজিয়েও থাকে। সেদিক থেকে বাদ্যকর ও বাইতির মধ্যে ঐ সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকুই লক্ষ্যণীয়।

বাইতিদের বাজনার হাত খুব ভাল। সাধারণ ঢাক ঢোল যেমন সুন্দরভাবে বাজিয়ে থাকে তেমনি বিশেষ বিশেষ বাদ্যযন্ত্র যেমন মাঙ্গলিক বিবাহ অনুষ্ঠানে সানাই বাজাতেও এরা বিশেষ পটু। এছাড়াও মনু ধরনের চর্মকারের কথা বলেছেন— যেমন কারাবর ও ধিগরন। কারাবররা পশুদেহ থেকে চামড়া কর্তন করে তা তৈরি করে আর ধিগ্‌বন যারা তারা চামড়ার কাজ করে।

গোত্র বা টোটেম— অন্যান্য হিন্দু জাতি জাতি গোষ্ঠীর মত এদেরও মধ্যে গোত্র এবং পারিবারিক বাধানিষেধ হিসাবে টোটেম-ট্যাবু বর্তমান। গোত্র হিসাবে এদের মধ্যে কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ইত্যাদি গোত্রের চল আছে। অন্যান্যদের মতই এদের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয়রা কাছিম খায় না, শাণ্ডিল্য গোত্রীয়রা ষাঁড় বোয়ায় না। এদের পদবীর মধ্যে প্রধান হল দাস। তাই এরা যেখানে অধিক সংখ্যায় বাস করে সেই সমস্ত জায়গাগুলি দাস পাড়া, দাসগড়, দাসপুর, দাসনগর ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ইদানিং কালে এই সম্প্রদায়ের অনেকেই 'দাস' পদবী পালটে আইনের সহায়তায় এর মাধ্যমে মণ্ডল, পাত্র, সরকার ইত্যাদি পছন্দমত পদবী গ্রহণ করছে।

সামাজিক রীতিনীতি— এরাও সমাজবদ্ধ জীব। তাই সামাজিক বিধি-বন্ধনের মধ্যে থেকে সামাজিক বহু বাধানিষেধ এরা মেনে চলে। বিশেষ করে বিবাহের ক্ষেত্রে আপন আপন থাকের মধ্যে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিতে আগ্রহী। তবে বর্তমানে সেই গোঁড়ামি অনেকাংশেই দূরীভূত হয়েছে। ফলে বিয়ে-শাদির ব্যাপারে এরা আপন আপন থাক ভেঙে একই গোষ্ঠীর ভিন্ন থাকের মধ্যেও বিয়ে দেওয়া শুরু করেছে। তবে বিয়ের ক্ষেত্রে বঙ্গের চর্মকারেরা এখনও বিহারী চর্মকারদের কাছ থেকে অনেকটাই দূরত্ব বজায় রেখে চলে তবে মনে হয় সেটাও আর বেশি দিন চলবে না।

মৃতের অশৌচ পালনে এরা বরাবরই একমাস অশৌচ পালন করে থাকে। এখনও তাই করে, তবে অনেক শিক্ষিত চাকুরিজীবীরা ঐ নিয়ম শিথিল করে নিয়ে নিয়েছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে এরা হিন্দু, তবে নিম্নবর্ণের হিন্দু হলেও এরা নিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুর সকল দেবদেবীর পূজাই করে থাকে। এদের জাতিগত কোন বিশেষ দেব-দেবতা না থাকলেও যারা চর্মজাত দ্রব্যাদি তৈরি করে থাকে তাদের অনেকেরই মধ্যেই দেবশিল্পী

বিশ্বকর্মা পূজার বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। হিন্দু আচারই সর্বোতভাবে মেনে চলে। পূজা অর্চনার জন্য এই জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব ব্রাহ্মণ আছে। নিজেদের পূজায় ঢাক ঢোল নিজেরাই বাজিয়ে থাকে। উত্তর ভারতের চর্মকার সম্প্রদায়ের মধ্যে সৎনামী সম্প্রদায়ের অনেক আছে — যারা মাছ মাংস, পিঁয়াজ খায় না ও মদ্যপান করে না। বিহারের চর্মকারেরাও গোঁড়া হিন্দুবাদী। তারা বহু হিন্দুদের দেবীর পূজাও করে থাকে।

সার্বিক অবস্থা— এই জাতি খুবই অনুন্নত এবং গরীব। লেখা পড়ার চল এদের মধ্যে তেমন ছিল না। তপশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ায় স্বাধীনোত্তর কালে অনেকেই চাকুরির সুযোগ পাওয়ায় এই সমাজের ছেলে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার প্রবণতা গড়ে ওঠে তার ফলে সংরক্ষণের সীমায় থাকায় অনেকের চাকুরি-বাকুরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকেরই জীবন যাত্রার মান বহুলাংশে উন্নত হয়েছে। সেই সঙ্গে সভ্যতার হাওয়া পালে লাগায় অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহর-নগরে গিয়ে কল কারখানায়, অফিস আদালতে চাকুরি করছে। কেউ কেউ চর্মজাত বিভিন্নবাদ্য যন্ত্র তৈরি করা ও তাদের সারা-মেরামতের ও বিক্রয়ের দোকান খুলে বসেছে। অনেকেই জুতার দোকান খুলে বসেছে তবে সেক্ষেত্রে অন্যান্য আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতায় এদের অনেকখানি প্রতিহত হতে হচ্ছে।

পাড়া গ্রামেও এদের আগের থেকে আর্থিক অবস্থা ভাল হয়েছে। পূজাপার্বনে ঢোল-ঢাক বাজালেও বার মাস সে কাজ থাকে না তাই অন্য সময় কৃষি শ্রমিকের কাজ করে। অনেকে পরের জমি জায়গা চষে থাকে ফলে বর্গাচাষীও হয়েছে। নিজেরাও কিছু কিছু জমি জায়গা কিনে প্রান্তিক চাষীতে পরিণত হয়েছে সুতরাং আগের সেই নিদারুণ আর্থিক কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

গ্রাম ও শহরে এখন অনেকেই জুতা তৈরি, জুতা মেরামত ও জুতা পালিশের কাজ করে। বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র মেরামত ও ছাউনির কাজ করে। মোট কথা এরা আপন বৃত্তি অর্থাৎ চর্মকেন্দ্রিক কাজ-কাম থেকে এখনও সরে আসে নাই।

এই সমাজের অনেকেই চর্মজাত দ্রব্যাদি নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অনেকেই লেদার টেকনলজি বা চর্মজাত দ্রব্যাদির উন্নতিকরণের চেষ্টা-চরিত্র করেছে। তাদের মধ্যে এক জনের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবিদার। তিনি হলেন রাঢ় বঙ্গের বীরভূম নিবাসী মাধব দাসের পুত্র দীননাথ দাস। তিনি উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নিজ প্রচেষ্টায় লেদার টেকনলজির উন্নতি ঘটিয়ে কলকাতায় প্রজেক্ট তৈরি করেন এবং তাতে আপন সম্প্রদায়ের বহু জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। এই উদ্যোগে তিনি প্রভূত সাফল্য লাভ করায় আর্থিক স্বাচ্ছল্যেও বিশেষ উন্নত হয়েছিলেন ফলে এই সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বহু দান ধ্যান করেছিলেন। যেমন বীরভূমের খুজুটি পাড়ায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও বহু

স্থানে অনেক দেবকীর্তি স্থাপন করেছিলেন। যেমন— বর্ধমানের রতনপুরে দুর্গোৎসব ও তা পরিচালনার জন্য বিষয় সম্পত্তি প্রদান এবং কলকাতায় রাজা রাজকৃষ্ণ দে স্ট্রীটে রাধাগোবিন্দদেব সেবার জন্য দেবালয় স্থাপন ও দেবসেবা পরিচালনার জন্য মাসিক কুড়ি হাজার টাকা আয় হওয়ার মত সম্পত্তি দান করেছিলেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যও বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

গোপভূমে বিস্তৃতি— অতি প্রাচীন কাল থেকেই গোপভূমে চর্মকারদের অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে থাক গত যে চারটি বিভাগ বর্তমান তার মধ্যে 'আড়ি' বিভাগটির প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই 'আড়ি' কথাটি 'রাঢ়ী' থেকে এসেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে রাঢ় বঙ্গে এরা যে ছিল তাতে সন্দেহ নাই। আর রাঢ় বঙ্গেরই একটা অংশ হল গোপভূম— কাজেই গোপভূমেও এদের না থাকার কারণ নাই। তাছাড়া গ্রাম পরিক্রমায় গিয়ে, তথ্যানুসন্ধানের আশায় যখন দিনের পর দিন গোপভূমের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরেছি, তখন সরেজমিনেই দেখিছি প্রায় সব গ্রামেই এই সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে। তবে সেই বসতক্ষেত্রগুলি গ্রামের কোন কোন প্রান্তীয়সীমায় অবস্থিত।

গোপভূমের প্রাচীন এলাকা দুর্গাপুর— যা বর্তমানে শিল্পনগরীতে পরিণত হয়েছে, সেই নতুন গড়ে ওঠা দুর্গাপুর শহরের পূর্ব প্রান্তেই রয়েছে মুচিপাড়া যেখানে বাসস্টপেজ গড়ে উঠেছে এবং তা 'মুচিপাড়া' স্ট্যান্ড নামেই পরিচিত। গোপভূমে এমন বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। নমুনা স্বরূপ বলা যায় গোপভূমের এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম মানকরের শেষ দক্ষিণ প্রান্তে মুচিপাড়া অবস্থিত অন্যদিকে গলসী থানার কুরমুন-চন্দনপুর গ্রামদুটির একটি পূর্ব প্রান্তে আপরটির পশ্চিম প্রান্তে মুচিপাড়ার অবস্থান দেখা যায়। তবে গোপভূমের প্রায় সব গ্রামেই এদের বসতি দেখা যায়।

।। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও পত্র পত্রিকা ।।

শিল্পজীবী সম্প্রদায় ঃ—

১) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (৩য়), মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-১০৪
২) বাঙালীর ইতিহাস— নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-২৭৫
৩) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (৩য়) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৬
৪) ঐ .... পৃঃ-৪
৫) ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়— ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-১৮৩
৬) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-২১৭

অন্যান্য সম্প্রদায় ঃ—

১) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (৩য়), মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-১৪৭
২) বাংলার কায়স্থ সমাজ— ধীরেন দেব, লৌকিক পত্রিকা থেকে।
২, ৩ সংখ্যা ১৩৯৪.... পৃঃ-৩
৩) বাঙালীর ইতিহাস— নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-২৪৬, ২৪৮
৪) বাংলার কায়স্থ সমাজ— ধীরেন দেব, লৌকিক পত্রিকা
২, ৩ সংখ্যা— ১৩৯৪.... পৃঃ-৫
৫) ভারতীয় জাতি বর্ণপ্রথা— ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-২৫৮
৬) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (৩য়), মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-১৫৪
৭) শ্রীধর্ম্মমঙ্গল— ঘনরাম চক্রবর্ত্তী।.... পৃঃ-১৭
৮) বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-২৪৮
৯) গোবিন্দ লীলামৃত— কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনুবাদক— যদুনন্দন দাস।
১০) তথ্যসূত্র ঃ— বর্তমান পত্রিকা ৮ই ডিসেম্বর— ১৯৯৮
১১) " ঃ— বর্ধমান সহায়িকা (২০০১) বর্ধমান সমাচার।.... পৃঃ-১৫৪
১২) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য়), মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-১১৬
১৩) তাম্বুলী সমাজের উৎস সন্ধানে— অনিল বরণ কর,
তাম্বুলী হিতৈষী পত্রিকা— বৈশাখ, আষাঢ় ১৪০৩।
১৪) হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য— ডঃ অতুল সুর।
১৫) বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-২৪৮
১৬) প্রচলিত প্রবাদ।
১৭) ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়— ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-১৮৩
১৮) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২), মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-১২২
১৯) ঐ (৩) " .... পৃঃ-৭২
২০) চর্যা গীতির ৩নং পদ।
২১) জাগরণ— রামকৃষ্ণ মণ্ডল।.... পৃঃ-১৪
২২) West Bengal District Gazetteers (Burdwan) 1994. .... Page-138
২৩) জাগরণ— রামকৃষ্ণ মণ্ডল।.... পৃঃ-১৪
২৪) ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়— ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-১৮৩
২৫) জাগরণ— রামকৃষ্ণ মণ্ডল।.... পৃঃ-৩০
২৬) পদবীর উৎস সন্ধানে— ধীরেন দেব
(অসময় পত্রিকা— অক্টোবর ১৯৯৯).... পৃঃ-৫৫
২৭) West Bengal District Gazetteers (Burdwan) 1994. .... Page-138
২৮) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য়), মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-১০৪
২৯) শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—অনুবাদক—কালী কিশোর বিদ্যাবিনোদ।.... পৃঃ-৪২

৩০) বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-২৪৯
৩১) ঐ .... পৃঃ-২২৮
৩২) দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২৩৪
৩৩) বৃহৎ বঙ্গ (১ম) দীনেশ চন্দ্র সেন।.... পৃঃ-২৬৮
৩৪) বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-২২৮
৩৫) ভারতীয় জাতি বর্ণপ্রথা— ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-২৫৯
৩৬) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য়), মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-৯৬
৩৭) ঐ .... পৃঃ-৯৯
৩৮) চর্যাপদের ১৩ নং পদ দ্রষ্টব্য।
৩৯) ধর্মরাজের ধ্যান— লম্বোদরপুর, বীরভূম।
দ্রঃ— রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর— ডঃ অমলেন্দু মিত্র।.... পৃঃ-১৪৩

ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ঃ—

৪০) বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।.... পৃঃ-২৪৮
৪১) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য়), মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-১৯৪
৪২) বেনের মেয়ে (৩য় পরিচ্ছেদ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।.... পৃঃ-২৭
৪৩) মনসা মঙ্গল— কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ।
সম্পাদনা— বিজনবিহারী ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-২৬
৪৪) কবি কঙ্কণ চন্ডী— মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (বসুমতী প্রকাশন).... পৃঃ-৯৫
৪৫) ঐ .... পৃঃ-১৪০
৪৬) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য়), মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-১৭৯-১৮০
৪৭) কবি কঙ্কণ চন্ডী— মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-৭১
৪৮) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য়), মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-২২৭
৪৯) দ্রষ্টব্য— বৃহৎ বঙ্গ (১ম) দীনেশ চন্দ্র সেন।.... পৃঃ-৪৮৭

অন্ত্যজ সম্প্রদায় ঃ—

৫০) বর্ধমানের ইতিহাস যৎকিঞ্চিৎ— ডঃ সুকুমার সেন।
৫১) বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম) ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।.... পৃঃ-১৪
৫২) Bengal District Gazetteers— J.C.K. Peterson. Page-85
৫৩) জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ
অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৩১
৫৪) বাঁকুড়া জেলার তপসীলী জাতি উপজাতি— দুঃখ ভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।.... পৃঃ-১৬
৫৫) ঐ
৫৬) রাঢ় বঙ্গের শব্দ বৈশিষ্ট্যের সাংস্কৃতিক পটভূমি— সুশীল কুমার মণ্ডল।.... পৃঃ-১৯২
৫৭) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-১৫৮
৫৮) Bengal District Gazetteers (Burdwan) J.C.K. Peterson. Page-85

৫৯) বাঁকুড়া জেলার তপসীলী জাতি উপজাতি— দুঃখ ভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২৭
৬০) Bengal District Gazetteers (Burdwan) J.C.K. Peterson. Page-86
৬১) বাঁকুড়া জেলার তপসীলী জাতি উপজাতি— দুঃখ ভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৩০
৬২) ঐ .... পৃঃ-২৩
৬৩) ধর্মমঙ্গল— রূপবাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-২২০
৬৪) রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়ন।.... পৃঃ-৩৩১
৬৫) Bengal District Gazetteers (Burdwan) J.C.K. Peterson. Page-87
৬৬) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খন্ড) মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-২২২
৬৭) কবি কঙ্কণ চন্ডী— মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।.... পৃঃ-৭১
৬৮) শিবায়ন কাব্য— রামেশ্বর চক্রবর্তী।.... পৃঃ-২২৩
৬৯) চর্যাগীতির ১০ নং পদ দ্রষ্টব্য।
৭০) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, মানিকলাল সিংহ।.... পৃঃ-
৭১) বাংলার হিন্দুদের বর্ণবিন্যাস— চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস।.... পৃঃ-৭৩
৭২) চর্যাগীতির ১০ নং পদ দ্রষ্টব্য।
৭৩) ঐ ১৪ নং ”
৭৪) West Bengal District Gazetteers, March – 1994. .... Page-
৭৫) গ্রাম মুলুকের ইতিকথা— সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৩৫
৭৬) বীরভূম বিবরণী (২য়) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২৩০
৭৭) বাঁকুড়া জেলার তপসীলী জাতি উপজাতি— দুঃখ ভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৩৮
৭৮) রাজমালা। দ্রষ্টব্য— বৃহৎ বঙ্গ (১ম) দীনেশ চন্দ্র সেন।.... পৃঃ-৩

।। গোপভূমের বিশেষ ঐতিহ্যবাহী কিছু জনপদ ।।

অমরার গড়— গ্রামটি গোপভূম পরগনার আউশ গ্রাম ২নং ব্লকের সদর কার্যালয়-এর জে, এল, নং-৮৮, গুসকরা-বুদবুদ পাকারাস্তর উত্তর অংশে মানকরের সামান্য পূর্বে অবস্থিত। গোপভূমের গোপরাজাদের এটি এককালে রাজধানী ছিল। সেই রাজবংশের রাজা মহেন্দ্রই ভাল্কী থেকে তাদের রাজধানী এখানে সরিয়ে এনেছিলেন। সেই সময়কার এই গ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে এই গ্রন্থের 'ইতিহাসের অলোয় গোপভূম ও তার রাজকাহিনী' শীর্ষক অধ্যায়ে অলোচনা করা হয়েছে। এখন সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে গ্রামের বিশেষ কিছু পুরাকীর্তি ও ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

গ্রামের নামকরণ ঃ অনেকের মতে রাজা মহেন্দ্রর পাটরানী অমরার নামে গ্রাম নাম হযেছিল অমরা এবং যেহেতু রাজা মহেন্দ্র এখানে রাজধানী নির্মান করে তাকে পরিখা ও পাঁচিল পরিবেষ্টনে সুদৃঢ় গড়ে পরিণত করেছিলেন তাই এই গ্রামের নাম হয় অমরারগড়।

দেবকীর্তি— রাজামহেন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবী 'শিবাখ্যা'ই গ্রামের মুখ্য বা গ্রাম্য দেবী। উল্লেখ্য রাজা মহেন্দ্রই এমন ক্ষমতা শালী ছিলেন যে, একদা কাটোয়া হতে পঞ্চকোট পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম বর্ধমানই তার অধিকারে ছিল। একসময় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি কাটোয়ার নিকটের গ্রাম খাজুর ডিহির উগ্রক্ষত্রিয় জমিদার জগৎসিংহের পূজ্যদেবী 'শিবাখ্যা'কে জোর করে সেখান থেকে নিয়ে এসে আপনরাজধানী এই অমরার গড়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (১) তখন থেকেই বংশানুক্রমিক ভাবেই দেবী এ গ্রামেই পূজিত হয়ে আসছেন।

দেবী অসলে কালো কষ্টি পাথরে খোদিত দশভূজা সিংহবাহিনী মূর্তি। দেবী দশ হাতে দশ প্রহরণ ধারিনী হলেও প্রহরণ গুলির মধ্যে খড়্গটিই আকারে বিশেষ বড়। পদতলে খড়্গাঘাতে কর্তিত মহিষের উদর নির্গত মহিষাসুর-দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে রত। কিন্তু এর বিশেষত্ব হল এই মূর্তির নীচে চিহ্নিত রয়েছে একটি শিবা বা শৃগাল মূর্তি-যার জন্যই দেবী 'শিবাখ্যা' নামে পরিচিত।

এই দেবীর মাহাত্ম্য ও এখানকার রাজা মহেন্দ্রর গৌরব গাথা প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই গ্রামের এক কবি দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩১৯ সালে 'শিবাখ্যা কিঙ্কর' নামে

এক বিশালাকার কাব্য রচনা করেছিলেন। তাতে দেব মন্দির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"হেরিয়া মেঘের গায় রজত পর্বত প্রায়
শোভিতেছে সুবিশাল শিবাখ্যা মন্দির।" (২) (পৃঃ- ২৯২)

কিন্তু বাস্তবে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি কোন ক্রমেই রজতপর্বতের ন্যায় নয়। জানিনা সেই মন্দির নষ্ট হয়ে গেছে কিনা! তবে বর্তমানে যে মন্দির রয়েছে তা খুববেশী প্রাচীণও নয় এবং গঠন কৌশল খুবই সাধারণ একতলা দালান মন্দির। দেবী পশ্চিমমাস্য অর্থাৎ পশ্চিম মুখী বারান্দা সহ একতলা মন্দিরে অবস্থিত। মন্দির চৌহদ্দি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। শিবাখ্যা অসলে শাক্তদেবী তাই তাকে ঘিরে মন্দির প্রাঙ্গনে বেশ কয়েকটি শিব মন্দির বর্তমান। দেবী নিত্য পূজিতা হলেও বছরের বেশ কয়েক দিনে বিশেষ পূজাও হয়ে থাকে। দেবী সারাবছর এই মন্দিরে অবস্থিত হলেও, শাসন দেবী হিসাবে বেশ কয়েকবারই গ্রাম পরিক্রমা করে থাকেন। তার মধ্যে নবমীর দিন সন্ধ্যারাত্রে দেবী এখান হতে ব্রাহ্মণদের কোলে নাচতে নাচতে প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশের পরবর্তী পুরুষদের অন্যতম নীলমনি রায়ের বাড়ীর সন্নিকটে দক্ষিণদুয়ারী এক মন্দিরে যায় (কেন যায় সে বিষয়ে পরে বলা হবে)। সেখানে মহিষ বলি সহ পূজান্তে ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে অবস্থান করেন। দেবী অরও তিনবার গ্রাম পিরক্রমান্তে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে অবস্থান করেন। দেব সম্পত্তির দ্বারাই দেব সেবা চলে। এখনও ১১০ একর দেবত্তর সম্পত্তিতে সামাজিক বন সৃজন করা হয়েছে, অবশিষ্ট জমি দেবসেবার বিভিন্ন কাজে বৃত্তি হিসাবে বন্টিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় এখনও প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঢাক বাজে, তার জন্য ঢাকীকে জমি দেওয়া আছে। সেবা পরিচালনার জন্য কমিটি আছে।

দেবী সম্পর্কে প্রচলিত কিছু কিংবদন্তি ঃ দেবীর মাহাত্ম্য ও মহিমার বিষয়ে বহুবিধ জনশ্রুতি এখনও শোনা যায়, তার মধ্যে উল্লেখ্য ২/১টির কথা স্মরনীয়। যথা— (১) দেবী কোন এক সময় অপহৃতা হলে তিনি কিভাবে ফিরে এসেছিলেন সে বিষয়ে জনশ্রুতিতে জানা যায়— এই বংশের কোন রাজা খাজনা আদায়ে গিয়ে কোন মহল্লা থেকে শিবিকায় ফিরছিলেন। হঠাৎ বাহকেরা বিশ্রাম করতে থাকায় রাজা তখন একক ঐ শিবিকাতেই ছিলেন। তখন এক দুস্থ কিশোরী কণ্যা রাজার কাছে আশ্রয় চাইলে রাজা তাকে নিজরাজ্যে নিয়ে যেতে রাজী হন। তখন সেই কন্যা তৈরী হয়ে আসছি বলে চলে যায়। আর ফেরে না ফলে অপেক্ষমান রাজা কন্যাকে না পেয়ে ফিরে যান। সেই রাতেই রাজা স্বপ্ন দেখেন যে, মেয়েটি জানাচ্ছে যে সে ভাক্কীর শেওলাপুকুরে আছে রাজা যেন তাকে তুলিয়ে নিয়ে যায়। ফলে দেবীর নির্দেশেই রাজা শিবাখ্যাদেবীকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

(২) দ্বিতীয় কোন এক সময় চোরেরা দেবীকে চুরি করতে এলে দেবী বিশাল

ভারী হয়ে যায় ফলে চোরেরা দেবীকে তুলতেই পারে নাই তদুপরি দেবীর ইচ্ছায় চোরেরা সব কানা হয়ে অমরার গড়ের ১ম বাস স্টপে পড়ে থাকে এবং সকালে সবাই ধরা পড়ে। যেহেতু চোরেরা ঐ স্থানে কানা হয়ে পড়ে ছিল তাই সেই স্থানের নাম হয়ে যায় চোর কুলি।

(৩) অনুরূপ আর এক কিংবদন্তিতে জানা যায় যে, একবার ভাতকুণ্ডা গ্রামের রায়েরা দেবী শিবাখ্যাকে নিজ গ্রামে রেখে পূজা করার মানসে চুরি করতে আসে। কিন্তু তারা দেবীকে নিয়ে নিজেদের গ্রামের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলে দেবী প্রচণ্ড ভারী হতে থাকে। ফলে তাদের পক্ষে অর সহজভাবে দেবীকে বহন করা সম্ভব না হওয়ায় খুবই ধীরে ধীরে চলতে গিয়ে তারা ধরা পরে যায় অর অস্বাভাবিক ভার বশত দেবীকে তারা বর্তমান 'নবমীতলায়' নামিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ওরই মধ্যে তারা দেবীর ঐশী শক্তির পরিচয় পেয়ে ঐখানেই দেবীকে বিশেষ ভাবে পূজা দিয়ে থাকে। তাই অদ্যাবধি ঐ স্থানেই মহিষ বলি সহ নবমী রাত্রে মহাধূমধামে পূজা হয় এবং সেই জন্যই সেখানে একতলা দালান মন্দির ও নির্মিত হয়েছে।

দেবী মূর্তি প্রস্তর নির্মিত হলেও প্রতিবছর দেবীর অঙ্গরাগ করা হয়। বিশেষত্ব হল দেবীর গাত্র বরণ অনেকটা কমলারং এর কিন্তু অসুরের রংসবুজ ও সিংহের রং হলুদ হওয়া চাই।

গ্রামে অন্যান্য দেবদেবী ঃ দুগ্ধেশ্বর শিব— শক্তিরূপাদেবী শিবাখ্যার ভৈরব রূপে এই গ্রামেই দেবীর মন্দিরের কিছুটা উত্তর অংশে রয়েছেন দুগ্ধেশ্বর শিব। শিবাখ্যা কিঙ্কর কাব্যে উল্লেখ আছে—

এ পুরী তোমার রাজরাজেশ্বরী।
রাজা দুগ্ধেশ্বর ভৈরব প্রহরী।। (পৃঃ- ২৯৭)

এই দুগ্ধেশ্বর শিব পশ্চিমাস্য অর্থাৎ পশ্চিম মুখী এক শিখর দেউল রীতিতে তৈরী মন্দিরে অবস্থিত আছেন। মন্দির সামনে একটি বাঁধানো আটচালাও বর্তমান। শিব নিত্যপূজিত হলেও অন্যান্য বাৎসরিক শৈব্য উৎসবাদি সবই যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দুর্গামন্দির— চারিদিকে অন্যান্য মন্দির ঘেরা এক অপূর্ব নির্মান শৈলীর দুর্গা মন্দির গ্রামের মাঝ বরাবর অবস্থিত রয়েছে। মন্দিরটি রাঢ় বঙ্গের খরের চালের আদলে তৈরী। মূল চালের গায়ে কাটাবারান্দার চাল— সবই পাকা। দেখতে বেশ নয়নাভিরাম। এধরনের মন্দির বঙ্গে সচরাচর দেখা যায় না। বঙ্গের বাইরে কাশী বৃন্দাবন ও রাজস্থানে ও এর চল বেশী। তবে নিকটেই মানকরের কবিরাজদের প্রতিষ্ঠিত মা অনন্দময়ীর মন্দিরের মূল ছাদটি অনেকটা এই ধরনের।

এই দুর্গামন্দিরের পশ্চিমগায়ে একটি শিব মন্দির, তারও পশ্চিমে পূর্ব দুয়ারী

পঞ্চচূড়ার এক বিষ্ণুমন্দির— সামনে বেশ কিছু টেরাকোটার কাজ বর্তমান। মূল মন্দিরের দক্ষিণে উত্তর মুখী চারটি শিব মন্দির, তার সঙ্গে লাগাও পূর্ব দিকে পশ্চিম মুখী তিনটি শিবমন্দির। মোট কথা চারিদিকে বিভিন্ন দেব-দেউলের মাঝে বিস্তৃত উঠান সহ একত্রে অনেকগুলি মন্দিরের অয়তকার সমাবেশ এক উন্নত স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন তাতে সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু মন্দির— গ্রামের পশ্চিমে মণ্ডল পাড়ায় একটি দর্শনীয় জীর্ণ বিষ্ণুমন্দির বর্তমান। তার গঠন নৈপুণ্যের চমৎকারিত্ব শিল্প রসিক মনকে সহজেই বিমুগ্ধ করে। মন্দিরটি দ্বিতল বিষ্ণু মন্দির। ভিতরের দিকে উপরে ওঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির নীচে রয়েছে এক অদ্ভুত ছোট্ট দরজা দেওয়া প্রকোষ্ঠ-যা সচরাচর কোন মন্দিরে দেখা যায় না। মন্দিরে বিগ্রহ এখন নাই তবে মন্দির অভ্যন্তরের এক কুলঙ্গায় একটি পাথরের ভগ্ন নারায়ন মূর্তি ও অন্য এক কুলঙ্গায় নারায়ণের বাহন কাঠের গড়ুর পক্ষীর মূর্তি রয়েছে। পূর্বে এখানে দামোদর নামে রূপার শালগ্রাম। ছিল প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ হল তা চুরি হয়ে গেছে। সব থেকে লক্ষণীয় হল পঞ্চচূড়ার এই মন্দিরের সামনে রয়েছে এক অদ্ভুত সুন্দর পোড়ামাটির বা টেরাকোটার অপূর্ব শিল্প নিদর্শন যা গ্রাম বাংলার মন্দির স্থাপত্যের এক অনন্য উদাহরণ। জানিনা এ আর কতদিন শিল্পরসিকদের বিমোহিত করতে পারবে?

পঞ্চ-শৈবমন্দির— গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পূর্ব মুখী গায়ে গায়ে লাগাও পাঁচটি শিব মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রতিঠি মন্দিরেই শিব লিঙ্গ বর্তমান। তাদের নিত্য পূজাও হয়। মন্দিরগুলির দরজার উপরে টেরাকোটার কিছু কিছু কাজ রয়েছে। যেমন উত্তরের মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরে রয়েছে মহিষমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী মূর্তি যার সিংহটি ড্রাগনাকৃতি। তার পরের টিতে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের পোড়ামাটির মূর্তি, তৃতীয়টিতে রয়েছে শিব মন্দিরের প্রতিকৃতি এবং চতুর্থটিতে রামসীতার মূর্তি। প্রতিটি শিব মন্দিরে কাঠের বৃষ মূর্তি কেবল দক্ষিণেরটিতে রয়েছে পাথরের বৃষ মূর্তি।

সিদ্ধেশ্বরী কালী— লোকশ্রুতি অনুযায়ী এখানকার উল্লেখ্য রাজা মহেন্দ্রর গুরু শিবরাম স্বামী এই অমরার গড়ে দেহত্যাগ করলে তার সমাধির উপর এক কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই কালী মূর্তির পাশেই শিবরাম স্বামীর সিদ্ধাসন আছে। তাতে বসে নিবিঘ্নে জপধ্যান করতে পারলে সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত। কথিত আছে সেই অসনে বসে গ্রামের ছেলে কেনারাম চট্টোপাধ্যায় ও সাধক কবি কমলাকান্ত সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাই এই কালী সিদ্ধেশ্বরী কালী।

গ্রামের পশ্চিমে মাঠের মাঝে এই কালী মন্দির বেশ নির্জন পরিবেশে এখন ও বর্তমান। মন্দিরে মা কালীর মৃন্ময়ী মূর্তি রয়েছে যা সচরাচর বিসর্জন হয় না তবে রং

চটে গেলে নতুন করে মূর্তি আনা হয়। এখানে বিশেষ পূজা হিসাবে দুর্গাপূজার চারদিন ও কালীপূজার দিন বিশেষ ধূমধামে পূজা হয়ে থাকে। মন্দিরটি দক্ষিণদুয়ারী খড়ের চালের ধরনে তৈরী পাকা চাল— সামনে টিনের চালের বারান্দা আছে। মাঠের মধ্যে মায়ের অবস্থান হওয়ায় মাঠটিও সিদ্ধেশ্বরী মাঠ নামে খ্যাত। এখানে বিশেষ পূজা হিসাবে দুর্গাপূজার চারদিন ও কালী পূজার দিন বিশেষ ধূমধামে পূজা হয়ে থাকে। মন্দিরটি দক্ষিণ দুয়ারী খড়ের চালের ধরনে তৈরী পাকাচাল-সামনেটিনের চালের বারান্দা আছে। এখানে ঢেঁকি ও কুলোর শব্দের প্রবেশ নিষেধ। কার্ত্তিকমাসে এর পূজার ব্যাপারে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় এর উল্লেখ থাকে।

পথিককালী— গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পথের ধারে একটি কালী বাড়ি দেখা যায়। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যাতেই এর পূজা হয়ে থাকে তবে পথের ধারে এর অবস্থানের জন্য গ্রাম বাসী খুবই যৌক্তিক ভাবেই এই কালীর নামকরণ করেছেন পথিক কালী।

ধর্মরাজ— গ্রামে ধর্মরাজ তলায় ধর্মরাজের অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ড সহ গাজন উৎসব পালিত হয়।

মনসা— গ্রামের প্রাচীন লাইব্রেরী যাবার পথে রাস্তার পশ্চিমে বাগ্দী পাড়ায় একটি খড়ের ঘরে মা মনসার পূজা হয়। এখানে একটি সম্প্রতি নির্মিত ছাদ যুক্ত অটচালাও বর্তমান। মন্দিরের পূর্ব গায়ে মাটির ঘোড়া স্তূপিকৃত অবস্থায় পড়ে আছে যা মানসিক রূপে প্রদত্ত হয়েছে। একটি হাতীও রয়েছে আর রয়েছে কয়েকটি মনসার বারি— যা চম্পাইনগরী ও দখল গঞ্জ থেকে আনা হয়। গ্রামে আরও অনেক স্থানেই মনসার পূজা হয়ে থাকে। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে ধূমধাম সহ গ্রামে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মনসার পূজা এই গ্রামের লোক উৎসব। এতে মনসার গানও গাওয়া হয়ে থাকে।

গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য ঃ— একদা গ্রামটি যে রাজ ঐতিহ্যে ময় ছিল তার বহু প্রমাণ গ্রামের মধ্যেই ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, একটু অভিনিবেশ সহ লক্ষ করলেই তা নয়নগোচর হবে। সে প্রসঙ্গেই বলি— গ্রামের দক্ষিণ অংশে এখনও একটি মাঠ রয়েছে যার নাম হাতি শাল। অর্থাৎ সেখানে একদা রাজাদের হাতি বাঁধা থাকত। তা থেকেই ঐ স্থানের নাম হয় হাতশাল পরে হয়েছে হাতশালের পূল। বর্তমান বাসস্ট্যাণ্ডের পূর্বে এর অবস্থান।

গ্রামের দক্ষিণে আর একটি মাঠ রয়েছে যা মরাইতলীর মাঠ নামে পরিচিত আসলে ঐ মাঠেই একদা রাজাদের মালক্ষ্মীর ভাণ্ডার ধানের গোলা বা মরাই বাঁধা থাকত, তা থেকেই ঐ স্থানের নাম হয় মরাইতলীর মাঠ।

গ্রামের উত্তরদিকে বর্তমান সাঁওতাল পাড়ার দিকে গ্রামের লোক অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলতে চায় প্রাচীণ রাজবাড়ী ওখানেই ছিল। এখনও সেখানে প্রাচীন ইটের গাঁথনি

যত্রতত্র লক্ষ্য করা যায়। এই মাঝি পাড়ার গায়েই মাটি নিয়ে নিয়ে তৈরী হয়েছে এক পুকুর সদৃশ খালা জলাশয়, থাকে 'ধলার' বলা হয়। এই ধলারই হল রাজাদের ধনাগারের অপভ্রংশে ধলার। একদা এখান থেকে মাটি খোঁড়ার সময় পাওয়া গিয়েছিল সোনার প্রদীপ সহ বহু পুরাবস্তু। এই ধলারের কাছেই একদা ছিল রাজাদের আমোদ-প্রমোদ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য রঙ্গালয় ও নাচ ঘর। সেই নাচঘর বা রঙ্গালয়ের শেষ স্মৃতি চিহ্ন রূপে এখনও তাদের গাঁথনির কিছু ভগ্নাংশ দেখা যায়। সেদিনের সেই ঐতিহ্যময় 'রঙ্গালয়'-ই আজ অপভ্রংশে রঙ্গাল হয়ে প্রাচীন ইতিহাসের ফসিলে পরিণত হয়েছে।

এখন আসা যাক সতী ঘাটের কথায়। গ্রামের উত্তরে আদিবাসী পাড়ার সামান্যপূর্বে পাল পুকুরের গায়, এখন যেখানে ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠ হয়েছে একদা সেখানেই কোন ধর্মপ্রাণ প্রাচীনা নারী পতির চিতায় সজ্ঞানে সহমরণে গিয়ে সতী হয়েছিলেন। তাই সেইস্থান এখনও 'সতীঘাট' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে।

সেখান থেকে একটু উত্তর পশ্চিমে সরে গেলে চোখে পড়বে শাল বাগান ও সন্ন্যাসী বাগান। সেই শাল বাগান থেকে সাঁওতাল রমণীরা কাঁচা শালপাতা সংগ্রহ করে তা থেকে পেতে খাওয়ার জন্য শাল পাতা তৈরী করে বাজারে বিক্রয় করে। এবার আরও কিছু দক্ষিণ পশ্চিমে গেলে পরপর ২টি বাঁধান ঘাটের পুকুর যা নন্দীদের পুকুর নামে খ্যাত-তারই উত্তর পশ্চিমে এখন বিরাট কৃষিক্ষেত্র বা মাঠ চোখে পড়বে। কিন্তু অতীতে সেখানেই ছিল ঘনজঙ্গলে পরিপূর্ণ বিশাল বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা। যার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বর্গীরা সদল বলে এতদঅঞ্চলের ধ্বংস সাধনে উদ্যোগ নিয়েছিল। তাই ঐ ডাঙ্গা তখন বর্গীডাঙ্গা নামে খ্যাত হয়ে জনমনে ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল। তাদেরই হৃদয় হীন অত্যাচারে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। রীতিমত সমৃদ্ধ এই গ্রামটিও তখন বর্গীদের নিষ্ঠুর আক্রমণে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

এবার গ্রামটি সামগ্রিক ভাবে ঘুরে দেখলে সহজেই চোখে পড়বে যে, গ্রামটি বেশউচু এবং তার চার দিকেই রয়েছে অপেক্ষাকৃত খালা জায়গা— যা একদা রাজাদের তৈরী পরিখা হিসাবে ধরে নিতে কোন অসুবিধাই নাই তাই **Bengal District Gazetters (Burdwan)** এ যথার্থই বলা হয়েছে **The long lines of fortification which enclosed his walled town are still visible just where of a round earthwork rampart and ditch enclosing a square of about a mile in area.** (৩)

গ্রামটি প্রাচীন এবং আকারে বেশ বড় ও বটে। গ্রামের মাঝে একটি উচ্চবিদ্যালয় ও একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। গ্রামে একটি পাঠাগার ও বর্তমান। তাছাড়া নাগরিক সুযোগ সুবিধার মাধ্যম হিসাবে হাট বাজার পোষ্ট অফিস সহ ব্লক অফিস ও বর্তমান। গ্রামটি বড় তাই গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসত ক্ষেত্র হওয়ায় এখানে নানান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন ভাদুগান, টুসুগান সহ মনসার ভাসানও সেই সঙ্গে বহুবিধ সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কাণ্ড সোৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়।

আউশগ্রাম— গহন গভীর অরণ্যে ঘেরা অজয় দামোদরের মধ্যবর্তী বিস্তৃত বিশালক্ষেত্রই প্রাচীনগোপভূম নামে পরিচিত হলেও তার কেন্দ্রবিন্দুতেই অবস্থিত ছিল আউশ গ্রাম। সেদিক থেকে আউশ গ্রাম এলাকাই ছিল সে দিনের গোপভূমের প্রাণ ভোমরা। আজও তাই গোপভূম বলতে যে সীমানার কথা বলা হয়েছে তার মাঝের অংশই আউশ গ্রাম এলাকা, তাই আউশ গ্রামকে বাদ দিয়ে গোপভূম কল্পনাই করা যায় না। যদিও সেই রাজ্য সীমার এলাকা, বারে বারে পরিবর্তিত ও সংকুচিত হতে হতে বর্তমানে আউশ গ্রাম থানাকেন্দ্রিক সীমায় সীমিত হয়েছে, তবুও ঐতিহ্যবাহী গোপভূমের প্রাণকেন্দ্র এখনও আউশ গ্রাম।

আউশ গ্রাম যদিও 'গ্রাম' অভিধায় অভিহিত তবু ও এখনও সে এক বিস্তৃত এলাকার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত যার অধীনে রয়েছে— একদা গণ্ডগ্রাম থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা শহর গুসকরা, প্রাচীন ব্যবসা কেন্দ্র দিগনগর, বৈষ্ণবপাট বাড়ি সর ও অভিরামপুর, ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি কেন্দ্র অমরার গড় ও মানকর, মন্দির ময় মৌখিরা, পত্নক্ষেত্র পাণ্ডুরাজার ঢিবি— সব মিলিয়ে যে আউশ গ্রাম থানা, তার প্রাণকেন্দ্র এই আউশ গ্রাম। এর জে.এল. নং হল-১১১।

সমগ্র থানা এলাকা আউশ গ্রাম ব্লক নামে অভিহিত হলেও শাসনগত সুবিধার জন্য তা ২টি ব্লকে বিভক্ত যথা— আউশগ্রাম ১নং ও ২নং ব্লক। একনং আউশ গ্রাম ব্লকের সদর কার্যালয় গুসকরা, যার অধীনে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ রয়েছে ৮৭টি গ্রাম, মোট পরিমাণ ১৮৬ বর্গ কিঃমিঃ। ২ নং ব্লকের সদর দপ্তর অমরার গড় যার অধীনে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ ১৫৩ টি গ্রাম, মোট পরিমান ৩৫৪ বর্গ কিঃমিঃ। উভয় ব্লকের মোট পরিমাণ ৫৪০ বর্গ কিঃমিঃ। সেই বিস্তৃত এলাকার নিয়ন্ত্রণ কারী থানা অফিস কিন্তু আউশ গ্রামেই অবস্থিত। সে দিক থেকে আউশ গ্রাম হল সমগ্র এলাকার রিমোট কেন্দ্র বা চালিকাশক্তি। জনশ্রুতি এই আউশ গ্রামের বিস্তৃত এলাকার সবুজ শ্যামলিমায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রম তৈরী করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিশেষ কোন কারণে তা স্থানান্তরিত হয়ে বোলপুরের ভুবনডাঙ্গায় চলে যায়।

গ্রামনাম— একদিকে অরণ্যের আধিক্য, অন্যদিকে অনুর্বর গৈরিক মৃত্তিকার প্রাচুর্য ও সুষ্ঠ সেচ ব্যবস্থার অনিশ্চয়তার জন্য পূর্বে এই গ্রামে দীর্ঘ মেয়াদি আমন ধানের পরিবর্তে আশু বা আউশ ধানের চাষ বেশি হওয়ায়, গ্রাম নাম আউশ ধানের আধিক্য থেকেই আউশ গ্রাম হয়েছে। ২য় মতে জানাযায় গ্রামের সায়র নামের বড় জলাশয় থেকে নির্গত নালায় মাঠ ধরতে গিয়ে এক শিবলিঙ্গের প্রাপ্তি ঘটে— যা পরে 'আসকর' শিবনামে পরিচিত হয়। সেই শিবই উচ্চরণ বিকৃতিতে হয়ে যায় আসকর >

আউশ। পরে তার সঙ্গে গ্রাম শব্দ যুক্ত হয়ে গ্রাম নাম আউশ গ্রাম হয়েছে। ৩য় আর এক মতে জানা যায়— একদা বীর ভূমজেলার সুপুর-রাইপুর নিবাসী এক কায়স্থ বংশীয় সভ্রান্ত ব্যক্তি— আশুতোষ সিংহ বর্ধমান রাজপরিবারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই পথেই গ্রামথেকে বর্ধমানে যাতায়াত করতেন। তার ইচ্ছা হয়েছিল নিজনামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা। যাতায়াতের পথে এই গ্রামটিকেই তার পছন্দ হওয়ায় তিনি এই গ্রামের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন এবং গ্রাম নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই গ্রামকেই নিজনামে নামিত করতে চেয়েছিলেন ফলে তার সেই আশুতোষ নাম থেকেই গ্রাম নাম 'আউশ গ্রাম' হয়ে যায়। সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে ও এই তথ্যের আভাস মেলে। পরিশেষে নামকরণ প্রসঙ্গে জানাই ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন— যেখানে ঠিক মত বৃষ্টি হয় অর্থাৎ আবৃষগ্রাম আউশ গাঁ নাম হয়েছে। (৪)

গ্রামের প্রাচীনত্ব— গ্রামটি যদি আশুতোষ বাবুর নামেই নার্মিত হয়ে থাকে, তবে এই গ্রাম নাম কোন মতেই তিনশ বছরের প্রাচীণ হবে না। কারণ বর্ধমানের রাজ ইতিহাস ৩০০ বছরের প্রাচীন নয়। অন্যদিকে গ্রামে যে সকল পুরাকীর্তি লক্ষ করা যায়— যেমন গ্রামের মধ্যে কয়েকটি শিব মন্দির যার গায়ে অল্প বিস্তর টেরাকোটার কাজও দেখা যায়। তাছাড়াও রাধাকান্ত মন্দির, রাসমঞ্চ, চুরি হয়ে যাওয়া গোপালের মন্দির-ইত্যাদি সবেরই বয়ঃক্রম তিনশ বছরের অধিক নয়। কাজেই সেগুলি দেখে গ্রামের প্রাচীনত্ব অনুভব সম্ভব নয়। তবে গ্রামের মাঠ প্রান্তে পূজিত হচ্ছেন দেবী চণ্ডী- তার বয়স যে বেশ প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই। তার কথায় পরে আসছি।

এখন বলা যায় প্রচীন গোপভূমের উল্লেখ্য গ্রামগুলির মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে অন্যতম তাই-এই গ্রামও বেশ প্রাচীন তাধরে নেওয়া যেতে পারে তবে গ্রাম প্রচীন হলেও গ্রাম নাম নাও প্রচীন হতে পারে। কারণ গ্রাম নামের তৃতীয় সূত্র মেনে নিলে, অর্থাৎ আশুতোষ বাবুর নামে গ্রাম নাম নামিত হলে, তারও পূর্বে এই গ্রামের অন্যনাম নিশ্চয়ই ছিল তা মেনে নিতেই হয়।

প্রসঙ্গত বলি এই গ্রামের এক অংশ 'গোবিন্দ মাঠ' নামে পরিচিত। জনশ্রুতি, পূর্বে নদীয়ার ফুলিয়া নিবাসী এক জগদীশ গোস্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক দেশ ত্যাগী হয়ে তার ইষ্টদেব গোপালের মূর্তি সঙ্গে করে বৃন্দাবন যাত্রার পথে এই গ্রামের বর্তমান থানা সন্নিকটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ঠিক সেই সময়েই তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন সংসারী হবার জন্য।

তখন গোপাধিক্য গোপভূমের গোপাল মাঠের গোপ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে নিজেদের পাড়ায় নিয়ে গিয়ে স্থিতু করান। গোপালের সেবাপূজার ব্যবস্থাও করে দেন এবং নিজেরা তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে

রীতিমত সংসারী হয়ে তিনি সেখান থেকে উঠে এসে বর্তমান গোপাল মন্দির সংলগ্ন স্থানে বসতি শুরু করেন। কাজেই গোপাল মাঠের মত এই গ্রামেরও হয়ত অন্য কোন নামছিল। পরবর্তী কালে সেই প্রাচীণ গ্রাম নামের বদলে বর্তমান নাম সংযোজিত হয়েছে।

ইংরেজ আমলেও যে এই গ্রামের রাজকীয় অস্তিত্ব ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা জানি প্রায় ২০০ বছরের পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ রেখে ইংরাজরা যে সকলে বিষয়কে কেন্দ্র করে গ্রামে গঞ্জে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে ছিল তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে মাধ্যম তা হল নীলচাষ'' ইংরাজ আমলের কোন এক সময়ে এই গ্রামেও নীল কুঠি স্থাপিত হয়েছিল এবং এখানেও যে নীলচাষ পূর্ণ মাত্রায় দীর্ঘ দিন পরিচালিত হয়েছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নীল কুটির অবক্ষয়িত চিহ্নাংশেই।

তা হোক, তবুও বলা যায় সেই ইংরাজরাই এই গ্রামকে এতদ অঞ্চলের মধ্য মনি হিসাবেই বেছে নিয়েছিল। তাই ১৯১০ খ্রিঃ প্রকাশিত Bengal District Gazetteers Burdwan এ J C K Peterson সাহেব উল্লেখ করে বলেছেন যে এখানেই ইংরাজ আমলেই তৈরী হয়েছিল, এই এলাকার শাসনকেন্দ্র থানা। [৫]

গ্রামের দেবকীর্তি ও ঐতিহ্য— গ্রামের উল্লেখ্য দেব মন্দিরগুলির মধ্যে কয়েকটি শিব মন্দিরের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়াও গ্রামে রয়েছে রাধাকান্ত মন্দির— যার উল্লেখ্য উৎসব হল রাস উৎসব, দোল উৎসব ইত্যাদি। রাস উৎসব উদাযাপনের জন্য রাসমঞ্চ বর্তমান। আর ছিল গোপাল বিগ্রহ। গোপালের সেবক বংশ ছিল গোস্বামীরা। তাদের শরিকান রা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ায় গোপাল মূর্তি ১৬ই বৈশাখ থেকে বাইরে যেত এবং বিভিন্ন গ্রামপরিক্রমা করে কার্ত্তিক মাসে গ্রামে ফিরে আসত। ১৯৬৪/৬৫ খ্রিঃ গ্রাম পরিক্রমায় গিয়ে গোপীনাথ বাটী থেকে অন্যগ্রামে যাবার কালেই তা চুরি হয়ে যায়। তখন থেকে আর কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই দেবালয় শূণ্য হয়েই পড়ে আছে।

এবার আসি গ্রাম্যদেবী চণ্ডীর কথায়— যিনি অধিষ্ঠিত আছেন গ্রামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বসন্ত পুর যাবার পথে এক পুকুর পাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে। দেবী সেখানে নিত্যসেবিত। বৈশাখ মাসে বিশেষ পূজাও হয়। সবথেকে আকর্ষণীয় বিষয় হল শারদীয়া নবমীর দিনে গ্রামের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ থেকে ঘটা করে সেখানে পূজা নিয়ে যাওয়া হয়।

দেবী চণ্ডী নামে অভিহিত হলেও, আসলে উনি কোন বৌদ্ধ গন্ধী দেবী বলেই মনে হয়। দেবী পূজার এক বিশেষ রীতি থেকেই তাই অনুমেয়। রীতিটি হল গ্রামের ব্যানার্জীদের দুর্গামণ্ডপ থেকে দেবীর পূজা নিয়ে যাবার সময় বাড়ির ছেলেরা অশ্লীল

খিস্তি খেউর করতে করতে যেতে থাকে। এর অর্থ সাধারণ ভাবে দুর্বোধ্য হলেও এর মধ্যেই কোন তন্ত্রাচারী বৌদ্ধাচার নিহিত নাই তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তাছাড়া এক সময় এই এলাকায় বৌদ্ধধর্মের যে ব্যাপকতা ছিল তারই আভাস এই অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ধর্ম রাজের পূজাব দ্বারাই অনুভূত হয়। অধিকন্তু নিকটেই রয়েছে গৌতম বুড়ো (বুদ্ধর) স্থান এবং এড়ালে বুদ্ধেশ্বর শিব ইত্যাদির অবস্থান এখানে বৌদ্ধ প্রভাবের ইঙ্গিতবহ।

গ্রামের এ পাড়া ও পাড়া মিলিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েক জায়গায় মনসা পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে মেটে পাড়ায় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা বিশেষ সমারোহে পূজিত হয়। ওখানে পূজা ওরা নিজেরাই করে, ব্রাহ্মণের অনুপ্রবেশ এখনও ঘটে নাই। পূজকরা দেয়াশী নামে খ্যাত। বর্তমান পূজক হলেন শ্রীমন্তদেয়াশী। অনেক রোগের প্রতিবোধক ওষুধ ওরাই দিয়ে থাকে। তাছাড়া সময় কালে গ্রামে কালী, লক্ষ্মী, পঞ্চানন, সরস্বতী ইত্যাদি বহু বিধ দেব-দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

গ্রামের মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি হিন্দু ধর্মের সকল ধর্মীয় প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হলেও ইদানিং কালে গ্রামে পরম পুরুষ যুগবতার শ্রী রামকৃষ্ণের ভাব-রসিকরাও যে রয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রাম মধ্যে রাস মঞ্চের সন্নিকটে রামকৃষ্ণের অবস্থান মূর্তির সংস্থাপনায।

গ্রামীন কৃষ্টি ও ঐতিহ্য— ঐতিহ্যবাহী এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম অতীতকাল থেকেই ধর্মীয় কৃষ্টি, শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিশেষ উন্নত। সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের ‘বর্ধমানের ইতিহাস’ গ্রন্থে জানা যায় এই গ্রামের প্রতিপত্তি সম্পন্ন পরিবার ছিল গোস্বামী পরিবার। পদ্মাপাড়ে তাদের জমিদারীও ছিল। তাদের বংশের রামবিষ্ণু বিদ্যালংকার ছিলেন সাধক কমলা কান্তের দীক্ষা গুরু। পিটারসন সাহেবের বর্ধমান গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়— গ্রামের অতীতে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য জেলাবোর্ডের পরিচালনায় ছিল দাতব্য চিকিৎসালয়, যা বর্তমানে গ্রামীণ হাঁসপাতালে উন্নীত হয়েছে। পূর্বে শিক্ষার প্রসারের জন্য এখানে ছিল M. E. School যা বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য বেশ কয়েকটি সংস্কৃত টোল ছিল, বর্তমানে তা প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। এই সে দিন পর্যন্ত শরৎ রঞ্জন স্মৃতি তীর্থ, বৈদ্যনাথ চতুষ্পাঠীর অবস্থান ছিল। বর্তমানে তারই রেশ ধরে ধূর্জ্জটি কুমার গোস্বামী স্মৃতি কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ ও কৃত্যবিদ্যা তীর্থ পরিচালিত শরৎস্মৃতি চতুষ্পাঠী তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নিষ্প্রভ। আধুনিক শিক্ষায় হাতে খড়ি দেওয়ার জন্যই গ্রামে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর রয়েছে পোষ্ট অফিস, গ্রামীন পাঠাগার, টেলিফোন কেন্দ্র, মাদার ডেয়ারী প্রকল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

গ্রামের সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগের উন্নতি ঘটেছে। লোকসংস্কৃতির চলমান প্রবাহরূপে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে কাশীপুরের রাজকন্যা ভাদুরাণীর স্মৃতিতর্পন রূপে ভাদ্রের ভাদুগান। ব্রতানুষ্ঠান রূপে চলে আসছে পৌষের তুসু তসলা। লৌকিক দেবী মনসার ভাষানগান, ধর্মও শিবের গাজনের বিভিন্ন ক্রিয়া কাণ্ড। এছাড়াও গ্রামীন কৃষ্টির চিরায়ত প্রকাশ হিসাবে মাঝে মধ্যেই উপস্থাপিত হয় যাত্রা থিয়েটার সহ নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আউল বাউল ভাঁজো ও আগমনির অনুরনম।

আড়া— দুর্গাপুরের নিকটবর্তী কাঁকসা থানার অধীন ৯১ জে.এল. ভুক্ত 'আড়া গ্রামটি ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কারণ অনেকের মতে এই গ্রামটিই 'রাঢ়াপুরী' অর্থাৎ রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী হিসাবে বিবেচিত। দুর্গাপুর-শিবপুর রাস্তার মুচিপাড়া থেকে মাত্র ৬ কিঃমিঃ উত্তরে এর অবস্থান। অন্যদিকে "জয়দেব কেন্দুলী হতে প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণস্থিত আড়া গ্রামই প্রাচীন রাঢ়াপুরীর স্মৃতি বহন করছে।" [৬] এই মন্দির অভ্যন্তরের সংস্কারক শ্রদ্ধেয় সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় বলেন শিব লিঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ গায়ে দু'টি অমৃত কূপ রয়েছে— পূজার সময় বা শিবের মাথায় জল ঢালার সময় সমস্ত জলই ধীরে ধীরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তা নেমে যায়। ভিতরে তেমন কোন গহ্বর বা বৃহৎ কোন কূপ নাই। মন্দিরটি বারে বারে সংস্কৃত হওয়ায় বহিরঙ্গের সাবেক আকৃতির বহু পরিবর্তন যে ঘটেছে মন্দিরটি দেখলেই তা সহজেই বোঝা যায়।

এখন এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠাতা কে বা কারা এবং গ্রাম নামই বা কেন আড়া তা নিয়েও জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে। সে প্রসঙ্গেই আলোক পাত করা যাক। অনেক গবেষকের মতে এই অঞ্চলটি একদা রাঢ়দেশ নামেই পরিচিত ছিল এবং সেই রাঢ় দেশের এতদ অঞ্চল 'রাঢ়াপুরী' নামে অভিহিত হত। প্রমাণ হিসাবে কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম' নাটকের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে বলা যায় সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে—" গৌড়ং রাষ্ট্রমনুওমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢাপুরী"— [৭] অর্থাৎ সুন্দর নিরুপমা গৌড় দেশের রাঢাপুরী নগরী)।

আবার মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর গোষের তাম্র লিপিতে "রাঢ়াধিপ" এর উল্লেখ আছে। রাঢাধিপ বলতে রাঢ়ের অধিপতি কেই বোঝায়। সেখানে প্রখ্যাত গবেষক ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ প্রপিতামহকে এই রাঢ়াধিপ বা রাঢাধিপতি বলে স্থির করেছেন। 'দুর্গাপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা গবেষক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনিও ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতকেই সমর্থন করেছেন। আর ঐ নাটক এবং তাম্রলিপি দুইই ঐতিহাসিকদের মতে একাদশ শতকেই লিখিত হয়েছিল। তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, ঐ সময়েই এই অঞ্চল রাঢ় নামে পরিচিত ছিল এবং তার অধিপতি ছিলেন ঈশ্বর ঘোষের চতুর্থ পূর্ব পুরুষ 'রাঢাধিপ'।

তার সময়কাল তা হলে অরও একশ বছর পিছিয়ে যাবার কথা কারণ ২৫ বছর এক পুরুষের সময় কাল হলে (২৫×৪=১০০) চার পুরুষের জন্য একশ বছরের তফাত হবে। সেদিক থেকে ঈশ্বর ঘোষের সময় একদশ শতক হলে 'রাঢ়ধিপ' তার চতুর্থ পূর্ব পুরুষ, তার সময় আরও একশ বছর পিছিয়ে গিয়ে দশম শতক হবে। সেই নিরিখে বিচার করলে খ্রীষ্টীয় দশম শতকেও এই অঞ্চল রাঢা নামেই পরিচিত ছিল এবং তার অধিপতি ছিলেন রাঢ়াধিপ। আরা রাঢ়াধিপের এলাকাই রাঢাপুরী। ডঃ হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এখানের চারিদিকেব ধ্বংসস্তূপকে কোন প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলেই অনুমান করেন। (৮)

সেই নিরিখে বলা যায় এটি ঈশ্বর ঘোষের প্রপিতামহ রাঢাধিপের রাজধানী শহর ছিল। এবং এখানেই রাঢাধিপ রাঢের অধিপতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তার আরাধ্য দেবতা রাঢ়েশ্বর নামে শিবও তার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পববর্তীকালে এইস্থান রাঢ়া থেকে অপভ্রংশিত হতে হতে রাঢা · আঢ়া আডঢ়া আড়া নামে নামিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর বক্তব্য— "রাঢ়েব উচ্চারণের' স্থানে 'অ' প্রচলিত আছে তাই 'বাঢ়েশ্বর' হযেছেন 'আঢ়েশ্বর' এবং রাঢ়াপুরী 'আড়া' তে পরিণত হযেছে।' (৯)

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অন্যমতয়ে নাই তা নয়। কেউ কেউ বলেন এটি সেন রাজাদের আমলে সৃষ্ট কিন্তু তার পক্ষে কোন প্রমাণ স্পষ্ট নয়। বরং এটিকে পাল যুগেব পুরাকীর্তি হিসাবে ধরাই শ্রেয়। 'বর্ধিষ্ণু বর্ধমান' গ্রন্থে ডঃ হংসনারায়ন ভট্টাচার্য বলেছেন যে "বাঢেব রাজা শিবভক্ত মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতকে ধ্বংস লীলা থেকে নিবৃত্তির জন্য রাঢ়েশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। মতান্তবে গোপভূমের রাজা ভল্লুপদ ঘোষ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।" (১০) কিন্তু ঐ দুটি বক্তব্যই ধোপে টেকেনা। কারণ প্রথমত তিনি বর্গিদের ভয়ে কোন রাজা ঐ মন্দির তৈরী করেছিলেন তা বলেন নাই, আর বর্গী হাঙ্গামা তো বঙ্গে ১৭৪২-১৭৫১ খ্রীঃ মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। ফলে তা আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগের কথা কিন্তু মন্দিরের গঠন কাল অনেক বেশী প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যদিকে ভল্লুপদর রাজত্ব কাল প্রসঙ্গে সদগোপ কুলতিলক ডঃ অতুল সুর যা বলতে চেয়েছেন তাহল— "রাঘব সিংহ ৮৪৮ বঙ্গাব্দে (১৪৪২ খ্রীঃ) মানকরের নিকট এক বিস্তীর্ণ বনাকীর্ণ স্থানে এসে বসবাস করেন।" (১১) অর্থাৎ ডঃ সুরের মত অনুসারে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে রাঘব সিংহের রাজত্ব কাল নির্নিত হয়। (১২) এই রাঘব সিংহই ভল্লুবাদ রাঘব সিংহ। আর সেই ভল্লুপদই যদি এই মন্দির নির্মান করে থাকেন তবে তার বয়স কাল হবে সাড়ে পাঁচশ বছর। কিন্তু এ মন্দির দেখলেই বোঝা যাবে যে এটি অরও বেশী প্রাচীন। সে দিক থেকে ডঃ ভট্টাচার্যের দু'টি মতই মেনে নেওয়া যায় না।

এখন এই গ্রাম যে প্রাচীন রাঢ়াপুরী ছিল তা এই রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির ও তাকে ঘিরে বিভিন্ন পুকুর হতে পাওয়া ও আশপাশের বহু ঐতিহাসিক স্মারক চিহ্নই তার প্রমাণ। সে দিক থেকে স্থানীয় প্রখ্যাত গবেষক প্রয়াত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন— "পশ্চিমবঙ্গে রাঢা শব্দের সমোচ্চারিত আর কোন গ্রাম নাই, সম্ভবতঃ এই আঢ়া শব্দটি রাঢা শব্দেরই অপভ্রংশ। তাছাড়া স্থানীয় পুরাকীর্তি ও কিংবদন্তী গুলি অনুশীলন কবলে এই সত্য আর অস্বীকার করার উপায় থাকে না।" (১২) তাই বলা যায় গ্রামটি প্রাচীন রাঢাপুরী।

এবার বেশ কিছু দিন ধরে এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনাদির কথায় আসা যাক। রাঢ়েশ্বর শিব মন্দিরকে কেন্দ্র কের রয়েছে বেশ কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য পুকুব। তার মধ্যে মন্দিরেব সামান্য উত্তরে রয়েছে কালো দিঘি। যার জল খুবই কালো— তাই কালো দিঘি নাম। কিন্তু এই পুকুরে পদ্ম যা ফোটে তা সবই লাল পদ্ম। এর গর্ভ থেকে একদা বহু পুরাকীর্তিও উদ্ধার হয়েছে। লোক বিশ্বাস, এখানে স্নান করলে অবশ অঙ্গের সুস্থতা ফিরে আসে। তাই এখানে স্নান করার বিশেষ চল আছে। এবার এই মন্দিবের সামান্য পশ্চিম দক্ষিণে নব সৃষ্টি এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পশ্চিমে রয়েছে রওনা বা রমনা পুকুর। রমনা শব্দটি রমনীয় পুষ্করিনীর অপভ্রংশ কিংবা বাবা রাঢ়েশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে এখান থেকে খাদ্য পানীয় গ্রহণ পূর্বক সৈনিকদের রওনা হওয়ার সংকেতকেই নির্দেশ করে থাকে। পূর্বে মহিলারাই এখানে স্নান করত, এখন বাবার স্নান জলও এখান থেকেই আনা হয়। এই পুকুর থেকেও পূর্বে বেশ কিছু প্রত্ন দ্রব্য উদ্ধার হয়েছিল। এবার এই গ্রামের সব থেকে প্রত্ন সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী পুকুরের কথায় আসি। পুকুরটি হল পোড়েল পুকুর।

বর্তমান গ্রাম ও মন্দিরের প্রায় মাঝামাঠি উচু পাড় যুক্ত প্রাচীন পুকুর এই পোড়েল পুকুর। প্রথমে এর ঐতিহ্যের কথাই বলে নিই। লোক শ্রুতি, পূর্বে বাড়িতে কোন যাগ যজ্ঞ, কাজকর্ম হলে গৃহস্বামী আগের দিন সন্ধ্যায় পুকুর ঘাটে গিয়ে পান সুপারী সহ তার প্রয়োজনীয় বাসনপত্র পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে এলে পরের দিন সকালে তা সবই পাওয়া যেত এই পুকুর থেকেই। কিন্তু কোন লোভী ব্যক্তি লোভলালসার বসবর্তী হয়ে সেই বাসন পত্রের কিছু ফেরত না দেওয়ায় সেই প্রথা তখন থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। সে দিক থেকে এটি এতদঞ্চলের এক ঐতিহ্য সম্পন্ন পুকুর তাতে সন্দেহ নাই। এবার এর গর্ভ থেকে বিভিন্ন সময়ে যে সকল প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের বিষয়ে আসা যাক।

পোড়েল পুকুরের দক্ষিণে রয়েছে আকুলেশ্বরী তলা। একদা সেই দেবীর থানে পোড়েল পুকুর থেকে পাওয়া প্রচুর ভগ্ন পুরাবস্তু স্তূপীকৃত করে রাখা ছিল আজ থেকে ৪১ বছর আগে ১৯৬২ খ্রীঃ স্থানীয় গবেষক প্রবোধ কুমার চট্টোপাধ্যায় যখন এখানে

ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রথম এসে ছিলেন, তখন তিনি সেই সকল ভগ্ন পুরাকীর্তিগুলি দেখে গিয়েছিলেন। তারই দেওয়া বিবরণ থেকে এখানে কিছু কিছু উল্লেখ করা হল। উল্লেখিত স্থানটি সাধক বিরূপাক্ষ গোস্বামীর সিদ্ধাসন নামেও পরিচিত। লোক বিশ্বাস ওখানে তার পঞ্চমুণ্ডির আসন বিদ্য মান। তবে তিনি ক্ষেত্র সমীক্ষায় এসে যে সকল পুরাবস্তু দেখে গিয়েছিলেন আজ তার কোন চিহ্নই সেখানে বর্তমান নাই-সবই কে বা কারা কোন উদ্দেশ্যে কোথায় নিয়ে গেছে কেতার হিসাব রাখে?

তিনি যে সকল পুরাবস্তু এখানে দেখে গিয়েছিলেন তার মধ্যে উল্লেখ্য হল এক দ্বিভুজা নারী মূর্তি, যার দুপাশে ২টি কদলীবৃক্ষ খোদিত ছিল। মূর্তিটির সম্মুখ ভাগ ভগ্ন হলেও তার পদ মূলে একটি হস্তীমূর্তি খোদিত ছিল। আর একটি মূর্তি ছিল সপ্ত ফনা বিশিষ্ট নাগছত্র ধারী লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তির। আরও ছিল একটি বড় মাপের পাথরের পদ্ম বেদীকা— যা কোন বিগ্রহের পাদপীঠেরই অংশ, এবং ছিল একটি উচ্চ দ্বিভুজা পদ্ম হস্তা নারী মূর্তি— সম্ভবত এটি বৌদ্ধ দেবী তারা মূর্তি। এছাড়াও স্থানটিতে ছিল আরও বহু ভগ্ন মূর্তির বিপুল সমাবেশ।

ঐগুলি ছাড়াও ঐ পোড়েল পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছিল একটি নটরাজ মূর্তি— যা বর্তমানে পার্শ্ববর্তী বামুনাড়া গ্রামে রক্ষিত রয়েছে এবং এখান থেকে পাওয়া বহু ভগ্ন মূর্তি এখনও নিকটের পাষানী মায়ের তলায় রয়েছে। ঐ পুকুর থেকেই পরবর্তী কালে দ্বিভুজা এক নারী মূর্তি— যা গর্দভ পৃষ্ঠে আসীন এবং বক্ষ লগ্নদুই হস্তের ১টিতে উর্ধ্ব মুখী সম্মার্জনী ধারন করে আছেন। যাকে শীতলা মূর্তি হিসাবেই ধরা হয়। এটি বর্তমানে গ্রামস্থ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আসীন। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত মহলের ধারনা ঐ সকল মূর্তি গুলিই পাল যুগের স্থাপত্যকলার নিদর্শন।

এখন ঐ পোড়েল পুকুর ছাড়াও গ্রামের অন্যান্য স্থান থেকেও মাটি কাটার কালে বেশ কিছু ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গেছে যেমন— আড়া গ্রামের ধর্মরাজ স্থানে রয়েছে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ মূর্তির এক চাল চিত্র। এই শিলাখণ্ডের মাঝে রয়েছে এক ক্রম হ্রাসমান মুকুট সহ বুদ্ধ মুণ্ড যার গলা থেকে নীচের অংশ ভগ্ন। এটি কালো ব্যাসল্ট পাথরের নির্মিত পাল আমলের প্রথম দিকের মূর্তি-শিল্প চাতুর্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

তাছাড়াও এই গ্রামেই প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে একটি স্থান খননের ফলে সেখানে পাওয়া গিয়েছিল এক বিশালাকৃতির লিন্টন সাইজের প্রস্তর খণ্ড যার দুপাশে দুটি জটাজুট সমাযুক্তাং শিবের আবক্ষ মূর্তি যার মাঝের অংশে খোদিত রয়েছে ১১ খানি মূর্তি চিত্র। এ গুলি হর-পার্বতীর বিভিন্ন লীলামূর্তি। এছাড়াও গ্রামের পূর্বদিকের মাঠে জমি সমতলের উদ্দেশ্যে ড্রেজার চালাবার সময় পাওয়া যায় এক অবক্ষ মূর্তির খণ্ডাংশ যার মাথার মুকুটের শীর্ষভাগ সহ চালচিত্রের অলংকরণগুলি অক্ষত ছিল। এটি দীর্ঘ দিন গ্রামের বন বিভাগের অফিসের সামনে রক্ষিত থাকলেও বর্তমানে তা

অন্তর্হিত হয়েছে। এটিও কালো ব্যাসল্ট পাথরে নির্মিত পাল অমলেরই শিল্প রীতির নিদর্শন। এই ভাবেই গ্রামের যত্রতত্রেই পাওয়া গেছে ঐতিহ্য ময় বহু পুরাকীর্তির নিদর্শন। আমিও ঐ আড়া গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষায় গিয়ে তার বহু নিদর্শন চাক্ষুষ করেছি তার মধ্যে উল্লেখ্য, বর্তমান রাঢ়েশ্বরের পূজক সুধীর চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে ঐ গ্রাম থেকেই পাওয়া একটি পাথরের আসন চৌকি দেখে এসেছি, যার গায়ে সুন্দর লতাপাতার শিল্প শৈলী দর্শনীয়।

এতক্ষণ ধরে এই গ্রামে পাওয়া বিভিন্ন মূর্তি গুলির কথা বিস্তৃত ভাবে বলা উদদেশ্যই হল যে, ওগুলি সবই পাল যুগীয় মূর্তি এবং এ গ্রামে তা ব্যাপক ভাবে পাওয়ার অর্থই হল গ্রাম একদা পাল যুগেই সমৃদ্ধির চবমতম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। সেই নিরিখে ঈশ্বর ঘোষের তাম্র শাসনে যে রাঢ়াধিপের উল্লেখ রয়েছে তার সময় কাল তো ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টীয় দশম শতক এবং তা পরিপূর্ণভাবেই পাল যুগের সীমাতেই পড়ে। কাজেই তখনকার দিনে এই আড়াই রাঢ়াপুরী রূপে রাঢ়ের অধিপতি রাঢাধিপের রাজধানী ছিল তা ধরে নেওয়াই সঙ্গত। কারণ এত বিস্তৃত পুরাকীর্তির নিদর্শন যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে সেটি কোন ভগ্ন রাজধানী হওয়াই সম্ভব।

ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণে জানা যায় চন্দেলরাজ ধঙ্গ কর্তৃক রাঢ়াধিপ বৃদ্ধ বয়সে অতির্কিত আক্রমনে পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন। সেই সময় ধঙ্গের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পরাজিত এই রাঢ়াধিপের রাজধানীর ধ্বংস সাধনটাই স্বাভাবিক। তাই এত ব্যাপক ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বুকে নিয়ে পড়ে থাকা রাঢ়াপুরীই যে বর্তমান আড়া তাসহজেই অনুমেয়। আর গ্রাম ময় ছড়িয়ে থাকা আবিষ্কৃত প্রত্ন নিদর্শন গুলিই ধ্বংস হওয়া রাজধানীর অতীত গৌরবের স্মারক চিহ্ন!

এখন গ্রাম পরিক্রমায় গিয়ে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তের একটি জায়গা 'গড়দুয়ার' ও পূর্ব দিকের এক জায়গা 'বাজীগড়' নামে অভিহিত হয়ে আসছে তা দেখা গেল, যদিও সেই দুই স্থানে আজ হাজার বছর পরে গিয়ে গড়ের কোন চিহ্নই দর্শিত হল না। তবুও ঐ গড়উল্লেখিত নামের মধ্যেই চারি দিকে পরিখায় পরিবেষ্ঠিত সুদৃঢ় গড় বিশিষ্ট রাঢ়ের রাজধানী রাঢ়পুরীর কথাই মনে করিয়ে দেয়।

পরিশেষে রাঢ়েশ্বর শিব মন্দিরের কথায় আবার ফিরে আসি। এটির নির্মাতা যেই হোক না কেন— এটি বঙ্গের মুষ্টিমেয় কতিপয় প্রস্তর নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য মন্দির তাতে সন্দেহ নাই। এই মন্দির অভ্যন্তরে পূজিত রাঢ়েশ্বর শিব বিগ্রহের সেবাপূজার জন্য পরবর্তী কালে বর্ধমানের দানবীর রাজা উদয় চাঁদ মহাতব কর্তৃক ৯৪০ বিঘা জমি প্রদত্ত হয়েছিল। যদিও বর্তমানে তা তলানীতে ঠেকেছে তবুও বর্ধমানের রাজার সেই মহতী দানের স্বীকৃতি স্বরূপ এখনও বর্ষসেরা শৈব উৎসব শিবগাজনের সংকল্প করা হয়— " কৈশল্যা গোত্র শ্রী উদয় চাঁদ মহাতব দেব শর্মনে

হোম অহং করিস্যে করি স্যামি" মন্ত্রে। হোমের পর ১টি ফোঁটা উক্ত রাজার উদ্দেশ্যে মন্দির দেওয়ালে এখনও প্রদত্ত হয়।

—ঃ আসানসোল ঃ—

বর্ধমান জেলাব পশ্চিমাংশে আসালসোল এখন এক মহকুমা শহর। কিন্তু মহকুমা শহর হলে কি হয়— এখানকাব কয়লা শিল্প, ইস্পাত শিল্প এবং রেল সম্প্রসারণ জানিত তাব কর্মীদের আবাসন সংস্থান এবং অন্যবিধ বহু শিল্প কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসাব ফলেই, এই শহর বর্তমানে এমন এক অতিকায় শহরে পরিণত হয়েছে যা রাজ্যের রাজধানী কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী শহর হাওড়া-র পরেই বিশালতাব ক্ষেত্রে আপন স্থান দৃঢ় করে নিয়েছে। কিন্তু অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে শহর হওয়ার আগে এটি নেহাতই এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামটির নামও ছিল আসালসোল কিন্তু কেন?

তার উত্তরে বলা যায় একদা খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের সময়কালেই এখানে আসন ও শাল বৃক্ষের পরিব্যাপ্তি ছিল। তাথেকেই এটি 'আসন-শাল' নাম পায় পরে তা উচ্চারণের সহজ সারল্যেব প্রবণতায় হয়ে যায় আসানসোল। অন্য মতে বলা হয়েছে এখানে আসন গাছ তো ছিলই আর ছিল অস্ট্রিক ভাষায় সোল অর্থে জলাভূমি বা নিম্নভূমি, যাতে প্রচুর পরিমানে অসনবৃক্ষ জন্মাত। তাই ঐ স্থান আসানসোল নামে পরিচিত হয়। কিন্তু অবস্থার এমনই পরিবর্তন যে, সেখানে এখন আর আসন গাছের কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

প্রাবন্ধিক নিশীথ কুমার ঘোষ বলেন পূর্বে এই এলাকার কোন নামকরণই ছিল না। এই অঞ্চলটি তখন উত্তররাধাভূমি নামে পরিচিত ছিল। পরে রাজত্বকারী রাজাদের পারস্পরিক ঝগড়া ও একে আরেকের রাজসিংহাসন কেড়ে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের নামকরণ হয় 'গোপভূম'। (১৩) যাক সেকথা, শুরুর দিকে অসনজঙ্গলে ঘেরা আসানসোল যখন ধীরে ধীরে নবরূপ পরিগ্রহ করতে চলছে, উন্নতির সেই উষালগ্নে যে দুজন বহিরাগত ব্যক্তির বিশেষ অবদান ছিল তাদের একজন বর্ধমানের ভাতাড় থানার এরুয়ার থেকে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ যশ আর অন্যজন কড়ি দাঁ,পার রায় হয়েছিলেন। তাদের প্রচেষ্টাতেই এই আসানসোল উন্নতির সোপান গুলি অতিক্রম করতে করতে নবরূপ পরিগ্রহের দিকে এগিয়ে যায়।

সেযুগে শেরশাহের বিখ্যাত রাজপথ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মিত হওয়ার ফলে এই এলাকা ধীরে ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। পরে রেল পথেরও বিস্তার হয় এবং কয়লা ও লৌহ ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণ হতে থাকায় এই আসানসোল ধীরে ধীরে গ্রামীণ পরিকাঠামো ঝেড়ে ফেলে শহরের মোহময় আবেষ্টনে আবিষ্ট হতে

থাকে। এর উন্নতির সোপানগুলি হল শুরুতে এটি গ্রাম থেকে ইউনিয়ন বোর্ডে উন্নয়ন তা থেকে পুরসভা (১৮৯৬ খ্রিঃ)। সেখান থেকে মহকুমার (১৯০৬ খ্রিঃ) পরিণত হয়। সর্বোপরি এর মুখ্যপবিচয় এখন এটি বঙ্গের অগ্রগণ্য শিল্পাঞ্চল। কারণ এখানকার কয়লা খনিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নানাধরনের শিল্পকাবখানা এবং বিশাল আয়তন নিয়ে ঘটেছে তার বিস্তৃতি- তাই নিকটবর্তী বহু এলাকাই এই শিল্পাঞ্চলের আওতাভুক্ত হয়েছে।

সেই বিস্তৃত এলাকায় গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল শিল্পকারখানা। তাদের ২/৪ টির কথা এখানে উল্লেখ করা যাক। কয়লাকেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চলের শুরুই যখন কয়লা দিয়ে তখন বলি ১৮৩৪ খ্রিঃ ভারতের প্রথম কযলাখনি কারএগুটেগোর দিয়েই শুরু হল কয়লা উত্তোলন শিল্প।

তারপর ১৯১৮ খ্রিঃ তৈরী হল এশিয়ার সর্ববৃহত ইস্পাত কারখানা ইন্ডিয়ান আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানী বার্ণপুরে, ঐখানেই 'বার্ণস্ট্যান্ডার্ড' নামে তৈরী হল রেলওয়াগন নির্মানের বিরাট কারখানা। গড়ে উঠলো সাইকেল তৈরীর কারখানা সাইকেল করর্পোরেশন, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন, নীলকারখান র‍্যাকিট্ এন্ড কোলমেন, চিত্তরঞ্জনে বিশ্ববিখ্যাত রেল ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা। তৈরী হল আসানসোলের অদূরে রূপনাবায়নপুরে ভারতের প্রথম উচ্চমানের টেলিফোন কেবলস তৈরীর কারখানা 'হিন্দুস্থান কেবলস'। পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর উন্নতমানের কাঁচ কারখানা 'হিন্দুস্থান পিলকিনটন'। রাণীগঞ্জে তৈরী হল 'বেঙ্গল পেপার মিল', জে. কে. নগরে নির্মিত হল অ্যালুমিনিয়াম কারখানা। এইভাবেই আসানসোল শিল্পাঞ্চলকে ঘিরেই যেন দুরন্ত গতিতে শিল্প বিপ্লবের বিকাশ ঘটল। ফলে আসানসোল এখন রীতি মত সমৃদ্ধশালী শিল্পাঞ্চল। তাই দেশ-দেশান্তর থেকে মানুষের ভিড় জমেছে এখানে ফলে এটি এখন এক কসমোপলিট্যান সিটিতে পরিণত হয়েছে।

তবুও বলা যায় একাদিক্রমে প্রায় ২৩০ বছর ধরে এখানের কয়লা খনিগুলি থেকে কোটি কোটি টন কয়লা উঠে আসছে, যার দ্বারা শুধু এখানেই নয়, সমগ্র দেশের শিল্পোন্নতির বিকাশ ঘটাতে তারা প্রভূত সাহায্য করেছে। কিন্তু ঈশান কোনে পুঞ্জিভূত মেঘ যেমন বিপদের সংকেত বহন করে, এখানেও তেমনি এক অশনি সংকেত ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে। সেটি হল কয়লা তোলার পর খালি হয়ে যাওয়া খনি গর্ভ- স্বার্থান্বেষী খনি মালিকদের অতুগ্রহ অর্থলালসায় সেগুলির যথাযথ বালি দ্বারা ভরাট হয় না। ফলে খনি গর্ভ খালিই থেকে যায়। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে এই শিল্পাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে ধ্বসের ধ্বংসলীলা। অচিরাৎ এর সুষ্ঠু সমাধান না হলে বঙ্গের প্রখ্যাত এই শিল্প ক্ষেত্রটি শ্মশানে পরিণত হতে বিশেষ সময় লাগবে না।

এখন এই শহরের পুরাকীর্তি ও কৃষ্টির কথায় আসা যাক। বিশাল এলাকা নিয়ে

এই শিল্পনগরী গড়ে ওঠায় এর বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে আছে নানান পুরাকীর্তি। তাদের সকলের কথা যথাযথ ভাবে বলতে না পারলেও উল্লেখ্য কিছু কৃষ্টির কথা বলা যেতে পারে। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য সেগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগেভাগ করে নেওয়া যাক। যেমন— শহরের প্রবেশ মুখ, হটন এলাকা, উগ্রক্ষত্রিয় পাড়া, নামো পাড়া সাতাপল্লী, হসপিটাল এলাকা, রেললাইন পার, রাধারানী পল্লী, কল্যানেশ্বরী আশ্রম এলাকা, পদ্মবাঁধ, ট্রাফিক মিউজিয়াম ও স্টেশন রোড।

শহরের প্রবেশ মুখে— দুর্গাপুর থেকে আসানসোলের দিকে আসতে শহরে ঢোকার মুখেই নেমে উত্তরে সামান্য এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে ঘাগড়বুড়ির মন্দির। দেবী হিসাবে এই নাম বেশ বিচিত্রই মনে হয়। আসলে ইনি হলেন লৌকিক দেবী চণ্ডী। এবার নাম করনের বিষয়ে বলি। একবার এক চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ শহর প্রান্তে বয়ে চলা এক ক্ষুদ্র পাহাড়ি স্রোতস্বিনী লুনিয়া অতিক্রম করে পাশের গ্রামে পূজা করতে যাবার সময় এক বিরল প্রজাতির গাছের নীচে ঘাগরা পরা এক বৃদ্ধার ডাকে ফিরে তাকালে বৃদ্ধা তাকে প্রতিদিন এই বৃক্ষতলে তার পূজা করতে বলেন। ব্রাহ্মণ সম্মতি জানায়। সেই রাতেই ব্রাহ্মণকে স্বাপ্নাদেশে জানানো হয় যে, সেই গাছের তলায় এক গোলাকার পাথরকে প্রতিষ্ঠা করে যেন পূজা করা হয়। ব্রাহ্মণ যেহেতু ঘাগড়া পড়া বৃদ্ধাকে সেখানে দেখেছিলেন, তাই পূজাকরার সময় ঐ দেবীর নামকরণ করেন ঘাগড়বুড়ি বা ঘাগড়চণ্ডী। প্রস্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় দেবী পূজা। তদবধি দেবী ঘাগড়বুড়ি নামেই খ্যাত হন।

পরবর্তীকালে আরও ২টি সম আকৃতির গোলাকার পাথর সেখানেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সর্বসাকুল্যে দেবীর আটনে তিনটি প্রস্তর খণ্ড বর্তমান। তার মধ্যে মাঝেরটিই ঘাগড়বুড়ি আর দুপাশের ২টির ১টি শিব, অন্যটি কালীর প্রতীক। দেবীর প্রতিষ্ঠা কাল সম্পর্কে লোক শ্রুতিতে জানাযায় যে দেবী সপ্তদশ শতকের পথম দিকে সম্ভবত ১৬২০ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তবে এখানে লোক সমাগম বা ভক্ত সমাগম শুরু হয় ১২০ বছর আগে থেকে।

এই দেবী শুরুতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের পূজ্য দেবতা ছিলেন বলেই অনেকেই মনে করেন। পরে তাকে ব্রাহ্মণীকরণ করে চণ্ডী দেবী হিসাবে এখন পূজা করা হচ্ছে। সেযাই হোক, চক্রবর্তী পরিবারই বংশানুক্রমিক ভাবেই এই দেবীর পূজা করে আসছেন। বর্তমান পূজকদের অন্যতম হলেন দেবদাস চক্রবর্তী। ভক্তরাও দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাঙালী ভক্তের সঙ্গে বহু বহু অবাঙালী ভক্ত প্রতিদিন সমবেত হচ্ছেন। আর পূজক ব্রাহ্মণরা সকলেই রক্তাম্বর পরিধানে পূজায়রত।

দেবী মহাত্ম্য সমপর্কে বহু কাহিনীই লোক মুখে প্রচলিত। লোকবিশ্বাস দেবীর কাছে মানত করলে সকল মনোবাসনাই পূরণ হয়ে থাকে। তাই ভক্ত সমাগমও প্রচুর হয়ে

থাকে। ভক্তদের দানেই দেবীর মন্দির, ভোগ ঘর, যাত্রীদের বিশ্রাম কক্ষ ও আরও কিছু ছোটখাট মন্দিরাদি নির্মিত হয়েছে। দেবী নিত্য পূজিতা হলেও শনি মঙ্গলবারে বিশেষ পূজা হয়ে থাকে আর সপ্তাহের ঐ দুনি ব্যাপক ভক্তসমাগম হয়। মাঘ মাসের ১ম দিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন তাই ঐ দিনটিকে ঘিরে প্রতিবছব এখানে একটি বড় মেলা বসে। দেবীর কৃপায় মৃতবৎসা ও বন্ধ্যা নারী সন্তান বতী হয়। দেবীর দয়ায় বসন্ত ও কলেরা রোগ নিরাময় হয়। এখানে বার মাসের জন্য অনেক দোকান পত্র আছে ফলে দেবী পূজার উপকরনাদি পেতে কোন অসুবিধা হয় না। পাশেই মন্দির চত্তরকে প্রায় ঘিরেই উপল খণ্ডের উপর দিয়ে বিসর্পিল গতিতে ক্ষীণ তোয়া লুনিয়া নদী প্রবাহমান।

এবার চলুন হটন রোডে, যেখানে দেখতে পাওয়া যাবে এক তান্ত্রিক সাধক রাখাল চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণাকালী। এই কালী প্রথম একটি কুঁড়ে ঘরে বাংলার ১৩১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে যুধিষ্ঠির গড়াই নামক এক ব্যক্তির, একমাত্র পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে এই মায়ের কৃপায় নিষ্কৃতি পাওয়ায় ঐ ভদ্রলোক দেবীর দালান মন্দির নির্মান করে দেন। এই কালী মন্দিরের কাছেই রয়েছে ভরদ্বাজ বংশীয় ব্রাহ্মণদের পূজিত দামোদর শিলারূপী বিগ্রহ ও তার নবনির্মিত মন্দির। এখানে ঐ দেবতার প্রাচীন মন্দির আগে থেকেই ছিল কিন্তু তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে তা পুনার্নির্মিত হয়েছে।

উগ্রক্ষত্রিয় পাড়ায় রয়েছে নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের সামনে রয়েছে নাটমন্দির। এখানে গাজন উৎসব বেশ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে এক মৃন্ময়ী কালীও পূজিত হয়। এর বিশেষত্ব হল বিসর্জনের পর মায়ের কাঠামোটিকে নিয়ে দেবীর সারা বছর নিত্য সেবা চলে।

নমো পাড়ায় ধর্মরাজের অবস্থান রয়েছে। বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমায় এখানে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটিও বেশ প্রাচীন। এবার যাওয়া যাক হাঁসপাতাল সন্নিকটে শেরশাহী সড়ক জি.টি. রোডের কালিকা মন্দিরে। এখানে প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে দেবী কালীকার বিগ্রহ সহ এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ফলে এখানে একই মন্দিরে শিব ও শক্তির সহবস্থান। দেবী কালিকার পূজাও যেমন. হয় তেমনি শৈবউৎসব শিবরাত্রির পূজানুষ্ঠান ও এখানে পালিত হয়।

'সুখ স্বপনে শান্তি শ্মশানে'— এমন একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। তাই হয়ত শ্মশানের নির্জন শান্ত পরিবেশে শক্তিদেবীর আরাধনায় শান্তিলাভের আশায় কোন তান্ত্রিক সাধক কর্তৃক এখানকার সাঁতা পল্লীর শ্মশানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেবী ছিন্নমস্তার মূর্তি। পরে সেখানে ১৯১৪ খ্রিঃ দালান মন্দিরও নির্মিত হয়েছে। মাঘী পূর্ণিমায় দেবীর বাৎসরিক উৎসবে ছাগবলি সহ পূজাদি হয়ে থাকে। আসানসোলের এটিও একটি দর্শনীয় পুরাবস্তু।

এখন রেললাইন পার হয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে এক শৈবসাধু গোবিন্দ দাসের স্বপ্ন লব্ধ শিব লিঙ্গ সহ শিবমন্দির। এই ভাবে আসানসোলের বিশাল বিস্তৃত এলাকায় ঘুরলে বহু প্রাচীন ও নব্য পুরাকীর্তি সহজেই লক্ষ্য করা যাবে উদাহরণ হিসাবে কয়েকটিব নাম উল্লেখ করা যায়। যেমন— কল্যানেশ্বরী আশ্রম এবং বিমলা সেবা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত কালী বাড়ি, শ্মশান কালী মন্দির, জি.টি. রোডের রাধাগোবিন্দ মন্দির, পদ্মবাঁধের নিকট গৌবাঙ্গ মন্দির ইত্যাদি।

এতক্ষণ প্রাচীন কৃষ্টির কথা হল। এবার নব্যকৃষ্টির কথায় আসা যাক। আমরা জানি কতিপয় বাঙালী এক জায়গায় মিলিত হলেই তারা কিছু একটা করতে চায় ও কিছু করে দেখাতে চায়। এ যেন বাঙালী মননের এক স্বতস্ফূর্ত বহিপ্রকাশ। এতেই সৃষ্টি হয় ক্লাব বা সংঘ। এইভাবেই ১২ জন বন্ধু বা ইয়াব মিলেই প্রথম সূচনা হয়েছিল রারোয়ারী দুর্গোৎসব যা 'সার্বজনীন' নামের মোড়কে ধীরে ধরে সমগ্র বঙ্গে উৎসবের ক্ষেত্রে এখন এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আসানসোন ও বঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত হলেও সেখানে বাঙালীর তো অভাব নাই— তাই সেখানেও আজ বেশ কয়েকটি বারোযাবী বা সার্বজনীন কালী পূজাকে ঘিরে তারা কিছু আলোড়ন বা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

তাদেরই একটি হল ট্রাফিক জিমনিসিয়াম অঞ্চলে কতিপয় যুবকদের দ্বারা আনীত ১২/১৩ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট মৃন্ময়ী কালী, যেখানে বিশাল জাঁকজমকে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সংসাব চত্রে ঘূর্ণিও দিশেহারা মানুষ জন সংসারে সুখ-শান্তির কামনায় দলে দলে মায়ের পদতলে তাদের অন্তরের আকুতি জানিয়ে পূজা নিবেদন·করেন। ফলে জমে ওঠে পূজা মণ্ডব। তাকে ঘিরেই তখন কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে বিরাট মেলা।

অন্যদিকে স্টেশন রোডের পাশে আর এক বিরাট কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজার সংগঠক হল স্পোর্টিং ক্লাব। এদের কালী মূর্তি উচ্চতায় সামান্য ছোট প্রায় ৮/৯ হাত। কিন্তু তা হলে কি হয়, উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব দেখা দেয় না— ফলে সেখানেও লোক সমাগমের অভাব হয় না। তাই সেখানেও কয়েক দিন ধরে এক মেলা বিশেষ জাঁজ জমকে পরিচালিত হয়। এই ভাবেই উৎসব প্রিয় বাঙালী কয়েকদিন আনন্দে মেতে ওঠে।

—ঃ বননবগ্রাম ঃ—

আঁউশগ্রাম থানার ১নং ব্লকের অধীন, অরণ্যের আওতায় সবুজ শ্যামল স্নিগ্ধ পরিবেশে, বননবগ্রামের অবস্থান। এর জে.এল. নং-৪০। গুসকরা মোর বাঁধ পাকা রাস্তার উত্তরে এবং আউশ গ্রামের সামান্য পশ্চিমে এই গ্রামের অবস্থান। একদা

বনকেটে নব বসতি গড়ে তোলায় গ্রাম নাম 'বননবগ্রাম' হয়েছে। ছোট গ্রাম হলেও শিক্ষায়-দীক্ষায় গ্রামটি প্রাচীন কাল থেকেই সুনামের অধিকারী। বহুপূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল 'বুজুরুক নব গ্রাম'। বুজরুক কথাটি ফার্সি কথা, যার অর্থ বিজ্ঞ বা জ্ঞানী। তাই বলা যায় ধনৈশ্বর্যে গ্রাম বড় না হলেও বিদ্যা ঐশ্বর্যে এ গ্রাম প্রাচীণ কাল থেকেই সমৃদ্ধ।

গ্রামেব সুসন্তান স্যার নলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অবিভক্ত বাংলার মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। পিতা সারদা বঞ্জন ছিলেন সাবজজ। এই গ্রামে বিলাত ফেরৎ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন আছেন, তেমনি জার্মান, রাসিয়া থেকেও শিক্ষালাভ করেছেন এমন লোকও বহু আছেন। তাছাড়া অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং সাহিত্য বিজ্ঞানে ডক্টরেটও বহু আছন। সেই নিরিখে দেখতে গেলে গ্রামটি সত্যই শিক্ষা-দীক্ষায় সবিশেষ উন্নত।

গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে কয়েকটি প্রাচীন পুঁথির হাতে লেখা সংকলন বর্তমান রয়েছে। যেমন— বেনুকর অধিকারীর বাড়িতে রয়েছে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ। এটি ১৬৮৯ শকাব্দের ২৬ শে পৌষ শুক্রবার অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিঃ নকল করা হয়েছিল যা পলাসী যুদ্ধের সময় কাল। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের পুঁথি রয়েছে নকুল চন্দ্র দত্তের বাড়িতে আর আছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের হাতে লেখা পুঁথি বলবাম অধিকারীর বাড়িতে। এটি ১২২১ সারের ২৯ শে অগ্রহায়ন নকলেব কাজ শেষ হয়। অর্থাৎ এই পুঁথিটি ১৯০ বছবের প্রাচীন।

গ্রামে উল্লেখ্য চট্টোপাধ্যায় পরিবার ভাতাড় থানার বড়বেলুন থেকে বননব গ্রামে এসে স্থিতৃ হয়েছিলেন। যিনি প্রথম এই গ্রামে এসে ছিলেন তিনি হলেন রামকিঙ্কর, তার পুত্র বেচারাম। বেচারামের পুত্র কমলাকান্ত, তার পুত্র রামচন্দ্র, এর পুত্র ত্রিলোচন। ত্রিলোচনের পুত্র সাবদা প্রসাদ ইনি সাবজজ ছিলেন। এরই সন্তান নলিনী রঞ্চন (জন্ম ১৮৬৬ খ্রিঃ ৮ই অগ্রহায়ন) হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতি ছিলেন। তার পাঁচসন্তান যথা কামদা, হরকুমার, অনুজ, সুধীর প্রফুল্ল ইত্যাদি।

চ্যাটার্জীদের প্রসাদোপম অট্টালিক যেকোন পথিকজনের দৃষ্টি আকর্ষন করবে। এর নির্মাতা ছিলেন স্যার নলিনীরঞ্চন চট্টোপাধ্যায়। এটি দক্ষিণমুখী দ্বিতল ভবন যা আকারে এতই বিশাল যে, এখানে সহজেই একটি মহাবিদ্যালয় কেন এতে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা যায়। বাড়িটি মাঝে দেওয়াল দিয়ে ২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, মধ্যের পশ্চিমাংশ কাছারি বাড়ি নামে খ্যাত। পূর্বে বসত বাড়ি। বাড়িটির নাম 'বিলাস ভবন'। স্থাপিত হয়েছে ২২ শে পৌষ ১৩৩৩ সাল।

নিজেদের ঐ বিশাল দর্শনীয় বাড়ি ছাড়াও এই পরিবার গ্রামে বেশ কয়েকটি দেব বিগ্রহ সহ মন্দিরাদি নির্মান করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল গ্রামের উত্তরাংশে তৈরী

হয়েছে বিশাল নাট মন্দির সহ দুর্গামন্দির এবং দেবসেবার জন্য মন্দিরের উত্তর ও পশ্চিমে বাঁধানো ঘাট সহ ২টি বৃহৎ পুষ্করিনী ও ফলের বাগানও তৈরী করা হয়েছিল যা এখন লুপ্ত। অনেকগুলি গ্রথিক পিলারের উপর ছাদ সহ বিশাল নাটমন্দির। সেখানে উৎসব উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন হত।

দুর্গামন্দিরের পশ্চিমে রয়েছে ভোগমন্দির এবং উত্তরে রন্ধনশালা। এগুলি বর্তমানে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই দুর্গামণ্ডপের লাগাও পশ্চিমে সারি বদ্ধভাবে নির্মিত হয়েছে বেশ কয়েকটি শিব মন্দির। মন্দির অভ্যন্তরে শিব লিঙ্গগুলি বিশেষ বিশেষ নামে নামিত। যেমন উত্তর থেকে ক্রমানুসারে লিঙ্গগুলি গিরিবালা, অমৃতে শ্বর, কুলেশেশ্বর, বামেশ্বর, সারদেশ্বর ইত্যাদি নামে পরিচিত। লিঙ্গ গুলি সবই গৌরী পট্ট যুক্ত। মন্দির গাত্রে টেরাকোটার কোন কাজ নাই। মন্দিরগুলির মধ্যে কেবল কুলেশেশ্বর মন্দিরটি বিশেষ রীতিতে তৈরী। এটি সর্বসাকুল্যে ত্রয়োদশ চূড়ার সমন্বয়ে গঠিত গোপভূমের এক বিরল গঠনের শিব মন্দির। ত্রয়োদশ চূড়ার শিবমন্দির গোপভূমের কোথাও দেখা যায় না। তবে এটি অনেকগুলি শিবমন্দিরের মধ্যে সংকীর্ণ স্থানে প্রায় পরিত্যক্ত গ্রাম প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় এর শিল্প সৌকর্য তেমন উপলব্ধি করা যায় না। শিলিঙ্গগুলি এখানে নিত্য পূজিত হলেও শিব চতুর্দশীতে এখানে বিশেষ ধূমধাম হয়ে থাকে।

গ্রামে আরও অনেক মন্দিরাদি রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য হল দুর্গেশ্বর শিব মন্দির। এই মন্দিরটির নির্মান কাল ১২৮২ বঙ্গাব্দ ইং ১৭২৭ খ্রিঃ, এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন গোপাল চ্যাটার্জী। এর গায়ে প্রচুর টেরাকোটার কাজ লক্ষ করা যায়। মন্দিরটির পূর্বগায়ে দরজাকৃতি স্থানে অঙ্কিত রয়েছে একটি বড় আকারের নর্তকী মূর্তি।

গ্রামে হিন্দু ধর্মের তিন বিশিষ্ট ধারা যেমন— শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এর প্রবাহ মানতা লক্ষনীয়। যেমন-দুর্গোৎসব গ্রামে মহাসমারোহে উদযাপিত হয়, কালী পূজাও অনুষ্টিত হয়। বিশেষ করে পশ্চিমপাড়ায় কার্ত্তিক মাসে মহাধুমধামে বহু ছাগ বলি সহ কালীপূজা হয়ে থাকে। এই পূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠান এর আকর্ষনকে বিশেষ মাত্রা দান করে। এই কালীপূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামে তখন একটি মেলাও বসে। গ্রামে আরও ২টি উল্লেখ্য অনুষ্ঠান হল মাঘ মাসে রটন্তী কালী পূজা ও সরস্বতী পূজা। ঐ দুটি অনুষ্ঠানকে নিয়ে গ্রামে বিশেষ উৎসব শুরু হয়ে যায়। সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যেও গ্রামে মেলা বসে। এই সব শাক্ত অনুষ্ঠান ছাড়াও বৈষ্ণবীয় উৎসব হিসাবে গ্রামে বিশেষ ধুমধামে হরিনাম সংকীর্ত্তন ও বিষ্ণুপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শৈব কৃষ্টির কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তাই বলা যায় গ্রামে হিন্দু ধর্মের তিন ধারাই সমভাবে প্রবাহমান।

এবার আসা যাক লৌকিক দেব-দেবীর কথায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় গ্রামে আদিরে তলায ধর্মরাজ আদিরায়ের কথা। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজ আদিরায়ের গাজন মহাধূমধামে, বহুভক্ত সন্ন্যাসী সহকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি যেমন বাম ফোঁড়া ধুনো সেবা, আগুন ঝাঁপ সহ পরিপালিত হয়। এই গাজনে বহু ছাগ বলি সহ পূজাদি হযে থাকে এবং গাজনের কৃত্যানুষ্ঠান দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে কয়েক হাজার লোকের সমাগম হয়। গ্রামের মনসা পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও গ্রামের কায়স্থ দত্ত পরিবারে পূজিত হন মাতা মঙ্গল চণ্ডী। অনেকের মতে এটিই গ্রামে আদি মাতৃপূজা। এই মাতৃকা মূর্তি ছাড়াও আর এক মাতৃকা মূর্তির সন্ধান মেলে গ্রামের হোমপদ মেটের বাড়িতে। এখানে রয়েছে ছোট্ট পাথরের এক কালীমূর্তি যা পাওয়া গিয়েছিল গ্রামের উত্তর ধারে দাসপাড়ার হুজুরে বাগান থেকে।

গ্রামে কেবল হিন্দুদের বাস। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ, সদগোপ, সুবর্ণবণিক সূত্রধর, স্বর্ণকার ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বাস হলেও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় মেটে বাউরী বাগ্দী, মুচি ও আদি বাসী সম্প্রদায়ের অবস্থান লক্ষনীয়। গ্রামে সুবর্ণ বণিকদের সংখ্যাও কম নয়। শুরু থেকেই তারা গ্রামে বশে সঙ্গতি সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। তাদের অনেকেরই পদবি ছিল পোদ্দার। পোদ্দার কথাটি এসেছে ফার্সী শব্দ ফেতেদার থেকে— যার অর্থ মুদ্রা পরীক্ষক ও বিনিময়কারী। ঐ কাজ করতে গিয়ে অনেক অসাধু ব্যক্তি মুদ্রার ওজন ভুল ভাল করে এবং আসলকে নকল বানিয়ে লোক ঠকাত, তাই তখন পোদ্দার উপাধিধারী ব্যক্তিদের বাজারে বিশেষ বদনাম ছিল। সেই বদনামের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এক সম্ভ্রান্ত পোদ্দার পরিবারের সদাশয় ভোলানাথ পোদ্দার, নিজেদের পোদ্দার পদবি ত্যাগ করে 'দত্ত' পদবি গ্রহণ করেছিলেন। সেই ভোলা নাথের এক মাত্র পুত্র নকুল চন্দ্র দত্ত লেখাপড়া শিখে ইংরাজী সাহিত্যে M.A. পাস করে এরুয়ার হাইস্কুলে ইংরাজীর শিক্ষক পদে ব্রতী হন। পরে মঙ্গলকোট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা শুরু করে শেষে ভাতাড় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে তাঁর কর্মজীবন শেষ করেন। তিনি এরুয়ারেই সপরিবারে বাস করতেন। তিনিও বননব গ্রামের এক কৃতি সন্তান। তিনি একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, তাই বিশ্বভারতী বিশ্ব বিদ্যালয় তাঁকে 'জ্ঞানশ্রীসাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সেই তিনিই এই লেখকের শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ও এই পুস্তক প্রণয়নের প্রধান প্রেরণা দাতা।

গ্রামের উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব স্যার নলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আউশ গ্রাম— বননবগ্রাম রাস্তাটি তৈরী করিয়েছিলেন, তাই রাস্তাটি স্যার নলিনী রঞ্জন রোড নামে পরিচিত। গ্রাম টি শিক্ষায়-দীক্ষায় বেশ উন্নত সে কথা শুরুতেই বলা হয়েচে। সেই সঙ্গে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এর অগ্রণী ভূমিকাও লক্ষনীয়। এই গ্রামেই একদা আর্য চট্টোপাধ্যায়ের

সম্পাদিত 'অগ্রগতি' পত্রিকা বেশ সাড়া জাগিয়ে ছিল। এই গ্রামে বর্তমানে কবিগানের চর্চা রয়েছে। কবিয়াল হিসাবে বেশ নাম করেছেন শ্রদ্ধেয় জয়দেব মেটে।

—ঃ মঙ্গল কোট ঃ—

বর্ধমান জেলাব কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট নিজেই একটি থানা। অজেয় অজয় নদীর দুরন্ত উপনদী কুনর যেখানে সোহাগ ভরে অজয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে—তাদের সেই মিলন ক্ষেত্রের পাশাপাশি বহু বিস্তৃত এলাকা নিয়েই সৃষ্ট হয়েছে প্রাচীন কাল থেকই সমৃদ্ধশালী জনপদ মঙ্গলকোট। পূর্বে এই এলাকা উজ্জয়িনী বা উজানী নামেও পরিচিত ছিল সে সবই অতীত বিস্মৃতির কথা। একমাত্র তবে এই এলাকাটিতেই প্রাগৈতিহাসিক কাল অর্থাৎ কম করেও সাড়ে তিনহাজার বছর আগের সেই তাম্রাশ্মীয় যুগ থেকে শুরু করে-গুপ্ত যুগ, পালযুগ, সেনযুগ, মুঘল যুগ ও আধুনিক যুগ পর্যন্ত এক ক্রমানুসারী সভ্যতার অভিচ্ছেদ্য ধারাবাহিক বিকাশ ঘটেছিল তা আজ ঐতিহাসিক প্রামাণিক তথ্যে প্রমাণিত। এখান থেকে অতীত ইতিহাসের অনেক বোবা কাহিনীও আজ জন সমক্ষে উম্মোচিত। সে কথা বিস্তৃত ভাবে এই গ্রন্থের 'গোপভূমের প্রত্নক্ষেত্র' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, তাই সে প্রসঙ্গে আর না গিয়ে এখানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য পুরাকীর্তি ও কৃষ্টির কথা তুলে ধরা হল।

শুরুতেই তাদের স্মরণ করি যারা ব্যক্তি উদ্যোগে এই এলাকার ঐতিহ্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট ছিলেন বা আছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যার নাম করতে হয় তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী এককড়ি দাস। তিনি এই এলাকার লোক ছিলেন। আপন প্রচেষ্টায় এখানের বহু পুরাবস্তু নিয়ে কাগজে লেখা লেখি করে জনসমক্ষে এ বিষয়ে আগ্রহের সৃষ্টি করেছিলেন, তার ফলেই সরকারী উদ্যোগে এখানে খননের কাজ প্রশস্ত হয়েছিল। ২য় যার কথা বলতে হয় তিনি হলেন গবেষনার কাজে নিবেদিত প্রাণ আজীবন গবেষক শ্রদ্ধেয় মুহম্মদ আয়ুব হোসেন। যিনি এখানকার বহু পুরাকীর্তি যেমন গুপ্ত যুগীয় শিলমোহরাদি, সনাল জল পাত্র সহ বহু দ্রব্যাদি আবিষ্কার করে জনসমক্ষে এর গুরুত্ব প্রচার করে ছিলেন। আর এখনও যিনি এখানকার ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব জনগনে জানাতে আগ্রহী তিনি হলেন এখানকারই ভূমিজ সন্তান শ্রী কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী এ বিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ বারে বারে পরিস্ফুট হয়েছে।

এবার আলোচনায় আসা যাক। প্রথমেই বলা হয়েছে আলোচ্য ক্ষেত্রের নাম 'মঙ্গলকোট'। কোট শব্দটি প্রাচীন 'কোষ্ঠ' শব্দ থেকেই আগত। যার অর্থ দুর্গ। এখানে প্রাচীন কাল থেকেই যে একটি দুর্গ ছিল তা বৃহদ্ধর্ম পুরাণেও উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

"উজ্জয়িন্যাম্ তথা পূর্বাম পীঠম্ মঙ্গলকোষ্ঠকম্।"

তাছাড়া মঙ্গলকোটে যে দুর্গ ছিল এবং তা মোগল-পাঠান যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ আবুল ফজল আলামির লেখা "অকবর নামা" গ্রন্থেও উল্লেখ আছে। তবে তখনকার সেই প্রাচীণ মঙ্গলকোট বর্তমানের নূতন হাট, উজানী-কোগ্রাম, বক্সীনগর, বড় বাজার পদিমপুর ইত্যাদি গ্রামগুলিকে নিয়ে বিস্তৃত ছিল। এই মঙ্গলকোট খুবই প্রাচীন জনপদ ছিল। তার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, টলেমীর মানচিত্রে সিব্রিয়াম বা শিবিপুরের উল্লেখ আছে। তাছাড়াও বেসান্তর জাতকে শিবিরাজ্যের বাজধানী ছিল জেতুত্তর নগরীতে। ডঃ অশ্বিনীকুমার চৌধুরী ও ডঃ অতুল সুর দুজনেই জাতক বর্ণিত এই শিবিরাজ্যের রাজধানী শিবি তথা জেতুত্তরকেই মঙ্গলকোট বলেই স্বীকার করেছেন। "সম্ভবতঃ বক্তিয়ার খলজী রাজনগর অধিকার করে অজয় অতিক্রম পূর্বক মঙ্গলকোটের হিন্দু রাজাকে দমন করে নদীয়া অভিযান করেছিলেন।" (১৪)

অতিপ্রাচীন কালে এটি উজ্জয়িনী নামেই খ্যাত ছিল ঠিকই কিন্তু মোগল আমলে এটি 'মঙ্গলকোট' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। হয় তার কারণ হিসাবে বলা যায় বঙ্গে মুসলমান অনুপ্রবেশের প্রথম দিকে রাঢ বঙ্গের যে কটি স্থানে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল তার মধ্যে মঙ্গলকোট অন্যতম ক্ষেত্র। কারণ অনেকেই মনে করেন বকতিয়ার খলজী নদীয়া অভিযানের প্রাককালেই, মঙ্গলকোট অধিগৃহীত হয়েছিল তার ফলেই মুসলমান ধর্মপ্রচারকেরা এখানে ইসলাম প্রচারে বলিষ্ঠ ক্ষেত্রও পেয়েছিলেন। সে দিক থেকে মোগল আধিপত্য এখানে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই সম্ভবত এই এলাকা মোগলদের (অধিকৃত ক্ষেত্র) বা মোগলের কোঠা (১৫) (মোগলকোঠ) মঙ্গলকোট নামে নামিত হয়। পরবর্তী কালে এটি কোন এক সময় স্থানীয় ভাবে 'কসবা' নামেও পরিচিত হত। কসবা কথাটি আরবি কথা-যার অর্থ নগর বা ইংরাজীতে city এখনও অনেক প্রাচীণ লোকের মুখে কসবা নামটি শোনা যায়।

এখন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মঙ্গলকোটের দর্শনীয় স্থান ও পুরাকীর্তি গুলির প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যাক। প্রথমেই আসা যাক অষ্টাদশ আউলিয়ার কথায়। জনশ্রুতিতে জানা যায় মঙ্গলকোট বা উজ্জয়িনীর কিংবদন্তি রাজা বিক্রয়মাদিত্য নয়, ইতিহাস গন্ধী রাজা বিক্রমজিৎ এর সঙ্গে একদা ১৮ জন মুসলমান ধর্ম প্রচারক— যাদের অলি বা আউলিয়া বলা হয় তাদের মধ্যে এখানে মুসলমান ধর্ম প্রচারকে কেন্দ্র করেই সংঘাত শুরু হয়। সেই সংঘাত কে কেন্দ্র করেই ঐ রাজার সঙ্গে আউলিয়াদের যুদ্ধও বাধে, তাতে বিক্রম জিৎ কর্তৃক কায়েকজন ধর্ম প্রচারক শহিদ হলেও শেষ পর্যন্ত রাজা পরাজিত ও নিহত হন। তার পরেই এখানে মুসলমান ধর্মের বিস্তার ঘটে ও এই এলাকা 'অষ্টাদশ আউলিয়ার' দেশ নামে খ্যাত হয়।

অষ্টাদশ আউলিয়াদের মধ্যে গোলাম পাঞ্জাতন, পীর গজনাভী গাজী, কোয়ার

সাহেব সহ পাঁচজনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে তাদের সমাধি বা মাজার আছে। তার মধ্যে পুরাতন থানার গায়ে খড়ি নদী, তার দয়িতের সঙ্গে যেথায় মিলিত হবার জন্য আকুলি বিকুলী করছে তার অব্যবহিত আগেই পীর পাঞ্জাতনের মাজার বর্তমান। সেখানে তার বাৎসরিক উরস উপলক্ষে ২/৪ দিনের জন্য পূর্বে একটি মেলা বসতো কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে ভক্তরা পোড়ামাটির ঘোড়া নিবেদন করে থাকেন— তাতে বাঁকুড়ার বিশেষ ধরনের গলালম্বা মাটির ঘোড়াও দেখা যায়।

তেলঢালাপুকুর— এটি একটি প্রায় ২½ বিঘার মত আয়ত ক্ষেত্রকার পুকুর যার তলদেশ থেকে উপর পর্যন্ত চতুদিক ইট দিয়ে বাঁধানো। চর্তুদিকে ইটের গাঁথনি করে সিড়ির মত নীচের দিকে মেনে গেছে এবং তলদেশ ও ইট দিয়েই বাঁধানো আছে। পুকুরের তলদেশের পূর্ব প্রান্তে একটি সুড়ঙ্গ আছে, হয়ত এটি জল নিকাশী ব্যবস্থাও হতে পারে।

পুকুরে জমে যাওয়া পাঁক সরাতে গিয়ে হঠাৎ এক স্থানে বাঁধানো এক চৌবাচ্ছার সন্ধান মেলে যার উপরে কাঠের পাটাতন চাপাছিল কিন্তু তার নীচে কি আছে তা পুলিশি হস্তক্ষেপে কারও পক্ষে দেখা বা জানা হয়নি। জনশ্রুতি যে, এই পুকুরের সঙ্গে নিকট বর্তী মাইনে পুকুর বা বিষপুকুর, ফুলবাগ পুকুর ও বাঁধা পুকুরের সাথে নলদ্বারা যুক্ত ছিল। মাটির নলের সাহায্যেই হামামখানায় জল সরবরাহ করা হত।

তেলঢালা পুকুরের তলদেশে কাঠের পাটাঢাকা চৌবাচ্ছার অনুসন্ধান করতে পারলে হয়তো ঐ জনশ্রুতির. নিরসন হলেও হতে পারত। কিন্তু সে রহস্য অন্ধকারেই রয়ে গেল। অনেকের মতে এটি কিংবদন্তি রাজাদের আমলে তেলঢেলে রাখা হত তাই এটি এখনও তেলঢালা পুকুর নামেই খ্যাত হয়ে আসছে কিন্তু আসলে এটি মৌর্য যুগীয় কোন স্থাপত্য নিদর্শন বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

দানেশ মন্দির সমাধী ক্ষেত্র ও মসজিদ— উল্লেখিত তেল পুকুরের দক্ষিণ দিকে এই গ্রামের তথা এই দেশের এক প্রখ্যাত সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন— যার নাম ছিল সেখ আব্দুল হামিদ। বিদ্যা অর্জনের জন্য তিনি সুদুর দিল্লীতে গিয়ে আরবি ও পারসী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করে সুপণ্ডিত হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই বিদগ্ধ পণ্ডিত নিজেকে সবসময় বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতেন এবং নিজেকে বাঙালী বলে গর্ব বোধও করতেন। পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তিনি মৌলনা হামিদ দানেশ মন্দ বাঙালী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তদানীন্তন ভারত সম্রাট শাহজাহান তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি নিজের দেশে ফিরে এসে তেলপুকুরের দক্ষিণ প্রান্তে পড়াশুনা ও সাধন ভজনে দিনাতিপাত করতেন।

একদা ভারত সম্রাট শাহজাহান ১৬২৪ খ্রিঃ কোন এক সময় গুরুদর্শনে মঙ্গলকোটে এসেছিলেন। সম্রাট যে পথে এখানে এসেছিলেন তা বাদশাহী সড়ক নামে

খ্যাত এবং গৌড়াধিপতি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নির্মিত বলে কথিত। এটি বঙ্গের গৌড় হতে উড়িষ্যার কটক পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা এই মঙ্গলকোটের উপর দিয়েই উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। এই পথেই নির্মিত হয়েছিল ক্রোশ অন্তর মসজিদ এবং (নমাজ পড়ার আগে উজুকরার জন্য) খণিত হয়েছিল বিশাল বিশাল দিঘি বা জলাশয়— যাদের অবক্ষয়িত চিহ্নাদি এখনও লক্ষ্য করা যায়। একদা এই বিশাল রাজপথের সমুদয় অংশই নমাজের আজান ধ্বনিতে বারে বারে মুখরিত হয়ে উঠত।

সম্রাট এখানে ২/৪ দিন গুরুর সানিধ্যে কাটিয়ে ছিলেন এবং জ্ঞানতপস্বী গুরুদেবকে গুরদক্ষিণা স্বরূপ চুরানব্বই হাজার তঙ্কা দান করতে চাইলে, তিনি নিজে কিছুই না নিয়ে ঐ টাকায় তার জন্মভিটার পশ্চিমে সাধারণেব জন্য একটি মসজিদ নির্মানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে মসজিদ তৈরীও হযেছিল— যার ধ্বংসাবশেষেব কিছু এখনও দেখা যায়. তবে ভবিষ্যতে আর যাবে না কারণ ঐ স্থানে বর্তমান মাটির তৈরী মসজিদটি ভেঙে সেখানে এক বৃহৎ মসজিদ নির্মানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সম্রাট শাহজাহানেব নির্মিত সেই মসজিদেসম্রাটের নাম সহ উৎকীর্ণ লিপিটি বর্তমান মাটির তৈরী মসজিদ যা সম্রাট তৈরী মসজিদ ভেঙে যাওয়ার পর সেখানে মৌলভি মহম্মদ ইসমাইলের প্রচেষ্টায় তৈরী হয়েছিল তার প্রবেশ দ্বারে প্রথিত আছে। ১৩২০ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এর অনুবাদ করা হয়েছে- তার মূল বক্তব্য হল— যে ঈশ্বরের নিমিত্ত কোন মসজিদ কেউ নির্মান করলে, ঈশ্বর তার জন্য স্বর্গে একটি গৃহ নির্মান করবে। এই মসজিদ শাহজাহান বাদশাহ গাজির রাজত্বকালে নির্মিত। হিঃ ১০৬৫।[(১৬)]

কালের কবলে প্রায় নিশ্চিহ্ন সেই অবক্ষযিত মসজিদের অংশ দেখিয়ে এখনও লোকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে যে ওটি গুরুদানেশ মন্দের জন্যই সম্রাট সাহজাহানের তৈরী মসজিদ। এই মসজিদের দক্ষিণ গায়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত দানেশমন্দের সামাধি বা মাজার বর্তমান। এরই পূর্ব গায়ে রয়েছে বিরাট ইদদরগা।

বিক্রমাদিত্যের ভিটে— গ্রামের উত্তর দিকে এক বিস্তৃত এলাকা নিয়ে এক উচু ডাঙ্গা বর্তমান যাকে কিংবদন্তিরাজা বিক্রমাদিত্যের ভিটে বা ঢিবি বলে এখানকার লোক নির্দেশ করে থাকে। বর্তমানে এখানে কোন ঘর বাড়ির চিহ্নই বর্তমান নাই। তবে এটি যে একটি প্রত্নক্ষেত্র তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এই ঢিবিতেই ১৯৮৬ খ্রিঃ থেকে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে খনন কার্য চালিয়ে বহু ঐতিহাসিক প্রত্নদ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানে এখনও এক জায়গায় মাটির নীচে পোড়া চাল পাওয়া যায়। এখানেরই এক স্থানে মাটি সরিয়ে পোড়া ছাই এর হদিশ মেলে— তা থেকে মনে হয় প্রাচীণ কালে এখানে কোন অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এখনও চেপে বৃষ্টি হলে অনেক পুরাবস্তুর হদিশ মেলে।

বিষপুকুর— দানেশমন্দের মাজার ও মসজিদের দক্ষিণে একটি বৃহৎ পুষ্করিনী বর্তমান— যাকে স্থানীয়লোকে পীরপুকুর বা বিষপুকুর বলে থাকে। এর আর এক নাম মাইনে পুকুরও বটে। অনেকের বিশ্বাস এই মাজার ও মসজিদ দেখভালের জন্য খাদিমদের পারিশ্রমিক বা মাহিনা বাবদ পুকুরটি তাদের দেওয়া হয়েছিল বলে একে মাইনে পুকুর ও বলা হয়। সেযাই হোক, পুকুরটি খুবই পবিত্র। দূর-দূরান্ত থেকে অনেকেই এসে এই পুকুরে স্নান করে। লোক বিশ্বাস এই পুকুরে স্নান করে দানেশ মন্দের মাজারে গড়াগড়ি দিলে চর্মরোগ নিবৃত্ত হয় এবং কুকুরের বিষ দূরীভূত হয়। যেহেতু এই পুকুরে স্নান করলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়ে যায় তাই এই পুকুর বিষপুকুর নামেই সমধিক খ্যাত।

এই বিষপুকুরের উত্তর পাড় কোন অতীতে বাঁধানো ছিল কিন্তু দীর্ঘ দিন তা মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। হঠাৎ কিছু দিন আগে এক সময় পুকুরের পাঁক তুলতে গিয়ে কোদালের আঘাত শক্ত জিনিষে পড়লে তা সরাসরি করতে গিয়ে ঐ বাঁধানো ঘাটের হদিশ মেলে। তখন থেকে ঐ ঘাট সাধারণে ব্যবহার করছে। কোন অতীতে তৈবী ঘাট দীর্ঘদিন মাটির তলায় লুপ্ত থাকলেও এখনও তা রীতিমত মজবুত এবং ব্যবহাবের উপযোগী রয়েছে।

মাইনে পুকুর বা বিষপুকুরের পশ্চিম পাড়ে একদা এতদঅঞ্চলের প্রখ্যাত ব্যক্তি কাজী খোদা নওয়াজ এর বাসভূমি ছিল। এখন তা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে।

ঘোড়া-শহিদ— .গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চাঁদ দিঘির গায়ে ঘোড়া-শহিদের আস্তানা। পূর্বে এখানে একটি অতিবৃহৎ প্রাচীণ বটবৃক্ষ ছিল, যার ডালগুলি গোল হয়ে মাটি স্পর্শ করে থাকতো এবং ডালের ফাঁক দিয়ে গরুর গাড়ীর চলাচলের রাস্তা ছিল। এখন সেই বটবৃক্ষের দেহান্ত হয়েছে— ফলে জায়গাটি এখন একেবারেই ফাঁকা। অতীতে কোন এ যোদ্ধা পীড় সাহেব ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় এসে ঘোড়ার পিঠেই মারা যান বলেই এই স্থান তখন থেকেই ঘোড়া শহিদ নামে খ্যাত। এক সময় মুসলমান ধর্ম প্রচারক বা অষ্টাদশ আউলিয়ার সঙ্গে মঙ্গলকোটের রাজা বিক্রমজিতের যুদ্ধ হয়েছিল সেকাহিনী আমাদের জানা। সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কোন আউলিয়া যোদ্ধা, ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধ করাকালীন শহিদ হয়েছিলেন কিনা অর্থাৎ তিনি অষ্টাদশ আউলিয়ার একজন ছিলেন কিনা সে কাহিনী আজ অজ্ঞাত।

শাহমকদম পানা মাজার ও মসজিদ— এই গ্রামের মাঝ বরাবর পাকা রাস্তার দক্ষিণে একটি প্রাচীণ মসজিদ দেখা যায়— যাকে এখানকার লোকেরা শাহমকদমের মাজার ও মসজিদ বলে। ঘনবৃক্ষাচ্ছাদিত মনোরম পরিবেশে এই মাজার ও মসজিদ বর্তমান। এখানে এই মসজিদের গায়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেক বড় বড় মক্সা কাটা পাথরের চাঁই পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেগুলি পূর্বে হয়ত এই প্রাচীন মসজিদের

পিলার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে হয়ত সেই মসজিদ ভেঙে গেলে নতুন করে এই মসজিদ তৈরী হয়েছে, এবং ঐ পাথরের পিলারগুলি আর ব্যবহার করতে না পারায় সেগুলি এখানেই যত্রতত্র পড়ে আছে। কারণ হিসাবে বলা যায় এই রকম পাথরের পিলার বড় বাজারের হুসেনশাহী মসজিদেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই শাহ্‌মকদম পীর অষ্টাদশ আউলিয়ার একজন হলেও হতে পারেন।

আধুনিক মসজিদ— সুদূর বাগদাদ থেকে ধর্ম প্রচারের জন্য হজরত জাকের আলকাদেরী নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন এবং দীর্ঘ দিন এখানেই অবস্থান করেছিলেন। তার পরবর্তী বংশধরেরা বর্তমানে কোলকাতার বড় হুজুর পার্ক এলাকায় রয়েছেন। পরবর্তী কালে সেই হজরত জাকের আলকাদেরীর শিষ্য সম্প্রদায় ও তার বংশধরদের প্রাচষ্টায় অর্থাৎ কাদেরী সম্প্রদায় কর্তৃক এখানে একটি সুন্দর আধুনিক মসজিদ তৈরী হয়েছে। মসজিদটি আধুনিক শিল্প চাতুর্যে অভিনব। ঐ সাম্প্রদায়ের ভক্তদের দ্বারা মসজিদ দেখাশুনা হয় এবং বহু দূরদূরান্ত থেকে সাম্প্রদায়ের ভক্তদের আসা যাওয়া চলে। বৎসরের জেলহজ মাসের ৪র্থ দিনে এখানে বিশেষ উৎসব পালিত হয়। ইনি অষ্টাদশ আউলিয়ার একজন বটেন কিনা তা সঠিক ভাবে জানা যায় না।

হুসেনশাহের মসজিদ— বর্তমান নূতন হাট ও মঙ্গলকোটের সংযোগ স্থলে বড় বাজারের ও এখানকার বাদশাহী সড়কের পশ্চিমে রয়েছে এক রাজা দিঘি। সেই বাজাদিঘির পশ্চিম পাড়ে এক বিশাল উচু ডাঙ্গার উপর এই মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। মসজিদের তিনদিকের দেওয়াল আংশিক বর্তমান। দক্ষিণের দেওয়াল সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে এবং ছাদের চিহ্ন নাই। এখনও দাঁড়িয়ে থাকা ভগ্ন দেওয়ালে মাঝে মধ্যেই প্রাচীণ পাথরের পিলার লক্ষ করা যায়। এমনই এক পাথরের লম্বা স্তম্ভে দেবনাগরী হরফে 'শ্রীচন্দ্র সেন নৃপতি''র উল্লেখ আছে। কিন্তু ইতিহাসে এহেন নৃপতির কোন উল্লেখ নাই। অনেকেই এই চন্দ্র সেনকে লক্ষ্মণ সেনের কোন অখ্যাত নামা বংশধর বলে মনে করেন। এই ''চন্দ্রসেন সম্ভবতঃ গোপভূমের একজন সামন্ত ছিলেন।'' (১৭)

এ প্রসঙ্গে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে, এই প্রাচীন মসজিদটি তদানীন্তন বঙ্গের বিদ্যোৎসাহী অধিপতি হুসেনশাহ এক পুকুর পাড়ের উচুডাঙ্গায় তৈরী করেছিলেন। এই মসজিদে একটিশিলা লিপি ও ছিল। সেটি মসজিদ ধ্বংসের কালে এখান থেকে তুলে নিয়ে মঙ্গলকোটের মৌলনা দানেশমন্দ বাঙালীর মাজারে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল পরে সেটি কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েচে। তাতে জানা যায় হিজরী ৯১৬ অব্দে (১৫১০ খ্রিঃ) হুসেন শাহ এটি তৈরী করেছিলেন।

মসজিদ গাত্রে খোদিত চন্দ্রসেন নামাঙ্কিত লিপি প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রাখাল দাস

বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি ও আকর্ষিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ১৩২০ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-য় ১৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে— "উক্ত হোসেন শাহী মসজিদে প্রাপ্ত প্রস্তর খণ্ডে খোদিত লিপি হতে জানা যায়, চন্দ্রসেন নামক কোন হিন্দু রাজার (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকঃ মন্দির ধ্বংস সাধনের পর সেই সব উপাদান দিয়ে উক্ত মসজিতটি গ্রথিত করা হয়েছিল। খোদিত লিপির অক্ষরগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষর মালার অনুরূপ।"

চতুর্দিকে ইতস্তত পড়ে থাকা ভগ্ন ইটের স্তূপে স্তম্ভাকৃতি কিছু প্রস্তর খণ্ড বুকে নিয়ে এই বিশাল মসজিদটি তার অতীত দিনের রাজকীয় অবস্থার কথাই ঘোষনা করছে। বর্তমানে পুরাতত্ত্ব বিভাগ এটিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এর সংরক্ষণের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ করেছে। এর গঠন শৈলী তথা ভিতরের খিলান, নক্সা যুক্ত ইটের ব্যবহার দেওয়াল গাত্রে লতা পাতাফুলের বৈচিত্রের চমৎকার সমন্বয় এবং বহু বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ডের ব্যবহার-সব মিলিয়ে এটি সৌন্দর্যেব এক অতুলনীয় প্রতীক যা সহজেই মানুষের মনে অপার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে! বর্ধমান জেলায় আজ পর্যন্ত যতগুলি প্রাচীণ মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে এই হুসেন শাহী মসজিদটি অন্যতম তাতে সন্দেহ নেই।

মসজিদটি এক উচু ঢিবি বা ডাঙ্গার উপর নির্মিত হয়েছে। সেই ঢিবি প্রসঙ্গে অনেকেই অনুমান করেন যে, এটি কোন ধ্বংস প্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহার ছিল-যার উপরে মসজিদটি মির্নিত হয়েছিল। সেরকম অনুমানের পিছনে যুক্তি হল যে, এই এলাকা একদা বৌদ্ধ ও জৈন পুরাকীর্তির বহু নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানকার অজয় গর্ভে পাওয়া গেছে বহু বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি তার মধ্যে কোগ্রামের মঙ্গলচণ্ডী মন্দির অভ্যন্তরে সংরক্ষিত রয়েছে এক বুদ্ধ মূর্তি। তাছাড়াও এখানকার বহু স্থানেই এমন বহু বৌদ্ধ মূর্তি রক্ষিত আছে যা নদীগর্ভ বা অন্যস্থান থেকে পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ মূর্তি ছাড়াও এখান থেকেই পাওয়া জৈনদের ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্তি শংকর পুরে ন্যাংটেশ্বর শিব হিসাবে পূজিত হচ্ছে। তাই এই এলাকায় বৌদ্ধ স্তূপ আদৌ ছিল না বা না থাকার কথা নয়, তবে এই ঢিবিই যে প্রাচীণ বৌদ্ধ বিহার ছিল তারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

মজলিস দিঘি— গ্রামে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৃহদাকার দিঘি লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখ্য হল মজলিশ দিঘি। এটি গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। এর জলকর এখনও ৫০/৬০ বিঘার কম নয়। যদিও এর চার দিকের পাড় বুজিয়ে জমিবের করা হয়েছে এবং বসতি গড়ে তোলা হয়েছে। একদা হয়ত এর পাড়ে মজলিস বা বৈধকাদি বসত তাই এই দিঘি মজলিস দিঘি নামে নামিত হয়েছে।

ঐ দিঘি ছাড়াও এখানে আছে রাজাদিঘি যার পশ্চিমে হুসেন শাহী মসজিদ এখনও ভগ্ন অবস্থায় রয়েচে। এছাড়াও এখানে বাঁধা পুকুর ও আরও অনেক বড় পুকুর বা পুষ্করিণী বর্তমান।

—ঃ মানকর ঃ—

গোপভূম পরগনার এক উল্লেখযোগ্য গ্রাম মানকর। গ্রামটি বুদবুদ থানার অধীন এবং জে.এল.নং-৩৭। গুসকরা-বুদবুদ পাকা রাস্তায় অমরার গড় ও বুদবুদের মধ্যে এর অবস্থান। হাওড়া-রাণীগঞ্জ রেলপথে মানকর একটি স্টেশন।

গোপভূমের অমরার গড়, দিগনগর, কাঁকশা ইত্যাদি স্থানে গোপরাজাদের প্রাধান্য থাকায় এই গ্রামও যে একদা গোপ প্রাধান্যে প্রবাবিত হয়েছিল তা ধরে নেওয়া যায়। কারণ এই গ্রামের গ্রাম্য দেবতা হলেন মাণিকেশ্বর শিব। এই শিবের উৎপত্তি বিষয়ে বঙ্গে আর পাঁচটি শিবক্ষেত্র সৃষ্টির পিছনে যেমন গোপেদের গাইয়ের গহন বনে দুধ দেওযার কাহিনী জড়িত— এখানেও তাই শোনাযায়, ফলে এই এলাকায় গোপ প্রাধান্য যে ছিল তা ধরে নিতে অসুবিধা নাই। অনেকেই মনে করেন মানিকেশ্বর শিব থেকেই গ্রাম নাম মানকর হয়েছে। এই দাবীকে একেবারে নস্যাৎ করা যায় না, কারণ এই গ্রামের পূর্ব প্রান্তে মল্লিকেশ্বর শিবের নাম থেকেই ঐ মৌজার নাম যখন মল্লিক পাড়া।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে, এই গ্রামের কনৌজ ব্রাহ্মণেরা এক সময় বিদ্যাচর্চা ও গুরু গিরি পোশায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ঐ বংশের সুপণ্ডিত ভক্তলাল গোস্বামী বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র ও চিত্রসেনকে ১১২৯ সালে দীক্ষা দিয়েছিলেন— আর রাজারাও গুরুকে মান্য-রূপ কর হিসাবে এই গ্রাম ব্রহ্মোত্তর রূপে দান করেছিলেন। তাই মান্যরূপ কর থেকেই গ্রাম নাম মানকর হয়েছে।

গ্রামের প্রাচীনত্ব ঃ— গ্রাম যে খুব প্রাচীন সে বিষয়ে গ্রামের লোকেরা কিছু তথ্য দিয়ে তার প্রাচীনত্ব প্রমাণ প্রসঙ্গে বলতে চান যে, এই গ্রাম মহাভারতের কালে পঞ্চপাণ্ডবরা এখানে ত্রাস পাণ্ডব ক্ষেত্রতলা > পানক্ষেত্রতলায় কিছুকাল কাটিয়ে গিয়েছিলেন। মহাভারতের আর ব্যক্তি পৌষ মুনি নাকি এখানকার পৌষ মুনি ডাঙ্গা বা পঞ্চাননতলায় যাগযজ্ঞে কালাতিপাত করেছিলেন। লোক বিশ্বাস এখনও নাকি সেখানে যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বলতে দেখা যায়— ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি সবই জনশ্রুতির পর্যায়ে পড়ে— এর ঐতিহাসিক সত্যতা নিরূপন সত্যই দুরুহ ব্যাপার।

গ্রামবাসীর আরও বক্তব্য যে বঙ্গে বর্গী আমলের সময় (১৭৪২-৫১ খ্রিঃ) পাশের গ্রাম অমরার গড়ের তৎকালিন গোপরাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে ভাস্কর পণ্ডিতের সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় বাংলার নবাব আলিবর্দি এই গ্রামের 'সভাভরন' মাঠ থেকে ভাস্করকে সরিয়ে নিয়ে হত্যা করেছিলেন। সেই কাহিনীর প্রেক্ষিতে নাট্যকার নিশিকান্ত বসুরায় 'বঙ্গেবর্গী' ও দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা বৈদ্যনাথ' নাটকের দুটি দৃশ্যে 'মানকর শিবির' ও 'মানকর গড় প্রান্তর' এর উল্লেখ আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখতেই হবে যে, ইতিহাস ও নাটক এক নয়। নাটকে কল্পনার অবকাশ থাকে কিন্তু ইতিহাস সত্যনির্ভর সেখানে কল্পনার কোন স্থান নাই।

এখন দেখা যাক ইতিহাস এ বিষেয়ে কি বলে। ইতিহাস বলছে মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের কাছে ‘মানকরা’ নামক স্থানে [১৮] আলিবর্দির ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গবেষক ডঃ অতুল সুরও বলেছেন— “১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আলিবর্দি খান ও ভাস্কর ও তার সেনাপতিদের সন্ধির আছিলায় মুর্শিদাবাদের কাছে মানকরা নামক স্থানে নিজ শিবিরে আমন্ত্রণ করে হত্যা করেন। [১৯] এছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত গঙ্গারামের ‘মহারাষ্ট্র পুরাণে’ও ১১৪৯-৫০ সালে মারাঠা বর্গীদের দ্বারা বাঙ্গলাদেশ লুণ্ঠিত ও মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের নিধন বর্ণিত হইয়াছে। [২০] তাতেও মানকর নায় মানকরার কথাই উল্লেখ আছে, যেমন—

জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তলআর খুলিয়া তখন মারিলেখ তাখে।।
সেইক্ষণে তবে ঘটাবট্টি হইল।
জতগুলা আইসাছিল সবগুলা মইল।।
..... মানকরা মোকামে জছি ভাস্কর মইল।
মনসুরা দউড়াইয়া কবি গঙ্গারামে কইল।। [২১]

কিন্তু নাট্যকারেরা মানকরাকে মানকর বলে চালাতে চেয়ে সবই গোলমাল করে বসে আছেন। তবে এখানেও যে বর্গীদের আগমন ও অত্যচার সংঘটিত হয়েছিল তা ইতিহাস সত্যা।

এবার গ্রাম বাসীরা আরও বলতে চান যে, একসময় কলিযুগের সাক্ষাৎ ভগবান গৌরহরি শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাবার পথে এই গ্রামের বড় কালীর কাছে এক বিল্ব বৃক্ষতলে বিশ্রাম করেছিলেন তাই এখনও সেখানের এক বেদীতে ভোগ আরতি সহ উৎসব হয় এবং সে স্থান বিশ্রাম তলা নামে খ্যাত। বৈষ্ণবপদকর্তা চণ্ডীদাস নাকি এই গ্রামের রাসময় কবিরাজের বাড়িতে সাময়িক অবস্থান করেছিলেন। এই সব টুকরো টাকরা অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়ে গ্রামের প্রাচীনত্ব দাবী করা হয়।

যাক সে কথা— তবে গ্রামে এখন ও যে সব প্রাচীণ দেব কীর্তি ও মন্দিরাদি বিস্তৃত রয়েছে তা কমকরেও তিনশ বছরের অধিক প্রাচীণ তাতে সন্দেহ নাই। তাছাড়াও চৈতন্য সহপাঠী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক অধ্যাপক রঘুনাথ শিরোমণি এখানকার লোক হওয়ায় এই গ্রাম যে ৫০০ বছরের অধিক প্রাচীণ তাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আরও বলা যায় অজয় দামোদর বেষ্টিত গোপভূমের বহুপ্রত্ন ক্ষেত্রেই তাম্রশ্মীয় সভ্যতার (খ্রীঃ পূর্ব ১৫০০-১২০০ সময়কালের) নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই এলাকা যে সেই সভ্যতার স্মারক বুকে নিয়ে বিস্তৃত হয়েছিল তা সহজেই বলা যায়। সেদিক থেকে গোপভূমের এই প্রাচীণ গ্রাম মানকরও যে প্রাচীনত্বের ঐতিহ্যবাহী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেবকীর্তি তথা পুরাকীর্তি ঃ— গ্রামের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধেব বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে সাধারণত গ্রামের দেব কীর্তি তথা পুকাকীর্তির মাধ্যমে। সে দিক থেকে এই গ্রাম যে বিশেষ ঐতিহ্যবাহী তাব প্রমাণ গ্রাম পরিক্রমাকালেই পেয়েছি। গ্রামটি ১৮টি পাড়ায় একদা বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি পাড়াই সমৃদ্ধির অত্যুচ্চ শীর্ষে অবস্থিত থাকায় গ্রামের প্রায় সকল পাড়াতেই নানান দেবকীর্তি ও পুরাকীর্তির নিদর্শন প্রচুব পবিমানে ছড়িয়ে আছে যা সচরাচর বহু গ্রামেই দেখা যায না। তাবা এত ব্যাপক যে তাদেব সামগ্রিক বিববণ এখানে দেওযা সম্ভব নয় তবুও তাদেব মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য কিছু পুরাকীর্তির কথা এখানে বিধৃত হল।

আনন্দময়ীমা— কবিরাজ পাডায় বর্ধমান বাজপবিবারের পারিবারিক চিকিৎসক কবিরাজ বংশ এককালে খুবই বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার ছিলেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী মার মন্দিব অমরার গড় থেকে মানকরে ঢোকাব মুখে পাকা রাস্তার দক্ষিণে বিস্তৃত এলাকা নিযে অবস্থিত। মন্দিরটি চারিদিকে উচু পাঁচিল দিয়ে ঘেবা। দক্ষিণ দুয়ারী বাংলা খড়ের চালের অনুকরণে এক সুন্দর কারুকার্য সম্বলিত, বঙ্গে বিরল গঠনের এই মন্দিরটি সহজেই যে কোন লোকের দৃষ্টি কাড়বে।

মূল মন্দিরটির সামনেই একটি প্রশস্ত আটচালা— যা এখন প্রায়ভগ্ন অবস্থায় এসে গেছে। এর গায়ে প্রস্তর ফলকে ১৭৬১ শকাব্দে ২২শে ফাল্গুন এটি তৈরী হয়েছিল বলে লেখা আছে। মন্দির সংলগ্ন আটচালা ছাড়াও বিরাট প্রাঙ্গন পাকা করে বাঁধান আছে। জনশ্রুতি এ ক্ষনেই কোন সাধক সাধিকার সমাধি আছে। আটচালার পুর্ব দিকে গেট খুললেই বাঁধানো ঘাট সহ বিরাট পুষ্করিনী দেখা যাবে যা, দেবসেবার জন্য খনন করা হয়েছিল। মূল মন্দিরের পশ্চিম দিকে ২টি মন্দিরে কৃষ্ণ বর্ণের শিবলিঙ্গ এবং পূর্ব দিকে ১টি মন্দিরে শ্বেতবর্ণের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মূল মন্দিরটির গাত্রে প্রস্তরফলকে প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে ১২২২ সাল, ২রা ফাল্গুন মঙ্গলবার মাঘীপূর্ণিমা-শকাব্দ ১৭৩৭ উল্লেখিত আছে।

উচু দাওয়ার জল বারান্দা, ভিতরে বারান্দা সহ গর্ভমন্দির-যার মধ্যে উত্তর দেওয়ালের মাঝবরাবর একটি খাঁজে মায়ের মূর্তি অধিষ্ঠিত। কালোকষ্টি পাথরের ভোলা নাথ নীচে শায়িত তার নাভি কুণ্ড হতে উত্থিত প্রস্ফুটিত পাথরের শ্বেত পদ্মের উপর কষ্টি পাথরের সৃষ্টি অনন্য গঠনের লোল জিহ্বা, করাল বদনী, কালী মূর্তি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। মা চতুর্ভুজা, চারহাতেই মাকালীর মতই প্রহরণ ধারী ও ববাভয় দাত্রী। গলায় মুণ্ডখালা। দেবী মূর্তি উচ্চতায় ২$^{১}/_{২}$ ফুটের মত। মাকালীর ধ্যানেই ধ্যান ও পূজা হয়ে থাকে। দেবীর নিত্য পূজাও সন্ধ্যারতি হয়। তাছাড়া বছরের অন্যান্য সময় যেমন কালী পূজার দিন, ফল হারিনী ব্রত্যের দিন ও শারদীয়া নবমী এবং জগদ্ধাত্রী পূজার দিনেও ছাগ

বলি সহ বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। সন্ধ্যায় ভোগ আরতির পর মন্দিরের প্রধান ফটকও বন্ধ হয়।

দুর্গামণ্ডপ ও কবিরাজ বাড়ি— একদা মানকেরর প্রখ্যাত জমিদার রাজবৈদ্য কবিরাজদের বসতবাড়ি আনন্দময়ী মন্দিরের দক্ষিণ থেকেই শুরু। বিরাট বিস্তৃত এলাকা নিয়ে এদের বসতবাড়ি। বাড়ির অন্দরমহলের পশ্চিমে চারিদিকে দ্বিতল বাড়ি দিয়ে ঘেরা, মাঝে বিস্তৃত উঠান সহঠাকুর বাড়ি। এই অন্দর সংলগ্ন ঠাকুর বাড়িটি আসলে দুর্গা মণ্ডপ। এখানে পর্যায় ক্রমে দুর্গা, জগদ্ধাত্রী বাসন্তী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি বিভিন্ন শাক্ত দেবীর পূজা হয়ে থাকে। এছানা এই দুর্গামণ্ডপের উত্তরে লিচুতলায় একই গঠনরীতিতে তৈরী মন্দিরে নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্বে ঠাকুর বাড়ির সংলগ্ন উপর ও নীচের সমস্ত ঘরেই অতিথি অভ্যাগত, কুটুম্ব সজ্জনের জমজমাট অবস্থান হত এবং তা বালা খানা হিসাবেই পরিচিত ছিল। এখন সে কথা ইতিহাস হয়ে গেছে। দ্বিতলের বহু ঘরই এখনভগ্ন হতে বসেছে। এ বাড়ির যাবতীয় পূজা পার্বণ এখনও চলছে তবে অতীতের সেই জৌলুস আর নাই।

গ্রামের প্রভাব শালী ব্যক্তিত্ব অগ্রজ প্রতীম·শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তথা এই বাড়ির বহু দেব বিগ্রহের পূজক জগবন্ধু চক্রবর্তী সঙ্গে থাকায় তিনি আমায় অন্দর মহলে নিয়ে যান। অন্দর মহলও একই গঠনের বিরাট চকমিলন ত্রিতল বাড়ি, মধ্যে উঠান। এখনও এখানে এই পরিবারের যারা থাকেন তারা হলেন—ঁসত্যেন কবিরাজের স্ত্রী দীপালি কবিরাজ, জগন্নাথ কবিরাজ, তারকেশ্বর কবিরাজ, পাঁচুগোপাল কবিরাজ ও বাণীকণ্ঠ কবিরাজ। বাড়ির বিধবা বধূ দীপালি কবিরাজ অন্দরের খড় বাড়িসহ চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা বহু বাড়ি, বাঁধানো ঘাট সহ পুষ্করিনী, বিরাট বিরাট ভগ্ন বাড়ি ভোগ মন্দির সবকিছুই ঘুরিয়ে দেখালেন এবং তাঁদের বংশের অতীত গৌরব গাথা শোনাতে গিয়ে বেশ কিছু সময় আবেগে অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলেন। তাদেরই একটি বড় পুকুরের উত্তর অংশে জলের উপরচাঁদনীর মতদেখা গেল যেখানে পুরুষেরা বৈঠকী জমলিস বসাতেন। ঠাকুরবাড়ি বা বালা খানার পশ্চিমে উঁচু ভগ্ন বাড়ির ধ্বংস স্তূপ দেখা গেল যেখানে বিচার সভা বসত তা এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা। এখানেই কবিরাজদের প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বৈদিক মহাবিদ্যালয় ছিল বছর ১৫ আগেও তার ভগ্নাবশেষ দেখা যেত।

লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ— এও এক বিরাট আঙ্গিনা ঘেরা বিষ্ণুমন্দির। এক সুদৃশ্য তোরণ অতিক্রম করে এর প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে হয়। মূল মন্দিরের সামনেই কারুকার্য খচিত আটচালা— যা কিছু দিন আগে সংস্কৃত হলেও আবারও সংস্কারের প্রয়োজন আছে নচেৎ খুব বেশী দিন আত্মরক্ষাকরতে পারবে বলে বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় না।

পূর্বদুয়ারী বিষ্ণু মন্দির। মন্দির গাত্রে সূক্ষ্ম কারুকার্য। ভিতরে বিরাট সিংহাসনে

দেব বিগ্রহও নারায়ন শিলা বর্তমান। একই মন্দিরের উত্তরের প্রকোষ্ঠে আকারে বড় ঘন কৃষ্ণ বর্ণের মসৃণ শিব লিঙ্গ। উভয় বিগ্রহেরই নিত্য পূজা হয়। মন্দির গাত্রে প্রতিষ্ঠা লিপিতে দেখা গেল যে, মন্দিরটি ১৭৮৭ শকাব্দে অর্থাৎ বাংলার ১২৭২ সালে সৃষ্ট। এই মন্দির চত্তরেই নাট মন্দিরের উত্তরে দক্ষিণ দুয়ারী এক বারান্দা হস বাসন্তী মন্দির রয়েছে। যেখানে পূর্বে চৈত্র মাসের বাসন্তী নবমীতে ধূমধামে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হত, এখন সেখানে ঘটেই পূজা হয়ে থাকে।

এখানে লক্ষনীয় বিষয় হল যে, একই চৌহদ্দিতে বিষ্ণু, শৈব ও শক্তি-হিন্দু ধর্মের তিনধারারই সম্বনয় সাধিত হয়েছে। এই দেব বিগ্রহ গুলির প্রতিষ্ঠাতারা হলেন এখানকার দত্ত পরিবার যারা কোলকাতার বড়বাজারের প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র ব্যবসায়ী। শ্রদ্ধেয় চিন্ময় ও সুর্যকুমার দত্ত মহাশয়দের কোন পূর্বপুরুষ এই দেববিগ্রহ গুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বড়কালী— গ্রামে বড় কালী এক প্রাচীণ ও জাগ্রতা দেবী। এই দেবীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পাওযা যায় ৺রামানন্দ গোস্বামীর নাম। ইনি পঞ্চমুণ্ডির আসন করে দেবীর সামনে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে শোনা যায। জনশ্রুতি এই বড় কালী একবার সাধারণ নারী মূর্তি ধারণ করে এক শঙ্খকারের কাছে শাঁখা পড়ে বড়কালীর পূজকের কাছে তার মেয়ে শাঁখা পড়েছে বলে দাম নিতে বলায় শাঁখারী সেই মত দাম চাইলে পুজক অবাক হয়ে ছিলেন এই জন্য যে তার তো কোন মেয়েই নাই তবে কে শাঁখা পড়ল! সেই সময়ে নূতন পুকুরে দুহাত তুলে দেবী সেই শাঁখা দেখিয়ে ছিলেন। শাঁখা পড়ার এমন জনশ্রুতি বঙ্গে বহু দেবী সম্পর্কে চালু আছে। যেমন— বর্ধমানের ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা, মাহাতার মাবড়দুয়ারী, কল্যানেশ্বরীর মা কল্যানী ইত্যাদি।

বড়বাড়ি— গ্রামে পূর্বে এই বাড়িই ছিল প্রখ্যাত জমিদার বাড়ি। তাই এখনও এ বাড়ি বড় বাড়ি নামেই খ্যাত। এই বংশের শেষতম জমিদার ছিলেন বটুক নাথ ভট্টাচার্য। তিনি গত হওয়ার পর স্ত্রী রেনুবালা দীর্ঘ দিন এ জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন। এই বংশেই জন্মেছিলেন প্রখ্যাত সাধক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। তার সাধক জীবনের বহু অলৌকিক ঘটনার কথা আজও লোকের মুখে মুখে ঘোরে। এখানে তার একটির কথা উল্লেখ করি।

সাধক প্রবর বৈদ্যনাথ একদিন মনস্থ করলেন যে তিনি গ্রামের সকলকে তাদের ইচ্ছামত আহার্যে ভোজন করাবেন। সেই উদ্দেশ্যে গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হল। সেখানে বর্ধমান রাজ বংশের দীক্ষাগুরু রায়পুর মৌজার প্রখ্যাত জমিদারদেরও আহ্বান করা হয়। কিন্তু তারা এসে সাধককে বিপদে ফেলার জন্য অসময়ের ফল (কার্ত্তিক মাসে) তাল সাঁস থেকে চাইলেন। সাধক তার ইষ্ট দেবী মা কালীকে স্মরণ করে তাই খাইয়েছিলেন। এই ঘটনা গ্রামের এক কবি স্বর্গত ডাঃ কৃষ্ণপদ দাস তার কবিতায় উল্লেখ করে বলেছেন—

"এ গাঁয়ের এক ভট্টাচাজ
মায়ের সাধক বৈদ্যনাথ
ইচ্ছা ভোজন দিল সবারে।"

কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ— গ্রামের ভট্টাচার্য পরিবারে দুই কৃষ্ণ মাঝে রাধা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে অন্যান্য দেবদেবী সহ কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যসেবা চালু থাকলেও বছরে জন্মাষ্টমীর, দোল রাস, ঝুলন ইত্যাদি বিশেষ বৈষ্ণবীয় পর্ব সমূহ ধূমধামে পরিচালিত হয়ে থাকে।

আশেদের শিব মন্দির— এই মন্দির বেশ প্রাচীন। এর দেওয়াল গাত্রে বহু সুন্দর সুন্দরটেরা কোটার কাজ দেখা যায়। মন্দিরটি ভগ্নদশায় এসে গেলে এই বংশের এক দুহিতা শ্রীমতি আভাদ ১৯৯৫ খ্রিঃ এর সংস্কার করে দেন। মন্দির অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ বেশ বড় এবং সেখানে শিবের বাহন বৃষের প্রস্তর প্রতিকৃতি ও বর্তমান।

পাণ্ডবক্ষেত্র বা পানক্ষেত্রতলা— লোক শ্রুতি যে, মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবেরা তাদের অজ্ঞাত বাস কালে ঘুরতে ঘুরতে এসে এখানে কিছুদিন কালাতিপাত করেছিলেন এবং শক্তি সাধনাতে রত হয়েছিলেন। সেই স্মৃতি ধরে রেখে এখন ও এখানে শারদীয়া দুর্গোৎসবের নবমীর দিনে শাক্ত আরাধনা স্বরূপ পূজাদি হয়ে থাকে। পাণ্ডবদের স্মৃতি বাহক পাণ্ডবক্ষেত্র তলা এখন লোকমুখে পান ক্ষেত্র তলা হয়েছে।

পূর্বে এখানে এক দক্ষিণদুয়ারী ছোট্ট মন্দির ছিল তাবেশ বোঝা যায় কারণ বৃহৎ এক বট বৃক্ষ তার ডাল পালা ও নামাল দ্বারা সেই মন্দিরের ধ্বংস ঘটালেও তার গর্ভগৃহকে এখনও আচ্ছাদন করে আছে- এমনিকি সেই ছোট প্রকষ্ঠের সরদলটিও বটবৃক্ষের দ্বারা ধরা আছে— ফলে জায়গাটি দেখতে বেশ মনোরম হয়েছে। তাই বলি এটি ঐতিহাসিক স্থান বটে কিনা তা বলা না গেলেও এটি যে একটি দর্শনীয় স্থান তাতে সন্দেহ নাই।

এর সামান্য পশ্চিমে রয়েছে এক মসজিদ। সেখানে নমাজের পূর্বে মুসলমানেরা যাতে উজু করার নিমিত্ত জল পায় তার জন্য এই গ্রামের রায়পুর মৌজার উদার হৃদয় জমিদার হিতলাল মিশ্র মসজিদ সংলগ্ন পূবের এক পুষ্করিনী মুসলমানদের দান করেছিলেন। তিনি মসজিদ নির্মান ও তার ব্যায়নির্বাহের জন্য নিষ্কর জমিও দান করেছিলেন।

জীবনগোস্বামীর ভিটে— এবার গ্রামের এক উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব জীবন গোস্বামীর কথায় আসি। সংসার চক্রে পিষ্ট হতে হতে হতদরিদ্র জীবন গোস্বামী নিজ ইষ্টের কাছে বড় হওয়ার বাসনা জানালে দেবতা তাকে স্বপ্নে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ তাঁর প্রখ্যাত কবিতা 'স্পর্শমনি' তে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আমি গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজার মতই কবির কথাতেই তা ব্যক্তকরি। সাধক জীবন

গোস্বামী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হাঁটতে হাঁটতে বৃন্দাবনের যমুনাতীরে যেখানে সনাতন গোস্বামী সাধনায় রত, সেখানে উপস্থিত হলেন—

হেন কালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরনে এসে
কবিল প্রণাম।।
শুধালেন সনাতন কোথা হতে আগমন,
কি নাম ঠাকুর।"
বিপ্রকহে কিবাকব পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহুদূর।
জীবন আমার নাম মান কবে মোব ধাম
জিলা বর্ধমানে,
এত বড়ো ভাগ্য হত দীনহীন মোর মত
নাই কোন খানে।

এই বলে ব্রাহ্মণ তার হীন অবস্থাব থেকে পবিত্রান পাওয়ার জন্য তার ইষ্টদেব যে তাকে এখানে পাঠিয়েছেন এবং তারই দ্বারা ব্রাহ্মণের অভাব মোচন হবে জানালে সনাতন অবাক হয়ে বলেন—

শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন
"কি আছে আমার
যাহাছিল সে সকলি ফেলিযা এসেছি চলি
ভিক্ষামাত্র সার।।"
সহসা বিস্মৃতি ছুটে সাধু ফুকারিযা উঠে
ঠিক বটে ঠিক
একদিন নদী তটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ মাণিক।
যদি কভুলাগে দানে সেই ভেবে ঐখানে
পুঁতেছি বালুতে
নিয়ে যাওহে ঠাকুর দুঃখ তব হবে দুব
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"
বিপ্রতারাতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মনি
ব্রাহ্মণবালুর পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোল গানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে।

নদী পারে রক্ত ছবি দিনান্তের ক্লান্তরবি
গেল অস্তাচলে।
তখন ব্রাহ্মণ উঠি সাধুর চরনে লুটে
কহে অশ্রু জলে।।"
যে ধনে হইয়া ধনি মনিরে মান না মনি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নত শিরে" এত বলি নদী নীরে
ফেলিলা মাণিক।

এই ভাবে ভক্ত প্রবর জীবন গোস্বামী সাধু সনাতনের পূত স্পর্শে যে পরম ধনের সন্ধান পেয়েছিলেন সেই জীবন গোস্বামীর বাড়ি ছিল এই গ্রামে বর্তমান ঘড়ুই পাড়ায়। সাধকের বাড়িতে ছিল একটি বিষ্ণু মন্দির যা অধুনা লুপ্ত। কিন্তু মন্দির লুপ্ত হলে কি হবে, ভিটের চিহ্ন না থাকলেই বা কি এসে যায়, সাধকের স্মৃতি বিজড়িত সেই আবাস স্থল এখন লোক মুখে 'গোঁসাই বেড়া' নামেই খ্যাত।

প্রসঙ্গত বলি বৃন্দাবনে গিয়ে শুনেছি জীবন গোস্বামী কর্তৃক যমুনায় পরশ পাথর ফেলে দেওয়ার সংবাদ তদানিন্তন ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব শুনে বেশ কিছু হাতির পায়ে লোহার শিকল বেঁধে যমুনা তোলপাড় করিয়েছিলেন সেই পরশ পাথর পাওয়ার আশায় কিন্তু তা তিনি পাননি, তবে কোন এক হাতির পায়ের শিকল যে সোনা হয়েছিল তা শোনা যায়।

সভাভরণ মাঠ— আনন্দময়ী মায়ের মন্দির পার হয়ে পাকারাস্তা ধরে কিছুটা পূর্ব দিকে গেলে একটি মজে যাওয়া বড় পুষ্করিনী দেখা যায়। জনশ্রুতি এর পাড়েই বর্গীদের সভা বসত। এমনই কোন এক সভা থেকে মারাঠা সর্দারভাস্কর পণ্ডিতকে এখান থেকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে স্থানটি সভাহরণ তা থেকে সভাভরণ নামে নামিত হয়েছে।

মনসামন্দির— মান করের কুম্ভকার পাড়ায় যুগী নাথ সম্প্রদায়দের পূজ্য মনসা মন্দির বর্তমান, যেখানে ধুমধামে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বিষ্ণুমন্দির— মানকর গ্রামের পূর্ব পাড়ায় একটি পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট সুন্দর টেরা কোটার কাজে সুসমৃদ্ধ ভগ্ন বিষ্ণু মন্দির বর্তমান। মন্দিরটি দ্বিতল এবং উপরে ওঠার সিঁড়িও আছে। বর্তমানে মন্দির অভ্যন্তরে কোন বিগ্রহ নাই, তাই ভক্তসমাগম সেখানে হয় না ঠিকই কিন্তু মন্দির গাত্রে টেরাকোটা শিল্পের অনন্য সমাবেশ সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ণণ করে। তাই শিল্প রসিকদের কাছে এর আকর্ষণ দুর্নিবার।

ধর্মরাজ চাঁদরায়— এবার আসাযাক ধর্মরাজের কথায়। একদা বৌদ্ধদেবতা বিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তিত হতে হতে এখন লৌকিক দেবতায় পর্ববসিত হয়েছে। সেই লৌকিক

দেবতা ধর্ম রাজ প্রায় সব গ্রামেই বিভিন্ন নামে বিরাজিত। এই গ্রামের দক্ষিণে চাঁদ রায় তলায় এক উত্তর মুখী মন্দিরে ধর্মরাজ চাঁদ রায়ের অবস্থান। মন্দিরের সামনে রয়েছে বাঁধান আট চালা। পূর্বে এখানে যথা নিয়মে গাজনাদি উৎসব পালিত হত কিন্তু আর তা হয় না।

বাঁকুড়া রায়— গ্রামের দক্ষিণে রেললাইনের কাছাকাছি পূর্ব দুয়ারী এক আর এক মন্দিরে ধর্মরাজ বাঁকুড়া রায়ের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। মন্দির অভ্যন্তরে বাঁকুড়া রায়ের কূর্মাকৃতি প্রস্তর মূর্তি। সহ অবস্থানে রয়েছে আরও কিছু মূর্তির সঙ্গে দুটি কাল পাথরের বৌদ্ধ মূর্তি। মন্দিরের সামনে নতুন সংস্কৃত নাটমন্দির বর্তমান।

মন্দিরের দক্ষিণ গায়ে আর এক ছোট মন্দিরে এখানকার ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠাতা কোন পুরুষের স্মৃতি সৌধ বর্তমান। সেই পূর্ব পুরুষ সম্পর্কে জনশ্রুতি যে তার সঙ্গে এখানকার ধর্মরাজ বাঁকুড়া রায়ের বিশেষ সখ্যতা ছিল। এখানেও পূর্বে গাজনউৎসব হত কিন্তু এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে। এই ধর্মরাজতলার উত্তরে একটি সাধারণ শিব মন্দিব বর্তমান।

পালপাড়ার শিব মন্দির— মানকরের পাল পাড়া একটি উল্লেখ্য পাড়া। কারণ মানকরে তিনসম্প্রদায়ের একদা বিশেষ বাড়বাড়ন্ত ছিল। মানকর গ্রাম বলতে মুখ্যত তাদেরকেই বোঝাত। সেই তিন সম্প্রদায় হল— পাল ভট্টাচার্য ও খাঁ। এক চলতি প্রবাদেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে—

"পাল ভট্টাচার্য খাঁ
তিন নিয়ে মানকর গাঁ।।"

তা সেই উল্লেখ্য পালপাড়ায় একটি রেখ দেউলের রীতিতে তৈরী বড় শিব মন্দির বর্তমান। মন্দিরটির গায়ে পোড়া মাটি বা টেরাকোটা শিল্পের বিশেষ নিদর্শন লক্ষনীয়। অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গটিও বেশ বড়।

পদচিহ্ন ধারক মন্দির— গোঁসাই পাড়ার গোপাল মিশ্রের বাড়ীর সন্নিকটে আগাছায় ঘেরা একটি উত্তর মুখী ছোট মন্দির— যার গর্ভে কোন বিগ্রহনাই কিন্তু রয়েছে ২টি পদচিহ্ন। কার পদচিহ্ন বুকে নিয়ে এই মন্দিরের অবস্থান তা আজ সঠিক জানা না গেলেও ২টি পদ চিহ্নের জন্যই মন্দিরটি পদচিহ্ন ধারক মন্দির রূপে খাত হয়েছে।

কুণ্ডু পাড়ার শিব মন্দির— মানকরের রায়পুর মৌজার কুণ্ডুপাড়ায় কলুগড়ের গায়ে যা আটঘরের কলু বলে খ্যাত সেখানে একটি দর্শনীয় শিব মন্দির বর্তমান, যাকে দেউল বলা হয়। মন্দিরটি টেরাকোটার অলংকরনে অনবদ্য। এতে যেমন আছে অনেক ফিরিঙ্গী সাহেব সৈনিকদের ছবি তেমনি রয়েছে পঞ্চতন্ত্রের ছবি সহ বহু পৌরানিক বিষয়ের ছবি। ফলে মন্দিরটি সত্যই দর্শনীয় তথা মনমুগ্ধকর। রেখদেউল রীতিতে তৈরী মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ বর্তমান।

এই মন্দিরের দক্ষিণেই গ্রামের এক প্রখ্যাত সাধু (রাম কৃষ্ণমঠের) স্বামী তপানন্দ মহারাজদের কেনা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই গ্রামের অন্যত্রেও তাঁদের সাবেক বাড়ি বর্তমান।

মানকরের রায়পুরে পঞ্চরত্নের বিষ্ণুমন্দির— এখানে পূর্ব দুয়ারী একটি পঞ্চচূড়ার বিষ্ণুমন্দির রয়েছে যার গর্ভে বিষ্ণুর শালগ্রাম শিলা বর্তমান। মন্দিরটি গঠনে তেমন কোন শৈল্পিক নিদর্শন না থাকলেও এটি যে প্রাচীন মন্দির তাতে সন্দেহ নাই। মূল মন্দিরের চারিদিকে যাতায়াতের জন্য উচু বারান্দা ছিল বর্তমানে সেই যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরটির সংস্কার এর কাজ অল্প বিস্তর হয়েছে তবে পরিপূর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন।

মন্দিরের বিগ্রহ শালগ্রাম শিলাকে রথে নিয়ে রথ যাত্রার দিনে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়, তার জন্য একটি সুবৃহৎ পিতলের রথ বর্তমান। রথটি লোহার ফ্রেমে আগাগোড়া পিতলের চাদরের মোড়কে তৈরী তাই এটি বঙ্গের আর পাঁচটি পিতলের রথের সমগোত্রীয়। এই পিতলের রথটির গায়ে বনকাটির রথের মত তেমনকোন শিল্প নিদর্শন নাই। এটি উচ্চতায় প্রায় ১১ফুটের মত এবং তিন স্তরে বিস্তৃত। উপরের চূড়ার মধ্যেই পিতলের সিংহাসন যুক্ত। তাতেই শালগ্রাম শিলা বসিয়ে রথকে গ্রাম পরিক্রমা করানো হয়। উপরের থাকে রথের রশ্মি ধরে সারথী গড়ুর পাখী।

রথের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিতে যা লেখা আছে তাতে দেখা যায়— "শ্রী শ্রী লক্ষ্মী জনার্দন দেবের রথ। শ্রীমাধব চন্দ্র কর। সাং-মানকর, রাইপুর। শিল্পী মিস্ত্রি-কেদার নাথ দে, মানকর। সন ১৩১৮, ১০ই আষাঢ়।"

অন্যান্য জায়গায় পিতলের রথ যে দেখা যায় না তা নয়- যেমন বর্ধমান জেলার ভাতাড় থানার এরুয়ার গ্রামে গ্রাম্যদেবী সোনার কালীকে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমার জন্য পিতলের রথ আছে কিন্তু তা নির্মিত হয়েছে কোলকাতায়। অন্যদিকে বর্ধমানের বনকাটি গ্রামেও রয়েছে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হিসাবে পঞ্চচূড়ার মন্দিরের আকারে শিল্প সুষমায় মণ্ডিত বিরাট পিতলের রথ কিন্তু তার প্রস্তুত কারক মিস্ত্রীরা যে কোথাকার শিল্পী তার কোন হদিস নাই। সেদিক থেকে এখানকার রথের নির্মাতা এই গ্রামেরই লোক এবং এটা খুবই গর্বের বিষয় যে পিতলের রথ নির্মান করার মত দক্ষ কারিগর বা শিল্পী ও এই গ্রামেই ছিল।

বিশ্বাসদের দুর্গাবাড়ি ও বাসভবন— মানকর গ্রামের পশ্চিমে বিশ্বাসরা ছিলেন মানকরের আর এক প্রখ্যাত জমিদার। তাদের বিশাল রাজকীয় বাড়ি এখনও সগর্বে বিরাজমান। এদের পারিবারিক দুর্গামণ্ডপটি দেখার মত। পূর্বে বিশাল ধুমধামে এখানে শারদীয়া উৎসব পরিপালিত হত। দুর্গোৎসব ছাড়াও এ বাড়িতে অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে নিত্যসেবিত কুলদেবতা নারায়ণ শিলাও পূজিত হত। বংশানুক্রমিকভাবেই এখানে

অনেক দেবদেবীর পূজা চলে এলেও তাদের সেই জৌলুস আর নাই। এদের দুর্গাবাড়ি ও বসতবাড়ির নির্মাণ শৈলী অনুপম।

এ বাড়ির প্রাচীন পুরুষদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহেশ বিশ্বাস। ইনি কাশ্মীব রাজ স্টেটের দেওয়ান পদে কর্মরত ছিলেন। একদা এই মানকর গ্রামে মুগো সুতো অর্থাৎ মাছধরার সুতোর রমরমা কারবাব ছিল। এখানে পলুকীট চাষের ব্যাপক প্রচলন ছিল, যা থেকে রেশম তৈরী হত। সেই পলুকীটকে কিভাবে প্রতিপালন ও তা থেকে ব্যাপক রেশম উৎপাদন করা যায় সে বিষয়ে খুঁটিনাটি কলাকৌশল নিয়ে এই বিশ্বাস পরিবারের মহেশ বিশ্বাস 'কীটকৌতুক' নামে একটি বই লিখেছিলেন।

শোনা যায়, তারামায়ের দামাল ছেলে বামাক্ষেপা ও তিনি একই গুরু কৈলাসপতির মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। তিনি একদা হিমালয় পর্বতশীর্ষে শৈবতীর্থ অমবনাথ দর্শনে গিয়ে পরমযোগী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মাতার সাক্ষাৎ পান। যিনি পূর্বাশ্রমে ছিলেন নেপালের রাজকন্যা। তিনি মহেশ বিশ্বাসের অনুরোধে তাব মানকর বাড়িতে কিছুদিন থাকাকালীন স্থানীয় বহু কাণ্যকুব্জীয়দের দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনিই অম্বিকাকালনার ছোট দেউরী এলাকায় ১৩৪০ সালের ১৪ই আষাঢ় 'আনন্দআশ্রম' প্রতিষ্ঠা কবেন যা আসলে একটি মহিলা সন্ন্যাস আশ্রম। আশ্রমটি এখনও মহিলা সন্ন্যাসীদের দ্বারা চালিত হচ্ছে।

রাধাবল্লভ জিউ এর নবরত্ন মন্দির— এই রাধা বল্লভ জিউ এব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত ছিলেন বর্ধমান রাজ পরিবাবের গুরু বংশ। এই বংশের ইতিহাসের সঙ্গে মানকরের ইতিহাস অনেককাংশে জড়িত তাই এই বংশের পূর্ব পুরুষদেব বংশ পরিচয়ের কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। যতটুকু জানা যায় এই বংশের প্রথম দিকের পূর্ব পুরুষরা হলেন বদলে দুবে, মনোরথ দুবে ও শ্রীকান্ত দুবে। এদের মধ্যে শ্রীকান্ত দুবে রাধা বল্লভী সম্প্রদায়ের কাছে দীক্ষানিয়ে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় স্থিতু হন। তারপর ঐ বংশের যে পুরুষদের নাম পাওয়া যায়-তারা হলেন মধুসূদন, নিহারীদাস ও শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

শ্যামসুন্দরই বর্ধমানের রাজা জগৎরাম রায় ও তার স্ত্রীকে দীক্ষা দিয়ে মানকরের পাশে খাণ্ডারী গ্রামে বসবাস করেন। এই শ্যামসুন্দর গোস্বামীর পুত্র ভক্তলাল গোস্বামী বর্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্র ও চিত্র সেনকে দীক্ষাদিয়ে আপন মন্ত্র শিষ্য বর্ধমানাধিপতি রাজা কীর্তিচন্দ্র বাহাদুরের স্থানে সন ১১২৯ সালের ১৪ই চৈত্র তারিখের সনন্দানুসারে ব্রহ্মোত্ত পাইয়াছিলেন।" (২২)

এখন কনৌজ বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজগুরু ভক্তলাল গোস্বামীই মানকর রায়পুরেব প্রধান জমিদার হয়ে মানকরে ১১৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন রাধা বল্লভএর নবরত্নের মন্দির সহ বিগ্রহ। এই ভক্তলাল গোস্বামীর প্রপৌত্র হলেন অজিতলাল গোস্বামী এবং অজিতলালের দৌহিত্র হিসাবে পাই হিতলাল মিশ্রকে। হিত লাল মিশ্র শিক্ষানুরাগী

ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এখানে একটি টৌল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নিজবাসভবনে 'ভাগবতালয়' প্রতিষ্ঠা করে বহু ধর্মীয় গ্রন্থের সংগ্রহ শালা তৈরী করেছিলেন। বহু হাতে লেখা মূল্যবান পুঁথিও সংগৃহীত হয়েছিল। তিনি নিজে গীতার ভাস্য ও রচনা করেছিলেন। যার কথা সাহিত্যে সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি খুবই উদার হৃদয়ের ব্যক্তি ছিলেন।

এই হিতলাল মিশ্রের দৌহিত্র ই হলেন রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত; তিনিই বাংলার প্রথম জমিদার, যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ (১৯০৫ খ্রিঃ) করেন।

ভক্তলাল গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ জিউ এর মন্দির এখন ভগ্নঅবস্থায় পরিণত হয়েছে। মন্দিরে দেবতাও নাই। মন্দিরটি বিরাট গ্রথিক থামের উপর গঠিতচারদিকে বারান্দা সহ সুন্দর গঠনের এক অনন্য মন্দির। এর গঠনের সঙ্গে বর্ধমানের রাজাদের দাঁইহাটের সমাজ বাড়ির গঠনশৈলীর কিছুটা মিলখুঁজে পাওয়া যায়। মন্দিরের সামনেই পশ্চিমদিকে একটি বিরাট আটচালা ছিল। বর্তমানে তা ভেঙে পড়ছে। এরই পশ্চিমে জমিদারদের বসত বাড়ি 'রঙমহল' এখন ভগ্নপ্রায়। জমিদারদার বাড়িও মন্দিরের দ্বিতল প্রবেশ পথে নহবতখানা ছিল। মন্দিরটি এতদঅঞ্চলের মধ্যে বিরল গঠনের নবরত্নের মন্দির ছিল। মন্দিরের উপরে বড় বড় গোলাকার চূড়াগুলি চারিদিকে মূলচূড়াকে ঘিরে রয়েছে, অন্যান্য নবরত্নের মন্দির থেকে এর গঠন স্বতন্ত্র। মূলচূড়ায় ওঠার জন্য চূড়াবরাবর একটি লোহার শিকল সেট করা আছে— যা ধরে উপরে ওঠা যায়। মন্দিরটি সত্যই দর্শনীয় বস্তুছিল কিন্তু বর্তমানে তা কালের কবলে পড়ে ধুঁকছে।

মূল মন্দিরের পূর্ব দিকে দ্বিতল বিশিষ্ট এক দক্ষিণদুয়ারী বড় বাড়ি রয়েছে যাতে পূর্বে সাধু সন্ন্যাসীরা এসে আশ্রয় ও বিশ্রাম নিতেন, তাই এখনও ঐ বাড়ি সাধুনিবাস নামে খ্যাত। এখানে একটু পুর্ব দিকে আট কোনাকৃতি এক শিব মন্দির বর্তমান রয়েছে।

কৃষ্ণগঙ্গা— রংমহলের নিকটেই রয়েছে একটি বিরাটাকার দিঘি যার নাম কৃষ্ণগঙ্গা। শুরুতে এর চারদিকে ঘেরা ছিল এবং তিনটি করে মোট ১২টি বাঁধানো ঘাট ছিল এবং প্রতিটি পাড়ে একটি করে ছিল প্রবেশপথ বা গেট তাতে প্রহরী পাহারায় থাকত। বর্তমানে সেই সব ঘেরা ও গেটের হদিস না থাকলেও দক্ষিণ পাড়ে এখনও তার কিছু চিহ্ন দেখা যায়। এছাড়াও গ্রামে অনেক বড় বড় দিঘি বা সায়ের আছে, তাদের মধ্যে এক ভিনদেশী শিষ্য এই গ্রামের গুরু উত্তম আচার্যের নির্দেশে গুরুর নামে খনিত উত্তম সাগর ও গুরুমাতার উদ্দেশ্যে খনিত ঠাকরুণ পুকুর নামে ২টি বড় পুকুর ও গ্রামে রয়েছে। শোনাযায় সেই শিষ্যই ছিলেন দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ।

সতী মন্দির— এখনকার দিনে সতীমন্দির শুনলে মনটা মুচড়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু তখনকার দিনে সতী হওয়া একটা পূণ্যের ব্যপার ছিল আর মানসিকতাও ছিল ভিন্ন।

সেদিক থেকে প্রাচীন গ্রাম এই মানকবে বেশ কয়েকটি সতী মন্দিরের উল্লেখ পাই। যেমন— মাড়ো যেতে একটি বড় পুকুরের উত্তর পাড়ে একটি সতীমন্দির দেখা যায়। যেমন্দিরের গায়ে অন্নপূর্ণ দাসী নাম উল্লেখ রয়েছে। পূর্বে বুড়ো পুষ্করিনীর পাড়ে ১২১৪ সালে কোন মহিলা সতী হয়েছিল সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়াও ঢোল সমুদ্র পুষ্করিনীর পাড়েও অনুরূপ সতী হওয়ার স্মারক দেখা গেছে।

খ্রিস্টান মিশন— গোপভূমের মধ্যে একমাত্র খ্রিস্টান মিশনটি এই মানকরেই ১৯১০ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানকরের পশ্চিমে রাইপুর এলাকার মানকরের মান্য ব্যক্তি রাজগুরু ভক্তলাল গোস্বামীদেব 'বড়বাগান'টি তৎকালীন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর ভগ্নী মিস হার্ডিঞ্জ ক্রয় করে সেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার মানসে একটি বালিকা অনাথ আশ্রম খুলেছিলেন। উক্ত আশ্রমটি "জেনানা চার্চ অফ মিশনাবী" বা Church of England Zenana Missionary Society নামে পরিচিত হয়। এটি যেহেতু জেনানা বা মহিলাদের আশ্রম তাই এটি বরাবর পরিচালিত হত তিনজন ইউরোপীয় মহিলা (মেম) দ্বারা। এর ব্যয়ভার সরাসরি ইংল্যান্ড থেকেই পরিবাহিত হত।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসানের পর মিশনটি উঠে গেছে। তবে সেখানে 'S.T. LUKE'S CHURCH' নামে এক চার্চ এখনও বর্তমান এবং অল্পকয়েকঘর খ্রিস্টান ও সেখানে রয়েছে। একদা এই মিশনে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল।

ব্যবসা বাণিজ্য ঃ একদা গোপভূম পরগনার প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র ছিল এই মানকর। এখানকার তাম্বুলী সম্প্রদায় ধান-চালের ব্যবসা করে প্রভূত বৃত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। তখনকার দিনে গোপী নাথ দত্ত তামাকের ব্যবসায়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই গ্রামের দত্তদের কোলকাতার বড় বাজারে ব্যবসা ছিল এবং এখনও আছে। মানকরের দত্তরা ছাড়াও কুণ্ডুরাও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। ইংরাজ কুঠিয়ালদের দেখা দেখি এখানে নীলের চাষ ও ব্যবসা বেশ উন্নত ছিল। তখনকার দিনে তাম্বুলীরা ছাড়াও প্রখ্যাত জমিদার হিতলাল মিশ্রেরও অনেক নীলকুঠি ছিল এবং কুণ্ডদের ছিল লক্ষার কারবার

শিল্প ঃ একসময় মানকর সম্পর্কে একটি প্রবাদ বাক্য চালু ছিল, সেটি হল—

পড়ে তসর খায় ঘি
তার আবার খরচ কি?

অর্থাৎ তসর শিল্প এখানে এক সময় খুবই উন্নত ছিল। অন্যদিকে গোপভূম পরগনা হওয়ায় গোপেদের পোষ্য গোসম্পদের প্রাচুর্যে ঘি-দুধের ও অভাব ছিল না, ফলে এখানকার লোকেরা তখন 'দুধে ভাতে'ই ছিল। ঘরে ঘরে তাঁতে মানকরের তন্তু বায়েরা উন্নত মানের তসর বস্ত্র ও বেনারসী চেলী তৈরী করত। এখন হয়ত এসব কথা গল্প বলেই মনে হবে কিন্তু

সত্যই এক সময় ছিল, যখন হাজার হাজার তাঁতে চলমান শব্দে এই গ্রামের বাতাস মুখরিত হত।

এই গ্রামের 'কতুনি'র খুব নাম ডাক ছিল। কুতনি হল সুতী সহ রেশমের সংমিশ্রণে তৈরী এক ধরনের কাপড়। এক সময় মাছ ধরার সুতো, যাকে 'মুগো' বলে তা উৎপাদনে বঙ্গের মধ্যে মানকেরর একধিপত্য ছিল। পলুকীটের চাষ— যা থেকে রেশম তৈরী হত তারও ব্যাপকতা ছিল এই গ্রামে। এই গ্রামে গহনা শিল্প-বিশেষ করে গহনার ডাইস তৈরীতে এখানকার কর্মকারদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। এরা যেকোন সূক্ষ যন্ত্রপাতি তৈরীতে সিদ্ধহস্ত ছিল। পিতলের রথ তৈরী করার মত শিল্পীও এখানে ছিল।

মানকরের মিষ্টান্ন শিল্প খুবই উন্নত ছিল, বিশেষ করে কদমা ও তিনখাজা। এই কদমা এক সময়ে আকারে বিশেষ বড় ছিল কিন্তু অবক্ষয়ের যুগে পড়ে তা অবক্ষয়িত হতে হতে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে ডোমেদের মধ্যে ঝুড়ি ঝাঁজুরী, মোরা ইত্যাদি বোনার রেওয়াজ আগে ভালই ছিল এখনও তার রেশ দেখা যায়।

শিক্ষা ও সাহিত্য ঃ শিক্ষা-দীক্ষায় এই গ্রাম পূর্বেও বেশ উন্নত ছিল। কনৌজ ব্রাহ্মণেরা গ্রামে বিদ্যাভ্যাসের জন্য শুরুতে টোল খুলেছিলেন এবং তাতে বহু দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার জন্য গ্রামে আসতো। এই গ্রামে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে মধুসূদন গোস্বামী, হিতলাল মিশ্র ও শ্যামসুন্দর গোস্বামী তিন উল্লেখ যোগ্য জ্যোতিষ্ক। এছাড়াও গ্রামের কৈল্যাসনাথ ভট্টাচার্য, আদ্যনাথ ভট্টাচার্য, মদনমোহন সিদ্ধান্ত ও উত্তম ভট্টাচার্য রাও ছিলেন উল্লেখ যোগ্য পণ্ডিত। হিতলাল মিশ্র নিজগৃহে 'ভাগবতালয়' নামে একটি পাঠাগার তৈরী করেছিলেন এবং নিজে গীতার ভাষ্যও রচনা করেছিলেন— যা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। গ্রামের আর এক জমিদার মহেশ বিশ্বাস 'কীটকৌতুক' নামে এক পুস্তক রচনা করেছিলেন।

শিক্ষা-দীক্ষায় এই গ্রাম বর্তমানেও বেশ উন্নত। গ্রামে বর্তমানে ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১টি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ১টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক যার সূচনা পর্ব সূচিত হয়েছিল সেখানে একটি মহাবিদ্যালয়ও বর্তমান। স্বাধীনতা লাভের বর্ষে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পল্লীমঙ্গল' নামে এক পাঠাগার যা এখন সরকারী সহায়তায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতি ঃ গ্রামে লোক সংস্কৃতির চর্চা হিসাবে ভাদুর গান, ঘেঁটুর গান, মনসার ভাসান, শিবের গাজনের গান বা সংএর গান, পল্লীগীতির চর্চা আছে। সংস্কৃতির চর্চা হিসাবে যাত্রা, থিয়েটার বৈঠক গান ও নানান সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে মহিলা মহলে তসলা, সাঁঝ পুজুনি, ভাঁজো ইত্যাদি ব্রতানুষ্ঠানের

প্রচলন রয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের গান, মৃত্যুতে শোকগীতি (Mourning Song) ও পঞ্চরং ইত্যাদির চল আছে।

স্বাস্থ্য ঃ এই গ্রামে একদা একটি খ্রিশ্চান মিশন ছিল যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ অল্প হলেও চলত। বর্তমানে তা উঠে গেলেও সেখানেই তৈরী হয়েছে ৫০ বেডের গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। মানকরের রাজবৈদ্য কবিরাজ রাও সুচিকিৎসকছিলেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়ও ছিল। সর্বোপরি গ্রামটি অতীতে বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল। তাই এখানে একসময় বঙ্গের গৌরব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ও বাংলার রূপকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তথা সুচিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শৈশবে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

জাতিসম্প্রদায় ঃ গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। যেমন— ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, তাম্বুলী, সুবর্ণবণিক, তন্তুবায়, গোপ, সদগোপ, মোদক, কর্মকার ইত্যাদি ছাড়াও নিম্ন ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউরী, মেটে, হাড়ি, ডোম, মুচি ইত্যাদি বহু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমান বসতিও আছে।

উপসংহার ঃ একদা এই গ্রাম গোপভূমপরগনার মধ্যে উন্নত কৃষ্টির ধারক ছিল। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৮৫৫ খ্রিঃ এই গ্রামের বুক চিরে পূর্বরেল রাণীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তার কিছু পরে ১৮৬৩ খ্রিঃ এই গ্রাম ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। মহামারির ব্যাপকতা নিয়ে ম্যালেরিয়া এই গ্রামকে আক্রমন করে ফলে বহু লোক মারা যায়। মৃত্যুভয়ে বহু লোক গ্রাম ছেড়ে চলেও যায়। আর যারা গ্রামে থেকে যায় তারাও গলাসরু পেটমোটা হয়ে ধুঁকতে থাকে ফলে গ্রাম একেবারেই রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, বর্গী আক্রমণ ইত্যাদি প্রাকৃতি ও রাজনৈতিক বিপর্যয় গ্রামের যত না ক্ষতি করেছিল তাঁর চেয়ে ঢের ক্ষতি করল ম্যালেরিয়া।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরিভূত হওয়ার পর গ্রাম একটু সুস্থ হল বটে কিন্তু ক্ষতি যা হবার তাতো হয়েই গেছে। তাই বলে বসে থাকলেও চলবে না। অতীতের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পাথেয় করে যাতে এই গ্রাম হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে তার জন্য বর্তমান প্রজন্মকেই সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে, এবং তা পারলে এই মানকর অনাগত ভবিষ্যতে অগ্রগতির দিশারি হতে পারবে।

—ঃ মাড়ো ঃ—

বুদবুদ থানার জে.এল. নং-৯ মাড়ো একটি গণ্ডগ্রাম। মানকরের দক্ষিণ পশ্চিমে এর অবস্থান। এই গ্রামে শ্রীচৈতন্যের নিজজন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশ ধর এক

গোস্বামী পরিবার বর্ধমান জেলার ভাতাড় থানার বলগোনার কাছে নিত্যানন্দপুর থেকে উঠেগিয়ে এই গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তাদেরই বংশধর হিসাবে 'রামরসায়ন' প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্যই এই গ্রামের খ্যাতি সমধিক বিস্তৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই।

গ্রামের প্রাচীন দেবকীর্তির মধ্যে রাধামাধবের মন্দির বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই দেব বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তারই একটু পশ্চিমে পূর্ব দুয়ারী বেশ বড় মাপের ভোগঘর সহ বর্তমান মন্দির তৈরী হয়েছে। মন্দিরের সামনে টিনের ছাউনি দেওয়া বড় আটচালাও বর্তমান। রাধামাধবের নিত্য সেবা সহ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় উৎসব পালিত হয়।

এই মন্দিরে মাধবের ডানদিকে রয়েছেন ললিতা সখী এবং বাম দিকে রাধারানী। মনে হয় কোন সময় হয়ত রাধারানী চুরি হয়ে যাওয়ায় নতুন করে রাধারানী প্রতিষ্ঠার পর পূর্বের রাধারানীকে পাওয়ায় হয়ত সাবেক কিংবা পরের রাধারানীর মধ্যে কেউ ললিতা সখী হয়ে অবস্থান করছেন। এই মন্দিরে আর এক বিগ্রহ তিনখণ্ডে খণ্ডিত হয়ে মন্দিরেই অবস্থিত থেকে পূজা পাচ্ছেন— তিনি হলেন গ্রাম্যদেবী খগেশ্বরী। দেবীর পূজা মন্ত্র হল— "ওঁ ক্রীং ঘড়োশ্বর্যৈ নমঃ" এবং দক্ষিণাকালীর ধ্যানমন্ত্রেই দেবীর ধ্যান সমাধা হয়।

পূর্বে এই গ্রামের পশ্চিমে এক পুকুরের পূর্ব পাড়ে বাঁধানো ঘাটের পাশে যেখানে রঘুনন্দন গোস্বামীর পিতা কিশোরী মোহন গোস্বামীর সমাধী-স্মৃতি মন্দির রয়েছে তারই কাছে একটি দক্ষিণ দুয়ারী ভগ্নপ্রায় মন্দিরে এই ঘড়োশ্বরী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেবীর উদ্দেশ্যে ডাক সংক্রান্তিতে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে গ্রামে বশে জাঁকিয়ে মেলাও বসতো। মানকরনিবাসী জমিদার হেমনলিনী দেবী স্বামী ৺কেশবনাথ গোস্বামী ও শক্তিবালা দীক্ষিত স্বামী ৺রাধাকান্ত দীক্ষিত-এর সময়ে বছর ২২ হল তা বন্ধ হয়ে গেছে।

এই গ্রামের উত্তর অংশে বলরামপুর ডাঙ্গায় কুলীন গোস্বামী বংশের প্রতিষ্ঠিত রেবতী বলরামের প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল তার সেবক ছিল সিদ্ধপুরুষ চন্দ্রশেখর গোস্বামী দেব সেরায় প্রতিদিন ৪সের অন্নের বরাদ্দ ছিল। জনশ্রুতি ঐ ৪সের চালের ভোগ অন্নের দ্বারাই সাধক চন্দ্র শেখর একদিন হঠাৎ আসা ক্ষুধাতুর বর্গীদস্যুদের বিশাল বাহিনীকে তৃপ্তি সহ ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে সাধকের অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বর্গীসর্দার দেবতা বলরাম-রেবতীর নামে ৩৬৫ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন।

পরে সেই প্রস্তর মূর্তি চুরি হয়েগেলে পূজক চন্দ্রশেখরের করুন আর্তিতে দ্রবিভূত দেবতা তাকে স্বপ্নে, বিষ্ণুপুরের পোকা বাঁধের যে নিম্ব বৃক্ষ হতে দুগ্ধ নিসৃত হচ্ছে

সেটি নিয়ে নবদ্বীপের কুড়োরাম মিস্ত্রীর দ্বারা রেবতী বলরামের দারুমূর্তি নির্মানের নিদের্শশ দেন। পরে সেই মত নির্মিত দারুমূর্তি গ্রামে এখনও পূজিত হয়ে চলেছে।

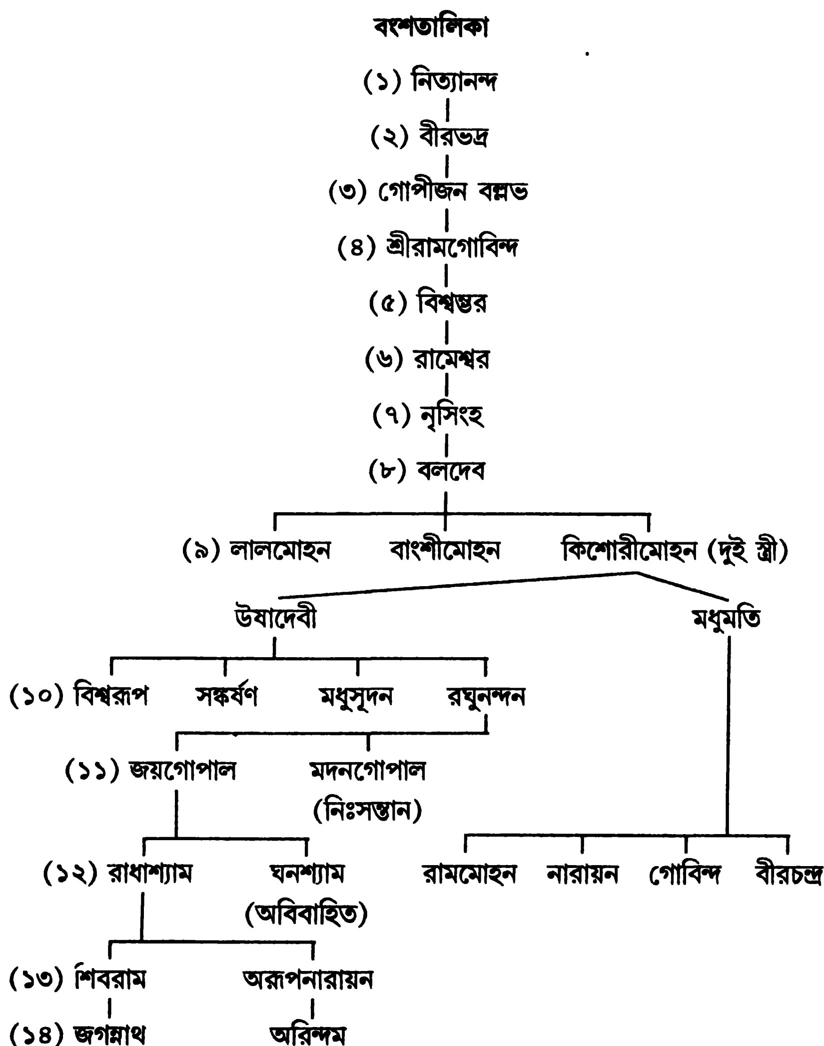
আলোচ্য মন্দিরাদি ছাড়াও গ্রামে ১টি পঞ্চচূড়ার সাদামাটা শিবমন্দির ও ছড়িয়েছিটিয়ে আরও ২/১টি মন্দির বর্তমান। এখন এই গ্রামের সব থেকে প্রথিত যশা ব্যক্তি এবং যার মাধ্যমেই এই গ্রামের বিশেষ পরিচিতি সেই প্রখ্যাত পণ্ডিত লেখক রঘুনন্দন গোস্বামীর কথায় ফিরে আসি। সেই পণ্ডিতের বসত বাড়ির আর কোন চিহ্নই নাই তবে তাঁর টোল বাড়ীব এখনও কিছু চিহ্ন বর্তমান আছে— যেখানে বসে তিনি ছাত্রদের বিদ্যাদান করতেন এবং বহু গ্রন্থ প্রনয়ন করেছিলেন। বাংলার ১১৯৩ সালে এই মাড়ো গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কথাতেই বলি—

বর্ধমান সন্নিধান গ্রামমাড়ো অভিধান
তাহাতেই আমার নিবাস।

তিনি ৪৫ বছর বযসকালে তাঁর প্রখ্যাত রামায়ন কাব্য 'রামরসায়ন' রচনা করেছিলেন। রামরসায়ন কাব্যের শেষাংশে কবির দেওয়া বংশপরিচয় ও কবির বর্তমান বংশধর শিবরাম গোস্বামীপ্রদত্ত হিসাব থেকে কবির চৌদ্দপুরুষের বংশ তালিকা পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হল। কবি ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দশম অধস্তন পুরুষ।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অ্যাডামস সাহেব তাঁর রির্পোটে উল্লেখ করে বলেছেন যে, পণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামী বাংলাও সংস্কৃত মিলিয়ে ৩৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সংস্কৃতে ৩৫ খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাংলার দুখানির মধ্যে হল রামরসায়ন ও শ্রী শ্রী গীতমালা। কবির রচিত ঐ দু'খানি বইই খুবই যত্নে রক্ষিত রয়েছে কবির বর্তমান বংশধর শিবরাম গোস্বামীর গৃহে। তিনি পবম আগ্রহে আমাদের তা দেখালেন।

শিবরাম গোস্বামী মহাশয় তাঁর পূর্বপুরষ পণ্ডিত রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্যের কথা প্রসঙ্গে একটি মজার কাহিনী শুনালেন। কাহিনীটি নিম্ন রূপ পণ্ডিত প্রবর রঘুনন্দন তাঁর টেলে বসে আছেন, এমন সময় কিছু ভিনরাজ্যের পণ্ডিত তাঁর কাছে তর্কযুদ্ধ করার জন্য আসেন। তখন পণ্ডিত রঘুনন্দ তাদের সকল প্রশ্নে উত্তর দেওয়ার পর তাদের সে সকল প্রশ্ন করেছিলেন তার কোন উত্তর দিতে না পারায় তারা পরাজিত হয়। তখন কবির বয়স ৩০ বছর। অল্প বয়সী কবি কিছুটা অহংবোধে তাড়িত হয়ে তাদের বসার আসনটি তুলে অবজ্ঞাবসে তাদের গায়েই ঝেড়ে দিয়েছিলেন, ফলে ক্ষুব্ধ পণ্ডিতগণ ক্রোধান্বিত হয়ে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন যে, তোমার পাণ্ডিত্যের এত অহংকার, আমবা তোমায় অভিশাপ দিলাম তোমার বংশে চার পুরুষে কেউ আর পণ্ডিত হবে না। তখন কবি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পণ্ডিতদের অভিশাপ সত্যই কার্যকরী হয়েছিল অর্থাৎ বর্তমান পুরুষ পর্যন্ত ধরে ও কবির পরবর্তীচার পুরুষে কেউ আর পণ্ডিত হননি।



এই গ্রামেই রঘুনন্দন গোস্বামীদের কোন পূর্বপুরুষ বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা শশীশেখর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার সুললিত পদাবলী, ভাবপ্রবণ বাঙালীর কর্ণকুহরে এখনও সুধা বর্ষন করে।

এবার এই গ্রামের আর এক বর্দ্ধিষ্ণু পারিবার চন্দ্রদের (সুবর্ণ বণিক) কথা বলি। গ্রামে ঢোকার মুখে রাস্তার পূর্ব দিকে তেঁতুল তলায় চন্দ্রদের বিশাল প্রাচীণ বাড়ি যা

বর্তমানে প্রায় ধ্বংসের মুখে। এক কালে চন্দ্রদের আর্থিক অবস্থাবেশ স্বচ্ছল ও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল— এই বাড়িই তার প্রমাণ। আগের দিনে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু না থাকায় টাকা পয়সা যে লোকে বাড়িব দেওয়ালেই হাঁড়ি কুড়ি সহ গেঁথে রাখতেন এই বাড়ির দেওযালেও তার প্রমাণ তখন পেয়েছিলাম। এদের প্রাচীণ দুর্গাবাড়িও ছিল। হয়ত তা ভেঙে গেছে, তাই প্রাচীণ বাড়ির কিছু অংশ সংস্কার করে টিনের চালেব বারান্দাসহ পূজাপণ্ডপ বানিয়ে নিয়ে সেখানেই দুর্গোৎসব পরিপালিত হচ্ছে।

মাড়োর চন্দ্র বংশের ধনদৌলতের কিছু গল্প আজও লোকমুখে প্রচলিত। চন্দ্রদের বাড়ির পূর্বদিকে ছিল পুষ্করিনী। সেই পুষ্করিনীতে সোনার নোলক পড়া মাছগুলি এককালে খেলা করে বেড়াত, আর বাড়ির বৌরা বিকালবেলায় বাঁধানো ঘাটে বসে তা উপভোগ করতেন। আর বৌরাও ছিল রূপের ডালি! একবার মা দুর্গা এক বৌকে স্বপ্ন দিয়ে বলেছিলেন "তুই আমার সামনে এমনভাবে বসে থাকিস না, লোকে আমাকে না দেখে তোকেই দেখে চলে যায়"— বৌটি তদবধি আর সেজেগুজে মায়ের সামনে বসতেন না। চন্দ্রদের দুর্গাপূজা সম্পর্কে এখনও একটি প্রথা চালু আছে তা হল নীলকণ্ঠ পাখী না ডাকলেও শঙ্খচিল না উড়লে দেবীর আহ্বানে ঘট আনা আজও হয় না।

বর্তমান মাড়ো গ্রামের উত্তর পশ্চিমে সায়ের নামে একটি বড় পুকুর রয়েছে, তার পশ্চিমে কিছু ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট একটি ডোবা এখনও দেখা যায়। পূর্বে সেখানে জনবসতি ছিল, এখন নাই। উত্তর পশ্চিমের জঙ্গল এলাকার মাঠ ধোয়াজল রাশি ডোবায় পড়ে তা গ্রামের কুলি রাস্তাবরাবর এগিয়ে গিয়ে কোটা গ্রাম থেকেই নদীর আকার নেয়। সেদিক থেকে এই গ্রামকেই ঐ নদীর উৎসস্থল বলা হয়। নদীটি হল পশ্চিম বর্ধমানে উল্লেখ্য নদী খড়ি বা খড়োশ্বরী। মাড়ো গ্রামে খড়ি নদীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে কিছু লোক প্রবাদ বা জনশ্রুতি চালু আছে। অন্যত্র খড়ি নদীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে তা আলোচনা করেছি।

—ঃ রানীগঞ্জ ঃ—

প্রাচীন গোপভূমের আওতায় দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত কয়লা সম্পদ কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল হল রাণীগঞ্জ। এর জে.এল. নং-২৪। রানীগঞ্জ নামটি খুব প্রাচীন নয়। ১৮৭৪ খ্রিঃ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের কয়লা বিষয়ক রির্পোটে প্রথম রানীগঞ্জের নাম পাওয়া যায়। এই এলাকা বর্ধমানের রাজাদের এক উল্লেখ্য তালুক ছিল। রানীগঞ্জের নামকরণ প্রসঙ্গে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়— তাতে জানা যায় বর্ধমানের রাজপরিবারের কোন রাণীকে ঘিরেই রাণীগঞ্জের নামের উৎপত্তি। সম্ভবত উখরা রাজদুহিতা এবং বর্ধমানের রাজা তিলক চাঁদ (১৭৪৪-১৭৭০ খ্রিঃ) এর

বিধবা রানী ব্রজ কিশোরীর রানীগঞ্জে অবস্থান হেতু এখানকার নাম হয় রানীগঞ্জ। সে যাই হোক বর্ধমান রাজ পরিবারের সঙ্গে এর নাম করনের বিষয়টি জড়িত থাকায় নিশ্চিন্তভাবেই বলা যায়-এই রানীগঞ্জ নামের উৎপত্তি তিনশ বছরের অধিক প্রাচীন নয়।

কয়লা কেন্দ্রিক শহর রানীগঞ্জ— রানীগঞ্জের পরিচিতি মূলে রয়েছে কয়লা। পূর্বে মাটির তলায় যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত কালো মাণিক কয়লা সম্পর্কে মানুষের কোন ধরনাই ছিল না। একদা একদল তীর্থযাত্রী পদব্রজে পুরীধাম যাবার পথে দামোদরের সন্নিকটে রানীগঞ্জের এক বনপ্রান্তে বিশ্রাম নেওয়ার কালে ৩টি কালো পাথর দিয়ে চুলো তৈরী করে তাতে কাষ্ঠ সহযোগে রান্নার তোড়জোড় শুরু করে। রান্না শেষ হবার পরে তারা অবাক বিস্ময়ে দেখে যে, কালো কালো পাথর যা দিয়ে উনুন তৈরী হয়েছিল-তাও গনগন করে জ্বলছে এবং তাদের গা দিয়ে তেলের মত কি যেন গড়াচ্ছে! তারা অবাক হয়ে ভাবে এ কোন ভৌতিক ব্যাপার! মেয়েরা তো এখানকার রান্না খাবেই না ঠি করে বসল। কিন্তু পরে বোঝাগেল ঐ পাথরেই কয়লা নামক জ্বালানী আর ঐ তৈলাক্ত বস্তুই আলকাতরার সাবেক রূপ।

এইভাবেই কয়লার কথা মানুষ জানল। পরে ১৭৪৪ খ্রিঃ প্রথম এই রানীগঞ্জ থেকেই কয়লা খননের কাজ শুরু হয় এবং সেই কয়লা সহজেই কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৮৫৫ খ্রিঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী পূর্বরেল রানীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তার আগে দামোদর ও অজয় নদী দিয়ে কয়লা কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হত। এই কয়লাকে কেন্দ্র করেই রানীগঞ্জের উন্নতি পর্বের সূচনা হয়। পাশের পল্লীমঙ্গলপুর থেকে ডাক ঘর এখানেই উঠে আসে। ধীরে ধীরে থানাও এখানে উঠে আসে ফলে রানীগঞ্জ কয়লা কেন্দ্রিক এক সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হতে থাকে।

এখানকার ২টি লোভনীয় শিল্প তদানীন্তন ইংরাজ বণিকদের দৃষ্টিকে অতিমাত্রায় প্রলুব্ধ করেছিল, তার একটি কয়লা উত্তোলন, অন্যটি নীলচাষ। ১৮২০ খ্রিঃ থেকে এখানে কয়লা উত্তোলন পর্বের সূচনা হয়। এখানে মাটির নীচে প্রচুর পরিমানে কয়লা সঞ্চিত রয়েছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন ঠাকুর পরিবারের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুর তার বন্ধু উইলিয়ম কারের সঙ্গে যুগ্মভাবে ১৮২০ খ্রিঃ 'কার টেগোর কোম্পানী' নামে এখানে কয়লা উত্তোলন শুরু করে। পরে ১৮৪৩ খ্রিঃ এই সংস্থা হামফ্রে কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেঙ্গল কোল কম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুর এখানে নীল চাষ ও শুরু করেছিলেন।

এইভাবেই কয়লাকে কেন্দ্র করেই অষ্টাদশ শতকের মধ্যাংশ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম পর্বেই রানীগঞ্জ শিল্প অঞ্চলে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে বিভিন্ন শিল্প ও

কলকারখানাও এখানে গড়ে ওঠে যেমন— ১৮৯৫ খ্রিঃ রানীগঞ্জ স্টেশনের উত্তরে বার্ন এন্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের পাইপ তৈরী শুরু হয়। এই রানীগঞ্জের লাগোয়া বল্লভ পুরে ১৮৯১ খ্রিঃ তৈরী হয় ভারত বিখ্যাত কাগজ কল 'বেঙ্গল পেপার মিল'। তাছাড়াও এখানে বাসনপত্র, তেলকল, টালির কারখানা সহ বহুবিধ ইঞ্জিনীয়ারিং কলকারখানা গড়ে উঠেছিল। মোট কথা আসানসোল শহরের আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত রানীগঞ্জ বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চলের তথা পশ্চিমরাঢ়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পোন্নত মহাকুমা শহর হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল।

রানীগঞ্জ শহরের উল্লেখ্য কয়েকটি স্থান— রানীগঞ্জের মঙ্গলপুর মোড় একদা পুলিশ ফাঁড়ির দৌলতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছিল কিন্তু সেখান থেকে থানা স্থানান্তরিত হওয়ায় তার গুরুত্ব অনেক খানিই হ্রাস পায়। রানীগঞ্জের এতোয়ারী শাওএর চায়ের দোকানকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ অঞ্চলের নাম হয় এতোয়ারী মোড়। রানীগঞ্জের কয়েকটি কুয়াকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল কুয়ামোড়। পরে এখানেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের মূর্তিস্থাপিত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। শোনাযায় এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল সরস্বতী লাইব্রেরী একদা যা স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের উৎসাহ, প্রেরণা ও আশ্রয় দাতা ছিল, সেই লাইব্রেরীই পরে পাবলিক লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছিল।

এখানকার ষষ্ঠী গড়ে ছিল এক সময়ের বিরাট জলাশয়। যার বেশ কিছু অংশ পরে ভরাট করে তৈরী হয়েছে পৌরসভার চিলড্রেন পার্ক এবং পরে এখানেই তৈরী হয়েছিল পুরসভার বাজার। ১৯৯৯ খ্রিঃ সেটি স্থানান্তরিত হয় শিবমন্দির রোডে। রানীগঞ্জ অঞ্চলের আর এক উল্লেখ্য স্থান হল রোনাই অঞ্চল। এখানে মুসলমানদের আধিক্যই বেশি। এখানের রাজার বাঁধ পুকুর— যা এই অঞ্চলের সব থেকে বড় পুষ্করিনী তারই পাড়ে ছিল মাজার শরীফ এবং অন্যদিকে মুসলমানদের কবর স্থান। এখনাকার পবিত্র মাজার শরীফে শায়িত আছেন এখানকার প্রখ্যাত পীর বাবা শের-ই-বঙ্গাল মৌলনা সৈয়দ সামসুদ্দিন ইন্দাবি। ইনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত সাধক। তার অনেক অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের কাহিনী লোক মুখে শোনা যায়। তার পূণ্য স্মৃতি তর্পনের উদ্দেশ্যে বছরের ৪ঠা ফাল্গুন এখানে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মানসে বর্ধমান জেলার মধ্যে এক বিরাট মেলার আয়োজন করা হয়— যাতে ভারতের প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও লোক সমাগম হয়ে থাকে। এখানকার মাজারে চাদর চড়াবার জন্য এখনও নেপাল থেকে চাদর আসে, তাতে অনেকেই মনে করেন হয়ত এই পীড় সাহেব নেপাল থেকেই এখানে এসেছিলেন।

রানীগঞ্জের নিখা অঞ্চলে একদা ছিল এক ক্ষুদ্র বিমানবন্দর। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে এখান থেকে পানাগড় পর্যন্ত ছোটখাট বিমান ওঠা নামা করত। এখানে সিগন্যালিং টাওয়ারও ছিল।

এখানকার বড় বাজাবে ১২০০ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কালীবাড়ি— যা শ্মশান কালী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রাচীনডালপট্টি মোড়ে রয়েছে ষোলআনার দুর্গামন্দির। এবার আসাযাক এখানের এক প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ মাঠের কথায় যেটি ডাক ও তার দপ্তরের অধীন থাকায় 'তারবাংলা' ময়দান নামে পরিচিত। একদা সেখানে প্রাচীন দিনের নামিদামি সার্কাসদলের তাঁবু পড়ত, আর অনুষ্ঠিত হত নানান জনসভা এবং আমোদ-প্রমোদ হিসাবে বিকালের দিকে মাদারী খেল ও মুরগীর লড়াই। এখন সেখানে জন বসতিতে পরিপূর্ণ হওয়ায় এসব কাহিনী ইতিহাস কথায় পরিণত হয়েছে। এরই উল্টোদিকেই ছিল 'কুলুপুকুর'— যেখানে রানীগঞ্জ বাসীরা সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ড সম্পন্ন করত।

পরিশেষে এখানকার এক প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিজড়িত রাজবাড়ির কথা বলতে হয়। সেটি হল এখানকার সেয়ারসোল রাজবাড়ির কথা। সুদূর কাশ্মীর থেকে আগত এক ব্রাহ্মণ যুবক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশকরার পর এখানের এক কয়লা কোম্পানীতে কাজে যোগ দেন। পরে নিজের অধ্যবসায় সততাও কর্মক্ষমতার দৌলতে নিজেই এক কয়লা কোং এর অধিকর্তা হয়ে বসেন। তারই প্রতিষ্ঠিত বংশ সেয়ারসোল রাজপরিবার নামে খ্যাত। দেশের কল্যানে এই পরিবারের বদ্যানতার সীমা ছিল না। বহুজনহিতকর কাজের সঙ্গে এই পরিবার ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল।

এই রাজপরিবারের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় সেয়ারসোল রাজস্কুল। পরে এদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান— তার মধ্যে অগ্রগণ্য হল সেয়ারসোল গালর্স স্কুল, রানীগঞ্জ গালর্স কলেজ। এদেরই প্রচেষ্টায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার কল্পে তৈরী হয় টোল; জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে তৈরী হয় ডাক্তারখানা। এই পরিবার তখনকার দিনে সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল দ্যোতক ছিল। তাদের পরিবারে বার মাসে তের পর্বণ লেগেই থাকত। রথের উৎসব ছিল এই পরিবারের এক উল্লেখ্য উৎসব। তাকে ঘিরে এখনও সেখানে রথের মেলা বসে। এখানে রয়েছে সুদৃশ্য পিতলের রথ।

রানীগঞ্জের উৎসবানুষ্ঠান— বিশাল এলাকা নিয়ে রানীগঞ্জ শহর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই শহর মূলত কয়লাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট। এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লোক যেমন কাজের আশায় সমবেত হয়েছে, তেমনি দেশ-বিদেশের বহু লোককও এখানে জড়ো হওয়ায় এখানকার কৃষ্টিতে এক মিশ্ররূপ লক্ষ্য করা গেলেও তাদের জীবন যাত্রার মধ্যে এক শান্তি পূর্ণ সহ অবস্থান সুদৃঢ় ভাবে লক্ষণীয়।

এখানে বিভিন্ন উৎসব সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত হলেও বাঙালীদের আধিক্য হেতু বঙ্গ কৃষ্টির উল্লেখ্য উৎসব দুর্গোৎসব এখানে মহাসমারোহে পালিত হয়। পূর্বে অধিকাংশ দুর্গোৎসবই ছিল পারিবারিক উৎসব কিন্তু তা সমষ্টি স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় বর্তমানে

সেখানে বহু সার্বজনীন বা বারোয়ারী দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পূর্বেব পারিবারিক দুর্গোৎসবগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল রামময়রা প্রবর্তিত দুর্গাপূজা যা নাকি রানীগঞ্জের আদি দুর্গা পূজা, পাল পরিবারের দুর্গাপূজা, রানীগঞ্জের কুমার বাজাবেব নীচু পাড়ায় রায়েদের দুর্গাপূজা, খাডশুলীর সাধু পরিবারের পূজা, অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তীর বাড়ির পূজা, সেয়ার সোলের হাজরা বাড়ির পূজা, রাজপরিবারের পূজা (বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে), নিমতা গ্রামের চট্টোরাজ পরিবারের পূজা যা প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন বলে শোনা যায়, ইত্যাদি।

এখন সার্বজনীন দুর্গাপূজার জমজমাট বাজার তাই রানীগঞ্জের বহু স্থানে সাড়ম্বরেই বারোযারী দুর্গাপূজা চলে আসছে। যেমন— শালডাঙ্গায় ভকতপাড়ায় সার্বজনীন পূজা, ডালপট্টির পূজা, রাধারমণ রোডেব পূজা, মৃত্যুঞ্জয় ইনস্টিটিউটের পূজা, স্কুল পাড়ায় সার্বজনীন দুর্গোৎসব ইত্যাদি উল্লেখ্য।

এখানে উৎসবের শেষ নাই, এখানে দামোদবের তীরে দামালিয়ায় বসে এক প্রখ্যাত পৌষ সংক্রান্তিব মেলা। বড়বাজারে শ্মশানকালীর পূজাও এক উল্লেখ্য উৎসব, সেযারসোল বাজবাড়ির বথের মেলাব কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি পীড়ের মেলাও এখানকার উল্লেখ্য উৎসব।

সাধারণ প্রতিষ্ঠান— খনি শিল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে এই শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠায় এখানেই ১৯৫৫ খ্রিঃ তৈরী হয়েছে সারা ভারতের মধ্যে প্রথম খনি বিদ্যাশিক্ষার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রানীগঞ্জ মাইনিং স্কুল। পরে পরে এখানে গড়ে ওঠা শিল্প ক্ষেত্রের অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদিও প্রয়োজনানুগ ভাবেই আপন তাগিদেই গড়ে উঠেছে। এখানকাব নাগবিকদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেয়াবসোল রাজ পরিবার কর্তৃক সেয়ার সোল রাজ স্কুল, সেয়ারসোল গালর্স স্কুল, রানীগঞ্জ গালর্স কলেজ। ১৮৭৭ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী। ১৮৮৮ খ্রিঃ তৈরী হয় রানীগঞ্জ স্কুল। ১৯৫৭ খ্রিঃ বনোয়ারী লাল ভালোটিয়ার প্রচেষ্টায় এবং আর্থিক সহায়তায় রানীগঞ্জে নির্মিত হয় সহশিক্ষা মূলক এক মাত্র মহাবিদ্যালয় যার ছাত্র সংখ্যা এখন পাঁচহাজার ছাড়িয়ে গেছে। এটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে অন্যতম বৃহত্তম কলেজ। রানীগঞ্জ গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুল নির্মানেও বনোয়ারী লালের বিশেষ অবদান ছিল।

১৮৮০ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় বিচার বিভাগীয় আদালত। ১৮৭৭ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী। ১৯৮১ খ্রিঃ সাধারনের প্রচেষ্টায় তৈরী হয়েছে এক মহিলা কলেজ, যা সেয়ার সোলেই অবস্থিত। এখানেও সহস্রাধিক ছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে পড়াশুনা করে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে রানীগঞ্জের ভূমিকা— পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশের শৃঙ্খল মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য স্থানের মত এখানকার বাসিন্দারাও বিশেষ ভূমিকা

গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ কারী ব্যক্তিত্বের স্মরণ প্রসঙ্গে যাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয় তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন- সেয়ারসোল রাজস্কুলের শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটক। তিনি ই উদ্যোগী হয়ে এতদ অঞ্চলের যুবগোষ্ঠীকে দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করার জন্য তৈরী করেন জাতীয়তাবাদী 'যুবসংঘ'। তিনিই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজামন্দ মুখোপাধ্যায়কে জাতীয় আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করার দীক্ষাগুরু। তারই মাতৃস্বসা দুকড়ি বালা দেবী ও ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ কর্মী। এখানকার ভীমাচরণ রায় বৈপ্লবিক ভাবধারায় অতিমাত্রায় উদযোগী হয়েছিলেন। তিনিই পরে মহাত্মাগান্ধীর সানিধ্যে এসে পড়াশুনা ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। তিনিই পরে 'রানীগঞ্জের গান্ধী' নামে খ্যাত হন।

বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও একজন স্বদেশ কর্মী ছিলেন। তার প্রকাশিত 'তরুণ' নামক পত্রিকা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল, এর জন্য তাকে জরিমানাও দিতে হয়েছিল। তার বৈপ্লবিক কাজ কর্মের জন্য তাকে জেলখাটতেও হয়েছিল। এবার আসি ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষের কথায়— যিনি এখানকার আন্দোলন কারীদের বিভিন্নভাবে মদত দিতেন। ঐ সকল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় রানীগঞ্জ ১৯১৪-৪৫ খ্রিঃ পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামের এক শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। সেখানের বহু যোদ্ধার মধ্যে দর্গাদাস হালদার এর নাম খুবই উল্লেখ্য। এছাড়াও ছিলেন আরও অনেকেই কিন্তু সকলের নাম এখানে উল্লেখ সম্ভব না হলেও তাদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়।

বিভিন্ন সময়ে রানীগঞ্জে বহুবিপ্লবী এবং রাজনৈতিক নেতার শুভ আবির্ভাব ঘটেছিল। যেমন— লালালাজপত রায়, বীরেন্দ্র নাথ সাসমল, বিপিন চন্দ্র পাল, বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলি, সুরেশ মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের। এছাড়াও এখানে এসেছিলেন ঋষি অরবিন্দ, নেতাজী সুভাষ বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ মহান ব্যক্তিরা। এই রানীগঞ্জ ধন্য হয়েছিল পরম পুরুষ শ্রী রামকৃষ্ণের চরম স্পর্শে। ঠাকুর রাম কৃষ্ণ দেওঘর যাবার পথে তাঁর পরম রসদ-দাতা রাণী রাসমনির জামাতা মথুরাবাবুর সঙ্গে এসে এখানে একরাত কাটিয়ে গিয়েছিলেন। [২৩]

উপসংহার— পরিবর্তনশীল জগতে কালের প্রভাবে অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। রানীগঞ্জের বুকেও তাই বহুপরিবর্তন ধীরে ধীরে সূচিত হয়ে চলেছে। একদা এই এলাকা সত্যই জনমানসে অজ্ঞাত ক্ষেত্রহিসাবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। কিন্তু এখানে কয়লা নামক এক অমূল্য দাহ্য বস্তুর আবিষ্কার হওয়ায় এই রানীগঞ্জ পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়। সেই কয়লাকে কেন্দ্র করেই এই অঞ্চলের উন্নতির শুরু। মৃগনাভির গন্ধে যেমন মানুষ আকৃষ্ট হয় তেমনি কালোমাণিকের দুর্ণিবার আকর্ষণে এই এলাকা জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে ওঠে ফলে এটি ক্রমশ শহরের আকার নেয়। তখন

জনচাপের সুষ্ঠ নাগরিক পরিষেবা বিধানের জন্য এর উন্নতিও শুরু হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই এলাকা মহকুমা শহরে উন্নীত হয়। সৃষ্টি হয় আরও বহু কলকারখানা। তার ফলে বহিরাগত আরও বহুজনের আগমনে এটি এক জনবহুল শিল্প সমৃদ্ধ জাঁক জমক শহরে পরিণত হয়। এই ভাবেই এর উত্থান পর্ব পূর্ণতা পায়।

আমরা জানি উত্থানের পরই আসে পতনের পালা। সে দিক থেকে এই শহরেরও উত্থান পর্বের পর পতনের পালাও শুরু হতে দেখা যায়। নিকটেই শিল্প নগরী আসানসোলের উত্থানের ফলে রানীগঞ্জের পতন পর্ব শুরু হতে থাকে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে মহকুমা স্থানান্তরিত হয় আসানসোলে। ফলে এটি আবার এক সাধারণ পৌর শহরে পরিণত হয়।

যাকে নিয়ে এর উত্থান-সেই কয়লা এখানে দীর্ঘদিন ধরে উত্তোলিত হওয়ায় দীর্ঘ বিস্তৃত খনিগর্ভ ক্রমশ শূণ্য হতে বসেছে। এটা এক ভীষণ ভয়ের দিক কারণ এর ফলে ধ্বস নামার কাজ শুরু হয়ে গেছে। অন্যদিকে মাঝে মাধ্যেই খনি গর্ভে অগ্নি সংযুক্ত হওয়ায় এখানে বিপর্যয় পর্ব শুরু হয়েছে। এই দুই কারণে এখানকার মানুষ দারুণ বিভীষিকার মধ্যে চূড়ান্ত সর্বনাশের আশংকায় দিন গুনছে, তাই স্তব্ধ হতে বসেছে এর উন্নতির অগ্রগতি। তদুপরি এই শহর এখন 'বিপদজ্জনক' বলে ঘোষিত হওয়ায় এখানকার মানুষ অনাগত কোন ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য দিন গুনছে।

এখন এই শহরের জনমনে সাহস যোগাবার জন্য অচিরাৎ শূণ্য খনিগর্ভগুলি বালিভরাটের মাধ্যমে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহনের দ্বারা এই শহরকে সুরক্ষিত করার আশু প্রয়োজন।

—ঃ সুয়াতা ঃ—

একদা বঙ্গের অজয়-দামোদরের মধ্যবর্তী জঙ্গলাবৃত্ত (গোপভূমের বিশিষ্ট গোপরাজা ভল্লুপদর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজধানী ভাল্কীর সংযুক্ত গ্রাম ছিল এই সুয়াতা। এখানেই সুদূর আরব থেকে আসা মুসলমান ধর্মপ্রচারক মানবতাবাদী সাধক পীর বাহমনী সাহেবের মাজার বর্তমান। গ্রামটি বর্তমান আউশগ্রাম থানার ২নং ব্লকের ৯০ নং জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীণগ্রাম এবং গুসকরা বুদবুদ পাকারাস্তার সামান্য উত্তরেই এর অবস্থান।

গ্রামের নামকরণ— নামকরণ প্রসঙ্গে অগ্রবর্তী হলেই বেশ কিছু কিংবদন্তির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়তে হয়। যেমন— অনেকেই বলে থাকেন ভগবান বুদ্ধের জাতক গাহিনীর 'জনপদ কল্যানী' সূত্রে উল্লেখিত 'শ্বেতক নগরীই পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে সুয়াতা হয়েছে। [২৪] কিন্তু এর পিছনে তেমন কোন ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকায় বর্ধমানের প্রখ্যাত গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী এই মতকে গ্রহণ যোগ্য

মনে করেন নাই। তাঁর মতে এ ধারনা সম্পূর্ণভ্রান্ত। [২৫] অন্যদিকে কিংবদন্তির মায়াজালে এই গ্রামের সঙ্গে যে ব্যক্তির নাম নিবিড় ও গভীর ভাবে জড়িত, সেই ব্যক্তিটি হলেন এতদ অঞ্চলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হজরতপীর, সৈয়দ শাহমহম্মদ বাহমানী সাহেব।

আরবের ইয়েমেন প্রদেশ থেকে আসা মুসলমান ধর্ম প্রচারক শাহজামালের কয়েক জন সঙ্গীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই বাহমনী সাহেব। বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারের কাজে ঘুরতে ঘুরতে বাহমনী সাহেব এই সুয়াতায় এসে স্থিতু হন। তিনি ছিলেন মানব দরদী সাধক। তখন এখানকার গোপরাজারা তাদের কুলদেবতা শিবাক্ষা দেবীর পূজায় নরবলি দিতেন কিন্তু তিনি তার প্রতিবাদ করায়, রাজাদের সঙ্গে তার সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ফলে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষে দল বল সহ সে যুদ্ধে মারা যান।

এখন ধর্মযুদ্ধে কেউ এককভাবে মারা গেলে আরবী ভাষায় তাকে 'শহীদ' বলা হয় কিন্তু শহীদের সংখ্যা বেশি হলে তখন বলা হয় 'শুহাদাহ'। গোপরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে বাহমানী সাহেব একা মরেন নাই, আরও অনেকেই মারা গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই গ্রাম নিবাসী তথ্য সমৃদ্ধ ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ফজলুল কাদের চৌধুরী মহাশয়ের নিকট জানা গেল যে, ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সুয়াতা থেকে ৪/৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে প্রতাপপুর ডাঙ্গায়। যেহেতু বাহমনী সাহেব এখানেই থাকতেন, তাই মৃত্যুর পর শহীদদের দেহগুলিকে নিয়ে এসে এই সুয়াতোতেই সমাহিত করা হয়েছিল। ফলে এই গ্রামকে বহু শহীদের সমাধিস্থল বলেই শুহাদাহ বলা হত। দীর্ঘ ছয়শ বছরের ব্যবধানে 'শুহাদাহ' শব্দটি রূপান্তরিত হতে হতে শুহাদাহ > শুহাদ > শুহাদা 'সুয়াতা'য় পরিনত হয়ে গ্রাম নামে নামিত হয়েছে।

গ্রামের প্রাচীনত্ব ঃ— গ্রামটি প্রাচীন, কারণ গ্রামে অবস্থিত হজরত পীর সৈয়দ শাহ মহম্মদ বাহমানী সাহেবের মাজার নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীণ পুরাকীর্ত্তি, তদুপরি মাজারে বর্তমানে তিনটি শিলালিপি ও তাদের অবস্থানও প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

এই গ্রামের লাগাও ভাল্কীর দক্ষিণে হুসেন শাহের তৈরী একটি মসজিদ ছিল যা বর্তমানে ধ্বংসে পরিণত হলেও তার চিহ্ন রূপে ভাঙাইটের স্তূপ ও কয়েকটি স্তম্ভ এখনও পড়ে আছে। জায়গাটি এখনও 'মসজিদ ডাঙ্গা' নামে খ্যাত। সেই মসজিদ ভগ্ন হয়ে গেলে তার প্রতিষ্ঠা লিপিটি এখানের মাজারে রাখা আছে। সেটি ছাড়াও মাজারে আরও ২টি লিপি বর্তমান। তাদের ১টি রয়েছে মাজারের প্রবেশদ্বারের উপরে আর অন্যটি মাজারের গর্ভ গৃহের উত্তর দেওয়ালে গ্রথিত রয়েছে। এই তিনটি আরবী তুঘরা হরফে লেখা লিপি বীরভূমের মুলুক নিবাসী প্রখ্যাত গবেষক শ্রদ্ধেয় সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ভারত সরকারের নাগপুরস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান (শিলা

লিপি) বিভাগের অধিকর্তা জনার জিয়াউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক ১৯৭৭ খ্রিঃ গঠিত হয়ে ভাষান্তরিত হয়েছে। (২৬)

তাতে জানা যায় বর্তমান মাজারের প্রবেশদ্বারের লিপি ও সমাধিগৃহের উত্তর দেওয়ালের লিপি ২টি একই বছর হিজরী ৯০২ অর্থাৎ ১৪৯৬-৯৭ খ্রিঃ তদানীন্তন ধর্মপরায়ন বঙ্গ সুলতান আবুল মুজাফর হুসাইন শাহ এই স্মৃতি সৌধের উদ্দেশ্যে শিল্প সৌন্দর্যে মণ্ডিত তোরণে একটি লিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন, যাদের লেখক ছিলেন সুলতানের রাজকর্মচারী কাজী মিনাহী। পরবর্তী কালে সেই তোরণ ধ্বংস হলে তা সমাধি গৃহের উত্তর দেয়ালে স্থান পেয়েছে। আর ৩য় লিপিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদে উৎকীর্ণ ছিল, তাতে জানা যায়, সুলতান হুসাইন শাহ কর্তৃক হিজরী ৯০৮ অর্থাৎ ১৫০২/১৫০৩ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছিল। যার লেখক ছিলেন সম্ভবত মনসুর।

বাংলার নবাব হুসেন শাহ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃতি-মনস্ক ও পরমত সহিষ্ণু উদারব্যক্তি। তাই তার সম্পর্কে একটি চলতি প্রবাদেও ঐ উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবাদ বলছে—

বাদশা ছিলেন হুসেন শাহ জাতিতে পাঠান।
হিন্দু তার পাত্রমিত্র উজির দেওয়ান।। — এহেন উদার সুলতান ১৪৯৩ খ্রিঃ সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন এবং তিনিই পরবর্তী কালে এই স্মৃতি সৌধ ও মসজিদটি নির্মান করেছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু কালের ভ্রুকুটিতে আজ তা বিলীন। সেদিক থেকে বিচার করলে গ্রামটি যে পাঁচশ বছরের অধিক প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আজথেকে তিনশ বছর আগেও ১৬৯৯ খ্রিঃ বাঁকুড়ার সুখ সায়রের সীতারাম দাস তার মঙ্গল কাব্যে পীর পয়গম্বরদের বন্দনা প্রসঙ্গে এখানকার বাহমানী শাহের উল্লেখ করে বলেছেন— "সংহতি বম্বানী বন্দো ভাক্কীর পীর।
বদর আলম বন্দো সাগরে জাহির।।" এখানে উল্লেখ্য বাহমানী শাহই উচ্চারণ ভেদে বাহমান, বোম্মান, বোম্বান নামেও পরিচিত।

গ্রামের দর্শনীয় স্থান— গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে বৃক্ষাচ্ছাদিত মনোরম পরিবেশে গ্রামের প্রাচীনতম স্থান ও প্রাচীন পুরাকীর্তির ঐতিহাসিক দলিল স্বরূপ মসজিদের প্রতিষ্ঠা লিপি সঙ্গে নিয়ে বাহমানী সাহেবের মাজার বর্তমান। এটি যদিও আজ জীর্ণদশায় এসে গেছে— অচিরাৎ সংস্কার হওয়ার প্রয়োজন, তবুও এখানে উপস্থিত হলেই এটি যে একটি প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র তা সহজেই বোঝা যায়। মাজারটি অপেক্ষাকৃত উচু স্থানে অবস্থিত। এখানে যিনি শায়িত আছেন তার সঙ্গে যুদ্ধের একটা সম্পর্ক ছিল

তা বেশ বোঝা যায়। প্রমান স্বরূপ এখনও এখানে সকাল সন্ধ্যায় দামামা নির্ঘোষে যুদ্ধের সূচনা ও অবসানের ইঙ্গিত সূচিত হয়।

এই মাজারের উত্তরে শ্যাওলা দিঘি— যা গোপরাজ কন্যা শৈবলিনীর স্মৃতি বাহক। অর্থাৎ শৈবলিনী থেকে শ্যাওলায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেই মজে যাওয়া শ্যাওলার কাছে যেখানে ডি.ভি.সি. ক্যানেলের সাইফোন রয়েছে, সেখানেই পূর্বে গোপরাজাদের আরাধ্যা দেবী শিবাক্ষার আটনছিল— যার জন্য ঐ জায়গা এখনও 'শিবাখ্যার ঢিবি' নামে খ্যাত। পরে সেই জায়গায় আব্দুল কাদের চৌধুরী মহাশয় জমি তৈরী করার জন্য ঢিবি কাটাতে গিয়ে এক বিরাট ওজনের খড়্গ পেয়েছিলেন। সেটি এঅঞ্চলের বয়স্ক লোক মাত্রেই অবলোকন করেছেন। পরে সেটি জামতারার ডাঃ এ.মার্টিন এর কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল।

গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পার্বন যথা সময়ে পালিত হলেও মুসলমানদের উৎসবাদিও নিয়মমাফিক পালিত হয়ে থাকে। পৌষ সংক্রান্তি ও ১লা মাঘ গ্রামে শহীদ বাহমানী পীরের উরম উৎসব উপলক্ষে বড় মেলা বসে। কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে পুণ্যার্থী মানুষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে এখানে উপস্থিত হয়ে তারা পীরের পুকুরে অবগাহন স্নান সেরে দরগায় সিন্নী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মানত হিসাবে দিয়ে থাকে। কয়েকদিন ধরে মানুষের মিলন মেলায় গ্রামটি উদ্বেল হয়ে ওঠে। হুগলীর ফুরফুরা শরীফের পর বাহমানী পীরের মেলায় জমায়েত খুবই উল্লেখ্য।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখ করতে হয় গ্রামের আমবাগান, যা তৈরী হয়েছিল মালদহ থেকে মাটি এনে এবং তারই উপর রোপিত হয়েছিল মালদহের আমের চারা, এবার বলতে হয় গ্রামের পশ্চিমে অবস্থিত তুলাক্ষেত্রে কথা। এক সময় এখানে তুলাচাষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু সফলতা না আসায় তা বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে পরে নানা সমবায় ক্ষেত্র এবং বিদ্যালয় ইত্যাদি তৈরী করা হলেও স্থানটি এখনও 'তুলাক্ষেত্র' নামেই খ্যাত।

গ্রামের উল্লেখ্য কয়েকটি পাড়া— হিন্দু মুসলমানের মিলিত বসতক্ষেত্র এই গ্রামে যেমন মুসলমানরা রয়েছেন তেমনি হিন্দুরাও আছেন। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, গোপ ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বহু লোকের বাস লক্ষ্য করা যায়। তাই গ্রামে বেশ কয়েকটি পাড়াও দেখা যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য গুলি হল যথাক্রমে খাদিম পাড়া, দরগা পাড়া, মল্লিক পাড়া, কায়স্থ পাড়া, সদগোপ পাড়া, বাবু পাড়া ইত্যাদি।

কোন পীরের স্থানে আলোদানকারী ব্যক্তিকে খাদিম বলা হয়। তেমনি কোন খাদিমের বসবাস ছিল এই গ্রামে এক পাড়ায়, তাই সেই পাড়া খাদিম পাড়া নামে খ্যাত হয়ে আছে। তেমনি গ্রামে আর একটি পাড়া রয়েছে যাকে দরগা পাড়া বলা হয়।

আমরা জানি মুসলমানদের সমাধিক্ষেত্রকেই দরগা বলা হয়। সেই দরগার অবস্থিতির জন্য এখনও গ্রামের একটি পাড়া দরগা পাড়া নামে পরিচিত। তাছাড়াও গ্রামে রয়েছে মল্লিক পাড়া

এবার আসা যাক কায়স্থ পাড়া, সদগোপ পাড়া ও বাবু পাড়ার কথায়। এই সব পাড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হিন্দুদের অনেক পুরাকীর্তি তথা দেবকীর্তি। সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল— শিবমন্দির, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির ও বহু প্রাচীন দেবালয় ইত্যাদি। তা ছাড়া গ্রামে দুর্গা, ধর্মরাজ, বড়ঠাকুর, পঞ্চানন ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এবং তাদের আটনাদিও আছে। হিন্দুদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে চৈত্রমাসের শিবের গাজন, শ্রাবণ মাসের মা মনসার পূজা বেশ ধূমধামেই পালিত হয়।

গ্রামের বাবু পাড়ায় এখনও বহু প্রাচীণ সৌধের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। একদা বাবু পাড়ার বাবুদেব বিশেষ বোলবোলাও ছিল, তাই স্থানীয় কবি আব্দুল কাদের চৌধুরীর কবিতায় শুনি—

"ইহাদেরই কোন পূর্বপুরুষে গড়েছে চিড়িয়াখানা।
গ্রহ-বিগ্রহেমুড়িয়া দিয়েছে সের সের দিয়া সোনা।।
কুকুরের নাকে ঝুলিত নোলক, পুকুরের মাছে নথ।
পাল্কীতে ছাড়া চলিত না কেহ একটু খানিও পথ।।" (২৭)

লোক সংস্কৃতি— গ্রামে মনসার পূজা উপলক্ষে মনসার গান, ভাদ্র মাসে ভাদুর গান, পৌষ মাসে তসলা ইত্যাদি লোক গান গাওয়া হয়। তাছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দরদী মরমিয়া সুরে মরছিয়া গান, দরবেশ ও ফকিরীগান, বাউলগান, এবং মুসলিম মেয়েদের মধ্যে ঢোলক বাজিয়ে বিয়ের গান গাওয়ার রেওয়াজ আছে। এছাড়াও আলকাপ, লোটো ইত্যাদি গানের চল আছে। এখানকার মেলায় স্থানীয় আলকাপ, লোটো ও পঞ্চরসের গান আদরে গৃহীত হয়।

শিক্ষা ও সাহিত্য— গ্রামে শিক্ষার প্রসার কল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ রয়েছে উচ্চবিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার। গ্রামে শিক্ষিত ও সংস্কৃতি মনস্ক বহু ব্যক্তির আবির্ভাব পূর্বেও ঘটেছে এবং এখনও সেই ধারা অব্যাহত আছে। কৃষি প্রধান গ্রাম হলে কি হবে এখানে উচ্চ শিক্ষিত ও চাকুরীজীবীর সংখ্যা কম নয়। গ্রামে একটি পোষ্ট অফিস সহ বহু জনকল্যান মূলক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। বর্তমানে গ্রামে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী জননেতা ও কবি মরহুম আব্দুল কাদের চৌধুরী এই গ্রামেই জন্মেছিলেন। আরও এক প্রাচীন কবি আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে সুলতান হুসেন শাহের সময় কালেই (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবির নাম আব্দুল আলিম এবং তিনিই সুলতান হুসেন শাহের নির্দেশেই

'মৃগাবতী' নামে এক সুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যের শুরুতেই কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন—

সুয়াতা গাঁয়েতে আছে পীর বাহমান।
মাজার বাঁধাল রাজা জমিদিলদান।।
মৃগাবতীর কথা হেথা শুনেন সুলতান।
আদেশ দিলেন মোরে রচিবারে গান।।
মহাবিদগ্ধ রাজা অতি সুপণ্ডিত।
তার আদেশে রচি গান হরষিত।। (২৮)

কবির লেখাতেই জানা যায় যে, এই গ্রামেই হজরত পীর বাহমনী শাহের মাজার ছিল যা হুসেন শাহ সংস্কার করেছিলেন। কবির কাব্যে হুসেন শাহের সময়ের অনেক কিছুই জানা যায়। যেমন তিনি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন—

গৌড় হতে মান্দারন ছিল এক পথ।
সেই পথ হোসেন শা করে মেরামত।। সেই পথ যে, বাদশাহী সড়ক যা কালুত্তাক বামশোড়ের ভিতর দিয়ে চলে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। পরিশেষে কবির কথাতেই তার কাব্যরচনার সময়কাল ও বংশ পরিচয় প্রদান করে এই গ্রাম সমীক্ষা শেষ করছি—

সুয়াতা মোকাম পীর বাহামান
শাহ মাহমুদ নাম।
আব্দুর রকিব মোর প্রিয় পিতা
করে নকিবের কাম।
পীরের মাজারে দেয় সাঁঝ বাতি
ডঙ্কা বাজায় আর
হাঁকেসে আজান মিনারে চড়িয়া
দিনে রাতে পাঁচবার।
সুয়াতা ভালকী মাঝে মসজিদ
সে যে আল্লার ঘর,
আবুল মজঃফর আলাউদ্দিন হোসেন
বানালেন সেই ঘর।
বছর ধরিয়া রচি মৃগাবতী
আলিমা শুনিতে মন
হিজরী সনের ন'শ কুড়ি হলো
মৃগবতী সমাপন। (২৮)

।। প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি পত্রপত্রিকা ও ব্যক্তি ঋণ ।।

১) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-২০০
২) শিবাখ্যা কিঙ্কর কাব্য—দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২৯২, ২৯৭
৩) Bengal District Gazetteers (Burdwan).
৪) বাংলা স্থান নাম—ডঃ সুকুমার সেন।.... পৃঃ-৬৪
৫) Bengal District Gazetteers (Burdwan).
৬) গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-২৮
৭) প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক—কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত (সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার).... পৃঃ-৩১১
৮) দুর্গাপুরের ইতিহাস—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৩৬
৯) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-৯৩
১০) বর্ধিষ্ণু বর্ধমান—ডঃ হংস নারায়ন ভট্টাচার্য।.... পৃঃ-২৬১
১১) দুর্গাপুরের ইতিহাস—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৭৩, ৩৯
১৩) আসানসোল ইতিহাসের আয়নায় সেকাল, এখাল ও ভাবী কাল—নিশীথ কুমার রায়। দ্রঃ- বর্ধমান সমগ্র (৩য়) সম্পাদনা—ডঃ গোপীকান্ত কোঙার।.... পৃঃ-২৫৮
১৪) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-১০৫
১৫) বাংলা স্থান নাম—ডঃ সুকুমার সেন।.... পৃঃ-১৩০
১৬) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩২০ সাল।
১৭) বর্ধমান পরিচিতি—অনুকূল চন্দ্রসেন ও নারায়ন চৌধুরী।.... পৃঃ-৩২
১৮) আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ-ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায়।.... পৃঃ-৩০
১৯) আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী—ডঃ অতুল সুর।.... পৃঃ-৪৯
২০) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন।.... পৃঃ-৯৭৪
২১) মহারাষ্ট্র পুরাণ—গঙ্গারাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংখ্যা-১৭৮৪, পত্র সংখ্যা-৬
২২) হিতলাল মিশ্রের বক্তব্য।
২৩) তথ্য গ্রহণে—আজকের যোধন—শারদীয়া ১৪০৬ এর রানীগঞ্জ ক্রোড় পত্রের বিভিন্ন প্রবন্ধ।.... পৃঃ-২০-৭৬
২৪) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের রাঢ়ভূমির ঐতিহাসিক ভূগোল ও মহাবীরের চারিকা প্রবন্ধ অবলম্বনে ডঃ বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুদ্ধেশ্বর শিপ ও সুয়াতা গ্রাম'—শারদীয়া বর্ধমান—১৩৮৪ সাল।
২৫) বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।.... পৃঃ-৩৩৫
২৬) তিনটি উপেক্ষিত শিলা লিপি—আব্দুল হালিম।
২৭) কবি আব্দুল কাদের চৌধুরীর কবিতা—"তুমি যাবে মোর গায়ে"। ভেদিয়া বার্তা—১৩৮১
২৮) মৃগাবতী কাব্য—আব্দুল আলিম। আয়ুব হোসেন সম্পাদিত, নারায়ন চৌধুরী প্রকাশিত শারদীয়া বর্ধমান ১৩৯১।

এই অধ্যায় পরিপুষ্টির জন্য যারা তথ্য দানে ঋণী করেছেন ঃ—

১) রাধাশ্যাম রায়, অমরার গড়, বর্ধমান (২) জগবন্ধু চত্রবর্তী, মানকর, বর্ধমান, (৩) ধীরেন্দ্র নাথ মেটে, মানকর, বর্ধমান, (৪) সুধীর চক্রবর্তী, আড়া, বর্ধমান, (৫) নীরদ শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় মাড়ো, বর্ধমান, (৬) সৈয়দ মেহেদি হোসেন— মঙ্গলকোট, বর্ধমান, (৭) লক্ষ্মীনারায়ন গোস্বামী, আউশ গ্রাম, বর্ধমান, (৮) প্রভাত রঞ্জন, গোস্বামী আউশ গ্রাম, বর্ধমান, (৯) ধুর্জটি কুমার গোস্বামী আউশ গ্রাম, বর্ধমান, (১০) বিশ্বনাথ অধিকারী, বননব গ্রাম, বর্ধমান।

।। কৃষ্টির বৈচিত্রে গোপভূমের গ্রাম ।।

(অ)

অমরপুর ঃ— আউশ গ্রাম থানার ২নং ব্লকের ১৫নং জে.এল. ভুক্ত গ্রাম অমরপুর। গ্রামটি কুনুর নদীর সামান্য উত্তরে অবস্থিত। পানাগড়-ইলামবাজার রাস্তায় হরিনারায়ণ পুরে নেমে সামান্য পূর্ব দিকে এগুলে কিংবা ১১ মাইল স্টপে নেমে দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রবর্তী হলে গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের লাগাও রয়েছে 'আদুরিয়া' নামে একটি গ্রাম, তাই এদের পরিচিতিকে স্পষ্ট করার জন্য একত্রে 'আদুরিয়া অমরপুর'ও বলা হয়।

গ্রামে মুসলমান নাই। হিন্দুদের মধ্যে কর্মকার, কায়স্থ, তন্তুবায়, সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশি তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ও আছে, অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সংখ্যাও কম নয়। গ্রামে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা যথা সময়ে যথা নিয়মে পালিত হলেও কালী পূজাই বিশেষ আড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে। গ্রামে হরিনাম তথা ২৪ প্রহর অনুষ্ঠানও বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই উদ্‌যাপিত হয়।

কৃষি কেন্দ্রিক গ্রাম। অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল। চাকুরিজীবীর সংখ্যা কম, তবে এখানের কর্মকার সম্প্রদায় কাঁসা-পিতলের দ্রব্য উৎপাদনের চল এখনও বজায় রেখেছেন। তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে পিতলের ঘড়া বিশেষ উল্লেখ্য।

অমরপুর ঃ— গলসী থানার অধীন ২৫নং জে.এল. ভুক্ত আর এক প্রাচীন গ্রাম অমরপুর। এটি 'বঙ্গেরদুঃখ' নামে খ্যাত প্রাচীন দেবনদ দামোদরের উত্তর তীরে অবস্থিত। নিকটবর্তী রেলস্টেশন পারাজ। পারাজ থেকেও গ্রামে যাওয়া যায়। বর্তমানে বর্ধমান থেকে সরাসরি বাসযোগেও গ্রামে যাওয়া যায়।

গ্রামে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস এবং সম্প্রদায়গত ভাবে বেশ কয়েকটি পাড়াও রয়েছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈরাগ্য, কুম্ভকার, সূত্রধর, তিলি, তাম্বুলি, নাপিতসহ বহু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বাস। এখানকার কুম্ভকারেরা এখনও জাতিগত পেশা, মৃৎ শিল্পে নিযুক্ত থেকে বিভিন্নদেব-দেবীব মূর্তি নির্মাণ সহ অন্যান্য মৃৎ পাত্রও তৈরি করে থাকেন।

গ্রামে প্রবেশের মুখে বাম দিকে চোখে পড়বে একটি প্রাচীন শিব মন্দির। তা ছাড়াও গ্রামে পঞ্চানন্দ, শীতলা ও বাবাঠাকুরের মন্দির রয়েছে। এখানে প্রতিবছর

বৈশাখী পূর্ণিমায় মহা আড়ম্বরে দিদিঠাকরুনের গাজন উৎসব বহু ভক্ত সহকারে পালিত হয়। তাছাড়া পৌষ সংক্রান্তির পূণ্য স্নান উপলক্ষে এখানকার দামোদরের তীরে এক দিনের জন্য একটি মেলাও বসে। মেলাটি প্রাচীনত্বের দাবিদার। গ্রামে একটি পীরের স্থানও বর্তমান আছে।

কৃষিপ্রধান গ্রাম। অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষি নির্ভর হলেও অনেকেই চাকুরি ও ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। গ্রামটি কৃষ্টি সম্পন্ন গ্রাম। এখানে মনসার ভাসান, সাঁকি এবং লোক সঙ্গীতের চর্চা আছে। গ্রামে এক অন্ধ সন্তান লোকসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই গ্রামেরই এক সুসন্তান আপন সাধন দৌলতে রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হিসাবে ব্রতী আছেন। 'কলকল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক তথা মেমারী মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষাব্রতী বিশ্বনাথ পাল মহাশয়ও এই গ্রামেরই সন্তান।

অণ্ডাল ঃ— অণ্ডাল থানার সদর কার্যালয়, অণ্ডালের জে.এল. নং-৫২। এটি একটি প্রাচীন গ্রাম। অণ্ডাল স্টেশন (জংশন) থেকে প্রায় ৪ কি.মি. উত্তর-পূর্বে জি.টি. রোডের পাশেই এর অবস্থান। বর্তমানে কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান ও রেল কর্মীদের বসবাসের কলোনী শহর হিসাবে গড়ে ওঠায়, এখানে ভিন প্রদেশ থেকে আগত বহু ব্যক্তির সমাবেশে এর গ্রাম পরিবেশ দূরীভূত হয়ে এখন এটি একটি মিশ্র কৃষ্টি সম্পন্ন শহরে পরিণত হয়েছে এবং শহর হিসাবে এর গুরুত্বও সম্যক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখনও এখানে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যে দেবতার পূজা সমধিক গুরুত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় সেটি হল ধর্মরাজের গাজন বা পূজা। বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন বহু ভক্ত সহকারে বেশ ধুমধামেই পালিত হয়। তাছাড়াও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজাও পালিত হয়। চাকুরি ও ব্যবসাই এখানকার লোকের বর্তমান জীবিকা। লোককৃষ্টির দ্যোতক হিসাবে এখানের অণ্ডালদক্ষিণ বাজারে, বৈশাখ মাসে মহাবীর ঝাণ্ডা উপলক্ষে তিন দিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। [১]

(আ)

আটঘড়া ঃ— মঙ্গলকোট থানায় অজয়নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এক কৃষিপ্রধান গ্রাম আটঘড়া। নতুনহাট-গুসকরা বাসরাস্তা চালু হওয়ার ফলে গ্রামে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। গ্রামটি বাসরাস্তার উত্তরে কল্যানপুরের লাগাও গ্রাম তাই উভয় গ্রামকে নিয়ে একত্রে 'আট ঘড়া-কলান পুর' বলা হয়। গ্রামটির জে.এল. নং হল ৫৪। গ্রামে চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই সীমিত। অজয় নদীর পলি গঠিত ক্ষেত্র হওয়ায় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম বর্ধমানই আলুচাষের ক্ষেত্র। সে হিসাবে এই গ্রামেও প্রচুর পরিমাণে আলু ও ধানের চাষও হয়ে থাকে।

গ্রামে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস হলেও ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপদের সংখ্যাই বেশি। অন্যান্য গ্রামের মত এখানেও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা পার্বণ যথা নিয়মেই হয়ে থাকলেও গ্রামের মুখ্য উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় 'রাধামাধব' বিগ্রহের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে। প্রতিবছর ফাগুন মাসের ১২ই হতে ২৮ তারিখ পর্যন্ত রাধামাধবের বিগ্রহ এখানে অবস্থান করেন। বিগ্রহ বেশ বড়। রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ, সঙ্গে আছেন জগন্নাথ দেব। বিগ্রহগুলি সবই দারু নির্মিত। সেই সময় বিগ্রহকে সামনে রেখে তার সেবা পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রাম উৎসবে মেতে ওঠে। সেই উৎসবই গ্রামের বাৎসরিক গ্রাম্য উৎসব। তখনই গ্রামের লোক আত্মীয়-পরিজনদের গ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানায়। রাধামাধব দর্শনের জন্য বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ সেখানে সমবেত হয় এবং মহোৎসবও চলতে থাকে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কন্যা গঙ্গা মাতার বংশীয় গোস্বামী পরিবারই হলেন রাধামাধবের সেবক ও পূজক। তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেন অর্দ্ধেন্দু শেখর গোস্বামী। এ উপলক্ষে বহুজনের সমাগম হওয়ায় গ্রামে তখন ছোটখাট মেলার মত বসে।

গোস্বামীদের একতলা দালান মন্দিরে রাধামাধবের অধিষ্ঠান হয়। মন্দিরের সামনে নতুন আটচালা নির্মিত হয়েছে। তবুও স্থান খুব সংকীর্ণ। উৎসবে জন-সমাগমে তাই খুবই অসুবিধা হয়। গ্রামে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন কৃত্যাদি সহ।

আলুটিয়া ঃ— একদা সুশীলা ও আলুটিয়া মিলে দিগনগর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন একই মৌজায় অবস্থিত ছিল। গ্রামটি আউশগ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত এবং এর জে.এল. নং-১৫৪। গ্রামটি গুসকরা সংলগ্ন পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হওয়ার সুবাদে এখন এটি গুসকরা মিউনিসিপ্যালিটির আওতা ভুক্ত হয়েছে। সেদিক থেকে এটি শহর এলাকার অধীন হলেও এখনও এর গ্রাম্যরূপ অবলুপ্ত না হয়ে পরিপূর্ণই বর্তমান আছে।

গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। ইদানিং কালে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের অনেক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গ্রামে 'রায়' উপাধির বহু সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের বাস থাকলেও কিছু কৈবর্ত গোষ্ঠীও রয়েছে। তাছাড়া অন্ত্যজ গোষ্ঠীও অনেক আছে। গ্রামে প্রাচীন পুরাকীর্তির মধ্যে একটি মসজিদ রয়েছে। বর্তমানে এই গ্রামের ঈশান কোনে তৈরি হয়েছে পরেশনাথ মণ্ডলের সৌজন্যে ও শিষ্য সাধারণের দানে এক নয়নলোভন রামমন্দির। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেব-দেবীর নিত্য পূজা চালু থাকলেও এখানে বাৎসরিক ও বিশেষ উৎসব রামনবমীতে উদযাপিত হয়। তখন মহোৎসবে দুরদূরান্ত থেকে বহু লোক সমাগম হয়ে থাকে এবং সেই উৎসবকে ঘিরেই ছোটখাট এক মেলাও বসে।

আলিগ্রাম ঃ— আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত এটি একটি বড় গ্রাম। গুসকরা-বর্ধমান

সিউড়ি রোডের ওড়গ্রামে নেমে কিছুটা পশ্চিমে গেলে কিংবা গুসকরা-বুদবুদ রাস্তার কেঁয়োতলায় নেমে দক্ষিণপূর্বে গেলে ঐ গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটির জে.এল. নং-১৬৫। এখানে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস হলেও 'লাহা' উপাধির সদ্‌গোপেরা বেশ বর্ধিষ্ণু। গ্রামে লাহাদের দুর্গাবাড়ি রয়েছে। সেখানে ধুমধামে দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয়। কৃষিপ্রধান গ্রাম হলেও এখন অনেকেই চাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে রত আছেন। গ্রামে কয়েকটি শিবমন্দিরসহ ধর্মরাজ মন্দির বিগ্রহ বর্তমান। অন্যান্য দেব দেবীর পূজা গ্রামে সময় মত অনুষ্ঠিত হলেও ধর্মরাজের উৎসব গাজনাদি বিশেষ ধুমধামে পালিত হয়। এটিই গ্রামের গ্রাম্যউৎসব। আত্মীয়-পরিজনদের তখন গ্রামে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বহু ছাগ, মেষ বলিদানসহ ধর্মরাজের পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রতিবছর ১৩-১৫ই আষাঢ় এখানে ধর্মগাজন অনুষ্ঠিত হয়। একে কেন্দ্র করেই গ্রামে তখন বহু লোকের সমাগম হয় এবং একটি মেলাও বসে।

আদরাহাটি ঃ— গলসী থানার ২নং ব্লকের অধীন ৭৮ জে.এল. ভুক্ত এই গ্রামটি দামোদর নদের উত্তর অংশে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম। বর্ধমান থেকে আদরাহাটি বাসে সরাসরি গ্রামে যাওয়া যায়। নিকটবর্তী রেলস্টেশন হল গলসী। গলসী থানার মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের বিজয় সেনের এক তাম্র শাসনে বেশ কয়েকটি গ্রামের উল্লেখ আছে, তাতে 'অধকরক' নামে উল্লেখিত গ্রামটিকেই ভাষাচার্য শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন আদরা বলেই উল্লেখ করেছেন। সেদিক থেকে গ্রামটি যে বেশ প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই।

গ্রামের মাঝামাঝি অংশের এক উচ্চস্থানে আদরেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। এই শিবই এখানকার গ্রাম্য দেবতা। অনেকের বিশ্বাস এই 'আদরেশ্বর' শিব নাম থেকেই গ্রাম নাম আদরাহাটি হয়েছে। এখন গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন দু'ধরনের ব্যাখ্যা দান করেছেন। তাঁর মতে গ্রামে ছিল এমন একটি হাট যেখানে জিনিষ পত্রের দরদাম করতে হত না, অর্থাৎ আ-দরাহাট > আদরাহাটি গ্রামনাম হয়েছিল। অন্য ব্যাখ্যায় বলতে চেয়েছেন-হাটীদের বসত ক্ষেত্র। [২] অনেকেই বলেন— একদা গ্রামের আদাড়-পাঁদাড় ঘন জঙ্গলে আধার হয়ে থাকত এবং সেখানে 'হাটী' উপাধিক সম্ভ্রান্ত উগ্রক্ষত্রিয়রা বসতক্ষেত্র গড়ে তোলায় গ্রাম নাম আদরাহাটি হয়েছে। সেটা হলেও তা হবে অর্বাচীন কালের কথা। কিন্তু মল্লসারুল তাম্র শাসনে যে গ্রামের উল্লেখ রয়েছে সে তো খুবই প্রাচীন গ্রাম আর গ্রামের আদরেশ্বর শিবও খুবই প্রাচীন। তাই দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় গ্রাম নাম আদরেশ্বর শিবের নাম থেকেই আদ্রাহাটি হয়েছে। এই শিব লিঙ্গটির বিশেষত্ব হল, এর রুদ্রভাগে খোদিত রয়েছে এক দেবমূর্তি— যা সচরাচর অন্য শিবলিঙ্গে দেখা যায় না। তাই এটি বিরল ধরনের শিবলিঙ্গ এবং খুবই প্রাচীন। শিল্প শাস্ত্র মতে একে 'মুখলিঙ্গ' শিব বলা হয়। এই ধরনের শিবলিঙ্গ গ্রামে

দু'টি ছিল। বর্তমানে অপরটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ শালায় স্থান পেয়েছে। মন্দির অভ্যন্তরে শিবের পাশেই প্রস্তরখোদিত এক জয়দুর্গা মূর্তিও বর্তমান। মূর্তিটি খুবই প্রাচীন এবং অসুরদলনী দেবী দুর্গারই প্রাচীন রূপ।

বঙ্গে আর পাঁচটি শৈব উৎসবের মত এখানেও শিবকে ঘিরে চৈত্র মাসে মহা ধুমধামে শিবের গাজন উদ্‌যাপিত হয়। এই গাজনকে ঘিরেই গ্রামে তখন কয়েকদিনের জন্য একটি মেলাও বসে। গ্রাম্য দেবতা আদরেশ্বরের গাজনই এখানকার গ্রাম্য উৎসব। তাই গ্রামবাসীরা এই উপলক্ষে আত্মীয়-পরিজনদের গ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানায়। মন্দিরের সামনে একটি টিনের আটচালা, চত্তরে একটি ভোগঘর, একটি প্রাচীন তমাল বৃক্ষ ও এক বিল্ববৃক্ষ বর্তমান। ১৪০৮ সালে মন্দিরটি সংস্কৃত হয়েছে।

গ্রামে বেশকয়েকটি পরিবারকেন্দ্রিক দেববিগ্রহ ও তাদের মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেমন— গোস্বামী পরিবারে রয়েছে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ। এর উৎসব পালিত হয় কার্তিক মাসে। মুখার্জী পরিবারে পঞ্চচূড়া রীতিতে তৈরি শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ বর্তমান। মন্দিরের অগ্রভাগে কিছু টেরাকোটার কাজে এক মিথুনচিত্র সংযোজিত রয়েছে। বণিকপরিবারের প্রতিষ্ঠিত দু'টি শিবমন্দির বর্তমান। এগুলি অষ্টাদশ শতকের নির্মিত বলেই মনে হয়। এছাড়াও দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত এক পঞ্চরত্নের বিষ্ণুমন্দির রয়েছে তবে বর্তমানে তাতে কোন বিগ্রহ নাই।

গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অনেকগুলি পাড়ার সংযোজনে গ্রামের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমান অধিবসতিও রয়েছে। গ্রামে হাট-বাজার সবই বর্তমান। গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ও আছে।

গ্রামের পশ্চিমে ঘোষ পাড়া যাবার পথে এক ফাঁকা জায়গায় ভগ্ন অবস্থায় এক সূর্য মূর্তির চিহ্ন দেখা যায়। গ্রামের একেবারে পশ্চিমে রয়েছে ৩টি মুসলমান পাড়া তার মধ্যে প্রাচীন দলিজ (বৈঠকখানা) সহ সম্ভ্রান্ত মিঞা পাড়াও বর্তমান। সেখানে পূর্বমুখী তিন গম্বুজ যুক্ত প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন এক বিশাল মসজিদ বর্তমান। নবাবী আমলে কোন এক সাতেহ সাহেব ফার্সিতে লেখা দলিলে মসজিদকে কিছু জমি দান করেছিলেন তা জানা গেল, মসজিদটির সংস্কার চলছে। এর গায়ে অনেক ফুল ও জাফরির কাজ রয়েছে। উপরে পশ্চিমে রয়েছে দু'টি ছোট মিনার আর পূর্বে চার স্তবকে সৃষ্ট দু'টি বড় মিনার।

এবার গ্রামের পূর্ব প্রান্তে বঙ্কিম গতিতে বয়ে যাওয়া বাঁকা নদীর উত্তরে গ্রামীণ হাসপাতালের পূর্ব গায়ে ঘন আম্র ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষছায়ায় আচ্ছাদিত মনোরাম পরিবেশে সতীডাঙ্গায় সৃষ্ট 'সর্বেশ্বর সাধন তীর্থ' আশ্রমের কথায় আসি।

সতীডাঙ্গা নাম　　সর্বেশ্বর ধাম
বক্রেশ্বরী নদী ধারে।

দেখিতে সুন্দর অতিমনোহর
মুনিজন মন হরে।। [৩]

সেই সতীডাঙ্গায় পুরাকালে ৪টি গ্রামেব (আদ্রা, কৈতারা, মহরাও বেলান) জন্য এখানে একটি মহাশ্মশান ছিল। সেখানে একদা সতীদাহ হওয়ায় স্থানটি 'সতীডাঙ্গা' নামে পরিচিত। এখনও এখানে সেই সতীর স্মৃতি-মন্দির বর্তমান আছে। সাধক সর্ব্বেশ্বর এখানেই আশ্রয় নিয়ে সাধন-ভজনে রত ছিলেন। তাঁর সাধনোচিত অলৌকিকত্বের বহু ঘটনা লোক মুখে বহুল প্রচলিত আছে। যেমন— দারুণ খরায় বৃষ্টি দান, যবনের খাদ্য ফুলে পরিণত করা, অসময়ে বাউল গায়কদের আমষোল ভোজন, ব্রাহ্মণগণকে এক বছরের বাসি খিচুড়ি মাটির তলা থেকে বের করে গরম অবস্থায় পরিবেশন, বিসূচিকা রোগীর প্রাণদান ইত্যাদি ইত্যাদি [৪]।

এখানেই পরবর্তীকালে দেবী প্রসাদগোস্বামী এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং যুগল বিগ্রহ স্থাপনে তার পূজা আরাধনাসহ এই আশ্রম পরিচালনা করেন। বর্তমানে তার কনিষ্ঠ পুত্র স্বপন গোস্বামীই এর পরিচালক। এখানে ১৭ই চৈত্র থেকে ২০শে চৈত্র পর্যন্ত বাৎসরিক অনুষ্ঠান চলে। তাতে নাম কীর্তন অনুষ্ঠানসহ খিচুড়ি ভোগে ভক্তসেবা হয়ে থাকে।

গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস, তবে 'হাটী' উপাধির উগ্রক্ষত্রিয়ের সংখ্যাই বেশি। কৃষি কেন্দ্রিক গ্রাম হলেও এখানে চাকুরিজীবীর সংখ্যাও কম নয়। গ্রামে বহুজ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীসহ বহু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের আধিক্য রয়েছে।

আকন্দরা ঃ— কাঁকসা থানার ৪৭ নং জে.এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম আকন্দরা। কাঁকসা-পানাগড় রাস্তায় এই গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামের উন্নতি তথা বিভিন্ন পুরাকীর্ত্তির প্রবর্তক ছিলেন তৎকালীন জমিদার গুরুচরণ রায়। তিনিই গ্রামে বেশ কয়েকটি 'শ্বর' যোগে নামিত শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে তাদের মন্দিরাদি নির্মাণ করেছিলেন। শিবলিঙ্গগুলি হল যথাক্রমে লক্ষেশ্বর, রামেশ্বর, বানেশ্বর এবং ভূষনেশ্বর। তাদের অধিষ্ঠিত মন্দিরগুলিও বেশ দর্শনীয়। তাছাড়া ও তার আমলেই তৈরি কালী মন্দির এবং লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরও বেশ দর্শনীয় বস্তু। গ্রামে প্রাসাদোপম জমিদার বাড়িটিও পুরাকীর্ত্তির আকর্ষণীয় এক নিদর্শন তাতে সন্দেহ নাই।

(ই)

ইটা ঃ— মঙ্গলকোট থানার ১৩০ নং জে.এল. ভুক্ত গ্রাম ইটা। কাটোয়া-বর্ধমান বাস রুটে কৈচর স্টপে নেমে সামান্য দক্ষিণে গেলেই গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামে যে সকল পুরাকীর্তি বর্তমান তার মধ্যে সব থেকে আকর্ষণীয় হল, গ্রামের প্রায় মধ্যস্থলে

অবস্থিত অষ্ট কোনাকৃতি টেরাকোটা অলংকরণে সুসমৃদ্ধ পুরাতন এক শিবমন্দির। শোনা যায় পূর্বে এখানে নাকি ১২টি শিবমন্দির বর্তমান ছিল কিন্তু কালের কবলে অবশিষ্টরা উধাও হয়ে গেলেও তারা যে ছিল তার প্রমাণ হিসাবে তাদের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরগুলি প্রায় সবই ১৫ ফুটের মত উচ্চতায় গঠিত হয়েছিল।

গ্রামের দক্ষিণ অংশে একস্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ৯" উচ্চতা বিশিষ্ট এক গড়ুর মূর্তি। গ্রামের দক্ষিণে রয়েছে সর্বজন মান্য এক পীরের আস্তানা। গ্রামের 'দোলতলা' নামক স্থানে রাজদোলকে উপলক্ষ্য করে সেখানে ২/৪ দিনের জন্য একটি মেলাও বসে। গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু রায়চৌধুরী পরিবার যারা একদা বীরভূম জেলার শাহশিলামপুর গ্রাম থেকে উঠে এসে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাদেরই বাড়িতে ১০" উচ্চতা বিশিষ্ট এক লৌকিক দেবতা 'এলাইচণ্ডী' প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং তার নিত্য সেবাও পরিচালিত হয়। এছাড়াও ঐ পরিবারের এক দেবালয়ের এক কক্ষে প্রতিষ্ঠিত আছেন 'শ্যামরায়' এবং অন্য কক্ষে যন্ত্রে রক্ষিত আছেন— তারা, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী, মঙ্গলচণ্ডী ও দক্ষিণাকালী।

ইছাবটগ্রাম ঃ— এ গ্রামটিও মঙ্গলকোটের অজয় সান্নিধ্যে অবস্থিত উজানি নগরের পূর্ব প্রান্তের এক সমৃদ্ধশালী গ্রাম। গ্রামটির জে.এল. নং-৮০। অজয়ের দক্ষিণ তীরে এর অবস্থান। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তিনি তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতিসদাগরের কাহিনীতে ইছানি নগরের উল্লেখ করেছেন। সেই ইছানি নগরী ধনপতি সদাগরের স্ত্রী খুল্লনার পিতৃগৃহ হিসাবে উল্লেখিত। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "ইচ্ছানি নগরে ঘর পিতা লক্ষপতি।" [৫] অনেকের মতে এই ইচ্ছাবট গ্রামই চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের সেই ইচ্ছানি নগর এবং তা যদি হয়, তবে এই গ্রাম অন্তত ৪০০ বছরের অধিক প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই।

গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণুগ্রাম। হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ের বসতি এখানে দেখা যায়। গ্রামে প্রাচীন দেবকীর্তি বলতে রয়েছে ধর্মঠাকুর, শিব, কালী ইত্যাদি দেবদেবী, এখানে ব্যক্তিগত ভাবে অনেকের বাড়িতে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকলেও গ্রামের সর্বসাধারণের পূজ্য দেবতা হলেন ধর্মরাজ। সেদিক থেকে এই ধর্মরাজই হল গ্রাম দেবতা। এরই পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের লোক আত্মীয়-পরিজনদের আমন্ত্রণ জানায়। ইনি গ্রামে 'রাজরাজেশ্বর' নামে পরিচিত। বুদ্ধপূর্ণিমাকে কেন্দ্র করেই গ্রামে এই ধর্ম রাজের গাজন মহাধুমধামে পালিত হয়। গাজনে ভক্তও হয়ে থাকে অনেক। তাদের সংখ্যা কোন কোন বছর ৬০ এর মতও হয়ে যায়। গাজনের যাবতীয় অনুষ্ঠান যেমন কামান, ফল, হবিষান্ন সবই পরিপূর্ণ ভাবে পালিত হয় এবং পরিশেষে পূজায় বহু সংখ্যক ছাগ বলিও দেওয়া হয়। গাজন সন্ন্যাসীদের করণীয় কাজ যেমন বানফোঁড়া, দণ্ডিকাটা,

আগুন সন্ন্যাস, ফুলখেলা সবই হয়ে থাকে। এই গাজনকে ঘিরেই তখন গ্রামে একটি মেলাও বসে। এই ধর্মরাজের বিশেষ মহিমা হল— মেয়েদের বাধক, বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ ও যাবতীয় পেটের বোগ, শ্বেতি এবং কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগের নিরাময় সাধন। এর জন্য এখান থেকে ওষুধও দেওযা হয়। লোকশ্রুতিতে জানা যায় এখানকার এক বৃদ্ধ বটবৃক্ষতলে, অনেকেরই অনেক ইচ্ছা পূরিত হত, তাই গ্রামনাম 'ইছাবটগ্রাম' হয়েছে।

ইরকোনা ঃ— গলসী থানার ১০৩নং জে.এল. ভুক্ত এই গ্রাম। বর্ধমান-আদরাহাটি বাসধরে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস থাকলেও এটি একটি বৈষ্ণবীয ভাবপুষ্ট গ্রাম। তাই প্রতিবছর মাঘ মাসে তিনদিন ধরে রাধাকৃষ্ণের স্মরণ উৎসবে অখণ্ড নাম-যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। সে উপলক্ষে গ্রামবাসীর সঙ্গে অন্যান্য বহুগ্রাম থেকেও ভক্ত বৈষ্ণবেরা অংশ নিয়ে থাকেন। এতে বহু তপসিলি সম্প্রদায়ের লোকেদেরও সাগ্রহে অংশ নিতে দেখা যায়। সে উপলক্ষে তখন এখানে কয়েকদিনের জন্য একটি আকর্ষণীয মেলাও বসে।

ইটেডাঙ্গা ঃ— কাঁকসা থানার অধীন বিদবিহার অঞ্চলের দণ্ডেশ্বর মৌজায় অজয় নদীর দক্ষিণে এক ছোট্ট গ্রাম ইটেডাঙ্গা। এখানে কয়েকঘর ধীবর শ্রেণীর লোকের বাস, যাদের স্থানীয় ভাবে কেওট বলা হয়। এই গ্রামের আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য হল গ্রামের এক নিম্ববৃক্ষতলে নির্মিত বেদীর উপর অনেকগুলি আকার অবয়বহীন প্রস্তর খণ্ড সংগৃহীত আছে— যাকে গোঁসাই ঠাকুর বলা হয়। পরম নিষ্ঠায় এখানকার লোকেরা এই লৌকিক দেবতার পূজা করে থাকেন। যারা এর পূজা পরিচালনা করেন তারা গোঁসাই কেওট নামে খ্যাত।

(উ)

উল্লাসপুর ঃ— বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ১নং ব্লকের গোপাল পুর মৌজায় এই গ্রামের অবস্থান। ভেদিয়া-গুসকরা ভায়া মোরবাঁধ রাস্তায়, দীননাথপুরে নেমে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি ছোট হলেও বেশ প্রাচীন। পাশের গ্রামের (খটনগরের) জমিদার মূলচাঁদ রায় যিনি বর্ধমান রাজপরিবারে কর্মরত থাকাকালীন আর্থিক সচ্ছলতার অধিকারী হয়ে নিজগ্রামে বহু দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করে কিছু মন্দিরাদিও নির্মাণ করেছিলেন। তিনিই এখানকার বন্দোপাধ্যায় বংশীয় ব্রাহ্মণদের বর্ধমান রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সেই ব্রাহ্মণরা আপন পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে রাজার নিকট হতে সম্মানীয় 'পাঠক' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং এখনও তারা বংশানুক্রমিক ভাবেই সেই পাঠক উপাধিই বহাল রেখেছেন।

শোনা যায় পূর্বে এই গ্রামবাসীরা আপনকাজ কর্মের ফাঁকে যাত্রা, থিয়েটার, গান-বাজনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকতেন, তা থেকেই এই গ্রামের নাম হয়েছে উল্লাসপুর। অপভ্রংশে উলুসপুর নামেও খ্যাত।

গ্রামের প্রাচীন দেবকীর্তির মধ্যে অষ্টনায়িকা দুর্গা বর্তমান আছেন। একতলা দালান মন্দিরে মায়ের অবস্থান। অষ্টধাতুর তৈরি অষ্টদলের মাঝে দুর্গার মস্তক শোভা পাচ্ছে। এখানে দেবীদুর্গার কোন হাতের হদিশ নাই, তবে পদ্মের প্রতিটি দলে এক একটি নায়িকা যেমন— কৌমারী, নরসিংহী, সর্ব্বমঙ্গলা ইত্যাদি অষ্টনায়িকার প্রতিকৃতি দেখা যায়। তাই এই দেবী অষ্টনায়িকা দুর্গা নামে খ্যাত।

দেবী খুবই প্রাচীন। মজার ব্যাপার এই যে, একই সিংহাসনে শাক্তদেবী অষ্টনায়িকা দুর্গা ও তার পূর্ব গায়ে রয়েছেন শ্রীধর মূর্তি। অর্থাৎ একই মন্দিরে একাধারে শাক্ত ও বৈষ্ণবের সমাবেশ বা উভয়ের মিলন সাধিত হয়েছে। দেবীর অন্নভোগসহ নিত্য সেবা হয়, তাছাড়াও শারদীয়া পূজার চারদিন এই দেবীর মহাধুমধামে পূজা হয়ে থাকে। যেহেতু দুর্গার ধাতু মূর্তি গ্রামে রয়েছে তাই গ্রামে কোন মৃন্ময়ী দুর্গা মূর্তি আসে না এবং দেবীর শারদীয়া পূজা যথা নিয়মে প্রতিপালিত হলেও কোন বলিদান এখানে দেওয়া হয় না। কারণ যেহেতু এখানে বৈষ্ণব দেবতা শ্রীধর বর্তমান। দেবীর পূজক পাঠক বংশীয় ব্রাহ্মণেরাই। বংশানুক্রমিক ভাবে পালা ক্রমে এরা দেবীর পূজা করে আসছেন তার মধ্যে বর্তমান পূজকরা হলেন শ্রীধর, রতন ও জগদীশ পাঠক।

গ্রামে কার্তিক মাসে মৃন্ময়ী কালী পূজা খুবই ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। কালী মন্দিরের পূর্ব ও দক্ষিণে দু'টি প্রাচীন ও সাদামাঠা শিবমন্দির বর্তমান। এগুলি ছাড়াও পূর্ব প্রান্তে এক বাঁশ ঝাড়ের ফাঁকে রয়েছে প্রস্তররূপী দেবীমনসা। শোনা গেল অতীতে কোন এক সময় অজয়ের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকে দেকুড়ি গ্রাম থেকে অনেকটা পদ্মের আকার বিশিষ্ট এই প্রস্তর খণ্ডটি ভেসে এসে এখানে লেগেছিল। বন্যার পরে দেকুড়ি গ্রামের লোকেরা দেবীর এই গ্রামে অবস্থানের কথা জানতে পেরে এখান থেকে দেবীকে নিয়ে যাবার মনস্থ করলে দেবী স্বপ্নাদেশে তাদের নিবৃত্ত করেন। তদবধি দেবী এখানেই পাঠক বংশীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারাই পূজিত হচ্ছেন। দেবীর নিত্যপূজা ছাড়াও দশহরা, প্রতিপঞ্চমী ও শেষ পঞ্চমীতেও বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। তবে শেষ পঞ্চমীতেই এখানে দুর দূরান্ত হতে বহু ভক্ত মানসিক স্বরূপ ছাগবলিসহ পূজা দিয়ে যায়।

দেবী খুবই জাগ্রতা। লোকবিশ্বাস দেবী এখানে থাকায় মানুষের সর্প ভীতি নাই। তবে কারও যদি সর্পদংশন হয়েও থাকে তাকে দেবীর স্থানের মৃত্তিকা ও স্নানজল খাওয়ালেই নাকি সুস্থ হয়ে যায়। এ ছাড়াও দেবী কলেরা ও বসন্ত রোগেরও প্রতিরোধ করে থাকেন। গ্রামটি ছোট হলেও পারস্পরিক মেলবন্ধন বেশ নিবিড়। গ্রামের উত্তরে ক্যানেল থাকায় এবং ভূগর্ভের জল উপরে আনার সুযোগ থাকায় পলিবহুল এখানের মাঠে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়।

উত্তর রামনগর ঃ— আউশ গ্রাম থানার ২নং ব্লকেই গ্রামটি অবস্থিত। এর জে.

এল. নং-১২৪। ভেদিয়া মোর বাঁধ পাকা রাস্তাটি খটনগর ও উত্তররাম নগর গ্রাম দু'টির বিভাজন সৃষ্টি করেছে। ঐ রাস্তার উত্তরে খটনগর এবং দক্ষিণে রামনগর। গ্রামটি বেশ প্রাচীন এবং বহু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামের বহু শিক্ষিত ব্যক্তিই কর্ম উপলক্ষ্যে বাইরেই বসবাস করেন। তবে গ্রামের দুই প্রধান উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা ও হরিনামে অনেকেই গ্রামে আসেন। গ্রামের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীন ভগ্ন বাড়ি দেখা যায় যেগুলি জমিদার বাড়ি নামে খ্যাত। গ্রামে একটি দ্বিতল ইটের তৈরি ঠাকুর বাড়ি রয়েছে, যার মধ্যে অনেক দেববিগ্রহ বর্তমান। প্রতিষ্ঠাতাদের প্রদত্ত জমি-জায়গার মাধ্যমেই সেই সকল দেবতার সেবা পরিচালিত হয়। সামনে আটচালাসহ একটি মনসার আটন আছে যেখানে ভাদ্রের সংক্রান্তিতে বেশ সমারোহে মনসার পূজা হয়ে থাকে। চ্যাটার্জীদের গ্রামে পাকা দুর্গামণ্ডপ রয়েছে আর রয়েছে সামনে আটচালাসহ হরিমন্দির যেখানে জাঁকজমক সহকারে হরিনাম মহোৎসব পালিত হয়।

গ্রামে একটি উচ্চবিদ্যালয়, পঞ্চায়েত অফিস, পুলিশ ফাঁড়ি, দৈনিক বাজার, হাসপাতাল ও ব্যাঙ্ক বর্তমান। গ্রামে হাই স্কুলের পাশে এক নিম্ব বৃক্ষ তলে 'ব্রহ্মদৈত্য' নামে এক লৌকিক দেবতার পূজা হয়ে থাকে। প্রতিবছর ১লা মাঘ এই পূজা হয়। পূজায় মানত হিসাবে মাটির ঘোড়া প্রদান করাই রীতি। পণ্ডিতদের মতে এটি কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুক, ব্রহ্মদৈত্য হিসাবে স্বীকৃত হয়ে পূজা পাচ্ছেন। একে ঘিরে ছোট খাট একটা মেলাও বসে। প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছে জানা যায় তিনি নাকি এই গ্রামের চ্যাটার্জী পরিবারের কোন সন্তান ছিলেন। উপনয়ন কালে ব্রহ্মচারী থাকাকালীন সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিলেন। লোক বিশ্বাস তিনিই ব্রহ্মদৈত্য হয়ে এখানে অবস্থান করেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই দেবতাকে ভক্তি করেন কারণ তিনি রুষ্ট হলে সমূহবিপদ— সে রকম বহু লোক কাহিনী এখানে শোনা যায়।

উড়ো ঃ— গলসী থানার ১৩৭ জে.এল. ভুক্ত এই গ্রামটি বর্ধমান থেকে ১৫ কি.মি. পশ্চিমে জি.টি. রোডের গায়েই অবস্থিত। পূর্বে এই পথে গ্রামটি তখনকার দিনে পথিকদের বিশ্রাম স্থল ছিল তাই এটি উড়োর চটি নামে খ্যাত হয়েছিল। গ্রামের অনেক পুরাকীর্তির মধ্যে সব থেকে উল্লেখ্য হল— এক দালান মন্দিরে রায় পরিবার প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর নির্মিত বিশাল সিংহবাহিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয়দুর্গার মূর্তি। পাষান নির্মিত এই বিগ্রহটি বঙ্গে এক বিরল সংযোজন। (বীরভূম জেলার অজয় নদীর উত্তর তীরে দেউলী নামক এক গ্রামে পার্বতীর এক প্রস্তর মূর্তি রয়েছে বটে তবে তা উচ্চতায় ছ'ফুটের বেশি হবে না) শারদীয়া দুর্গাপূজার আগে থেকে বোধন। নবমী হতে বিজয়া দশমী পর্যন্ত বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবীর পূজা হয়ে থাকে।

উনবিংশ শতকে গ্রামের মনীন্দ্রনাথ রায় এবং অরুন রায় জোড়া রেখ দেউল রীতিতে শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। গ্রামে আরও রয়েছে 'কালাচাঁদ' নামে ধর্মরাজ

বিগ্রহ। পূর্বে সেখানে বেশ ধুমধামে গাজন উৎসব পালিত হত এখন তা একে বারেই বন্ধ হয়ে গেছে। এই ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে লোকে পোড়া মাটির হাতি উৎসর্গ করে। ঐ সকল পুরাকীর্তি ছাড়াও গ্রামে দুর্গাপদ রায়ের বাড়িতে রয়েছে প্রস্তর নির্মিত এক মনসা মূর্তি। দশহরার দিনে এই মনসার বিশেষ বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে এক ভট্টাচার্য বাড়িতেও বিশালাক্ষী দেবীর এক প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ডোমপাড়ায় পূজিত হয় এক ডাকাত কালী।

এবার প্রাচীন কৃষ্টির কথা ছেড়ে এক নবসৃষ্ট অনুষ্ঠানের কথায় আসা যাক। ১৯৫৫ খ্রিঃ তৈরি হয় D.V.C. ক্যানেল। গ্রামের দক্ষিণে কর্তিত ঐ ক্যানেল চালু হবার পর গ্রামের তখনকার দিনের জমিদার বিষ্ণুপদ হালদার ঐ ক্যানেলের জলে মকর সংক্রান্তিতে স্নান পর্ব সমাধা করেন। তার দেখাদেখি গ্রামের অনেকেই ঐ স্থানে মকর স্নান সারতে থাকায় পরে সেই স্থানকে কেন্দ্র করে তথায় ঐ সময় এক মেলা বসে যায় এবং ধীরে ধীরে তা বেশ বড় আকার ধারণ করে। কিন্তু গ্রামে বিভিন্ন প্রাচীন উৎসবাদি থাকলেও তাদের কোনটিকে ঘিরে মেলা না বসে সম্পূর্ণ হাল আমলের ঐ মকর স্নানকে কেন্দ্র করে গ্রামে ৭/৮ দিন ধরে মেলা বসাটা সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার!

এড়াল ঃ— আউশ গ্রাম থানার ২নং ব্লকের আওতায় ৯৩ নং জে.এল. এর অন্তর্ভূক্ত এড়াল একটি প্রাচীন গ্রাম। গুসকরা বুদবুদ বাসরাস্তার অভিরামপুরে নেমে দক্ষিণে কিছুটা গেলেই গ্রামে যাওয়া যায়। অন্যদিকে পাবাজ রেল স্টেশনে নেমে উত্তরে গেলেই গ্রাম এড়াল।

গ্রামের প্রাচীন পুরাকীর্তির কথা গ্রন্থের ২য় খণ্ডে 'পুরাকীর্তি ও মন্দিরাদি' অধ্যায়ে বলা হয়েছে তাই সে কথায় আর না গিয়ে অন্যকথা বলি। গ্রামটি কৃষিপ্রধান গ্রাম তবে চাকুরিজীবী নাই তা নয় কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। গ্রামে কার্তিক মাসে মৃন্ময়ী কালী পূজায় বিশেষ ধুম হয়। গ্রামে ১৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কালী মূর্তি দেখার জন্য তখন গ্রামে বিশেষ লোক সমাগম শুরু হয়। সেই কালী পূজাকে কেন্দ্র করেই তখন গ্রামে কয়েক দিনের জন্য একটি মেলাও বসে।

গ্রামে বেশ কয়েকটি ধর্মরাজ রয়েছে যেমন— বাঁকুড়া রায়, সদাশিব ও যাত্রাসিদ্ধি। তাদের গাজনকে ঘিরে বেশ উৎসব শুরু হয়ে যায়। গ্রামস্থ বুদ্ধেশ্বর শিব তার গাজন এর সময় তাল পুকুরে স্নান করতে যাবার জন্য এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বিশ্রাম নেয়, তাই ঐ স্থান বিশ্রামতলা নামে খ্যাত।

গ্রামে সার্বজনীন দোলউৎসবও বেশ সমারোহে উদযাপিত হয়। শীতলা পূজাও হয়ে থাকে তবে বেশ কয়েকটি মনসাপূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামের লোক উদ্বেল হয়ে ওঠে।

এথোড়া ঃ— বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে গোপভূম এলাকার আসানসোল

শহরসীমায় এই গ্রাম অবস্থিত। আসানসোল হতে সালানপুর হয়ে বাসে এই গ্রামে যাওয়া যায়। এর জে. এল নম্বর-৭৬। গ্রামটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অনেক দেবদেবীর মন্দিরাদিও গ্রামে রয়েছে। শিবই রয়েছে ৬টি। তার মধ্যে উল্লেখ্য চন্দ্রচূড় শিব। পুনশ্রুতি এই শিবলিঙ্গটি এক কৃষক জমি চষার কালে পেয়েছিলেন। সেটির পূজা অর্চনার দায়িত্ব ভট্টাচার্য পরিবারের উপর অর্পিত হওয়ায় তারাই শিব মন্দিরটি তৈরি করেন। তবে সেই শিবের সেবা-পূজা পরিচালনার জন্য কাশিম বাজারের মহারানী স্বর্ণময়ী দেবী বেশ কিছু জমিজমাসহ দেবসেবার নিমিত্ত একটি পুকুরও দান করেছিলেন। ঐ শিব ছাড়াও গ্রামে আরও ৫টি শিব বর্তমান রয়েছে।

শিব ছাড়াও গ্রামে রয়েছে ৪টি বিষ্ণু মন্দির। শাক্তদেবী হিসাবে গ্রামে বেশ ধুমধামে ১০টি দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং কালী পূজাও কমকরে ১০টি হয়ে থাকে। লৌকিক দেবতা হিসাবে বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্যামচাঁদ নামে এক ধর্মরাজের পূজাও হয় এবং বিভিন্ন কৃত্যাদিসহ তার গাজন উৎসব বেশ সমারোহেই পালিত হয়।

(ও)

ওয়ারিশপুর ঃ— গোপভূম পরগনার আউশ গ্রাম ১ নং ব্লকের অধীন এই ওয়ারিশপুর। এর জে. এল. নং-৫৭।·বর্তমানে এর নাম ওয়ারিশপুর হলেও পূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল ব্রাহ্মণডিহি। ডিহি শব্দে গ্রাম, সেদিক থেকে গ্রামে ব্রাহ্মণদের আধিক্য থাকায় গ্রামনাম ব্রাহ্মণডিহি হয়েছিল কিন্তু এই এলাকায় মুসলমানদের প্রাধান্য বর্ধিত হওয়ায় যে কারণেই হোক ব্রাহ্মণরা এখান থেকে উঠে চলে যায়। ফলে গ্রামে যখন ব্রাহ্মণই নাই তখন গ্রামনাম ব্রাহ্মণডিহি থাকারও কোন কারণ নেই। তাই মুসলমান প্রধান এই গ্রামের নাম পরিবর্তিত হয়ে, হয়ে যায় ওয়ারিশপুর। গ্রামটি বন নবগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম।

এই নাম পরিবর্তন সূচিত হয় আনুমানিক ১৭৪০ থেকে ১৭৫০ খ্রিঃ মধ্যে। 'ওয়ারিশ' শব্দের অর্থ হল উত্তরাধিকার। এই গ্রামে একদা প্রভাবশালী মুসলমান 'মীরদা'দের বসতি ছিল। প্রমাণ হিসাবে বলা যায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় পাড়াতেই মীরজাপুকুর (মীরদা > মীরজা) নামে দু'টি পুকুর রয়েছে। তাই বলা যায় গ্রামের প্রভাবশালী মীরদাদের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে এই গ্রাম তাদের বংশধরেরা পেয়েছিলেন বলেই গ্রামনাম ওয়ারিশপুর হয়ে থাকবে।

পূর্বে গ্রামে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য থাকলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত গ্রামে এক ঘরও ব্রাহ্মণ ছিল না। কিন্তু গ্রামে হিন্দুদের দেবদেবীর পূজা নির্বাহের জন্য অনেক অনুরোধে একঘর ব্রাহ্মণকে বর্তমানে গ্রামে বসানো হয়েছে। গ্রামের বাগদিপাড়ায় ধর্মরাজতলায়

ধর্মরাজ ছাড়াও এক বিষ্ণুমূর্তিও আছে। ধর্মরাজ আদিরায়ের গাজন বেশ ধুমধামেই পালিত হয়।

গ্রামে একদা ইমামবাড়ার অবস্থান থাকায় গ্রামটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী কারণ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মাত্র তিনটি ইমামবাড়ার মধ্যে এই গ্রামেই একটি রয়েছে। অপর দুটির একটি মুর্শিদাবাদে, অন্যটি হুগলীতে। সেদিক থেকে বঙ্গের গোপভূমে এটিই একমাত্র গ্রাম যেখানে ইমামবাড়া বর্তমান।

ইমামবাড়া-র অর্থ যে বাড়িতে মহরম অনুষ্ঠিত হয়/যে স্থানে মহরম পর্বে তাজিয়া রক্ষিত হয়। এখানকার মুসলমানরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই এরা ইমামের প্রতি খুব ভক্ত ছিলেন। এখানে মহরমের সময় তাজিয়া তৈরি করে শোকজ্ঞাপন করা হয় এবং মরছিয়া গানও দলগতভাবে গাওয়া হয়। মসজিদের সঙ্গে ইমামবাড়ার কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। যেমন, মসজিদ হল সমবেত প্রার্থনা সভা। সেখানে অনেকে মিলে একসাথে নমাজ পড়া হয়। কিন্তু ইমামবাড়া হল নিভৃতে সাধনক্ষেত্র। সেখানে কোন কোলাহল থাকবে না, ভক্তরা নিরালায় ঈশ্বর আরাধনা করতে পারে। ইমামবাড়াকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও ধরা হয়, কারণ এখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও থাকে।

ওয়ারিশপুরের ইমামবাড়াতেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল তথা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এখানে মেঝেতে তিনটি স্তর বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়— যার অর্থ নিচু ধাপে নিম্নশ্রেণীর ছেলেরা বসে পড়াশুনা করত। মধ্যের স্তরে মাঝের শ্রেণীর ছেলেরা পড়ত, আর উঁচু ধাপে উঁচু শ্রেণীর ছেলেরা বসে পড়াশুনা করত। ইমামবাড়া যখন শিক্ষাকেন্দ্র তখন এখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারও ছিল— তার প্রমাণ হিসাবে এখানে গ্রন্থ রাখার জন্য দেওয়ালে বহু তাক বা shelf -এর অবস্থান বেশ স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ এখানে একটি মাদ্রাসাও ছিল। সেই মাদ্রাসায় পড়াতেন মসজিদের মৌলবিরাই। এই ইমামবাড়া তৈরি হয়েছিল ১৭৮০-১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং এর নির্মাতা ছিলেন সৈয়দ শাহআলী নকির।

গ্রামটি মুখ্যত কৃষিপ্রধান গ্রাম। ইদানীং কিছু লোক চাকুরির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলেও তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছেন সৈয়দ আব্দুল হালিম, যিনি কর্মজীবনে সহকারী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু তার থেকেও তাঁর বড় পরিচয় হল— তিনি একজন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর একনিষ্ঠ গবেষক। তাঁরই বলিষ্ঠ গবেষণার ফসল হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে দুই খণ্ডে ইসলামের ইতিহাস, বাঙ্গালী মুসলমানের উৎপত্তি, বাঙ্গালী জাতির বিকাশের ধারা ও আরও বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি।

(ক)

কেউসা ঃ— অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে মঙ্গলকোট থানার ৮৮ নং জে. এল. ভুক্ত

গ্রাম এই কেউসা, কোঙারপুরের নিকটেই অবস্থিত। নতুন হাট থেকে উত্তর-পূর্বে এগিয়ে গেলে গ্রামে যাওয়া যায়। এটি কৃষিকেন্দ্রিক ছোট গ্রাম। এখানে হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষ্ণবদের আধিক্য লক্ষণীয়। গ্রামস্থ অজয় নদীর তীর সংলগ্ন এক দালান মন্দিরে রাধাগোবিন্দর যুগল মূর্তি পূজিত হচ্ছে। সারা বছরই এই দেবসেবা চললেও বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় উৎসবগুলি এখানে সাড়ম্বরে পালিত হয়।

পৌষসংক্রান্তিতে অজয় গর্ভে মকরস্নান বিশেষ উৎসাহে উদ্‌যাপিত হয়। তখন বহুলোকের সমাগমে সেখানে ২/৩ দিনের জন্য একটি মেলাও বসে। ঐ মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সমাগম হলেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমাবেশ লক্ষ করার মত। মকরস্নানকে কেন্দ্র করে তখন সেখানে মহোৎসব চলতে থাকে, বিশেষ করে চাকদা গ্রাম থেকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা এক বিশেষ মহোৎসব সেথায় নিয়ে যায় এবং মেলায় সমবেত বহু ভক্তই মহোৎসবের অন্ন প্রসাদ পেয়ে থাকে।

কৈচর ঃ— মঙ্গলকোট থানার বর্ধমান-কাটোয়া বাসরাস্তার ধারে এক প্রাচীন গ্রাম কৈচর। এটি ১৪৪ নং জে. এল. ভুক্ত। এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামে ভট্টাচার্যদের বাড়িতে 'কৈবলেশ্বর' নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ শিবনাম থেকেও গ্রামনাম কৈচর হতে পারে। শিবচতুর্দশীতে এখানে উৎসব হয়ে থাকে। গ্রামে হিন্দুদের অন্যান্য উৎসবাদি যথানিয়মে পরিপালিত হলেও শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে বিশেষ ধুমধামে মনসাদেবীর বিশেষ বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই উৎসবকে কেন্দ্র করেই তখন গ্রামে একটি মেলাও বসে।

বর্তমানে গ্রামটি বাসস্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ ব্যবসাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গ্রামে এক দালান-মন্দিরে ডোম পরিবারের কালিকা দেবী প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি হলেও প্রায় সারা বছর পূজিত হয়ে মহালয়ার দিনে বিসর্জিত হয়। কার্তিক মাসের কালীপূজার দিনে এখানে বিশেষ উৎসব হয়। গ্রামে চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব খুবই ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মুসলমান পাড়ায় রয়েছে এক প্রাচীন মসজিদ।

কাঁকড়া ঃ— অজয়ের দক্ষিণে মঙ্গলকোট থানার ৮৪ নং জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম। এটি খুব বড় গ্রাম না হলেও মাঝারি ধরনের গ্রাম বটে। নতুন হাট— কাটোয়া ভায়া মাজিগ্রাম বাসে পলসোনা গ্রামে নেমে উত্তর দিকে কিছুটা গেলেই কাঁকড়ায় যাওয়া যায়।

গ্রামের নামকরণের কারণ হিসাবে বলা যায় এখানে পুরানে উল্লেখিত অষ্ট নাগের (অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ) অন্যতম কর্কটনাগের প্রাধান্য ও এই গ্রামে তার পূজার জন্যই গ্রাম নাম কর্কট > কর্করা > কাঁকড়া হয়েছে। গ্রামে এক ধরনের সাপের বিশেষ প্রাধান্য বা গ্রামে তাদের ঘোরাফেরা সর্বত্রই লক্ষ

করা যায়। বিশেষ করে গ্রামের পূর্ব প্রান্তে মুচিপাড়ায় তেঁতুল সহবট বৃক্ষে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় তাই এই বৃক্ষতলকেই কর্কট নাগের আটন (দেবতার বেদী) বলা হয়।

গ্রামে এই সাপ, অবাধে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। কেউ এদের আঘাত করে না বা এরাও কারও ক্ষতি করে না। বাড়িতে বিশেষ ভাবে এদের যাতায়াত শুরু হলে ভোগ নিবেদন করলেই তা প্রশমিত হয়। কোন সাপ মারা গেলে তাদের পাত্রে ভরে গঙ্গায় নিবেদন করতে হয়। এই সাপই এখানে সাক্ষাৎ মনসা হিসাবে পূজিত হয়। অনুরূপ ভাবে এই থানার অধীনে একটু পূর্ব-দক্ষিণের কয়েকটি গ্রামে (মুসুরি, পলসনা, পোসলার) এক ধরনের সাপের আধিক্য লক্ষ করা যায়। তাদের ঝাঁকলাই বা ঝঙ্কেশ্বরী বলা হয়। তাদের গায়ের রং কালো। তারা কেউটে সাপের জাত আর এখানে যে কর্কট সাপের প্রাধান্য দেখা যায় তারা অনেকটা হলুদ রং এর গুখরো সাপের জাত। উভয়েই বিষধর।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামবাসীরা এই সর্পকুল এর হাত থেকে বাঁচার তাগিদে একে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে পূজা শুরু করে। শুরুতে বাগদি, ডোম, মুচি ইত্যাদি অন্ত্যজ সম্প্রদায় কর্তৃক এর পূজা শুরু হয়। তাই বাগদিরাই এর পূজক ছিলেন। পরে লৌকিক দেবতাগুলি ব্রাহ্মণীকরণের কালে এর পূজার অধিকারও ব্রাহ্মণদের হাতে চলে যায়। তবে তা অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেদের হাতেই এর পূজার ভার ন্যস্ত হয়।

প্রথম দিকে দাঁয়েরা এই দেবীর সেবক বা পূজক ছিলেন কিনা জানা না গেলেও বাৎসরিক পূজায় যখন গ্রাম ষোল আনার পূজা নিবেদিত হয় তখন সর্বাগ্রে দাঁয়েদের পূজা হয়ে থাকে। গ্রামের উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ অধিকাংশই গোস্বামী হওয়ায় তারা সকালের দিকে চিঁড়াভোগে দেবীর পূজা সম্পন্ন করেন। পরে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের পূজা আপন আপন মানত অনুযায়ী ছাগ মেষ ইত্যাদি বলিসহ সম্পন্ন হয়।

এই সাক্ষাৎ সর্পরূপী মনসার পূজা উপলক্ষে গ্রামের লোক আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করে থাকেন। সেদিক থেকে এই দেবীই গ্রাম্যদেবী। এর বাৎসরিক পূজা দশহরার পরের পঞ্চমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। দেবী নিত্যপূজিতা না হলেও মানত থাকলে সপ্তাহের শনি-মঙ্গল বারেও দেবীর পূজা হয়ে থাকে। দেবীর বাৎসরিক পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামে ২/৩ দিনের জন্য তখন ছোট খাট একটি মেলাও বসে। গ্রামে পূর্বে কোন মুসলমান বসতি ছিল না তবে ধীরে ধীরে গ্রামের দক্ষিণে একটি মুসলমান পাড়া গড়ে উঠেছে।

গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে উল্লেখ্য হল দুর্গা, সিংহবাহিনী, শিব, নারায়ণ ইত্যাদি। পূর্বে গ্রামে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ছিল কিন্তু বর্তমানে তা নবদ্বীপে রয়েছেন। আর

ছিল লক্ষ্মী নারায়ণ কিন্তু তিনিও দৌহিত্র সূত্রে বর্তমানে সর গ্রামে রয়েছেন। মদন-মোহন, রাধারাণী ইত্যাদি বিগ্রহগুলি এখন পালা ক্রমে গ্রামেই পূজিত হচ্ছেন। গ্রামে দুর্গোৎসব হয় দু'টি, তার মধ্যে একটি গ্রাম সাধারণের বা বারোয়ারি আর অন্যটি মেটেদের পারিবারিক।

এবার আসি সিংহবাহিনীদেবীর কথায়। লোক শ্রুতিতে জানা যায় এই বিগ্রহ ছিল মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতের আরাধ্যা দেবী। তিনি বঙ্গ আক্রমণে এসে এই স্থানের উপর দিয়ে যাবার কালে স্বেচ্ছায় এই দেবীকে এখানকার 'রায়' পদবীর ব্রাহ্মণদের দিয়ে ছিলেন এবং তার সেবা পূজার জন্য জমিজমাও দান করেছিলেন। অদ্যবধি অষ্টধাতু নির্মিত অষ্টভুজা সিংহবাহিনীদেবী এখানে পূজিত হচ্ছেন।

পরিশেষে আর একটি উল্লেখ্য বিষয়ের কথা বলি— সেটি এই কলিযুগের সাক্ষাৎ ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম জীবনীকার ও পরমভক্ত কোগ্রাম নিবাসী লোচনদাসেব স্বহস্ত লিখিত 'চৈতন্যমঙ্গল' পুঁথি যা এই গ্রামেই রক্ষিত আছে। গ্রামের প্রখ্যাত পণ্ডিত, সম্প্রতি প্রয়াত রাস মোহনগোস্বামীর মুখে শুনেছি তাঁদের কোন এক পূর্বপুরুষ রাসানন্দ গোস্বামী, বঙ্গের ১১১০ সালে শ্রাবণী পুর্ণিমার দিনে স্বাপ্নাদিষ্ট হয়ে বন্যায় পরিপ্লাবিত উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অজয় নদীতে ঝাঁপ দিয়ে একটি পেটিকা উদ্ধার করেছিলেন—তাতেই ছিল ঐ পুঁথি, যা এখনও ঐ বংশের অধস্তন পুরুষ শিক্ষক শান্তিরাম চক্রবর্তীর বাড়িতে সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হচ্ছে।

কোগ্রাম ঃ— এটিও মঙ্গলকোট থানার অজয় তীরবর্তী বন্যাবিধ্বস্ত এক প্রাচীন গ্রাম। অজয় ও তার উপনদী কুনুরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই গ্রাম উভয় নদীর দ্বৈরথ আক্রমণে প্রায় অবলুপ্ত। একদা এই গ্রামে সতীদেহের বামকুনুই পড়ায় এটি একটি প্রাচীন পীঠস্থান (এ সম্পর্কে গ্রন্থের ২য় খণ্ডে 'পূরাকীর্তি ও মন্দির' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)।

এক সময় এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন অন্যতম চৈতন্যজীবনীকার ও ভক্তকবি লোচনদাস। সেদিক থেকে এটি লোচনদাসের পাটবাড়িও বটে। এখনও পৌষ সংক্রান্তিতে মকর স্নান উপলক্ষে কবির পাটবাড়িতে বহু ভক্ত ও বৈষ্ণব বাউলের আবির্ভাব হয় ও মহোৎসব চলে। এখানে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বসত বাড়িও বর্তমান।

কাসেমনগর— মঙ্গলকোট থানার অধীন কাসেম নগর (জে.এন. নং-৩৩) একটি উল্লেখ্য গ্রাম। গ্রামটি প্রাচীন হলেও এর নামকরণ বেশিদিনের নয়। কারণ ১৮৭৪ খ্রিঃ এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা মৌলবি আব্দুল কাসেম, ঐ কাসেম সাহেবের নাম অনুসারেই গ্রাম নাম কাসেমনগর হয়েছে। বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিমের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল এই গ্রামে। হাশিমের উল্লেখ্য গ্রন্থ হল

'Inrestrospection' যা বঙ্গে একদা বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। ঐ হাশিমসাহেবের সুযোগ্য পুত্র হলেন প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক বদরউদ্দিন উমর যিনি রাজস্ব বিষয়ে কিছু মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

নতুনহাট গুসকরা রোডে এই গ্রামে যাওয়া যায়। এটি একটি কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র হিসাবেও এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। গ্রামে অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা সহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে।

এই কাসেমনগর গ্রামটিও পূর্বে কাশিয়াড়া নামে খ্যাত ছিল পরে কাসেমনগর রূপে পরিচিত হলেও অন্য এক নামেও এব পরিচিতি রয়েছে— সেটি হল বৈরাগ্যতলা। কাসেমনগরেরই এক অংশে, পাকা রাস্তার উত্তরে অতীতে বৈরাগ্যচাঁদ নামে এক সাধক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি সাধনমার্গে বহুদূর অগ্রবর্তী হয়ে এখানেই সাধন ভজনে নিযুক্ত থেকে এই স্থানকে পূতপবিত্র সাধন ক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। তাই তার নামকে কেন্দ্র করেই এই এলাকা বৈরাগ্যতলাই নামে অভিহিত হয়। সেই বৈরাগ্য চাঁদের তিরোধান দিবসকে স্মরণে রেখে সেই সুদূর কাল থেকে এখানে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তখন বেশ কয়েক দিনের জন্য এখানে একটি জমাটি মেলাও বসে— মেলাটি কম করেও চারশ বছরের প্রাচীনত্বের দাবিদার।

সরস্বতী পূজার অব্যবহিত পরেই মাকুবী সপ্তমী থেকে মহোৎসবের শুরু। এখানে মহোৎসবেব শুরু হয় লুঠ বা কাড়াকাড়ির মাধ্যমে। পরে বসিয়েও খাওয়ানো হয়। প্রথম দিন এখানে চিঁড়া মহোৎসব হয়, পরের দিন অন্নমহোৎসব হয়ে থাকে। তখন এখানে দূর-দূরান্ত থেকে আগত বহু ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পেয়ে থাকেন। এই বৈরাগ্য তলাতে রয়েছে সাধক প্রবর বৈরাগ্যচাঁদের সমাধি মন্দির যা বর্তমানে সুন্দব ভাবে সংস্কৃত হয়েছে। এই সংস্কারের কাজে গ্রামবাসীর উদ্যোগ ও ভিক্ষাই ছিল মূলধন।

লোকশ্রুতিতে জানা যায় এই বৈবাগ্যচাঁদ ছিলেন কনৌজের অধিবাসী। তারা তিন ভাইই বঙ্গের তিন স্থানে স্থিতু হয়েছিলেন। বড় ভাই গোপাল দাসের সাধন ক্ষেত্র চিল কেতু গ্রামের দধিয়া বৈরাগ্য তলা আর সেখানেও একই সময়ে উৎসব পালিত হয়। ছোটভাই মনোহর দাসের সাধন ক্ষেত্র ছিল বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী আর মধ্যম তূলসী দাসই বৈরাগ্য চাঁদ নামে এখানেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

কুড়ুম্বা :— আউশ গ্রাম ১নং ব্লকের অন্তর্গত এক সমৃদ্ধ কৃষি প্রধান গ্রাম কুড়ুম্বা। এখানে চাকুরিজীবী নাই তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা এমনিতেই কম। গ্রামটির জে.এল. নং ১১৩। গ্রামটি আদা কুড়ুম্বা নামে সমধিক পরিচিত। গ্রামে আদারচাষ বেশি হওয়ার গ্রামনাম আদা কুড়ুম্বা হয়েছে।

কুমারগঞ্জ :— আউশ গ্রাম ১নং ব্লকের দিগনগর পঞ্চায়েতের অধীন এক ছোটগ্রাম কুমারগঞ্জ। গুসকরা বুদবুদ রাস্তায় গুসকরার নিকটবর্তী গ্রাম। গ্রামটি কৃষি প্রধান।

গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌গোপদের প্রাধান্যই বেশি। পূর্বে হয়ত 'কুমার' পদবীর সদগোপদের আধিক্য থাকায় গ্রামনাম কুমারগঞ্জ হয়েছে। গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজাদি অনুষ্ঠিত হলেও মনসাপূজার আধিক্যই বেশি।

কলাইঝুঁটি ঃ— আউশ গ্রাম থানার ২নং ব্লকের ৯৬ নং জে.এল. ভুক্ত এক পুরাতন গ্রাম কলাইঝুঁটি। গুসকরা-বুধবুদ বাস রাস্তার আনন্দবাজার মাঝি পাড়ার পাশ দিয়ে ক্যানেলপার হয়ে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি খুবই প্রাচীন কারণ এখানেই ১৭৭৫ খ্রিঃ বিখ্যাত মহিলা পণ্ডিত হটু বিদ্যালঙ্কার এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার আসলনাম ছিল রূপমঞ্জরী। (৬)

কৃষিপ্রধান গ্রাম। সদগোপ সম্প্রদায়ের আধিক্য বেশি। এদের মধ্যে কোঙার সদ্‌গোপ (কুলীন)ও কিছু আছেন। বেশ কয়েক ঘর কর্মকারও আছেন। হিন্দুদের বহুদেবদেবীর পূজাদিসহ শারদীয়া দুর্গোৎসব এখানে বিশেষ ধুমধামে অনুষ্ঠিত হলেও মনসাপূজার আধিক্য আছে।

করটিয়া ঃ— আউশ গ্রাম থানার সদর কার্যালয় আউশ গ্রামেই নেমে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের লোক একত্রে মিলিত হয়ে গ্রাম্য দেবতা ধর্মরাজের গাজনের দিন স্থির করেন। গাজন উৎসবে বিভিন্ন কৃত্যাদির মধ্যে বান ফোঁড়া, আগুন ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ ইত্যাদি অনেক অনুষ্ঠানই হয়ে থাকে। ভক্তও অনেক হয়। এখানকার ধর্মরাজের স্থায়ী কোন মন্দির নাই। সারা বছর ইনি গাছতলাতেই থাকেন, কেবল উৎসবের কয়েকদিন অস্থায়ী আচ্ছাদন দেওয়া হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে ২/৩ দিন ধরে হরিনামও অনুষ্ঠিত হয়।

কুরকুবা ঃ— গ্রামটি যদিও গলসী থানার অধীন এবং জে.এল. নং-৯৭ তবুও আউশ গ্রাম থানার দিগনগর অঞ্চলের নিকটবর্তী গ্রাম। দিগনগরের আনন্দবাজার থেকে গলিগ্রাম যাবার পথে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজাদি হলেও সবথেকে উল্লেখ্য দেবী পূজা হল কমলা নাম্নী মনসাদেবীর পূজা। সামনে নাট মন্দির সহ একতলা দালানমন্দিরে দেবীর প্রস্তর মূর্তি বর্তমান। বৎসরের শ্রাবণ সংক্রান্তিতে দেবীর বিশেষ বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এতদঅঞ্চলের দেব-দেবীর বাৎসরিক উৎসবকে অনেকক্ষেত্রে তাদের গাজন বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় গলসীর গোহ্ গ্রামের ভগবতীর বাৎসরিক পূজাকে ভগবতীর গাজন বলা হয়। এখানেও তেমনি কমলাদেবীর বাৎসরিক পূজাকেও কোমলার গাজন বলা হয়।

গ্রামে কমলাদেবীর বাৎসরিক পূজাকে কেন্দ্র করেই তখন গ্রামে ৩/৪ দিনের জন্য একটি মেলাও বসে। এই দেবীর উৎসবই এখানকার গ্রাম্য উৎসব এবং তাকে ঘিরেই গ্রামের লোক আত্মীয়-পরিজনদের গ্রামে আসার আহ্বান জানায়, একদা গ্রামে আখমাড়াই কল তৈরির কারখানা ছিল এবং সেখানের তৈরি আখমাড়াই কলের সুখ্যাতিও ছিল।

গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের বাস। গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে মাজেদমোল্লা দুনি তৈরি শুরু করে তার পর ধীরে ধীরে তারাই আখমাড়াই কল তৈরি শুরু করে। তাদের ঐ শিল্প বহু দিন চলেছিল পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।

কৈতারা ঃ— গলসী থানার অন্তর্গত ৭৪ নং জে.এল. ভুক্ত এক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম কৈতারা। বর্ধমান গোহগ্রাম বাস ধরে কৈতারায় যাওয়া যায়। গ্রামটি প্রাচীন তার কারণ খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বিজয়সেনের তাম্রলিপি— যা মল্লসারুলে পাওয়া গেছে তাতেই বর্ধমান ভুক্তির কথা যেমন প্রথম জানা যায়, তেমনি ওতেই পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামের নামও জানতে পারা যায়। সেখানেই 'কপিলবাটক' গ্রাম নামের উল্লেখ রয়েছে, যা ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেনের মতে কৈতারা গ্রাম। সেই দৃষ্টিকোণে দেখতে গেলে গ্রামটি নিঃসন্দেহে খুবই প্রাচীন।

এখন গ্রামের কিছু পুরাকীর্তি ও কৃষ্টি সম্পর্কে বলা যাক। গ্রামে কিছু 'মাহাতা' পদবী ধারী কর্মকার বাস করেন। জাতিগত বৃত্তি হিসাবে লৌহ দ্রব্য প্রস্তুত করাই তাদের কর্ম হলেও সেখান থেকে সামান্য সরে গিয়ে তারা পিতলকেন্দ্রিক দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করছেন। তাদের উৎপাদিত তৈজসপত্রের মধ্যে উল্লেখ্য হল তৈলভাণ্ড বা তেলের ঘটি যার বিশেষত্ব হল, সেগুলি এতই উজ্জ্বল হয় যে তার পালিশের প্রয়োজন হয় না।

এবার গ্রামের কিছু পরিবার কেন্দ্রিক দেব কীর্তি তথা পুরাকীর্তির কথা আলোচনায় আসা যাক। প্রথমেই বলি লাহা পরিবারের কথা। এদেরই ঘরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীধর বিগ্রহ। প্রতিবছর রাসে বাৎসরিক উৎসবকে ঘিরে এখানে মেলা বসে। গ্রাম মধ্যে রয়েছে কর্মকার প্রতিষ্ঠিত সুউচ্চ শিখর দেউলের পুরাকীর্তি, শিব মন্দির এবং তারাই প্রতিষ্ঠা করেছেন একতলা দালানমন্দিরে দেবীমনসা— ভাদ্র মাসে যার পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামে আরও কয়েকটি পরিবার কর্তৃক বেশ কয়েকটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল— ভট্টাচার্যদের জোড়াচালা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ তার একটির নাম কৈবলেশ্বর। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির যা ১৩০২ বাঙ্গাব্দে বা ১৮৯৫ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছিল। সেখানে প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবগাজন এবং চড়ক পূজাও হয়ে থাকে। আরও এক দক্ষিণমুখী শিকর দেউলে রামেশ্বর ভটাটচার্যের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বর্তমান। এটি ১৮২৭ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছিল। এর মিস্ত্রি ছিল কৈতারা নিবাসী রামচন্দ্র।

এই গ্রামে আর এক উল্লেখ্য দেবকীর্তি হল ডোম সম্প্রদায়ের এক দালানমন্দিরে অধিষ্ঠিতা মৃন্ময়ী কালিকা দেবী। এর বিশেষত্ব হল প্রতিমা প্রতিবছর কার্তিক অমাবস্যায় পূজিত হয়ে নিত্য সেবিত অবস্থায় থেকে যায় পরের বছর মহালয়া পর্যন্ত। কার্তিক

অমাবস্যায় দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠার পর পূজা শুরু হয় এবং তা একই নিয়মে চলতে থাকে। গ্রাম পরিক্রমায় ঠিক একই ধরনের অনুরূপ পূজা লক্ষিত হয়েছে কৈচরের ডোম পরিবারের কালিকা দেবীর।

পরিশেষে বলি গ্রামে আটচালা এক মন্দিরে বুড়োরায় নামে এক ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিতা থেকে নিত্য পূজিত হচ্ছেন। এই মন্দির সংলগ্ন রয়েছে এক আটচালা যা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের দিকে এক বৃক্ষতলে বিশালাক্ষীদেবীর শিলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর বিশেষ বাৎসরিক উৎসব পালিত হয় আষাঢ় মাসের নবমী ও মহানবমীতে। গ্রামে এক সময়ের বর্ধিষ্ণু পরিবার ছিলেন গন্ধবণিকেরা। কিন্তু গ্রামে তাদের কোন দেবকীর্তি লক্ষ করা গেল না।

কাঁকসা ঃ— ৮৬ নং জে. এল. ভুক্ত কাঁকসা থানার সদর কার্যালয় এই কাঁকসা। এখানে যেতে হলে পানাগড় রেলস্টেশন কিংবা G. T. Road-এ পানাগড়ে নেমে তিন কি.মি. উত্তরে পাকা রাস্তা ধরেই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটির নামকরণের পিছনে রয়েছে গোপভূমের গোপরাজা কনকসেন প্রতিষ্ঠিত 'কঙ্কেশ্বর' শিব। শিব নাম কঙ্কেশর (কঙ্কেশ্বর > কাঁকসা) থেকেই গ্রামনাম কাঁকসা হয়েছে। ইতিহাসগন্ধী আলোচনায় জানা যায় খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের কোন এক সময় সৈয়দ শাহ সইফুদ্দীন খান বোখারী এখানকার গোপরাজাদের পরাজিত করে এতদাঞ্চলের আধিপত্য গ্রহণ করেছিলেন। এখনও এখানকার লোকেদের, গ্রামে প্রয়াগপুরের কাছে তেঁতুলতলার দিকে আঙ্গুল তুলে সেখানে সৈয়দ বোখারীর কবরস্থানের নির্দেশ করতে দেখা যায়।

এখানে আরও রয়েছে, তুর্কি আমলে আগত অষ্টাদশ আউলিয়া (মুসলমান ধর্মপ্রচারক) দের অন্যতম দানবাবা পীরসাহেবের মাজার। এখানে প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ২৫ তারিখ থেকে ৭/৮ দিনের জন্য একটি মেলা বসে যা কাঁকসা থানার সর্ববৃহৎ মেলা। সেই সময় এখানকার হিন্দু মুসলমান, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক সমবেত হয়ে দান বাবাকে অন্তরের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আবার কঙ্কেশ্বর শিবের কথায় ফিরে আসা যাক। এই কঙ্কেশ্বর শিব খুবই প্রাচীন। হিন্দুরা বহুকাল ধরেই এই শিবের পূজা-অর্চনা করে আসছেন। বিভিন্ন শৈব অনুষ্ঠান এখানে নিষ্ঠার সঙ্গেই পালিত হয়। শিবরাত্রিতে এখানে বিশেষ উৎসবও পালিত হয়। এই শিবমন্দিরের গায়েই একদা এক বৃহৎ পুষ্করিণী 'জীবিত কুণ্ড' বর্তমান ছিল যা বর্তমানে বোজাতে বোজাতে তাকে এক সঙ্কীর্ণ গড়েতে পরিণত করা হয়েছে। এই পুষ্করিণীর চারিদিক এক সময় ইট দিয়ে বাঁধান ছিল। লোক শ্রুতিতে জানা যায় মৃত ব্যক্তির গায়ে ঐ পুষ্করিণীর জল ছিটিয়ে দিলে সে প্রাণ ফিরে পেত তাই ঐ পুকুরের নাম জীবিত কুণ্ড। বিদেশী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধের কালে রাজসৈন্যরা মারা গেলেও তাদের ঐ জল স্পর্শে বাঁচান হত। ফলে তারা প্রাণ ফিরে পেয়ে আবার বিপুল বিক্রমে

শত্রুদের আক্রমণ করে তাদের পর্যুদস্ত করত। এই আসল রহস্যটি শত্রুপক্ষ জানতে পেরে নিষিদ্ধ মাংস ছিটিয়ে এর অলৌকিকত্ব নষ্ট করে দেয়। বহু প্রাচীন পুরাকীর্তি এই পুষ্করিণী হতে উদ্ধার হয়েছে।

এই গ্রামে রথ যাত্রার উৎসব বেশ উল্লেখযোগ্য। তাকে ঘিরে এই গ্রামে তখন ২/৪ দিনের জন্য একটি মেলাও বসে। এ ছাড়াও গ্রামে দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়ক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

কাঁকসা গ্রাম থেকে সামান্য পশ্চিমে দার্জিলিং মোড়ের প্রয়াগপুরে রয়েছে এক প্রাচীন শিব মন্দির। সেখানে গত শতকের চল্লিশের দশকে বাপ্পানামে এক উড়িষ্যাগত সাধক উপস্থিত হয়ে শিবপূজায় আত্মনিয়োগ করেন। তাই ঐ মন্দির তারই নামে নামিত হয়ে বাপ্পামন্দির রূপে পরিচিত হয়। তারই প্রয়াণ দিবস শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে এখানে বিশেষ পূজাদিসহ্ একটি ছোটখাট মেলাও বসে।

সব মিলিয়ে কাঁকসা এখন বেশ শহরমুখী হয়েছে। এতে হাট বাজার, ব্যবসা ক্ষেত্র এবং নাগরিক বহু পরিষেবাসহ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও বর্তমান।

কেন্দুলা ঃ— অজয় নদীর দক্ষিণে ফরিদপুর থানাধীন (জে.এল. নং-২৮) এক প্রাচীন গ্রাম কেন্দুলা। দুর্গাপুর-শিবপুর বাসে চড়ে শিবপুরের নিকটবর্তী স্টপে নেমে পশ্চিমে এগিয়ে গেলে ঐ গ্রামে যাওয়া যায়। জয়দেব কেন্দুবিল্ব থেকে প্রায় ৭/৮ কি.মি. দক্ষিণ পশ্চিমে গ্রামটির অবস্থান।

এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক কালের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক বিরূপাক্ষ গোস্বামী। গ্রামে বহু পুরাকীর্তি ও দেবকীর্তি লক্ষ করা যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল দুর্গা, সিংহবাহিনী মহিষাসুর মর্দিনী, কালী ইত্যাদি। সাধক বিরূপাক্ষের সাধনার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। শোনা যায় একবার সিংহবাহিনীর পূজা করতে বসে এক থালায় সিন্দুর রেখে তাতে অষ্টমীক্ষণের পূর্বেই জগৎজননীর পদচিহ্ন ফেলিয়েছিলেন এবং তাই দেখেই অষ্টমীর ক্ষণের সময় হয়েছে বুঝে বলিদান পর্ব সমাধা করেছিলেন। সাধক বিরূপাক্ষের পুত্র কবীন্দ্র ও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেও একজন সিদ্ধ সাধক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

সাধক বিরূপাক্ষের সমাধির উপর দক্ষিণ সুখী এক কালী মন্দিরে কার্তিক মাসে মৃন্ময়ী কালিকা দেবীর পূজা হয়ে থাকে। এখানে সাধক বিরূপাক্ষের পাদুকা রক্ষিত আছে। সেই পাদুকার পূজান্তে দেবী পূজা শুরু হয়। এই পূজাতেও খুব ধুমধাম হয় এবং তখন এখানে প্রায় ৭০/৮০টি ছাগ বলিও হয়। এই দেবীর পূজকরাও হলেন বিরূপাক্ষের পরবর্তী বংশধরেরা।

ঐ মন্দিরের ধারে কাছেই ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তির ভগ্নাবশেষ। তাদের মধ্যে পাকুড় গাছের তলায় রয়েছে চণ্ডী, মনসা, ষষ্ঠী ইত্যাদি

দেবীর খণ্ডিতাংশ। ঐ পাকুড় গাছের কিছু পূর্ব দিকে রয়েছে দুর্গা মন্দিব, সেখানেও ধুমধামে পূজা হয়ে যাকে। এখানকার সিংহবাহিনী তথা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটি চুরি হয়ে যাওয়ায় এখন তার সিংহাসনকে সামনে রেখেই তথায় দেবী ও সাধক বিরূপাক্ষের পূজা হয়ে থাকে।

কাটাবেড়া ঃ— এ গ্রামটি ও ফরিদপুর থানার ৪২নং জে.এল ভুক্ত এক পুরাতন গ্রাম। দুর্গাপুর হতে উখরা যাবাব পথে এই গ্রামটিতে যাওয়া যায়। গ্রামে কেবল হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামে প্রধান উৎসব হল গোষ্ঠাষ্টমী এবং রাস উৎসব। বৈষ্ণবীয় উৎসব হিসাবে গ্রামের এক সুন্দর রাস মন্দিরে রাস উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। প্রথমেই উল্লেখিত গোষ্টাষ্ঠমী গ্রামে বেশ জাঁক জমকেই পালিত হয় এবং সেই উৎসবকেই কেন্দ্র করেই তখন গ্রামে বেশ কয়েক দিনের জন্য একটি জমজমাট মেলাও বসে। বৈশাখ মাসে গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষে কয়েকদিন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কালীনগর ঃ— ফরিদপুর থানার ২৭নং জে.এল ভুক্ত এক ছোট গ্রাম। কেন্দুলার একটু পূর্বদিকে এর অবস্থান। গ্রামের নাম কালীনগর। পূর্বে হয়ত গ্রামে কালী ঠাকুর বা কালী নামে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল— যা থেকে গ্রাম নাম কালীনগর হয়েছে। বর্তমানে গ্রামের সকল অধিবাসীই মুসলমান, নিম্ন সম্প্রদায়ের ২/১ ঘর ডোম জাতির বাস ছাড়া গ্রামে হিন্দু নাই। গ্রামের অধিকাংশের জীবিকাই চাষ আবাদ। গ্রামের উত্তর দিকে একটি ছোট নদী বহমান— যার নাম টুমুনি। এটি চুরুলিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে বিষ্ণুপুরের (ইছাই ঘোষের দেউলখ্যাত) কিছু পশ্চিমে দেউলীবেয়ার কাছে অজয় নদীতে পড়েছে।

কুমার ডিহি ঃ— থানা অণ্ডালের আওতায় ১৪নং জে. এল ভুক্ত গ্রাম কুমার ডিহি। অণ্ডাল থেকে ৮ কি.মি. উত্তরপূর্বে এই গ্রামের অবস্থান। অন্যদিকে উখরা থেকে সিলভার জুবিলী রোড ধরে ও গ্রামে যাওয়া যায়। অতীতে এই এলাকা ঘনজঙ্গলে আবৃত ছিল। কয়েকশ' বছর পূর্বে, পূর্ব বঙ্গের বরিশাল থেকে রায়চৌধুরী পদবীর এক ব্রাহ্মণ পরিবার সেখানে গিয়ে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে এখানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। এখন এটি খনি অঞ্চলের অন্তবর্তী। এখন ২০টি পাড়ার সমন্বয়ে এটি একটি বড় গ্রামও বটে।

বারো মাসে তেরো পার্বণের মত এ গ্রামেও উৎসবের শেষ নাই। প্রথমে দুর্গাপূজা দিয়েই শুরু করা যাক। গ্রামে চার থানে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে বেশকয়েকটি থানে বিশেষ করে চৌধুরীদের বড় থানে চার দিন তান্ত্রিক মতে পূজা হয়ে থাকে এবং এই পূজায় কোন্দাগ্রামের গ্রহবিগ্রগণ অংশ নিয়ে থাকে। গ্রামের এখনও বেশ কিছু বাড়িতে পটে মাদুর্গার পূজাও হয়ে থাকে।

দুর্গাপূজার আগেই গোপ পাড়ায় বিশেষ ধুমধামে ভগবতী পূজা হয়ে থাকে। সে পূজাতেও ঐ উল্লেখ্য গ্রহবিগ্রগণ অংশ নিয়ে পূজা নির্বাহ করেন। এবার আসা যাক কালীপূজাব কথায়। গ্রামে বেশ ধুমধামে কার্তিক মাসে বেশ কয়েকটি মৃন্ময়ী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল মুক্তকেশীকালী। গ্রামের বাউরি পাড়ায় অগ্রহায়ণ মাসেও কালী পূজা হয়।

গ্রামের সায়ব দিঘির পাড়ে রয়েছে শিবমন্দির। সেখানে শিবরাত্রিতে বিশেষ ধুমধামে ঐ শৈব উৎসবটি পালিত হয। এলাকায় অনাবৃষ্টি হলে এখনও এলাকার লোক বিশ্বাস করে যে, ঐ শিবের মাথায জল ঢাললে বৃষ্টি হবে। তাই অনাবৃষ্টির কালে এখনও শিবের মাথায় জল ঢালা হয়। এবার ধর্মরাজের প্রসঙ্গে বলা যায়— গ্রামে বুড়োরায় নামে এক ধর্মঠাকুর বর্তমান। তাব গাজন উৎসবও বিশেষ ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। লোক বিশ্বাস এই ধর্ম রাজের কৃপায় বহু দুরারোগ্য রোগের উপশম হয়। ফলে অনেক ভক্তই সায়র থেকে দণ্ডি কেটে বা প্রণাম খেটে মন্দিরে আসে। অনেকে মানত হিসাবে নিজ হাতে শূলবিদ্ধও করেন। গ্রামের জমিদার রায় চৌধুরীদের গৃহদেবতা হিসাবে রয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণ। এখানে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে দেবসেবায় অন্নভোগের ব্যবস্থা আছে। তখন কোন প্রসাদেচ্ছু ভক্তের আবির্ভাব হলে তাদের ফেরান হয় না।

কোটাচণ্ডীপুর ঃ— আউশগ্রাম থানার ২নং ব্লকের অধীন ৮০ নং জে.এল ভুক্ত প্রাচীন গ্রাম কোটা চণ্ডীপুর। মাড়ো গ্রামের প্রায় ২ কি.মি. পশ্চিমে এর অবস্থান। গ্রামে প্রাচীনকাল থেকেই বহু ভক্ত বৈষ্ণবের বাস। শুরু থেকে বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠিত বহু আখড়া এই গ্রামে চলে আসছে। পরবর্তীকালে বহু বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবার আখড়াগুলি পরিচালনার জন্য অনেকক্ষেত্রে জমিজমা দান করেছিলেন। আখড়াগুলি শুধু দেবসেবার ক্ষেত্রই ছিল না, সেগুলি বৈষ্ণবীয় আচার নিষ্ঠাসহ শিক্ষা দীক্ষার কেন্দ্রও ছিল। গ্রামে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিদের বাস থাকায় সেখানে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বহু টোলও ছিল।

এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলে একচক্ষু কানা অসাধারণ মেধাসম্পন্ন প্রখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি। যাঁর সম্পর্কে বলা হয়— "কানা ছোঁড়া বুদ্ধে দড়ো নাম রঘুনাথ"। [৭] সেই রঘুনাথ অতি শৈশবে পিতৃহারা হয়ে নবদ্বীপের এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেন। তাঁর সম্পর্কে 'মধ্যযুগে বাঙ্গালা' গ্রন্থে কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "নবদ্বীপ সারস্বত সমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি বর্ধমান জেলার কোটা মানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হইলে তাঁহার জননী ভরণ পোষণের অভাবে নদীয়ায় আসিয়া এক কুটুম্বের বাটীতে আশ্রয় লন।" [৮] তিনি শ্রী চৈতন্যের সহপাঠী ছিলেন এবং বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে পড়াশুনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বহু গ্রন্থও

প্রণয়ন করেছিলেন। কোটা গ্রামের রামেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন স্থানেই একদা রঘুনাথ শিরোমণিদের বসতবাটী ছিল।

কোটা গ্রামের উত্তর দিকে রয়েছে 'দেউ ধড়েশ্বর' শিব মন্দির কিন্তু পূর্বে নাকি তা এই গ্রামের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। লোক প্রবাদ গ্রামে ছুতারদের সংখ্যা বেশি থাকায় তাদের চিঁড়ে কোটার শব্দে বিরক্ত শিব গ্রাম ছেড়ে উত্তর অংশে হাজির হয়। পরে স্বপ্নাদিষ্ট কোন ভক্ত সেখানে মন্দির নির্মাণ ও দেবসেবার জন্য পুষ্করিণী খনন করে দেন। মহাধুমধামে চৈত্র মাসে শিবের গাজন পালিত হয়।

গ্রামে গ্রাম্যদেবী হিসাবে বর্তমান রয়েছেন শ্রীশ্রী চণ্ডী। শারদীয়া নবমীর দিনে মহাধূমধামে চণ্ডীদেবীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। এই দেবীচণ্ডীর নাম অনুযায়ী কোটা গ্রামের নাম হয়েছে কোটাচণ্ডীপুর। এখানে বৈশাখে শীতলা ও শ্রাবণে মনসা পূজা মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামেই জন্মেছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা কর্মী পাঁচকড়ি সরকার। গ্রামের মুসলমান পাড়ায় রয়েছে এক প্রাচীন মসজিদ।

কোন্দা ঃ— অণ্ডাল থানার অধীন অজয় নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী এক প্রসিদ্ধ গ্রাম কোন্দা। এর জে.এল. নং-৭। অণ্ডাল থেকে বাস যোগেই গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামের লাগাও গোবিন্দপুর নামে আর একটি গ্রাম রয়েছে— যার জন্য এদের পরিচিতি বোঝাতে এক সঙ্গে 'কোন্দা-গোবিন্দপুর'ও বলা হয়।

গ্রামের প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে যোগসিদ্ধসাধক ঘনশ্রাম গোস্বামী। যিনি একাধারে তান্ত্রিক সাধক এবং সিদ্ধ বৈষ্ণব সাধকও ছিলেন। তিনি আপন সাধন দৌলতে হিন্দু ধর্মের দুই বিপরীত মেরুর সাধন পদ্ধতি শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনের সমন্বয় করেছিলেন বলেই লোক শ্রুতিতে শোনা যায়—

নাড়াও নাড়ে পাঁঠাও কাটে
দেখে এলেম কোন্দার পাটে।।—

অর্থাৎ—

কোন্দার ঘনশ্যাম গোস্বামীর পাটে নাড়া অর্থাৎ মণ্ডিত মস্তক বৈষ্ণবদের নর্তনকীর্তন এবং শাক্তদের পাঁঠাকেটে মায়ের পূজা দুইই সমতালেই চলেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকে ১৮৯১ খ্রিঃ এই গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেন আর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সত্যকিঙ্কর গোস্বামী— যিনি পরবর্তীকালে জ্ঞানানন্দ সরস্বতী নামে এক যোগী সাধকের নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করে নিজেকে 'ভাস্করানন্দ সরস্বতী' নামে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। [১] এই ভাস্করানন্দ ছিলেন সাধক ঘনশ্যাম গোস্বামীর দশম অধস্তন পুরুষ।

কাজোড়া ঃ— পূর্বে অণ্ডাল পশ্চিমে রাণীগঞ্জ উভয়ের নিকটে জি.টি রোডের এক কিলোমিটারের মধ্যেই কাজোড়া গ্রামের অবস্থান। গ্রামটি ছোট হলেও বেশ প্রাচীন।

একদা শৈবধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল এই গ্রামে, তাই আকাবে ছোট্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রায় শতাধিক শিব মন্দির এই গ্রামে দেখা যায়। সেই সব শিব মন্দিরের মধ্যে উল্লেখ্য হল কালাগ্নিশিবের বিরাট মন্দির। এই শিব এখানে নিত্য সেবিত। সোমবারে সোমবারে এর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে।

দেবসেবার বিশেষ কাজের জন্য জমিজমা প্রদত্ত আছে। গ্রামের জমিদার ছিলেন হাজরা পরিবার। গ্রামের পশ্চিমে অবস্থিত পাণ্ডারাই এখানকার শিবের বংশানুক্রমিক পূজক। চৈত্র সংক্রান্তিতে এই শিবের বাৎসরিক উৎসব, গাজন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তখন ঐ গাজনে শতাধিক সন্ন্যাসীও হয়ে থাকে। ঐ সময় চড়ক উৎসব আর হয় না তবে ঐ শিবের গাজনকে কেন্দ্র করে তখন এখানে ২/৪ দিনের জন্য একটি মেলাও বসে।

কালাগ্নি শিব খুবই জাগ্রত। তাঁর দয়ায় অনেক বন্ধ্যা নারীও সন্তানবতী হন। বহু দুরারোগ্য ব্যাধিও বাবার দয়ায় ভাল হয়ে যায়। বিশেষ করে পেটের অসুখ বা অম্বল শূল। ঐ সমস্ত রোগব্যাধি নিরাময়ের জন্য সেবাইতরা কিছু পালন সাপেক্ষে ওষুধ দিয়ে থাকেন। শিবের কাছে বহু ভক্তের আগমন ঘটলেও মহিলা ভক্তের সংখ্যাই বেশি।

কল্যানপুর ঃ— আসানসোলের অধীন একটি গ্রাম হলেও এখন শহর সান্নিধ্যে থেকে অনেকটাই শহরমুখী হয়েছে। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। হিন্দুদের বহু দেবদেবীর পূজাও এখানে হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল শিব, কালী, ধর্মরাজ ইত্যাদি। গ্রামে বেশ সাড়ম্বরে ধর্মরাজের বাৎসরিক গাজন পালিত হয়ে থাকে। বৈশাখী পূর্ণিমাতেই গাজন হয়। ঐ গাজনে ধর্মরাজের বিভিন্ন পালনীয় কৃত্যাদিসহ কমবেশি চল্লিশ জন ভক্ত নিয়ে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের লোকেদের দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি থাকায় নানাবিধ মানত করলেও মাটির ঘোড়া অবশ্যই নিবেদিত হয়।

কুলটি ঃ— এটি কুলটি থানারই সদর কার্যালয়। একে ঘিরেই কুলটি শিল্পাঞ্চল তথা কুলটি শহর বিস্তৃত হয়েছে। জি.টি. রোড ও রেলপথ এই শহরের উত্তর অংশ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছে। পূর্ব ভারতের প্রথম লৌহ ইস্পাত কারখানাটি এখানেই গড়ে ওঠে। এই কুলটিতেই জি.টি. রোডের ধারে একটি প্রখ্যাত শিবমন্দির বর্তমান, তাকে ঘিরেই এখানে বর্তমানে একটি আশ্রমও তৈরি হয়েছে।

কেঁদুয়াড়ি ঃ— সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের অধীন ছোট্ট এক গ্রাম কেঁদুয়াড়ি। মাত্র ১৭টি রুইদাস পরিবার নিয়ে এই গ্রামটি গঠিত। গ্রামে নেই কোন পুকুর বা জলাশয়, নেই কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়। চাষ আবাদ ও হয় না বা তার কোন সুবিধাও নাই। কিন্তু এখানে যা আছে তা হল ঘরে ঘরে বিভিন্ন ধরনের চামড়ার বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের কারখানা।

শহর রূপনারায়ণপুরের ডাবর মোড় থেকে সামডি যাবার পথে প্রধান সড়কের উপরে মাত্র ১০ মিনিটের পথ কেঁদুয়াড়ি। চামড়া কেন্দ্রিক বাদ্য যন্ত্র নির্মাণের কাজে গ্রামে আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই নিয়োজিত। গ্রামটি পরিপূর্ণভাবে রুইদাস (মুচি) দের বসত ক্ষেত্র। এখানে অন্য কোন সম্প্রদায় নাই। বাদ্যযন্ত্র নির্মাণই মুখ্য জীবিকা তবে বাদ্যযন্ত্র মেরামতের কাজও এখানে হয়।

গ্রামে ঢুকলে চারিদিক থেকে ডুগি তবলা, খোল-মৃদঙ্গের উপর আঙ্গুলের টোকামারার শব্দ এবং তাতে সুর ওঠার বিলম্ব অনুধাবনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই গ্রামের বাদ্য যন্ত্র তৈরির বিশেষ সুখ্যাতি আছে। কারণ চামড়ার উপর গাবলাগিয়ে তাতে সুর তোলা একটা রীতিমত শিল্পকর্ম। সেই শিল্পসৃষ্টিতে এরা কোন সিনথেটিক আঠা ব্যবহার না করে সনাতন পদ্ধতিতে ভাতের আঠার সঙ্গে মিহি লোহার গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি করে গাবের আঠা। এখানেই এদের স্বকীয়তা। নিপুন হাতের যাদু স্পর্শে নির্মিত এদের যন্ত্রে সহজেই সুরমাধুর্য মূর্ছিত হয়, তাই বাজারে এদের তৈরি বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ কদর। দূর দূর এলাকা থেকে খরিদ্দাররা ভিড় জমায়। ফলে এদের রুজিরোজগার মন্দ নয়। চাকরির বাজারে দারুন মন্দার ভাব তাই এদের সন্তান সন্ততিরা পড়াশুনা করলেও বাংশানুক্রমিক চলে আসা বাপ-ঠাকুরদার ব্যবসাতেই তারা আত্মনিয়োগ করছে। কেঁদুয়াড়ি গ্রামে এই ব্যবসার বয়স প্রায় ১২০ বছরের উপর।

এদের কাঁচামাল অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রগুলির কাঠের খোল তৈরি হয় সাধারণত নিম শিরিষ ও আমকাঠ দিয়ে এবং তা আনা হয় কলকাতা থেকে। চামড়া আসে গৌরাণ্ডির চামড়ার ব্যবসায়ী কাছ থেকে। যন্ত্রগুলি তৈরি করতে বিভিন্ন রকমের সময় লাগে। যেমন তবলা তৈরি করতে সময় লাগে তিন দিন, একটা খোল বানাতে সময় লাগে পাঁচ দিন; ঢাক, মাদল, ধামসা তৈরি করতে একই সময় লেগে যায়। এদের তৈরি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তবলাই বেশি বিক্রয় হয়। এখনও পর্যন্ত এক একটা তবলা ৩৫০ টাকায় বিক্রয় হয়।

দিনে দিনে এদের তৈরি তবলা, শ্রী খোল এর চাহিদা বাড়ছে। দূর-দূরান্ত থেকে এমনকি ভিন রাজ্য থেকেও ব্যবসায়ীরা আসে মাল কিনতে। তাই এদেরও কাঁচামালের আমদানি বাড়াতে হচ্ছে। এই কাজে পুঁজির বিশেষ প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নাই। এ ব্যাপারে ব্যঙ্কের মাধ্যমে ঋণদান ও সরকারি সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন। পঞ্চায়েত এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলে এদের সুবিধা হয়। [.১]

(খ)

খতিয়ার ঃ— মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত গুসকরা নতুন হাট বাস রাস্তার দক্ষিণে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম। এর জে. এল. নং-৪০। গ্রামটি অজয় ও তার উপনদী

কুনুরেব মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত, তাই উভয় নদীর বন্যার আক্রমণে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ। গ্রামটি মূলত কৃষি কেন্দ্রিক গ্রাম। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম, নদীবাহিত পলিমাটিতে প্রচুব ধান আলুও রবি ফসল উৎপন্ন হয়। বন্যার ফলে কযেক দিন কষ্ট উপলব্ধি করলেও তা সরে গেলে মাঠে প্রচুর ফসলের আশায় এবং তা যথাযথভাবেই পাওয়ায় কেউ গ্রাম ছাড়ার কথা আর ভাবে না।

গ্রামে মুসলমান নাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বাস। তবে পল্লব গোপেদের সংখ্যাই বেশি। গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে শারদীয়া দুর্গোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম্য দেবতা হিসাবে ধর্মরাজের প্রাধান্য রয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসেই ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে কেন্দ্র করেই আত্মীয় পবিজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। গ্রামে তেমন কোন উল্লেখ্য পুরাকীর্তি নাই, তবে সাধারণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি উচ্চবিদ্যালয় বর্তমান। যার নাম পশ্চিম মঙ্গলকোট জাতীয় শিক্ষা নিকেতন। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ খ্রিঃ, প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন মাজিগ্রাম নিবাসী তৎকালীন কংগ্রেস নেতা মদন চৌধুরী, স্কুলের প্রধান গেটটি শান্তিরাম পালের নামে উৎসর্গীকৃত— যিনি এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

খুদরুন ঃ— মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত এক প্রাচীন গ্রাম। নতুন হাট-কাটোয়া-ভায়া কৈচর রুটে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বাস। এর জে.এল. নং ৭৯। জনশ্রুতি এখানে বর্গী হাঙ্গামার ফলে (১৭৪২-৫১খ্রিঃ) ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে স্থানীয় ভূস্বামীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাবে কয়েকবার যুদ্ধ হয়েছিল তাই গ্রাম নাম খুদরুন হয়েছে।

গ্রামে ১২ মাসেই বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাদি হয়ে থাকে তবে সব থেকে উল্লেখ্য হল ধর্মরাজের গাজন। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমাতেই এখানে বাবাধর্মরাজের গাজন বিপুল উৎসাহে মহাধুমধামে উদযাপিত হয়। ভক্তের সংখ্যাও অনেক। তাদের সংখ্যা শতাধিক। ধর্মরাজ পূজার যাবতীয় কৃত্যাদি যেমন ফল, হবিষ্য, মুক্তস্নান, আগুনখোলা, ধুনো সেবা, মানত মত দন্ডি কাটা এবং দেবতাকে নিয়ে নিকটবর্তী গ্রাম পরিক্রমা এবং পরিশেষে ছাগবলি সহ পূজাদি সবই হয়ে থাকে। দেবতাও বেশ জাগ্রত। লোক বিশ্বাস, এই দেবতার কৃপায় বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হন। তাছাড়াও পেটের অম্বল রোগের নিরাময় হয়ে থাকে। তার জন্য এখানে থেকে ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং এখানকার পূজকরাই সেই ওষুধ দিয়ে থাকে।

ধর্মরাজ ছাড়াও গ্রামে আরও বহু দেবদেবতার অবস্থান রয়েছে যেমন— শিব, দুর্গা, পঞ্চানন, কালী, যোগাধ্যা, ষষ্ঠী, গ্রহরাজ ইত্যাদি। ঐ সকল দেব-দেবীর পূজাও গ্রামে যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে পৌষ ও মাঘ মাসে সাড়ম্বরে পঞ্চাননের পূজা হয়, বৈশাখ মাসে হয় যোগাধ্যাদেবীর পূজা। ঐ দুই পূজা বেশ সাড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হয় তাই তাদের উৎসবকে ঘিরে মাঝে মাঝে মেলাও বসে।

খটনগর ঃ— এই গ্রাম সম্পর্কে গোপভূমের মন্দিরাদি অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে, তবুও দুচার কথা বলার প্রয়োজন। গ্রামটির জে. এল. নং ৪৪। গ্রামের প্রাচীনদেব কীর্তির কথা আলোচিত হলেও তাদের মধ্যে আর একটি হল সিংহপরিবার সেবিত লক্ষ্মীজনার্দন বিগ্রহ। এই বিগ্রহ সেবার স্বকীয়তা হল প্রত্যহ ক্ষীরের ভোগ নিবেদন। কিন্তু বর্তমানে তা আর সম্ভব না হলেও এখন দুধের ভোগ নিবেদিত হয়। তবে তারও বিশেষত্ব হল বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মুখে ঘা হলে ভোগের দুধ খাইয়ে দিলে তা সেরে যায়। ফলে এই লক্ষ্মীজনার্দনের ভোগের দুধ নেওয়াব বিশেষ চাহিদা আছে। গ্রামে ধুম ধামে ২৪ প্রহর হরিনাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামের পূর্বাংশে অধিকারী পরিবারে পুরুষানুক্রমিক ভাবে মহাপ্রভুর বেশ বড় বিগ্রহ পরম নিষ্ঠায় পূজিত ও সেবিত হয়ে আসছে।

খাণ্ডারী ঃ— আউশ গ্রাম থানার ২ নং ব্লকের অন্তর্গত মাঝারি আকারের এক গ্রাম খাণ্ডারী, গ্রামের জে. এল. নং ৮৪। গ্রামে মুসলমান অধিবসতি নাই। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন ব্রাহ্মণ, গোপ, সদ্‌গোপ, নাপিত, ধোপা ও বহুল পরিমাণে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বাস। কৃষি প্রধান গ্রাম। চাষ আবাদই এখানকার লোকেদের প্রধান জীবিকা।

গ্রামে দেবদেবীর উৎসব সম্পর্কে বলা যায় এখানে বৈশাখ মাসে খড়্‌গেশ্বর নামে মহাদেবের গাজন পর্ব ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। এই খড়্‌গেশ্বরই গ্রামদেবতা এবং তার নাম থেকেই গ্রাম নাম খাণ্ডারী হয়েছে। মাঘ মাসে গ্রামে মহাসাড়ম্বরে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে কেন্দ্র করেই তখন গ্রামে একটি মেলাও বসে। গ্রামে রাধামাধবের পঞ্চ রত্নের মন্দির রয়েছে, তা ছাড়াও রয়েছে কয়েকটি শিবমন্দির তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন নীলকণ্ঠ ও রত্নেস্বর শিব। গ্রামে কালী পূজাও ধুমধামে হয়ে থাকে তখন ও গ্রামে ছোটখাট মেলাও বসে। গ্রামে আরও রয়েছেন বুড়িমাদেবী যিনি আসলে মহিষমর্দিনী দূর্গা আরও আছেন ৪টি মনসাদেবী।

খানা ও খানো ঃ— গলসী ২ নং ব্লকের অধীন খানা একটি বড় গ্রাম। বর্তমানে এই গ্রামের উত্তর অংশে পূর্ব রেল পথ ২টি ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি লুপ লাইন নামে রামপুর হাটের দিকে অগ্রবর্তী হওয়ায় এটি একটি জংশনের মর্যাদা পেয়েছে তাই গ্রাম নাম এখন খানা জংশন নামে নামিত হয়েছে।

বর্ধমান শহর থেকে জি. টি. রোড ধরে প্রায় ১০ কি. মি. পশ্চিমে অগ্রবর্তী হয়ে ৩ কি. মি. উত্তরে এগিয়ে গেলেই এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটিতে হিন্দু মুসলমানের বাস হলেও ইদানিং রেল জংশনের সূত্রে এখানে অনেক অবাঙালিও বসবাস করছেন। অন্যান্য গ্রামের মতই এখানেও বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরাদি রয়েছে এবং এখানে বহুদেবদেবীও পূজিত হয়। যেমন যথা নিয়মে ও সময়ে গ্রামে দুর্গাপূজা, কালীপূজা,

জগদ্ধাত্রী পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বৈশাখমাসে শীতলা পূজা, চৈত্রমাসে শিবের গাজন এবং শ্রাবণ মাসে মনসাপূজাও হয়।

খানো ঃ— এ গ্রামটিও গলসী থানার ২ নং ব্লকের ১৩৯ নং জে. এল. ভুক্ত। গ্রামটি থানা জংশন এর সামান্য পশ্চিমে খানো লিঙ্ক নামে ছোট স্টেশনেব দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে হিন্দুও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েব বাস। গ্রামটি আসলে কৃষি নির্ভর হলেও এখানে অল্প পরিসবে চাকুবিজীবী ও কিছু ব্যবসায়ী লোকের অবস্থান লক্ষ্যণীয়। অন্যান্য গ্রামের মত এই গ্রামেও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা যথাসময়ে এবং যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হলেও সবথেকে উল্লেখ্য এক দেবী হলেন ঈশান চণ্ডী।

মুলখানো গ্রামের ঈশান কোনে চণ্ডীদেবীর আটন। তাই এই্ দেবী ঈশান চণ্ডী নামেই খ্যাত। এই দেবীর আটনটি হল খানো লিঙ্ক নামে ইষ্টার্ন রেলের এক ছোট স্টেশনের দক্ষিণ গায়ে। এখানের এক স্তূপীকৃত ভগ্ন ইটেব ঢিবির উপর দেবীর পদ যুগলের চিহ্ন সম্বলিত এক ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড বর্তমান, তাকে ঘিবেই দেবীর অবস্থান। ঐ প্রস্তর খণ্ডের পূর্ব-পশ্চিমে সারিবদ্ধভাবে প্রচুর পরিমাণে উত্তর মুখে দণ্ডায়মান মাটির হাতি ঘোড়া, তাব মাঝেই বেশ কয়েকটি লম্বাত্রিশূল লাল কাপড় জড়ান অবস্থায় বিদ্যমান। এই নিকট দেবীর আটন তবে প্রস্তর পদ যুগলের কাছেই ঈষৎপূর্বে দুটি শিবলিঙ্গের অবস্থান— যা পরবর্তী কালে অন্যত্র থেকে আনা হয়েছে বলেই অনুমান।

দেবী এখানে নিত্য পূজিতা। পূজকের নাম লালু ভট্টাচার্য। এই ভট্টাচার্য পরিবার বংশানুক্রমিক ভাবে দেবীর পূজায় নিয়োজিত আছেন। বছরে দুবার দেবীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে তখন আরও পুজক অংশ নিয়ে থাকে। বছরে মহানবমীর দিনে পাঁঠাবলিসহ দেবীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে আর দোল পূর্ণিমায় তিনচার দিন ধরে দেবীর আর এক বিশেষ পূজা হয়ে থাকে তবে ঐ সময় কোন বলিদান হয় না। বরং দেবীর নিমিত্ত বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বার মাসের জন্য পোঁতা হাড়িকাঠকে তখন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। ঐ সময় আটনের নীচে অস্থায়ী হরিমণ্ডপ তৈরি করে ৩/৪ দিন ধরে অখন্ড তারক ব্রহ্ম নামযজ্ঞ চলতে থাকে। রাত্রে পালা কীর্তনও হয়। দোল পূর্ণিমার দুদিনের মাথায় এখানে প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে। তখন আটনে চলতে থাকে অবিবাম ভক্ত আগমন ও তাদের মানত পূজা প্রদান। আর নীচে চলে অবিরাম হরিনাম যজ্ঞ ফলে একাধারে দুই অনুষ্ঠানই সমানে চলতে থাকে।

ধুলেটের আগের দিন দুপুরে ভোগ আরতির পর সমবেত কয়েক হাজার ভক্তের সকলকেই আটনের দক্ষিণ দিকে গাছপালায় ঘেরা বনবীথির ছাওয়ায়, পাতা পেড়ে বসিয়ে পেট পুরে প্রসাদ দেওয়া হয়। এর জন্য সেদিন আগের রাত থেকে রান্না করা শুরু হয় এবং এক নাগাড়ে ১১/১২টি উনুনে সমানে রান্নার কাজ চলতে থাকে। পরের দিন দুপুরে ধুলেট অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আরও ব্যাপক ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে

এবং ধূলোটের পর সমাগত সকল ভক্তকেই পূর্বদিনের মত একই জায়গায় বসিয়ে একই ভাবে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিন খেচরান্নের (খিঁচুড়ি) সঙ্গে পরমান্ন প্রসাদ ও থাকে। দুর্গাপূজার নবমীতে দেবীর বিশেষ পূজা হয় ঠিকই কিন্তু দোল উৎসবের মত ভক্তদের এত ব্যাপক সমাগম তখন হয় না।

এখানে দোল উৎসবে বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান ধুমধামে প্রতিপালিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল যে, অনেক দিন আগে পাশাপাশি গ্রামগুলিতে কলেরারোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেলে ভীত সন্ত্রস্থ গ্রামবাসীগণ দৈব কৃপালাভের উদ্দেশ্যে দেবী ঈশান চণ্ডীর পূজা দিয়ে নিরাময় লাভ করলেও সেখানে হরিনাম সংকীর্তনও শুরু করেছিলেন ফলে সেই ট্রাডিশন তখন থেকেই চলে আসছে। ফলে একই আটনে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় পূজাই চলে আসছে।

এই ঈশান চণ্ডী মায়ের পূজা পাঠ ও অনুষ্ঠানাদি সকল কিছুই তত্ত্বাবধান করেন ষাটোর্ধ বয়সের স্থানীয় বরসনা গ্রামের শংকর প্রসাদ দত্ত। যদিও ইনি গৃহী ব্যক্তি তবে চাকুরি জীবনের মাঝামাঝি সময়ে তা ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে সাধন ভজনে রত আছেন। পোষাক হিসাবে হলুদ ও লাল রংয়ের কাপড় জামা ব্যবহার করেন। মাথায় আছে লম্বা জটা।

তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় ভক্তগণের মুক্তহস্তেদান ও পরিপূর্ণ সহযোগিতায় ঈশান চণ্ডীর পূজাপার্বন ও উৎসবাদি পরিপূর্ণভাবে চলে আসছে। এখানে দোলপূর্ণিমায় বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে দূর-দরান্ত থেকে ভক্ত সমাগম হয় এবং তাকে ঘিরেই এখানে তখন কয়েক দিনের জন্য একটি মেলাও বসে।

খেতিয়া ঃ— গলসী থানার অধীন ১০১ নং জে. এল. ভুক্ত গ্রাম খেতিয়া। বর্ধমান থেকে দুর্গাপুরের পথে গলসী রেল স্টেশনে নেমে প্রায় ৫ কি. মি. পশ্চিমে অগ্রবর্তী হলে এই গ্রামে যাওয়া যায়। অন্যথায় জি. টি. রোড বরাবর গলসীতে নেমে, গলসী-আনন্দ রাজার (দিগনগর) রাস্তায় সামান্য উত্তরে গেলে গ্রামে যাওয়া যায়।

গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হলেও সবথেকে উল্লেখ্য উৎসব হল চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা। শারদীয়া দুর্গাপূজার মতই চার দিন ধরে মহিষাসুর মর্দিনী সিংহবাহিনী দেবী দুর্গাই সপরিবারে সপ্তমী থেকে দশমী তিথিতে মহাসমারোহে পূজিতা হন। এখানে বসন্তকালে এই দেবীর আরাধনা। তাই দেবী বাসন্তী নামে খ্যাত।

এই বাসন্তী পূজাই এখানকার গ্রাম্য উৎসব, তাই একে ঘিরেই গ্রামের লোকেরা আত্মীয়পরিজনদের গ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানায়। এই সময় গ্রামে কয়েকদিনের জন্য একটি মেলাও বসে। জনশ্রুতি, সাধক কমলাকান্তও এই পূজা দর্শনে এসেছিল। কৃষি প্রধান গ্রাম। চাষ আবাদই গ্রামের অধিকাংশের জীবিকা। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম।

খান্দরা ঃ— ৩২ নং জে. এল ভুক্ত অন্ডাল থানার অন্তর্গত গ্রাম খান্দরা। অন্ডাল থেকে উখরা যাবাব পথে উখরা রেল স্টেশনের নিকটে এই খান্দবা গ্রামের অবস্থান। খনি এলাকা ভুক্ত হওযায এই গ্রামটি এখন গ্রামীণ পবিকাঠামো পাল্টে শহবমুখী হতে বসেছে এবং এখন এটি একটি ব্যবসা ক্ষেত্র হিসাবে পবিণত হয়েছে।

গ্রামেব উল্লেখ্য দেবস্থান হিসাবে গ্রামের পশ্চিমে রয়েছে নীলকন্ঠ নাথ বা নীলকণ্ঠেশ্বর শিবক্ষেত্র। এখানে এক বিবাট মন্দিবে নীলকণ্ঠ শিব বিরাজমান। বিভিন্ন শৈব উৎসবের মধ্যে ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশীতে শিব পূজাকে কেন্দ্র করে এখানে বিশেষ উৎসব হয। তাকে ঘিবে তখন এক মেলাও বসে। তাছাড়া ও গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবীব পূজা যথা নিয়মে যথাসময়ে পালিত হয। বর্তমানে এখানে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হযেছে।

(গ)

গতিষ্ঠা ঃ— মঙ্গলকোট থানার মধ্যে গুসকরা নতুন হাট বাস-রাস্তার ধারে এই গ্রাম। গ্রামেব জে. এল. নং ৩২। গ্রামটি অজয় নদীর দক্ষিণে এবং কুনুর নদীর উত্তরে অবস্থিত ফলে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাধীন হলেও পাশাপাশি আমডোব, চাকদা ইত্যাদির তুলনায় অনেকখানি উঁচু স্থানে অবস্থিত। তাব ঐ অবস্থানের জন্য অনেক সময় বন্যার জল এখানে প্রবেশ করতে পারে না। বা তেমন কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাই স্থানীয় ভাবে একটি লোকছড়া চালু হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—

আমডোব ডোব চাকদা ভাসে।
গতিষ্ঠার লোক দাড়িয়ে হাসে।

এতদ অঞ্চলের আরও পাঁচটি গ্রামের মত এটিও একটি কৃষি প্রধান গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম। এই এলাকার প্রধান ফসল ধান ও আলু। গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হলেও এখানকার গ্রাম্য উৎসব হল ধর্মরাজের গাজন। ধর্মরাজের নামটিও বেশ অদ্ভুত— গুজরুন। গ্রামে দুর্গা কালী ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হলেও গ্রামের দাস (কর্মকার) পরিবারে বাসন্তী পূজার সময় অন্নপূর্ণা পূজা ও পরে মনসা পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। লোকবিশ্বাস গ্রামটি একদা মঙ্গল কোটের রাজার গোচারণ ক্ষেত্র ছিল। তাই গ্রামের নাম গোতিষ্ঠা হয়েছে। মোট কথা গোপভূমির গোপালকদের এটি একটি বসতক্ষেত্র ছিল।

গন্না ঃ— আউশ গ্রাম থানার ১ নং ব্লকের ১৬৩ নং জে. এল. ভুক্ত এই গ্রামটি গুসকরা-বুদবুদ রাস্তার ধারেই অবস্থিত। দেরিয়াপুরের পাশের গ্রাম তাই এদের পরিচিতির জন্য একত্রে বলা হয় গন্না-দেরিয়াপুর। ছোট গ্রাম, অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত

থাকলেও সব থেকে আকর্ষণীয় দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী কালী। এর বিশেষত্ব হল দেবী মৃন্ময়ী কালী মূর্তি হলেও পূজান্তে এর বিসর্জন হয় না। দেবী নিত্যপূজিতা। ১০/১২ বছর অন্তর স্বপ্নাদেশে দেবীর বিসর্জন হয় এবং তখন নতুন মূর্তি আনা হয়। কার্তিক মাসে অমাবস্যায় কালী পূজার দিনেই দেবীর মহাধুমধামে বিশেষ বাৎসরিক পূজা হয়ে থাকে। তখন ছাগ মেষ মহিষ বলিও হয়ে থাকে। হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌গোপদের আধিপত্যই বেশি। পূর্বে সংস্কৃতির চর্চা হিসাবে কবিগানের চল ছিল।

গোপীনাথ বাটী ঃ— আউশ গ্রাম থানার ১ নং ব্লকের আওতায় দিগনগর পঞ্চায়েতের অধীন এই গ্রাম। এ গ্রামটিও গুসকরা-বুদবুদ পাকা রাস্তার পূর্বে অবস্থিত। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ জিউ বিগ্রহের জন্যই গ্রামের নাম গোপীনাথ বাটী হয়েছে। একদা গ্রামে অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস থাকলেও গোস্বামী ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই বেশি ছিল। গোপীনাথ জিউ নিত্যসেবিত হলেও তার বাৎসরিক বিশেষ পূজা বা উৎসব শুরু হয় ১৭ই বৈশাখ থেকে ২রা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত। পূর্বে পাশাপাশি পাঁচখানি গ্রামের (ধারাপাড়া, সুশীলা, মাঝের গ্রাম, দেরিয়াপুর, গোপীনাথবাটী) ব্রাহ্মণদের নিয়ে উৎসব হত এবং তাদের নিমন্ত্রণ করা হত উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য। এখন আর তা হয় না। গ্রামের লোকেদের নিয়েই সেই উৎসব সারা হয়।

গ্রামে বেশ কয়েকটি শিবমন্দির বর্তমান। তার মধ্যে বিশ্বেশ্বর শিব বেশ উল্লেখ্য। এই শিবের নিত্যসেবা বর্তমান আছে এবং দিনে ও রাতে এখনও দুবার পূজা হয়। শিব চতুর্দশীতেও এখানে উৎসব হয়। গ্রামে সিংহবাহিনী দুর্গার পূজা হয়। পূর্বে এই দুর্গার বাহন সিংহের গায়ের রং হত সাদা এবং ডাগ্রনাকৃতি লম্বাটে লম্বাটে মুখ যাকে বঙ্গ সিংহ বলা হত। এখন তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পূর্বে এই পূজায় মহিষ বলিদানও হত। এখন তা গল্প কথায় পর্যবসিত হয়েছে, এখন কেবল আখ ও কুমড়া বলিতেই দেবীকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। তাতেও ভক্ত হয়। তবে ধর্মপূজার কৃত্যাদি হিসাবে এখানে বানফোঁড়া হয় না। ধুনো সেবা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়। এই ধর্মরাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয় যে, গ্রামের জমিদাররা একদা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গ্রামের এক বাগান থেকে ধর্মরাজকে পেয়েছিলেন, তাই ধর্মরাজের নাম বাগানের বুড়ো থেকে বাগিনীবুড়ো হয়েছে। ধর্মরাজের পূজায় ছাগ ও মেষ বলি হয়ে থাকে।

গ্রামে মনসা পূজাও বিশেষ ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। অনেক প্রতিমা এলেও বেশ কিছু পূজা ঘটবাড়িতেও হয়ে থাকে। পরিশেষে বলি, গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হলেও গ্রাম্যদেবী হলেন রক্ষাকালী। অগ্রহায়ণ মাসে সকলের নবান্ন পরিপালিত হওয়ার পর সাধারণত ২০ তারিখের আগের যে কোন শনি, মঙ্গলবারে এই রক্ষাকালী

মায়ের পূজা হয়ে থাকে এবং গ্রামের সকলেই এই পূজায় অংশগ্রহণ করেন। গ্রামে পূর্বে কর্মকারদের দ্বারা কাঁসা-পিতালের দ্রব্যাদি তৈরি হত কিন্তু বর্তমানে গ্রামে কর্মকার থাকলেও সেই সব দ্রব্যাদি তৈরি বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

গোয়াল ডাঙ্গা ঃ— গোপভূম পরগনার আউশ গ্রাম থানার ১ নং ব্লকের রামচন্দ্রপুর মৌজার অধীন এক কৃষি প্রধান গ্রাম এই গোযাল ডাঙ্গা। গ্রামটি গুসকরা-মোর বাঁধা রাস্তার বন নবগ্রামের বেশ কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমে জঙ্গল মহলের গভীব জঙ্গলের আবেষ্টনে আবেষ্টিত।

পূর্বে জঙ্গল মহলের এই ডাঙ্গা বা উঁচু জায়গায় গোয়ালাদের অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। তাই গ্রামের নাম গোযাল-ডাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে গ্রামনাম গোয়াল ডাঙ্গা বহাল থাকলেও সে গ্রামে এক ঘরও গোয়ালার বাস নাই। সব শেষ যে গোয়ালা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে সেই বাড়িটি এখনও গোয়ালা বাড়ি নামে খ্যাত।

এখন গ্রামে মাত্র দু' ঘর ব্রাহ্মণ, অবশিষ্ট সদগোপ ও কয়েক ঘর নিম্ন সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামে একটি দুর্গাবাড়ি ও একটি কালী মন্দির রয়েছে। দুর্গাতলায় ২৪ প্রহরও হয়ে থাকে। কালী বাড়িতে খুবই ধুমধামে কালী পূজা হয়ে থাকে এবং কালী প্রতিমা বিসর্জিত হলেও ঘট বিসর্জন হয় না। সেই ঘট সারা বছর নিত্য পূজিত হয়। আবার পূজার সময় ঘট আনার কালে পুরাতন ঘট বিসর্জিত হয়।

এটি কৃষি প্রধান গ্রাম। সকলেই চাষআবাদে যুক্ত। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই সীমিত। গ্রামটি জঙ্গলের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় গ্রামের নিম্নসম্প্রদায়ের লোকেরা বন থেকে শালপাতা আহরণ করে তা পাতায় পরিণত করে ও বিক্রয় করে। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেখানে পাঠ সমাধা করে ছেলে মেয়েরা নবগ্রাম হাইস্কুলে যায়।

গোস্বামী খণ্ড ঃ— আউশগ্রাম থানার ২ নং ব্লকের ৪২ জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম গোস্বামী খণ্ড। ভেদিয়া মোর বাঁধ বাস রাস্তার দক্ষিণে উত্তর রাম নগরের পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামের নাম গোস্বামী খণ্ড হলেও এখানে একঘরও গোস্বামী নাই, পূর্বেও ছিল না। তবে সুদুর অতীতের কথা জানা যায় না। গ্রামের জমিদার ছিলেন মিত্ররা। তাঁদের তৈরি কিছু পুরাকীর্তি এখনও গ্রামে বর্তমান। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল ঠাকুর লক্ষ্মী জনার্দনের এক প্রাচীন মন্দির। গ্রামে প্রাচীন জমিদারদের নামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আরও দুটি শিব মন্দির তাদের মধ্যে একটি হল সুরখেশ্বর অন্যটি হল মদনেশ্বর।

গ্রামে গ্রাম্য উৎসব হল রাধাগোবিন্দর হরিনাম বা ২৪ প্রহর অনুষ্ঠান। এই উৎসব উপলক্ষে গ্রামবাসীগণ আত্মীয়-পরিজনদের নিমন্ত্রণ করেন। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ সংক্রান্তির তিন দিন এবং জ্যৈষ্ঠের শুভদিনেই ধুলোট বা পরিসমাপ্তি ঘটে। এই গ্রামের উত্তর প্রান্তে ক্যানেলের দক্ষিণে যে সকল পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সে

বিষয়ে এই পুস্তকের গোপভূমের পূবাকীর্তি অধ্যায় বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।

গলসী— গলসী থানার সদর কার্যালয় হল গলসী গ্রাম যার জে. এল. নং ৯৯। বর্ধমান থেকে জি. টি. রোডে সবাসরি গলসী গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামের প্রায় মাঝ বরাবর জাতীয় সড়ক এ. জি. টি. রোড পূব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছে। ফলে এটি ধীরে ধীরে বেশ ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় শহরের রূপ পেয়েছে।

গ্রামটির নামকরণ প্রসঙ্গে বহু মত প্রচলিত, তার মধ্যে একটি হল সুকুমার সেন বলেছেন এটি গলপাশী থেকে গলসী হয়েছে। অর্থাৎ সেই ঠেঙারেদের সময় কালে এখানে পথচারী জনদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা হত। সেই থেকেই গ্রাম নাম গলসী হয়েছে। [১০] দ্বিতীয় মত হল গ্রামে গ্রাম্য দেবতা গর্গেশ্বর শিব থেকেই গ্রাম নাম গলসী। তৃতীয় মতে প্রবক্তা হিসাবে ডঃ সত্যনারায়ণ দাস বলতে চেয়েছেন 'গর' এই জলবাচক শব্দ থেকে 'গল' হয়েছে এবং তার থেকেই গ্রামের নাম গলসী।

গ্রামে অনেক পুরাকীর্তি ও দেবকীর্তির মধ্যে উল্লেখ্য হল গ্রামের মধ্যস্থলে এক আটকোনা শিবমন্দিরে গ্রাম দেবতা গর্গেশ্বর শিব অবস্থিত আছেন। স্থানীয় অঞ্চলের বহু শিবের মধ্যে এই গর্গেশ্বর শিবই শ্রেষ্টত্বের দাবিদার। গ্রামে আর এক দালান মন্দিরে ধর্মরাজের শিলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থেকে পূজিত হচ্ছেন। ঐ মন্দিবেই রয়েছেন, অষ্টভুজা এক দুর্গামূর্তি যা জয়কালীর ধ্যানে সেবা পাচ্ছেন। ধর্মরাজের গাজনে এক বিশেষ বীতি লক্ষ করা যায়— সেটি হল গাজনের দিনে যার গাজন তাকেই অর্থাৎ ধর্মরাজের শিলা মূর্তিটিকে মন্দির থেকে দূরে সরিয়ে গ্রামস্থ এক মসজিদের কাছে এক বেদীতে সারাদিনের জন্য রেখে আসা হয়। পরে দিনান্তে সন্ধ্যার পরে তাকে মন্দিরে আনা হয়। গ্রামে চৈত্র মাসে শিবের গাজন না হয়ে তা অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ মাসে এবং একই সঙ্গে ধর্মরাজের গাজনও অনুষ্ঠিত হয়। এই উভয় দেবতার একই দিনে গাজনকে কেন্দ্র করে গ্রামে বিশেষ ধুমধাম শুরু হয় এবং তখন গ্রামে একটি মেলাও বসে। গ্রামের এক দালান মন্দিরে শ্রীধররূপী বিষ্ণুরও নিত্য পূজা হয়ে থাকে। গ্রামে আর একটি উল্লেখ্য উৎসব হয়ে থাকে চৈত্রমাসে জয় দুর্গাদেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে। সেটি বাসন্তী পূজার সময়েই হয়ে থাক। সেই সময় গ্রামে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি চলতে থাকে। তখনও গ্রামে একটি ছোটখাট মেলা বসে।

এতক্ষণ গ্রামে দেবদেবীর উৎসবাদির কথা হল, এবার গ্রামের পুরাকীর্তিগুলির প্রসঙ্গে বলা যায় যে, গ্রামে ধর্মরাজের দালান মন্দিরটি কখন তৈরি হয়েছিল তা বলা না গেলেও সেটি যে, ১৯২৫ খ্রিঃ সংস্কৃত হয়েছিল তা মন্দির গাত্রের লিপি থেকেই জানা যায়। এছাড়াও গ্রামে কয়েকটি পারিবারিক দেববিগ্রহ ও তাদের মন্দিরাদিও রয়েছে। যেমন— গাঙ্গুলী পরিবারের শিখর দেউল রীতিতে তৈরি মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১৮১২ শকাব্দে বা ১৮৯০ খ্রিঃ। এদের তৈরি শিব মন্দিরটি ১৮৫৪ খ্রিঃ তৈরি

হয়। এখানে কিছু টেরাকোটার কাজও লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল একটি শিব অন্যটি কালীর চিত্র। এছাড়াও গ্রামে রয়েছে মুখার্জী পরিবার প্রতিষ্ঠিত দু'টি শিখর দেউল ও আরও তিনটি আটচালা রীতির শিব মন্দির।

গোহগ্রাম ঃ— গলসী থানাব দামোদর নদীর উত্তব তীরে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম এই গোহগ্রাম। বর্ধমান থেকে গলসী-গোহগ্রাম বাসে সবাসরি এই গ্রামে যাওয়া যায়। এর জে. এল. নং- ৭০। গ্রামটি যে প্রাচীন তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে প্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীন রাজা বিজয় সেনের তাম্রলিপি যা মল্লসারুল গ্রামে জারুলে নামক এক পুকুরে ১৯৩৫ খ্রিঃ পাওয়া গিয়েছিল। তাতে বেশ কয়েকটি স্থানীয় গ্রামের নাম আছে। তাতেই গোহগ্রামের উল্লেখ আছে যা ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেনের মতে, সেটিই গোহগ্রাম।

এই গ্রামের প্রাচীন দেবকীর্তি তথা পুরাকীর্তি হিসাবে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় চক্রবতী' পরিবার প্রতিষ্ঠিত এক দালান মন্দির, যার অভ্যন্তরে বিরাজিত রাধা-দামোদর নামে নিত্যপূজিত শালগ্রাম শিলা। এরই পিছনের দিকে রয়েছে, একটি সুউচ্চ শিখর দেউল যার সামনের দিকে রয়েছে টেরাকোটা শিল্পের অনবদ্য নিদর্শন। এই মন্দিরের উপরের দিকে রয়েছে এক আমলক শিলা। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লিপি থেকে জানা যায়, এটি ১৭৯২ শকাব্দে বা ১৮৭০ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছিল। ঐ চক্রবর্তী পরিবার গ্রামে আরও চারটি আটচালা শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাদের মধ্যে এখন দু'টির শিখর চূড়া ভেঙ্গে গেছে।

গ্রামে আরও রয়েছে একটি সুন্দর দোল মঞ্চ। দোলের সময় সেখানে দামোদর শিলাকে সংস্থাপন করা হয় এবং উৎসব উদযাপিত হয়। এই গ্রামে আর এক উল্লেখ্য উৎসব হল চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে শিবের গাজন। তাকে ঘিরে গ্রামে তখন জমজমাট উৎসব চলে। গাজনে ভক্ত হয় অনেক এবং বান ফোঁড়া থেকে শুরু করে নানান কৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। তখন গ্রামে বহু লোকজনের সমাগম হওয়ায় গ্রামে একটি মেলাও বসে।

এবার গ্রামে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য গ্রাম্যদেবী জগদ্ধাত্রী বা ভগবতীদেবী সম্পর্কে কিছু বলা যাক। গ্রামে ইনি ভগবতী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। চৈত্র মাসের রামনবমীতে এই দেবীর বাৎসরিক বিশেষ উৎসব বা গাজন অনুষ্ঠিত হয়। দেবীগ্রামের ভগবতী তলায় এক দালান মন্দিরে অধিষ্ঠিত থেকে নিত্য সেবিত হন। কেবল গাজনের সময় অষ্টমীর দিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই দেবীকে পরিপূর্ণ সমারোহে শোভাযাত্রাসহ গাজন তলায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই আবার শোভাযাত্রা সহকারে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়।

দেবী ভগবতী শিলা মূর্তি। প্রায় তিন ফুটের মত উঁচু। দেবী চতুর্ভুজা সিংহপৃষ্ঠে

আসীন। দেবীর হাতে যে সব আয়ুধ রয়েছে সেগুলি হল খড়্গ, চক্র ও দু'হাতে দুই ত্রিশূল। দেবীর দক্ষিণে রয়েছে এক নারী ও বামে এক নরমূর্তি। নীচে রয়েছে দুটি গরুড় মূর্তি, মূর্তিগুলি সহজেই নাড়াচাড়া করা যায়। প্রত্যহ স্নানের সময় মূর্তি সামনে টেনে এনে স্নানান্তে আবার পূর্বস্থানে সংস্থাপিত করা হয়। পূজক বসন্ত ভট্টাচার্যরা বংশানুক্রমিক ভাবে এই দেবীর পূজা করে আসছেন।

পূর্বে এই দেবী গোহগ্রামের দক্ষিণে নদীর পর পারে বাঁকুড়া জেলার শালখাঁড়ার জঙ্গলে অবস্থিত ছিলেন। এখানকার এক গোপের দুগ্ধবতী গাভী বাড়িতে দুধ না দিয়ে প্রতিদিন রাত্রে নদীপার হয়ে সেই জঙ্গলে দুধে দিতে যাওয়ায় গোপ তা অনুসন্ধানে গেলে দেবীর কথা জানাজানি হয়। তখন গ্রামের লোকেরা দেবীকে শালখাঁড়া হতে চুরি করে আনে। কিন্তু সেকথা শালখাঁড়ার লোকেরা জানতে পেরে মূর্তি ফিরিয়ে নিতে এলে সংঘর্ষ বাধে। তখন দেবী স্বপ্নে উভয় গ্রামের লোককে জানায় যে দেবী গোহগ্রামেই থাকবে। শালখাঁড়ার লোকেরা কাঠ ও গঙ্গা মাটি সহযোগে মূর্তি তৈরি করিয়ে, যেন একই সময়ে একইভাবে পূজা করে। আজও সেইভাবেই পূজা দুই গ্রামেই চলে আসছে। পূর্বে শালখাঁড়া থেকে দেবীর চোটের জন্য লোকের হাতে হাতে খাঁড়া গোহ গ্রামে আসত, তারপর বলিদান হত। এখন আর আসেনা। তবে গোহ গ্রামের প্রথম চোটটি এখনও শালখাঁড়া থেকেই আসে।

আগে এই দেবীর সেবা পূজার জন্য ৩৬৫ বিঘা জমি ও দশটি পুকুর নিষ্কর ছিল। প্রতিদিন ১ বিঘা জমির ধানের চালে ভোগ হত প্রয়োজনীয় মাছসহ, ফলে ভক্তরা চাইলেই ভোগের প্রসাদ পেত। এখন কোন মতে সেবা চলে, পূর্বের সেই জমিজমা নেই ফলে পূজার সেই জৌলুসও নাই। তবে গাজনে এখনও বেশ ধুমধাম হয়। গাজন উপলক্ষে দু' দিনে প্রায় হাজার পাঁঠাবলি হয়।

ভগবতীর এই বিশেষ গাজনে এখনও প্রায় পাঁচশ র মত সন্ন্যাসী হয়। মহাধুমধামে বিভিন্ন কৃত্যাদিসহ গাজন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাকে ঘিরে তখন গ্রামে বিশেষ লোক সমাগম হয়। ফলে শিব ও ভগবতীর গাজনকে ঘিরে গ্রামে দু' বার মেলা বসে। মেলার জাঁকজমক কিন্তু কমে নাই বরং দিন দিন তা বাড়ছে। তাছাড়া এই উৎসবে ঢাক, ঢোল, ব্যান্ড, নহবত, জগঝম্প, রসুনচৌকি ইত্যাদি বিশাল বাদ্য ভাণ্ডারের সমাবেশ হয়— সবাই কিন্তু দেবীর মানত শোধ করতে আসে। তাই এই ভগবতীর গাজন সত্যই দেখার মত। একই রকম উৎসব নদীর ওপারে শালখাঁড়াতেও চলে।[১১]

গরম্বা ঃ— গলসী থানার ১১৩ নং জে. এল. ভুক্ত গ্রাম গরম্বা। গ্রামটি দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম। মাঝারি আকারের এই গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। বর্ধমান-গোহগ্রাম বাসে গোহগ্রামে নেমে দক্ষিণে কিছু অগ্রবর্তী হলে এই গ্রামে যাওয়া যায়।

গ্রামে দেবদেবীর মধ্যে উল্লেখ্য হলেন শিব, মনসাও শীতলা। শিবরাত্রিতে শিবের বিশেষ উৎসব হয়ে থাকে। তাছাড়া অন্যান্য দেবদেবীর পূজা যথা নিয়মে উদ্‌যাপিত হলেও গ্রামে সব থেকে উল্লেখ্য উৎসব হল পৌষ সংক্রান্তিতে মকরস্নান উৎসব। দামোদর নদীতে মকর স্নান করাব জন্য তখন এখানের দামোদরের তীরে একটি মেলাও বসে। সেই সময় গ্রামে গঙ্গা পূজাও অনুষ্ঠিত হয়।

গোপডাল ঃ— গলসী থানার ২ নং ব্লকের গোহগ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রাম গোপ ডাল। এর জে. এল. নং ৬৯। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই গোপ সম্প্রদায় ভুক্ত। গোপভূমের এটিও একটি গোপ প্রধান গ্রাম। এখানে গোপ সম্প্রদায়ের বিস্তারের জন্যই গ্রাম নাম গোপডাল হয়েছে। প্রাচীন অর্থ ধরলেও দাঁড়ায় 'ডাল মানে বৃক্ষ বহুল ভূমি' (বাংলা স্থান নাম—সুকুমার সেন। পৃঃ-২২) অর্থাৎ গোপেদের সৃষ্ট বাগান—তাকে ঘিরেই গ্রাম বা 'গোপডাল' নামে খ্যাত।

দামোদরের উত্তর তীরে অবস্থিত প্রাচীন গোহগ্রামের লাগাও পশ্চিমাংশে বাঁধের গায়ে অবস্থিত গ্রাম হওয়ায় এখানকারও প্রধান উৎসব হল ভগবতীর গাজন। তাছাড়াও এখানে বগা পঞ্চমীর দিনে মৃৎ প্রতিমায় মহাধুমধামে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তখন ঝাঁপান উৎসবকে কেন্দ্র করে মনসার গান এবং শাকি গানও গাওয়া হয়। এই পূজায় বিশেষত্ব হল জলভরা ঘট উল্টো করে মাথায় বসিয়ে আনা হয় কিন্তু জল পড়ে না। ভক্তদের ভর হয়। ভর যেকোন ভক্তের হতে পারে। ভর এমনই জিনিষ যে কোন শিশুভক্তের ভর হলেও তাকে অতিশয় বলবান ব্যক্তিরাও আটকে রাখতে পারে না। এই পূজায় আত্মীয়-পরিজনদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। ছাগবলিসহ দেবীর পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কার্ত্তিক মাসে ছবির মাধ্যমে গ্রামে ক্ষেপা কালীর পূজা হয়ে থাকে। এই দেবীর কৃপায় মানসিক রোগ নিরাময় হয়। এখানেও ছাগ বলি সহ মায়ের পূজা নিষ্পন্ন হয়। ধর্মরাজের পূজাও গ্রামে হয়ে থাকে। গ্রাম্য ধর্মরাজের নাম বন্যরাজরায় ধর্মরাজ। ধর্মরাজ নিত্যসেবিত হলেও প্রতি রবিবার ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হন। ঐ দিন দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা পূজা দেওয়ার জন্য সমবেত হন। ধর্মরাজের কৃপায় বাত ব্যাধি প্রশমিত হয়। ধর্মরাজ তলার ধুলা মাটিই রোগের প্রধান ঔষধ। শোনা যায় এই ধর্মরাজ নাকি কোন কবিরাজ ছিলেন। তাঁর দেহাবসানের পর তার আটনের ধুলা মাটিতেই রোগের অবসান ঘটে। পৌষ সংক্রান্তি ও ১লা মাঘ ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে এখানে মেলা বসে।

এই গ্রামের চাকুপুড় পাড়ার এক গোপ বাড়ির কোন গরু নদীপারে শালখাঁড়ার জঙ্গলে দুধ দেওয়াকে কেন্দ্র কের সেখানে ভগবতী দেবীর আবিষ্কার ঘটে। সেই মূর্তি পরে গোহ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখনও পূজিত হচ্ছেন। এবং এখনও সেখানে

মহাধুমধামে চৈত্রমাসের রামনবমীতে দেবীর বিশেষ পূজা বা গাজন মহা ধুমধামে পালিত হয়। সেদিক থেকে গোহগ্রামের সঙ্গে গোপডালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।

এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা চাযআবাদ। চাকুরিজীবী নাই বললেই চলে। এই গোপডালেই নদী পার হয়েই বাঁকুড়া যাওয়ার ফেরি ঘাট রয়েছে। একদা গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার মণ্ডলদের পারিবারিক দুর্গোৎসব ছিল। তার মন্দিরও ছিল কিন্তু দামোদরের বন্যায় তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় পূজাও বন্ধ হয়ে গেছে।

গোপমহল ঃ— বুদবুদ থানার বুদবুদ মিলিটারী বেস-এর দক্ষিণে গোপমহল গ্রামের অবস্থান। বুদবুদ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪ কি.মি. দক্ষিণে। গ্রামটি ছোট এবং গোপপ্রধান গ্রাম। অর্থাৎ গ্রামের অধিকাংশ লোকই গোপ সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ায় খুব সঙ্গত কারণেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে গোপমহল। গ্রামের প্রধান পুষ্করিণীটির নামও গোয়ালবাঁধ। গ্রামটি কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও নিকটে মিলিটারী বেস্ থাকায় অনেকেই সেখানে চাকুরি করেন ফলে গ্রামে চাকুরিজীবীর সংখ্যা বেশ ভালই। কিছু লোক নিকটবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্র বুদবুদে বিভিন্ন ব্যবসায়ে যুক্ত আছেন। অনেকেই দুধ ছানার কারবার করেন এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিরা চাষ আবাদে নিযুক্ত রয়েছেন।

গ্রামে মাঝামাঝি অংশে এক পুকুরের পাড়ে দক্ষিণমুখী একতলা দালান মন্দিরে গ্রাম্যদেবী মনসা বেশ সাড়ম্বরে পূজিত হন। দেবীর বিশেষ পূজা বা বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় ভাদ্র সংক্রান্তিতে। দেবীমনসা যেহেতু গ্রাম্যদেবী তাই তার উৎসবকে ঘিরেই গ্রামের লোক আত্মীয়-পরিজনদের নিমন্ত্রণ কবে পূজায় কয়েক দিন আনন্দে মেতে ওঠেন।

মনসার ঘট আনাকে কেন্দ্র করে পূর্বে 'সাঁকি' নামে এক ধরনের মনসা মাহাত্ম কেন্দ্রিক গান গাওয়া হত। তাতে মনসার কথা থাকলেও বিগত এক বছরের বিভিন্ন ঘটনার কথাও এসে যেত এবং তা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে অনেকটা প্রতিযোগিতা মূলক ভঙ্গিতেই গাওয়া হত। বেশ কিছুদিন হল তা বন্ধ হয়ে গেছে। এই পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামে মনসামঙ্গলের গানও হত। এখন ৩/৪ দিন ধরে যাত্রা থিয়েটার ইত্যাদি অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে।

গোপডাঙ্গা ঃ— অজয় নদীর দক্ষিণে কাঁকসা থানার অন্তর্গত একটি ছোট্ট গ্রাম গোপডাঙ্গা। গ্রামটি মুখ্যত কৃষিপ্রধান গ্রাম। চাকুরিজীবী আছে তবে তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনার মতই সামান্য। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত। সেদিক থেকে গোপ প্রধান গ্রাম এবং গ্রামটি উঁচুডাঙ্গায় অবস্থিত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামের নাম হয়েছে গোপডাঙ্গা। গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবী যেমন— দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, চণ্ডী ইত্যাদির পূজা হলেও কার্তিক মাসে কালী পূজার ধূমই বেশি হয়।

গড়গড়িয়া ঃ— এই গ্রামটিও অজয় নদীর দক্ষিণে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম।

গ্রামটি কাঁকসা থানার অধীন কৃষি প্রধান গ্রাম। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই সামান্য। এ গ্রামটিও গোপ প্রধান গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ লোকই দুধ ছানা ইত্যাদি দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ব্যবসায়ে রত এবং চাষ আবাদে সংযুক্ত। গ্রামটিতে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাদি হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখ্য হল— দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি।

গোপালপুর ঃ— বর্তমানে দুর্গাপুর ১২ র অধীন একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। জি. টি. রোডের রাজবাঁধ স্টপেজে নেমে ২ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। একদা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে গ্রামের ব্যাপক অংশ পুড়ে যাওয়ায় গ্রামটি পোড়া-গোপালপুর নামেও পরিচিত। কাঁকসা থানাধীন গ্রামটি দূর্গাপুর শহরের সংস্পর্শে আসায় এখন তার আঙ্গিকের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, গ্রামটি ধীরে ধীরে শহরের রূপ পেতে চলেছে। তবুও বলা যায় গ্রামটি খুবই প্রাচীন। কারণ এর সর্বাঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন পুরাকীর্তি সমূহের বিশেষ লক্ষণ।

গ্রামে রয়েছেন প্রাচীন শিব ভুবনেশ্বর। গ্রাম ঢুকতেই এক বৃক্ষমূলে অবস্থিত আছেন প্রাচীন গ্রামদেবতা সন্ন্যাসী ঠাকুর। আরও রয়েছে মহাবীর তলায় মহাবীরের মূর্তি, সেখানে মহাবীবের হস্ত চিহ্নও বর্তমান। দত্ত পাড়ায় রয়েছেন কাঠে পোড়ান প্রাচীন পাতলা ইটের তৈরি টেরাকোটার কাজ সম্বলিত বিষ্ণুমন্দিরে রঘুনাথ। গ্রামে রয়েছে বড় কালীতলা, চ্যাটার্জী পাড়ায় রয়েছে গোপাল মন্দির— যা অনেকের মতে গ্রাম নামে ইঙ্গিত বাহী। ঐ পাড়ার বট বৃক্ষতলে রয়েছেন এক অদ্ভুত নামধারী প্রাচীন ধর্মরাজ 'বাকুন্ডা রায়।' সম্ভবত বাঁকুড় রায় থেকেই বাকুণ্ডা রায় নামটি এসেছে বলেই মনে হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমায় এর গাজন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়টিও বেশ প্রাচীন। গত ২০০১ খ্রিঃ এটি M. E. স্কুল হিসাবে ১১৫ বছর অতিক্রম ক'রে শতবর্ষ উদ্‌যাপন করল। এই বিদ্যালয়টিকেই প্রারম্ভিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই সম্ভবত ১৮৬২-৬৩ খ্রিঃ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই গ্রামে শুভ আবির্ভাব ঘটেছিল [১২]। সেদিক থেকে বিদ্যাসাগরের পদধূলিধন্য এই গ্রাম সত্যই ঐতিহ্যপূর্ণ।

এবার এই গ্রামে কিছু লোককৃষ্টির কথায় আসা যাক। এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে দু'টি অনুষ্ঠানেরর কথা অবশ্যই বলতে হয় তাদের একটি হল গাজন অন্যটি নবরাত্রি। প্রথমেই আসা যাক গাজনের কথায়। বৎসর শেষে চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামের উল্লেখ্য শিবভুবনেশ্বর এর গাজন অনুষ্ঠিত হয় বেশ ধুমধামে। শিবগাজনের অন্যান্য কৃত্যাদি নিয়েই এখানের গাজন শুরু হলেও এর এক বিশেষ স্বকীয়তা হল— মূল মন্দির থেকে প্রায় ৩ কি.মি. দূরে চাটুজ্যে সায়েরে স্নানের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রাসহ যাওয়া হয়। তাতে দু'টি গরুর গাড়ি একত্রিত করে তার উপর বাঁশ দিয়ে তাতে একজন ভক্ত হেঁট মুণ্ড উর্ধপদ হয়ে গাড়ির টানে দোদুল্যমান অবস্থায় চলতে থাকে। তার সামনে থাকা এক

মহিলা ভক্তার কাছ থেকে ফুল নিয়ে তার ঝুলন্ত মাথার সামনেই জ্বলন্ত অগ্নিতে তা নিক্ষেপ করতে করতে স্নানের জন্য এগিয়ে যায় এবং স্নানান্তে মন্দিরে ফিরে আসে। বঙ্গের শিবগাজন ও ধর্ম গাজনে বিভিন্ন রকম শারীরিক নির্যাতনমূলক কৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেলেও এ এক অভিনব কৃত্য, যা দেখার জন্য দূর দুরান্ত থেকে লোক সমাগম হয়।

এখন অপর অনুষ্ঠানটি হল নবরাত্রি উপলক্ষে গ্রামটি দুটি পাড়ায় বিভক্ত হয়ে অনেকটা আড়াআড়ি ভাবেই নয় দিন হরিনাম করে থাকে, তাকেই নবরাত্রি বলে। সেই অনুষ্ঠানের শেষেব দিন ধুলোটের সময় বেশ কয়েকটি গরুর গাড়িকে ঘেড়াবেড়া দিয়ে সাজিয়ে কিছু লোক রং বে রং পোযাকে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক পালাব অভিনয় করতে করতে এগিয়ে যায়। আবার অন্য কিছু গাড়িতে ভিনপাড়ায় বিগত বছরে ঘটে যাওয়া বহু অন্যায় কেচ্ছাকাহিনী, গাড়িগুলির গায়ে পোষ্টার ফেসটুনে প্রতিফলিত করা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে কুশিলবদের দ্বারা রসালাপ ও অভিনয়ে তা ব্যক্ত করা হয়। এতে গ্রামে ভিন পাড়া এবং গ্রামবাসীরা কোন রাগ রোষ করে না বরং সকলেই বিমল আনন্দ উপভোগ করে। পবে অন্যপাড়াও তাদের নবরাত্রি অনুষ্ঠানে এর জবাব দিয়ে থাকে।

গোপালপুরের নবরাত্রিব বুলেটের এই রঙ্গ-ব্যঙ্গের অনুষ্ঠানটি কলকাতার জেলে পাড়ার শিবের গাজনের সং। উত্তর বর্ধমান ও বীরভূম মুর্শিদাবাদের শিবগাজনের বোলানের সং, দক্ষিণ দামোদরের পৌষসংক্রান্তির ময়ূরপঙ্খীর গান, অতীতের কুরমুন পলাসীর খেস্যা গানের কথাই অনেকাংশেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরিশেষে ঐতিহ্যবাহী গোপালপুরের প্রাচীন অস্তিত্বের কথা কিছু বলি। বহু বহু বছর আগে সেই সুদুর অতীতেও এর অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। প্রমাণ হিসাবে বলা যায় দূর্গাপুর কেন্দ্রিক বীরভানপুরে যে সকল প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে-তদ্রুপ প্রস্তরায়ুধ নিকটবর্তী আড়া, সগরভাঙা, গোপালপুর এবং কাঁকসা জঙ্গলেও পাওয়া যায় [১৩]। সেগুলির কাল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার মাননীয় পরেশ দাস মহাশয় বলেছেন যে, —"এগুলি শেষ আদ্রযুগের সমাপ্তি এবং হলোসীন যুগের সূচনা পর্বে আনুমানিক ১,০০০ বছর আগে আয়ুধগুলি আদিম মানব কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল [১৪]। কিন্তু তখনকার দিনে এই গ্রামগুলির কি নাম ছিল তা আজ আর বলা সম্ভব নয়, তবে এদের অস্তিত্ব সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

গ্রামটি আকারে বেশ বড়ও বটে। বর্তমানে দুর্গাপুর শহর সংস্পর্শে এসে এর আকার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের পূর্ব দিকে ফাঁকা এলাকায় পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বসতি গড়ে উঠেছে এবং সেখানে তারা বাজারও তৈরি করেছে। প্রাচীন গ্রামেও সাবেক বাজার, বিদ্যালয়, টাউন লাইব্রেরী, বালিকা বিদ্যালয় ও বিভিন্ন দেব দেবীর মন্দিরাদি বর্তমান।

গৌরাংডি ঃ— কয়লা খনি অঞ্চলের অন্তর্গত বরাবনি থানার অধীন অজয় নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এক শহরমুখী বাণিজ্য কেন্দ্র গৌরাংডি। অন্ডাল-গৌরাংডি শাখা রেলে অন্ডাল থেকে এখানে যাওয়া যায়। কলিযুগবতার গৌরাঙ্গের নামের সঙ্গে ডিহি অর্থে গ্রাম শব্দ যোগে গ্রামনাম গৌরাংডি হবার সম্ভাবনাই বেশি। কয়লা খনি অঞ্চলের মুখ্যত কয়লা সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে এই স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(চ)

চানক ঃ— মঙ্গলকোট থানার ২৭ নং, জে. এল. ভুক্ত এক সমৃদ্ধশালী গ্রাম চানক। এই গ্রামের উত্তরে বয়ে চলেছে দুরন্ত নদী অজয় ও দক্ষিণে তারই উপনদী কুনুর বর্তমান। ফলে এই এলাকা বন্যা সঙ্কুল। গুসকরা-নতুন হাট বাস রাস্তা এই গ্রামের উপর দিয়ে প্রসারিত হওয়ায় এর যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ উন্নত।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায় একদা মঙ্গলকোট-উজানীর কোন সামন্ত রাজার ২য় রাজধানী ছিল এই গ্রামে। রাজারা মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নেবার জন্য এখানে আসতেন। তাই এখানেও ছিল বিশাল রাজপ্রাসাদ এবং রাজা-রাণীদের জন্য প্রমোদ উদ্যান ও জলকেলির জন্য প্রমোদ সরোবর। রাজা রাণীরা এখানে এসে সে মনোরম সরোবরে স্নানাদি ও জলকেলি করতেন সেই পুষ্করিণীর নাম ছিল অঙ্গশোভা যা বর্তমানে অপভ্রংশিত হতে হতে হয়েছে অংচোবা, তা থেকে আমচোবরা। আমচোবরা পুষ্করিণীর পাশেই ছিল ফুলের বাগান— যা এখনও ফুলবাগান নামে খ্যাত হয়। পরে তা পরিবর্তিত হতে হতে স্নান > চান > চানক হয়ে যায়। তা থেকেই গ্রাম নাম চানক হয়ে যায়।

এই গ্রাম সম্পর্কে কিছু কিংবদন্তি চালুও আছে। তার একটি হল এখানে নাকি রাতারাতি ভূতে একটি পুকুর কেটেছিল। যেটি গ্রামের উত্তরে জোঙ্গল যাবার মোরাম রাস্তার গায়ে এখনও বর্তমান। যার স্থানীয় নাম ভূতকোঁড়া। দ্বিতীয় একটি কিংবদন্তিতে রাজা পোঁতার ডাঙ্গার কথা শোনা যায়। এখানে হঠাৎ বর্গী আক্রমণ হলে রাজা ভীত হয়ে রাণীদের নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে মাটির নীচে গুপ্ত কক্ষে আশ্রয় নেয়। রাজা কর্মচারীদের তালা বন্ধ করতে বলে এবং বর্গীরা চলে গেলে তা খুলতে বলেন। কিন্তু বর্গীরা সেই চাবি খোলার জন্য কর্মীদের অত্যাচার করলে তারা নিরুপায় হয়ে তা পুকুরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু বর্গীরা চলে গেলেও কর্মীরা আর সেই চাবি খুঁজে না পাওয়ায় মাটির নীচেই রাজারা প্রথিত হওয়ার মতই বন্ধ হয়েই মারা যায়। তাই গ্রামের একস্থান রাজাপোতার ডাঙ্গা নামে খ্যাত এবং সেখানে এখনও পাকা সুড়ঙ্গ বর্তমান আছে।

গ্রামটি শিক্ষায় দীক্ষায় বেশ উন্নত। গ্রামে চাকুরিজীবীর সংখ্যাও অনেক। এই গ্রামেই ১৮৫৯ খ্রিঃ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, কলকাতা হিন্দু স্কুলের

প্রধান শিক্ষক রায় বাহাদুর রসময় মিত্র। গ্রামটি মুখ্যত কৃষি প্রধান গ্রাম। এখানের প্রধান ফসল ধান, আলু ও রবিশস্য। প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপাদন ক্ষেত্র হওয়ায় এখানে আলু সংরক্ষণের জন্যই একটি কোল্ডস্টোরও নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে গ্রামটি এক প্রসিদ্ধ ব্যবসাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পূর্বে এখানে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রহিসাবে চতুষ্পাঠী এবং তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রও ছিল।

এই চানক গ্রামটি পশ্চিম মঙ্গলকোটের অধীন বর্তমানে আজমৎশাহী পরগণা ভুক্ত হলেও পূর্বে যে এটি গোপভূমের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাতে সন্দেহ নাই। কারণ এই গ্রামের আশে পাশের গ্রামগুলি গো এবং গোপ সংক্রান্ত নামের ধারক ও বাহক। যেমন— গোপালবেড়া (অর্থাৎ গো পালকরা তাদের গোধন নিয়ে বেষ্টনী রচনা করে থাকতো)। গোধিষ্ঠা (গোধনের অধিষ্ঠান), গোপালনগর (গোপালকদের নগর), গোপালপুর (গোপালকদের নির্মিত পুর বা বাসক্ষেত্র) যাদববাটী (যদু > যাদবদের বাটী), কোটাল ঘোষ (ঘোষ ও কোটালদের অবস্থান) ইত্যাদি।

চান্না ঃ— তন্ত্রসাধনার সিদ্ধক্ষেত্র চান্না গ্রামটি গলসী থানার খানা জংশন থেকে প্রায় ৫ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত। বিসর্পিল গতিতে প্রবাহমান খড়ি নদী গ্রামের উত্তর প্রান্তে বহমান। এর জে. এল. নং-১৪৬। সিউড়ি রোডের হলদি গ্রামে নেমে প্রায় ৩ কি. মি. পশ্চিমে গেলেই এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি খুবই প্রত্যন্ত পল্লী গ্রাম এবং একদা খুবই দুর্গম ছিল বলেই ঠাঙাড়েদের উৎপাত ছিল। তাই প্রচলিত লোক প্রবাদে শোনা যায়— "যদি যাবি চান্না, ঘরে উঠবে কান্না"।

এখানকার প্রকৃতির শ্যামল আঁচলের মোহময় আবেষ্টনে আবাল্য পালিত হয়েছিলেন শ্যামামায়ের এক দামাল ছেলে সাধক কমলাকান্ত: খুব অল্প বয়সে পিতৃহারা অনাথ কমলাকান্ত চান্না নিবাসী মাতুল নারায়ণ ভট্টাচার্যের আশ্রয়ে পালিত হতে থাকেন। ফলে শিশুকাল হতেই গ্রামে ঈশান কোনে তান্ত্রিক সাধন ক্ষেত্র বিশালাক্ষী মায়ের আটনে তার সাধনার শুরু ও সিদ্ধি। বিশালাক্ষী মায়ের মন্দিরে আসল মূর্তি কবে চুরি হয়ে গেছে তার নাই ঠিক তবে সেখানে এখন রয়েছে টোপর পরা হাঁমুখো ডিম্বাকৃতি পাঁচটি মুণ্ড। এদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নাম আছে। যেমন— এণাক্ষী, দ্বিরাক্ষা, বিশালাক্ষী, রক্তাক্ষী ও সুলোচনা।

প্রথম দিকে এখানের পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধক কবি কমলাকান্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই চান্নাগ্রাম কমলাকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। (এ সম্পর্কে জানতে হলে লেখকের বঙ্গের শাক্ত পীঠ ও সাধনক্ষেত্র গ্রন্থের ১০৬-১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর নিত্যপূজা হলেও প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে দেবীর বাৎসরির উৎসব পালিত হয়। তখন গ্রামের লোকেরা আত্মীয় পরিজনদের আমন্ত্রণ জানান ও বিশেষ ধুমধামে ছাগ, মেষ, শূকর ইত্যাদি বলিসহ পূজা

প্রদান করেন। শোনা যায় গ্রামের বয়স্করা বৌমাদের সুবিধার জন্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামে বসে মেয়েরা যাতে সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য এখানে একটি মেলাও বসায়, ফলে সেই মেলা বৌয়েদের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হওয়ায় তা 'বৌরী' মেলা নামে নামিত হয়। এখনও সে মেলা চলে আসছে।

গ্রামটিতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। অনেক আদিবাসীও আছে। গ্রামের মধ্যে অনেক দেবদেবীর মন্দির ও দেবদেবতার পূজাদিও যথা সময় হয়ে থাকে। গ্রামে সাধকের আবাসস্থল কমলাকাণ্তের মাতুলালয়ে ১৯৭০ খ্রিঃ বর্ধমান জেলা সংস্কৃতি পরিষদ কমলা কান্তের উদ্দেশ্যে এক স্মৃতি স্তম্ভ তৈরি করে দিয়েছেন। প্রতিবছর ১লা চৈত্র সেখানে স্মৃতিচারণ উৎসব পালিত হয়।

গ্রামে আর একটি আকর্ষণীয় স্থান হল— গ্রামের উত্তরে খড়ি নদীর কোলে স্বামী নিরালম্বের 'আশ্রম চান্না'। এই গ্রামেই ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ৫ই অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি পরবর্তী কালে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিযুগের বিপ্লবাদের অন্যতম অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি 'অগ্নিযুগের ব্রহ্মা' নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। অগ্নিযুগের তৎকালীন পুরোধা শ্রী অরবিন্দ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিল তার নিবিড় মেলামেশা [১৫]। তাই আলিপুর বোমা মামলায় তাকে জড়ান হলেও প্রমাণ অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই তিনিই উত্তরকালে নিরলম্বস্বামী নামে খ্যাত হয়ে নিজ গ্রাম চান্নায় আশ্রম স্থাপনে সাধনভজনে মগ্ন হয়েছিলেন।

এইগ্রামে তন্ত্র সাধনায় একটি ধারা এখনও বর্তমান রয়েছে তাই ইদানিংকালে গ্রামের এক পুকুর পাড়ে তৈরি হয়েছে এক মহাকালী আশ্রম। স্থানীয় কুলচণ্ডা গ্রামের একসাধক সন্তান জীবনে বহুবার মৌন ব্রত পালন করলেও দীর্ঘ ১২ বছর মৌন অবস্থায় এই আশ্রমে সাধনায় রত ছিলেন। তিনি বর্তমানে এই আশ্রম পরিচালনায় ব্রতী। শিব জ্ঞানে জীব সেবাই তার মহান ব্রত। একনিষ্ঠ মাতৃসাধক কালীপ্রণব ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বহুভক্তজনকে নিজহাতে রাঁধা-বাড়া করে খাইয়ে পরমতৃপ্তি লাভ করেন। অতিতি বৎসল সাধক তাই সকলের কাছে খুবই আপনজন।

চাঁকতেঁতুল ঃ— বুদবুদ থানার অধীন এক উন্নত গ্রাম। জি. টি. রোডের পানাগড় রেল স্টেশন থেকে বাসযোগে দামোদরের উত্তরের এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি কৃষিনির্ভর হলেও দামোদর ক্যানেলেন দু'বার সেচের জল পাওয়ায় গ্রামের আর্থিক পরিকাঠামো সুদৃঢ় হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরিতেও অনেকেই নিযুক্ত আছেন। গ্রামে ছোটখাট বাজার রয়েছে তাছাড়া সপ্তাহে ২ দিন সোম ও শুক্রবারে হাটও বসে। গ্রামে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্ম, কায়স্থ, গোপ, সদ্গোপ, বৈরাগ্য ও বহু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বাস।

এই গ্রামে উৎসবাদির মধ্যে বৈশাখে রক্ষাকালী। শ্রাবণে মনসা, আশ্বিনে দুর্গা, লক্ষ্মী, কার্তিকে কালী, অগ্রহায়ণে অন্নপূর্ণা ও জগদ্ধাত্রী, মাঘে সরস্বতী এবং বছরের শেষ মাসে বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা এবং চৈত্রে গাজন গ্রামের উল্লেখ্য। শিব, রামেশ্বরের বার্ষিক গাজন খুবই ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। রামেশ্বরের শিব মন্দির ও আটচালা বেশ দর্শনীয়ও বটে।

চিচুরিয়া ঃ— জাম্বুরিয়া থানার অন্তর্গত এই গ্রামটি জামুরিয়া থেকে ৮ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত। এর জে.এল. নং-৬৯। এই গ্রামে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ, শুঁড়ি, জেলে ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বহু লোক বাস করে। গ্রামে পুরাকীর্তির তেমন দৃষ্টিগোচর অবস্থান না থাকলেও দেবকীর্তির বেশ প্রাবল্য আছে। বার মাসে তের পার্বণের মতই এই গ্রামে বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা সাড়ম্বরে হয়ে থাকে। গ্রামে এক বিশেষ নামের দেবী পূজা চালু আছে। সেই দেবী হলেন 'দিগম্বরী' দেবী, যার পূজা অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় মাসে। তেমনি বিশেষ এক সময় বসন্তকালের ফাল্গুন মাসে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় কালী পূজা।

এবার গ্রামে সবথেকে উল্লেখ্য উৎসবের কথায় আসি। সেই উৎসবটি হল দুইধর্মরাজ কালা রায় ও বুড়ো রায়ের গাজন। এমনি দালান মন্দিরে ধর্মরাজের শিলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানকার ধর্মরাজের বিশেষত্ব হল— এটি এখনও ব্রাহ্মণদের দ্বারা অধিগৃহীত হয়নি। কারণ এর দেয়াশীরা হলেন গ্রামের ধীবর সম্প্রদায় আর পণ্ডিত উপাধি ধারী শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি রাই হলেন এর পূজক। বৈশাখী পূর্ণিমায় চার দিন ধরে বিশেষ জাঁক জমক ও বিভিন্ন কৃত্যাদির মাধ্যমে ধর্মরাজের পূজা বা গাজন সম্পন্ন হয়। গাজনে বানেশ্বরকে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। বিভিন্ন কৃত্যাদির মধ্যে আগুন ঝাঁপ, কাটাখেলা, ফুলখেলা, পাতাভরা ছাড়াও এখানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে ছড়ার চাপান উতোর হয়ে থাকে— যা সচরাচর ধর্মরাজের গাজনে অন্যত্র দেখা যায় না। এখানকার ধর্মরাজ বেশ জাগ্রত। তার কৃপায় অনেকের দুরারোগ্য ব্যধিও ভাল হয়ে যায়। তাই রোগ নিরাময়ের আশায় অনেকেই মানত করে পুকুর থেকে দণ্ডি কেটে মন্দিরে আসে।

গ্রামের এক নিম্ববৃক্ষতলে ধীবর সম্প্রদায় বলিদানসহ বুড়োরায়ের বিশেষ পূজা করে থাকেন। গ্রামে মনসা পূজাও হয়ে থাকে। তা অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ধর্মরাজ মন্দিরের নিকট এক তেঁতুলতলায়।

চুরুলিয়া ঃ— জামুরিয়া থানার ৬নং জে. এল. ভুক্ত পশ্চিম বর্ধমানের এক পাথুরে এলাকায় চুরুলিয়া গ্রামের অবস্থান। আসানসোল থেকে বাস যোগে এখানে যাওয়া যায়। গ্রামটি অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। গ্রামটির প্রাচীন পরিচয় হিসাবে বলা যায়। এটি একদা শেরগর পরগনার অধীন হিন্দু রাজা নরোত্তমের রাজত্ব ছিল। এই

নরোত্তম ছিলেন ওল্ড হামের মতে পঞ্চকোটের রাজ বংশীয় কোন রাজা। এখানে নরোত্তমের গড় ছিল। মুসলমান আধিপত্যের কালে সেই রাজাকে পরাজিত করে তার দুর্গ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এবং সেখানেই আয়মাদারগণ ঘরবাড়ি ও মসজিদবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। এখনও এক উঁচু ঢিবিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের মাঝেই সেই দুর্গের অবস্থান লক্ষ করা যায়।

বর্তমানকালে চুরুলিয়ার বিশেষ প্রসিদ্ধি হল এখানকার ব্যাঙাচি কবি দুঃখু মিয়া— যিনি পরবর্তীকালে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল হিসাবে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন— তাঁর জন্মস্থান হিসাবে। বর্তমানে এই গ্রাম যত্রতত্র কবির স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তৈরি হয়েছে নজরুল একাডেমি, নজরুল সংগ্রহশালা, নজরুল মহাবিদ্যালয়, কবির নামে বিরাট পাঠাগার, নজরুল মঞ্চ ইত্যাদি বহু উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান। এখানের এক নির্জন শান্ত প্রকৃতির কোলে ফুলবাগিচার মনোরম সৌন্দর্যের মাঝে সমাহিত আছেন কবিপত্নী প্রমিলা দেবী। কবির জন্মদিন উপলক্ষে এখন এখানে প্রতিবছর ১১ই জ্যৈষ্ঠকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক দিন ধরে চলে নজরুল জন্মোৎসব ও নজরুল স্মরণ মেলা।

গ্রামের লোক অধিকাংশ কৃষিজীবী হলেও অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য চাকুরি করে থাকেন। আর অবশিষ্ট কিছুলোক আছেন যারা এই পাথুরে এলাকার খাদান থেকে পাথর তুলে এনে, শিল্পীর মানসিকতায় ছেনি হাতুড়ির সাহায্যে সেই পাথরকে কুঁদে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় ও সৌখিন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

চিচুরিয়া ঃ— বারাবনি, পাঁচগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ৩৬ নং জে. এল ভুক্ত এক ছোট্ট গ্রাম চিঁচুরিয়া। এই গ্রামটি স্থানীয় শহর বারাবনি থেকে মাত্র ২ কি.মি. দূরে অবস্থিত। গ্রামটিতে সর্বসাকুল্যে ১২০ ঘর লোকের বাস। তবুও অন্যান্য গ্রামের থেকে এর স্বকীয়তা বর্তনাম। নীচে সে কথাই বলা হল।

কয়লাখনি এলাকায় অবস্থিত এই গ্রাম। একদা খনিতে কয়লা তুলতে আসা ভিন প্রদেশী শ্রমিকরাই সমবেত হয়েছিল এই গ্রামে। তাই গ্রামবাসীরা কেউ বর্ণবাল, মাজি, মিশ্র, পাশোয়ান ইত্যাদি পদবীর অধিকারী।

একদা এই গ্রামের উপর দিয়ে মিটার গেজ রেল লাইন অন্ডাল হয়ে দেওঘর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তার জন্যই এখানে গড়ে উঠেছিল এক রেল স্টেশন। পার্শ্ববর্তী মনোহর-বহাল, কালিডাঙ্গা, নুনি ইত্যাদি গ্রামের লোকেরা এই চিচুড়িয়া স্টেশনে উঠে কেউ মাইথন, পানিফলা, মুক্তাইচণ্ডী, কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে যাতায়াত করত। এই খনি এলাকায় অবস্থিত ভিনপ্রদেশের কয়লা শ্রমিকরা এখান থেকেই দেওঘর, মধুপুর, জসিডি ইত্যাদি স্থানে আপন আপন দেশের বাড়িতে যাতায়াত করত।

কিন্তু সে সবই এখন গল্প কথায় পর্যবসিত হয়ে ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। কারণ সেই রেলপথ বহুদিন হল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৃদ্ধ বটবৃক্ষের ছাওয়ায় ঘেরা তাদের

শতাব্দী প্রাচীন রেলস্টেশন, তাদের অন্তরকে কেবলই মথিত করছে। রেল না চললেও গ্রামবাসীর স্বপ্ন এই স্টেশনকে ঘিরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের ইচ্ছা স্টেশনের ঘরগুলিকে সংস্কার করে সেখানে তৈরি করা হোক একটি পর্যটন আবাসন। যাকে কেন্দ্র করে নিকটবর্তী মাইথন, কল্যাণেশ্বরী, পানিফলা, মুক্তাইচণ্ডী পরিদর্শনে আসা পর্যটকরা এখানে অবস্থান করতে পারবেন। সেটি হলে তাদের প্রিয় স্টেশনটি কেন্দ্র করে তারা অনেকেই আবার রুজি রোজগারের সুযোগ পাবেন।

এখন খনি এলাকায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমের বিনিময়ে তাদের রুটি, রুজির ব্যবস্থা চললেও তারা বাড়তি একটা সুযোগ পাবে। এই আশায় তারা পঞ্চায়েতেকে আবেদন জানিয়েছে যাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেল হীন রেল স্টেশনটিকে পর্যটন শিল্পের কেন্দ্র স্থল করা যায়। এখানে চাষ আবাদের তেমন সুযোগ নাই বললেই চলে। গ্রামের বাচ্ছাদের পড়াশুনার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা আছে (১৬)।

চিত্তরঞ্জন ঃ— একদা বিশাল বিস্তৃত গোপভূমের পশ্চিম প্রান্তে আসা আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত এটি একটি বিশেষ শিল্পকেন্দ্র। কারণ এখানেই নির্মিত হয়েছে এই দেশের প্রধান রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা। উঁচু নীচু পাথুরে এলাকায় ১১ বর্গ কিলোমিটার পরিসরে মিহিজাম, সুন্দরপাহাড়ী প্রভৃতি গ্রামকে কেন্দ্র করে দেশের এক মহান পুরুষ চিত্তরঞ্জন দাসের নামে এই কারখানা নামিত হয়েছে। ১৯৫০ খ্রিঃ ২৬শে জানুয়ারি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তী দেবী এর উদ্বোধন সূচনা করেন। রেল ইঞ্জিন কারখানাই এখানকার মুখ্য কারখানা হলেও তাকে ঘিরে আশে পাশে আরও কিছু কলকারখানা গড়ে ওঠায় এটিও এক বিশেষ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। কলকাতা থেকে এই শিল্প নগরী দূরত্ব ২২৫ কি.মি.। ট্রেনে সরাসরি এখানে আসা যায়।

(ছ)

ছোড়া ঃ— আউশ গ্রাম থানার ১ নং ব্লকের ওসকরা ইলাম বাজার রাস্তার মোর বাঁধ বাস স্টপেজের পশ্চিমে ১১ মাইল যাবার রাস্তার দুধারে বসতি যুক্ত গ্রামই ছোড়া। এটি ধনকড়া গ্রামের উত্তরে অবস্থিত। বর্তমানে গ্রামের মাঝ দিয়ে পাকা রাস্তা প্রসারিত হওয়ায় রাস্তাকে ঘিরে বহু ব্যবসাক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। সাবেক বসতি ছাড়াও এখানে এখন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদেরই সংখ্যা বেশি।

গ্রামের কিছুটা উত্তরে শ্যাওড়া ইত্যাদি কয়েকটি বৃক্ষচ্ছাদিত ছায়াছন্ন পরিবেশে গ্রাম্যদেবী নীলাই চণ্ডীর অবস্থান। এখানে এক পুরাতন বৃক্ষ মূলে পূর্বদিকে একটি বড় শিলের মত প্রস্তর খণ্ড— তার পশ্চিমে একটি প্রায় ১$^{১}/_{২}$ ফুট আকৃতির প্রস্তর মূর্তি যার নীচের দিকে রয়েছে পদ্ম ও পদ্মের উপরেই উপবিষ্ট চতুর্ভুজ পুরুষ মূর্তি যা

বুকেব উপব দুটি হাত দিযে কিছু যেন চেপে ধরার ভঙ্গিতে বর্তমান। মাথায় মুকুট, মূর্তিটি বেশ সুন্দর তবে খুবই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। এর পশ্চিমেই একটি ছোট ৬" মত আকারের পাথরের মূর্তি, এটি পুরুষ মূর্তি বলেই মনে হয় এবং গণেশের মত স্ফীতোদর।

এই তিন মূর্তির মধ্যে কোনটি যে নীলাই চণ্ডী তা বোঝার উপায় নাই। মূর্তিগুলি তেল সিন্দুকে এমন লেপা আছে যে স্পষ্ট করে কোনটাকেই বোঝা যায় না। দেবীর এখানে নিত্য পূজা হয় না, তবে স্থানীয় বাসিন্দারা নিত্য ফুল-জল দিয়ে থাকেন। বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। লোকশ্রুতি, প্রকৃতি দেবী কোন ঘরবাড়ির আশ্রয় পছন্দ করেন না, তাই দেবীর কোন মন্দির নাই। এমনকি দেবী তলার কাছাকাছি কোন পাকা বাড়িও দেবীর ইপ্সিত নয়, কারণ এখানে একটি পাকা দুর্গামন্দির করতে চাওয়া হয়েছিল কিন্তু তাতে বাধাপড়ায় ভিত গাঁথা অবস্থাতেই পড়ে আছে।

দেবী নীলাই চণ্ডী নামে কেন খ্যাত তার হদিস মেলে না। আর আমাদের দেশে নীল দেবতা বলতে শিবকেই বোঝায়। যেমন নীলের গাজন, নীলের পূজা, নীলের বাতি ইত্যাদি। তাই ইনি নীল জায়া থেকে নীলাই চণ্ডী হয়ে থাকবেন।

ছোট রামচন্দ্রপুর ঃ— কাঁকসা থানার অন্তর্গত জঙ্গল ঘেরা এক ছোট গ্রাম এই ছোট রামচন্দ্রপুর। পানাগড়-ইলামবাজার রাস্তা ধরে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি অযোধ্যা বনকাঠীর সন্নিকটে অবস্থিত। গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। হিন্দুদের মধ্যে কিছু ব্রাহ্মণ, সদগোপ সহ বহু তপশিলি সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে।

গ্রামের লোকেরা প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম। গ্রামে দিদি ঠাকুরুনের ও রাধাবল্লভের মন্দির আছে। গ্রামে পঞ্চানন, মনসা ও শীতলা দেবীও বর্তমান। গ্রামে অন্যান্য দেব দেবতা থাকলেও সব থেকে দুরত্বের সঙ্গে প্রতিবছর বৈশাখ মাসে দিদি ঠাকুরণের পূজা হয় এবং তার আট দিনের মাথায় ঐ দেবীর অষ্টমঙ্গলা নামে এক বিশেষ উৎসব গ্রামে পালিত হয়। গ্রাম্যদেবী দিদিঠাকুরুনের বিশেষ পূজাকে কেন্দ্র করে তখন গ্রামে একটি মেলাও বসে এবং সেই মেলা অষ্ট-মঙ্গলা পার করে ভাঙ্গে।

ছোড়ড়া ঃ— অন্ডাল থানার অধীন এক প্রাচীন গ্রাম ছোড়ড়া। জে. এল নং ২৯। রাণীগঞ্জ-সিউড়ি বাসে সরাসরি এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি বড়, এর পুরাকীর্তির মধ্যে উল্লেখ্য হল ধর্মরাজের এক পাকা মন্দির। তাছাড়া গ্রামে অনেকগুলি দেবদেবীর পূজাও হয়—তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল বেশ কয়েকটি শিব, দু'টি বিষ্ণু, দু'টি চন্ডী, একটি মনসা, ছ'টি কালী ও তিনটি ধর্মরাজ। ধর্মরাজের হলেন যথাক্রমে বাঁকুড়া রায়,

ধর্মরায় ও তারা রায়, পূর্বে ধর্মরাজগুলি অন্ত্যজ সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হত, ডোম সম্প্রদায়ই ছিল এদের পূজক কিন্তু বর্তমানে তা ব্রাহ্মণদের দ্বারাই পূজিত হচ্ছেন।

বৈশাখী পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে তার কয়েকদিন আগে থেকেই ধর্মরাজের গাজন শুরু হয়ে যায়। বেশ ধুমধামেই গ্রাম্যদেবতা ধর্মরাজের নানান কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমেই পূজা হয়। পূজায় বেশ কিছু ছাগ বলিও হয়। ধর্মরাজের তরফ থেকে বন্ধ্যাত্ব নাশ ও পেটের রোগের নিরাময়ের জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। ধর্মরাজের গাজনকে কেন্দ্র করে এখানে কয়েকদিনের জন্য একটি মেলাও বসে।

ছোট দিঘরি ঃ— হীরাপুর থানার ১১নং জে. এল. ভুক্ত গ্রাম ছোট দিঘরি। আসানসোলে বাসে চেপে পশ্চিমে ছোট দিঘরি গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে কিছু পুরা কীর্তি এবং দেব কীর্তি লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল গ্রামে মহান্ত পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত মন্দির, যার অভ্যন্তরে মহান্তদের কুলদেবতা রঘুনাথ শালগ্রাম শিলা বর্তমান। মন্দিরটি কারুকার্যময়— এর প্রতিষ্ঠাতা পুরুষেরা হলেন সীতারাম চোবে মহান্ত ও রাঘব চোবে মহান্ত। গ্রামে মুখার্জী পরিবার কর্তৃক ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে একটি শিব মন্দিরসহ কালী মন্দিরও নির্মিত হয়েছে। এর নির্মাতারা ছিলেন তারা শংকর মুখোপাধ্যায় ও মিনতি মুখোপাধ্যায়।

(জ)

জোঙ্গল ঃ— অজয় নদীর সামান্য দক্ষিণে, পশ্চিমে মঙ্গলকোট থানার আওতায় পালি গ্রামের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম জোঙ্গল অবস্থিত। পূর্বে এখানে ঝোপঝাড় জঙ্গল ইত্যাদি ছিল এবং তা পরিষ্কার করেই এই গ্রামের পত্তন হয় তাই গ্রামের নাম জঙ্গল > জোঙ্গল হয়েছে বলেই অনেকের মনে হয়। গ্রামটি খুব প্রাচীনও নয়। কৃষি প্রধান গ্রাম। এখানে ধান, আলু ও রবি ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। তাই বন্যার ভয় উপেক্ষা করেও এখানকার লোক মাটি কামড়ে পড়ে আছে চাষকে কেন্দ্র করেই । চানক থেকে উত্তর বরাবর মোরাম রাস্তা ধরে এই গ্রামে যাওয়া যায়।

জামদহ ঃ— কাঁকসা থানার অধীন ঠাকুরাণী বাজারের ১৪ নং জে. এল. ভুক্ত এক প্রত্যন্ত গ্রাম জামদহ। দুর্গাপুর-শিবপুর বাসে অজয় তীরে শিবপুরে নেমে অজয়ের দক্ষিণ বাঁধ বরাবর কিছুটা এগিয়ে গেলেই এই গ্রামে যাওয়া যায়।

প্রাচীন কালে কোন এক সময় নিকটস্থ অজয় নদীর বন্যার প্রভাবে এখানে এক দহ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার চারিদিকে প্রচুর জামগাছের জঙ্গল গড়ে ওঠায় গ্রামের নাম 'জামদহ' হয়েছে। এখন সেখানে দু'দশটি জামগাছ দেখা যায় না তা নয় তবে জাম গাছের সেই জঙ্গল আর নাই।

গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই সদগোপ সম্প্রদায়ের তবে নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য ডোম ও বাউরি আছে। কৃষি প্রধান গ্রাম। চাষ আবাদই এখানকার লোকেদের প্রধান জীবিকা। চাকুরির সংখ্যা খুবই কম। গ্রামে দেব আরাধনার মধ্যে অন্নপূর্ণার পূজা ও রঘুনাথ শিবের পূজা হয়। গ্রামটি অজয় নদীর একেবারে দক্ষিণেই অবস্থিত তাই মাঝে মধ্যেই বন্যার প্রকোপ দেখা যায়। গত ১৩৮৫ সালের বন্যায় গ্রামটির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও বর্তমান।

জিজিরা ঃ— গোপভূম পরগনার বুদবুদ থানার অধীন জঙ্গলমহলের মধ্যে অবস্থিত এক ছোট গ্রাম জিজিরা। গ্রামটি জিঞ্জিরা নামেই রেকর্ড—যার অর্থ শিকল। উচ্চারণ বিকৃতির জন্য এটি জিঞ্জিরা > জিজিরায় পরিণত হয়েছে। মানকর থেকে ভাতকুণ্ডা হযে পশ্চিমে এই গ্রামে যাওয়া যায়। পুরাকীর্তি বলতে গ্রামে তেমন কিছু নাই কেবল একটি পুরাতন শিব মন্দির ছাড়া।

গ্রামে মুখার্জী পরিবার কর্তৃক কষ্টি পাথরের মদনমোহন ও পিতলের রাধারাণী ও ললিতাসখী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেবা পূজার জন্য। বর্তমানে শরিকি বিভাগে তা এই গ্রামে চার মাস থাকার পর করটি যায় চার মাস ও বোলপুরের নিকট শিউলীতে চার মাস অবস্থান করেন। জঙ্গল বেষ্টিত ছোট গ্রাম হলেও গ্রামে রয়েছে একটি উচ্চবিদ্যালয়।

জুজুটি ঃ— গলসী থানার অধীন ১৫৮ নং জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম জুজুটি। বর্ধমান থেকে বেলকাশ যাওয়ার বাসে বেলকাসে নেমে কিছুটা হাঁটলে এই গ্রামে যাওয়া যায়। অন্যদিকে বর্ধমান থেকে দামোদরের বাঁধ ধরেও এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি দামোদরের উত্তর বাঁধের একেবারে গায়েই অবস্থিত।

এটি প্রাচীন গ্রাম। তবে তদানীন্তন বঙ্গের দুঃখ নামে অভিহিত দামোদরের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় গ্রামটি অতীতে বহুবার বিধ্বস্ত হয়েছে। তাই গ্রামটিকে বন্যার হাত থেকে সুরক্ষিত করার জন্য এখানে জোড়া বাঁধের ব্যবস্থা আছে। এখানেই রাজ্য সেচবিভাগের অফিস ও বাংলো রয়েছে। পূর্বে এই বাংলোকে কেন্দ্র করে এই বাঁধের গায়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য শাল শিশু সেগুন, মেহগিনি ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষের বাগান ছিল কিন্তু বর্তমানে তা অবলুপ্ত হতে বসেছে।

গ্রামে মুসলমান নাই। হিন্দুদের মধ্যে সামান্য কয়েকঘর ব্রাহ্মণ ছাড়া অধিকাংশই সদ্‌গোপ। ইদানিং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু উদ্বাস্তু পরিবার এখানে আশ্রয় নিয়েছে। তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু বাগদিও আছে।

এই গ্রামে প্রাচীন দেবদেবীর মধ্যে উল্লেখ্য এক শিব মন্দির বর্তমান। শিব এখানে নিত্যসেবিত হলেও শিবরাত্রিতে বিশেষ ধুমধামে পূজা হয়। অন্যান্য দেবদেবীর পূজা গ্রামে যথা সময়ে সম্পাদিত হলেও পৌষ সংক্রান্তির সময় দামোদর নদীতে মকর

স্নানকে ঘিরে এখানে বিশেষ উৎসব সংঘটিত হয়। নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু পুন্যার্থীর তখন সমাগম হয়ে থাকে। তখন গ্রামের গ্রাম্য দেবী দন্ডেশ্বরীর পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। দন্তেশ্বরী আসলে গঙ্গাদেবী। এই দুই উৎসবকে কেন্দ্র করেই গ্রামে তখন মেলা বসে যায় সেই সময় মেলায় নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসাবে যাত্রাগান, লোক সঙ্গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বৈশাখী পূর্ণিমায় বহু ভক্ত সমন্বয়ে বিভিন্ন কৃত্যাদি সহ ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি প্রধান এই গ্রামে চাষ আবাদই মানুষের প্রধান জীবিকা। এখানে দু'বার ধানচাষ সেই সঙ্গে গম আলু ও প্রচুর রবি শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই নগন্য।

জামগড়া ঃ— ফরিদপুর থানা ২৩ নং জে. এলের অধীন বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় গড়ে ওঠা এক গ্রাম জামগড়া। উখরার নিকটেই এর অবস্থান। গ্রামের সব থেকে আকর্ষণীয় দেবতা হলেন বংশীধরচন্দ্র। এক সুন্দর মন্দির অভ্যন্তরে কষ্টি পাথরে তৈরি অনিন্দ্য সুন্দর দেববিগ্রহ এই বংশীধরচন্দ্র। এই মন্দিরে সহ অবস্থানে অন্যান্য দেব-দেবীও রয়েছেন। গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গোস্বামী পরিবার কর্তৃক এই মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গ্রামে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। চাষ আবাদ হলেও কয়লা খনি অঞ্চলে এর অবস্থান হওয়ায় অনেকেই চাকুরিরত আছেন। গ্রাম্য দেবতা বংশীধরচন্দ্র নিত্যসেবিত ও পূজিত হলেও বৎসরে বিশেষ কয়েকটি বৈষ্ণবীয় উৎসব মহাসমারোহে গ্রামে পালিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখ্য দোলপূর্ণিমায় দোল উৎসব এবং জন্মাষ্টমী। বিশেষ রীতিতে ভক্তি নিবেদনের পর উৎসব শুরু হয়। দোল পূর্ণিমার একদিনের উৎসব বেশ জাঁকজমক সহকারে হয়ে থাকে আর জন্মাষ্টমী উৎসব চলে দু'দিন ধরে। তখন হরিনাম সংকীর্তন ও মহোৎসব চলতে থাকে।

জামুরিয়া ও জামুরিয়া গ্রাম ঃ— জামুরিয়া থানার সদর কার্যালয় হল জামুরিয়া। এর জে. এল ২১ নং, আসানসোল থেকে সরাসরি বাস যোগে এখানে যাওয়া যায়। এটি আসলে খনি এলাকা, এর গভীরে রয়েছে কালোহিরের বিস্তৃত ভান্ডার। তাই এখানে আজ ভিন রাজ্যের বহু লোকের আনা গোনা। ফলে এটি এখন গ্রাম্য পরিবেশ ত্যাগ করে শহরের চাকচিক্য পেতে চলেছে। এখানে প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলকন্ঠেশ্বর শিবের গাজন ও চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। এক প্রাচীন শিব মন্দিরে নীলকন্ঠেশ্বর শিব অবস্থিত আছেন।

থানার সদর কার্যালয় থেকে সামান্য দূরে জামুরিয়া গ্রাম, এখানে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় প্রতি বছর ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মাঝে এক দালান মন্দিরে ধর্মরাজের শিলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখনও এই ধর্মরাজের পূজক হলেন ধীবর সম্প্রদায়।

ধর্মরাজই এখানকার গ্রাম্য দেবতা এবং তার গাজনই হল গ্রাম্য উৎসব। গাজনের সময় এখানে কযেকদিনের জন্য একটি মেলাও বসে।

(ঝ)

ঝিলু ঃ— মঙ্গলকোট থানার বন্যা বিধ্বস্ত বহুগ্রামের এটিও একটি গ্রাম। এর জে. এল নং-৬২। এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। গ্রাম তেমন বড় নয়। এখানে ব্রাহ্মণ, গোপ, সদগোপ উগ্রক্ষত্রিয়, ধোপা ও বহু নিম্নসম্প্রদায়ের বাস। গ্রাম্য দেবতা ধর্মরাজের গাজন মহাধুমধামে পালিত হয়। গাজন ভক্তের সংখ্যা একশর বেশি হয়ে থাকে। গ্রামের লোক এই উৎসবে আত্মীয়-পরিজনদের আমন্ত্রণ জানায়। এই সময় গ্রামে কয়েকদিনের জন্য একটি মেলাও বসে। এখানকার ধর্মরাজের প্রতি মানুষের বিশেষ ভক্তি লক্ষ করা যায়। বহু ছাগ বলিসহ এর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পেটের রোগ, বাধক, শ্বেতি, রাতকানা ইত্যাদি রোগ উপশমের জন্য এখান থেকে ওষুধ দেওয়া হয়।

ঝাঝরা ঃ— উদ্মরা থেকে বাস যোগে ৫ কি.মি. পথ পার হলেই ঝাঝরায় যাওয়া যায়। এটি ফবিদপুর থানার অধীন কয়লা উৎপাদক অঞ্চলের অন্তর্গত গ্রাম। যার নীচে কয়লা থাকলেও উপরে ধান উৎপাদন ক্ষেত্রও বর্তমান। সেদিকে থেকে গ্রামটি কৃষি নির্ভর হলেও খনি অঞ্চল হওয়ায় অনেক চাকুরিজীবীও আছেন। এই ঝানঝিরা বা ঝাঝরা গ্রামের পাশেই ৩৫০ ফুট উচ্চতা (সমুদ্রতল থেকে) সম্পন্ন এলাকা হতেই অজয়ের দুরন্ত উপনদী কুমুরের উৎপত্তি হয়েছে।

গ্রামে বেশ কিছু দেবদেবীর পূজা যথা সময়ে নিয়ম মাফিক সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবুও গ্রাম্য দেবতা হিসাবে চৈত্র সংক্রান্তিতে বিশেষ ধুমধামে বহু ভক্তের সমন্বয়ে শিবের গাজন উদযাপিত হয়ে থাকে।

(ড)

ডাঙ্গাল ঃ— কাঁকসা থানার অন্তর্গত অজয় নদীর পূর্বদিকে গ্রামটি অবস্থিত। পানাগড় ইলাম বাজার রাস্তায় ১১ মাইলের মোড় পার হয়ে উত্তরে এগিয়ে ডাঙ্গালের স্টপে নেমে সামান্য পশ্চিমে হাঁটলেই ডাঙ্গাল গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি অজয়ের নদীগর্ভ থেকে অনেকখানি উঁচু বা ডাঙ্গাতে অবস্থিত হওয়ার জন্যই গ্রামনাম ডাঙ্গা > ডাঙ্গাল হয়েছে। এই গ্রামটি মোটা মুটি তিনভাগে বিভক্ত। ভাগগুলি হল— উঁচু ডাঙ্গাল, নীচু ডাঙ্গাল ও রামপুর ডাঙ্গাল। ডাঙ্গাল গ্রামের উত্তর পূর্বে প্রাচীন গ্রাম বসুধা অবস্থিত। ডাঙ্গাল ও বসুধার মধ্যবর্তী অংশে এক কুর্মাকৃতি ফাঁকা ডাঙ্গায় অর্থাৎ ডাঙ্গালের উত্তর অংশে কাঁদরের উত্তর গায়ে এতদঅঞ্চলের বিশেষ আকর্ষণীয় চণ্ডী

দেবী 'রূপাই চণ্ডীর' আটন বা থান অবস্থিত। তিনি শুধু ডাঙ্গাল গ্রামের গ্রাম্য দেবীই নন, তিনি এই অঞ্চলের আঞ্চলিক দেবীও।

যতটুকু জানা যায় তাতে ডাঙ্গাল গ্রামের ঠাকুরদাস আচার্য এই দেবীর পূজক ছিলেন। তিনি অপুত্রক থাকায় তার জামাই ক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার সন্তান সন্ততিরা চার পুরুষ ধরে এই দেবীর পূজা করে আসছেন। ডাঙ্গাল থেকে একটি কাঁদর পার হয়ে দেবীর কাছে যেতে হয়। সেখানে পশ্চিমমুখী একতলা দালান মন্দিরে দেবীর প্রস্তর মূর্তি বর্তমান। দেবীর সহ অবস্থানে আরও কিছু দেবদেবী সেখানে রয়েছেন— যেমন সিদ্ধিদাতা গণেশ, বরুল চণ্ডী, দশভুজাদুর্গা— যার দুদিকে জয়া-বিজয়া, মহাকাল ভৈরব ও শিব। এগুলির অনেকেই পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। দেবী এখানে নিত্যপূজিতা হলেও বছরের চৈত্রসংক্রান্তিতেই বিশেষ বাৎসরিক পূজা হয়ে থাকে।

এখন পূজার এক বিশেষ নিয়ম ও আশ্চর্য জনক এক ঘটনার কথা বলি। ডাঙ্গাল গ্রাম থেকে প্রায় ২-২১/২ কি. মি. অগ্নিকোণে বরুলবিল নামক স্থানে— যেখানে বরুল চণ্ডীকে পাওয়া গিয়ে ছিল, সেখানে পূজার একদিন আগে জাগরণ পূজা ও পূজার দিন সকালে বিশেষ পূজা করে আসা হয়। পরে পূজার দিন বিকালে ঢাক ঢোল বাদ্য সহকারে সেই পূজা করা বিশেষ স্থানে যাওয়া হয়। পূজক স্নান জলের জন্য আবেদন জানালে সেখানে হঠাৎই এক জায়গা থেকে বুদবুদ কেটে জল উঠতে থাকে এবং পূজক তা ধরে নেন। মায়ের স্নানের জন্য জল নেওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। সারা বছর বন্ধ থাকে আবার পরের বছর পূজার সময় ঐ ভাবে পূজান্তে সেই জল পাওয়া যায়।

সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যার আগে স্নান সেরে পূজকেরা পূজার যাবতীয় উপকরণসহ মায়ের আটনে উপস্থিত হন। তখন আশপাশের বহু গ্রাম থেকে অজস্র ভক্তের সমাগম হয় মায়ের পূজা দিতে আসার জন্য। পূজা শুরু হওয়ার পর দেবীর মাথায় ফুল চাপানো হয় পরে দেবীর মন্দিরের দক্ষিণ গায়ে এক স্থানে চৌকো খাল কেটে, সেখানে বিশেষ নিষ্ঠায় প্রচুর ঘি পুড়িয়ে অসংখ্য বিল্বপত্রে দেবীর হোম যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। পরে দেব মন্দিরের একেবারে পিছনে এক বটবৃক্ষের তলে মায়ের উদ্দেশ্যে মানসিক হিসাবে প্রচুর ছাগবলি হয়ে থাকে। পূজান্তে উপবাসী ভক্তদের আগে প্রসাদ বিতরণের পর তাদের জলপান করানো হয়ে থাকে। তারপর সমবেত ভক্তদের প্রসাদ দেওয়ার পর ব্রাহ্মণগণ পূজার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে বাড়ি ফেরেন। পূজাকে কেন্দ্র করে সেখানে মেলা বসে এবং সেখানে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি চলতে থাকে। তবে সবই মায়ের পিছনে। মায়ের সামনে কারো কিছু করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা নাই। রূপাই চণ্ডী দেবী খুবই জাগ্রত দেবী। এতদঅঞ্চলে জনমনে দেবীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা

ও ভক্তি সহজেই লক্ষ করা যায়। দেবীর অনেক অলৌকিক কাহিনী জনগণের মুখে মুখে শোনা যায়।

(ঢ)

ঢেকুর ঃ— ঢেকুর নামে নির্দিষ্ট কোন জায়গার এখন আর কোন হদিস পাওয়া যায় না। কিন্তু এই স্থানটি একদা গোপভূমের শিরোভূষণ ছিল কারণ এখানেই একদা গোপভূমের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা মহামাণ্ডলিক ইছাই ঘোষের রাজধানী তথা দুর্ভেদ্য গড় সংস্থাপিত হয়েছিল। ধর্মমঙ্গলে উল্লেখ্য প্রতাপ সিংহও এই ঢেকুর গড়ের এই আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

অনেকেই এই ইছাই ঘোষকে কল্প কাহিনীর কাল্পনিক নায়ক বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু প্রখ্যাত সংস্কৃতি গবেষক শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ বলেন—"ইছাই ঘোষ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ঐতিহাসিকদের কাছে তিনি 'ঢেক্করীর' ঈশ্বর ঘোষ বলে খ্যাত, তিনি ঢেকুরের ইছাই ঘোষ এবং বর্ধমান জেলার গোপভূম রাজ্যের অন্যতম গোপরাজ বংশধর উত্তররাঢ়ের স্বাধীন সামন্ত রাজা।" (১৭) সেই স্বাধীন রাজা ঈশ্বর ঘোষের রাজধানীই ছিল ঢেকুরে।

ঢেকুর নাম করণ প্রসঙ্গে বলা যায়— একদা অজয় নদীর উভয় তীরেই গড় জঙ্গল এলাকায় বর্ধমান বীরভূম সীমান্ত অঞ্চলে ঢেকারু নামে এক ধরনের কর্মকার সম্প্রদায়ের বাস ছিল। এই অঞ্চলে তাদের ব্যাপক সংখ্যাধিক্য থাকায় ঢেক্কারু > ঢেকুর নামে এই এলাকা পরিচিত হয়। এখনও এই সম্প্রদায় নাই তা নয়, তবে তাদের সংখ্যাও কমেছে এবং তাদের শিল্প কর্মও প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সেই ঢেকুর এলাকাতেই মহামান্য ইছাই ঘোষ তার রাজধানী ও গড় নির্মাণ করেছিলেন বলেই অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে বর্তমান কাঁকসা থানার অধীন দামোদরপুর, গৌরাঙ্গপুর, খেরওয়াড়ী নিয়ে বিষ্ণুপুর মৌজাই যা এখনও গভীর জঙ্গলে আবৃত সেখানেই ইছাই তৈরি করেছিলেন সুদৃঢ়গড় ও রাজধানী যা এখনও ত্রিষষ্ঠী গড় বা ঢেকুর গড় নামেই খ্যাত।

ঐতিহাসিক প্রমাণও এর পিছনে রয়েছে যাকে অস্বীকার করাও সম্ভব নয়। সেখানে সন্ধ্যাকর নন্দীর প্রখ্যাত রামচরিত কাব্যে ঈশ্বর ঘোষের ঢেক্করীর কথা বারেবারে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া দিনাজপুরের রাম গঞ্জে প্রাপ্ত ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে ঢেকুরগড়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষকেরা যেমন— ননী গোপাল মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অক্ষয় কুমার মৈত্র, সকলেই বলেছেন— "আমাদের এই ত্রিষষ্ঠী গড় ঢেকুরীই সেই প্রাচীন ঢেক্করী।" (১৮) তাই বলা যায় অজয়ের দক্ষিণে গড় জঙ্গলের ঘন জঙ্গলে অবস্থিত বর্তমানে বিষ্ণুপুর অঞ্চলই একদা ইছাই ঘোষের রাজধানী ঢেক্করীগড় বা ঢেকুর বর্তমান ছিল। তিনি সেই সুদৃঢ় গড়ের

এক স্থানে তার আরাধ্যা দেবী ভবানী বা শ্যামারূপার মন্দির নির্মাণ করে দেবীর সাধনভজন করতেন। যার জন্য এই এলাকা শ্যামারূপার গড় নামেও পরিচিত। এই শ্যামারূপা প্রসঙ্গে 'ধর্মীয় প্রভাব ও গোপভূম' এবং 'গৌপভূমের পুরাকীর্তি' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

(ত)

তালিমবাটী ঃ— অজয় নদীর দক্ষিণে আউশ গ্রাম থানার ২ নং ব্লকের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোটগ্রাম তালিমবাটী। স্বর্গের পারিজাত বলে খ্যাত নাগেশ্বর ফুলের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ অজয় তীরের সাগরপুতুল গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত এই গ্রাম। পূরব পাড়ুক, দীননাথপুর গ্রামগুলি থেকে উত্তরে কিছুটা এগিয়ে গেলেই মোরাম রাস্তা বরাবর ঐ গ্রামে যাওয়া যায়।

গ্রামে উচ্চবর্ণের হিন্দুর বাস নাই বললেই চলে, এখানে অধিকাংশই মেটে সম্প্রদায়ভুক্ত তপশিল সম্প্রদায়ের বাস। চাষ আবাদই এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা। উৎসবের মধ্যে উল্লেখ্য, কার্তিক মাসে মৃন্ময়ী কালী পূজা। কালী পূজাই এখানে বিশেষ ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজের আপাল গাজনও বিশেষ উৎসাহে উদযাপিত হয়। ছোট গ্রাম। এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সেখানকার পাঠ শেষ হলে ছেলে মেয়েরা নিকটের পি.পি.ডি. হাইস্কুলে যায়।

তেলোতা ঃ— আউশগ্রা ২ নং ব্লকের অধীন এক কৃষি প্রধান গ্রাম। এর জে. এল. নং-১০৩। গ্রামটি গুসকরার কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গুসকরা-মানকর বাস রাস্তার উত্তরে আনন্দবাজার স্টপে নেমে যাওয়া যায়। গ্রামটি দু'টি অংশে বিভক্ত যেমন উপর তেলোতা ও নামো তেলতা। সেদিক থেকে এদের দু'টি গ্রাম বলাই ভাল।

গ্রামে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজানুষ্ঠান যথা নিয়মে হয়ে থাকলেও দুর্গোৎসব কালীপূজা যেমন অনুষ্ঠিত হয় তেমনি জাঁকজমকে মনসা পূজাও হয়ে থাকে। গ্রাম দু'টিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস তবে সদ্‌গোপদের সংখ্যাই বেশি। কৃষি প্রধান গ্রামে অধিকাংশের জীবিকাই চাষ আবাদ। এখানে ধান গম ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হলেও উৎকৃষ্ট মানের বেগুন উৎপন্ন হয় এবং স্থানীয় বাজারে তার চাহিদাও প্রচুর।

তিলোকচাঁদপুর ঃ— কাঁকসা থানার অন্তর্গত একটি বড় গ্রাম, যার জে. এল. নং-৬৯। এই গ্রামে বর্তমানে মানকার থেকে ভাতকুন্ডা দেবশালা হয়েও যাওয়া যায়। অন্যদিকে দার্জিলিং রোড হয়েও তিলোকচাঁদপুরে যাওয়া যায়। গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায় এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

গ্রামে প্রধান জীবিকা চাষ আবাদ হলেও চাকুরিজীবীও কিছু আছেন। গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক থাকলেও গোপ ও সদ্‌গোপদের আধিক্যই বেশি। গ্রামে পুরাকীর্তির

মধ্যে লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরটি বেশ প্রাচীন, মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজও রয়েছে। গ্রামে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা হলেও মনসাপূজার বিশেষ ধুম হয়ে থাকে। মনসাই গ্রামের গ্রাম্য দেবী। মনসা পূজায় অন্য গ্রাম থেকেও মনসা মূর্তি এনে গ্রামে কয়েক দিন বাখা হয়। তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকই মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠে। এই পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামেব লোক আত্মীয়-পরিজনদের আমন্ত্রণ জানায়। ঐ সময় মনসামঙ্গলের গানও হয়ে থাকে। গ্রামে ঐ গানের দলও আছে, তারাও গান করে থাকে, তখন বহু ছাগবলি সহ মনসার পূজা হয়ে থাকে।

গ্রামে লক্ষ্মীজনার্দনের সেবাইতরা মানসিক রোগেব প্রতিকারে এবং বাত ব্যাধির উপশমের জন্য ঔষধ হিসাবে বিভিন্ন গাছ গাছড়ার নির্যাস সহ এক বিশেষ ধরনের তেল তৈরি কবে দেন এবং বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোক এসে তা নিয়েও যায় এবং তারা ফলও পায়। তাই এখানকার তেলের চাহিদাও আছে।

এখানকার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় রামহরিপাল নিজ পিতা স্বর্গত হরিলাল পালের স্মৃতি রক্ষার্থে 'হরিলাল স্মৃতি হাইস্কুল' প্রতিষ্ঠা করে তার উন্নতিকল্পে দীর্ঘদিন সেই স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। স্কুলকে দাঁড় করাবাব জন্য তিনি নিজের জমির ধান বিক্রয় কবেও শিক্ষকদের বেতন দিতেন। নিজে খুবই সরল অনাড়ম্বব জীবন যাপন করতেন। কোন দিন ছাতা জুতা ব্যবহার করেন নাই।

(দ)

দারিয়াপুর ঃ— আউশ গ্রাম থানার ১ নং ব্লকের দিগনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় এই গ্রামটি অবস্থিত। ওসকরা-বুদবুদ পাকা রাস্তার গায়েই এর অবস্থান। ওসকরার সামান্য দক্ষিণে এই গ্রামের অবস্থান এবং জে. এল. নং ১৬২। গ্রামটি ছোট হলেও প্রাচীন। এখানের এক শিব মন্দিরে নীলকণ্ঠেশ্বর শিব নামে শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। লিঙ্গটি আকারে ছোট হলেও এর গাজন অনুষ্ঠান এবং শিবচতুর্দশীতে পূজানুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়ে থাকে।

গ্রামটিতে ডোকরা শিল্পীদের বসতক্ষেত্র গড়ে ওঠায় এর গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাকা রাস্তার পশ্চিমে একটি পাড়ায় বেশ কয়েক ঘর ডোকরা শিল্পী অধিবসতি গড়ে তুলেছে। এরা ডোকরা কামার হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেয়। কিন্তু এরা খুবই গরীব এবং বহিরাগত অন্ত্যজ সম্প্রদায় ভুক্ত-তাই দেশীয় কর্মকারদের সঙ্গে এদের সামাজিক কোন চল নাই। এক উপ-জাতীয় শিল্পচেতনা এদের মধ্যে কার্যকরী রয়েছে এবং নানান অর্থনৈতিক অসুবিধার মধ্যেও সেই ধারাকে ওরা এখনও এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

এরা সাধারণত কাঁসা পিতলকে গালিয়ে গালা ও মাটির ঠোলের মাধ্যমে বিশেষ

নৈপুণ্যের দ্বারা তৈরি করে নানান সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার—বিশেষ করে ধান চাল মাপার কাঠা সের কুনকে, আর তৈরি করে হাতি, ঘোড়া, পুতুল ও নানা দেব দেবীর নিজস্ব ঘরানায় তৈরি মূর্তি। শিল্পকলা হিসাবে এর বিশেষ স্বকীয়তা আছে। বড় লোকদের বসার ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এদের তৈরি শিল্প সামগ্রী বিশেষ মনোগ্রাহী। কিন্তু এদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

যদিও সরকারি তরফ থেকে এদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় ও বাজার সৃষ্টির ব্যাপারে ঢাকঢোল পিটিয়ে সরকারি প্রচার খুবই তুঙ্গে তোলা হয় কিন্তু বাস্তবে বেশ অনীহাই লক্ষ করা যায়, তাই এদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এদের বসত বাড়ির চালে খড় নাই, পড়নে নেংটি সম্বল, ছেলে মেয়েদের নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে এক অবর্ণনীয় দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেই নিজস্ব শিল্পকলাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, সমগ্র গোপভূম পরগনার একমাত্র এই গ্রামের এক ছোট্ট পাড়াতেই ডোকরা শিল্পের জন্য চার জন রাষ্ট্রপতি পুরস্কৃত শিল্পী রয়েছেন যা সত্যিই গৌরবের বিষয়। কিন্তু সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য ঐ পুরস্কার প্রদানেই শেষ। তাদের কারুকলার যোগ্য মর্যাদা দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের কোন উদ্যোগই নাই। তাই রাষ্ট্রপতি পুরস্কৃত শিল্পী দারুণ শীতে নেংটি পরে গায়ে ছেঁড়া গামছা গায়ে কাঁপতে থাকে। এতো জাতির লজ্জা!

দেয়াশা ঃ— আউশ গ্রাম থানার ১ নং ব্লকের ১৬৬ নং জে. এল. ভুক্ত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম দেয়াসা। গ্রামে যেতে হলে সিউড়ি রোডের ওড়গ্রামে নেমে পশ্চিমে কিছুটা গেলেই গ্রামে যাওয়া যায়। অন্যদিকে মানকর রাস্তায় কেঁয়োতলায় নেমে পূর্বদিকে অগ্রবর্তী হলেও গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম হলেও বেশ আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ গ্রাম। চাষই প্রধান জীবিকা হলেও নিকটবর্তী গুসকরা ও অন্যান্য ব্যবসা ক্ষেত্রে অনেকেই ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন আবার অনেকেই চাকুরিও করেন।

গ্রামে দেব-দেবীর সংখ্যা কম হলেও শিব, দুর্গা ও ধর্মরাজের বিশেষ ধুমধামে পূজা হয়ে থাকে। এখানে শারদীয় দুর্গাপূজা খুবই জাঁকজমকে অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজায় অনেক ছাগ বলিও হয়ে থাকে। আবার আষাঢ় মাসের ১২-১৪ তারিখে এখানে প্রতিবছর মহাধুমধামে নানা কৃত্যাদিসহ ধর্মরাজের গাজনপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মরাজই এখানকার গ্রাম্য দেবতা। তাই এই গাজনে লোকজন আমন্ত্রিত হয়। এই অনুষ্ঠানেও কম করে ৬০/৭০ টি ছাগ বলি হয়ে থাকে। ধর্মরাজের গাজনকে কেন্দ্র করেই তখন একটি মেলাও বসে। এখানকার ধর্মরাজের নামে বাত ও চোখের অসুখ নিরাময়ের জন্য ওষুধ দেওয়া হয়।

দীননাথপুর ঃ— গ্রামটি আউশ গ্রাম ২ নং ব্লকের অধীন ভেদিয়া-মোড় বাঁধ

রাস্তার ধারেই অবস্থিত। গ্রামটি বেশ প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের গায়েই রযেছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাণ্ডুরাজার ঢিবি। এখানে খননকার্যে প্রাপ্ত নির্দশনাদিতে জানা যায় যে এখানকার অজয তীরবর্তী এক বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাক আর্য তাম্রস্মীয় সভ্যতার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। সেই সভ্যতাব সময়কাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব দেড় হাজাব অব্দেব কাছাকাছি। সেদিক থেকে এই এলাকা আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর সময কালে এক বিশেষ সভ্যতায় সমুজ্জ্বল হযে উঠে ছিল। সেই নিরিখে এই গ্রামও বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম।

এখানে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়েব বাস। গ্রামের মাঝ বরাবর পাকা রাস্তা প্রসারিত হওয়ায়, কৃষি প্রধান গ্রাম হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রাম এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পরিণত হয়েছে। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়। হাটবাজার সবই আছে। এতদ অঞ্চলের হাইস্কুল টি পূবর-পারুক-দীননাথপুর হাইস্কুল (পি.পি ডি) এই গ্রামেরই পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাদি যথা সময়ে যথা নিয়মে পরিপালিত হয়।

দেবশালা ঃ— আউশ গ্রাম ব্লকের আওতাধীন হলেও গ্রামটি বর্তমানে বুদবুদ থানার অধীন। গোপভূম পরগনার জঙ্গল মহলের ঘন জঙ্গলে আবৃত এক প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে এখানে যাওয়ার তেমন কোন পথ ছিল না। পানাগড় থেকে হেঁটে যাওয়া ছাড়া। এখন ভাতকুন্ডা থেকে মোরাম রাস্তা ধরে গ্রামে যাওয়া যায় এবং ঐ মোরাম রাস্তা ধরেই ত্রিলোকচাঁদপুর থেকেও আসা যায়। জনশ্রুতি নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে দুর্দান্ত বর্গীদের আক্রমণ হানার উদ্দেশ্যেই জঙ্গল ঘেরা এই এলাকায় বর্ধমানের রাজাদের এক সুরক্ষিত গড় এখানে ছিল যার জন্য এই গ্রামের নাম হয়েছিল রাজার গড় > রাজগড়। বর্ধমানের চিত্রসেন রায় এই গড়টির নির্মাতা। [১৯] এখনও এখানে এক বটবৃক্ষাচ্ছাদিত সিংহ দরজার সুবিশাল থাম, ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কিছু গেট ও ভিতরে পাকা ইটের সৌধাবলীর ধ্বংসাবশেষ এবং অন্দর মহলের ব্যবহার্য চতুর্দিকে বাঁধানো পুকুরের ক্ষয়িত অংশ চোখে পড়ে। এছাড়াও এখানের কিছু কিছু অংশ এখনও বড়খা (বড় খাল যুক্ত পরিখা > বড়খা) গড়ের ডাঙ্গা, গড়খাই ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত হওয়ায় সহজেই অনুমান হয় যে, এটি একদা কোন রাজাদের তৈরি গড়ই ছিল। এখন তা অবলুপ্ত হয়ে গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়েছে যে সেখানে যাওয়াই দুঃসাধ্য। এ ব্যাপারে কয়েকজন উৎসাহী গ্রামবাসী লাঠি হাতে গাছপালা কাঁটা সরিয়ে সেখানে যেতে সাহায্য করেছিলেন।

সেই দুর্গম জঙ্গল থেকে কিছু সরে সামান্য পূর্বদিকে বর্তমান গ্রামটি গড়ে উঠেছে এবং দেবশালা নাম নামিত হয়েছে। গ্রামে রয়েছেন অনাদি লিঙ্গ শিব, শ্রীধর, গোপাল, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্যামসুন্দর, লক্ষ্মীজনার্দন, দামোদর, বেশ কয়েকটি মহামায়া দুর্গা, ও অনেকগুলি মৃন্ময়ী কালী, নর্তকচণ্ডী, মড়কচণ্ডী ইত্যাদি। বহু সংখ্যায় বিভিন্ন দেবদেবীর

গ্রামে অবস্থান আধিক্য হেতু অনেকের মতে গ্রামের নাম দেবশালা হয়েছে।

গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস হলেও মুসলমানদের স্বতন্ত্র দুটি পাড়া রাইকনা ও কৌচা ছাড়াও হিন্দুরা তাদের সম্প্রদায় গত আপন আপন পাড়ায় বাস করেন। তাদের পাড়াগুলি হল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ (বকসী), গোপ, সদ্‌গোপ, সুবর্ণবণিক, কর্মকার, নাপিত, কুম্ভকার, বাউরি, মেটে ডোম বাগদি, হাড়ি পাড়া ইত্যাদি। গ্রামে আদিবাসীও আছে। কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি থাকায় অনেকেই গ্রামে থেকে, আবার অনেকেই বাইরে থেকেও চাকুরি করেন। ইদানিং অনেকে ব্যবসা বাণিজ্যেও লিপ্ত আছেন।

গ্রামের পুরাকীর্তি ও দেবকীর্তি প্রসঙ্গে বলা যায়— গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়বে একতলা দালান মন্দিরে ও তার সামনে আটচালা সহ গ্রাম দেবতা স্বয়ম্ভু শিব মন্দির। মন্দিরটি প্রাচীন তাই তাকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে ১৩৩৬ সালে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এর সংস্কার সাধিত হয়। দেবতা খুবই জাগ্রত, চৈত্র সংক্রান্তিতে চার দিন ধরে শিবের গাজন উৎসব চলে। মন্দিরের মেঝে মোজাইক করা তার মাঝে এক গর্ভে ছোট আকারের শিব লিঙ্গ বর্তমান, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। গাজনে প্রচুর ভক্ত হয় এবং নানা প্রকার কৃত্যাদিসহ গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গাজনে প্রচুর ভক্ত হয় তার মধ্যে শিব ভক্ত সব সময় গোপ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই বংশ পরম্পরায় নিয়োজিত হয়।

এই গাজনে সবথেকে উল্লেখ্য অনুষ্ঠান হল ২ জন প্রধান ভক্ত কর্তৃক আধানে এক তাল গাছকে উপরে দেবস্থানে তুলে আনা। ২ জন লোকের পক্ষে একটি তাল গাছকে উপরে তুলে আনা খুবই আশ্চর্যের বিষয় তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেব মহিমাতেই তা সম্ভব। ধর্মগাজনের সর্বত্র এ ধরনের অনুষ্ঠান সচরাচর দেখা যায় না। গাজনে উপস্থিত হলে ঐ রকম বহুতাল গাছকেই দেবস্থানের এক পাশে পড়ে থাকতে দেখা যাবে যা প্রতি বছর আনতে আনতে জড়ো হয়ে পড়ে আছে। এই শিব গাজনকে কেন্দ্র করে গ্রামে বেশ কয়েক দিন ধরে মেলাও বসে।

গ্রামে প্রভাবশালী পরিবার হল বক্সী পরিবার। এদের গৃহদেবতা হিসাবে লক্ষ্মী জনার্দন, শ্যামসুন্দর, মহামায়া দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীর মন্দিরগুলিকে ঘিরে একটি টিনের চাল ও কাঠের কারুকার্য মণ্ডিত দর্শনীয় প্রাচীন আটচালা এখনও তার অস্তিত্ব কোন মতে বজায় রেখে চলেছে। তবে অচিরায় সংস্কার না করলে আর বেশি দিন সে থাকবে না তা তার হেলে পড়া অবস্থা দেখেই বেশ বোঝা যায়।

এদের কাছারী বাড়ির কাছে রয়েছে দু'টি পূর্ব দুয়ারী শিবমন্দির। ব্যানার্জীদের বাড়িতে রয়েছে সাদামাঠা গড়নের একজোড়া শিব মন্দির। এছাড়াও গ্রামে অতীতে নবদ্বীপ থেকে আসা অধিকারী বাড়িতে রয়েছেন দারু নির্মিত বড় আকারের গৌর ও

নিতাই এর যুগলবিগ্রহ যা মহাপ্রভু নামেই খ্যাত। বর্তমান বংশধর নিতাই অধিকারী, যিনি পেশায় শিক্ষক নেশায় কীর্তনীয়া— তিনিই এই বিগ্রহের সেবক। এদের সেবা অনেকখানি আত্মবৎসেবা। নিজেরা যা সেবা করতে ভালবাসেন দেবতাকেও তাই নিবেদন করে দেবসেবা সম্পন্ন করেন। দেবতার নিত্য সেবা সহ বৎসবে অন্যান্য উৎসবাদিও যথা নিয়মে পালিত হয়ে থাকে।

গ্রামের পশ্চিমে রাইকনা নামে এক মুসলমান পাড়া পার হযে ক্যানেলের পশ্চিম গায়েই রাস্তার উত্তবে এক বিরল প্রজাতির কুসুম বৃক্ষের সম্মুখে একভগ্ন মন্দিরে লৌকিক দেবী নর্তক চণ্ডীর আটন। মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্ন হলেও পূর্বে এটি বিষ্ণুমন্দির এর রীতিতেই তৈরি হয়েছিল। এই ভগ্ন মন্দিরে বর্তমানে কোন বিগ্রহ নাই। কিন্তু তা না থাকলে কি হয, দেবীর প্রতি রয়েছে মানুষের অসীম শ্রদ্ধা। এখানেই দেবী নর্তক চণ্ডীর উদ্দেশ্যে বিশেষ পূজা ও যাগ যজ্ঞ হয়ে থাকে। গ্রাম্য প্রথা হল— নবদম্পতি বিয়েব পর বাড়ি ঢোকার আগেই মন্দির প্রাঙ্গনে নেমে পদব্রজে মন্দিরে প্রবেশ করে এবং দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানায়। পরে তাদের নাম মন্দির গাত্রে যজ্ঞেব অগ্নিদগ্ধ কালোকয়লার ছাই দিয়ে নিজেদের নাম লেখে। তাই দেয়ালে একটু খুঁজলেই গ্রামের বহু দম্পতিব নামের হদিস পাওয়া যাবে। মেয়ের বিয়েতেও মেয়ে শ্বশুড় বাড়ি যাবার আগে এখান এসে যুগলে প্রণাম নিবেদন করে তাদের যাত্রা শুরু করে।

গ্রামের একটু পশ্চিমে পরিত্যক্ত রাজগড়ে যাবার পথে, বাঁশ বনের মধ্যে উত্তরমুখী এক জোড়া শিব মন্দিরের মতই মন্দির দেখা যায়। মন্দিরে কোন দেব বিগ্রহ নাই, আছে কয়েকজন বৈষ্ণবের সমাধি। পূর্বে এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল কিনা তা বলা যায় না। এমনও হতে পারে মন্দিরের ভিতর বিগ্রহ অন্তর্হিত হবার পর তা সমাধি মন্দির হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নচেৎ এমন শিব মন্দির সদৃশ মন্দির সচরাচর সমাধি মন্দির হিসাবে ব্যবহৃহ হতে দেখা যায় না।

এই গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস হলেও গ্রামের সম্ভ্রান্ত বকসী পরিবার শিক্ষায় দীক্ষায় বিশেষ উন্নত হয়ে তাদের অনেকেই এখন গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন শহরাঞ্চলে বসবাস করছেন। গোপভূমের এই অরণ্যাঞ্চলে একদা গোপ জাতিরও বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তা গ্রাম্য দেবতা শিবের গাজনের প্রধান ভক্তা তাদের মধ্য থেকেই নির্বাচনের মাধ্যমেই তা বেশ অনুমান করা যায়। সেই গোপ সম্প্রদায়ের এক সন্তানের সঙ্গেই এখানকার রাজগড়ের একরাজ কন্যার প্রেমকে ঘিরে এক লৌকিক প্রেমকাহিনী এখানকার লোকের মুখে মুখে শোনা যায়।

ঘটনাটি হল— একদা এই রাজগড়ের কোন এক রাজকন্যার সঙ্গে এখানকার এক গোপ বালকের ভালবাসা হয়েছিল এবং উভয়ে উভয়কে গভীর ও নিবিড় ভাবে ভাল বেসেছিল। তাদের সেই ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিতেই রাজকন্যা তার ভালবাসার নাগরকে

নিয়ে ঘর করার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে দুজনে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাতের অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজরোষে তা সম্ভব হয়নি। রাজা তা জানতে পেরে বনের মধ্যেই নাগরকে হত্যা করিয়েছিলেন। এই ঘটনা জানাজানি হলে, এখানকার লোকেরা বেদনা বিধুর চিত্তে অরণ্যে পড়ে থাকা রৌদ্র দগ্ধ নাগরের মৃতদেহে তার ভালবাসার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে পরম স্নেহে লতাপাতার আচ্ছাদন দিয়েছিল।

বিস্ময়ের বিষয় হল এই যে, এতদ অঞ্চলের পথচারীগণ ঐ পথে যাবার কালে অরণ্যের বৃক্ষাদির পাতা ছিঁড়ে সেই ব্যর্থ নাগরের শাশ্বত প্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এখনও পত্রপল্লব নিবেদন করেন। এর ফলে ঐ স্থানটি পাতায় পাতায় স্তূপাকৃতি হয়ে থাকতে দেখা যায়। হাটবারের দিন লোক সমাগম বেশি হওয়ায় পল্লবের স্তূপের আকার বেড়ে যায়। ঐ স্থানটি নাগরপোঁতা নামেই খ্যাত হয়েছে।

গ্রামটি শিক্ষায় বেশ উন্নত। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে। গ্রামে দুদিন সাপ্তাহিক হাট, বাজার, পুলিশ ফাঁড়ি, ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র পোষ্ট অফিস ইত্যাদি অনেক কিছুই বর্তমান। গ্রামে কীর্তন গানের বেশ রেওয়াজ লক্ষণীয়, কারণ এখানে প্রায় পাঁচটি কীর্তন গানের দল রয়েছে। পূর্বে গ্রামে টুসু-তসলার ব্রতকথা এবং ভাদু, ভাঁজো ইত্যাদি গানের চর্চাও ছিল। তবে ভাদু গান এখনও অবলুপ্ত না হলেও ভাঁজো গান আজ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তারই সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে গ্রামের এক বয়স্ক মহিলা শ্রদ্ধেয়া সুনীতি বকসীর স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে যে সকল নমুনা গীতি সংগ্রহ করেছিলাম তারই সামান্য অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল—

· ভাঁজালো মিমি মিনি মাটি লো সরা
কাল ভাঁজোকে আনতে যাব পদ্মফুলের ঝারা।
পদ্মফুল, কুন্দফুল তারা দুটি ভাই।
চলভাই সবে মিলে কৈলাসেতে যাই।
কৈলাসের পথ ভাই বড়ই দুর্গম
ভাঁজোর কৃপায় আমরা তা করব অতিক্রম।

দণ্ডেশ্বর ঃ— কাঁকসা থানার আওতায় ১১ নং জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম এই দণ্ডেশ্বর। বীরভূমের কেন্দুবিল্বের দক্ষিণে শিবপুর বাস স্টপে নেমে অজয়ের দক্ষিণের বাঁধ ধরে পশ্চিমে কিছুটা যাবার পর সামান্য দক্ষিণে অগ্রবর্তী হলে এই গ্রামে যাওয়া যায়।

গ্রামটি প্রাচীন। এখানে অনেকে দেবকীর্তিও বর্তমান। তার মধ্যে গ্রামের উত্তর অংশে একেবারে এক ফাঁকা জায়গায় এক বিশাল বটবৃক্ষসহ কদম বৃক্ষের তলায় দু'টি শিবমন্দির বর্তমান। একটি দক্ষিণ দুয়ারী অন্যটি পশ্চিম দুয়ারী। এই পশ্চিম দুয়ারী শিব মন্দিরেই রয়েছেন দণ্ডেশ্বর শিব, যার নাম অনুযায়ী এই গ্রাম তথা মৌজাটিও 'দণ্ডেশ্বর' নামে খ্যাত।

দুটি শিবই প্রাচীন এবং মন্দিরদ্বয়ও বেশ পুরাতন। এখানকার দুই শিবকে কেন্দ্র করে চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাধূমধামে গাজন উৎসব সম্পন্ন হয়। এখানকার দণ্ডেশ্বর শিবের প্রতীক বানেশ্বর পাশ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রাম পরিক্রমায় যায় ফলে তখন সেই সকল গ্রামেও গাজন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। তেমনই একটি উল্লেখ্য গ্রাম হল ফুলঝোড়।

দণ্ডেশ্বর গ্রামটিও কৃষি প্রধান গ্রাম। চাষ আবাদই এখানকার প্রধান জীবিকা।

দামোদরপুর ঃ— গ্রামটি জামুরিয়া থানাব সদর কার্যালিয় জামুরিয়া থেকে সামান্য দক্ষিণ পূর্বে, এর জে. এল. নং-২০, বঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে বহু সম্প্রদায়ের বসবাস লক্ষ করা গেলেও এখানে আদিবাসীদেরই আধিক্য লক্ষণীয়। সে দিক থেকে গ্রামটিকে আদিবাসী প্রধান গ্রাম বলাই সঙ্গত। এ কারণে গ্রামটি আদিবাসী কৃষ্টির বিশেষ দ্যোতকও বটে। এই গ্রামেই অনুষ্ঠিত আদিবাসীদের এক বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসব হল ছাতা পরব। একে ছাতা তোলা বা ছাতা পূজাও বলা হয়।

এই বিশেষ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় ভাদ্রের শেষের দিন ও আশ্বিনের প্রথম দিনে। বৎসরের নির্ধারিত দুই বিশেষ দিনে ঐ উৎসব চলে, তার জন্য বহুদূর দূরান্ত থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু লোক জন দামোদরপুরের সংলগ্ন গ্রাম রকায় সমবেত হয় এবং ঐ উৎসবে সকলে একীভূত হয়ে যায়।

উৎসবের শুরুর দিন— অর্থাৎ ভাদ্র সংক্রান্তির দিনে দু'টি বৃহৎ বাঁশের ছাতা তৈরি হয় এবং তাকে রং বে রং এর কাগজ, কাপড় ও ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হয়। তারপর বিশাল উঁচু দু'টি বাঁশ— যা প্রায় ২৮ হাতের মত লম্বা, তার আগায় ঐ ছাতা দু'টি সংযোজিত করে বাঁশ দু'টিকেও রঙিন কাগজে মুড়ে উপরে তুলে ধরে পুঁতে দেওয়া হয। তার ফলে বাঁশ দু'টির মাথায় দু'টি বৃহৎ আকারের সুসজ্জিত ছাতা উড্ডীন অবস্থায় থেকে যায়। একেই ছাতা দেবতা বলা হয়।

এবার শুরু হয় ছাতা পূজা। পূজার বিভিন্ন দ্রব্য উপাচারের মধ্যে এখানে থাকে নানাবিধ সামগ্রী সহ চিড়া, সিন্দুর, চাল, কোরাকাপড়, লাল শালু কাপড়, গাঁজা, গাঁজার কল্‌কে, মদ এবং বলিদানের জন্য একটি লাল রংয়ের মুরগি ও একটি ছাগ। ছাতাতোলার পর থেকে শুরু হয় নানা প্রকার বাদ্যভাণ্ড সহ মাদলের তালে তালে আদিবাসী পুরুষ নারীর মিলিত নৃত্য। শুরু হয় পূজা অনুষ্ঠান। দীর্ঘক্ষণ পূজা চলার পর পূজা একসময় শেষ হলেও বাদ্যসহ নৃত্য দু'দিন ধরে সমানতালে চলতে থাকে। পালাক্রমে খাওয়া দাওয়া চললেও নৃত্যগীতের বিরাম নাই।

তৃতীয় দিনে ছাতা নামাবার পর উৎসবের পরিসমাপ্তি সূচিত হয়, এমন এক গুরুত্ব পূর্ণ আদিবাসী উৎসব এই গ্রামেই অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন থেকে গ্রামটি আদিবাসী কৃষ্টির বিশেষ ঐতিহ্যবাহী গ্রাম।

এখানকার উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য সেখানে একটি মেলাও বসান হয়। মেলায় আদিবাসীদের হাতের কাজ ও তাদের সৃষ্টি শিল্পসম্ভার পণ্য হিসেবে পরিবেশিত হয়। মেলায় আদিবাসী কৃষ্টির বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিসহ আদিবাসী যাত্রা অনুষ্ঠানও সোৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের মহান ঃ— জামুরিয়া থানার ১৪ নং জে. এল. ভুক্ত অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এক প্রত্যন্ত গ্রাম। কবি কাজি নজরুলের জন্ম ভিটা চুরুলিয়া থেকে অজয়ের বাঁধ বরাবর ৫ কি.মি. পূর্বে হাঁটলে মুসলমান প্রধান এক অতিসাধারণ গ্রাম দেশের মহানে যাওয়া যায়। গ্রামটি খুব সাধারণ হলেও সেখানে যারা বসবাস করছেন, সেই গ্রামবাসীগণ কিন্তু সাধারণ নয়। তারা সকলেই ছেনি হাতুড়ির দ্বারা পাথরের উপর ফুটিয়ে তোলেন অনন্য শিল্প সৌন্দর্য ফলে তারা সকলেই এক একজন দক্ষভাস্কর শিল্পী। গ্রামের প্রায় পঁচাত্তর ভাগ লোকই এই কাজে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন।

প্রাচীনকাল থেকেই তারা দূর-দূরান্ত থেকে পাথর এনে তাতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করে অতুলনীয় শিল্প সম্ভার। তবে সকলেই যে সূক্ষ্ম কারুকার্যের শিল্পী তা নয়। তাদের অনেকেই সাদামাঠা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার যেমন শিলনোড়া থেকে শুরু করে জাঁতা, পাথরের থালা, বাটি গেলাস, ধান ভেজানোর ডাবা, আধুনিকবাথ টব এমনকি পবিত্র প্রদীপ, চন্দন পিড়ি, শিবলিঙ্গও তৈরি করে থাকেন।

অতীতকাল থেকেই অজয় নদীর জলপথেই ভিন্ন জায়গা থেকে পাথর আনা ও পাথরের তৈরি দ্রব্যসম্ভার জলপথেই দেশ-বিদেশের বাজারে চালান দেওয়ার কাজ চলতো। এখন স্থলপথেই তা পরিবাহিত হয়। বংশ পরম্পরায় এখানকার মুসলমান শিল্পীরা পাথরের কাজ করছে তবে পূর্বে তাঁদের বাইরে থেকে পাথর আনতে হত কিন্তু এখন জামুরিয়ার বহু পাথর খাদান থেকেই পাথর পাওয়ায় তাদের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। তবুও তাদের আর্থিক অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমেও একজন শিল্পীকে পঞ্চাশ টাকা উপায় করতে হিমশিম খেতে হয়। যদিও তাদের তৈরি অধিকাংশ দ্রব্যসম্ভার সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তবুও উপযুক্ত পুঁজির অভাব, দ্রব্যসামগ্রীর উপযুক্ত বাজারের অভাব ইত্যাদি কারণে তারা বেশ অসুবিধায় পড়ে। সরকার থেকেও তাদের দ্রব্যসামগ্রীর বাজার সৃষ্টির প্রচেষ্টা ও তাদের সাহয্যের ব্যবস্থা করার তেমন আগ্রহ নাই। তাই অনেকেই বংশগত শিল্পকর্ম ছেড়ে স্থানীয় কয়লা খনি থেকে বেআইনি কয়লা উত্তোলনে প্রলুব্ধ হচ্ছেন। প্রাচীন এই শিল্পকলাকে বাঁচাবার জন্য সরকারি উদ্যোগের অবশ্য প্রয়োজন আছে।

দিসের গড় ঃ— আসানসোল থেকে পশ্চিমে কুলটি দিসের গড় এখন এক উল্লেখ্য শিল্পাঞ্চল। এর জে. এল. নং—৩৯। দামোদর নদীর প্রধান উপনদী বরাকর এখানেই

দামোদরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। একদা বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চল শেরশাহের অধিকার ভুক্ত ছিল তাই ঐ অঞ্চল সেরগড় পরগনা নামে অভিহিত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ রয়েছে ঐ সেরগড় পরগনার সদর কার্যালয় ছিল ডিহিসের গড়। ইংরাজ আমলে যা 'The sherghar' নামে উচ্চারিত হত। পরবর্তী কালে উচ্চারণের হেরফেরে তা দিসের গড়। দিসের গড় > ডিসের গড় হয়েছে।

একদা এখানে চুরুলিয়ার নরোত্তমের গড়ের মত সত্যই এক দুর্ভেদ্য গড় বা দুর্গ ছিল তাই গড় কথাটি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সেই গড় বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় (১৭৪০-৪৪ খ্রিঃ) কর্তৃক এক সময় অধিকৃত হয়েছিল। সে দিক থেকে এই স্থান বেশ প্রাচীনও বটে। কয়লাখনি অঞ্চলের উল্লেখ্য কেন্দ্র হিসাবে এই স্থান একসময় ভারতীয় খনিসমিতির (Indian Mining Assosciation) প্রধান কার্যালয় রূপে পরিগণিত হয়।

এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কৃষ্টিই লক্ষণীয়। হিন্দুদের উল্লেখ্যদেবতা হিসাবে এখানে রয়েছেন দশ মহাবিদ্যার উল্লেখ্য মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দির। দেবী নিত্য পূজিতা। অন্যদিকে এখানে মুসলমানদের এক মাজারও বর্তমান। চৈত্র মাসে তার উরস কে কেন্দ্র করে তখন এখানে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে ঘিরে মেলাও বসে। উৎসবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই শ্রদ্ধা সহকারে অংশ নিয়ে থাকে।

দামোদরপুর ঃ— জামুরিয়া রাজার থেকে সামান্য পূর্বে দামোদরপুরেরই একটা অংশে রয়েছে বসতি। সেখানে প্রায় আড়াই হাজারের মত লোক বাস করে, তারা সকলেই শবর পরিবার ভুক্ত। এরা এখানে দীর্ঘ দিন ধরে বাস করলেও এরা বহিরাগত। প্রায় ১০০ বছর আগে তারা এখানে এসে বসতি গড়েছিল। তাদের প্রতিষ্ঠিত পুরুষ হিসাবে যিনি খ্যাত, তিনি হলের কেদার ব্যাধ। এদের মুখ্য উপাধি 'ব্যাধ' এবং সকলের জীবিকা হল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুখে রং মেখে সং সেজে গ্রামেগঞ্জে বহুরূপীর সাজে লোক রঞ্জনের মাধ্যমে উপায় করা। সেদিক থেকে একে বহুরূপীর গ্রাম বলাই সঙ্গত।

এরা এখনও পর্যন্ত পড়াশুনার ধার ধারে না। তাদের লেখা পড়া শেখাবার জন্য সরকার পক্ষেরও কোন মাথা ব্যথা নেই তাই এখনও পর্যন্ত তাদের গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত নাই। এরা অশিক্ষিত এবং বেশ সংস্কারাচ্ছন্ন। এদের বিশ্বাস কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে রুজি রোজগার করতে গেলে এদের সমাজচ্যুত হতে হবে তাই এরা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কোন কাজেই ব্রতী হতে চায় না এবং কাজের বিনিময়ে জীবিকা— এরা সেখান থেকে এখনও বহু দূরে।

গ্রামের পুরুষ মাত্রেই আবাল-বৃদ্ধ সকলেই সেই সকাল থেকেই নানা সাজে সজ্জিত হয়ে কেউ রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, হর-পার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, ভীম-অর্জুন, রাবণ-মহিরাবণ,

ইত্যাদি বহু পৌরাণিক ভূমিকা ছাড়াও রাক্ষস-খোক্কস, বাঘ-ভালুক, সিংহ, এমনকি সিনেমার অধিনায়ক, খলনায়কের ভূমিকাতেও এরা অভিনয় করে থাকে। এরা অনেকেই রুজি রোজগারের জন্য আপন এলাকা ছেড়েও দূর দূরান্তে পাড়ি দিয়ে বহুদিন পর পর বাড়ি ফেরে।

এরা এখনও বহু বিবাহে আগ্রহী। অনেকেই একাধিক পরিবার গ্রহণ করে। তার পরিণতিতে সংসার বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক দুরবস্থায় ধুঁকতে থাকে। তাছাড়া বর্তমান যুগে এদের এই বৃত্তির আর তেমন কদর নাই। পূর্বে এদের বৃত্তির প্রতি মানুষের একটা সমীহভাব ছিল কিন্তু এখন তারা অনেক খানিই উপেক্ষিত, প্রায় ভিখারির পর্যায়ে পড়ে গেছে। অনেকের তাই মোহভঙ্গ হতে শুরু হয়েছে। ফলে পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের বৃত্তি থেকে সরে গিয়ে কেউ রিক্সা চালায়, কেউ রং মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রীর যোগাড় দিতে শুরু করেছে। [২০]

দেউলি ঃ— এটি অজয় নদীর উত্তরে একেবারে বাঁধের গায়ে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম। বীরভূম জেলার বোলপুর থানার পুরুষোত্তমপুর মৌজায় এর অবস্থান। গ্রামটি যদিও গোপভূমের পরিপূর্ণ সীমানায় বর্তমানে না পড়লেও একদা অজয় নদীর উত্তরের কিছু অংশও গোপভূম হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল— একাদশ শতকে বীরভূম গোপভূমের অন্তর্গত ছিল। তখন বীরভূম উপান্তের অজয় তটশায়ী ত্রিষষ্টি গড় বা ঢেকুর গড়ের মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ এই অঞ্চল শাসন করতেন। [বীরভূম পরিচিতি— সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ৫] তাই একে আমাদের আলোচনায় আনা যায়। তাছাড়া এই ছোট্ট গ্রামটি অপরিমেয় পুরাকীর্তি সম্ভারে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ সে কথা শোনার পর গভীর আকর্ষণে অজয়ের দক্ষিণ তীরের গ্রাম মালচা পরিক্রমণ কালে নদীপার হয়ে এই গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলাম।

একটি বৃহৎ পুকুরকে ঘিরে তার চারিদিকের বসতি নিয়েই এই গ্রামের অবস্থান। গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই সদ্‌গোপ, তবে কিছু বর্মন উপাধির বাগদি ও কয়েক ঘর গ্রহাচার্য ব্রাহ্মণের বাসও আছে। গ্রামটি বেশ ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম। এর সঙ্গেই জড়িত প্রখ্যাত চৈতন্য জীবনীকার কোগ্রাম নিবাসী ভক্ত কবি লোচনদাসের স্মৃতি।

এই গ্রামের পাশেই কাঁকুটিয়া গ্রামে খুব বাল্যে লোচন দাসের বিয়ে হয়েছিল। দীর্ঘ দিন বাদে তিনি এখানে এসে জলভরনে আগতা এক মহিলাকে 'মা' সম্বোধন করে তার শ্বশুর বাড়ির সন্ধান জানতে চেয়েছিলেন এবং সেই মহিলার নির্দেশে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দেখে যে সেই মহিলাই তার স্ত্রী। কিন্তু তিনি তাকে মা সম্বোধন করায় স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে তিনি এই দেউলীতেই সাধন ভজনে রত হয়েছিলেন। এখনও তার সাধন স্থল অষ্টদল পদ্মাঙ্কিত শিলাসন— যার উপর বসে তিনি তার 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন তা বর্তমান রয়েছে।

গ্রামের দক্ষিণের এক বিশাল ডাঙ্গায় এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষকে ঘিরে তার চার পাশে গ্রামের দর্শনীয় পুরাবস্তুগুলি বর্তমান। অশ্বত্থ বৃক্ষের পশ্চিমে রয়েছে সুউচ্চ রেখ দেউলের রীতিতে গঠিত দেউলেশ্বর শিবমন্দির। এই দেউলেশ্বরের দেউল থেকেই গ্রাম নাম সম্ভবত দেউলী হয়ে থাকবে। এই মন্দির গাত্রে তেমন কোন উল্লেখ্য টেরাকোটার নিদর্শন নাই তবে এক প্রস্তর ফলকে কিছু লেখা রয়েছে, তাতে বহু কষ্টে ১৭৪০ অক্ষর কটি বোঝা যায়— যা শকাব্দেরই ইঙ্গিতবাহী। ঐ সময়ে মন্দিরটি সম্ভবত সংস্কৃত হয়ে ছিল। এখানে মন্দির গর্ভে গৌরীপট্টসহ শিব লিঙ্গ তো আছেই তা ছাড়াও বাড়তি সংযোজন হিসাবে রয়েছে খুবই চিত্তাকর্ষক প্রস্তর খোদিত দন্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি যার গঠন শৈলী খুবই মনোরম। এই মূর্তিটির দুপাশে দণ্ডায়মান রয়েছে শ্রী ও পুষ্টির মূর্তি। এটি পালযুগীয় শিল্প শৈলী তাতে সন্দেহ নাই।

এর একটু পূর্বে ফাঁকায় রয়েছে লিঙ্গাকৃতি একটি শিলা। এর দক্ষিণে সাদামাঠা পশ্চিম দুয়ারী প্রকোষ্ঠোর এক চৌকির উপর রয়েছে অজস্র স্তুপিকৃত প্রস্তর খণ্ড। দেখে মনে হয় এ যেন এতদ অঞ্চলের দেব বিগ্রহের সংগ্রহশালা (Museum)। এখান থেকেই ব্রতচারী কৃষ্টির পরম পৃষ্টপোষক গুরুসদয় দত্ত মহাশয় পঞ্চমুখী শিব, উগ্রচণ্ডা দেবী ও আরংসাট (শিব) —এই তিনমূর্তি কলকাতায় নিয়ে যান। একথা জানালেন অশীতিপর বৃদ্ধগ্রামবাসী ভোলানাথ পাল মহাশয়। ঐ মূর্তি স্তুপেই আশ্রয় নিয়েছেন গ্রামস্থ ধর্মরাজগুলি ও আরও কিছু মূল্যবান মূর্তি যা দেউলেশ্বর শিবমন্দিরে অবস্থিত বিষ্ণু মূর্তির মতই মনোহর সৌম্যমূর্তি।

এবার গ্রামের সব থেকে চমকপ্রদ পুরাকীর্তির কথায় আসি। সেই পুরাকীর্তিটি অশ্বত্থ তলার সামান্য দক্ষিণে এক ছোট একতলা মন্দিরের অভ্যন্তরে দক্ষিণমুখী প্রস্তর নির্মিত এক বিরাট সিংহবাহিনী মহিষাসুর মর্দিনী মূর্তি, এর উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট। দেবীর নাম দশভুজা পার্বতী কিন্তু দেবী আসলে অষ্টভুজা। এমন বিশালাকার প্রস্তর খোদিত দুর্গামুর্তি সচরাচর দেখা যায় না। এর নির্মাণ শৈলীও খুবই নিখুঁত ও মনোগ্রাহী এবং দেবীর কমনীয় মুখশ্রী যেন মানবী মূর্তির প্রতিচ্ছবি।

এ প্রসঙ্গে কিংবদন্তী বলছে— পুরাকালে এক ব্রাহ্মণের এক অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা ও পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করার পর তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হলেন যে তার কন্যাকে দেবদাসী করতে হবে। সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে কন্যা বড় হলে এই গ্রামের দেবস্থানেই তাকে দেব-দাসী হিসাবে উৎসর্গ করেন। কন্যা নাচে গানে, পূজায় সেবায় দেবতার তৃপ্তি সাধনে ব্রতী হন।

অন্যদিকে দেবদাসীর অতুলনীয় রূপ মাধুর্যে ও নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে এতদ অঞ্চলের এক রাজা প্রতিদিন এখানে আসতে থাকেন। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রণয় ভালবাসা গড়ে ওঠায় রাজা তাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত দেবদাসী তা

মেনে নিতে না পেরে রাজাকে নৃত্যগীতে পরিতৃপ্ত করতে থাকেন। কিন্তু রাজার এই প্রাত্যাহিক আসা যাওয়াকে দেবদাসীর ভাই মেনে নিতে না পেরে একদিনের খাবারে সে বিষ মিশিয়ে রেখে যায়। সেইদিন ভাগ্যক্রমে রাজা আসতে না পারায় সেই আহার্য একা দেবদাসীই গ্রহণ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এই ঘটনায় রাজা খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েন এবং দেবদাসীর মূর্তিকে হৃদয়ে ধারণ করে শিল্পীকে দিয়ে সেই মুখের আদলে তৈরি করান এই পার্বতী মূর্তি। তাই এই পার্বতীর মুখাবয়াব দেবী মূর্তির পরিবর্তে মানবীয় মূর্তির বহিপ্রকাশ ঘটেছে— যা সেই দেবদাসীর মুখচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভাবেই রাজা তার মানস প্রতিমাকে দেবী প্রতিমায় রূপান্তরিত করে দেউলিতে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই দেবীই দেউলীর পার্বতী নামে এখনও পূজিত হচ্ছেন।

পরবর্তীকালে ১৫৬৮ খ্রিঃ সুলতান সোলেমান করণানীর সেনাপতি কালাচাঁদ রায় নামে খ্যাত হয়েছিলেন, সেই তিনিই পুরীর জগন্নাথ ধাম লুণ্ঠন মানসে গৌড় হতে যাত্রা শুরু করে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের বক্রেশ্বর মন্দির ও বিগ্রহাদির প্রভুত ক্ষতি সাধনে দেউলীর ঘাট পার হয়ে ঐতিহাসিক পাণ্ডুরাজার ঢিবির পাশ দিয়ে পশ্চিমাবর্তে বনবিষ্ণুপুর হতে যে রাস্তা দেউলী হয়ে সুরুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাই ধরে অগ্রবর্তী হয়েছিলেন। সেই সময়েই "তিনি দেউলীর পার্বতী মন্দির ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, শিলা সন হতে বিষ্ণুমূর্তিকে ফেলে দিয়েছিলেন এবং মনুষ্য প্রমাণ পার্বতী মূর্তির নাসিকা কর্তন করেছিলেন"।[২১] তদবধি দেউলীর দেবী খাঁদা পার্বতী নামে খ্যাত হয়ে পূজিত হচ্ছেন। এটি শিল্প কলার এক অত্যুৎকৃষ্ট নমুনা এবং এটিও পাল যুগীয় শিল্পকলার নিদর্শন। অনেকেই মনে করেন পাল নৃপতি নয়পাল এই দেবী পিঠের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এত অনিন্দ্য সুন্দর পালযুগীয় প্রস্তর শিল্পের অভূতপূর্ব সমন্বয় কি করে এই গ্রামে হল তা রীতিমত গবেষণার বিষয়। এ প্রসঙ্গে অনেকেই অনুমান করেন যে এই এলাকা তখনকার দিনে ভাস্কর শিল্পীদের বাসভূমি ছিল এবং তখনকার দিনে অজয় নাব্য থাকায় সেই সুদূর অতীতেও রাজমহল থেকে পাথর এনে তারা এই স্থান মূর্তি শিল্পের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছিল। তাই এখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে পালযুগীয় শিল্পকলার অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শন। আবার অনেকে এও অনুমান করেন যে নদী সন্নিহিত গ্রামে হয়ত নদী স্রোতে ভেসে আসা মূর্তিগুলি গ্রামবাসীর উদ্যোগে একে একে এখানে সংগৃহীত হয়েছিল।

সে যাই হোক এই পার্বতীদেবী গ্রামে থাকায় শারদীয় পূজায় এখানে কোন মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা হয় না। এই দেবীরই পূজা একদা চার দিন ধরেই হত। জনশ্রুতি, এই দেবীর পদতলে নাকি রাজা সুরথ লক্ষবলি প্রদান করেই পূজা দিয়েছিলেন। তা যদি

হয়েও থাকে তবে তা এখন ইতিহাস মাত্র। এখন যা হয় তা হল দেবীর চার দিনের পূজার পরিবর্তে কেবল মাত্র নবমীর দিন মানতাদিসহ ছাগবলি দিয়ে দেবীর পূজা সম্পন্ন হয়। একদা এই দেব সেবার জন্য জমিদারদের দেওয়া জমি জমা ছিল। কিন্তু এখন আর তার চিহ্নও নাই। পাশের গ্রাম কামার পাড়ার এক ব্রাহ্মণ দেবীর সেবা পূজা করেন।

গ্রামের ছেলেরা উদযোগী হয়ে তৈরি করেছে একটি সংঘ। সেই সংঘ-শক্তির দ্বারাই বর্তমানে দেব-দেবীর মন্দিরাদির সংস্কার ও পূজা পার্বন চলে। এখানে শিব চতুর্দশীতে দেউলেশ্বর শিবের উৎসব চলে। তখন সংঘের ছেলেরা এখানে মেলা বসায় এবং তার আয়ও দেবসেবায় ব্যয়িত হয়। ভাবলে অবাক হতে হয়— অখ্যাত এই গ্রাম যে দানবীয় নীদর সঙ্গে লড়াই করে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতেই সতত ব্যস্ত। সেই প্রত্যন্ত পাড়া গাঁয়ে পালযুগের শিল্প কলার বহু অভূত পূর্ব শিল্প নিদর্শন বুকে নিয়ে গ্রামটি আপন কৃষ্টির আলোয় ভাস্বর হয়ে আছে। জানি না এই গ্রাম আর কতদিন এই অনন্য কৃষ্টিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

(ধ)

ধাড়াপাড়া ঃ— আউশগ্রাম ১ নং ব্লকের অধীন এই গ্রামটি বর্তমানে ওসকরা পৌরসভার আওতায় এসেছে। একদা এই গ্রামে 'ধাড়া' উপাধির সদ্‌গোপদের আধিক্য থাকায় গ্রামের নাম 'ধাড়াপাড়া' হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। তবে গ্রামটিতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বসতি থাকলেও এখনও গ্রামটি সদ্‌গোপ প্রধান তাতে সন্দেহ নাই। এ গ্রামে বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা নিয়ম মত হয়ে থাকলেও প্রধান গ্রাম্য দেবতা হলেন ধর্মরাজ। এখানকার ধর্মঠাকুর 'ধর্মরাজ' নামেই খ্যাত। টিনের চাল বিশিষ্ট চাতাল সহ মন্দিরে ধর্মরাজের অধিষ্ঠান। ধর্মরাজের গাজনকে কেন্দ্র করেই গ্রামের লোক আত্মীয় পরিজনদের গ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানায়।

লোক প্রবাদ যে এই গ্রামের ধর্মরাজ ও পাশের গ্রাম সুশীলার ধর্মরাজ দুইভাই। তাই বৈশাখী পূর্ণিমায় গাজনের দিনে এ গ্রামের ধর্মরাজকে মুক্ত স্নানের জন্য গ্রাম প্রান্তের এক চড়ক পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে সুশীলা গ্রামের ধর্মরাজকেও একই উদ্দেশ্যে তাদের গ্রামের প্রান্তসীমায় ঐ চড়ক পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয় ফলে ঐ স্থানে উভয় ভাইয়ের মিলন হয়ে থাকে। এখানকার ধর্মরাজের দেয়াসীরা হাঁপানি রোগের প্রতিরোধের জন্য ধর্মরাজের প্রদত্ত ওষুধ দিয়ে থাকে। গ্রামে অন্যান্য উৎসবের মধ্যে দুর্গাপূজা ও নবান্নে বিশেষ ধুমধাম হয়ে থাকে। গ্রামে প্রাচীন এক শিব মন্দিরও আছে। গ্রামের এক পাড়ার নাম কলাডাঙ্গা সেখানে আদিবাসী ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বাসই বেশি।

ধনটিকরীর ঢিবি/ডাঙ্গা ঃ— আউশ গ্রাম থানার ১ নং ব্লকের অধীন সোমাইপুর ও আউশ গ্রাম-এর মধ্যে বিস্তৃত পাকা রাস্তার দক্ষিণে ক্ষীণ তোয়া এক জল ধারা পঞ্চগঙ্গার সামান্য দক্ষিণে এই ঢিবি বা ডাঙ্গার অবস্থান। এটি কোন গ্রাম বা জনপদ নয় নেহাতই একটি ঢিবি। পূর্বে হয়ত এইস্থানে কোন বসতি ছিল, বর্তমানে এটি একটি প্রত্নক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত স্থান।

অনেকের মতে এটি একদা অজয় নদীর তীরবর্তী উঁচুস্থান ছিল— যাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে ছিল। ফলে এটি এক অবলুপ্ত ব্যবসা ক্ষেত্রও হতে পারে। সে যাই হোক ঐ ডাঙ্গা সম্পর্কে একটা ধারণা জনমনে চালু হয়ে যায় যে ওখানে নাকি ধন ঠিকরে পড়ে, তাই ঐ ডাঙ্গার নামকরণই হয়ে যায় ধন ঠিকরেডাঙ্গা থেকে ধনঠিকরের ডাঙ্গা বা ঢিবি।

পরে সোমাইপুরের স্মৃতি কণ্ঠ বাগ্‌দি ওখানে চাষের জন্য খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে কিছু সোনাদানা পেয়েছিলেন, ফলে ঐ ঢিবির প্রতি মানুষের আকর্ষণ দৃঢ় হতে থাকে। এর কিছু দিন পরে মাঝের গ্রামের কৃষ্ণধন দত্ত ওখান থেকে চাষের কাজেই মাটি খুঁড়তে গিয়ে কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তি পেয়ে যান। সেগুলি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের অবগারী মন্ত্রী মাননীয় কৃষ্ণপদ হালদার এর নির্দেশে বিধায়ক শ্রীধর মালিকের সহায়তায় কৃষ্ণধনের পুত্র গৌরাঙ্গসুন্দর দত্ত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় জমা দেন।

এবার মন্ত্রী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এখানে খনন কার্য চালাবার ফলে এখানেরই ঢিবির উপরিভাগেই কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের সঙ্গে চিত্রিত পাত্র, সনাল পানপাত্র ও ঈষৎ লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। [২২] তাছাড়া এখানে তাম্র-প্রস্তর যুগের বহুপুরাবস্তুও পাওয়া গেছে।

যেহেতু এখানে বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে এবং স্থানটিও কূর্মাকৃতি উঁচু ডাঙ্গা তাই অনেকেই একে বৌদ্ধ স্তূপ বলেও মনে করেন। তবে এখানে সুচারু রূপে খনন করতে পারলে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তার ফলে অতীত ইতিহাসের অনেক অব্যক্ত কাহিনীও যে বাঙ্ময় হবে তাতে সন্দেহ নাই।

ধবনী ঃ— দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের নিকটেই ৪৩ নং জে. এল. ভুক্ত গ্রাম ধবনী। দুর্গাপুর-শিবপুর বাস রাস্তার মলান দিঘি স্টপে নেমে কিছুটা পশ্চিমে হাঁটলে গ্রামে যাওয়া যেত। ইদানীং গ্রাম পর্যন্ত পাকা রাস্তা হওয়ায় বাসও চলছে। গ্রামটি ছোট হলেও প্রাচীন।

গ্রামটির নামকরণ প্রসঙ্গে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে গ্রামে ধব-বৃক্ষের প্রাধান্য থাকায় গ্রামের নাম ধবনী হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ধবনি < ধব + বন + ইক। (ধব গাছের *Desmodium Gangiticumm,* ছোটবন।) [২৩] অন্যমতে এই গ্রাম রেশম শিল্পে বেশ উন্নত ছিল। তাতে রেশমের

কাপড় ধোয়া বুনির প্রসিদ্ধির জন্য এই গ্রামের নাম (ধোয়াবুনি > ধবনী) হয়েছে। আর এক মতে গ্রামের নিকটে বন থাকায় সেই বন ধোয়া জল গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় গ্রাম নাম ধবনী হয়েছে।

গ্রামটি পাদ-প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হওয়ার কারণ হল, এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাধক কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। সমগ্র দেশে যাকে 'কণ্ঠ মাশাই' বলেই চিনত। সেই তিনিই তার কণ্ঠ মাধুর্যে, বাগ্মিতায়, রচনা শৈলী ও সুরমুর্চ্ছনার বিস্ময়কর অভিনবত্বে, সমগ্র বঙ্গে তো বটেই— এমনকি ভারতের দিকে-দিগন্তেও রসপ্রবাহের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। তাই ধবনী গ্রাম আজ সত্যিই ধন্য। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল— বঙ্গকৃষ্টির এক বিশিষ্ট আঙ্গিক, ভক্তিরসাপ্লুত কৃষ্ণযাত্রাকে বিশেষ গরিমায় প্রতিষ্ঠা করা।

১২৪৮ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ ধবনী গ্রামের এক নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে স্বভাব কবি নীলকণ্ঠের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন গ্রামে বামাক্ষেপা নামে সমধিক পরিচিত শ্রদ্ধেয় বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা সরস্বতী দেবী। দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করায় ছোটবেলায় তিনি লেখাপড়ার কোন সুযোগই পাননি। কিন্তু তা না পেলেও পরবর্তীকালে কবির বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন পঞ্চকোটের কাশীপুরের রাজা-রাণীর দৌলতে ২৩ বছর বয়সে তার লেখাপড়ার শুরু। মাত্র তিন বছরের প্রচেষ্টায় তিনি বাংলা পড়াশুনা বেশ রপ্ত করে সংস্কৃতও শিখেছিলেন।

পরিণত বয়সে যেমন লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তেমনি ছোটবেলায় গোচারণে গিয়ে কুসুমগড় নামক এক মাঠে জন্মদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী নীলকণ্ঠ আপন মনে গান গাওয়ার কালে তা শুনে অভিভূত হয়েই তৎকালীন কৃষ্ণ-যাত্রার প্রখ্যাত গায়ক গোবিন্দ দাস অধিকারী তাঁকে পরম আগ্রহে নিজ দলে গান গাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তার ফলেই তিনি নিজেকে প্রখ্যাত গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গোবিন্দ দাস অধিকারীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্য তিনি ঐ দল ছেড়ে দেন এবং কাশীপুরের রাজারাণীর কৃপায় যাত্রার দল খোলেন এবং দীর্ঘদিন গ্রামে গঞ্জে স্বরচিত পালায় সুরারোপে আবেগ প্লুত সুমধুর কণ্ঠে তা পরিবেশন করতে থাকেন।

কণ্ঠ মশাই তার সুললিত কণ্ঠ মাধুর্যে স্বরচিত পদ ও সঙ্গীতাদির সাবলীল পরিবেশনায় জনমনে বিশেষ প্রভাব ফেলায় তিনি বঙ্গের সীমা ছাড়িয়েও ভারতের বিখ্যাত গায়ক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং আপামর জনসাধারণের মনোরাজ্যে আপন আসন প্রতিষ্ঠা করে তদানীন্তন মনীষীদেরও স্নেহভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় তিনি যুগবতার শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ধন্যও হয়েছিলেন। সঙ্গ পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দের।

সাধক কবি তার স্বরচিত ভক্তিগীতির সুরমাধুর্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নয়নাশ্রু

ঝরিয়েছিলেন। ফলে আহ্বান পেয়েছিলেন কবিগৃহে শোনাবার এবং শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বার্ষিক অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার। তিনি রামকৃষ্ণের আর এক কৃপাধন্য শিষ্য নাট্যকার গিরিশ ঘোষের ভালবাসাও পেয়েছিলেন। তিনি তার অসাধারণ মধুবর্ষি ভক্তিগানের রস মাধুর্যে আপ্লুত করেছিলেন সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কেশব সেনকেও। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

সঙ্গীত জগতে তার স্বকীয় বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি তাৎক্ষণিক পরিপ্রেক্ষিতে গান রচনা করে তাতে সুরারোপে গাইতে পারতেন— যা অন্য গায়কদের পক্ষে সম্ভব হত না। তাই তিনি তখনকার দিনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়কে পরিণত হয়েছিলেন অবশ্য এর পিছনে ছিল ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা। তার ঐ বিশেষ প্রতিভার দৌলতে তিনি বীরভূমের হেতমপুরের রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তীর জীবন চরিত রচনা করে তা গেয়ে রাজা ও রসিক বর্গের বাহ্‌বা কুড়িয়েছিলেন। ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজও তাকে জয়মাল্যে ভূষিত করেছিলেন। যে সমস্ত রাজপরিবারের তিনি স্নেহধন্য হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হল— পঞ্চকোটের কাশীপুর রাজ পরিবার, হেতমপুরের রাজ পরিবার ও বর্ধমানের রাজ পরিবার।

ভক্তকবি নীলকণ্ঠ বাড়িতে রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেবাপূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। যতদূর জানা যায় তিনি ঐ বিগ্রহ পেয়েছিলেন কালিকাপুরের সদ্‌গোপ জমিদার রায় পরিবার থেকে। সেই বিগ্রহ আজও নীলকণ্ঠের পরিবারে পূজিত হয়ে আসছেন। তবে তার সেবা পূজার জন্য হেতমপুরের রাজারা দিয়েছিলেন ১০০ বিঘা জমি আর বর্ধমানের রাজা দিয়েছিলেন ২৩২ বিঘা জমি। এই সাধক কবিই ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২০ শে শ্রাবণ ত্রিবেণীর গঙ্গা সলিলে আবক্ষ দণ্ডায়মান থেকে অন্তর্জলি হয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন।

সাধক কবি নীলকণ্ঠ তার উত্তরসূরী হিসাবে পুত্র সাধক কমলাকান্তকে কৃষ্ণযাত্রার অঙ্গনে বিচরণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তিনিও দীর্ঘদিন পিতার অনুসৃত পথেই বিচরণ করে ৫২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করলে বঙ্গের কৃষ্ণ যাত্রার অন্তিম পর্ব শুরু হয়ে যায়।

বর্তমান ধবনী গ্রামে নীলকণ্ঠের স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে কবির এক আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কবির তিরোভাব দিবস (২০শে শ্রাবণ) উপলক্ষে প্রতিবছর এখানে কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় ও সেই সঙ্গে এখানে ২/৩ দিনের জন্য একটি মেলাও বসে।

(ন)

নন্দী ঃ— জামুরিয়া থানার অন্তর্গত ৭২ নং জে. এল. ভুক্ত গ্রাম নন্দী। জামুরিয়া

থেকে প্রায় ৩ কি. মি. দূরে এর অবস্থান। গ্রামটি খুব বড় নয়। তবে এখানে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, গোপ, সুবর্ণবণিক এবং অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাগ্‌দি, বাউরি মুচি ও বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। সম্ভবত নন্দীদের বাসক্ষেত্র বোক ও গ্রামনাম নন্দী হতে পারে। ভাষাচার্য সুকুমার সেনেব মতে নন্দী বাটক (নন্দীদের বাড়ি) > নন্দী। [২৩]

গ্রামটি রাজপুর নন্দী নামেও পরিচিত। গ্রামের মধ্যে রয়েছে জমিদারদের সৃষ্ট একটি আকর্ষণীয় প্রস্তর নির্মিত মন্দির যার অভ্যান্তরে জমিদারদেবই গৃহদেবতা দামোদর চন্দ্রের অবস্থান। এছাড়াও গ্রামে রয়েছে তিনটি শিব মন্দির এবং মনসা ও বাবা ঠাকুরের বিগ্রহসহ মন্দির। গ্রামে ধর্মরাজের পূজার প্রাধান্য রয়েছে তাই প্রতিবছর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাবণ মাসে পূজা হয় মনসার এবং অন্যান্য দেব-দেবীর, যেমন— দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী ও শৈব অনুষ্ঠান শিবরাত্রি যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে ২/৩ দিনের জন্য একটি মেলাও বসে।

নবগ্রাম ঃ— পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের অধীন এক প্রত্যন্ত গ্রাম এই নবগ্রাম। কয়লা খনি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান উখড়া থেকে মাত্র ৩ কি. মি. পশ্চিমে এর অবস্থান। গ্রামটি আকারে বড়, জনসংখ্যা প্রায় ছয় হাজারের উপর। গ্রামে শিক্ষিতের পরিমাণ প্রায় ৭০%, কৃষি প্রধান হলেও কৃষির সুযোগ সুবিধা তেমন নাই, অন্যদিকে খনি অঞ্চলে অবস্থিত হলেও এখানে ধীরে ধীরে খনির সংখ্যা কমে যাওয়ায় সেখানে চাকুরিও সঙ্কুচিত হয়েছে, তাই এখানকার লোক বাধ্য হয়ে বিকল্প রুজিরোজগারের চেষ্টায় ব্যস্ত। সে প্রসঙ্গেই আসতে চাই।

পূর্বে এই এলাকা শাল পিয়ালের জঙ্গলে আবৃত ছিল, সেখান থেকে গ্রামের খেটে খাওয়া লোকেরা বন থেকে কাঠ পাতা সংগ্রহ করে দিন চালাত। এখন সেই সাবেক অরণ্যও বিলুপ্তির পথে। তাই গ্রামবাসীরা বর্তমানে কৃত্রিম বনসৃজনেরর দিকে বিশেষ নজর দিয়ে তাদের গ্রামটিতে অরণ্যের ছায়ায় মায়ায় পল্লবিত করে গ্রামটিতে পর্যটকদের কাছে মায়াময় ও আকর্ষণীয় করতে চাইছে— যাতে এখানে পর্যটকদের গভীরভাবে আকর্ষণ করা যায়। এ এক অভিনব প্রচেষ্টা। এই কাজে একযোগে গ্রামের সকল সম্প্রদায় তো বটেই এমন কি আদিবাসীরাও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

খনি অঞ্চলে অবস্থিত এই গ্রামের আশে পাশে শিল্পাঞ্চলও বিস্তৃত থাকায় সেখান থেকে আরণ্যক পরিবেশে বনভোজনের উদ্দেশ্যে বহুজনকেই তাদের গ্রামে আসতে দেখা যায়। তাই শিল্প শিল্পাঞ্চলের ভ্রমণ পিপাসুদের আশা আকাঙ্খাকে সার্বিক রূপ দেওয়ার জন্য এখানকার গ্রামের লোকেরা পরিকল্পিতভাবে গ্রামকে সুন্দর করার জন্য নিবিড় বন সৃজনে মেতে উঠেছে। ফলে শাল, সেগুন, সোনাঝুড়ি, মহুয়ার জঙ্গলের

টানে এখন একসূত্রে বাঁধা পড়েছে নবগ্রামের বাসিন্দারা শুধু তাই নয়, সেখানে সৃজিত হয়েছে নামি দামি এবং রসনা তৃপ্তি দায়ক আম্রবিথি। তার ফলও ফলতে শুরু করেছে। গ্রামবাসী তা বাজার জাত করার স্বপ্ন দেখছে। তাদের সৃষ্ট আমবাগানের আকার প্রকার দেখে অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে যে, এমন বনসাই আম বাগান শিল্পাঞ্চলে আর একটাও নেই।

গ্রামবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাদের সৃষ্ট নবঅরণ্যের মোহময় আকর্ষণে পিকনিক পার্টি এবং উইক এন্ডারদের ব্যাপক আগমন ঘটছে গ্রামে। ফলে পর্যটন শিল্প কেন্দ্র হিসাবে নবগ্রামের গ্রামবাসিরা তাদের গ্রামকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারায়, তাদের কাছে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এখন গ্রামে যাওয়া রাস্তাঘাটের প্রসার ঘটলে তাদের স্বপ্ন আরও সার্থক হবে। (২৪)

(প)

পিন্ডিরা ঃ— মঙ্গলকোট থানার ১০১ নং জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম পিন্ডিরা। গ্রামে একদা পিঁড়রা গাছের প্রাধান্য বা পিন্ডুরী বৃক্ষের প্রাধান্য থাকায় গ্রাম নাম পিন্ডিরা হয়েছে বলে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা স্থান নাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং গ্রামের প্রাচীন লোকেরাও তাই অনুমান করেন। অন্যদিকে লোক প্রবাদে জানা যায় একদা অজয়তীরবর্তী অঞ্চলে পিন্ডিরা নামক জলদস্যুদর বিশেষ উপদ্রব ছিল। কোন এক সময়ে এখানে তাদের উৎপাতের জন্যই গ্রাম নাম পিন্ডিরা হয়েছে।

বর্ধমান-কাটোয়া বাস রাস্তায় শ্রীখণ্ড ডাক বাংলো থেকে যে রাস্তা নতুন হাট গেছে, তা ধরে বেল গ্রামে নেমে মোরাম রাস্তা ধরে সামান্য উত্তরে এগুলে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি ভালগ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হলেও পঞ্চায়েত অফিস এই গ্রামেই অবস্থিত। পিন্ডিরা গ্রামটি অজয় নদীর সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত হলেও অনেকখানি উচ্চে এর অবস্থান হওয়ায়, অজয়ের বিধ্বংসী বন্যায় কোন দিন এই গ্রামের কোন ক্ষতি হয়নি।

গ্রামে পোশাকি নাম পিন্ডিরা এবং পাশের গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর হলেও দুটি গ্রামই অপভ্রংশিত হতে হতে লক্ষ্মীপুর > লখীপুর, পিন্ডিরা > পিরিলী হয়ে একত্রে লখীপুর-পিরিলীতে পরিণত হয়েছে। গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, গোপ, সদ্‌গোপ ও অন্যান্যদের সঙ্গে বহু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বাসক্ষেত্র হলেও এখানে মুসলমানও অনেক আছেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হার্দিক সম্পর্কও চিরকালের। গ্রামে মুসলমানদের জন্য রয়েছে মসজিদ্, মোক্তব ও মাদ্রাসা। গ্রামের এক বড় দিঘির পাড়ে বুড়ো পীরের আস্তানাও ছিল। এখনও তার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

হিন্দুদের পুরাকীর্তি ও দেবকীর্তির মধ্যে গ্রামে রয়েছে প্রাচীন শিব মন্দির। নিত্যপূজাসহ সেখানে গাজন পর্বও অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামস্থ নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মনসা পূজার আধিক্য লক্ষ করা যায়। গ্রামে সার্বজনীন দুর্গোৎসব বেশ জাঁকজমকেই অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে প্রস্তর মূর্তির ষষ্ঠী ও তার আটন আছে। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নে দেবীঅন্নপূর্ণা পূজাব আধিক্য রয়েছে।

গ্রামে বিভিন্ন উৎসবে এবং অন্যান্য সময়েও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হয়। যেমন কবিগান, কীর্তন, যাত্রানুষ্ঠানের প্রতিযোগিতা উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি। চাকুরিজীবীও আছে। তাদের অনেকেই কর্ম উপলক্ষে দূর-দূরান্তেও ছড়িয়ে আছে। এমনই এক ব্যক্তিত্ব হলেন অদিতি রায়। ইনি প্রথিত যশা শিক্ষাবিদ। কর্মজীবনে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর হয়ে অবসব নেন। তিনি ইংরাজিতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যেমন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং কোরান অনুবাদ করেন। ইনি বর্তমানে কলকাতার শখের বাজারে অবস্থান করছেন।

গ্রামে দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চবিদ্যালয়, পঞ্চায়েত অফিস ইত্যাদি বর্তমান।

পোষলা ঃ— পোষলা নামে দু'টি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। তাই দক্ষিণের গ্রামটি বড় পোষলা ও তার লাগাও সামান্য উত্তরের গ্রামটি ছোট পোষলা নামে খ্যাত। বড় পোষলা ভাতাড় থানার অধীন এর জে. এল. নং-৭৬ । আর ছোট পোষলা মঙ্গল কোট থানার অধীন। কাটোয়া, বর্ধমান বাস রাস্তার বলগোনা পার হয়ে প্রায় ৩ কি.মি. উত্তরে রাস্তার পশ্চিম দিকে গ্রাম দু'টি অবস্থিত। পাকা রাস্তা থেকে দু'টি পৃথক পৃথক মোরাম রাস্তা ধরে পশ্চিমে এগুলেই গ্রাম দু'টিতে যাওয়া যায়।

গ্রাম দু'টির বিশেষত্ব হল এখানে সারাবছর মানুষের সঙ্গেই সহ অবস্থানে বিরাজিত রয়েছে ৩/৪ হাত লম্বা কালো রং এর মাথায় চক্রধারী বিষধর সাপ। কিন্তু এরা প্রকৃতপক্ষে মানুষ বা জীবজন্তুর কোন ক্ষতিই করে না। এই দুটি গ্রাম ছাড়াও এখানকার আরও কয়েটি গ্রামে এই সর্পকুলের অবস্থান লক্ষ করা যায়। গ্রামগুলি হল— মসারু, পলসোনা, নিগন, সিকত্তর ও মইদান। এই বিশেষ সর্পকুল স্থানীয়ভাবে ঝাঁকলাই বা ঝঙ্কেশ্বরী নামে অভিহিত। এরা এই গ্রামগুলিতে সাক্ষাৎ দেবীমনসা হিসাবেই পূজা পেয়ে থাকেন। মানুষ এদের কোন ক্ষতি করে না বরং শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকে। গ্রামগুলিতে এই সর্পকুল ঝঙ্কেশ্বরী বা ঝাঁকলাই মনসা মূর্তিতে মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন এবং বছরের আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে বাৎসরিক পূজায় মহাধুমধামে পূজিত হন।

গ্রামগুলিতে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা হলেও সব থেকে আকর্ষণীয় ও উল্লেখ্য দেবতা হিসাবে ঝঙ্কেশ্বরীর পূজাই গ্রাম্য উৎসবের রূপ নেয়। তখনই গ্রামগুলিতে

গ্রামবাসীরা আপন আপন আত্মীয়-পরিজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মহাধুমধামে মাতৃজ্ঞানে সর্পকুল ঝঙ্কেশ্বরীকে সাক্ষাৎ মনসারূপে ছাগ বলিসহ বিশেষ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা দিয়ে থাকে।

বড়পোষলায় সামনে ফাঁকা চাতালসহ দেবীর মন্দির বর্তমান। মন্দিরে দেবীর মূর্তির সঙ্গে সহ অবস্থানে রয়েছে অন্যান্য বহু দেব-দেবী। সেখানে বহু স্তূপিকৃত প্রস্তর খণ্ড বহু দেব-দেবীর প্রতিভূরূপে পূজা পেয়ে থাকেন। এদের মধ্যে ধাতুনির্মিত (পিতলের) কোন এক যক্ষিণী মূর্তিও রয়েছে। এই গ্রামে মায়ের বাৎসরিক উৎসবের সময় একটা রীতি চালু হয়ে গিয়েছিল। সেটি হল কোন এক সময় গ্রামের কোন বাড়ির বধু উনানের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকা ঝঙ্কেশ্বরীকে না দেখে উনানে আগুন ধরিয়েছিল ফলে দেবী কূপিতা হয়ে তার বাৎসরিক পূজায় বধূদের গ্রামে থাকা নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু কন্যারা আদরে আপ্যায়িত হত। বর্তমানে কালের প্রভাবে বধূদের বাইরে রাখার প্রথাটি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়েছে। বড় পোষলায় মায়ের বিশেষ পূজায় একটি মেলাও বসে। পূজায় শান্তি শৃঙ্খলা ও মেলা পরিচালনায় গ্রামের যুবগোষ্ঠী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

বড়পোষলার সামান্য উত্তরে রয়েছে ছোট পোষলা গ্রাম। এখানেও দেবীর প্রস্তর মূর্তি বর্তমান। এখানেও মন্দির ছিল তবে তা বেশ ছোট এবং ভগ্ন অবস্থায় এসে গিয়েছিল তাই গ্রামবাসীর উদ্যোগে সেখানে বর্তমানে বেশ সুরম্য মন্দির নির্মিত হয়েছে— যা পাকা রাস্তা থেকেও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের মত এ গ্রামেও একই সময়ে ঝঙ্কেশ্বরীর বাৎসরিক পূজা নানান অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিশেষ ধুমধামেই পরিপালিত হয়ে থাকে।

এখানকার কয়েকটি গ্রামে মানুষের সহ অবদানে থাকা অবাধ বিচরণকারী সর্পকুল ঝাঁকলাই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করেছেন যে, এই সাপ বিষধর। তবুও তাদের কাউকে না কামড়ান ও মানুষের সহ অবস্থানে থাকাটা সত্যই বিস্ময়কর বলে তারাও অভিমত দিয়েছেন। এই বিশেষ ধরনের সাপ এখানের গ্রামগুলিতে থাকায় অন্য কোন বিষধর সাপের সেখানে আবির্ভাব হয় না।

পূবর ঃ— বর্ধমান জেলার আউশ গ্রাম থানার ২ নং ব্লকে ৫১ নং জে. এল এর অন্তর্গত একটি মুসলনাম প্রধান গ্রাম পূরব। গ্রামটি আউশ গ্রাম থানার উল্লেখ্য প্রত্নক্ষেত্র পাণ্ডুরাজার ঢিবির পূর্বদিকে অবস্থিত, মোরবাঁধ-ভেদিয়া বাসে এই গ্রামে নামা যায়। গ্রামে এক নালার পূর্বে এক সমাধি ক্ষেত্রে কোন এক ব্যক্তির সমাধি সৌধ রয়েছে তবে নিকটবর্তী অজয়ের বন্যার প্রভাবে বা অন্য কোন কারণে সেটি হেলে গেছে। এটি ছাড়া গ্রামে একটিই মাত্র পুরাকীর্তি হল গ্রাম মধ্যে অবস্থিত একটি দ্বিতল মসজিদ। মসজিদটি সাধারণ একটি দ্বিতল বাড়ির মতই তৈরি। পূর্বদিকে উপর নীচে

বারান্দা আছে। বারান্দাতেই উপরে ওঠার সিঁড়ি, উপরের ছাদ প্লেন। অন্যান্য মসজিদের মত এর ছাদে কোন গোলাকার গম্বুজ নাই। তবে উপরে বেশ কয়েকটি মিনার আছে যেগুলি শিল্প সুষমায় মণ্ডিত। এর গায়ে উর্দুতে সাল তারিখ লেখা আছে, সেই প্রতিষ্ঠা লিপি অনুযায়ী জানা যায় যে মসজিদটি ১৩৪২ হিজরা অব্দে বা ইংরাজীর ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত। এর অভ্যন্তরে তোরণটি বেশ শৈল্পিক কারুকার্যে মণ্ডিত।

পলসোনা ঃ— মঙ্গলকোট থানার আওতায় এক ঐতিহ্যমন্ডিত গ্রাম পলসোনা। বর্ধমান কাটোয়া পাকা রাস্তায় পোষলার উত্তরের পশ্চিমমুখী মোরাম রাস্তা ধরে মসারুর পশ্চিমে একটি কাঁদরের পুল পার হলেই পলসোনা গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের নাম পলসোনা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে এতদ অঞ্চলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত পঞ্চতীর্থ পণ্ডিত সদ্যপ্রয়াত চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় শুনিয়েছিলেন— পূর্বে এখানে পলসাঁই (সাঁই অর্থে প্রভু) নামে এক বর্ধিষ্ণু জমিদার এই গ্রামে বাস করতেন। তাদেরই নাম থেকে এই গ্রামের নাম পলসোনা হয়।

এই গ্রামের বিশেষত্ব হল, গ্রামে যত্রতত্র ঘুড়ে বেড়াতে দেখা যায় কালো বরণ, মাথায় জাত সাপের মতই চক্র সহ এক ধরনের কেলে সাপকে—যাকে এখানকার স্থানীয় লোকেরা সাপ না বলে 'ঝাকলাই' নামে অভিহিত করেন। আর পাঁচটা গৃহপালিত প্রাণীর মতই এরাও মানুষের সহ অবস্থানে ঘুরে বেড়ায়, কেউ এদের তাড়ায় না এরাও কারও কোন ক্ষতি করে না। এমনকি শিশুর বিছানাতেও এদের অনেক সময় শুয়ে থাকতে দেখা যায় তার জন্য কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

এই সর্পকুলকে জীবন্ত মনসারূপে দেখা হয়। তাই একে দেবী জ্ঞানে 'ঝঙ্কেশ্বরী' নামে নিকটবর্তী ৭টি গ্রামে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে বিশেষভাবে পূজিত হয়ে থাকে। সাতটি গ্রাম হল— "মসারু, পলসোনা, দুই পোষলা গ্রামেতে সিকওর, মইদান, আর নিগনেতে"। (২৫) তবে সাতটি গ্রামের মধ্যে মাত্র চারটি গ্রাম— বড় পোষলা, ছোট পোষলা, মসারু ও পলসোনা গ্রামে মায়ের প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে সেখানে দর্শনীয় দেবী মন্দির তৈরি হয়েছে। অতি সম্প্রতি ছোট পোষলা গ্রামেও দেবীর বৃহৎ মন্দির তৈরি হয়েছে, যা পাকা রাস্তা থেকেও দেখা যায়।

এখানকার মন্দিরে ছোট আকারের দেবী মূর্তির সঙ্গে আরও বহু আকার বিহীন প্রস্তর খণ্ড বর্তমান। এখানেই দেবীর মাথায় পিতালের সর্প বর্তমান। প্রয়াত পণ্ডিতের পরিবারই দেবী পূজার দায়িত্বে আছেন। এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের ডঃ গোপীকান্ত কোঙার সম্পাদিত বর্ধমান সমগ্র গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪০৫-১৩ পৃষ্ঠায় লেখকের লেখা প্রবন্ধ 'জীবন্ত বিস্ময় ঝঙ্কেশ্বরী' দেখতে অনুরোধ জানাই।

পালিশগ্রাম ঃ— থানা মঙ্গলকোটের ৬/৭ কি.মি. উত্তর পূর্বে পালিশ গ্রামের অবস্থান। এর জে.এল. নং ৮১। নতুন হাট-কাটোয়া বাস রাস্তা ধরে এই গ্রামে যাওয়া

যায়। বাসরাস্তা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত ছুয়ে এগিয়ে গেছে। গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। এটি এক প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

এই গ্রামেই অবস্থিত রয়েছেন পালিশ ক্ষেত্র নামে এক শিব। এই শিবের নাম থেকেই গ্রামের নাম 'পালিশগ্রাম' হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানে শিবমন্দিরটি ভগ্ন দশায় এসে গেছে। অচিরে সংস্কার না করলে যে কোন সময় মুখ থুবড়ে পড়ার সম্ভাবনা। গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা যথা নিয়মে ও যথা সময়ে হয়ে থাকে তবে উল্লেখ্য গ্রাম্য উৎসব হল ধর্মরাজের গাজন। ঐ ধর্মরাজের আটন ক্ষেত্রও দৈন্য অবস্থায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রামের যুবগোষ্ঠীর উদ্যোগে বর্তমানে তা সুন্দর ভাবেই সুসংস্কৃত হয়েছে।

এখানকার ধর্মরাজ প্রসঙ্গে বলা যায় এই দেবতা সারা বছর গ্রামে থাকেন না, পাশের গ্রাম খুদরুনে অবস্থান করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় তাকে গ্রামে এনে তার প্রথম গাজন মহাধুমধামে এই গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে মাথরুনে ফিরে যাওয়ার পর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় সেখানে তার ২য় বার গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামটি অজয় সান্নিধ্যে (অজয়ের দক্ষিণে) অবস্থিত হওয়ায় এখানকার ক্ষেত্র বেশ উর্বর। তাই কৃষি প্রধান গ্রামে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি বেশ লক্ষণীয়। গ্রামের অধিকাংশই কৃষিজীবী। চাকুরিজীবীর সংখ্যা কম হলেও একেবারে নগণ্য নয়। এ গ্রাম সবিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ। একদা মাথরুন হাইস্কুলে পড়াশুনার সময় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ব্যবস্থাপনায় তার এক প্রাক্তন ছাত্র রেহমন সেখের বাড়িতে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম বাল্যে বহুদিন এখানে অবস্থান করেছিলেন। রেহমন সেখের স্ত্রী স্নেহময়ী কোবরা বিবি কবিকে সস্নেহে পালন করেছিলেন [২৬]।

গ্রামে মুসলমান অধিবসতি থাকায় এখানে মসজিদও রয়েচে। 'গাঁয়ের দিঘি'র দক্ষিণ পাড়ে বাসস্ট্যান্ডের লাগাও কয়েকটি তেঁতুল বৃক্ষের ছায়া ঘেরা শান্ত পরিবেশে মুশাফির পীরের আস্তানা বর্তমান। সেখানে একটি ছোট্ট একতলা দালান, পীরের আটন রূপে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। সেখানে বেশ কিছুটা জায়গা বাঁধিয়ে পথিকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানত হিসাবে সেথায় প্রচুর পরিমাণে পোড়ামাটির ঘোড়ার সমাবেশও লক্ষ করা যায়। মুসাফির পীরের আস্তানায় পীরের তিরোধান দিবস উপলক্ষে তার বাৎসরিক উরস পালিত হয় মাঘী পূর্ণিমার দিনে। সেদিন এখানে বহুলোককে পাতাপেড়ে খাওয়ান হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পীরের মানত হিসাবে উরসের দিন সিন্নি থেকে শুরু করে পাটালি বাতাসা মুরগি ও ছাগ উৎসর্গ করে যায়।

ঐ সময় উরস উৎসবকে কেন্দ্র করে তখন এখানে একটি বেশ বড় ধরনের জাঁকাল মেলাও বসে এবং কয়েকদিন ধরে তা অবস্থান করে। লোক পরম্পরায় জানা

যায় এই উৎসব প্রায় শতাধিক বছরের প্রাচীন। পীরের সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী লোক মুখে প্রচলিত আছে।

প্রাচীন এই গ্রামে এতদ অঞ্চলের চাহিদা পুরণের জন্য এখানে সপ্তাহে ছয়দিন গ্রামের মধ্যস্থলে হাট বসে, ফলে সেই স্থান হাটতলা নামে খ্যাত। গ্রামে একটি উচ্চবিদ্যালয়ও আছে। এখানে বহুজ্ঞানী গুণী লোকের বাস। গ্রামের উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং বিশিষ্ট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক অনাদি রক্ষিতের বাসভূমিও বটে।

পিলসোয়া ঃ— মঙ্গলকোট থানার ৪৬ নং জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম পিলসোয়া। গ্রামটি পশ্চিম মঙ্গলকোটের পাকখাওয়া কুলুর নদীর উত্তর ও পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখান থেকে সামান্য উত্তরেই রয়েছে গোপভূমের উল্লেখ্য নদী অজয়। ফলে গ্রামটি অজয় ও তার উপনদী কুলুরের বন্যায় বিধ্বস্ত এবং শ্রীহীন। গ্রামটি হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত বসতক্ষেত্র। মুসলমানদের মধ্যে মিঞারা এবং হিন্দুদেব মধ্যে গোস্বামীরা বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিল। তবে গ্রামের অনেকেই বন্যার ভয়ে আজ গ্রাম ছাড়া।

আজ থেকে প্রায় তিনশ' বছর আগে বর্ধমান রাজ পরিবারের সময় কালে এই গ্রামেই নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর গোস্বামী পরিবারের যাদবিন্দু গোস্বামীর চতুর্থপুত্র রূপে শ্যামসুন্দর গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। ইনি প্রকৃতিতে ছিলেন আপন ভোলা খেপাধুপো গোছর মানুষ। তার মুখ দিয়ে অনেক সময় লালাও বের হত। আলা ভোলা গোছের লোক ছিলেন তিনি, তাই তিনি আউল খেপা বা আউল চাঁদ নামে সমধিক পরিচিত ছিল। খ্যাপাটে স্বভাব থাকায় ছোট বেলা থেকেই রাখাল বাগালের সঙ্গেই সারাক্ষণ খেলা-ধুলা করে মাঠে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন এক প্রকৃষ্ট আধ্যাত্মিক সাধক। তাকে ঘিরেই গ্রামের পরিচিতির বিস্তার ঘটেছে।

তিনি আসলে একজন সাধক। ফল্গুধারার মত অন্তঃসলিলা তার সাধন ধারা। তবুও সাধন সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ রূপে বহু অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের বিচ্ছুরণ প্রায়শই লক্ষ করা যেত। এখনও লোকের মুখে মুখে সেই সব অচিন্তনীয় এবং অতীন্দ্রিয় কাহিনী সমূহ মুখে মুখে ঘুরছে তারই সামান্য নমুনা। যেমন—

শোনা যায় তিনি রাখাল বালকদের সঙ্গে খেলা করতে করতে নদীতে ডুব দিয়ে নিখোঁজ হতেন। তখন বাড়িতে সে কথা জানাতে গিয়ে দেখা যেত তিনি বাড়িতেই রয়েছেন। চাষীদের মাঠের ফসল ছিড়ে খুঁড়ে নষ্ট করে দিতেন। তার বাড়িতে অভিযোগ জানালে মাঠে গিয়ে দেখা যেত কোন কিছুই ক্ষতি হয়নি সবই নিখুঁত আছে। তার দুরন্তপনার জন্য তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে এমন সময় চাষীরা এসে অভিযোগ জানাল যে আউলচাঁদ তাদের মাঠের ফসল এই মাত্র নষ্ট করে এল। সে কথা শোনার

পর সঙ্গে সঙ্গে ঘর খুলে দেখা গেল তিনি তখনও গৃহবন্দী অবস্থায় মিটি মিটি হাসছেন!

বর্ধমানের কোন রাজা আউলচাঁদের পিতার শিষ্য ছিলেন, তিনি একবার সস্ত্রীক পালকি যোগে এখানে এলে রাণী আউল চাঁদের লাল ঝোল পড়া বিকৃত মুখভঙ্গী দেখে মুখ বাঁকিয়ে ছিলেন। তার ফলে রাণীর নাকি মুখ বেঁকে গিয়েছিল। পরে আউল চাঁদের কাছে অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে তা সেরে যায়। এই সাধকের বহু অলৌকিক কার্যকারিতা প্রচার হওয়ায় একদিন এক মুসলমান সাধক রায়পীর সাহেব তার সঙ্গে বাঘে চেপে দেখা করতে আসছেন বুঝতে পেরে ভাঙা পাঁচিলে বসে দাঁতন করাকালীন তিনি দাঁতন কাঠি ফেলে দিয়ে সেই পাঁচিলকেই আদেশ করেন তাকে সাধক সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে। ফলে উভয়ের মিলন হওয়ায় রায়পীর সাহেব তাকেই বড় সাধক হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। কারণ যেহেতু তিনি অচল বস্তুকেও সচল করতে পেরেছিলেন বলে (অনুরূপ কাহিনী এই গোপভূমের ভরতপুরের নিকট শিলামপুরের দুই সাধক বালাখা সইদ ও সত্যনারায়ণ গোস্বামী সম্পর্কে চালু আছে)।

সেই খেপা গোঁসাই আউলচাঁদের তিরোধান দিবস উপলক্ষে পৌষ সংক্রান্তির দিন তার বংশের পরবর্তী বংশধরদের প্রচেষ্টায় এবং গ্রামবাসীর সহযোগিতায় প্রতিবছর ঐ দিন আউলচাঁদের সমাধি মন্দিরে তার স্মৃতি তর্পন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তাকে কেন্দ্র করে কুনুর নদীর তীরে বাবলা বকুল বটের ছায়ায় ঐ দিন বিশাল মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাতে কয়েক হাজার লোক প্রসাদ পেয়ে থাকে। তবে যেহেতু রাখালগণের সঙ্গেই আউলচাঁদ বেশি মেলামেশা করতেন, তাদের সঙ্গেই ছিল তার হার্দ সম্পর্ক তাই সর্বাগ্রে রাখাল ভোগ নিবেদিত হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই তখন এখানে একদিনের জন্য ছোটখাট একটি মেলাও বসে। বর্তমানে আউলবাবার স্মৃতি মন্দিরটি বংশের সুযোগ্য এক বধূ মাতা প্রভাংশু বালা গোস্বামীর সৌজন্যে ১৪০৯ সালের ১৪ই ফাল্গুন সুসংস্কৃত হয়েছে। সমাধি মন্দিরের অভ্যন্তরে দণ্ডধারী আউলচাঁদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত রয়েছে। মন্দিরটি আটচালা শিবমন্দিরের ধাঁচে তৈরি।

গ্রামে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা ও তাদের মন্দির রয়েছে। একটি শিবমন্দির ও একটি গোপাল মন্দির। ঐ দুই বিগ্রহের নিত্য সেবা হয়ে থাকে। নীলের দিনে শিবের বিশেষ পূজাও হয়। তাছাড়াও গ্রামের পশ্চিমে বেশ কয়েকটি বৃক্ষের ছায়াবগুণ্ঠনে অবস্থিত ধর্মরাজ মন্দির। মন্দিরটি উত্তর দুয়ারী ছোট মন্দির, তবে তার সামনে ১৪টি পিলারের উপর সংস্থাপিত ছাদ বিশিষ্ট আটচালা রয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে গাজন উৎসব পালিত হয়। ভক্তও হয়। দৈহিক নির্যাতনের মধ্যে বানফোঁড়া সহ অন্যান্য কৃত্যাদিও অনুষ্ঠিত হয়। এখানে গ্রাম সাধারণের ধর্মরাজ কমিটির একটি বাড়িও আছে। সেখানে একটি রথও আছে। যাতে চড়িয়ে ধর্মরাজ ঠাকুরকে মুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া

হয়। ধর্মরাজ পূজাই গ্রামর গ্রাম্য উৎসব। ঐ সময় নানান কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠান, যেমন— যাত্রা কবিগান ইত্যাদি হয়ে থাকে।

পরিশা ঃ— আউশগ্রাম ২ নং ব্লকের আওতায় বুদবুদ থানার অধীন গ্রাম পরিশা। ভাতকুন্ডা থেকে দেবশালা যাবার পথে রাস্তার উত্তরে জঙ্গল মহলের স্বাভাবিক আবেষ্টনে এর অবস্থান। গ্রামের মধ্যে বহু দেব দেবীর ঘন সন্নিবেশ গ্রামটির প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয়। এর জে. এল. নং-৩০।

গ্রামে এখন যেখানে রক্ষাকালী, সিদ্ধিকালী ও দুর্গামন্দির বর্তমান, একদা সেখানে ছিল শ্মশান ভূমি। বর্তমানে তা অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্বের সেই শ্মশানে এক মহাসাধক যাগযজ্ঞ সহকারে কালীর পূজা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাই সেই কালী সিদ্ধকালী নামে খ্যাত। এখানকার এক বিশাল মন্দিরে প্রস্তর নির্মিত প্রায় দেড় হাত উচ্চতা বিশিষ্ট রটন্তীকালী মূর্তি বিদ্যমান। ঐ মন্দিরকে ঘিরে বর্তমানে চারিদিকে বসতি গড়ে ওঠায় এখন ঐ স্থান গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে পরিণত হয়েছে।

এই মন্দিরের পূর্ব দিকে রয়েছে স্বরূপ নারায়ণ ধর্মরাজের মন্দির। জ্যৈষ্ঠের দশহরায় এর গাজন সমাধা হয়ে থাকে। গাজনে অনেক ভক্ত হয়। সেখানে নানা শারীরিক কৃচ্ছসাধন প্রক্রিয়ার মধ্যে পাটাভাঙা একটি উল্লেখ্য প্রক্রিয়া। ৪টি উচু বাঁশ গেড়ে তার উপরে পাটা দিয়ে মাচা তৈরি করে তার উপরে উঠে পিছন দিকে হাত বেঁধে নীচে রাখা কুটুরীর বস্তায় ঝাপ দিয়ে পড়ে—একেই পাটা ভাঙা বলা হয়। এই গাজনে আর এক উল্লেখ্য কৃত্য হল তাল গাছ উপড়ানো। নিকটবর্তী দেবশালায় শিবের গাজনে এবং লবণ ধারাতেও ঐ ধরনের আধানে তাল গাছ তোলার রীতি আছে। এখানকার বড় মন্দিরেই রয়েছে মনসা ও দ্বিভুজ ভদ্রকালী মূর্তি। এখানে দক্ষিণা কালীর পূজা এবং রটন্তী চতুদর্শীতে রটন্তী কালীপূজা বিশেষ ধুমধামে পালিত হয়।

বড় মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে শ্যামসুন্দরের প্রাচীন বিষ্ণু মন্দির বর্তমান। তবে মন্দিরটির আশু সংস্কার প্রয়োজন। মন্দিরটির সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত দেবমূর্তি বড় মন্দিরেই রাখা আছে। শ্যামসুন্দর মন্দিরের সামান্য পূর্বে এক খড়ের চালের শিব মন্দিরে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের ১০৮টি শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত হয়েছে। অনুমান করা যায় বহু স্থানের বহু শিবলিঙ্গের ঠিক মত পূজা অর্চনা না হওয়ায় সেগুলি এখানে প্রদত্ত হয়েছে ফলে এটি যেন শিবলিঙ্গের সংগ্রহ শালায় পরিণত হয়েছে।

এছাড়াও গ্রামে আরও কয়েকটি শিবমন্দির রয়েছে। গ্রামে রয়েছে একটি মন্দিরে দেবীমনসার প্রস্তর মূর্তি এবং সেই মন্দিরেই সহবস্থানে রয়েছে নারায়ণ শিলা। এখানে দ্বিভূজ মনসার মাথায় রয়েছে এক সর্পের অষ্টফণার বিস্তৃত ছত্র। এখানে উভয় দেবতারই নিত্য পূজা হয়। মনসার মানত থাকলে বলি দেওয়া হয়, তখন নারায়ণ

শিলাকে অন্যত্র সরিয়ে রাখা হয়। লোক বিশ্বাস, সর্পাঘাতে দেবীর স্নানজল নিলেই বিষক্রিয়া হয় না। তবে সারবার না হলে স্নান জল পেতেও বহু বিঘ্ন দেখা দেয়।

এই গ্রামের চ্যাটার্জী ও মুখার্জীদের দু-বাড়িতেই ছিল তাদের আরোধিত সাত পুতুলের ধাতব (পিতল) দুর্গামূর্তি। কিন্তু বছর দশেক হল সে মূর্তি দুটিই একই সঙ্গে চুরি হয়ে যায়। তবুও কৃষিপ্রধান এই গ্রামে প্রচুর দেববিগ্রহ বর্তমান। সে দিক থেকে বীরভূম জেলার ঘুরসে গ্রামে যেমন পুকুরের আধিক্য রয়েছে বলে খ্যাতি আছে, তেমনি বর্ধমান জেলার এই গ্রামেও রয়েছে প্রচুর দেববিগ্রহ। তাই এই গ্রাম সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রবাদ শোনা যায় সেটি হল—

পরিশার ঠাকুর।
ঘুরসের পুকুর।

পূর্বতটী ঃ— আউশগ্রাম থানার ২ নং ব্লকের জঙ্গল মহল এলাকার অন্তর্গত গ্রাম পূর্বতটী। জে. এল. নং-৩৯। নিকটবর্তী নদী কুনুরের পূর্বতটে অবস্থিত হওয়ায় গ্রামের নাম হয়েছে পূর্বতটী। বেশ কাব্যিক নাম তাতে সন্দেহ নাই। তবে গ্রামটি অতীতে এখানে ছিল না বা নামও পূর্বতটী ছিল না। পূর্বের নাম ছিল গোপীকান্তপুর। তখন গ্রামটি ছিল আরও পশ্চিমে নদীর কাছাকাছি। প্রমাণ হিসাবে বলা যায় গ্রামের উল্লেখ্যযাগ্য পুকুরগুলি যেমন হাজরা পুকুর, বোষ্টম পুকুর, বিশ্বাসগড়ে, শুঁড়ি পুকুর, মোড়ল পুকুর ইত্যাদি পুকুরগুলি সবই বর্তমান গ্রামের পশ্চিমদিকে অবস্থিত, অতএব মূলগ্রাটিও ঐ সকল পুকুরগুলিকে ঘিরেই আরও পশ্চিমেই ছিল। সেই সঙ্গে হাজরা, বৈষ্ণব, বিশ্বাস ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বাসও গ্রামে ছিল কিন্তু এখন আর নাই, তবে শুঁড়ি ও সদ্গোপসহ গ্রামে প্রচুর পরিমাণে পল্লবগোপেদের বাস রয়েছে। একদা গোপভূম পরগণার এই অঞ্চলের বহু গ্রামেই গোপ বা গোয়ালাদের বসবাস ছিল তা পার্শ্ববর্তী গ্রাম রামচন্দ্রপুরে গয়লাসোল নামে মাঠে, বড় চাতরা গ্রামে গয়লাবাঁধ নামে পুকুর বা পাড় এবং মিরশা ঢুকতে বীর মাতার সঙ্গে গোপরাজা ইছাই ঘোষের নামের স্মৃতি এবং গয়লাডাঙা নামে গ্রামই তার প্রমাণ দেয়।

পূর্বে গ্রামটি আরও পশ্চিমে কুনুরের গায়েই ছিল কিন্তু বন্যার প্রকোপে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্যই হয়ত গ্রামবাসীরা অপেক্ষাকৃত উচু বলেই নিরাপদ স্থান হিসাবে এখানে বসতি গড়েছে। সেদিন থেকে গ্রামটিকে নবীন বলে মনে হলেও গ্রাম্যদেবতা ধর্মরাজের পূজার জন্য বর্ধমানের রাজাদের জমিজমা দেওয়ার নিরিখে গ্রামটি যে কম করেও তিনশ বছরের মত প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই।

গ্রামে ধর্মরাজের গাজন ছাড়াও শিবের পূজা। দুর্গা পূজা, কালী, মনসা, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, কার্তিক ইত্যাদি দেবদেবীর পূজাও বেশ আড়ম্বরেই হয়েই থাকে। সেদিক থেকে গ্রামে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য থাকলেও ইদানিংকালে বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান হিসাবে চব্বিশ প্রহরও শুরু হয়েছে।

শিক্ষাদীক্ষা প্রসঙ্গে বলা যায় গ্রামটি শিক্ষায় এখনও তেমন উন্নত নয়, তবে ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করছে। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। নিকটবর্তী হাইস্কুল বলতে বননবগ্রামে ছেলে মেয়েদের যেতে হয়। চাষআবাদই এখানকার লোকেদের প্রধান জীবিকা। ক্যানেলের সুবিধা থাকলে ভাল হত কিন্তু সে সম্ভাবনা নেই। জঙ্গল মহলের মধ্যে অবস্থিত এই গ্রামের নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা জঙ্গল থেকে শালপাতা সংগ্রহ করে এনে তা থেকে শাল পাতা তৈরি করে বাজারে চালান দিয়ে থাকে, ফলে এই প্রক্রিয়া বহুজনের জীবিকার একটা উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতাপপুর ঃ— একদা গোপভূমের গোপরাজাদের রাজধানী ভাল্কীর পশ্চিমে, নয়নাভিরাম পরিদর্শন ক্ষেত্র, তথা পিকনিক স্পট 'মাচান' অতিক্রম করে পশ্চিমে মোরাম রাস্তা ধরে শাল পিয়ালের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ৫/৬ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে যাবার পর আরণ্যক পরিবেশে এক পল্লীব সন্ধান মেলে— সেই পল্লীই প্রতাপপুর। এর জে. এল. নং-৬১। বনজঙ্গলে পরিবৃত ছাড়া ছাড়া পাড়া নিয়ে প্রতাপপুর গ্রামের অবস্থান। এটি আউশ গ্রাম ২নং ব্লকের অধীন।

সুয়াতার বহমনী পীরের সঙ্গে সদগোপ রাজাদের যুদ্ধ এই গ্রামের ডাঙাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে দিক থেকে গ্রামটি ঐতিহ্যবাহী। কিন্তু গ্রাম ঘুরে তেমন কোন প্রাচীন পুরাকীর্তি সন্ধান মেলে না। গ্রামে পুরাকীর্তি বলতে একটি সাধারণ গড়নের শিবমন্দির লক্ষ করা যায়। ঐ শিবমন্দির লাগাও এক বাড়িতে বেশ কিছু গৃহদেবতা বর্তমান, যেমন— ভবানী, মনসা, লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি। শিবমন্দিরে পূজিত শিব ক্ষয় হয়ে গেছে, আরও কয়েকটি ভগ্ন শিবলিঙ্গ মন্দির মধ্যে অযত্নে পড়ে আছে। গ্রামকে ঘিরে কয়েকটি বড়সড় পুকুর বর্তমান— তার মধ্যে উল্লেখ্য হল ঠাকরুন পুকুর। গ্রামের দক্ষিণে এক মনোরম স্থানে, বর্ধমানাধিপতি উদয় চাঁদ মহতবের মহান্ত স্থলের কোন মহান্ত ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়ে এই মনোরাম স্থানে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় বহুদিন বসবাস করেছিলেন।

গ্রামের কবিরাজ পরিবারের গৃহদেবতা ছিলেন লক্ষ্মীজনার্দন। এই পরিবার কোন অতীতে কবিরাজী চিকিৎসা করার জন্য কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। আসলে এরা সদ্গোপ গোষ্ঠীভুক্ত। তখনকার দিনে সদ্গোপ বাড়িতে ব্রাহ্মণরা পূজা করতে চাইতেন না। কোন এক ব্রাহ্মণকে তাদের বাড়িতে পূজা করতে বলায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, সদ্গোপদের বাড়িতে পূজা করতে হলে দিন একখানি সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। এই অপমানকর উক্তিতে ক্ষুদ্ধ হয়ে সেই কবিরাজ গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন বুকে বেঁধে কাটোয়ায় গঙ্গাতে নিক্ষেপের সংকল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করলে প্রভাতেই ভাল্কী গ্রাম অতিক্রমকালে গ্রামের সদ্ ব্রাহ্মণ সুরথ ব্যানার্জী সেই বিগ্রহের পূজা করতে রাজী হলে, কবিরাজ সেই বিগ্রহ তাকেই দিয়ে যান। সেই বিগ্রহ আজও ভাল্কীর সুরথ

ব্যানার্জীর পরবর্তী বংশধর জিতেন ব্যানার্জী কর্তৃক পূজিত হচ্ছেন। তবে এখনও বিশেষ উৎসব ও অনুষ্ঠানাদিতে কবিরাজরা সেই বিগ্রহ নিজ বাড়িতে নিয়ে সেবাপূজা করে থাকেন।

এই গ্রামেই এক শেওড়া ও বট বৃক্ষের আচ্ছাদনে রয়েছে মনসাবুড়ির আটন। সামনেই প্রতাপপুর পাঠচক্র ক্লাব। সামান্য সিমেন্ট বাধানো আটনে মনসার পূজা হয়। নিত্যপূজা হয় না। তবে ভক্তদের মানত থাকলে পূজা হয়ে থাকে। পাঁঠা বলি দিয়ে কোন বাৎসরিক বিশেষ পূজা হয় না। গ্রামের প্রান্ত সীমায় শিলারূপী রক্ষাকালী মায়ের অবস্থান। এখানেও গ্রামের লোক পূজাদি দিয়ে থাকে। ইনি খুব জাগ্রত দেবী। লোকশ্রুতি, ক্যানেল কাটার সময় কনট্রাকটারের কাছে বিশেষ পূজা নিয়ে তবে ক্যানেল কাটতে দিয়েছিলেন।

গ্রামটি কৃষিপ্রধান। অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজে ব্যস্ত। ঘন জঙ্গলের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাম। তবে ইদানীং মোরাম রাস্তার মাধ্যমে বননবগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে অভিরাম পুর হয়েও যাওয়া যায়। তবে বননবগ্রাম ৬ কি. মি. আর অভিরাম পুর ৯ কি. মি.। বরাবর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় গ্রামের তেমন কোন উন্নতি নাই।

পূর্বে এখানে কেনারাম ডোম নামে এক ডাকাত ছিল, তার প্রতাপে এই গ্রামে অন্য কোন ডাকাত দল ঢুকতে পারত না, পরে আর এক প্রতাপশালী ব্যক্তি প্রতাপ চক্রবর্তীর কথা শোনা যায়, তিনিও ক্ষমতায় ডাকাতদের মত দুর্ধর্ষ ছিলেন। এ সকল প্রতাপশালী দুর্দম্য ব্যক্তিদের অবস্থান হেতুই হয় এই গ্রামের নাম প্রতাপপুর হয়ে থাকতেও পারে।

পঞ্চমুহুলী ঃ— আউশ গ্রাম ২নং ব্লকের উল্লেখ্য গ্রাম মানকরের উত্তরে অবস্থিত পঞ্চমুহুলী একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের জে. এল. নং-৮৭। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই গোপ সম্প্রদায় ভুক্ত, কিছু বাগ্‌দিও আছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ ছিল না তাই দেবকার্য পরিচালনার জন্য একঘর ব্রাহ্মণ অন্যত্র থেকে নিয়ে গিয়ে গ্রামে বসানো হয়েছে। এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা চাষআবাদ হলেও গোপ সম্প্রদায়ের অনেকেই দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাত দ্রব্যাদির ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। গ্রামে চাকুরিজীবী নাই বললেই চলে। ইদানীং দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠায় সেখানে ২/১ জন চাকুরি করেন।

পারাজ ঃ— বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর যাবার পথে জি. টি. রোডের গায়ে লাগাও পারাজ গ্রামের অবস্থান। এটি ৪৮ নং জে. এল. ভুক্ত গ্রাম। গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয় যে 'পারাজ' কথাটি ফারসি শব্দ যার অর্থ সম্ভ্রান্ত অতিথি অথবা উচ্চ রাজকর্মচারীকে দেওয়া ভূমি [২৭]। সেদিক থেকে গ্রামটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম এবং বর্ধিষ্ণুও বটে। গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস এবং বেশ

কয়েকটি পাড়ার সমন্বয়ে গঠিত, শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ উন্নতমানেব। কৃষিপ্রধান হলেও অনেকেই চাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন।

সমগ্র গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর আটন। গ্রামে উল্লেখ্য দেবদেবীরা হলেন শিব, দুর্গা, কালী ও শীতলা। তবে শিবঠাকুবই এখানে বিশেষ ধুমধামে পূজিত হযে থাকেন। তাই শিবরাত্রিতে এখানে বিশেষ উৎসব শুরু হয়ে যায। সেই উৎসবকে কেন্দ্র করেই তখন এখানে কয়েকদিনের জন্য একটি মেলাও বসে। বিভিন্ন কামনা বাসনা নিয়ে আশুতোষ শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য গ্রামের ও আশপাশের বহু গ্রাম থেকে লোক সমাগম হয়, বিশেষ করে মেয়েদের সমাগমই বেশি হয়ে থাকে। শিবরাত্রির ব্রত উদযাপনের জন্য দূরাগত বহু মহিলারা এখানে রাত্রি যাপন করেন, ব্রতান্তে পরের দিন তারা বাড়ি ফেরেন। তাই রাত্রে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পরশুড়া ঃ— গলসী থানার অধীন ১২৮ নং জে. এল. ভুক্ত পরশুড়া গ্রামটি স্টেশন থেকে তিন কি.মি. এব মধ্যেই অবস্থিত। গ্রামটি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাস ক্ষেত্র। গ্রামে দেবদেবীর মন্দিরাদির তেমন সমাবেশ না থাকলেও গ্রাম মধ্যে হরিপুর নামে এক আশ্রম বর্তমান রয়েছে।

গ্রামে বিভিন্ন সময়ে বহু দেবদেবীর পূজা যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন— শ্রাবণ মাসে হয় মনসাপূজা। কার্তিকে রাস উৎসব ও কালীপূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন আর আশ্বিন মাসে মহাসমারোহে পূজিত হয় দুর্গোৎসব। এই দুর্গোৎসব ঐ গ্রামের প্রধান উৎসব হিসাবে পালিত হয়। তাই তখন এখানে চার দিন ব্যাপী একটি মেলাও চলতে থাকে।

পাণ্ডুক ঃ— বর্ধমান জেলার আউশ গ্রাম ২ নং ব্লকের আওতাধীন গ্রাম পাণ্ডুক। এর জে. এল. নং-৫২। ভেদিয়া-মোড় বাঁধ পাকা রাস্তা ধরে গ্রামে যাওয়া যায়। প্রত্যন্ত পল্লীগ্রাম হলেও বর্তমানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোনে গ্রামটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানের পি. পি. ডি. হাইস্কুলের পূর্বগায়ে এক উঁচু ঢিবি বর্তমান— যা পাণ্ডুরাজার ঢিবি নামে খ্যাত। সেখানে ১৯৬২-৬৫ পর্যন্ত খনন কার্যের দ্বারা বহু প্রত্ন দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় অজয় তীরবর্তী এই এলাকা যে তিন হাজার বছর আগের তাম্রযুগীয় সভ্যতার দ্যোতক ছিল তা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই পুস্তকের 'প্রত্নক্ষেত্র' অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে তাই সে প্রসঙ্গে আর যাওয়া হল না।

অনেকের মতে গৌতম বুদ্ধের খুল্লতাত পাণ্ডু শাক্যের রাজধানী ছিল এই এলাকা তাই এর নাম পাণ্ডুক [২৮]। এই গ্রামে ঢিবির পূর্ব গায়ে কয়েকটি শ্যাওড়া গাছের নীচে ইতস্তত ছড়ান, পাতলা ইঁটের স্তূপে পড়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন পুরাকীর্তি।

তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল প্রায় ৬ ফুটের মত উঁচু কালো পাথরের বিষ্ণুলোকেশ্বরের ভগ্নমূর্তি—যা শায়িত অবস্থায় পড়ে আছে এবং এর কোমর থেকে পায়ের পাতার উপরের অংশ পর্যন্ত ভগ্ন। এর চালির গায়ে নীচের দিকে দু'টি দণ্ডায়মান নারী মূর্তি, তাদের মাথার উপর দিকে দুপাশে দুটি করে পদ্মাসনে উপবিষ্ঠ বৌদ্ধ মূর্তির মত মূর্তি রয়েছে। উপরের চালিটাও ভাঙা, এর একেবারে নীচের দিকেও একটি নারী মূর্তি দেখা যায়।

এর পাশেই কালো পাথরের ৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এক নগ্ন জৈন মূর্তি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে। এই মূর্তিগুলিকে অনেকেই খ্রিষ্ট্রীয় দশম শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেন। এদের নিয়মিত পূজা না হলেও মূর্তিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে তেল সিন্দুর লেপা আছে এবং আশ্বিন মাসে মহানবমীতে মহা সমারোহে এখানে বড়াই চণ্ডীর পূজা হয়ে থাকে। এই গ্রামের প্রদ্যোত কুমার চট্টোপাধ্যায় এর বাড়িতে এখানকার চণ্ডী মূর্তির খণ্ডিত অংশ অর্থাৎ খণ্ডিত বড়াই চণ্ডীর পূজা হয়ে থাকে। কালা পাহাড় কর্তৃক বড়াই চণ্ডী খণ্ডিত হয়েছিল বলে লোকবিশ্বাস। দেবী নিত্য পূজিতা হলেও এখানেও বিশেষ পূজা মহানবমীতেই হয়। দেবী বরাহবাহিনী বলেই দেবীর নাম 'বড়াই চণ্ডী'। মূর্ছারোগের প্রতিকারে কেবলমাত্র মহানবমীর দিনেই পূজকরা কবজ দিয়ে থাকেন।

পাণ্ডুক গ্রামে ধর্মরাজের পূজাও হয়ে থাকে বুদ্ধ পূর্ণিমায়। পূজক হলেন ডোমেরা। নিত্যপূজা ব্রাহ্মণরা করলেও বিশেষ পূজা (মহানবমী ও বুদ্ধ পূর্ণিমায়) ডোমেরাই করে থাকে। এই পূজায় ব্যায় নির্বাহে বর্ধমানের রাজাদের অবদান ছিল। গ্রামে কার্তিক মাসে মেটেদের বাড়ির কালীপূজাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শোনা যায় একদা এখানকার মেটেরা ডাকাতি করতে গিয়ে মুলুক থেকে এক পাথুরে কালীমূর্তি চুরি করে এনেছিলেন। সে মূর্তি থাকলেও এখন ১২/১৩ হাত উঁচু বিশাল মৃন্ময়ী কালী মূর্তি পূজিত হয়। এর বিশেষত্ব হল মূর্তির বাঁ পাটি এগিয়ে থাকে, কার্তিক মাসের অমাবস্যার পরের দিন প্রতিপদে এর পূজা হয়, আর পূজায় এখনও কিছু চুরি করা দ্রব্য উপাচারের প্রয়োজন।

গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। বহুদেবদেবীর পূজা ও মন্দিরাদিও আছে। তবে চৈত্র মাস ৫ দিন ধরে গ্রামে হরিনাম মহামহোৎসব পালিত হয়। তাকে ঘিরে তখন গ্রামে একটি জমাটি মেলাও বসে। গ্রামের মাঝ দিয়ে রাস্তা বিস্তৃত হওয়ায় কৃষি প্রধান এই গ্রামটিতে ব্যবসা বাণিজ্যের ছোঁয়া লেগেছে।

পাণ্ডুদহ ঃ— বুদবুদ থানার ৪৮ নং জে. এল. ভুক্ত এক নবসৃষ্ট গ্রাম পাণ্ডুদহ। বুদবুদ থেকে ৪/৫ কি. মি. দক্ষিণে বর্তমান গ্রামের অবস্থান। কিছুদিন আগেও বুদবুদ এমুনেশন রোডের ভিতর দিয়ে সোজাসুজি দক্ষিণে এই গ্রামে যাওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে সে পথ বন্ধ হওয়ায় বুদবুদের সামান্য পূর্বে জি. টি. রোডের সুখডাল মোড় থেকে ভেঙে তিল ডাঙ্গার ভিতর দিয়ে ডি. ভি. সি মেন ক্যানেলের পাড় বরাবর

পশ্চিমে অগ্রবর্তী হয়ে প্রাচীন পাণ্ডুদহ গ্রামের নিকট ক্যানেল অতিক্রম করে যে রাস্তা দক্ষিণে কসবা পর্যন্ত অগ্রবর্তী হয়েছে সেই রাস্তায় ক্যানেল পার হযে সামান্য গেলেই এই গ্রামে যাওয়া যায়।

শুরুতেই এই গ্রামকে নবগঠিত গ্রাম বলা হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা যায়— ১৯৪৪ খ্রিঃ তখনও ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সেই সময বুদবুদে মিলিটারী বেসকে আব বিস্তৃত করার জন্য হঠাৎ নোটিশ দিয়ে বুদবুদের দক্ষিণে অবস্থিত কিছু গ্রামকে তুলে দেওয়া হয়। ফলে সেই সব গ্রামের ছিন্নমূল ব্যক্তিরা বিভিন্ন গ্রামে উঠে যায়। তখনই হিন্দু মুসলমানের মিলিত বাসক্ষেত্র পাণ্ডুদহের হিন্দুরা মুখ্যত গোপ সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈষৎ সরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু ডাঙ্গায় বসতি করে, সৃষ্টি করে এক গ্রাম। নাম হয় পাণ্ডুদহ ডাঙ্গা। পরে তা প্রাচীন পাণ্ডুদহের স্মৃতিকে ধবে রেখেই 'পাণ্ডুদহ' নামেই পরিচিত হয়। তাই এ গ্রামটি আক্ষরিক অর্থেই নবসৃষ্ট গ্রাম। আর সেখানকার মুসলমানরা আর একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে তৈরি কবে যে গ্রাম তার নাম হয় বেলেডাঙ্গা। পাণ্ডুদহ গ্রামে যদিও এখন এক আধ ঘর প্রামাণিক (নাপিত) ও কিছু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বাস দেখা গেলেও, এই গ্রামও গোপভূমের অন্যান্য বহু গোপ-প্রধান গ্রামের মধ্যে এক উল্লেখ্য গোপপ্রধান গ্রাম।

গ্রামের নাম প্রসঙ্গে বলা যায়—'পাণ্ডু' অর্থে সাদা মাটি [২৯] যা বর্ষায় গলে জলে কাদায় দুর্গম ও অপার দহের আকার নিত, তা থেকেই পাণ্ডুদহ গ্রাম নামের উৎপত্তি। এখনও গ্রামে ঢোকার আগেই ক্যানেলের উত্তরে, প্রাচীন সেই গ্রামের চিহ্ন রূপে একটি পরিত্যক্ত ভগ্ন মসজিদ দেখা যায়— যা বটবৃক্ষের নিঃশব্দ আক্রমণে দীর্ণ-বিদীর্ণ, তবুও মাথার উপর তিনটি গম্বুজ ও চার কোণে ৪টি মিনার সহ বর্তমান। মাঝের গম্বুজটি বেশ বড়। এর একটু পশ্চিমে রয়েছে বহু পূর্বে এখানে আসা এক মুসলমান পীর, দাতা সাহেবের মাজার। যার অলৌকিক বহু ক্রিয়াকাণ্ডের কথা এখনও লোক মুখে শোনা যায়, সেই পীর সাহেবের প্রতি লোকের সম্ভ্রম অগাধ। তাই পথচারীজন সকলে ঐ এলাকা অতিক্রম কালে নতমস্তকে নমস্কার করে যায়। প্রতিবছর মাঘ মাসে ঐ মাজারে পীরের নামে মহোৎসব পালিত হয়।

বর্তমান পাণ্ডুদহ গ্রামটি খুব একটা বড় নয়। মাঝারি ধরনের গ্রাম। গ্রামের প্রধান উৎসব বলতে চৈত্রমাসে বাসন্তী পূজা। এখানকার লোকে তাকে 'ভগবতী' পূজা বলেই অভিহিত করে। এই ভগবতী আসলে মহিষাসুরমর্দিনীদেবী দুর্গা। দেবীর সঙ্গে দুইকন্যা লক্ষ্মী সরস্বতীও বর্তমান তবে দুই পুত্র কার্তিক গণেশের অবস্থান নাই। এই ভগবতী পূজাই গ্রাম্য উৎসব। একে ঘিরেই আত্মীয়-পরিজনদের গ্রামে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তখন গ্রামে খুবই ছোট আকারের মেলাও বসে। মিলিটারী অধিকৃত এই সমুদয় এলাকায় এখন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নিয়ে তার মধ্যে তাদের প্রয়োজনে বিশাল বিশাল ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে।

গ্রামে দুর্গা ও কালী পূজা হয় না। লক্ষ্মী, সরস্বতী পূজা হয়। গ্রীষ্মে গ্রামে হরিনামও বসে। দেবমন্দির বলতে গ্রামে দু'টি ভগবতী মন্দির ও একটি অন্নপূর্ণা মন্দির বর্তমান। গ্রামের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে চণ্ডীদেবীর আটন বর্তমান। সেখানে ভগবতী পূজার ফলে মহানবমীতে ছাগবলিসহ পূজাও হয়ে থাকে।

কৃষি প্রধান গ্রাম। চাষ আবাদই লোকের মুখ্য জীবিকা। চাকুরিজীবির সংখ্যা খুবই কম, আঙ্গুলে গোনা যায়। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

পানাগড় ঃ— বর্ধমান জেলায় গড় সংযুক্ত বেশ কিছু স্থান নামের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই রকম গড়যুক্ত স্থানাদির মধ্যে পানাগড়ও একটি। গড় অর্থে বোঝায় কোন রাজা মহারাজার সৈন্য সম্বলিত সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য দুর্গ। হয়ত প্রাচীনকালে এখানে কোন রাজা-মহারাজার সেনা শিবির বা দুর্গ ছিল। তাই এই স্থান গড় অভিধায় অভিহিত হয়ে পানাগড় নামে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু সে ইতিহাস এখন কালগর্ভে নিমজ্জিত!

তবে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে ১৯৪১-৪২ খ্রিঃ এখানে একটি প্রতিরক্ষা শিবির তথা বিমানক্ষেত্র তৈরি হয়। বৃটিশ সরকারের উদ্যোগে কোন আমেরিকান সংস্থা তা নির্মাণ করেন। পরে পানাগর কেন্দ্রিক আরও কয়েকটি গ্রামকে সরিয়ে দিয়ে এখানে সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ কেন্দ্র ও সৈন্য শিবির তৈরি করা হয়। তাই বলা যায় অতীত ইতিহাস অজানা থাকলেও এটি বর্তমান যে একটি সেনানিবাস বা গড় তাতে সন্দেহ নাই।

কাঁকসা থানার অন্তর্গত ৮৫ নং জে. এল. ভুক্ত এই স্থানে জি. টি. রোড বা রেল পথে সরাসরি এখানে যাওয়া যায়। অতীতের পানাগড় ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলি, যদের নিয়ে সেনা শিবির সূচিত হয়েছে বর্তমানে তাদের গ্রামীণ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও সেখানে সুরক্ষিত বিশাল এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে সামরিক পরিবেশ। তবে পানাগড় এখন রীতি মত শহরের রূপ পেয়েছে। একদা এখানে সৃষ্টি হয়েছিল এক বৈষ্ণব পাটবাড়ি, যা তৈরি করেছিলেন রামাই পণ্ডিতের শিষ্য অর্ধ তিলকধারী হরিদাস।

পাত্রাগড় ঃ— কাঁকসা থানার অধীন এটি আর একটি গড় অভিধা যুক্ত গ্রাম। পানাগড় থেকে বাসযোগে এখানে যাওয়া যায়। গ্রামটি বেশ প্রাচীনও বটে এবং আকারে বড়ও বটে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাসভূমিও এই গ্রাম। হিন্দুদের মধ্যে উল্লেখ জ্ঞাতি গোষ্ঠী হল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কর্মকার, সদ্‌গোপ এবং অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাগদি বিশেষ করে দুলে বাগদিদের সংখ্যাই বেশি। এখানে আদিবাসীরাও রয়েছে।

গ্রামের দেব-দেবীর মধ্যে উল্লেখ্য হলেন শিব। টিনের ছাউনি মাটির ঘরে শিব অধিষ্ঠিত থাকলেও ইনিই গ্রাম্য দেবতা। এর নিত্য সেবা চললেও চৈত্রসংক্রান্তিতে

বিশেষ বাৎসরিক উৎসব হিসাবে গাজন পর্ব মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানকার শিব গাজনে একদা বিশেষ রমরমা অবস্থা ছিল এখন সে সব অতীত ইতিহাস হলেও উৎসব এখনও চলে তবে সেই জাঁক আর নাই। এখানের শিব গাজনের প্রচুর ভক্ত হয়, শারীরিক নির্যাতনমূলক অনুষ্ঠানাদি পূর্বে অনুষ্ঠিত হলেও এখন আর তা হয় না। তবে গ্রামের লোক সাগ্রহে এই শিব গাজনে অংশ নিয়ে থাকে।

প্রতাপপুর ঃ— দুর্গাপুর সন্নিকটে লাউদোহা ব্লকের অধীন একটি অতিসাধারণ গ্রাম প্রতাপপুর গ্রামের জন সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজারের মত এবং তাব ৪৮ শতাংশই শিক্ষিত। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও আছে। গ্রামটি মূলত কৃষিপ্রধান গ্রাম হলেও এখানে চাষ-আবাদের তেমন সুবিধাও নাই। দুর্গাপুর এখান থেকে মাত্র ৭ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত, তাই কিছু লোক দুর্গাপুরেব কলকারখানায় কর্মরত থাকলেও অধিকাংশই চাষ-আবাদে লিপ্ত। কিন্তু ধান চাষে পরিশ্রম যত, রোজগার তত নাই। তাই চিন্তাগ্রস্ত চাষীর দল!

এমন সময় ওরা শুনল বিকল্প চাষের কথা। সে কথা শোনার পর গ্রামের ছয় যুবক ও চার গৃহবধু যৌথ উদ্যোগ এখানে কুড়ি একর জমি কিনে সেখানে শুরু করল বিকল্প চাষ হিসাবে ঘাসেব চাষ। নব উদ্যোমে কয়েকটি পরিবার সাবেক পদ্ধতিতে ধান চাষ বাদ দিয়ে সেখানে শুরু কবল ঘাসেব চাষ। তাদের দেখা দেখি এখন গ্রামের প্রায় সকলেই ঘাস চাষে মত্ত।

স্থানীয় দুর্গাপুর শিলাঞ্চলে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে সুগন্ধী তেলের কারখানা। তার কাঁচা মাল হিসাবে প্রয়োজন লেমন, পামারোজা, সি এন-৫, সিট্রোনেলার মত বহু ঘাসের। তাছাড়া ঐ সকল ঘাস থেকে স্থানীয় কারখানায় লেবু ও গোলাপের সুগন্ধী তেল উৎপাদনও শুরু হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন কারখানায় প্রসাধনিক দ্রব্য, ফিনাইল সুগন্ধী তেল এবং মশামারার কয়েলে ঘাস-জাত তেলের চাহিদা বেড়েছে। ইদানিং কালে ঘাসের নির্যাস থেকে তৈরি সুগন্ধী তেলের দেশ ব্যাপী চাহিদার জন্য জৈব তেলের বাজার খুব বেড়েছে।

ঐ সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে এখানকার ছেলে মেয়েরা উঠে পড়ে লেগেছে ঘাসের চাষে আত্ম নিয়োগ করতে। তাই ঘাস চাষের জন্য গ্রামের মধ্যে এক নতুন সাড়া পড়ে গেছে। সাধারণ মানুষ সনাতন ধানচাষকে এড়িয়ে ঘাসচাষেই মেতে উঠেছে। কারণ এই চাষে তাদের আর্থিক উন্নতির বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। ফলে অল্প দিনেই তাদের আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোটাই বদলাতে শুরু করেছে। তাই প্রতাপপুর এখন এমনই একটি গ্রাম যেখানে গ্রামবাসী সবাই বিকল্প চাষ হিসাবে ঘাসের চাষে মহা ব্যস্ত। [(৩০)]

পোতনা ঃ— গলসী থানার ১নং ব্লকের অধীন ৮১ নং জে. এল. ভুক্ত গ্রাম

পোতনা। আগের দিনে এই এলাকা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেই জঙ্গলের মধ্যেই মানুষজনকে যাতায়াত করতে হত। ফলে তখনকার দিনে ঠগী সম্প্রদায়ের লোকেরা পথচারী লোকেদের পথে চলাকালীন সময়ে আড়াল থেকে আক্রমণ চালিয়ে কাবু করে তাদের মেরে ফেলত এবং টাকা পয়সা সব কেড়ে নিয়ে মৃতদেহগুলি গ্রাম প্রান্তে পুঁতে দিত। এইভাবে ক্রমান্বয়ে মানুষ পোঁতার ফলে একদা গ্রাম নাম 'পোতনা'য় পরিণত হয়।

গ্রামে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয়, গোপ ইত্যাদি উল্লেখ্য। গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর যেমন দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদির পূজা যথা সময়ে ও যথা নিয়মে পালিত হলেও ধর্মরাজের গাজনই মুখ্য উৎসব। তাই ধর্মরাজই গ্রাম্য দেবতা। তার গাজন বেশ ধুমধামেই পালিত হয় এবং তখন গ্রামবাসীরা আত্মীয়-পরিজনদের আমন্ত্রণ করে থাকে। গ্রামে ২৪ প্রহর অনুষ্ঠানও ধুমধামে পালিত হয়। কৃষিপ্রধান গ্রাম। চাষ-আবাদই এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা। চাকুরিজীবীর সংখ্যা এখনও যথেষ্ট কম।

পাণ্ডবেশ্বর ঃ— অণ্ডাল থানার ৫ নং জে. এল. ভুক্ত বৈদ্যনাথ পুর মৌজার অধীন পাণ্ডবেশ্বর এক প্রাচীন শৈবক্ষেত্র। পূর্বরেলের অণ্ডাল সাঁইথিয়া লাইনের পাণ্ডবেশ্বর স্টেশন রয়েছে। দুর্গাপুর, অণ্ডাল থেকেও বাসযোগে পাণ্ডবেশ্বরে যাওয়া যায়। পাণ্ডবেশ্বর অজয় নদীর দক্ষিণ গায়েই অবস্থিত এক প্রাচীন নদী কেন্দ্রিক বাণিজ্য কেন্দ্র। বর্তমানে পাহাড়ি নদী অজয় অনাব্য হওয়ায় এবং এখন সড়ক পথের প্রভূত উন্নতি হওয়ায়, নদী বন্দর হিসাবে এর গুরুত্ব কমে গেলেও ব্যবসাক্ষেত্র হিসাবে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ হিসাবে বলা যায় খনি এলাকায় অবস্থান হেতু খনিকে কেন্দ্র করে বহিরাগত তথা ভিন রাজ্যের বহু লোকের সমাগম হওয়ায় তদের চাহিদা পূরণে ব্যবসা ক্ষেত্র হিসাবেও এর বিশেষ ভূমিকাও লক্ষ করা যায়। বর্তমানে বহিরাগত লোকের চাপে এটি এখন এক মিশ্র কৃষ্টি সম্পন্ন শহরে রূপায়িত হয়েছে। এখানে অজয়ের উপর নবনির্মিত রবীন্দ্র-নজরুল সেতুটি সড়ক পথের গুরুত্ব বিশেষভাবে বর্ধিত করেছে।

এ হেন পাণ্ডবেশ্বরে একেবারে অজয় নদীর কোল ঘেঁসে নদীতটেই বৃক্ষ-ছায়ায় ঘেরা শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশে, রয়েছে বেশ কয়েকটি মন্দিরের অবস্থান— যা দর্শকদের চিত্তাকর্ষণে সতত সক্ষম। জনশ্রুতি, এখানেই নাকি পঞ্চপাণ্ডব তাদের অজ্ঞাতবাস কালে নিজেদের পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি এবং মাতা কুন্তীর জন্য একটি সর্বসাকুল্যে মোট ছয়টি শিবলিঙ্গ একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠিত ও তাদের স্মৃতি সম্বলিত শিবলিঙ্গ ও মন্দিরের জন্য এই স্থান পাণ্ডবেশ্বর নামে নামিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান মন্দিরগুলি দেখে তেমন প্রাচীন বলে আদৌ মনে হয় না।

এখানে আরও কয়েকটি মন্দিরের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে ভৈরব ও হনুমানের মন্দিরও রয়েছে তবে এখানে কালী-লক্ষ্মী, সরস্বতীর পূজাও হয়ে থাকে।

এখানের এক শিবমন্দিরের পাঁচিলকে ঘিরে সমগ্র পাঁচিলের উপর অংশে বহু বৃষ মূর্তি পরপর সন্নিবেশিত রয়েছে। মন্দিরগুলির মাঝে একটি আটচালাও বর্তমান। মূল মন্দির গর্ভে ছয়টি শিবলিঙ্গকে গোরখপুর নিবাসী ভগবতীদেবী ঝকঝকে পিতলের পাত দিয়ে মুড়িয়ে দিয়েছেন। এখানকার দেবসেবা পরিচালনা করেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মহান্তগণ। তারা যদিও এখানে সব সময় থাকেন না, থাকেন উখরায়। তবে তাদের নিয়োজিত লোকজন দ্বারা বিগ্রহেব সেবাপুজা পরিচালিত হয়। দেবতার নিত্যসেবা অনুষ্ঠিত হলেও বাৎসরিক নানা শৈব অনুষ্ঠান যেমন— শিবরাত্রি ইত্যাদি সাড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে। এখানে পৌষ সংক্রান্তিতেও উৎসব পালিত হয, এছাড়া অষ্টপ্রহর হরিনামও হয়। অষ্টাদশ শতকের কোন এক সময় ঘনশ্যাম নামে এক সিদ্ধ পুরুষ এখানে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সাধন ধারায় সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এখানে পরিবেশ দেব-আরাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র হওয়ায় ভক্ত আগমনের তাই বিরাম নাই।

এখানকার দেবক্ষেত্র বর্ধমান রাজ পরিবারের অর্থানুকুলে ধন্য হয়েছিল। জমি জমাও দেব সেবার জন্য প্রদত্ত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে।

(ফ)

ফুলঝোর ঃ— কাঁকসা থানার অধীন ১৪ নং জে. এল. ভুক্ত এক সাধারণ গ্রাম ফুলঝোব। পূর্বে এই সমুদয় অঞ্চলই গোপভূম পরগনার অধীন ছিল এবং এখনও গোপ প্রধান এলাকা। দুর্গাপুর শিবপুর পাকা রাস্তায় শিবপুরের সামান্য দক্ষিণে নেমে পশ্চিমে ৪/৫ কি. মি. হেঁটে কিংবা সাইকেলেও যাওয়া যায়। গ্রামটি অজয় নদীর সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রাম থেকে অজয়ের বাঁধ লক্ষ করা যায়। গ্রামে যাওয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। তাই গ্রামটি একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম। তবে গ্রামে যেতে পারলে আকর্ষণীয় জিনিষ রয়েছে ফলে ঠকতে হবে না। সে কথায় পরে আসছি।

গ্রামের বাসিন্দাদের অধিকাংশই গোপ সম্প্রদায় ভুক্ত। তাদের দেবসেবার জন্য একঘর ব্রাহ্মণকে গ্রামে বসানো হয়েছে। দুধ-ছানার কারবার ও চাষআবাদই তাদের মুখ্য জীবিকা। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই নগন্য।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায়, গ্রামের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে বিস্তীর্ণ মোরাম ক্ষেত্রের মাঝে স্বল্প শাল পিয়ালের ফাঁকে, উত্তর দক্ষিণে সুবিস্তৃত প্রায় মজে যাওয়া এক পুষ্করিণী যার থেকে সব সময়ের জন্য নির্গত হয়ে চলেছে দু'টি জলধারা। যাকে স্থানীয় ভাবে ঝোর বলা হলেও আসলে তা ঝর্ণা। এই ঝর্ণা পুকুরের উত্তর পাড়ের ঈশান ও বায়ু কোন থেকে সারা বছরই প্রায় সমধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে দুই জলধারা এর ফলে অনর্গল নিঃসৃত ঐ জলধারায় ঐ এলাকার বিস্তৃত মাঠে নিখরচায় চাষীদের সেচের সুরাহা হয়েছে।

ঐ পুকুরের দক্ষিণ পাড়েই পাথরের তৈরি ফুলেশ্বরী নামে এক আঞ্চলিক দেবীর অধিষ্ঠান ছিল, কিন্তু কালের কবলে সেই প্রাচীন প্রস্তর মন্দির এখন নিঃশেষ। সেখানে এক তেঁতুল বৃক্ষের তলে ইতস্তত পড়ে থাকা সাইজ করা পাথরের স্তূপ দেখা যায়। আর চোরেদের কৃপায় বিশাল ওজনের কষ্টি পাথরের তৈরি দেবীমূর্তি প্রথমে চুরি হলেও তা নিকটস্থ মলান দিঘি থেকে পাওয়া গিয়েছিল। পরে প্রায় ২০ বছর আগে তা পুনরায় চুরি হওয়ায় আর পাওয়া যায়নি। তখন থেকে ঘটেই দেবীর পূজা সমাধা হয়ে থাকে। লোকের কাছে জানা গেল দেবীমূর্তি প্রায় আড়াই ফুটের মত উঁচু ছিল। দেবী অষ্টভূজা এবং হাতির পিঠে চড়া। দেবীমূর্তির পদতলে ছিল অসুর। এ এক বিচিত্র মূর্তি যা বঙ্গে সচরাচর দেখা যায় না। দেবী তাই অষ্টভুজা মহিষদলনী কিন্তু সিংহবাহিনী না হয়ে হস্তীবাহিনী।

দেবীর নিত্যপূজা হলেও চৈত্রসংক্রান্তিতে বিশেষ পূজা এখনও হয়। সেই সময় পাশের গ্রাম দণ্ডেশ্বর থেকে দণ্ডেশ্বর শিবের প্রতীক হিসাবে বানেশ্বরকে এখানে আনা হয়। ফলে পুরুষ ও প্রকৃতির একাত্মতায় তখন এখানে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উৎসবে কীর্তন, বাউল ও কবিগানের অনুষ্ঠানও চলে।

এইভাবে গ্রামে উক্ত পুষ্করিণীকে ঘিরে তার এক পাড়ে ফুলেশ্বরী দেবী ও অন্য পাড়ে ঝোর বা ঝর্ণার মিলন মিশ্রণে যেমন ফুলেশ্বরীর 'ফুল' ও ঝোরের 'ঝোর' যুক্ত হয়ে গ্রামনাম হয়েছে ফুলঝোর।

ফুলেশ্বরী দেবী ছাড়াও গ্রামে রয়েছেন প্রস্তরময়ীদেবী মনসা। দক্ষিণ দুয়ারী একটিনের চালের মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। দেবী খুব জাগ্রতা। অনেকের বহুবিধ মনস্কামনা তিনি পূরণ করে থাকেন। তাই দেবীঅঙ্গে অনেক সোনাদানার গহনার প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। বাড়িতে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিশেষ করে বিবাহে মাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় এবং তখন মা মনসার জাগরণ, ভাসান ইত্যাদি গানও গাওয়া হয়।

ফুলঝোর অতিসাধারণ ও অখ্যাত গ্রাম হলেও এর উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি ফুলেশ্বরী দেবীকে নতুন করে সংস্থাপন করা হয় ও ঝর্ণা দু'টিকে বক্রেশ্বরের মত সুসংস্কৃত করা হয় এবং রাস্তাঘাটের যোগাযোগ সুন্দর করা যায় তবে ধর্মপ্রাণ ও ভ্রমণ পিপাসু বাঙালিদের কাছে এটি পরম আকর্ষণীয় হবে এই কারণে যে, তারা একই স্থানে ঝর্ণায় স্নান সেরে মাকে পূজা দিয়ে মানসিক শান্তি লাভে সমর্থ হবে। বাৎসরিক নানা শৈব অনুষ্ঠান যেমন— শিবরাত্রি সাড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে। এখানে পৌষ সংক্রান্তিতেও উৎসব পালিত হয়, তাছাড়া অষ্টপ্রহর হরিনামও হয়। অষ্টাদশ শতকের কোন এক সময় ঘনশ্যাম নামে এক সিদ্ধ পুরুষ এখানে শাক্ত বৈষ্ণব উভয় সাধন ধারায় সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এখানের পরিবেশ দেব আরাধনার প্রশস্তক্ষেত্র হওয়ায় ভক্ত আগমনের তাই বিরাম নাই।

এখানকার দেবক্ষেত্র বর্ধমান রাজ পরিবারের অর্থানুকুলে ধন্য হয়েছিল। জমি জমাও দেব সেবার জন্য প্রদত্ত হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে।

(ব)

বনকাপাশি ঃ— মঙ্গলকোট থানার কইচর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এক বিশিষ্ট গ্রাম বনকাপাশি। বর্ধমান-কাটোয়া পাকা রাস্তার বনকাপাশি বাস স্ট্যান্ড থেকে দক্ষিণে অগ্রবর্তী এক অবক্ষয়িত পাকা বাস্তা ধরে সামান্য দক্ষিণে এগিয়ে গেলে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের লাগাও সামান্য পূর্বে রয়েছে আর এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম-বাজার। এই দুই গ্রামকে একত্রে বাজার-বনকাপাশি বলা হয়ে থাকে। কাটোয়া থেকে মাত্র ১৪ কি. মি. দক্ষিণে এর অবস্থান।

গ্রামটি নাতিদীর্ঘ না হলেও এর জন সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজারের মত। শিক্ষিতের হার ৫০ শতাংশ। গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ উগ্রক্ষত্রিয় সদ্‌গোপ, সাহা, এবং তপশিলিদের মধ্যে বাগদি ও ডোমেদের সংখ্যাই বেশি। কৃষি প্রধান গ্রাম। অধিকাংশের জীবিকাই চায আবাদ তবে বর্তমানে গ্রামের অনেকেই এক শিল্প কর্মে যুক্ত রয়েছে, সেটি হল শোলা শিল্প। শোলাকে কেন্দ্র করে এই গ্রামের এক মালাকার পবিবারের সবিশেষ প্রচেষ্টায় গ্রামটি ধীরে ধীরে শোলা শিল্পীর গ্রামে পরিণত হয়।

শুরুতে তাদেব কথায় আসি। প্রথম দিকে এই পরিবার চিত্রকর হিসাবে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের চিত্রাঙ্কণে এরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখ্য পুরুষ ছিলেন গোপাল ও তার পুত্র রাখাল মালাকার। চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে এরা ডাকের সাজও তৈরি করতেন। রাখাল এর পুত্র মৃত্যুঞ্জয় এই কাজে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। কলকাতায় তাদের একটি সাজের দোকানও ছিল। তখনকার দিনের সাজকে ডাকের সাজ বলা হত। তার প্রধান কাঁচামাল ছিল রাংতা যা জার্মানি থেকে ডাকের মাধ্যমে আনা হত, তাই ঐ সাজ 'ডাকের সাজ' নামে খ্যাত হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধেব দরুন জার্মানরা ভারতে রাংতা পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ায়, মালাকাররা মাথায় হাত দিয়ে বসেন।

তখন মৃত্যুঞ্জয় মালাকার হতাশ না হয়ে স্ত্রী কাত্যায়নীদেবীর সাহচর্যে শোলাকে কেটে কাপড়ের উপর বসিয়ে সাদা সোলার সাজের প্রচলন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাপড়ের উপর সাদা ধবধবে সোলার কাজ দেখে নেতাজী সুভাষ বসু (তখনও দেশ ছাড়েন নাই) মুগ্ধ হয়ে তাঁর বাড়ির কালী পূজায় মায়ের সাজ হিসাবে তা গ্রহণ করেন। পরে পরে ডাকেরসাজের বদলে শোলারসাজের প্রচলন হয়। সে কাজে এখানকার মালাকার পরিবারের মুখ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পরে মৃত্যুঞ্জয় মালাকারের পুত্র আদিত্য মালাকার তার মা কাত্যায়নীর সহায়তায় শোলার সাজকে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি দান করেন। শোলাকে কেন্দ্র করে অতুলনীয় মূর্তি নির্মাণের (অকালবোধন মূর্তি) জন্য তিনি শোলা শিল্পী হিসাবে ১৯৭৪ খ্রিঃ রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরির হাত থেকে তাম্রপত্র ও নগদ ২,৫০০ টাকা গ্রহণ করে এই শিল্পকর্মের জন্য প্রথম রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হন। পরে ১৯৭৯ খ্রিঃ মাতা কাত্যায়নী দেবী শোলার দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডির নিকট হতে ৫,০০০ টাকা নগদ ও তাম্রফলকসহ রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেন। তারও পরে ঐ পরিবারের আদিত্য মালাকারের পুত্র আশিস মালাকার দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্র নির্মাণ করে ১৯৯০ খ্রিঃ তখনকার রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কট রমনের হাত থেকে নগদ ১০,০০০ টাকা ও তাম্রফলক সহ রাষ্ট্রপতির পুরস্কার গ্রহণ করেন। এইভাবে এই গ্রামের একই পরিবারের তিন প্রজন্ম (ঠাকুমা, পিতা ও পুত্র) শোলার শিল্পের পারদর্শিতার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। এটা এই গ্রামের পক্ষে তো বটেই এমনকি সমগ্র বঙ্গের পক্ষেও কম গৌরবের কথা নয়। এক মাত্র এই পরিবারের জন্যই বনকাপাশি শোলা শিল্পীদের গ্রাম হিসাবে সারা দেশে পরিচিত।

তাদের অতুলনীয় শিল্পকলায় মুগ্ধ হয়ে বর্তমানে এই গ্রামের অধিকাংশ এবং পাশের গ্রাম-বাজারসহ অনেক গ্রামের বহু লোকই এই শিল্পকে জীবিকার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। গ্রামের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়, মালাকার পরিবারের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে শোলার কাজে ব্রতী হয়েছেন। শোলার সাজ তৈরির কাজে আবাল বৃদ্ধবণিতা সকলেই অংশ নিয়ে থাকেন এবং সারা বছর এই কাজেই জড়িয়ে থাকেন। শিল্পীদের শিল্প কীর্তির মধ্যে উল্লেখ্য বস্তুগুলি হল— বিভিন্ন দেব-দেবীর সাজ, চাঁদমালা, বিয়ের টোপর, মুকুট, কদম ফুল ও শোলার মূর্তি ইত্যাদি। ঐ সকল দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে তারা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামে এবং কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই ইত্যাদি বিভিন্ন নামিদামী শহরে প্রতিমা সাজাবার জন্য যায়। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার উল্লেখ্য শোলার সাজও এরাই যুগিয়ে থাকে। আর শোলার দেব-দেবীর মূর্তি যা কেবল মালাকার পরিবারই তৈরি করে তা দেশ-বিদেশের বাজারেও পাড়ি দেয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী আদিত্য মালাকার এই সনাতনী শোলাশিল্পকে বিদেশীদের কাছে সম্যকভাবে তুলে ধরার জন্য সরকারি খরচায় বেশ কয়েকবার করে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে বয়সের ভারে অবনত, বাত ব্যাধিতে জর্জরিত, তবুও এই শিল্পের প্রতি আন্তরিক ভালবাসার টানে, শোলার নিবিড় আকর্ষণে এখনও এই শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবেই জড়িয়ে রয়েছেন জাত শিল্পী আদিত্য মালাকার [৩১]।

শোলা শিল্পের প্রধান কাঁচামাল নিঃসন্দেহে শোলাই। স্থানীয় অঞ্চলে সেই উন্নত মানের শোলা না পাওয়ায় তাদের কাজের জন্য বাংলাদেশের শোলা কলকাতা থেকেই আনতে হয়। অন্যান্য কাঁচামাল বলতে লাগে সাদা কাপড়, ভেলভেট পেপার বা সোয়েট পেপার, জরি, রাংতা ইত্যাদি। আর প্রয়োজন হয় তুঁতে, ময়দা ও ফেবিকল। শোলা কাটার জন্য লাগে কাতি, কাঁচি, নরুন, সন্না ইত্যাদি যন্ত্রপাতি আর প্রয়োজন হয় শিল্পীর অসীম ধৈর্য।

অসীম ধৈর্য সহকারে দিনের পর দিন নিযুক্ত থেকে তাদের কাজ তুলতে হয়। যে পরিমাণ শ্রম এ কাজে দিতে হয় তার তুলনায় পারিশ্রমিক কম আসায় ভবিষ্যত প্রজন্ম এ হেন সূক্ষ্মকাজে তেমন ঘেঁসতে আগ্রহী নয়। তারা সাদা-সাপটা শোলার কাজ বিশেষ করে প্রতিমা সাজাবার কাজেই সারা বছব লেগে থাকে। এ প্রসঙ্গে মালাকার বংশের সর্বকনিষ্ঠ রাষ্ট্রপতি পুরস্কৃত শিল্পী আশিস মালাকার তাই খেদ করে বলেন যে, এই শিল্পে প্রতিভাবান শিল্পীর অভাব নাই। কিন্তু তাদের কাছে সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা তেমন উদার নয়। সরকার আর একটু সহৃদয় ঔদার্য দেখালে এই শিল্পে শিল্পীরা স্বকীয় বিশেষত্বের সম্যক পরিচয় দিয়েই শিল্পকে আর মজবুত করতে পারত, ফলে এই শিল্প জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন হতে পারত।

এবার গ্রামের কথায় আসি। গ্রামটি বেস সমৃদ্ধ গ্রাম। এখানে বহুদেবদেবীর পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল শিবের গাজন। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন গ্রাম্য শিবমন্দিরে বহুভক্ত সহযোগে সম্পন্ন হয়। ঐ সময় পাশের গ্রাম বাজার থেকে শিব লিঙ্গ এনে এখানে রেখে গাজনাদি কৃত্য সম্পন্ন করা হয়। গ্রামে এখনও ৮/৯টি দুর্গাপ্রতিমা সমারোহে পূজিত হয়। গ্রামে জগদ্ধাত্রী পূজাও হয়ে থাকে। ভাদ্র সংক্রান্তিতে এখানে মনসার পূজাও হয়। কার্তিকে কালীপূজা ধুমধামেই সম্প্রন্ন হয়। চৈত্রে বাসন্তীপূজাও বাদ যায় না দুদিন ধরে তা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে আর এক দেবতার পূজা বেশ আড়ম্বরেই পালিত হয়— সেটি হল বাবা ক্ষেত্রপালেরপূজা। মাঘ মাসের মাকুরী সপ্তমীতে ছাগবলিসহ এই দেবতার পূজা হয়ে থাকে। গ্রামে হরিনাম ও ২৪ প্রহরও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে পোষ্ট অফিস, প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বর্তমান আছে। গ্রামের মধ্যে মোরাম রাস্তাগুলি চলাচলের যোগ্য হলেও গ্রামে ঢোকা পাকা রাস্তাটির আশু মেরামত প্রয়োজন।

বারগ্রাম ঃ— মঙ্গলকোট থানার অজয় নদীর সামান্য দক্ষিণে এই গ্রামের অবস্থান। গুসকরা নতুন হাট বাস রাস্তায় কাসেম নগর থেকে কিছুটা উত্তরে অগ্রবর্তী হলে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি একদা নৌবাণিজ্যের সহায়ক এবং নাব্যনদী অজয়ের তীরে অবস্থিত এক বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সেই সময় নৌবাণিজ্যে এই গ্রামের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ও বাড়বাড়ন্ত হওয়ায় গ্রাম নাম 'বারগ্রাম' হয়েছে।

এই এলাকা বিস্তৃত গোপভূমের এলাকাধীন হওয়ায় এখানকার বহু গ্রামেই গোপেদের বসত ক্ষেত্র ছিল। এখনও তার রেশ দেখা যায়। তাই গ্রামে গোপ ও সদ্‌গোপের আধিক্য রয়েছে, তবে অন্য সম্প্রদায়ের লোকও যে নাই তা নয়। এখানে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বহু লোকও বাস করে।

গ্রামে অন্য সময় বিভিন্ন দেব-দেবতার পূজাদি হয়ে থাকলেও ধর্মরাজ এবং মনসার পূজাও হয়ে থাকে। কৃষিপ্রধান গ্রাম। এখানের মাটিও সরস এবং উর্বর হওয়ায় ধান আলু ও অন্যান্য রবি ফসল প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে। গ্রামের লোকেরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। চাকুরিজীবীদের সংখ্যা খুবই কম।

বেলগ্রাম ঃ— মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত ১২২ নং জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম। বর্ধমান কাটোয়া বাসে শ্রীখণ্ডে নেমে সেখানে থেকে নতুন হাটগামী বাস ধরে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। কারণ এখানেই সুবুদ্ধি মিশ্রের শ্রীপাট অবস্থিত। যিনি পূর্ব জন্মে ব্রজের গুণচুড়া সখী নামে খ্যাত ছিলেন। তাছাড়াও এই গ্রামে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কন্যা গঙ্গা বংশীয় সন্তানেরাও বসবাস করেন। গ্রামে তাদের প্রতিষ্ঠিত বলরাম জীউ এর সেবা পরিচালিত হয়। গ্রামে নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ বর্তমান।

গ্রামে সারাবছর ধরে বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় উৎসব পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে চৈত্রের বারুণী তিথিতে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তখন দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভক্ত-বৈষ্ণবের সমাগম হয়ে থাকে। তখন গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন ও অনুষ্ঠিত হয়।

বড়চাতরা ঃ— আউশ গ্রাম ১ নং ব্লকের অধীন ৩৭ নং জে. এল. ভুক্ত এক ছোট্ট গ্রাম বড়চাতরা। বননবগ্রামের নিকটেই এর অবস্থান। গ্রামটি গোপভূমের গোপপ্রাধান্য যুক্ত বহু গ্রামের মধ্যে এক অন্যতম গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই গোপ, সদ্‌গোপ সম্প্রদায় ভুক্ত, তবে কিছু তপশিলি সম্প্রদায়ের বাসও আছে।

এই গ্রামের জমিদার ছিলেন বর্ধমান, রাজবাড়ির শ্বশুর বংশীয় মেহেরা পরিবার। গ্রামে অতীতেও গোপেদের যে আধিক্য ও আধিপত্য ছিল তার প্রমাণ হিসাবে গ্রামে এখনও রয়েছে এক বড় পুষ্করিণী যার নাম 'গোয়ালা বাঁধ'। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা হল চাষআবাদ। চাকুরি তেমন নাই। গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজায় বিশেষ ধুমধাম হয়ে থাকে। তাছাড়াও অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণাপূজাও বেশ সমারোহেই পালিত হয়। গ্রামে প্রাচীন পুরাকীর্তি বা দেবকীর্তি তেমন নাই।

বহমানপুর ঃ— গোপভূমের অনন্ত বিস্তৃত জঙ্গল মহলের ঘেরাটোপে অবস্থিত এক ছোট্ট গ্রাম বহমনপুর। এটি ১নং আউশ গ্রাম ব্লকের ৫৯ নং জে. এল. ভুক্ত হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম। গ্রামের নাম বহমানপুর কিন্তু এখানে একঘরও মুসলমান নাই। জনশ্রুতি এই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে নিরালা নির্জন স্থানে একদা ইয়েমেন দেশ থেকে ভারতে

ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসা বহমানী বংশের বাহমানী পীর সাহেব গোপভূমের এখানেই প্রথম আস্তানা গেড়ে ছিলেন। তাই তার স্মৃতিকে ধরে রেখে এই গ্রাম বহমানপুর নামে খ্যাত।

এখনও এই গ্রামের দক্ষিণে আম্রবীথির ফাঁকে সামান্য জায়গা বাতা দিয়ে ঘিরে রাখা আছে। সেখানে কিছু মাটির ঘোড়া দেখা যায়— সেটিই বাহমনী সাহেবের এই গ্রামে প্রথম আস্তানা। পরে তিনি এখান থেকে সুয়াতায় গিয়েছিলেন এবং সেখানেই মানবতাবাদী এই ধর্মপ্রচারক, ভাল্কীর সদ্‌গোপ রাজাদর দেবী পূজায় নরবলী দেওয়ার প্রতিবাদে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। সেই যুদ্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করায় তার এবং তার অন্যান্য সহযোদ্ধাদের মৃতদেহগুলি যুদ্ধক্ষেত্র (প্রতাপপুর) থেকে সুয়াতায় এনে কবরস্থ করা হয়েছিল— তাই তার মাজার ক্ষেত্র সুয়াতায় বর্তমান।

ছোট্ট এই গ্রামের লোকের প্রধান জীবিকাই হল কৃষি আবাদ। কয়েক ঘর সাহা পরিবার ও কিছু নিম্ন সম্প্রদায়ের বাস। পূর্বে তো নয়ই, এখনও গ্রামে মুসলমান বসতি নাই। তাই পাশের মুসলমান বসতির গ্রাম ডাঙ্গাপাড়া থেকে কেউ কেউ এসে বাহমানী সাহেবের আটনস্থলে ঘোড়া নিবেদন ও সন্ধ্যাবাতি দিয়ে যায়।

বাহমানী সাহেবের স্মৃতিকে ভাস্বর করার জন্য ডাঙ্গাপাড়ার সামসুল কাদের নিজগ্রাম ও এই গ্রামবাসীর সহায়তায় এই আস্তানায় কয়েক বছর মেলা চালিয়েছিলেন, তা সর্বসাকুল্যে বছর চারেক চলার পর, মুখ্যত যোগাযোগের অভাবেই বন্ধ হয়ে যায়। এই আস্তানা সুয়াতার বাহমানী সাহেবের মাজারের পরিচালক বা সেবাইতদের নামেই রেকর্ড হয়ে আছে।

গ্রামে বিভিন্ন পূজা পার্বন অনুষ্ঠিত হলেও তেমন কোন বিশেষ গ্রাম্য উৎসব নাই। আস্তানার কাছেই রয়েছে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামটি চার দিকেই যোগযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত ফলে গ্রামের কোন উন্নতি লক্ষ করা যায় না। নিকটবর্তী রেল স্টেশন মানকর এখান থেকে ১২ কি. মি. দূরে আর নিকটবর্তী বাসস্ট্যান্ড বননবগ্রাম— সেও ৬ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

বুধরা ঃ— হাওড়া রামপুর লুপ লাইন রেলপথের অজয় রেল ব্রীজের লাগাও অজয় নদীর দক্ষিণ তীরেই এক ছোট্ট গ্রাম বুধরা। এর জে. এল. নং-১৩২ এবং এটি আউশ গ্রাম থানার ২ নং ব্লকের অধীন। গ্রামে হিন্দু জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা যথা নিয়মে সম্পন্ন হলেও এখানকার গ্রাম্যদেবী হলেন মনসা। দেবী মনসা এখানে বুধ্যোর মা নামে খ্যাত। ইনি আসলে আঞ্চলিক দেবী এবং অঞ্চলের শাসন দেবী ও তাই আশপাষের বিভিন্ন গ্রাম থেকে মায়ের পূজা আসে এবং মাও বিভিন্ন গ্রামে পরিক্রমায় যান। তিনি যখন যে গ্রামে যান তখন সেখানে বিশেষ উৎসব উদযাপিত হয়। গ্রামের এক মন্দিরে মনসাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সেখানেই পূজা হয়ে থাকে।

অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই ছোট ও প্রাচীন গ্রামটি একদা নদী পথে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। অজয় নদী মজে যাওয়ায় এবং স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার সহজ হওয়ায় নদীপথে বাণিজ্য ক্ষেত্র হিসাবে এর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। এখানকার মনসা আঞ্চলিক দেবী হিসাবে স্বীকৃত। গ্রামে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরায় এবং শ্রাবণ মাসেও দেবীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। দশহরায় এই দেবীর পুজাকে কেন্দ্র করে একটি মেলাও বসে যা দশহরার মেলা নামে খ্যাত। ভাঙ্গন ধরা অজয় নদীর বাঁকে এর অবস্থান হওয়ায় গ্রামটি প্রায়ই বন্যায় বিধ্বস্ত হয়, তাই অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় গ্রামটি বেশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। গ্রামে ৪টি পাড়া বর্তমান থাকলেও লোকবসতির তেমন চাপ নাই।

বনকুল ঃ— আউশ গ্রাম ২নং ব্লকের অধীন গ্রাম বনকুলা, এর জে. এল. নং-৪৯। গ্রামটি অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত উল্লেখ্য প্রত্নক্ষেত্র পাণ্ডুরাজার ঢিবি'র সন্নিকটে অবস্থিত। অন্যদিকে ভেদিয়া অঞ্চলের পশ্চিমে তালিম বাটী গ্রামের নিকটেই কৃষি কেন্দ্রিক ছোট গ্রাম এই বনকুল। এখানে হিন্দু মুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস হলেও সদ্‌গোপদেরই আধিক্য লক্ষণীয়। গ্রামের প্রধান উৎসব হল লৌকিক দেবতা ধর্মরাজের গাজন এবং তা অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধপূর্ণিমায়। গ্রামের লোকেরা সেই সময় আত্মীয়-পরিজনদের আমন্ত্রণ করে থাকে উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য। এই উৎসবকে ঘিরে গ্রামে ছোটখাট মেলাও বসে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসাবে বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে তখন এখানে কলকাতার বড় দলের যাত্রা গানও হয়ে থাকে। এখানকার মেলা প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন। গ্রামে আশ্বিনে এক দুর্গোৎসব ছাড়া শ্রাবণ মাসে বেশ কয়েকটি মনসাপূজা বিশেষ ধুমধামে পালিত হয়।

এখানকার গ্রাম্য দেবতা এই ধর্মরাজের সেবা পূজার জন্য প্রায ১৫০ বিঘা জমি দেবোত্তর দেওয়া আছে এবং এখনও তা বর্তমান থাকায় তার আয় থেকেই এর উৎসবাদি গ্রাম সাধারণের পরিচালনায় ধুমধামেই পরিপালিত হয়। চক্ষু সংক্রান্ত রোগ ব্যাধির নিরাময়ের ক্ষেত্রে এখানকার ধর্মরাজের বিশেষ খ্যাতি আছে। গ্রামের ছেলে মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাধা করে নিকটবর্তী দীননাথপুর হাইস্কুলে যায়।

এই এলাকার বন্যাপ্রবণ বেশ কয়েকটি গ্রাম যেমন— সাগর পুতুল, তালিমবাটি, বনকুল ইত্যাদি গ্রামের অধিবাসীদের বন্যার হাত থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভেদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও অমরার গড় ব্লক উন্নয়ন এর যৌথ ব্যবস্থায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে বনকুল গ্রামে তৈরি হচ্ছে তিনতলা কমিউনিটি সেন্টার। এতে বন্যা দুর্গত প্রায় ৫০০ মানুষ একত্রে ঐ কমিউনিটি সেন্টারে থাকতে পারবে। এছাড়া গ্রামের গবাদি পশুদেরও বন্যার সময় আলাদাভাবে ওখানে রাখার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে [৩২]।

বেলুটি ঃ— আউশ গ্রাম থানার ১ নং ব্লকের ১২১ নং জে. এল. এর অন্তর্ভুক্ত এক ছোট গ্রাম বেলুটি। এই গ্রামের বিশেষ আকর্ষণ হল শারদীয়া দুর্গোৎসব। বঙ্গের এটি জাতীয় উৎসব হলেও এই দুর্গোৎসবই এখানকার বাৎসরিক গ্রাম্য উৎসব। একে কেন্দ্র করেই কয়েক দিন ধরে গ্রামের লোকের বিশেষ মাতামাতি লক্ষ্য করা যায়। এই উৎসবেই আত্মীয়-পরিজনদের আমন্ত্রণও করা হয় এবং একে ঘিরেই গ্রামে ৪/৫ দিনের জন্য তখন একটি মেলাও বসে। মেলাটি প্রায় ১০০ বছর প্রাচীন। গ্রামটিও বেশ প্রাচীন কারণ ভোজ বর্মার বেলবে তাম্র শাসনে এই গ্রামের নাম পাওযা যায়। এটি বিল্বহিষ্টা > বেলুটি নামে নামিত হয়েছে।

বুদবুদ ঃ— বর্তমানে বুদবুদ নিজেই একটি থানা। এর জে.এল. নং ১১। জি. টি. রোডের সংলগ্ন বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে বুদবুদ সেমি টাউন। পূর্বে এটি একটি মহকুমা সদর ছিল। বর্ধমান জেলা Gagetteers এ বলা হয়েছে— "It was formerly the head quarters of a subdivision and the station of a Munsif." (৩৩)

তখন এর অধীন বর্ধমানের বুদবুদ ও আউশগ্রাম এবং বাঁকুড়ার সোনামুখী এই তিন থানা সংযুক্ত ছিল। পরে ১৯৯৮ খ্রিঃ এক ফরমানে তার অবলুপ্তি ঘটে। ফলে বুদবুদের গুরুত্ব কমে যায়। পবে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য ১৯৭১ খ্রিঃ গলসী থানার ৩৫ টি মৌজা ও আউশ গ্রাম থানার ২৬ টি মৌজা কেটে নিয়ে নতুন বুদবুদ থানাব সৃষ্টি হয় তার ফলে বুদবুদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

বুদবুদের প্রধান পরিচয় হল এটি একটি বিশিষ্ট ব্যবসাক্ষেত্র। স্থানীয় বহু ব্যবসায়ী ছাড়াও, ভিন রাজ্যের বহু ব্যবসায়ীও এখানে ভিড় জমিয়েছেন। গ্রাম হিসাবে এর প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে এখানে ভিন প্রদেশের বহু লোকের সমাগম ঘটায় এক মিশ্র কৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে, তবুও বাঙালিদের বিভিন্ন পূজানুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হলেও এখানকার প্রধান উৎসব হল ধর্মরাজের গাজন।

বেতালবন ঃ— গলসী থানার আওতায় এটি একটি উল্লেখ্য গ্রাম। বর্ধমান থেকে গলসীর রামগোপালপুর যাবার পথে লোহা হয়ে বেতাল বনে যাওয়া যায়। গ্রামের নাম বেতালবন সম্ভবত গ্রামে অবস্থিত বেতালেশ্বর শিবের নাম থেকেই নিষ্পন্ন হয়েছে। গ্রামে অন্যান্য পুরাকীর্তির মধ্যে জমিদার শান্তিরাম প্রতিষ্ঠিত শান্তিশ্বর শিবও অধিষ্ঠিত আছেন।

গ্রামে দুর্গোৎসব মহাধুমধামে পরিপালিত হলেও অন্যান্য ধর্মীয় পূজাপার্বণ যথা নিয়মে পালিত হয়। এই গ্রামেই মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক তথা সাহিত্য সমালোচক সজনীকান্ত দাস। অন্যদিকে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শিল্পী রামদাস বাউলের জন্মস্থানও এই গ্রামে।

বসুধা ঃ— কাঁকসা থানা ৩৫ নং জে. এল. ভুক্ত প্রাচীন গ্রাম বসুধা। পানাগড়-

ইলামবাজার জাতীয় সড়ক দক্ষিণ থেকে উত্তরে অগ্রবর্তী হবার কালে অজয়ের ব্রীজের সামান্য দক্ষিণে এই গ্রামের মাঝ বরাবর অতিক্রান্ত হয়েছে। গ্রামটি বেশ প্রাচীন কারণ ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি নরসিহং বসুর পিতা ঘনশ্যাম বসুর জন্মভূমি ছিল এই গ্রাম। কবিকে তাই বলতে শুনি—

"বসু ঘনশ্যামাত্মজ সেবি ধর্ম্মপদ রজ
রচিল ত্রিপদীছন্দে পদ।" (৩৪)

বিশেষ কারণে কবির পিতা অজয় সান্নিধ্য ত্যাগ করে দেবনদী দামোদের পার হয়ে দক্ষিণ দামোদরের খণ্ডঘোষ থানার শাঁখারি গ্রামে বসতি করেন।

এই গ্রামের উল্লেখ্য পুরাকীর্তি তথা দেবকীর্তি হল গ্রামের সংলগ্ন সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমের এক উঁচু ভূভাগ ডাঙ্গালে দেবীরূপাই চণ্ডীর অবস্থান। (ডাঙ্গাল প্রসঙ্গে তা বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে) এছাড়াও গ্রামের পূর্বদিকে সামনে আটচালাসহ এক রেখ দেউলের শিব মন্দির বর্তমান। সেখানে শিবের নিত্যসেবা এবং বিভিন্ন শৈব অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হলেও জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখান একটি মেলাও বসে। তাছাড়া গ্রামের পূর্বদিকেই রয়েছে চড়ক তলা, সেখানে অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিসহ চৈত্রে চড়ক অনুষ্ঠিত হলেও বছরের বিভিন্ন সময়ে রথযাত্রা ও অন্য বিভিন্ন পর্বও বিশেষ ধুমধামে উদযাপিত হয়।

গ্রামটি অজয় নদীর কাছে একেবারে দক্ষিণ তীরে অবস্থিত হওযায় বন্যার সম্ভাবনা বেশি। প্রায়ই বাঁধ ভেঙ্গে বন্যা হয়ে থাকে। তবে কৃষি প্রধান গ্রাম। গ্রামের সাবেক অধিবাসী অধিংকাংশই সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ভূক্ত। তাছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত বহু উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ও রয়েছে। ফলে উভয় শ্রেণীর মিলিত পরিশ্রমে এখানে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। গ্রামে চাকুরিজীবীর সংখ্যা নেই তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। গ্রামের মাঝ বরাবর পাকারাস্তা প্রসারিত হওয়ায় বর্তমানে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছে।

বনকাটি ঃ— কাঁকসা থানার অরণ্য ঘেরা প্রকৃতির কোলে এক প্রাচীন ঐতিহ্যময় গ্রাম বনকাটি। এর জে. এল নং-৩৭, পানাগড়-ইলামবাজার রাস্তায় ১১ মাইল মোড় অতিক্রম করে সামান্য উত্তরে নেমে কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে অগ্রবর্তী হলে প্রথমে অযোধ্যা পার হয়ে বনকাটি গ্রামে যাওয়া যায়। অযোধ্যা ও বনকাটি গ্রাম ২টি পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গ্রাম একসঙ্গে অযোধ্যা বনকাটি নামে পরিচিত।

এক সময় বনকেটে গ্রামের পতন হয়েছিল বলেই গ্রাম নাম বনকাটি হয়। বিংশ শতকের ষাটের দশকে এই গ্রামেই আবিষ্কৃত হয়েছিল অসংখ্য প্রস্তরযুগ এবং ফসিল উডের বিভিন্ন নিদর্শন। যাদের বয়ক্রম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত হল— "এই সকল বৃক্ষ জীবাশ্ম নির্মিত আয়ুধের বয়স আনুমানিক দেড় লক্ষ হতে দুলক্ষ বছর। (৩৫)

আর প্রস্তরায়ুধগুলির বয়ক্রম খ্রিষ্টপূর্ব ছয় হাজার বছরের অধিক প্রাচীন। সেই নিরিখে বিচার করলে এই এলাকাগুলি যে খুবই প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই। গ্রামটির অন্য বিশেষত্ব হল যে, এটি মন্দির ভাস্কর্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন।

গ্রামের প্রাচীন জমিদার ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ কিন্তু নবাবী আমলে তারা 'রায়' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পর রায় পদবিই ব্যবহার করে আসছেন। এই রায় বংশের পূর্বপুরুষরা নিজেদের বসতবাড়ির সংলগ্ন বেশ কয়েকটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন এবং তাদের বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের বিভিন্ন জনের নামে ঐ বিগ্রহগুলি নামিত হয়েছিল। যেমন— উত্তরমুখী ২টি শিব মন্দির রয়েছে যাদের একটির নাম উমেশেশ্বর, অন্যটি বিশ্বেশ্বর। পূর্বমুখী আরও তিনটি শিব মন্দির বর্তমান, যাদের মধ্যে দক্ষিণেরটির নাম গোপালেশ্বর, মধ্যেরটি উমেশেশ্বর ও উত্তরেরটি কালীশ্বর। তাছাড়া এখানে এই বংশের সাধক প্রবর মহেশ্বর প্রসাদের পঞ্চমুণ্ডির আসনে ১৭০৪ শকে (১৭৮২ খ্রিঃ) একটি কালীমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা এখনও বর্তমান রয়েছে। মন্দিরগুলির গায়ে অল্প বিস্তর টেরাকোটার কাজও লক্ষ করা যায়।

গ্রামের জমিদার বংশের কোন কন্যার বসুধা গ্রামের মুখার্জী পরিবারে বিয়ে হয়। কিন্তু তাদের অবস্থা ক্ষীণ থাকায় জামাইকে তারা নিজ গ্রামে এনে বসতি করায়। রায়েদের তখন বিশাল ব্যবসা ছিল। তারা এখান থেকে কাঠ কয়লা কলকাতায় বিক্রয় করে সেখান থেকে নৌকা বোঝাই মশলাপত্র নিয়ে কাটোয়ার শাঁখাই ঘাট থেকে অজয় ধরে সাতকাহনিয়া হয়ে রক্ত নালা ধরে বনকাটির পাষাণচণ্ডীর মাঠে নৌকা ভিড়াতেন। জামাই মুখার্জীরাও গালার ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে প্রভুত বিত্তের অধিকারী হন। ফলে উভয় পরিবারই ব্যবসায়ের মাধ্যমে বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন হয়েছিলেন। ফলে রায়েরা যেমন গ্রামে অনেক দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তেমনি মুখার্জীরাও সেই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।

শোনা যায় মুখার্জীদের এক দিনের লাক্ষা ব্যবসায়ে যে লাভ হয়েছিল তা দিয়েই তৈরি হয়েছিল এতদ অঞ্চলের প্রখ্যাত দর্শনীয় পুরাবস্তু, পঞ্চচূড়া মন্দিরের আদলে গঠিত পিতলের রথ। অন্য এক দিনের লভ্যাংশ থেকে তৈরি হয়েছিল পাশেই পঞ্চচূড়ার গোপালেশ্বর শিব মন্দির। এ মন্দিরে প্রচুর দুর্লভ টেরাকোটার কাজ লক্ষণীয়। এ দুটি পুরাকীর্তিই নির্মিত হয়েছিল ১২৪২ বঙ্গাব্দে (১৮৩৫ খ্রিঃ)।

এখন রথের প্রসঙ্গে আসা যাক। রথটির ১২৪১ সালের ২রা মাঘ নির্মাণ পর্ব শুরু হয়েছিল এবং ১৫ই আষাঢ় ১২৪২ সালে তা শেষ হয়েছিল অর্থাৎ মাত্র সাড়ে পাঁচ মাসে এটির নির্মাণ পর্ব শেষ হয়। রথের গায়ে খোদিত লিপি থেকেই এই তথ্য জানা যায় কিন্তু রথের স্রষ্টা শিল্পীদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সে পর্ব সম্পূর্ণ

তমসাবৃত। তবে শ্রদ্ধেয় তারাপদ সাঁতারর 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকার এক প্রবন্ধে জানা যায় এটি বঙ্গের পিতলের রথসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম।

রথটি তিন থাকে অবিকল পঞ্চরত্ন মন্দিরের আদলে তৈরি। দূর থেকে একে দেখলে ঠিক পঞ্চরত্নের মন্দির বলেই মনে হয়। রথটি লোহার ফ্রেমের উপর পিতলের পাত দিয়ে মোড়া। কয়েকটি লোহার চাকা তাতে লাগানো— ফলে দড়ি বেঁধে টানলেই এটি সহজেই গড়িয়ে যায়। সম্পূর্ণ রথটি তিনটি থাকে তৈরি। মোট উচ্চতা ১৫ ফুটের মত। প্রথম থাক অর্থাৎ একতলার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৬'৫", ২য় তলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪'৫"। এই তলের উপরেই ৪ কোণে ৪টি চূড়া, এদের মধ্যে মাঝখানে রয়েছে আর একটি বড় চূড়া-যার গর্ভে সিংহাসনে এই রথের দেবতা অষ্টধাতুর নাড়ুগোপালকে বসিয়ে রথের দিনে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। রথে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার কোন মূর্তি চাপানো হয় না। গোপালকে ঘিরে মোট ৪টি পিতলের গড়ুর মূর্তি জোড় হাতে দাঁড়ানো ভঙ্গিমায় রথে অবস্থিত আছে। প্রথম থাকের উপরে চাতাল বরাবর পিতলের রডের রেলিং ছিল কিন্তু বর্তমানে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। আরও টুকিটাকি অনেক আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি রথ থেকে একে একে যাচ্ছে। এর প্রতিরোধ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

রথের গায়ে আগাগোড়া পিতলের চাদরে মোড়া পাতের গায়ে অদ্ভুত দক্ষতায় শিল্পীর ছেনি দিয়ে খোদাই করেছেন বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবীর লীলা খেলার মূর্তি এবং অঙ্কিত করেছেন লতাপাতার নানান অলংকরণ। রথের গায়ে আরও আছে টেরাকোটার আদলে তৈরি পিতলের ঢালাইয়ের বহু দেব-দেবীর মূর্তি। ফলে শিল্প সুষমায় মণ্ডিত অদ্ভুত এই রথের সন্ধান পেয়ে শিল্পাচার্য স্বর্গত নন্দলাল বসু তার বিশ্ব ভারতীর কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এখানে এসে এই অলংকরণের ড্রইং করে বা ছাপ তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন শান্তি নিকেতনে এবং একাধিক নকশা এই আদলে তৈরি হয়ে সেখানকার মাটির তৈরি ছাত্রাবাসের দেওয়ালের শোভাবর্ধন করছে।

রথযাত্রার উৎসবকালে বহু দূরদূরান্ত থেকে এখানে লোক সমাগম হয়ে থাকে। বনকাটিগ্রামের প্রখ্যাত রায় বংশের অন্যতম শরিক, নিপাট ভদ্রলোক নীলমাধব রায়ের বাড়ির লাগাও এই রথের অবস্থান। উত্তরাধিকারী সূত্রে এই রথের পরিচর্যা ও উৎসব উদযাপনের দায়িত্ব এখন এই ভদ্রলোকের উপরেই অর্পিত হয়েছে। রথ উৎসবকে কেন্দ্র করে তখন গ্রামে একটি মেলাও বসে।

বিভিন্ন শাক্ত, শৈব অনুষ্ঠানাদি যথা নিয়মে পরিচালিত হলেও গ্রামে বৈষ্ণব আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত যুগল বিগ্রহের সেবাপূজা ও বাৎসরিক নানা বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান যেমন— দোলা জন্মাষ্টমী, ২৪ প্রহর সবই পরম যত্নে নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

বিদবিহার ঃ— অজয় নদীর দক্ষিণে কাঁকসা থানার অধীন দুর্গাপুর-শিবপুর রাস্তার

পশ্চিমে এই গ্রামের অবস্থান। শিবপুরের দক্ষিণে নেমে পশ্চিম দিকে কিছুটা অগ্রবর্তী হলেই গ্রামে যাওয়া যায়। এর জে. এল. নং-১২। গ্রামটি যে প্রাচীন তা এর নাম থেকেই অনুমান করা যায়। পণ্ডিতদের মতে এখানে অতীতে কোন বৌদ্ধ বিহার ছিল তা থেকেই অপভ্রংশিত হতে হতে বৌদ্ধবিহার > বিদ্ধবিহার > বিদবিহার নামে পরিণত হয়েছে [৩৬]। অনেকের মতে এখানে পাল যুগে বিরাট এলাকা জুড়ে বৌদ্ধদের বিহার বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল ছিল।

এই গ্রামে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হলেও এখানে ধর্মরাজ 'বুধরায়' এর প্রাধান্য রয়েছে। এর নাম করণেও পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ কৃষ্টির সন্ধান পান। তাদের মতে বৌদ্ধ > বুদ্ধ হয়েছে এবং সেই বুদ্ধই এখানে রাজা রূপে স্বীকৃত হয়ে 'বুদ্ধরাজ' রূপে পূজিত হতেন। পরে ব্রাহ্মণ ধর্মের অধিগ্রহণে সেই বুদ্ধই আত্মবক্ষার্থে বুদ্ধরাজ > বুধরায় নামে ধর্মরাজ রূপে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানে পূজিত হচ্ছেন।

এই এলাকা পাল যুগে বৌদ্ধ প্রভাবে প্রভাবিত যে হয়েছিল তা অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। কারণ এব ধাবে কাছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অনেক প্রভাবই পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। নিকটেই বযেছে কোন্দার ঘাট নামে এক গ্রাম— যেখানে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধক ঘনশ্যাম দাসের সাধনস্থল এবং সেখানে তার শ্রীপাটও বর্তমান। সেই গ্রাম সম্পর্কে একটি চলতি ছড়ায় শোনা যায়—

"নেড়া নাচে পাঁঠা কাটে
দেখে এলাম কোন্দার ঘাটে।"

নেড়া অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষা পাত্র নিয়ে পাঁঠা কাটার স্থলে নাচানাচি করত— কারণ কর্তিত পাঁঠার মাংস ভিক্ষা হিসাবে পাবার জন্য। বৌদ্ধরা অহিংস তাই পাঁঠাবলি দিত না কিন্তু পাঁঠার মাংস ভিক্ষা হিসাবে পেলে খেত। সেদিক থেকে প্রাচীন ঐতিহ্য পূর্ণগ্রাম এই বিদবিহার। অজয় নদীর দক্ষিণে এটি একটি কৃষি কেন্দ্রিক গ্রাম। গ্রামে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস হলেও প্রায় সকলেই কৃষিজীবী।

বেতাগ্রাম ঃ— কাঁকসা থানার ঠাকুরাণী বাজার মৌজার অধীন এক ছোট গ্রাম। গ্রামটি জামদহ গ্রামের পূর্বে অজয় নদীর দক্ষিণে বাঁধের নীচেই এর অবস্থান। এই গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের। চাষ-আবাদই এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা। উল্লেখযোগ্য তেমন কোন দেবকীর্তি নাই। তবে গ্রামে পঞ্চাননের একটি আটন দেখা যায়।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায় পূর্বে হয়ত এখানে বেতস লতার প্রাধান্য ছিল এবং নদীর ধার বলেই তা হওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। তাই সেই বেতস থেকেই বেতা এবং তার সঙ্গে 'গ্রাম' যুক্ত হয়ে 'বেতাগ্রাম'। মাঝে প্রবাহমান অজয় নদী। তার উত্তরে রয়েছে একটি গ্রাম। নাম টিকরবেতা। টিকর শব্দের অর্থ উচু জায়গা বা ডাঙ্গা,

যা একদা বেতস আচ্ছাদিত হওয়ায় তার নামটি টিকরবেতা হয়েছে। সে অর্থে এই গ্রামও বেতস আচ্ছাদিত হয়ে বেতাগ্রাম হয়েছে তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। গ্রামটি প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব, বর্তমানে জয়দেব কেন্দুলির পশ্চিমে অবস্থিত।

বড়গড়িয়া ঃ— দুর্গাপুরের সন্নিকটে উত্তর দিকে ধবনী গ্রামের কাছেই বড়গড়িয়া গ্রামের অবস্থান। এটি একটি ছোট গ্রাম এবং গোপ প্রধান গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই পল্লব গোপ।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে অনুমান করা যেতে পারে কোন বড় গড়ে বা পুকুরকে কেন্দ্র করে গ্রামটি একদা গড়ে উঠেছিল তাই নামকরণ হয়েছে বড়গড়িয়া। তুলনায় বলা যায় একদা এক গড়ে বা পুকুরে মোষ পড়ে যাওয়ায় গ্রাম নাম হয়েছিল মোষগড়ে। সেই নিরিখে এটিও কোন গড়ে বা পুকুরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গ্রাম বলে মনে করা যেতে পারে।

সে যাই হোক গ্রামটি কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম। তবে দুর্গাপুর নিকটে হওয়ায় এদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। অনেকেই শহরে দুধছানার কারবারও করেন। তাছাড়া চাষই প্রধান জীবিকা। গ্রামে বিভিন্ন সময়ে নানা উৎসব ও পুজানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলেও গাজন অনুষ্ঠানই এখানকার প্রধান উৎসব। গাজন উপলক্ষে অনেকভক্ত ও সন্ন্যাসীও হয়ে থাকে। সেই সময় আত্মীয়-পরিজনদেরও তখন গ্রামে আমন্ত্রণ করা হয়। চৈত্র মাসে এখানে চড়ক অনুষ্ঠিত হয়।

বুধরুইতলা ঃ— ফরিদপুর থানাধীন অজয় নদীর তীরবর্তী এক ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। ইছাই ঘোষের শত্রুপক্ষ লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোমের মাথা ইচ্ছাই ঘোষ কর্তৃক কর্তিত হয়েছিল। লোক বিশ্বাস সেই মাথা নাকি অজয় তীরস্থ এই বুধরুইতলা গ্রামে পোঁতা হয়েছিল। কালুডোম এই অঞ্চলের লোক হওয়ায় এবং তার সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীররূপে স্বীকৃত হওয়ায় এখনও এতদ অঞ্চলের ডোমেরা কালুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করে। কুল পূজার প্রথা মেনেই প্রতি বছর নতুন মেঘের দিন ১৩ই বৈশাখ কালু ডোমের উদ্দেশ্যে এই গ্রামেই ডোমেরা পূজা নিবেদন করে থাকে।

অনেকের মতে ঐ পূজা কালু ডোমের উদ্দেশ্যে না হয়ে বৌদ্ধ উপাসক ডোমেরা কোন বৌদ্ধ দেবতার উদ্দেশ্যেও নিবেদন করতে পারে। কারণ তখনকার দিনে এই এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য ছিল, আর ডোমজাতির মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপকতা ছিল। বুধরুই কথাটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে স্থানীয় টিকর বেতানিবাসী শ্রদ্ধেয় গবেষক ডঃ অজিত দাস বলেছেন— বৌদ্ধ > বুদ্ধরাজ > বুধরায় > বুধরুই হয়েছে।

বালিজুড়ি ঃ— শিল্পনগরী দুর্গাপুরের কিছু পশ্চিমে ফরিদপুর ব্লকের ১৬ নং জে.

এল. ভুক্ত কয়লাখনি অঞ্চল ঝাঝরা প্রজেক্ট এর সংলগ্ন এক গ্রাম বালিজুড়ি। ভারত-রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে এখানে ঝাঝরা প্রজেক্ট নির্মিত হয়েছে। একদা এই গ্রামে বিশেষ কয়েকটি পরিবারের প্রচেষ্টায় এখান অনেক মন্দিরাদি গড়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে প্রাচীন কৃষ্টি সম্পন্ন গ্রামটি সবিশেষে ঐতিহ্যপূর্ণ।

গ্রামের উল্লেখ্য জমিদাব বামকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পিতা শিশুরাম ও পিতৃব্য কবিরাম উভয়ের গ্রামস্থ এক বিল্ব বৃক্ষমূলে পঞ্চমুণ্ডির আসনে তন্ত্রসাধনায় বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ সাধকদ্বয়-এর মধ্যে শিশুরাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ক্ষ্যাপাকালী এবং ঐ বংশের অনেকেই যেমন— নবীনরাম নবীনাকালী এবং রামকান্ত এলোকেশী কালী মন্দিবও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়াও আরও যে সকল মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল— দুর্গামন্দিব, বিষ্ণুমন্দির এবং পঞ্চশিব মন্দিব ও ত্রৈলোক্যতারণ শিবমন্দির।

এতক্ষণ জমিদাব বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবকীর্তির কথা বলা হল, এবার জমিদারদের দৌহিত্র হিসাবে ব্যানার্জী পবিবাবেব কথা বলতে হয। এরাও গ্রামে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন— যা এখনও বাঁড়ুজ্যে কালী নামে খ্যাত। এছাড়াও গ্রামের অন্যতম সাধক শঙ্করাচার্যপুরী গোস্বামীও শ্মশানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্মশানকালী এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিল্বমঙ্গল মঠ। উক্ত পুরাকীর্তিগুলি ছাড়াও গ্রামে রয়েছে অন্নপূর্ণা আশ্রম, গোপাল মন্দির, টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত দুর্গামন্দির, শিবমন্দির ও গ্রাম প্রান্তে প্রাচীন মনসামন্দির ইত্যাদি দর্শনীয় পুরাকীর্তি।

গ্রামটি মূলত কৃষিপ্রধান গ্রাম। তবে খনি এলাকা সংলগ্ন হওয়ায় এবং শিল্পাঞ্চলভুক্ত হওয়ায় চাকুবিজীবীর সংখ্যাও বেড়েছে। মুখ্যত খনি অঞ্চলের জন্যই বহিরাগত জনসমাগম বাড়ায় এবং আধুনিক জনজীবনের দিকে ঝোঁকার প্রবণতা বাড়ায় গ্রামের আঙ্গিকেরও ধীর পরিবর্তন সূচিত হতে হতে তা নগর সভ্যতার দিকে ঝুঁকছে।

বাবুই সোল ঃ— রাণীগঞ্জ ব্লকের কাজোড়া মোড় থেকে এক কি. মি. পশ্চিমে ছোট গ্রাম বাবুই সোল। হিন্দু অধ্যুষিত এই গ্রামে গোপ সম্প্রদায়ের আধিক্যই বেশি। সে দিক থেকে এটিও গোপভূমের আর এক গোপপ্রধান গ্রাম।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায় সোল অর্থে নীচু জমি। তাতে একদা বাবুই ঘাসের প্রাধান্য থাকায় গ্রাম নাম বাবুইসোল হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। গ্রামটি ছোট হলেও প্রাচীন। গ্রামের উল্লেখ্য দেবতা হলেন পশুপতিনাথ শিব। এই শিব এখানে নিত্য পূজিত এবং এক গোপপরিবারই এর সেবক। শিবের বাৎসরিক উৎসব চৈত্র সংক্রান্তিতে, গাজন অনুষ্ঠানের কালে এই অনাদিলিঙ্গ শিবের বিশেষ ধূমধামে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই উৎসবকে ঘিরে তখন মন্দির সংলগ্ন সরকারি জায়গায় বেশ কয়েকদিন ধরে একটি জোড়াল মেলা বসে।

কৃষিপ্রধান গ্রাম হলেও কলিয়ারী এলাকায় এর অবস্থান হওয়ায় অনেকই বাইরে কাজ করে করে। অনেকের দুধ-ছানার কারবারও আছে।

বাথানবাড়িঃ— সালানপুরথানার অধীন সালানপুর পঞ্চায়েতের সামিল বাথানবাড়ি হালদা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এক ছোট গ্রাম। গ্রামের জনসংখ্যা সাড়ে তিনশর মত। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তবে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম। গ্রামে চাষ-আবাদের কোন সুযোগই নাই। এখানে কয়েক ঘর মাল্লাদের বাস।

পাহাড় ঘেরা কল্যাণেশ্বরী থেকে এর দূরত্ব মাত্র দেড় কি. মি.। নিকটে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির উজ্জ্বল ফসল, নয়ন লোভন মাইথন ড্যাম। বার মাস থই থই জলে ঘেরা কৃত্রিম নয়নহরণ জলাধারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী এখানে আসেন। তাদের অনেককেই অমায়িক জলবিহারের উদ্দেশ্যে বাথানবাড়ির মাল্লারা নৌকা যোগে এই জলাধারে নৌচালনার কাজে ব্রতী হয়। এই কাজে নেমে তারা বেশ সাফল্যও পায়।

পরে তারা গ্রামের আরও অনেক (৩১ জন) মাল্লাকে নিয়ে ১৯৯৫ খ্রিঃ "মাইথন বোটমেনস পরিবহণ সমবায় সমিতি" নামে একটি সংস্থা তৈরি করে। সে সংস্থায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই সামিল করা হয়। ঐ সমবায় সরকারি সাহায্যও পেতে থাকে। তার ফলে তারা আরও ৪টি প্যাডেল বোট এবং ১৫টি নৌকা সংযোজন করে। মাল্লাদের আপন্ প্রচেষ্টায় তাদের এই অভিনব জলবিহারের পরিকল্পনার দৌলতে গ্রামবাসী আজ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতায় বেশ উন্নীত হয়েছে।

একটি নৌকায় ৭ জন করে লোক ধরে, তাদের এক ঘন্টা জল বিহার করিয়ে পারিশ্রমিক আদায় হয় ৬০ টাকা। আর প্যাডেল বোটে এক সঙ্গে চার জনের বসা চলে। এদের ভাড়া একটু বেশি। আসল জল বিহারের মরশুম শুরু হয় নভেম্বর থেকে চলে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অন্য সময় তাদের প্রায় বসে থাকার কথা কিন্তু ঐ সময়টা তারা অন্যভাবে ব্যয় করতে চায়। তারা ঐ জলাশয়ে মৎস্য চাষের পরিকল্পনা নিয়েছে এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে আবেদন করায় তাদের সে আবেদন মঞ্জুরও হয়েছে। তাদের জন্য সরকারি মৎস্য বিভাগ জলাশয়ে ১২ কুইন্টাল মাছ ছেড়েছে। তাদের মৎস্য চাষ প্রকল্পে এতদ অঞ্চলের বহু গ্রামই উপকৃত হবে বলে সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতি মনে করে [৩৭]।

(ভ)

ভেদিয়া ঃ— আউশ গ্রাম ২ নং ব্লকের মধ্যে ভেদিয়া একটি প্রাচীন গ্রাম। এর জে. এল. নং-১৩১ বর্তমানে রামপুর হাট লুপ লাইনের এটি একটি উল্লেখ্য রেল

স্টেশন। বাসেও বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে সহজেই যাতায়াত করার সুযোগ আছে তাই যোগাযোগের সুব্যবস্থার জন্য এটি একটি ব্যবসাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রাচীনকালে অজয় নদী নাব্য থাকার সময় অজয়ের নিকটবর্তী ব্যবসাক্ষেত্র হিসাবেও এর প্রসিদ্ধি ছিল। তখনকার দিনেও এখানে নাগরিক পরিষেবার সুযোগ থাকায় এটি নগর রূপেই পরিচিত ছিল তাই তখনও বহু প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে একে 'ভদ্দিনগর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিনেব সেই ভদ্দিনগরই (ভদ্দিনগর > ভেদিয়া) 'ভেদিয়া' নামে বর্তমানে পরিচিত হয়েছে।

এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বাস। বর্তমানে এর উপর দিয়ে রেল লাইন বিস্তৃত হওয়ায় অনেক অবাঙালি সম্প্রদায়ও এখানে বাস করছে। এখানে হিন্দুদের মধ্যে যেমন উচ্চ বর্ণের লোকের বাস রয়েছে তেমনি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের লোকও প্রচুর আছে, এমনকি আদিবাসী সম্প্রদাযের সংখ্যাও অনেক। তাই এটি এখন মিশ্র কৃষ্টির দিকে অগ্রবর্তী হচ্ছে। তবুও বাঙালিদের সংখ্যাই বেশি হওয়ায় গ্রামে বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীব পূজা মহাধুমধামে পরিপালিত হলেও ধর্মরাজ ও কালীপূজার ধুমই সব থেকে বেশি।

জ্যৈষ্ঠমাসে মহাধুমধামে ৪/৫ দিন ধরে এখানে ধর্মরাজের গাজন পালিত হয়। গাজনে ভক্তও হয় অনেক। তাদের সংখ্যা কম করেও ৭০/৮০ জন হয়ে থাকে। বানফোঁড়া থেকে শুরু করে নানারকম দৈহিক উৎপীড়নমূলক কৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার ধর্মরাজ বেশ জাগ্রত তাই দূর দূরান্ত থেকে অনেক ভক্তের আগমন হয়ে থাকে। অন্যদিকে কার্তিক মাসে কালীপূজাও বেশ জাঁক জমকেই পালিত হয়। কালীও খুব মহিমান্বিত, ফলে বহু দূরাগত স্থান থেকেও ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে। বহু ভক্তই তাদের কামনা পূরণ হওয়ার জন্য মানতাদিসহ ছাগবলি দিয়ে মায়ের পূজা প্রদান করে। কালীর কৃপায় নানাবিধ রোগ উপশম হয়, বিশেষ করে চর্মরোগের নিরাময়ের জন্য এখান থেকে ওষুধও দেওয়া হয়।

ভেদিয়া ঃ— মোরবাঁধ রাস্তা ধরে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে বেশ কিছু পুরাকীর্তি ও দেবদেবীর মন্দিরাদি বর্তমান। গ্রামে কয়েকটি শিব মন্দিরও রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল বুড়ুলেশ্বর শিব। চৈত্র মাসে এখানে অনেক ভক্তের দ্বারা শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে উল্লেখ্য দুই ধর্মরাজও বর্তমান। এদের একটির নাম কালারাক্ষ—যার সেবাইত ছিলেন মেটেরা, বর্তমানে সদ্‌গোপ দ্বারা পূজিত। এটি এক পাকুড় গাছের তলায় অবস্থিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে পূজিত হন। আর এক ধর্মরাজ হলেন বুড়োরাক্ষ। আচার্য ব্রাহ্মণেরা হলেন এর দেয়াসি। পূজক হলেন গাঙ্গুলীরা আর সেবাইত বা পরিচালকরা হলেন সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের ঘোষেরা। ইনি বটতলায় অবস্থিত। লোক বিশ্বাস এরা দু ভাই। বড় কালারাক্ষ, ছোট বুড়োরাক্ষ। এখানে আচার্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা 'চালান গান' গাওয়া হয়।

এখানকার ধর্মরাজদ্বয় হলেন আপাল গাজনের ধর্মরাজ। গ্রামের লোকেরা একত্রে বসে এদের গাজনের দিন স্থির করেন। বহুবিধ অনুষ্ঠান সহ এদের গাজন পরিপালিত হয়। বানফোঁড়া, ধুনোসেবা, ঝাঁপ দেওয়া সবই হয়ে থাকে। ঝাঁপ দেওয়াতে ১৪ হাত উচু জায়গা থেকে নীচে রাখা কলার পাতার উপর ঝাঁপ মারে। একে আত্মবলিদান বলা হয়। এই ধর্ম রাজক্ষেত্রে ওষুধ দেওয়া হয়, যাতে দুরারোগ্য বহু ব্যাধির উপশম হয়। ওষুধ হল যজ্ঞের কলা ও স্নান জল।

গ্রামে রয়েছে রাধাবল্লভের মন্দির। সেখানে শিলারূপী যুগল মূর্তি বর্তমান। নিত্যসেবা হয়। বিশেষ উৎসব হয় জন্মাষ্টমীতে, ইনি গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের ঠাকুর। গ্রামে অষ্ট ধাতুর গোপাল মূর্তিও আছে। আর আছে দামোদর মন্দিরে দামোদর শিলা। এগুলি ছাড়াও সবথেকে আকর্ষণীয় এবং প্রাচীন পুরাকীর্তি রূপে গ্রামে বর্তমান রয়েছে কুড়ুম্বাচণ্ডী। যার নাম থেকেই গ্রাম নাম কুড়ুম্বা হয়েছে। এই মূর্তি খুবই প্রাচীন, পাল যুগীয় মূর্তি বলেই অনেকে অনুমান করেন। এটি কালো পাথরের বাসন্তী মূর্তি। দেবীর দু'দিকে রয়েছে দুই ভৈরব মূর্তি। মূর্তিটি প্রায় একহাতের মত উঁচু। একতলা দালান মন্দিরে এর অবস্থান। চৈত্রমাসে বাসন্তী পূজার সময় এই দেবীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে— এবং চার দিন ধরে বাসন্তীপূজার মতই দেবী কুড়ুম্বাচণ্ডীর পূজা হয়ে থাকে। গুসকরা রটন্তী কালীর প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধপুরুষ রতন ক্ষেপাই নাকি এর কাছে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কয়েক বছর হল ১লা বৈশাখ চণ্ডীতলায় মহোৎসব শুরু হয়েছে, তাতে কয়েক হাজার লোক প্রসাদ পায়। অনেকের মতে কুড়ুম্বা নামের অনেক গ্রামের মধ্যে একেই আদি বোঝাতে হয় আদি কুড়ুম্বা > আদা কুড়ুম্বা হয়েছে।

ভাটগন্না ঃ— আউশ গ্রাম ১ নং ব্লকের অধীন ১৩৯ নং জে. এল. ভুক্ত গ্রাম ভাটগন্না। দিগনগরের সন্নিহিত হিন্দু প্রধান গ্রাম তবে সদ্‌গোপদের সংখ্যাই বেশি। দিগনগরের উত্তর পূর্বে এর অবস্থান। গুসকরা থেকে বুদবুদ যাবার পাকা রাস্তায় দিগনগর ঢোকার আগে, রাস্তার পূর্বদিকে গাছপালা ঝোপ-ঝাড়ে আচ্ছাদিত এলাকাই 'কেঁয়োতলা' নামে খ্যাত, সেখানে নেমেই গ্রামে যাওয়া যায়। এই কোঁয়োতলা ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত জনপদই ভাটগন্না নামে পরিচিত।

এখন যাকে কেঁয়োতলা বলা হচ্ছে, পূর্বে সেখানে কেয়াকুঞ্জ বা কেয়া গাছের জঙ্গল ছিল— তা থেকেই অপভ্রংশিত হয়ে কেঁয়োতলা হয়েছে। এখানের বন-বীথির ছায়া ঘন আচ্ছাদনের মাঝে রয়েছে দক্ষিণমুখী শিখর দেউল রীতিতে তৈরি এক শিব মন্দির। তার চারদিকে টিনের ছাউনিসহ উঁচু বারান্দা। মন্দিরের উর্ধাংশে চারদিকে সিমেন্টের তৈরি চারটি মূর্তি— যেমন, পূর্বে লক্ষ্মী-নারায়ণ, উত্তরে রাধাকৃষ্ণ, পশ্চিমে গণপতি ও দক্ষিণে শিব-দুর্গার প্রতিকৃতি লক্ষনীয়। মন্দির গাত্রের এক ফলকে ১৮২৬ শকাব্দ, ১৩০৮ সালে মন্দিরটি সংস্কৃত হয়েছিল তা লেখা আছে। মন্দির অভ্যন্তরে

কালো পাথরের শিবলিঙ্গ বর্তমান। এখানে এক বৃষমূর্তিও রয়েছে। মন্দিরের দক্ষিণেই ছোট্ট একটি কুণ্ড, যার ভিতর বার চার দিকই ইঁটের গাঁথনি করে বাঁধানো আছে। মন্দিরে প্রাঙ্গনের পশ্চিম দিকে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন টিনের ছাউনিতে আচ্ছাদিত। এখানের বৃক্ষাচ্ছাদিত শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে এক আশ্রম।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার নাম জগদানন্দ ব্রহ্মচারী। শিবমন্দিরের সামান্য দক্ষিণে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা জগদানন্দের বাঘছাল পরিধানে বসে থাকা উত্তরাস্য এক মূর্তি রয়েছে। তাকে ঘিরে স্বল্প ছাদ ও টিনের বারান্দা বেলিং দিয়ে ঘেরা। মূর্তিটি ধ্যানাসনে আসীন, তার মাথার উপর দণ্ডায়মান এক পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি, যার অর্ধেক হরি ও অর্ধেক হর অর্থাৎ হরি-হরের একীভূত মূর্তি বর্তমান।

প্রতিষ্ঠাতা জগদানন্দ বাকসিদ্ধ সাধক পুরুষ ছিলেন। তার সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। যেমন— তিনি নাকি তাব ভক্তদের চাহিদা মত অসময়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য ফল এনে খাওয়াতেন। কোন ভক্ত এখানে এসে রাত হয়ে গেলে তিনি তাকে গ্রামে আগিযে দিয়ে আসতেন, কিন্তু ভক্ত তাকে দেখতে পেতেন না, কেবল তার খড়মের আওয়াজ শুনতে পেতেন ইত্যাদি।

পরে এই আশ্রমে অনেক সাধকের আবির্ভাব হয়েছে, তবে শেষতম সাধক ছিলেন শিবানন্দ পরিব্রাজক। তিনিই এই আশ্রমের দক্ষিণে পাকারাস্তার পূর্বে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য এক বিশ্রামাগার তৈরি করিয়েছিলেন। গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস এবং সারা বছর বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠান পূজা পার্বণ অনুষ্ঠিত হলেও সব থেকে উল্লেখ্য উৎসব হল রক্ষাকালীর পূজা। ফাল্গুনের সংক্রান্তিতে রাত্রি কালে সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি এনে রাতেই পূজান্তে মূর্তি বিসর্জন ও সমবেত বহু ভক্তজনে প্রসাদ বিতরণ— এই পূজার বিশেষত্ব। ভক্তদের দানেই পূজার খরচ পরিপালিত হয়।

কৃষি প্রধান গ্রাম। চাষ আবাদই এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা, কিছু লোক ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন তবে চাকুরিজীবীব সংখ্যা খুবই কম। গ্রামের কেঁয়োতলার আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শিব নিত্য পূজিত হলেও শিব রাত্রিতে এর বিশেষ বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তখন এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু লোকজন বিশেষ করে মেয়েরা শিবের মাথায় জল ঢালা ও পূজা দেওয়ার জন্য সমবেত হন। তখনই এখানে কয়েক দিনের জন্য একটি একটি মেলাও বসে।

ভাল্কী ঃ— গোপভূমের গোপরাজ ভল্লুপদর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী এখন কিংবদন্তীর মায়াজালে ঘেরা এক প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ। বর্তমানে এটি আউশ গ্রাম ২নং ব্লকের ১০১ নং জে. এল. ভুক্ত গ্রাম। গুসকরা-বুদবুদ বাস রাস্তা অভিরামপুর অথবা সুয়াতায় নেমে উত্তরে অগ্রবর্তী হলে যাওয়া যায়।

গ্রামটি নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায়, পূর্বে গোপভূম রাজ্যের এর প্রসিদ্ধ রাজা

ভল্লুপদর রাজধানী ছিল এই গ্রামে। ভল্লুপদর নাম থেকে এর নাম হয় ভাল্কী। অনেকের মতে এই ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের টোটেম ছিল ভল্লুক, সেই ভল্লুক টোটেম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে ভাল্কী।

এটি অতীত গোপভূম রাজ্যের রাজধানী কিন্তু তার রাজবাড়ি অতীত পুরাকীর্তির তেমন কোন চিহ্ন এখন আর চোখে পড়ে না। বয়স্ক লোকেরা গ্রামের উত্তর সীমায় বিস্তৃত ফাঁকা ডাঙ্গা দেখিযে সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশে বলতে থাকে, সেখানেই প্রাচীন রাজবাড়ি ও রাজকার্যালয় ছিল— যা এখন 'চড়ক ডাঙ্গা'নামে খ্যাত। জনশ্রুতি ভল্লুপদ রাজার দুই কন্যা ছিল যথা যমুনা ও শৈবলিনী। এদের নাম অনুযায়ী রাজা গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর উত্তর-দক্ষিণে লম্বায় দুটি পরিখা তৈরি করিয়েছিলেন, যেগুলি বর্তমানে মজে গেলেও একটু লক্ষ করলেই গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। ঐ পরিখা দুটি শুরু হয়েছিল গ্রামের উত্তরে অবস্থিত ঘিবাঁধ নামক দু'টি পৃথক পুকুর থেকে যা অতীতে একটি বড় পুকুরই ছিল। বর্তমানে মাঝ অংশ মজে গিয়ে দু'টি পৃথক পুকুরে পরিণত হয়েছে। পূর্বের ঘিঁবাধ থেকে পরিখা শুরু হয়ে গ্রামের পূর্বদিক বরাবর দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে পাকারাস্তা অতিক্রম করে বর্তমানে যমুনা দিঘি পর্যন্ত বিস্তৃত। যা জলগড় > যমনো দিঘি নামে খ্যাত হয়েছে। আর ২য় পরিখা ২য় ঘিবাঁধ পুকুর থেকে শুরু করে গ্রামেব পশ্চিম বরাবর দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে সুয়াতা গ্রামের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত প্রখ্যাত সাধক বাহ্‌মান সাহেবের মাজারের কিছু উত্তরে, রাজার ২য় কন্যা শৈবলিনী নামের অপভ্রংশ হিসাবে 'শেওলা বাঁধ' নামে শেষ অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

গ্রামে ভল্লুপদ প্রতিষ্ঠিত রাজ বাড়ির চিহ্নাদির কোন হদিস না পাওয়া গেলেও গ্রামে অষ্টাদশ শতকের নির্মিত কিছু গ্রামীণ দেবালয়ের অস্তিত্ব রয়েছে তাদের সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক।

গ্রামে বনমালীশ্বর ও ভগবানেশ্বরশিব নামে দু'টি শিখর দেউলের শিবমন্দির বর্তমান। মন্দিরের পূর্ব দিকে আরও দু'টি মন্দির ছিল বর্তমানে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও তাদের চিহ্ন বর্তমান। এখানে একটি আটচালাও রয়েছে যার পশ্চিমেই ছিল এক বিষ্ণু মন্দির, সেটিও নষ্ট হয়ে গেছে। আটচালার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে আর এক শিব মন্দির, ভিতরে লিঙ্গও বর্তমান। এখানে একটি আটচালাও রয়েছে যার পশ্চিমেই ছিল এক বিষ্ণুমন্দির, সেটিও নষ্ট হয়ে গেছে। আটচালার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে আর এক শিব মন্দির। ভিতরে লিঙ্গও বর্তমান। তার পূজাও চলে।

মিশ্রদের দুর্গামন্দির— গ্রামে সোয়া দুশ' বছর আগেকার মিশ্রদের দুর্গামন্দির এখনও রয়েছে, মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। আকারে বেশই বড়, গঠন শৈলী বিষ্ণু মন্দিরের প্যাটার্নের, এতে টেরাকোটার কাজ লক্ষনীয়। মন্দিরটি কিছুদিন আগে সংস্কৃত হয়েছে। মিশ্রদের জোড়া মন্দিরের কাছেই বাঁশ বাগানের মাঝে তাদের সাবেক বাড়ির কিছু

অংশ এখনও দেখা যায়। সেই বাড়িব ভিতর থেকে পুকুর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ ছিল যা দিযে ধনাগারে যাওয়া যেত। বয়স্ক লোকেরা সেই সুড়ঙ্গ অনেকেই দেখেছেন।

জোড়ামন্দির— মিশ্রবাড়ির কাছেই জোড়া মন্দির যার গায়ে ১২৯১ সালের ৩১শে চৈত্র লেখা রয়েছে। মন্দির অভ্যন্তরে শিব লিঙ্গও রযেছে এবং তাদের সেবা পূজাও চলে।

মজুমদারদের দুর্গাবাড়ি— এটিও বিষ্ণু মন্দিরের রীতিতে গঠিত মন্দির, যার ছাদ কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে বর্তমানে খড়ের চাল করা হয়েছে। পূর্বে এখানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত। নবমীর পূজার দিনে অমরার গড়ের গোপরাজারা তোপ দাগলে এখান থেকেও তোপ ধ্বনি করা হত। বহুদিন হল এখানে দুর্গা পূজা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এখানে নারায়ণ শিলা প্রদুম্নেশ্বরের পূজা হয়ে থাকে।

পূর্বমুখী শিব মন্দির— এই মন্দিরের উত্তরে ও দক্ষিণে দুর্গামন্দির রয়েছে। এখানকার শিব মন্দিরে গ্রামের প্রাচীন ভাট পরিবারেব শিব বিগ্রহ এখনও এখানে পূজিত হচ্ছেন। ভল্লুপদর বাজবাড়ি বলে যে স্থানটি এখনও দেখানো হয় তারই সামান্য পূর্বে ভাটপাড়া বলে এক সমৃদ্ধ পাড়া ছিল। ভাটেরা বর্ধমান রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধিষ্ণু পবিবারে পরিণত হয়ে এখানে অনেক দেবকীর্তি স্থাপন করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য কীর্তি ছিল টেরাকোটার অলংকরণে সজ্জিত আটচালাসহ শিবমন্দির। কিন্তু কালের কবলে আজ গোটা পাড়াটাই নিশ্চিহ্ন, তবে তাদের সৃষ্ট মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও লক্ষণীয়।

কর্মকার পাড়া, গ্রামে এক সময় কর্মকাররা বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল। তারা বীরভূমের পাথরকুচি গ্রাম থেকে এখানে এসে বসতি করেছিল। দীর্ঘস্থায়ী বাহারি রংয়ের অলংকরণে সজ্জিত তাদের দুর্গাবাড়ি ছিল দর্শনীয় ক্ষেত্র। তাদের পাড়াও এখন অবলুপ্ত প্রায়। এরা ভাল স্বর্ণশিল্পী ছিলেন। বর্তমানে তারা এখান থেকে চলে গিয়ে ভিনরাজ্যের অনেক নামিদামী শহরে প্রখ্যাত স্বর্ণশিল্পীরূপে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

বিষ্ণু মন্দির— গ্রামে বেশ কয়েকটি বিষ্ণু মন্দির এখনও রয়েছে। গ্রাম মধ্যে একটি সুন্দর টেরাকোটা কাজে সমৃদ্ধ বিষ্ণুমন্দির এখনও বর্তমান। তার পূর্ব পাশেই আছে এক শিব মন্দির। মিশ্র পাড়ায় ছিল একটি সুন্দর বিষ্ণুমন্দির যা টেরাকোটা অলংকরণে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। দক্ষিণ দুয়ারী এই ভগ্ন মন্দিরটি এখন পরিত্যক্ত হয়ে বর্তমানে ছানি কাটার চালায় পরিণত হয়েছে।

গ্রামে একটি পাড়া এখনও বাজার নামে খ্যাত কিন্তু সেখানে এখন আর বাজারের কোন অস্তিত্বই নাই। হাটতলা নাম যে স্থান রয়েছে সেখানেও আর হাট বসে না। তাই সঙ্গত ভাবেই বলা যায়— "সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।' গ্রামে এক সময় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রও ছিল, বর্তমানে তাও উঠে গেছে। উঠে গেছে গ্রামীণ

পোষ্ট অফিস যা বর্তমানে সামন্ত পাড়ায় অবস্থিত হয়েছে। গ্রামের জুনিয়র হাই স্কুলটি দীর্ঘদিন ধরে হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, এখনও সে স্বপ্ন সফল হয়নি। গ্রামে একদা সংস্কৃত উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, এখনও সে স্বপ্ন সফল হয়নি।

গ্রামে একদা সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্র ছিল, কিছুদিন আগেও কোন চতুষ্পাঠীর আচার্য ছিলেন সুরেন্দ্রমোহর চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে তাও উঠে গেছে। গ্রামে এখনও রয়েছে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামটি বেশ বড় তবে এর অনেকগুলি পাড়াই এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গ্রামটি বেশ ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে। অনেক পাড়াই এখন যেন গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র গ্রামের আকার নিয়েছে, যেমন— সামন্ত পাড়া, নেউল বাঁধি ইত্যাদি।

গ্রাম্য উৎসব— গ্রামে দুর্গোৎসব সাড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হয়। এখনও গ্রামে ১০/১২ খানি প্রতিমা পূজা হয়ে থাকে। জগদ্ধাত্রী পূজা ছাড়া প্রায় সব পূজাই অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় বনমালীশ্বর শিবের গাজন, বৈশাখী পর্ণিমাতেও গ্রামে ধর্মরাজের গাজন মহা ধুমধামে পালিত হয়। এতদঞ্চলের উল্লেখ্য ধর্মরাজ হলেন উদয়নারায়ণ। যিনি এই গ্রামের অন্যপাড়া নেউল বাঁধিতে গোপগৃহে অবস্থিত।

বঙ্গে শিব প্রতিষ্ঠার পিছনে যেমন গোপেদের গাভী কর্তক দুগ্ধ প্রদান ও তার সন্ধানে যাওয়া গোপ কর্তৃক শিব প্রতিষ্ঠার কাহিনী প্রচলিত তেমন এই গোপভূমের প্রাচীন গ্রামে ভাল্কীর নেউল বাঁধিতে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ধর্মরাজ উদয়নারায়ণ-এর উৎপত্তির পিছনে রয়েছে এক গোপকন্যা সুমিতার কাহিনী। সুমিতার বংশধর সেই গোপ বাড়িতেই এতদ অঞ্চলের প্রখ্যাত ধর্মরাজ উদয়নারায়ণ অধিষ্ঠিত আছেন। গোপেরাই তার সেবক ও পূজক। বংশানুক্রমিক ভাবেই এদের মধ্য থেকেই দেয়াসি নির্বাচিত হয়। ধর্মরাজ এখানে নিত্য সেবিত। বাৎসরিক উৎসব খুবই ধুমধামে বৈশাখী পূর্ণিমায় উদযাপিত হয়। দূর দূরান্ত থেকে উপকৃত ভক্তরা আসেন মানত প্রদানের জন্য।

গাজনে বহু সন্ন্যাসী বা ভক্ত হয়ে থাকে। তারা নানাবিধ কৃত্যাদি যেমন সন্ন্যাস গ্রাহণ, উত্তুরী ধারণ, মুক্ত স্নান, কামাখ্যা আনা, চর্তুদোলায় গ্রাম পরিক্রমা, শুঁড়ি বাড়ির পচুই মদের ভাঁড়াল, চড়কপোতা, ভক্তফলার ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গাজন পর্বকে এগিয়ে নিয়ে যায়। গাজনে শারীরিক উৎপীড়নমূলক অনুষ্ঠানাদি যেমন বানফোঁড়া, ধুনোসেবা ইত্যাদি সবই অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই উৎসবে সব থেকে দু'টি অত্যাশ্চর্য বিষয়ও অনুষ্ঠিত হয়, যা সত্যই বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য যেমন— সাকুড়ের বড় দিঘি হতে মুক্ত স্নানের পর একটি কলসি জলে পূর্ণ করে, তার মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে তা উল্টিয়ে আনা হয় কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ঐ কলসি থেকে এক ফোঁটা জলও পড়ে যায় না।

অন্যটি, বলিদানের পূর্বে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রধান ঘাতক সমবেত ভক্তজন সঙ্গে নিয়ে ঢাক ঢোল বাদ্য সহকারে দেবতার কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়— দেবতার কণ্ঠ লগ্ন মালা আশীর্বাদ স্বরূপ পাওয়ার জন্য। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ভক্তাধীন ধর্মরাজ তা প্রদান করে থাকেন। সেই মালা কণ্ঠে ধারণ করে সেই ঘাতক পূজায় মানত হিসাবে আসা প্রায় শতাধিক পাঁঠা নির্বিঘ্নে বলিদান করে থাকেন। এই অনন্য মাল্যদান দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে বহুভক্তের সমাগম হয়।

এখানে ধর্মরাজ উদয়নারায়ণ সত্যই জাগ্রত— বহুজনের বহুরোগ ব্যাধি নিরাময় ও মনস্কামনা তিনি পূরণ করে থাকেন। এখানের দেবতার কৃপায় হাঁপানি, কুষ্ঠ, পক্ষঘাত, বাঁত, যক্ষা, অম্লশূল, চক্ষুশূল, মানসিক ব্যাধি নিরাময় হয় এবং বন্ধ্যানারী সন্তান পায়। দিনে দিনে ভক্ত সংখ্যাও বাড়ছে এবং তারাও দেবতার উদ্দেশ্যে অন্তরের অন্তঃস্থল নিঃসৃত ভক্তি নিবেদনে আর্জি জানিয়ে বলছে—

তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি বেদ তুমি বেদান্ত
মঙ্গলময় তুমি নারায়ণ।
ভক্ত জনে কর দয়া দেহ তব পদচ্ছায়া
দয়াময় তুমি জনার্দ্দন।। (৩৪)

প্রাচীন এই গ্রামের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকাই কৃষি। চাকুরিজীবীর সংখ্যা কম। সরল সাধারণ জীবনযাপনেই মানুষ অভ্যস্থ। এই গ্রামের সামান্য পশ্চিমে রয়েছে ভাল্কীর 'মাচান' নামে-শাল-পিয়ালের গভীর জঙ্গলে নয়ন মনোহর পরিবেশে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সৃষ্ট, এক সাজানো গোছানো পিকনিক স্পট। এতে এক বড় মাপের পুকুরের চারদিকে দেশ-বিদেশের বহু বর্ণ বৈচিত্রের মনোমোহন ফুলবাগিচা বানিয়ে, পুকুরে ব্যবস্থা করা হয়েছে বাহারি বোটে প্রমোদভ্রমণের। ভ্রমণেচ্ছুদের বিশ্রামের জন্য তিনতলা সৌধ, সব মিলিয়ে এটি বেড়াতে যাবার আদর্শ স্থান। এখানেই রয়েছে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি চতুষ্কোনাকৃতি ইটের গাঁথনীর প্রাচীন মাচা আকৃতির টাওয়ার, যার উপরে উঠে শত্রু পক্ষের গতিবিধি লক্ষ করার ব্যবস্থা ছিল। দেখতে অনেকটা মাচার মত গড়ন তাই ওকে ঘিরেই 'মাচান' নামকরণ হয়েছে। অনেকের মতে এটি জরিপ বিভাগের সীমা নির্দেশক স্তম্ভ। সে যাই হোক এটি এখন ভগ্ন অবস্থায় ইতিহাসের সাক্ষী রূপে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(ম)

মাথরুন ঃ— মঙ্গলকোট থানার ৯৩ নং জে. এল ভুক্ত গ্রাম মাথরুন। বর্ধমান কাটোয়া বাস রাস্তার কৈচর থেকে সামান্য উত্তর-পশ্চিমে গ্রামটির অবস্থান। প্রাচীন এই গ্রামে এক কালে প্রখ্যাত দানবীর ও শিক্ষানুরাগী মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী জন্মগ্রহণ

করেছিলেন। তিনিই পরবর্তীকালে এতদ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৯০০ খ্রিঃ পিতা নবীন চন্দ্রসেনের নামে আপন পিতৃ ভূমে নবীনচন্দ্র ইনষ্টিউশন (N. C. I.) নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, যা এখনও গ্রামে শিক্ষার আলো বিস্তার করে চলেছে।

ঐ বিদ্যালয়েই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়, দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের পদে ব্রতী ছিলেন এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঐ বিদ্যালয়ে কবির সান্নিধ্যে কবির প্রিয় ছাত্র হিসাবে পড়াশুনা করেছিলেন।

মাজিগ্রাম ঃ— মঙ্গলকোট থানার ৯১ জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম মাজিগ্রাম। নতুন হাট-কাটোয়া বাস রাস্তায় এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে জানা যায় যে, একদা নদী পারাপারের মাঝিদের গ্রামে বাসাধিক্য থাকায় গ্রাম নাম মাজিগ্রাম হয়েছে। অন্য মতে গ্রামের গ্রাম্য দেবী শাকম্ভরী মাইজি অভিধায় খ্যাত হওয়া সেই মাইজি > মাজি হয় এবং তার সঙ্গে গ্রাম যুক্ত হয়ে গ্রাম নাম হয় মাজিগ্রাম।

গ্রামটির চারিদিকেই বহু প্রাচীন দেবদেবী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বর্তমান রয়েছে। তার মধ্যে গ্রামরক্ষী হিসাবে যেন চার দিকে চার ভৈরবের অবস্থান লক্ষনীয়। এবা হলেন যথাক্রমে মহা ভৈরব, জটা ভৈরব, কাল ভৈরব ও শান্ত ভৈরব। এদের আটনে কোন আচ্ছাদন নাই। ঐ সব ভৈরবের স্থানে আরও অনেক দেব-দেবী সহ অবস্থানে বর্তমান রয়েছে, তাদের সকলের নিত্যপূজা হয়ে থাকে।

গ্রামে উল্লেখ্য শিব হলেন দেউলেশ্বর সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়াও গ্রামে রয়েছেন কালীশ্বর শিব। চৈত্র মাসে এর গাজন উৎসব পালিত হয়। গ্রামে রাধামাধবের যুগল বিগ্রহ সেবিত হয় গোস্বামী পরিবারে। বৈশাখের ১৮ই থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের কয়েক দিন ধরে বিগ্রহ গ্রামে আসে, তখন প্রচুর ধুমধামে দেব বিগ্রহের সেবাপূজা চলে ফলে তখন গ্রামে বহু লোক সমাগমও হয়ে থাকে। গ্রামে অন্য যুগল বিগ্রহের মধ্যে উল্লেখ্য হল অধিকারী পরিবারের রাধাকান্ত যুগল বিগ্রহ এবং ঘোষাল পরিবারের রাম-সীতা বিগ্রহ। রামসীতার নতুন মন্দিরও তৈরি হয়েছে।

গ্রামের গ্রাম্যদেবী শাকম্ভরী সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা হয়েছে। এই গ্রামেই এশিয়ার বিখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ধনপতি ও ডাঃ গণপতি পাঁজাদের জন্মভূমি এবং তাদের সন্তান সন্ততি হিসাবে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অজিত পাঁজা এবং রণজিৎ পাঁজাদের জন্মভূমিও বটে। গ্রামে পূর্বে সংস্কৃত চর্চার সবিশেষ প্রসার ছিল। এখনও ২/১টি টোল ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় বর্তমান। গ্রামের বিশ্বেশ্বরী উচ্চতর বিদ্যালয়টি পাঁজা পরিবারের সৌজন্যে সৃষ্ট। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয় ও পানীয় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা লক্ষণীয়।

মাজুরিয়া ঃ— আউশগ্রাম থানার ২নং ব্লকের ৯৯ জে. এল. এর অধীন মাজুরিয়া

গ্রাম। নিকটবর্তী পানাগড় রেল স্টেশনে নেমে কিংবা জি. টি. রোডে পানাগড়ে নেমে পানাগড় ইলামবাজার রোডের ধারে এক কাঁচা রাস্তা দিয়ে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে প্রাচীন পুরাকীর্তি বলতে মাত্র একটি শিব মন্দির ও দু'টি মনসার আটন বর্তমান। গ্রামে উল্লেখ্য উৎসব হিসাবে বৈশাখ মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এই গাজনকে কেন্দ্র করেই এখানে ৩/৪ দিন ধরে একটি মেলা বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। মেলাটি বেশ প্রাচীনও বটে।

মালচা ঃ— এই গ্রামটিও আউশগ্রাম থানার ২নং ব্লকের অধীন। এর জে. এল. নং-১০১। গ্রামটি অজয় নদীর একেবারে দক্ষিণে বন্যাপ্রতিরোধক বাঁধের গায়েই অবস্থিত। মোরবাঁধভেদিয়া পাকা রাস্তার উত্তরে এর অবস্থান। এখানে অজয়ের বাঁধ খুবই উঁচু কিন্তু তা হলে কি হয়, বর্ষাকালে দুর্দান্ত অজয় নদী প্রায়ই এখানের বাঁধ ভেঙ্গে এই গ্রামসহ নিকটবর্তী বহু গ্রামের অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন করে থাকে। তা করুক। তবুও নদী তাদের কাছে যেমন অভিশাপ তেমনি আশীর্বাদও বটে। মোট কথা বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা মাত্রেই পলিবহুল উর্বর মৃত্তিকায় ফসল বেশি পাওয়ায় সুবাদে এখানকার লোকেরা মাটি কামড়ে এখানেই পড়ে থাকে। সম্প্রতি বন্যায় অজয় নদীর খেয়ালি কর্মকাণ্ডে এই গ্রামেই বাঁধ ভেঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে এক সুগভীর খাতসহ দহ যা তাদের সেচের কাজে সাহায্য করছে।

গ্রামটি মুখ্যত দু'টি পাড়ায় বিভক্ত। পশ্চিমে মুসলমানদের বাস আর পূর্বে হিন্দুদের। হিন্দুদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌গোপদেরই সংখ্যা বেশি। পশ্চিমে মুসলমান পাড়ায় রয়েছে একটি দ্বিতল মসজিদ। গ্রামে অশীতিপর বৃদ্ধ আব্দুল রউফ মোল্লা জানালেন যে গ্রামটির পূর্ব নাম ছিল লাট পূর্ণকার ভগবানপুর। যার জমিদার ছিলেন বদ্দিপুরবাসী নৃসিংহ নন্দী।

মালচার উত্তর পশ্চিমে বাঁধের উত্তর গায়েই রয়েছে একটি কাঁদর। সেই কাঁদরের দক্ষিণে এক বিরাট বটবৃক্ষের কোটরে মুণ্ডসহ এক প্রস্তর খণ্ড অবস্থিত, যাকে বিষহরি মূর্তি বলা হয়। যার আকার বোঝা যায় না, তেল সিঁদুরে লাল হয়ে আছে। করনাদি দেখে একে মনসা বলেই মনে হয়। কারণ দশহরার দিনে এর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। তা ছাড়া নিত্য সেবাও হয়। পূজক উল্লাস পুরের স্বপন মুখার্জী।

লোকশ্রুতি উল্লাসপুরের হরিপদ মোট মায়ের থানের উত্তরে অজয়ের এক বিশালদহে মাছ ধরতে গিয়ে দেবীকে পেয়েছিলেন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দেবীকে এই বৃক্ষের তলেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তদবধি হরিপদর বংশধরেরা এই দেবীর দেয়াসি। গ্রামের পূর্ব পাড়ায় কার্ফা উপাধিধারী উগ্রক্ষত্রিয়দের বাড়িতে বাসন্তী দুর্গার পূজা হয়। তা ছাড়াও এখানে জগদ্ধাত্রী পূজাও হয়ে থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে ধর্মরাজের আপাল গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

চাষ আবাদের দৌলতে গ্রামের লোকেরা বেশ সঙ্গতি সম্পন্ন। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের ছেলে মেয়েরা সেখানের পাঠ সম্পূর্ণ করে গ্রাম থেকে ২/৩ কি. মি. দুরে পূবরপাড়ুক দীননাথপুর হাইস্কুলে পড়াশুনার জন্য যায়। নদীর ধারে চাষ আবাদ নিয়ে এরা ভালই আছে তবে বর্ষা পড়লেই ভাবনা শুরু হয়। যদিও কথায় আছে— "নদীর ধারে বসে ভাবনা বার মাস"। তাই এদের অন্তত তিন মাস আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ভাবতে ভাবতেই কাটে।

মালিয়াড়া ঃ— আউশ গ্রাম থানার ২ নং ব্লকের ৪৭ জে. এল. ভুক্ত গ্রাম মালিয়ারা। গ্রামটি অজয় নদীর একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে নদীর বন্যানিরোধক বাঁধের গায়েই অবস্থিত। ভেদিয়া-মোর বাঁধ রাস্তার উত্তরে উল্লাসপুর থেকে কিছুটা উত্তরে অগ্রবর্তী হলেই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই সদ্‌গোপ। তাছাড়া কিছু নিম্নসম্প্রদায়ের বাসও আছে। গ্রামে অন্যান্য পূজা ছাড়াও মনসার পূজা হয়ে থাকে। গ্রামে দু'টি মনসা মন্দির বর্তমান।

অজয় নদীর বাঁধ ভেঙ্গে প্রায়ই এখানে বন্যার সৃষ্টি হয়। একবার ভীষণ বন্যায় গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে এক গভীর খাত বিশিষ্ট দহের সৃষ্টি হয়। তবুও নদী তাদের কাছে একাধারে অভিশাপ তথা আশীর্বাদও বটে। কারণ এখানকার পলি সমৃদ্ধ উর্বর মৃত্তিকায় আশাতীত শস্যের শ্যামল সরসতা তাদের গভীর ভাবে আকর্ষণ করে। তাই এখানকার লোকেরা ফসলের আশায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। কোথাও উঠে যাওয়ার বাসনা সাময়িক মনকে নাড়া দিলেও তা আদৌ কার্যকরী হয় না।

মিরশা — গোপভূমের জঙ্গল মহলের আরণ্যক পরিবেশে গড়ে ওঠা অনেক গ্রামের মধ্যে এটিও একটি উল্লেখ্য গ্রাম। আউশ গ্রাম থানার ১ নং ব্লকের রাম চন্দ্রপুর মৌজার ৩৮ নং জে. এল. ভুক্ত মিরশা। শোনা যায় পুর্বে নাকি এই গ্রামের নাম ছিল মুরারীপুর। পরবর্তীকালে ঐ মুরারীপুরই অপভ্রংশিত হয়ে মিরশায় পরিণত হয়েছে।

গ্রামটি যে খুব প্রাচীন তা অন্য কোন পুরাকীর্তির লক্ষণে লক্ষিত না হলেও গ্রামে ঢোকার মুখে গোয়ালডাঙা যাবার পথে মোরাম রাস্তার পূর্বদিকে ঘন জঙ্গলে আবৃত এক বন্য পরিবেশে ঘন গাছপালার ফাঁকে একটি দেবস্থান পরিলক্ষিত হয়— যাকে এখানকার লোকেরা বীরমাতার স্থান বলে। আসলে এটি দুর্গাদেবী হিসাবেই পূজিত হয়। গোপভূমের রাজা ইছাই ঘোষের সঙ্গে বীর মাতার সম্পর্ক আছে বলে এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে। সেই নিরিখে গ্রামটির প্রাচীনত্ব রয়েছে তা বোঝা যায়।

বীরমাতার স্থানে পাশাপাশি ২টি পাষাণ খণ্ড তেল সিন্দুর মাখানো অবস্থায় অবস্থিত। তার মধ্যে উত্তরেরটি আকারে বড়— একেই বীরমাতা বলা হয়, আর দক্ষিণেরটি আকারে ছোট এটি ভৈরব নামে খ্যাত। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির এখানে পাশাপাশি অবস্থান। শারদীয়া দুর্গাপূজার কালে এই পাষাণ মূর্তি বীরমাতার পূজা হয়ে থাকে।

নবমীর দিনে ছাগবলিসহ ধুমধামে পূজা হয়। আর যেহেতু ইনি দুর্গা রূপেই পাষাণ মূর্তিতে পূজিত হন তাই শারদীয়া পূজার সময় গ্রামে কোন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত না। বর্তমানে বছর ১৫/১৬ যাবৎ গ্রামে ঐ সময় একটি বারোয়ারি দুর্গাৎসব আনা হচ্ছে।

গ্রামে দোল, রাস ইত্যাদি উৎসব উদ্‌যাপিত হলেও মনসা পূজা বেশ ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে চৈত্র সংক্রান্তিতেও বীরমায়ের পূজা বিশেষ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। তখন মুনুই ভোগসহ মহোৎসবও হয়ে থাকে। বীরমায়ের কোন মন্দির নাই। শোনা যায় কোন ভক্ত মায়ের জন্য মন্দির করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের তা অভিপ্রেত নয় তাই সঙ্গে সঙ্গেই তা ভেঙ্গে যায়—ফলে মা উদার আকাশেব তলে বৃক্ষাচ্ছাদনে অবস্থান করছেন। এখনও মায়ের চারিপাশে সরু সরু ভগ্ন ইটের স্তূপ ইতস্তত পড়ে থাকতে দেখা যায়।

গ্রামটি ছোট। অধিকাংশ অধিবাসীই সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের। ১০/১২ ঘর ব্রাহ্মণও আছে। তবে নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাগদিদের সংখ্যাই বেশি। চাষ আবাদই এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা। ক্যানেল নাই, ফলে চাষ আবাদ সম্পূর্ণ ঈশ্বর নির্ভর। গ্রামে ইলেকট্রিক যায়নি তাই চাষের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক সুযোগ সুবিধাও নাই।

গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম। গ্রামে কীর্তন গানের চর্চা আছে। এই গ্রামের দেবাশীষ ব্যানার্জী ও তার স্ত্রী উভয়েই পালাকীর্তন গেয়ে থাকেন। গ্রামে একজন ডাক্তারও আছেন। নাম সুকুমার দে। তিনি বর্ধমানেই থাকেন।

মল্লসারুল — ৭৬ নং জে. এল. ভুক্ত গলসী থানার অন্তর্গত এক প্রাচীন গ্রাম মল্লসারুল। বর্ধমান থেকে গলসী হয়ে সরাসরি গ্রামে যাওয়া যায়। গলসী থেকে আরও ২০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে এর অবস্থান। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোনে গ্রামটি খুবই উল্লেখ্য। কারণ এখানের জারুলে নামক এক পুকুরে পাঁক তোলার সময় ১৯৩৫ খ্রিঃ গোপভূমের মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ রাজা বিজয়সেনের এক তাম্রশাসন এখানে আবিষ্কৃত হয়। ফলে খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের ঐ তাম্রলিপিতেই প্রথম বর্ধমান ভুক্তি (প্রদেশ)-র উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ তাম্রশাসনেই পাশাপাশি ৯টি গ্রামের নাম পাওয়া যায়, সেগুলি সামান্য উচ্চারণ সারল্যে এখনও বর্তমান রয়েছে। সেদিক থেকে গ্রামটি খুবই প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রামে উল্লেখ্য দেবতা মল্লেশ্বর শিব। এই শিবের নাম থেকেই সম্ভবত গ্রাম নাম 'মল্লসারুল' হয়েছে। একটি উঁচু টিবির উপর দালান রীতির মন্দিরে গৌরীপট্টহীন শিব লিঙ্গ বর্তমান। এই মন্দির মধ্যে চতুর্মুখ এক ব্রহ্মামূর্তিও রয়েছে। শোনা যায়, এই মল্লেশ্বর শিবের পুরোহিতেরা হলেন, কলিযুগের সাক্ষাৎ ভগবান শচিসুত নিমাইকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষাদাতা পরম পূজ্যপাদ কেশবভারতীর বংশধর। তারা পরম বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও শিবের আদেশেই কৃষ্ণপদ গোস্বামীরাই এই শিবের সেবাপূজায় ব্রতী আছেন।

মন্দিরটি ১৩৫৯ সালের ১৮ই আষাঢ় সংস্কার করা হয়েছিল। মন্দির চত্ত্বরের পূর্বদিকে তাম্রশাসন পাওয়া পুকুর থেকেই উদ্ধৃত এক অষ্টভূজা সিংহবাহিনী মূর্তি রক্ষিত রয়েছে। মূর্তিটির ৫টি হাত এখনও বর্তমান, তার মধ্যে ডানদিকের উপরের হাতে তরবারি বামদিকের উপরের হাতে ঢাল, অন্য হাতে ধনু। পদতলে তরবারি হাতে মহিষাসুর বক্ষদেশে ত্রিশূলের আঘাতে বিদ্ধ অবস্থায় বর্তমান।

এই মন্দিরের উত্তবে সিংহদের শিব মন্দির। গ্রামের কালো দিঘি থেকে পাওয়া এক বুদ্ধমূর্তি গ্রামের উত্তর দিকে এক মনসা মন্দিরে অবস্থিত আছে। গ্রামে ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশেষ ধুমধামে মনসা পূজা হয়ে থাকে। গ্রামের বিভিন্ন পুকুর থেকে পাওয়া বহু ভগ্ন দেব-দেবীর মূর্তি গ্রামময় জড়িয়ে আছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য এক মূর্তি হল জয় দুর্গামূর্তি।

গ্রামে একটি সুন্দর বিষ্ণু মন্দির বর্তমান। মন্দিরে রয়েছে কষ্টি পাথরের রাধা মাধব ও অষ্টধাতুর রাধারাণী এবং ডানদিকে পিতলের বৃন্দামূর্তি। এখানে দেবতারা নিত্য সেবিত, তাছাড়াও এখানে দোল, রাস, জন্মাষ্টমী, ঝুলন ইত্যাদি বৈষ্ণবীয় উৎসবাদিও পালিত হয়। মন্দিরটি বেশ প্রাচীন এবং টেরাকোটা শিল্পে সমৃদ্ধ। টেরাকোটায় বহু দেবদেবীর মূর্তিসহ এখানে বীণাবাদনরত নাবী মূর্তি, রামসীতার পদতলে নতজানু হনুমান। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে খোল করতাল সহযোগে গৌরনিতাই এর নর্তন-কীর্তনেব দৃশ্যগুলি বেশ উপভোগ্যও, সেই সঙ্গে মন্দিরটি যে প্রায় পাঁচশ বছরের মত প্রাচীন তা বেশ বোঝা যায়। প্রাচীন এই গ্রামের লোকেদের জীবিকা কৃষিকাজ, চাকুরিজীবীও আছে তবে তাদের সংখ্যা বেশি নয়। এখানে লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বর্তমান থাকলেও মনসাপূজাকে কেন্দ্র করে মনসার ভাসান ও প্রতিযোগিতামুলক শাঁকি গানের চল আছে।

মোবারক গঞ্জ ঃ— কাঁকসা থানার ৮০ নং জে. এল. ভুক্ত এক নব সৃষ্ট গ্রাম মোবারক গঞ্জ। জি. টি. রোডের রাজবাঁধে নামলে নিকটেই অবস্থিত এই গ্রাম। শোনা যায় বাংলার ১২৩১ সালে দামোদরের ভীষণ বন্যায় গ্রামটি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সময় গ্রামের নাম ছিল শুভরাজপুর। পরে বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে নতুন করে গ্রামের সৃষ্টি হওয়ায় সেই গ্রামের নাম হয় মোবারক গঞ্জ।

গ্রামে তিনটি শিলামূর্তি বর্তমান, সেগুলি চণ্ডী নামে পরিচিত। এরা চণ্ডীর ধ্যানেই পূজিত হন। এই গ্রামে দামোদরের তীরে বৈষ্ণবীয় উৎসব দোল যাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর সেই সময় একটি মেলা বসে এবং কয়েকদিন ধরে তা চলতে থাকে। কৃষি প্রধান গ্রাম। চাষ-আবাদেই গ্রামের অধিকাংশ লোকের জীবিকার সংস্থান হয়ে থাকে। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম।

মহেশপুর ঃ— সালানপুর থানা ও পঞ্চায়েত সমিতির অধীন ২৪নং জে.এল.ভুক্ত

গ্রাম মহেশপুর। গ্রামটি ছোট, পাঁচশ'র মত জনসংখ্যা। এর অধিকাংশই নিরক্ষর। গ্রামে ইদানিং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে। গ্রামের সবাই আদিবাসী। পাহাড় সংলগ্ন গ্রামে চাষ-আবাদের কোন সুযোগ নাই। সকলের জীবিকাই হল পাথর কাটা। গ্রামটি সালানপুরের দেন্দুয়া মোড় থেকে মাত্র ৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

অন্য কোন পেশায় নিযুক্তির সম্ভাবনা না থাকায় গ্রামের লোক বাধ্য হয়ে পাথর কাটার কাজেই যুক্ত হয়েছে। একাজ যেমন কঠিন তেমনি বিপদসঙ্কুল। এখানে পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি। একটু অসাবধান হলেই বিপদের সম্ভাবনা। বহুবারই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে স্বজন হারাতে হয়েছে অনেককেই।

তাই সাথীহারা ব্যথা বুকে নিয়ে সংসারে ভেসে যাওয়া থেকে এমন কিছু করা বিধেয় যাতে কোন অশুভ ঘটনা ঘটলেও সংসার ভেসে না যায় বরং আর্থিক নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা দুই হাতের মুঠোয় আসে। এমনই সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করার মানসে গ্রামবাসীদের অনাগত ভবিষ্যত নিশ্চয়তার আলোকবর্তিকা দেখাবার জন্য দুর্বিষহ অনিশ্চিত জীবন যন্ত্রণা থেকে তাদের অব্যাহতি দেবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পরিবারকে সঞ্চয় ও সুরক্ষার নিবিড় বাঁধনে বাঁধার কাজে সকলকে বুঝিয়ে তাদের ক্ষমতা মত দৈনিক রোজগার থেকে সামান্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিমার আওতায় আনেন গ্রামের একমাত্র শিক্ষিত যুবক স্বপন হেমব্রম।

এর ফলে গ্রামের সকল পরিবারই এখন জীবন বিমার আওতায় এসে অনিশ্চিত জীবনে পরিবারবর্গকে আর্থিক সুরক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছে। বিমার ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। কারণ গ্রামের অনেককেই বিমার আওতায় আনা সম্ভব হলেও গ্রামের সকলকে বিমাভুক্ত করা ও এক অভিনব ঘটনা তাতে সন্দেহ নাই। তাই বিমা কর্তৃপক্ষ এই গ্রামকে 'বিমাগ্রাম' হিসাবে ঘোষণা করতে বদ্ধপরিকর। এই গ্রামের দেখাদেখি পাশাপাশি অনেক গ্রামই ধীরে ধীরে বিমার দিকে ঝুঁকছে [৩৯]।

(ঘ)

যাজিগ্রাম ঃ— কাটোয়া থানার অন্তর্গত ১৭নং জে.এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম যাজিগ্রাম। কাটোয়া বর্ধমান রাস্তায় কাটোয়া থেকে মাত্র ২ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে, যেখানে বি. কে.আর. রেলপথ পাকা রাস্তাকে ছেদ করেছে সেই সংযোগ স্থলেই এই যাজিগ্রামের অবস্থান। সেই যাজিগ্রামেরই বৃক্ষচ্ছায়ার অভ্যন্তরে এক মনোরম আশ্রমিক পরিবেশে গৌরাঙ্গদেবের দ্বিতীয় কলেবররূপে খ্যাত শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাট অবস্থিত।

শ্রীনিবাসের পিত্রালয় ছিল নদীয়া জেলার চাকুন্দি গ্রামে। পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। ১৪৪১ শকে ইং ১৯১৫ খ্রিঃ বৈশাখী পূর্ণিমায় তার জন্ম [৪০]। তিনি ছোটবেলা থেকেই গৌরাঙ্গ ভক্ত ছিলেন। একটু বয়স বাড়লে তিনি চৈতন্যদর্শনের

মানসে নীলাচলে যাত্রা করে পথেই মহাপ্রভুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হতাশ হয়েছিলেন তাই শ্রীচৈতন্য দর্শন আর তার ভাগ্যে হয়নি। শ্রী নিবাসের মাতুলালয় যাজিগ্রামে। যাজিগ্রামের জমিদারের অনুরোধে তিনি এখানেই বিবাহ করে এই যাজিগ্রামেই বসবাস শুরু করেছিলেন।

এখানে তার পাট বাড়িতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পরম সমাদরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গমূর্তি, কালো কষ্টি পাথরের গোপাল মূর্তি ইত্যাদি। তাছাড়াও এখানকার মন্দিরের পাশে তেঁতুলতলায় রয়েছে শ্রীনিবাসের ভজনস্থল। সেখানকার ভজনকুঠিরেই এক প্রস্তর খণ্ডে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ চিহ্নও বর্তমান। এখানকার সিদ্ধবকুল বৃক্ষের তলে নরোত্তমঠাকুর ও বীরভদ্র গোস্বামীর আসন বর্তমান। এখানেই রয়েছে একটি বেদী, যার নাম 'মিলনস্থলী'। এখানেই দুই মহাপুরুষ যথা গোবিন্দ দাস কবিরাজের দাদা রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাদের সেই মিলনকে স্মরণীয় করার জন্যই এই মিলনস্থলী সৃষ্ট হয়েছে।

যাজিগ্রাম পাটবাড়িতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর সান্নিধ্যে আশ্রয় পান। সেখানেই থাকাকালীন শ্যামানন্দ ও নরোত্তমের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার ফলে সখ্যতা জন্মে। সেখান থেকে বহু বৈষ্ণব গ্রন্থাদি বঙ্গে আনার কালে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী হলে সব চুরি হয়ে যায়। গ্রন্থ চুরির কিনারা করতে গিয়ে তিনি মল্লভূমের রাজা বিষ্ণুপুরের বীরহাম্বিরের সান্নিধ্যে আসেন।

বীরহাম্বির এই গৌরকান্তি সৌম্যদর্শন বৈষ্ণবের অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও কৃষ্ণপ্রীতিতে আপ্লুত হয়ে, তার কাছেই আত্মনিবেদন করে, তাকে গুরুরূপে গ্রহণ করার পর বীরহাম্বিরের অন্তরেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই থেকেই তিনি তার ক্ষাত্রবীর্য বিসর্জন দিয়ে বৈষ্ণবপ্রেমের প্রবল বন্যায় বিসর্জিত করেন অন্তরের হিংসাবৃত্তি, তার পরিবর্তে গ্রহণ করেন প্রেমের মাধ্যমে মানব কল্যাণের সেবাব্রত। গুরুকে চোখের সামনে রাখার জন্য নিজ রাজ্যে থাকার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এখানেই দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করান। ফলে বিষ্ণুপুরের রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে গুরুর বিবাহ প্রদানের পর এখানকার খড় বাংলা মহল্লায় আচার্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শোনা যায় গুরুশ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাট যাজিগ্রামে রাজা হাম্বির সস্ত্রীক উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এখানকার মন্দিরটি তিনিই নির্মাণ করেছেন। 'জলঢালা' পুকুরটিও তিনিই তৈরি করান। পুকুরটি প্রতিষ্ঠার দিনে হাম্বির পত্নী জাহ্নবী দেবী প্রথম এখানে জল ঢেলেছিলেন বলেই পুকুরটির নাম হয় 'জলঢালা'। হাম্বির প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দির ধ্বংস হলে পর ১৩২৪ সালে সেখানে কাশিমবাজারের রাজা নতুন মন্দির তৈরি করেছেন। পরে তাও সংস্কৃত হয়েছে এবং সেখানে বর্তমানে অতিথি নিবাস ও আরও

ঘরবাড়ি সহ উত্তর ও পশ্চিমদিকে প্রবেশ পথে দু'টি গেটও তৈবি হয়। আজ পর্যন্ত বঙ্গের বহু মহন্ত ও ভক্তবৈষ্ণবের শুভ আগমন ঘটেছে এই শ্রীপাট যাজিগ্রামের পাটবাড়িতে সেদিক থেকে এটি খুবই উল্লেখ্য শ্রীপাট।

এই আচার্যদের যাজিগ্রাম ছাড়াও বিষ্ণুপুরের গৃহে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধারমণ বিগ্রহ এবং পরম নিষ্ঠায় সেখানেও সেবাপূজা চালাতেন। তার দুই সংসারের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে প্রথমা স্ত্রী ঈশ্বরীদেবীর গর্ভের দুই সন্তান— বৃন্দাবন ও রাধাকৃষ্ণ, আর দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজ সন্তানদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন পুত্র গতিগোবিন্দ ও কন্যা হেমলতা। এই হেমলতাদেবী সম্পর্কে শোনা যায় তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, আচার্যের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে নিবেদিত প্রাণ পরম সাধিকাও ছিলেন। এই কন্যাই পিতার প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ বিগ্রহের আত্মনিয়োগ করেই একদা তাঁর শ্রীঅঙ্গেই লীন হয়ে গিয়েছিলেন।

আচার্যদেবের অন্যতম পুত্র গতিগোবিন্দই যাজিগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মদনগোপালসহ এক শালগ্রাম শিলা। যাজিগ্রাম পাট বাড়িতে অধিষ্ঠিত সকল বিগ্রহের নিত্যনৈমিত্তিক সেবাপূজা নিষ্ঠার সঙ্গেই প্রতিপালিত হয়। তাছাড়াও শ্রীনিবাস আচার্যের মহাপ্রয়াণ উৎসব কার্তিক মাসেব গোষ্ঠাষ্টমী তিথিতে সাড়ম্বরে পালিত হয়। এই যাজিগ্রাম বৈষ্ণবপাট বাড়িতেই অবস্থিত শিবকে কেন্দ্র করেই চৈত্রমাসে শিবের গাজন পবও বেশ আড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

যাজিগ্রামের শ্রীপাটে বিভিন্ন উৎসবাদি পালিত হলেও গ্রামেও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সার্বজনীন দুর্গোৎসবও প্রতিপালিত হয়। গ্রামটি বঙ্গের আর পাঁচটি গ্রামের মতই কৃষিকেন্দ্রিক। তবে গ্রামের উপর দিয়ে পাকা রাস্তা এবং নিকটেই মহকুমা শহর কাটোয়ার অবস্থান হওয়ায় অনেকেই গ্রামে ও কাটোয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকেন। গ্রামে চাকুরিজীবীও আছেন তবে তাদের সংখ্যা তেমন উল্লেখ্য নয়।

যাদববাটী ঃ— মঙ্গলকোট থানাধীন অজয় ও কুনুর নদীর মধ্যবর্তী এক ছোট গ্রাম যাদববাটী। নতুন হাট-গুসকরা বাসরাস্তায় আহারের দক্ষিণে বিস্তৃত মোরাম রাস্তা ধরে কিছুদূর দক্ষিণে অগ্রবর্তী হয়ে সুখপুকুরের পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামটিতে যাওয়া যায়। গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বাস হলেও গোপদের বংশ সম্ভূত যাদবদেরই এখানে আধিক্য থাকায় গ্রামনাম হয়েছে 'যাদববাটী'। যাদব বলতে যদুবংশ জাত যাদব বা গোপ সদ্গোপদেরই বোঝায়। তাই এখানে এখনও গোপ ও সদ্গোপদেরই বাসাধিক্য লক্ষ করা যায়।

এতদ অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন গোপ কৃষ্টি সম্পর্কিত বহু গ্রাম যেমন, গোপালবেড়া,

গোপালপুর, কোটাল-ঘোষ, মহিষগড়িয়া, গতিষ্ঠা ইত্যাদির সন্নিবেশ এটাই প্রমাণ করে যে, এ এলাকা একদা গোপভূমের অংশই ছিল।

গ্রামে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা যথাসময়ে সম্পন্ন হলেও এখানে মনসাদেবীর পূজা বেশ সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি প্রধানগ্রাম এই যাদববাটী তাই চাষআবাদই গ্রামবাসীর মুখ্য জীবিকা।

যাগেশ্বর ডিহি ঃ— মঙ্গলকোট থানার ১১১ নং জে.এল. ভুক্ত গ্রাম যাগেশ্বর ডিহি। বর্ধমান-কাটোয়া বাস রাস্তায়, যাগেশ্বর ডিহি বাস স্টপেজে নেমে সামান্য পশ্চিমে গেলেই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে বর্তমান আছেন যজ্ঞেশ্বর শিব। সম্ভবত সেই শিব নাম থেকেই গ্রামনাম যগেশ্বর ডিহি হয়েছে। অন্তে 'ডিহি' যোগে বহুগ্রাম বঙ্গে রয়েছে। ডিহি শব্দটি ফারসী 'দিহ' থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ শাসন শহর বা শাসনকর্তার বাসগ্রাম [৪১]। অন্যদিকে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে দীঘি হতেও গ্রামনাম ডিহি যুক্ত হতে পারে [৪২]। গ্রামে একটি বড় দিঘিও বর্তমান।

ঐ দিঘি সম্পর্কে বর্ধমান রাজবংশানুক্রমিক/বংশানুচরিতে জানা যায় যে ওটি বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ রায় কর্তৃক খণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একদা রাজা কীর্তিচাঁদ বর্ধমান থেকে মুর্শিদাবাদ যাবার ফলে ঐ স্থানে উপনীত হয়ে খুবই পিপাসিত হয়ে পড়েন। এক রাখাল বালককে দেখতে পেয়ে তাকে গ্রাম থেকে এক ঘটিজল আনতে বলেন। বালকটি বহুক্ষণ পরে সামান্যজল নিয়ে আসায় তার এত বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে রাখালটি জানায় যে, তাদের গ্রামে কোন জলাশয় নাই বহুদূরবর্তী গ্রাম থেকে লোককে জল আনতে হয়। ফলে তাদের বহুকষ্টের সঞ্চিত জল থেকে বেশ কয়েক ঘর থেকে চেয়ে চেয়ে ঐটুকু সংগ্রহ করতেই বিলম্ব হয়ে যায়।

রাজা অবস্থাটি উপলব্ধি করে বালককে কহিলেন— "বালক! তুমি এই স্থান হইতে যতদূর দৌঁড়িয়া যাইতে পারিবে, ততবড় দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়া তোমাকে দিব [৪৩]।" ঐ কথা শুনে বালক দৌড়াইতে শুরু করেছিল এবং যতদূর যেতে পারে পেরেছিল, সেই স্থান চিহ্নিত করে পরে রাজা কীর্তিচাঁদ সেখানে ঐ বৃহৎ দিঘি খনন করে রাখালের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। রাখালটির নাম সম্ভবত ছিল যজ্ঞেশ্বর। তাই দিঘিটিও 'যগেশ্বর ডি' নামে নামিত হয়। পরবর্তীকালে রাজা কীর্তিচাঁদের কীর্তি কাহিনী নিয়ে যে লোকগীতি এ অঞ্চলে জনগণের মুখে শোনা যেত তাতে শোনা যায়—

"রাজা রাজা বলহো—
যাগেশ্বরে দিয়ে দীঘি নাম রহিল।"

এই দিঘিকেন্দ্রিক গ্রামটিতে এই দিঘি সত্যই এক সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হত। এত বড় দিঘি সচরাচর দেখা যেত না। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার ফলে সেই দিঘি এখন মজে যেতে বসেছে, তাই তার সংস্কার করা আশু প্রয়োজন। সেটি করতে পারলে এতে বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারবে। যেমন- এতে মৎসচাষের কেন্দ্র

করা যাবে, এতে কৃষিকাজে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে। সর্বোপরি এর পাড়ে বাহারি বৃক্ষাদি সৃজন করে একে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবেও পরিণত করা যেতে পারবে। এরজন্য সরকারি উদ্যোগ আশু প্রয়োজন।

গ্রামে যথা সময়ে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা সম্পন্ন হলেও গ্রামস্থ যজ্ঞেশ্বর শিবকে কেন্দ্র করে শিবরাত্রি উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম হয়ে থাকে। তখন এখানে একটি মেলাও বসে। কৃষি প্রধান এই গ্রামের অধিকাংশ লোকের জীবিকাই কৃষিকাজ।

যাদবগঞ্জ ঃ— আউশ গ্রাম ১নং ব্লকের আওতায় ১৭৪ নং জে. এল. ভুক্ত এক ছোট্ট গ্রাম এই যাদবগঞ্জ। গুসকরা-বুদবুদ বাস রাস্তায় আনন্দ বাজারে নেমে উত্তরে অগ্রবর্তী হলে গ্রামে যাওয়া যায়। অন্যদিকে সুশীলায় নেমেও যাওয়া যায়। তেলোতা গ্রামের ঈশান কোণে এর অবস্থান। গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়েরই বাস। ব্রাহ্মণ খুব অল্পই আছে। কয়েক ঘর বৈষ্ণব রয়েছে, আর অধিকাংশরাই সদ্‌গোপ। এছাড়া কিছু নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকও আছে। গ্রামে ও গ্রামের আশেপাশে রয়েছে বহু সংখ্যায় আদিবাসী। কোন এক সময় এখানে যাদবদের বাসাধিক্য থাকায় গ্রাম নাম যাদবগঞ্জ হয়ে থাকবে। আবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক গ্রামনামও হতে পারে।

গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা হলেও গ্রামে উল্লেখ গ্রামীণ উৎসব হল মনসা পূজা। ভাদ্রের সংক্রান্তিতে মহাধুমধামে গ্রামে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। আত্মীয় পরিজনদের তখনই গ্রামে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাকে ঘিরে তখন গ্রামে একটি ছোট খাট মেলাও বসে থাকে। তা ছাড়া গ্রামের শ্মশানে কয়েক বছর যাবৎ ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে। বছরের শেষে চৈত্রে চড়ক গাজনও বেশ ধুমধামে পালিত হয়। সেই চড়ক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই তখনও গ্রামে আর একবার মেলা বসে। এই চড়কের সবথেকে আকর্ষণীয় বিষয় হল একে ঘিরে আদিবাসী সম্প্রদায় নৃত্য-গীতে মেতে ওঠে। গ্রামের আদিবাসীসহ দূরদূরান্ত থেকে আদিবাসী নরনারীরা সেজেগুজে এখানে এসে নানারকম বাদ্যসহযোগে সারারাত নৃত্যগীতে মেতে ওঠে এবং তাতে দর্শক সংখ্যাও প্রচুর হয়ে থাকে।

গ্রামটি পরিপূর্ণ কৃষিপ্রধান গ্রাম। চাষ আবাদই এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা।

(র)

রামচন্দ্রপুর ঃ— আউশগ্রাম থামার ১ নং ব্লকের মধ্যবর্তী গ্রাম রামচন্দ্রপুর। গ্রামটি ছোট এর জে, এল, নং ৩৮। বননবগ্রাম থেকে সোজা দক্ষিণে মোরাম রাস্তা ধরে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হলে রামচন্দ্রপুরে যাওয়া যায়। এক সময় গ্রামে মুসলমানদেরও বাস ছিল তা বেশ বোঝা যায় গ্রামের এক পুকুরের নাম 'মুসলমান পুকুর' থেকে। বর্তমানে গ্রামে মুসলমান নাই। গ্রামে সদ্‌গোপদেরই আধিক্য রয়েছে। অন্যান্য নিম্নসম্প্রদায়ের বাস সামান্য পরিমাণে রয়েছে।

সম্ভবত ব্যক্তি নাম থেকেই গ্রামনামক নামের উৎপত্তি হয়েছে বলেই মনে হয়। গ্রামে দেব-দেবীর পূজাপার্বন প্রসঙ্গে বলা যায় এখানে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হলেও মনসা পূজাবই ধুমবেশি। গ্রামের দুর্গামণ্ডপেই বৎসরে ১৯শে অগ্রাহায়ণ গোবিন্দ প্রভুর আগমন উপলক্ষে মহোৎসব হয়ে থাকে। কারণ হিসাবে বলা যায়, একবার ছড়া-ধনকড়া থেকে অভিরামপুর যাবার পথে পথভ্রষ্ট হয়ে বাহকরা রাধাগোবিন্দকে এই গ্রামে নিয়ে হাজির হলে তখন দুর্গা বাড়িতে নামিয়ে রাধাগোবিন্দর সেবা পূজা হয়। তখন থেকেই ঐদিন এখানে রাধাগোবিন্দের আবির্ভাব হয়।

গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ভৈরবনাথের থান বর্তমান। গভীর জঙ্গলের জন্য এর অবস্থান বের করতে বেগ পেতে হয়। স্থানটির সন্ধান পাওয়ার পর দেখা যায় সেখানে এক বৃক্ষের তলে বেশ কয়েকটি বড় আকারের পোড়া মাটির ঘোড়া ও হাতির মাঝে এক টুকরো পাথরের কিয়দংশ দেখা যায় তাকেই বাবা ভৈরব নাথ রূপে পূজা করা হয়। বাবা এখানে নিত্য পূজিত হয়, বাবার থানে ভক্তদের দেওয়া কিছু খুচবা টাকা পয়সা পড়ে থাকতে দেখা গেল। সেথায় একটি তুলসী মঞ্চও বর্তমান।

গ্রামে অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবী হলেও এখানে চাষে জলের কোন সুব্যবস্থা নাই, কারণ ক্যানেল নাই। আকাশের বৃষ্টির উপর ভরসা। এখন অগভীর নলকূপের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ইলেকট্রিক সালোর ব্যবস্থাও হয়েছে। গ্রামে এখনও চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম। এখানে কিছু 'ঠাকুরা' উপাধির সদ্‌গোপ রয়েছেন। তাদের এই বিচিত্র উপাধির প্রসঙ্গে জানতে চাইলে প্রায় আশি বছরের মত এক বৃদ্ধ ব্যক্তি জানালেন যে, তারা নাকি পূর্বে চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু বিশেষ কোন অপরাধে অপরাধী হওয়ায় তারা ঠাকুরা উপাধিতে অভিহিত হয়ে সদগোপে পরিণত হয়েছেন। পূর্বে এদের গ্রাম ছিল 'মকরখাড়া' সেখান থেকে এসে ওরা এখানেই স্থিতু হয়েছেন।

রঘুনাথপুর ঃ— আউশ গ্রাম থানার ১ নং ব্লকের ১৪২ নং জে. এল. ভুক্ত গোবিন্দপুর মৌজার আর এক ছোট্ট গ্রাম রঘুনাথপুর। ওসকরা থেকে ভেদিয়া বাস রাস্তা ধরে মাইল ১০/১২ অগ্রবর্তী হলে গ্রামে যাওয়া যায়।

গ্রামে উল্লেখ্য দেবকীর্তি বলতে রয়েছে 'সিদ্ধিনাথ' নামে শিব। সিদ্ধিনাথ শিবের মন্দিরটি সুরুলের জমিদার সরকারদের তৈরি। শিবলিঙ্গ মন্দির গর্ভে অনেকখানি প্রথিত অবস্থায় আছে। শিব এখানে নিত্যসেবিত ও পূজিত হলেও শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ ধুমধামে শিব পূজা হয়ে থাকে। তখন এখানে কয়েক দিনের জন্য একটি জমাটি মেলাও বসে। এখানে শিবের বিশেষত্ব হল— শিবের পূজকরা দেবতার নামে যে কোন রোগ নিরাময়ের জন্য বিশেষ করে অম্বল ব্যাধির উপশমের জন্য মাদুলিতে

পুরে দেবতার প্রসাদীপুষ্পসহ আরও কিছু ঔষধ হিসাবে দিয়ে থাকেন। মানুষ তাতে উপকৃত হওয়ায় অনেক ভক্তই তা নেবার জন্য ভিড় করে। মাদুলির দক্ষিণা বাবদ ষোল আনা নেওয়া হয়। মানত হিসাবে এখানে পোড়া মাটির ঘোড়া দেওয়া হয়। সিদ্ধিনাথ শিব ছাড়াও গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজাও হয়ে থাকে।

গ্রামটিতে হিন্দুদেব মধ্যে রাজপুত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের 'বর্মন' উপাধিধারী এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বাসাধিক্য রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বাউরি ও কিছু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বাস দেখা যায়। গ্রামে অধিকাংশ লোকের জীবিকাই হল চাষ আবাদ।

রামগোপালপুর ঃ— গলসী থানার দামোদর সন্নিকটে এক প্রাচীনকৃষ্টি সম্পন্ন গ্রাম রামগোপালপুর। এর জে.এল. নং-৬৩। বর্ধমান থেকে গলসী হয়ে সরাসরি এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটির সামান্য দক্ষিণেই প্রবাহিত দেবনদ দামোদর।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে অনেকেই বলে থাকেন যে, একদা এখানে রামগোপালেরই পূজার জাঁকজমক ছিল। তা থেকেই গ্রামের নাম রামগোপালপুর হয়েছে। বর্তমানে সে পূজা বহু দিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তবে গ্রামটি যে বেশ প্রাচীন তা গ্রামে ইতস্তত ছড়ানো ভগ্ন অট্টালিকাই প্রমাণ করে। এখানে উল্লেখ্য তেমন কোন উৎসব না থাকলেও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে। মনসাই এখানকার গ্রাম্যদেবী। বহু ছাগ বলিসহ মনসার পূজা শ্রাবন সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে মনসার ভাসান ও শাঁকি গানের রেওয়াজ আছে। ঐ মনসা পূজাকে কেন্দ্র করেই গ্রামের লোক আত্মীয় স্বজনদের আমন্ত্রণ জানায়। জাঁকজমকের দিক থেকে মনসাপূজার পরে কালীপূজার স্থান। গ্রামে শিব মন্দিরও আছে এবং শিবরাত্রির সময় সেখানে বিশেষ পূজাও হয়ে থাকে।

গ্রামটিতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। মুসলমান পাড়াটি একটু স্বতন্ত্র ভাবেই অবস্থিত। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, গোপ, উপক্ষত্রিয় কর্মকার, কুম্ভকার বণিক ও অনেক অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামটি মুখ্যত কৃষি প্রধান। প্রাচীন কাল থেকেই সমৃদ্ধ ছিল। এখন রাস্তাঘাটের উন্নতি হওয়ায় বিশেষ ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

রনডিহা ঃ— এটি বর্তমান বুদবুদ থানার অধীন ৪ নং জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীন পল্লী। জি. টি. রোডের অথবা পূর্বরেলের পানাগড় স্টেশনে নেমে রনডিহায় যাওয়া যায়। দামোদর নদীর উত্তর গায়েই এর অবস্থান। স্থানটি সে কারণে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল, এখানেই দামোদর নদীর উপর প্রথম আড় বাঁধ দিয়ে ব্যারেজ তৈরি করা হয় এবং সেখান থেকে বর্ধমানের বিস্তৃত এলাকায় ক্যানেলের মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়াও এখানে রয়েছে একটি সাজানো গোছানো ইরিগেশন ইনসপেকশন বাংলো।

দামোদরের উপর প্রাচীন আড়বাঁধ, বাংলো এবং পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যের জন্য স্থানটি বর্তমানে একটি পিকনিক স্পটে পরিণত হয়েছে। প্রায় বারো মাসেই এখানে ভ্রমণার্থীদের ভিড় লক্ষ করা যায়, তবে শীতকালেই পিকানিক পার্টির সংখ্যা খুবই বেশি হয়।

রামচন্দ্রপুর (ছোট) ঃ— গ্রামটি কাঁকসা থানার অন্তর্গত জঙ্গলাবৃত একটি ছোট গ্রাম। পানাগড় ইলামবাজার রাস্তা ধরে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সাম্প্রদায়ের বাস। হিন্দুদের মধ্যে কিছু ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ ও বেশকিছু নিম্নসম্প্রদায়ের বাস রয়েছে। মুসলমানদের আলাদা পাড়াও আছে।

গ্রামের লোকরা সকলেই কৃষিজীবী। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম। গ্রামে বিভিন্ন দেব-দেবীর মধ্যে দিদিঠাকুরুন ও রাধাবল্লভের মন্দির বর্তমান। অন্যান্য দেবদেবীর পূজার সঙ্গে গ্রামে-পঞ্চানন্দ, কয়েকটি মনসা ও শীতলাদেবীর পূজাও হয়ে থাকে। তবে গ্রামে সব থেকে গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিবছর বৈশাখ মাসে দিদিঠাকরুনের পূজা হয় এবং আট দিনের মাথায় তারই অষ্টমঙ্গলা নামে এক বিশেষ উৎসব পালিত হয়। এই বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করেই গ্রামে বিশেষ ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। দিদিঠাকরুনের পূজার দিন থেকে অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত আট দিন ধরে গ্রামে একটি মেলাও বসে।

রক্ষিৎপুর ঃ— দুর্গাপুরের কিছুটা উত্তরে কাঁকসা থানার ৪২ নং জে. এল. ভুক্ত এক গ্রাম এই রক্ষিৎপুর। দুর্গাপুর থেকে বাসে এই গ্রামে যাওয়া যায়। দুর্গাপুরের উত্তরে আড়ায় রয়েছে প্রাচীন বাঢ়েশ্বর শিব, সেই আড়া গ্রামের নিকটেই রক্ষিৎপুরের অবস্থান। এখানেও কয়েকটি শিব মন্দির বর্তমান তার মধ্যে একটি বিশেষ প্রাচীন। এখানের শিব নিত্যপূজিত হলেও শিবরাত্রিতে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। গ্রামে উল্লেখ্য উৎসব হল ধর্মরাজের গাজন। বৈশাখ মাসে এই ধর্মরাজের গাজন পর্ব বেশ ধুমধামেই অনুষ্ঠিত হয় সে উপলক্ষে গ্রামবাসী আত্মীয়-পরিজনদের গ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানায়। গাজনকে কেন্দ্র করেই তখন গ্রামে একটি জমাটি মেলাও কয়েকদিনের জন্য বসে থাকে।

রাজকুসুম ঃ— কাঁকসা থানার অধীনস্ত গ্রাম রাজকুসুম। গোপভূমের জঙ্গল মহলের জঙ্গল ঘেরা আরণ্যক পরিবেশে গ্রামটির অবস্থান। এর জে, এল, নং-৭২। জি.টি. রোডে রাজবাঁধে নেমে কিছুটা উত্তরে এগুলোই গ্রামে যাওয়া যায়।

গ্রামটির নাম এত সুন্দর সে প্রসঙ্গে অনেকের অভিমত হল যে, এখানে পূর্বে সুন্দর সুন্দর ফুলের চাষ হত। তাই গ্রামটি কুসুমের রাজা অর্থেই 'রাজকুসুম' নামে নামিত হয়েছে। হতেও পারে। তবে এখন আর সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। অর্থাৎ এ গ্রামে ফুলের চাষ কবেই বন্ধ হয়ে গেছে তবুও নামটি কিন্তু বহাল আছে। গ্রামের মধ্যে এক প্রাচীন শিবমন্দির বর্তমান। মন্দির অভ্যন্তরে দেব বিগ্রহও নিত্য

পূজিত। গ্রামে এক উল্লেখ্য দেববিগ্রহ হল হর-গৌরী বিগ্রহ। বিগ্রহটি মাটির তবে ১২ বছব অন্তর তা বিসর্জিত হয়ে থাকে। বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য বিগ্রহ স্থাপিত হয় কারণ দেবআটন শূন্য থাকে না; এই গ্রামের জমিদার ব্যানার্জীদের প্রতিষ্ঠিত এই মূর্তি সারা বছরই নিত্যসোবিত। তবে দুর্গা পূজার ৪ দিন বিশেষ সাড়ম্বরে পূজিত হন। বর্তমানে মুখার্জীরাই এব পূজক। প্রথমে এই দেববিগ্রহ শ্মশানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সেই দেব স্থানকে কেন্দ্র করে গ্রামের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্মশান এখন অনেক দূরে সবে গেছে।

গ্রামের এক স্থানে ভৈরবের পূজা হয়ে থাকে। সেখানে পোড়া মাটির স্তূপিকৃত ঘোড়া দেখা যায়। এই গ্রাম ছাড়াও ভিন্ন গ্রাম থেকেও বহু মানুষ ১লা মাঘ তারিখে সমবেত হয়ে ভৈরবের বিশেষ পূজা দিয়ে থাকেন। গ্রামে আর এক আকর্ষণীয় পুরাকীর্তি হল প্রায় ত্রিশ হাত উঁচু সুন্দর কারুকার্যে মণ্ডিত একটি সরস্বতী মন্দির। দেবী সরস্বতীর জন্য এত সুন্দর মন্দির বঙ্গে সচরাচর দেখা যায় না, কারণ বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পূজা সাধারণত প্যাণ্ডেল ও ক্লাব গৃহেই নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। সে দিক থেকে গ্রামে এই বাগদেবীর মন্দিরটি বিশেষ স্বকীয়তার দাবিদার।

গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রদ্ধেয় ষষ্ঠীনারাযণ গড়াই গ্রামের ছেলেদের বিদ্যার্জনের জন্য একটি জুনিয়ার হাইস্কুল নির্মাণের পর, সেই বিদ্যালয় সংলগ্ন এই বিশাল সরস্বতী মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। এই পরিবার বর্তমানে আসানসোলে অবস্থান করলেও বৎসরান্তে সরস্বতী পূজায় সপরিবারে গ্রামে এসে মহাধুমধামে সরস্বতীপূজা করে থাকেন এবং তাকে ঘিরে এক মহোৎসবের আয়োজন হয় তাতে দূরদূরান্ত থেকে আসা প্রায ৫/৬ হাজার লোকের ভোজনের ব্যবস্থা থাকে। এই সময় এখানে একটি মেলাও বসে।

গ্রামে লোকসংস্কৃতির বিলিয়মান এক ধারা 'কৃষ্ণযাত্রা'র চল বর্তমান। গ্রামের প্রাক্তন সময়কর্মী আপনভোলা জিতেন মুখার্জীর প্রচেষ্টাতেই এই ধারা এখনও গ্রামে সচল রয়েছে। তিনি গরীবগুর্ব ঘরের ছেলেদের নিয়ে আপন খেয়ালে দল পরিচালনা করেন। তাদের সে সকল পালা সেট আছে তার মধ্যে উল্লেখ হল— কংসবধ বা মাথুর, নিমাই সন্ন্যাস, কৃষ্ণকালী, রাধার কলঙ্কভঞ্জন ও সাবিত্রী সত্যবান ইত্যাদি।

বান্দরা পার হয়ে এই গ্রামে ফারাকি তলায় ঢোকার মুখে এক ঘন জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে বনকালীতলা। ঘনবনের মাঝে এক বিরল প্রজন্মের গাছের তলে এক কালীর আটন বর্তমান। বনের মধ্যে এখানেই কালীপূজা হয় তাই এ স্থান 'বমকালীতলা' নামে খ্যাত। আসা যাওয়ার পথে গ্রামবাসীরা বনকালীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদনে ভুল করেন না।

গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা ও দোল-দুর্গোৎসব পালিত হলেও ধর্মরাজের

গাজনসহ এখানে মনসা পূজাও ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও কিছু চাকুরিজীবীও আছেন তবে তাদের সংখ্যা খুব কম।

রূপগঞ্জ ঃ— এটি দুর্গাপুরের সামান্য উত্তরে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম। দুর্গাপুর থেকে সরাসরি বাস যোগে যাওয়া যায়। 'রাঢ়েশ্বর' শিব যেখানে অবস্থিত সেই আড়া গ্রামের নিকটেই এর অবস্থান। গ্রামে তেমন কোন পুরাকীর্তি নাই। হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম। মুসলমানের বসতি আদৌ নাই। গ্রামে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা যথা নিযমে হয়ে থাকে।

গ্রামে সাধারণ প্রতিষ্ঠান বলতে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমান। গ্রামেব অধিকাংশ অধিবাসীই গোপ সম্প্রদায়ের। তাদের দুধ-ছানার কারবার ও চাষ-আবাদ নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকেন। কৃষিজীবী এই গ্রামে চাকুবির সংখ্যা খুবই কম। তবে শিল্পনগরী দুর্গাপুরের সান্নিধ্যে থাকায় কিছু লোক দুর্গাপুরে কাজে নিযুক্ত আছেন।

রামপ্রসাদপুর ঃ— অণ্ডাল থানার অধীন ৫১ নং, জে, এল, ভুক্ত এই গ্রামটি দামোদর নদীর উত্তরে অবস্থিত। অণ্ডাল থেকেই দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রবর্তী হলেই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে উল্লেখ্য পুরাকীর্তির মধ্যে রয়েছে এক শিব মন্দির। যার অভ্যন্তরে অবস্থিত শিবলিঙ্গ নিত্য সেবিত হলেও শিবরাত্রিতে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তাকে ঘিরে সেখানে কয়েক বছর একটি মেলাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল তবে বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাধুমধামে এই শিবের গাজন উৎসব পালিত হয়।

গ্রামে শৈবকৃষ্টির বেশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের একব্যক্তি শিবের স্বপ্নাদেশে ২২ হাত দৈর্ঘের এক বিশাল শিব মূর্তি তৈরি করে তার পূজা শুরু করেন। [(৪৪)] এই শিবপূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামে এখনও একটি মেলা বসে। পাশাপাশি গ্রামের লোকরা এতে অংশ নিয়ে থাকে। গ্রামটি কৃষি কেন্দ্রিক গ্রাম। চাষ-আবাদই প্রধান জীবিকা। তবে অণ্ডালের নিকটবর্তী হওয়ায় কিছু লোক কলকারখানা ও খনিতেও কাজ করেন।

রঘুনাথবাটি ঃ— সালানপুর থানার আসানসোলের নিকটবর্তী এক প্রাচীন গ্রাম। আসানসোল থেকে এথোরা যাবার পথে এই গ্রামটিতে যাওয়া যায়। জনশ্রুতিতে জানা যায় কাশীপুরের রাজারা এই গ্রামে গ্রাম্যদেবতা হিসাবে রাধাশ্যামের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তার মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেই রাধাশ্যামই এখানে রঘুনাথ নামে খ্যাত হয় এবং তা থেকেই একদা গ্রাম নাম রঘুনাথবাটিতে পরিণত হয়।

এখানকার গ্রাম্যদেবতা রঘুনাথ নিত্য সেবিত হলেও তাকে ঘিরে বছরে বেশ কয়েকটি বৈষ্ণবীয় উৎসব পালিত হয়। কৃষিকেন্দ্রিক এই গ্রাম নিকটবর্তী খনি ও শিল্পাঞ্চলের সান্নিধ্যে আসায় তার আঙ্গিকের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, ফলে তা এখন নগরায়নের অভিমুখী।

রূপনারায়নপুর ঃ— গোপভূমের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অরণ্য ঘেরা পাহাড়ি

এলাকায় স্বাধীনোত্তর কালে তৈরি হয় চিত্তরঞ্জন শিল্পনগরী। সেই শিল্পনগরী গড়ে ওঠার আগে রূপনারায়নপুর ছিল এক প্রাচীন পল্লী। কিন্তু এখানকার জল হাওয়া শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। তাই স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে এর স্বীকৃতি ছিল। একসময় এই রূপনারায়ণপুরই পূর্ব রেলপথের প্রধান শাখার শেষ স্টেশন ছিল। আসানসোল থেকে প্রায় ১৮ কি.মি. উত্তরে এবং অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন থেকে বেশ কিছুটা দক্ষিণে রূপনারায়ণপুরের অবস্থান। এটি সালানপুর ব্লকের ৩৬ নং জে, এল, ভুক্ত গ্রাম।

এটি একটি সাধারণ গ্রাম। এতে হিন্দু ও মুসলমানের বাস। এখানে পুরাকীর্তি বলতে রয়েছে একটি শিব মন্দির— যা তৈরি করেন গোপাল সেট নামে জনৈক ব্যক্তি শিবের নিত্য পূজা হলেও ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশীতে শিবের বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে তারই উদ্যোগে তখন এখানে একটি মেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যক্তি উদ্যোগে তা চালু হওয়ায় বিশেষ কোন অসুবিধা হেতু তা বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রথমদিকে এখানে বেঙ্গল পটারি ও বিহার পটারি স্থাপিত হওয়ায় রূপনারায়ণপুর শিল্পনগরে পরিণত হয়। [(৪৫)]

পরে স্বাধীনোত্তর কালে এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করে চিত্তরঞ্জন শিল্পাঞ্চলের আওতাধীন আরও কয়েকটি গ্রাম— যেমন রাঙামাটি, জোড়বাড়ি, মালবহল ও উপরকেশিয়াকে নিয়ে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের M/s. Standard Telephone & Cables Ltd. এর সহযোগিতায় [(৪৬)] এখানে টেলিফোনও টেলিগ্রাফে ব্যবহারের উপযোগী তার উৎপাদনের জন্য একটি কারখানা হিন্দুস্থান কেবল ফ্যাক্টরি নির্মিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তার উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে এখানে মাটির নীচে দিয়ে নিয়ে যাওয়া Dry core Telephone coaxial cables, plastic cables ও বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক তার এখানে উৎপন্ন হচ্ছে। এই ধরণের কারখানার দৌলতে এই এলাকায় এখন ভিন প্রদেশের বহু ব্যক্তির সমাগম হওয়ায় এখানকার জনজীবনে এক মিশ্রকৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে এবং গ্রামীণ পরিবেশকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই এলাকা এখন নগরায়ণের চাকিচিক্যে রূপায়িত হয়েছে।

(ল)

লাখুরিয়া ঃ— মঙ্গলকোট থানার ৩৫ নং জে, এল, ভুক্ত গ্রাম লাখুরিয়া। গ্রামটি অজয়নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত প্রাচীন বর্ধিষ্ণুগ্রাম। ওস্করা নতুন হাট বাসে সিউড়ের মোড়ে নেমে উত্তরে মোরাম রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে প্রথমে পড়বে সিউর গ্রাম, তার উত্তরেই লাখুরিয়া। ইদানিং ওসকরা পালিগ্রাম রাস্তায় বাসযোগে সরাসরি গ্রামে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বঙ্গে একদা অজয় দামোদর কোপাই কুমুর ইত্যাদি নদী কেন্দ্রিক তাম্রাশ্মিয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল— সে তথ্য আজ পাণ্ডুরাজার ঢিবি, ভরতপুর, বসন্তপুর, মঙ্গলকোট ইত্যাদিতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে বিশেষভাবে প্রমাণিত। সেই সভ্যতাই অজয় নদীর তীরবর্তী এই সকল গ্রামাঞ্চলেও বিকশিত হয়েছিল। সেই নিরিখে দেখতে গেলে এই গ্রামও প্রাচীনকাল থেকেই সুসমৃদ্ধ ছিল। তবে এসব সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। তা বাদ দিলেও ঐতিহাসিক কালের মধ্যযুগেও এই গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল, তার বহু প্রমাণ গ্রামে ছড়িয়ে থাকা বহু পুরাকীর্তির মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়।

গ্রামে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, বণিক, সদ্‌গোপ, তন্তুবায় ও বহু অন্ত্যজ সম্প্রদায়সহ আদিবাসীর বসতি আছে। গ্রামে মুসলমান আমলের কোন সুবেদারের বাড়ির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। একদা নকুর দত্ত নামে এই গ্রামের এক ব্যক্তি বর্ধমান রাজ দরবারে কর্মসূত্রে আবদ্ধ থেকে নিজে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়ে নিজ গ্রামে বেশ কিছু দেবকীর্তি সংস্থাপন করেছিলেন। তারই 'নকুর' নাম অপভ্রংশিত হয়ে গ্রাম নাম 'লাকুরিয়া' হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। দত্তরা জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। নকুর দত্ত গ্রামে যে সকল দেবকীর্তি স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখ হল রাধাগোবিন্দ জিউ এর বিগ্রহসহ মন্দির। মন্দিরের সামনে আটচালা পিছনে দেবসেবার নিমিত্ত খনিত হয়েছিল ঠাকুর পুকুর। মন্দির থেকে পুকুরে ওঠা নামার জন্য বাঁধানো ঘাটও বর্তমান। এখানকার বিগ্রহের নিত্যসেবা হলেও, কার্তিক মাসে অন্নকূট সেবাসহ বিশেষ উৎসব পালিত হয়। সেই সময় হরিনাম যজ্ঞও চলতে থাকে।

দত্তদের অন্যতম কীর্তি হল রাসউৎসব। এর জন্য তারা গ্রামে একটি গোলাকার রাসমঞ্চও তৈরি করেছিলেন। পূর্বে মহাধুমধামে সেখানে রাসউৎসব পালিত হত। এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে। একদা এই দত্তদের পরিচালনায় গ্রামে রথযাত্রা, দোল, রাস ও ঝুলন উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হত। বর্তমানে ব্যক্তি উদ্যোগে তা বন্ধ হলেও গ্রামবাসী সকলের সহযোগিতায় এখনও তা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য বিগ্রহাদি ও উৎসব ছাড়াও গ্রামে আরও বিভিন্ন পাড়ায় অনেক দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেবিত হচ্ছে। যেমন— যুগল মহাপ্রভু, একক মহাপ্রভু, গোপীনাথও রাধারানী, মদনমোহন-রাধারানী, শ্রীধর, জগন্নাথ, শ্যামসুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি। এরা সকলেই নিত্যসেবিত। এদের ঘিরে নানান বাৎসরিক উৎসবনুষ্ঠানও পালিত হয়।

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সকল দেব-দেবতাদের উদ্ভব কাহিনী সম্যক জানা না গেলও যে, একদা এই গ্রামের সাধুপাড়ায় দারুমূর্তি জগন্নাথের প্রতিষ্ঠার বিষয় এক জনশ্রুতিতে জানা গেল যে, একদা এই গ্রামের শশধর সাধু, যিনি ব্যক্তি জীবনে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, কর্মজীবন থেকে অবসর.গ্রহণের পর গ্রামে

এসে একবার স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে জগন্নাথ মূর্তি নির্মাণের জন্য এক বিশেষ স্থান থেকে কাষ্ঠ খণ্ড পাওয়ার কথা জানতে পারেন। পরে তিনি গ্রামের শ্রীধর মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে খনন শুরু করেন তার ফলে সেখানে এক কাষ্ঠ খণ্ড পান। পরে সেই সাধু স্নান করতে পুকুর ঘাটে গেলে সেখানেই আমধারা ভবানীপুর থেকে আগত এক দারুশিল্পী তার খোঁজ নিয়ে জানান যে, তিনি যে টুকরা কাষ্ঠ খণ্ড পেয়েছেন তা থেকেই জগন্নাথ মূর্তি নির্মাণ করার জন্য তিনি আদিষ্ট হয়ে এখানে এসেছেন। ফলে সেই কাষ্ঠ খণ্ড থেকেই জগন্নাথের দারুমূর্তি নির্মিত হয় এবং এখনও সেই জগন্নাথ মূর্তি বণিক পাড়ায যথেষ্ট নিয়ম নিষ্ঠায় পূজিত হচ্ছেন।

এখনও সেই জগন্নাথকে রথযাত্রার দিনে রথে চড়িয়ে তার সঙ্গে দক্ষিণ পাড়ার শ্যামসুন্দর ও পূর্বপাড়ার (গোস্বামী পাড়া) গোপীনাথ বিগ্রহসহ রথ মন্দিরে (রথতলায়) নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সারাদিন রেখে তাদের সেবাপূজা সম্পন্ন করে অনেক রাতে তাদের আপন আপন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই রথ উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামে মহাধুমধাম পড়ে যায় এবং তখন ৭/৮ দিন ধরে গ্রামে একটি মেলাও বসে। উল্টোরথের পরদিনও রথটানা হয় তাকেই 'বাগিলা' রথ বলে।

গ্রামের বিভিন্ন দেবদেবীদের নিয়ে দোল, দুর্গোৎসব, শিবগাজনসহ অন্যান্য দেব দেবীর পূজা ও উৎসব নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হলেও, চৈত্র মাসেব ২০ তারিখের পর যে মঙ্গলবার আসে সেই দিনে, এতদাঞ্চলের শাসন দেবী বুধরা গ্রামের "দুলোর মা" নামক মনসাদেবীকে সাড়ম্বরে গ্রামে আনা হয়। সাধুপাড়ার গাজন তলায় তিনদিন ধরে সেখানে অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিসহ প্রচুর ছাগবলি দিয়ে মায়ের পূজা সমাপন করে আবার মনসাদেবীকে বুধরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই মনসাপূজাকে কেন্দ্র করে তখনও গ্রামে ছোটখাট একটি মেলাও বসে। এইভাবেই গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবীও তাদের পূজা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রামে বারমাসে তেরপার্বণ লেগেই থাকে।

গ্রামটি কৃষি প্রধান গ্রাম। অজয় নদীর পলিগঠিত উর্বর ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, আলু, ও রবি ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই গ্রামের অধিকাংশেরই জীবিকা কৃষি কাজ। চাকুরিজীবীও কিছু আছেন। বর্ধিষ্ণু গ্রাম হওয়ায় গ্রামে হাসপাতাল, পঞ্চায়েত, পোস্ট অফিস, কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ একটি উচ্চবিদ্যালয় বর্তমান। এখন পালিগ্রাম হয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে পাকা রাস্তা প্রসারিত হওয়ায় এর যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হয়েছে।

লক্ষ্মীগঞ্জ ঃ— আউশগ্রাম থানার ১ নং ব্লকের ১৫৩ নং জে. এল. ভুক্ত ছোট্ট গ্রাম লক্ষ্মীগঞ্জ। গুসকরা-বুদবুদ রাস্তা ধরে এই গ্রামে যাওয়া যায়। হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম হলেও এখানে অধিকাংশ অধিবাসীই গোপ সম্প্রদায় ভুক্ত। অর্থাৎ এটিও গোপভূমের

এক গোপ প্রধান গ্রাম। গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা যথা সময়ে হলেও তেমন কোন পুরাকীর্তি নাই। গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।

লোয়া ঃ— গলসী থানাব ৫৬ নং জে. এল. ভুক্ত ছোট গ্রাম লোয়া। বর্ধমান থেকে বাস যোগে গ্রামে যাওযা যায়। হিন্দু প্রধান গ্রাম। গ্রামে সাধারণ ও নিম্ন সম্প্রদায়ের অনেক লোকেব বাস থাকলেও বেশ কয়েক ঘর বৈষ্ণবও আছেন।

গ্রামে উল্লেখ্য দেব-দেউলের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরে বাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ নিত্য সেবিত হয়। মন্দিরের সামনে একটি রাসমঞ্চও বর্তমান। এই গ্রামে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা যথাসময়ে পরিচালিত হলেও এখানে উল্লেখ্য উৎসব রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব। এই রাসউৎসবকে কেন্দ্র করেই গ্রামে প্রায় সাত দিন ধরে একটি মেলাও বসে। গ্রামে বৈষ্ণবীয় উৎসব মহাসমারোহে পালিত হলেও সেখানে শৈবধর্মের উপাস্য দেবতা শিবের পূজাও হয়ে থাকে। গ্রামে শিবমন্দিরও রয়েছে, সেখানে শিব নিত্য সেবিত হলেও তার বাৎসরিক অনুষ্ঠানাদিও হয়ে থাকে। কৃষি প্রধান গ্রাম। চাষ-আবাদই প্রধান জীবিকা। চাকুরিজীবীও আছেন তবে তাদের সংখ্যা কম।

লোয়াপুর ঃ— এটিও গলসী থানার অন্তর্গত ২৬নং জে. এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম। লোয়া গ্রামেব সংলগ্ন গ্রাম লোয়াপুর। বর্ধমান থেকে বাস যোগে সরাসরি গ্রামে যাওয়া যায়। ছোটগ্রাম। গ্রামের মুখ্য দেবতা হলেন শ্যামসুন্দর জিউ।

গ্রামে এই দেবতাব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে যে লোকশ্রুতি শোনা যায়, সেটি হল— একদা গ্রামের এক কর্মকার বাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, গ্রামের এখন যেখানে দোলমঞ্চ বর্তমান রয়েছে সেখানেই এক বটবৃক্ষ মূলে রাধাশ্যামের যুগল মূর্তি রয়েছে। সে তা উদ্ধার করে তাদের সেবাপূজার ব্যবস্থা করে। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি সেই স্থানে গিয়ে যুগলমূর্তি দেখতে পান কিন্তু নিজে শূদ্র হওয়ায় কাশ্যপ গোত্রীয় চ্যাটার্জী বংশের এক ব্রাহ্মণকে ডেকে সেই বিগ্রহের সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন। তদবধি সেই ব্রাহ্মণ বংশ ঐ দেব সেবার অধিকার পাওযায় তারা 'অধিকারী' পদবিতে ভূষিত হয়ে বংশ পরম্পরায় ঐ দেবসেবায় ব্রতী আছেন।

বর্তমানে দেবমন্দির নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পূজকদের নিজ বাড়িতেই দেবসেবা চলছে। দেবতাও খুব জাগ্রত। তাদের সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি চালু আছে যেমন— এক সময় যুগল বিগ্রহের রাধিকা মূর্তিটি চুরি হয়ে যায়। বেশ কিছু দিন পরে এক রাত্রে রাধারাণী স্বপ্ন দিয়ে জানান যে, গ্রামের পশ্চিমে প্রবাহমান ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কুকুই এ তিনি নিমজ্জিত আছেন। তার পরিধেয় কাপড়ের কিছু অংশ বা ফুঁপি দেখা যাবে— সেই নিশানা ধরে যেন তাকে তুলে আনা হয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী অনুসন্ধানে রাধারাণীকে পাওয়া গিয়েছিল।

আর একটি ঘটনার কথা বলে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটাতে চাই। এবার শ্যাম সুন্দরের কথা। একদা দেবসেবার জমিজমা নিয়ে বর্ধমানের রাজাদের সঙ্গে কোর্টে মামলা চলতে থাকলে সেবাইত ব্রাহ্মণ মামলার দিন পড়লে আগের দিন থেকে হাঁটতে শুরু করে পরের দিন কোর্টে হাজির হতেন। একদিন যাত্রা করেও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পুরশোর এক মুসলমানের ছানি কাটার চালায় বিশ্রম নিতে বাধ্য হন এবং সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন ফলে সময়ে কোর্টে উপস্থিত হতে না পেরে চিন্তান্বিত ব্রাহ্মণ বিকালে বর্ধমানের উকিল সন্তোষ মিত্রের বাড়ি হাজির হয়ে মামলার খবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন যে, সে যথা সময়েই হাজির থেকে তার বক্তব্য পেশ করে দেয় এবং হাকিম সন্তুষ্ট হয়ে তার পক্ষে রায় দেওয়ায় মামলায় জিতে গেছেন। এ কথা শুনে তিনি আনু পূর্বিক সব ঘটনা উকিলকে জানালে, দুই জনেই বিস্ময়ে অভিভূত ও হতবাক হয়ে পড়েন।

বর্তমানে এই দেববিগ্রহের নিকট অন্য স্থান থেকে পাওয়া অনেক শালগ্রাম শিলা, কয়েকটি পিতলের গোপাল মূর্তি ও একটি কপিলমুনির মূর্তি সহ অবস্থানে থেকে দেবতার সঙ্গে পূজিত হচ্ছেন। দোলের সময় শ্যামসুন্দরের বিশেষ পূজা ও উৎসব পালিত হয়। তাছাড়াও এখানে ধুমধামে জন্মাষ্টমী উৎসবও পালিত হয়। এই শ্যামসুন্দরের বিগ্রহটি কষ্টি পাথরের। তলদেশে কিছু লেখা ছিল কিন্তু তা এখন স্পষ্ট নয়। রাধারাণীর বিগ্রহটি অষ্টধাতুর।

গ্রামে আরও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল মনসাপূজা। গ্রামের মধ্যে ৫/৬টি পাড়ায় মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশই নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পূজা অনুষ্ঠিত হলেও সদ্‌গোপ পাড়াতেও একটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্রসংক্রান্তির সন্ধ্যায় গ্রামের 'ভাগারী' পুকুর থেকে মনসার বারি ভরণ হয় তখন মনসার ঝাপান গান গাওয়া হয়ে থাকে। তাতে বহু গান গাওয়া হলেও একটি গান বিশেষ করে গাওয়া হয়, সেটি হল—

"রাবন পালারে পালারে, আসছে বিভীষণ
ঘরের ভেতর ঘড়ভেদি তোর বধিবে জীবন।"

পরিশেষে যে গানটি গাইতে গাইতে চলে যায় সেটি হল— "বাজুক বিষাণ ঢাকি, চলুক ঝাপান।"

গ্রামটি কৃষি প্রধান গ্রাম। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম হলেও তাদের অনেকেই এখন শহরমুখী। গ্রামে যাতায়াতের যোগাযোগ এখন ভাল হয়েছে।

লাউদহ ঃ— ফরিদপুর থানার অধীন ২১ নং জে.এল.ভুক্ত গ্রাম লাউদহ। ফরিদপুর থানার বর্তমান সদর কার্যালয়ই হল লাউদহ কারণ ফরিদপুর এলাকা দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ফরিদপুর এখন খুবই ব্যস্ত ও ঘিঞ্জি শহর। তাই সেখান থেকে

অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে থানার সদর কার্যালয় লাউদহেই স্থানান্তরিত করা হয়েছে। লাউ সেনের নাম থেকে লাউদহ্ নামকরণ সূচিত হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। অন্যমতে কোন দহ বা জলাশয় থেকেও নামকরণ হতে পারে।

দুর্গাপুর থেকে সহজেই এখানে যাওয়া যায়। গ্রামটি শিল্প নগরীর সংস্পর্শে রয়েছে তাছাড়া খনি এলাকাভুক্ত হওয়ায় এটিও এখন রীতিমত শহরে পর্যবসিত হয়েছে। এখানে বহুবিধ সাধারণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য ছিল বেসিক ট্রেনিং কলেজ, কিন্তু নীচে কয়লা খনির ব্যাপক বিস্তার হেতু এখানের কিছু অংশ বসে যাওয়ায় ঐ কলেজটি বর্তমানে এখান থেকে সরিয়ে দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়াও এখনও যে সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠান এখানে রয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল বেসিক স্কুল, হাই স্কুল, হাসপাতাল, টেকনিক্যাল কলেজ ইত্যাদি।

এখানে বিভিন্ন সময়ে বহুবিধ দেব-দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চাষ-আবাদ কিছু হলেও বাবুই চাষের বিশেষ চল আছে।

(শ)

শ্যামবাজার ঃ— মঙ্গলকোট থানার অজয় তীরবর্তী এলাকায় বর্ধিষ্ণু তথা প্রাচীন গ্রাম শ্যামবাজার। এর. জে.এল. নং—৯৯ এবং এটি ভালগ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন গ্রাম। ব্যক্তি নাম থেকেই সম্ভবত গ্রাম নামের উৎপত্তি। গ্রামটি পূর্বে বড়া শ্যামবাজার নামে খ্যাত ছিল এখন্ 'শ্যামবাজার' নামেই পরিচিত।

একদা অজয় নদীকেন্দ্রিক জলবাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে এটি প্রাচীন কাল থেকেই সমৃদ্ধ ও বাজার অভিধায় খ্যাত। বর্তমানে এই গ্রামের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা প্রসারিত হওয়ায় প্রতিদিন বাজার ছাড়াও সপ্তাহে দু'দিন সোম ও শুক্রবার হাট বসায় এটি বর্তমানে গঞ্জের আকার ধারণ করেছে এবং নতুন হাট, কাটোয়া ও বর্ধমানের সঙ্গে যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়েছে।

এখানে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন ব্রাহ্মণ, বৈরাগ্য, গোপ, সদ্গোপ ছাড়াও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বহু লোকের বাস। নিকটস্থ বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডের প্রভাব পুষ্ট বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় এখানের বৈষ্ণব সম্প্রদায় পুষ্ট। গ্রামে কীর্তন গানের চর্চা আছে। হেলারাম বৈরাগ্য, অনিল বৈরাগ্য ইত্যাদি অনেকেই কীর্তন গানের চর্চায় লিপ্ত আছেন। গ্রামে রাধামাধবের বিগ্রহ সেবিত হয়। পালাক্রমে সেই বিগ্রহ কয়েকটি গ্রাম পরিক্রমা করে থাকে। এখানকার সেবা অধিকারী পরিবার কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়। সেবাচলাকালীন সময়ে নিত্যসেবা ছাড়াও বিশেষ অনুষ্ঠানাদিও হয়ে থাকে।

গ্রামে বহু প্রাচীন দেবকীর্তিও বর্তমান। অনেক মন্দিরাদিও আছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল শিবমন্দির। সেখানে গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ধর্মরাজের সেবাপূজাও

হয়ে থাকে। ধর্মরাজের গাজন সম্পন্ন হয় মহাজ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায়। অন্যান্য পূজাদিও গ্রামে যথা সময়ে যথা নিয়মে পালিত হয়।

গ্রামের উত্তরে রয়েছে একটি বড় দিঘি— যা দত্তপুকুর নামে খ্যাত। কিন্তু গ্রামে কোন দত্ত পরিবার এখনও নাই পূর্বেও ছিল না। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানা গেল পশ্চিম মঙ্গলকোটের সিউর-লাকুড়ের জমিদার ছিলেন দত্ত পরিবার। সেই জমিদারদের মা শ্যামবাজারের উপর দিয়ে এই পথেই প্রায়শই কাটোয়ায় গঙ্গাস্নানে যেতেন। পথে সাময়িক বিশ্রাম। স্নান ও জলপানের জন্য এখানে একটি দিঘি খননের জন্য পুত্রকে অনুরোধ করেন। তখন মাতৃআজ্ঞায় জমিদার দত্তদের দ্বারা এখানে এক বিশাল জলাশয় বা দিঘি খণিত হয় এবং তার পাড়ে বড় করে একটি ঘাট ও বাঁধানো হয়। সেই পুষ্করিণীই দত্তপুকুর নামে খ্যাত— যার মালিকানা সত্ত্ব এখন গ্রামস্থ সদ্‌গোপ পরিবারের উপর বর্তেছে। জনশ্রুতি সাধক বামাখ্যাপা নাকি একবার এই পুকুর পাড়ে অবতীর্ণ হয়ে অন্তর্লীন হয়েছিলেন। পূর্বে আশপাশের বহু দূরবর্তী গ্রাম থেকে পদব্রজে শবদেহ কাটোয়ায় দাহ করার জন্য নিয়ে যাবার কালে শবযাত্রীরা এখানে তা নামিয়ে সাময়িক বিশ্রাম নিতেন। কৃষি প্রধান গ্রাম। চাষ-আবাদই গ্রামবাসীর প্রধান জীবিকা। চাকুরিজীবী থাকলেও তাদের সংখ্যা কম। গ্রামে প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় আছে।

শিবদা ঃ— আউশ গ্রাম থানার ১নং ব্লকের ১৬১নং জে.এল. ভুক্ত গ্রাম শিবদা। গুসকরা বর্ধমান শিউড়ী রোডে, শিবদার মোড়ে নেমে প্রায় ২ কি.মি. পশ্চিমে হাঁটলে গ্রামে যাওয়া যায়। নিকটবর্তী রেলস্টেশন, খানা জংশন থেকে ভেঙে যাওয়া লুপ লাইনের ন'দার ঢালে নেমেও গ্রামে যাওয়া যায়।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায় কোন এক সময় সম্ভবত অজয় বা কুনুরের বাঁধভাঙা বন্যার প্রবল তোড়ে এখানে সৃষ্ট হয়েছিল এক দহ। 'দহ' শব্দটি সংস্কৃত হ্রদ থেকে বর্ণবিপর্যয়ে 'দহ' হয়, তা থেকেই 'দ' বা 'দা' য়ে পরিণত হয়েছে। নদী স্রোতের যেখানে এহেন দহ ছিল বা আছে, তার কাছাকাছি জনপদ বহুক্ষেত্রে উল্লিখিত অন্ত্যপদযুক্ত হয়েছে দেখা যায় [৪৭]। এখানেও তেমনি নদী সৃষ্ট কোন দহ ছিল, যা শিবদহ নামে খ্যাত হয় এবং পরিশেষে তা অপভ্রংশিত হতে হতে 'শিবদহ' > 'শিবদা'য় পরিণত হয়েছে।

শিবদা গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। ইদানিং বেশ কিছু পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু গ্রামে বসতি করেছে। গ্রামে ঢুকতেই মুসলমান পাড়া। সেখানে পূর্বদিকে রয়েছে মুশাফির পীরের আস্তানা। মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রতি বছর এখানে পীরের উরস পালিত হয়। তাকে ঘিরে কয়েকদিনের জন্য একটি মেলাও বসে। জনগণের মনে পীরের সম্পর্কে গভীর আস্থা থাকায় এখানের মেলায় ব্যাপক লোক সমাগম হয়।

গ্রামে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা হয়ে থাকে। তার মধ্যে

উল্লেখ্য হল— দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি। তবে গ্রাম্য দেবতা হিসাবে গ্রামে দু'টি ধর্মরাজের পূজা হয়ে থাকে— তারা হলেন বুড়ো রায় ও খেলারাম। ধর্মরাজদ্বয়ের গাজন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে নানারকম শরীর নির্যাতনমূলক কৃত্যাদিসহ ধর্মবাজ মূর্তি সঙ্গে নিয়ে ভক্তরা ঢাক ঢোল বাজিয়ে বাদ্যের তালেতালে যে বিশেষ ভঙ্গিমায় নৃত্যসহ গ্রাম পরিক্রমা করে তা বিশেষত্ব পূর্ণ এবং দর্শনীয়, তথা চিত্তাকর্ষকও বটে।

ঐ সকল গ্রাম্য উৎসবাদি ছাড়াও এবার গ্রামে সবিশেষ উল্লেখ্য এক গ্রাম্য লৌকিক দেবী— যাকে ঘিরে গ্রামবাসীব মনে ভক্তিরসের স্রোতধারা সতত প্রবাহমান। সেই দেবক্ষেত্রেব কথায় আসা যাক। গ্রামের দক্ষিণে লোকালয় থেকে বেশ কিছুটা দূরে, কয়েকটি বটবৃক্ষের অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত এক মোহময় ছায়া ঘন, হৃদযহরণ শান্ত পরিবেশে, সদা জাগ্রত দেবী আঁধারকালীর আটন বিদ্যমান। দেবীর আঁধারকালী বা অন্ধকালী নামকরণের কারণ হল— একদা গ্রামে ডাকাতি করতে আসা একদল ডাকাত দেবীর সামনে দিয়ে গ্রামে ঢোকার সময়, এখানে বিরাজিত কালিকাদেবী, যিনি গ্রামবাসীর কল্যাণে সদাকল্যাণময়ী সেই দেবীর কৃপায়, অসৎ উদ্দেশ্যে আসা ডাকাতেরা সকলেই অন্ধত্ববরণে বাধ্য হয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে।

পরের দিন গ্রামবাসী দেবী স্থানে একসঙ্গে এতগুলি সশস্ত্র অন্ধলোকের সমাবেশ দেখে তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে এবং মায়ের অশেষ কৃপায় অভিভূত হয়। দিকে দিকে মায়ের অহৈতুকি কৃপার কথা প্রকাশিত হয়। দেবীব কৃপায ডাকাতরা অন্ধ হওয়ায় দেবীও 'আঁধারেকালী' নামে খ্যাত হলেন এবং দেবী যেহেতু এই গ্রামেই স্বমহিমায় অবস্থিত তাই গ্রাম 'আঁধারে শিবদে' নামে পরিচিতি পায়।

এখানে বিশাল বিশাল বটবৃক্ষের তলে মাটির বেদিতে দেবীর অবস্থান ছিল পরে ভক্তেরা তা বাঁধিয়ে দিয়েছেন। মাথায় কোন আচ্ছাদন নাই, তবে বিরাট বটবৃক্ষের আচ্ছাদন দেবীকে রোদবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করে। এখানকার বটবৃক্ষগুলি আকারে এতই বিশাল যে, এদেরকে অনেকেই বোটানিক্যাল গার্ডেনস এর সঙ্গে তুলনা করেন। এখানে দেবীর কোন স্বকীয় আকার নেই। কেবল সিন্দুরে লিপ্ত গোলাকার পাথর ছাড়া। পাথরের কিয়দংশ ভূগর্ভে প্রথিত আছে।

দেবী এখানে নিত্য পূজিত হলেও কার্তিক মাসের অমাবস্যায় বিশেষ ধুমধামে বাৎসরিক বিশেষ পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে। তখন ভক্তদের মানতস্বরূপ বহু ছাগবলিসহ দেবীর পূজা সম্পন্ন হয়। তবে বিশেষ পূজাতেও রাত্রে এখানে কারো থাকার নির্দেশ নাই। একবার কলকাতার দলে যাত্রার ব্যবস্থা করেও আকস্মিক জলঝড়ে তা পণ্ড হয়ে যাওয়ায় রাত্রে এখানে কোন অনুষ্ঠান রাখা হয় না। দেবীর আটনের কাছাকাছি কেউ বসবাস করতেও পারে না। জনশ্রুতি— একদা সাধক কমলাকান্ত দেবীর আটনের কাছেই আশ্রম করেছিলেন কিন্তু সেখানে টিকতে না পেরে আশ্রম অনেক দূরে সরিয়ে

নিয়েছিলেন, সেই কমলাকান্তের আশ্রমের এখন আর কোন চিহ্ন না থাকলেও স্থানটি এখনও কমলাকান্তের আশ্রম নামে খ্যাত হয়ে আছে।

গ্রামটি কৃষি প্রধান গ্রাম। এখানে চাষ আবাদের বিশেষ সুবিধাও আছে। তাই অধিকাংশ লোকই কৃষিকাজে লিপ্ত হলেও চাকুরিজীবীও অনেক আছেন। তাছাড়া অনেকেই নিজগ্রামে ও গ্রামের মোড়ে এবং নিকটবর্তী ব্যবসাক্ষেত্র গুসকরাতেও ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত আছেন।

শ্রীকৃষ্ণপুর ঃ— আউশ গ্রাম ১নং ব্লকের ১১৪ নং জে. এল. ভুক্ত গ্রাম শ্রীকৃষ্ণপুর। ভেদিয়ামোরবাঁধ রাস্তায় এই গ্রামে যাওয়া যায়। এটি বেরেণ্ডা পঞ্চায়েতের অধীন গ্রাম, গুসকরা থেকে ১০ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে এর অবস্থান। গ্রামে প্রায় ৪০০ পরিবারের বাস। এখানে একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের ৫০ ভাগ লোকই শিক্ষিত। কৃষিপ্রধান গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশের জীবিকা চাষ আবাদ হলেও বর্তমানে এখানে একটি নতুন শিল্পকে অনেকেই পেশা হিসাবে নিয়েছেন, সেটি হল কাঁথা স্টিচ বা নক্সী কাঁথা তৈরির কাজ।

চাষ-আবাদে লিপ্ত গ্রামবাসিকে এই শিল্পের পথ দেখিয়েছেন গ্রামের মেহবুব মোল্লা ও তার স্ত্রী তকদিরা বেগম। তাদেরই উদ্যোগে এই গ্রামে এই শিল্পের প্রসার ঘটে। তারাই এই গ্রামের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেককেই হাতে কলমে সূচিশিল্পের মহড়া দিয়ে প্রায় সকলকেই এই কাজে পোক্ত করেছেন।

এই গ্রামের মোল্লা পরিবারের তিনজন যেমন— রুনা লায়লা, তার বোন সাবিনা ইয়াসমিন ও তাদের মা তকদিরা বেগম রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এই সূচি শিল্পের হাত ধরে সমগ্র গ্রাম শুধু উপকৃত হয়নি, উপকৃত হয়েছে এই অঞ্চলের পাশ্ববর্তী বহুগ্রাম যেমন— কালিদহ, ভেদিয়া, জয়কৃষ্ণপুর, সিলুট, বসন্তপুর, নৃপতিপুর ইত্যাদি গ্রাম। এখন ঐ সকল গ্রামের অনেক মানুষজনও এই শিল্পকেই জীবিকার প্রধান মাধ্যম হিসাবে নিয়ে আর্থিক স্বাচ্ছল্য লাভ করেছে।

এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন সূঁচ, সুতো, সেলাই এর ফ্রেম স্থানীয় বাজার থেকেই পাওয়া যায়। আর যার উপরে কারুকার্য হয় সেই কাপড় কলকাতা থেকে আনা হয়। এখন স্বনির্ভর শিল্পীরা পাইকারি হিসাবে তাদের কাঁচামাল ও দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করে থাকে। তাদের তৈরি শিল্পদ্রব্য এখন দেশ বিদেশের বাজারে বিশেষ সমাদরে বিক্রিত হচ্ছে, আউশ গ্রামের বিধায়ক মাননীয় কার্তিক বাগকে এদের সম্পর্কে বেশ গর্বিত ভাবেই বলতে শুনি— "কাঁথা স্টিচ শিল্প নির্ভর এই গ্রামের খ্যাতি এখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশের বাজারেও গ্রামবাসীর তৈরি কাঁথা স্টিচের চাহিদা বাড়ছে [৪৮]।"

একটা শাড়ির উপর নিখুঁত নক্সা তৈরি করতে সময় লাগে ২০ থেকে ২২ দিন

আর ভাল কাজের শাড়ি প্রতি তাদের হাজার টাকার মত আয় হয়। তবে এ কাজে ভাল পুঁজি বিস্তারের প্রয়োজন আছে, ঝুঁকিও নিতে হয়। তাই সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিযে এলে এই শিল্পেব আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে।

শিলাসপুর ঃ— কাঁকসা থানার আওতায় দামোদর নদীর উত্তরে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম। এর জে.এল. নং-৯০। পানাগড থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত পাকা রাস্তা ধবে ঐতিহাসিক ভরতপুরেব সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রবর্তী হলেই শিলাসপুরে যাওযা যায়। এই গ্রাম একদা শিলাসপুর পরগনার সদর কার্যালয় ছিল। এখন তার সে গৌরব অতীত হয়ে গেছে তবুও গ্রামটি বেশ প্রাচীন এবং সমৃদ্ধশালী।

লোকশ্রুতি, এখানে একদা শেরআফগানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর শিবির স্থাপন করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের অপর নাম সেলিম এবং তিনি এখানে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করার জন্যই এই স্থান 'সেলিমাপুর' নামে খ্যাত হয়। পরে সেই সেলিমাপুরই অপভ্রংশিত হযে 'শিলামপুর' নামে নামিত হয়েছে।

এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস এবং উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত কৃষ্টি ও পুরাকীর্তিও বর্তমান। গ্রামে বয়েছে গোস্বামীদের রামমন্দির। এটি সুন্দর কারুকার্যে মণ্ডিত একটি গোলাকার রাসমঞ্চ। এখানে গোস্বামীদের গৃহদেবতা বৃন্দাবন চন্দ্র ও রাধারাণীকে রাসের দিন বসিয়ে মঞ্চ সুসজ্জিত করার পর অনুষ্ঠান শুরু হয়। গোস্বামীদেব গৃহে অন্যান্য দেবতার মধ্যে রয়েছেন— লালজি (কৃষ্ণ), শ্রীধর ও বহু শালগ্রাম শিলা। যাদেব নিত্যসেবা এখনও চলছে।

গ্রামে রয়েছে চ্যাটার্জীদের কালী বাড়ি, যা বিশাল বড় মাপের বাড়ি এবং বিভিন্ন অলংকরণে ও কারুকার্যে শ্রীমণ্ডিত। গ্রামের মাঝে বকুলবীথির তলে শিবমন্দির, গ্রামের পূর্বাংশে রয়েছে পঞ্চাননতলা। পশ্চিমপ্রান্তে গ্রামের বিশেষ উল্লেখ্য এক পুবাকীর্তি হল বরাখাঁ ও তার সুহৃদ তথা শিষ্য এক ব্রাহ্মণের একত্রে অবস্থিত সমাধি মন্দির বা মাজার। এখানে বিস্তৃত এলাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা— তার ভিতরে এক দক্ষিণমুখী একতলা দালানের গর্ভে রয়েছে পাশাপাশি দু'টি সমাধি। এখানেই শায়িত আছেন হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের দুই সাধক। একজন বরাখা সইদ অন্যজন সত্যনারায়ণ গোস্বামী।

প্রচলিত জনশ্রুতিতে জানা যায় একদা সাধক সত্যনারায়ণ গোস্বামী বাঘে চড়ে কাঁকসার কঙ্কেশ্বর তলা থেকে দক্ষিণে এগিয়ে আসছিলেন আর পশ্চিম থেকে এক মুসলমান সাধক বরাখাঁ এক ভাঙা পাঁচিলে চড়ে অগ্রবর্তী হতে থাকায় উভয়ের এখানেই সাক্ষাৎ হয়। পরে সাধনতত্ত্বের অনুশীলনে বরাখাঁ যে অনেক উঁচুস্তরের সাধক তা জানতে পেরে গোস্বামী তার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর কাছেই থেকে যান। পরে তাদের একই দিনে ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটলে তাদের মৃতদেহ একই গৃহে, পাশাপাশি কবরে শায়িত করা হয়। একে মাজার বলে।

সেই পবিত্র মাজারে তাদের তিরোধান উৎসবকে কেন্দ্র করে বর্ষশেষের চৈত্র মাসের শেষ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দু'দিন ধরে ভক্তেরা শ্রদ্ধা নিবেদনসহ উরস উৎসব পালন করেন। আটদিনের মাথায় তার অষ্টমঙ্গলাও হয়ে থাকে। সেই বিশেষ উৎসবে এখানে মহোৎসব বা লোকজন খাওয়ানর ব্যবস্থা থাকে। তা ছাড়া পৌষ সংক্রান্তিতে মকর স্নানে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা দামোদর নদীতে স্নান সেরে দুই সাধকের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। তার ফলে সেই সমাবেশ তথা উৎসব ও মেলা আক্ষরিক অর্থেই হিন্দুমুসলমানের মিলনমেলায় পরিণত হয়। সাধকদ্বয়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে অনেকের মনোবাঞ্ছা পূরণ হলে বহুজনই বাদ্যভাণ্ড সহকারে এদের কবরে চাদর চড়িয়ে থাকেন, সেও এক দর্শনীয় উৎসব। অনেকের মতেই এই সাধক বরাখাঁই ছিলেন সম্রাট শাহজানের সময় কালে কোট শিমূল দুর্গের অধিকর্তা।

গ্রামটি প্রাচীন গ্রাম তার বহু লক্ষণ গ্রামে লক্ষিত হলেও ইংরাজ আমলে এখানে যে নীল চাষের প্রসার ঘটেছিল তার প্রমাণ গ্রামে 'সিন্দূরে' নামক স্থানে পরিলক্ষিত হয়। গ্রামে অন্যান্য উৎসবাদির মধ্যে উল্লেখ্য হল— দোল, দুর্গোৎসব, কালী, মনসা পূজা ছাড়াও ধর্মরাজের গাজন এবং চৈত্রে শিব গাজন বিশেষ সমারোহে পালিত হয। শিবগাজনকে ঘিরে তখন গ্রামে একটি ছোটখাট মেলাও বসে যায়।

. গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণু তাতে সন্দেহ নাই। কারণ গ্রামে রয়েছে পোষ্ট অফিস, একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ এক উচ্চতরবিদ্যালয় এবং প্রতিদিন গ্রামে বাজার বসে। নিকটেই প্রাচীন দামোদর নদী পারাপারের জন্য রয়েছে ফেরিঘাট। বালির ঘাটও রয়েছে— যেখান থেকে প্রতিদিন বহু ট্রাক বোঝাই হয়ে এখানকার বালি দূরদূরান্তে চলে যাচ্ছে।

কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও এখানে চাকুরিজীবীর সংখ্যাও অনেক। তাছাড়া এখানকার বাজারে বহুলোক ব্যবসাবাণিজ্যেও লিপ্ত আছেন।

শিবপুর ঃ— জামুরিয়া থানার অধীন এক প্রাচীন গ্রাম। এর জে.এল. নং-১৮, জামুরিয়া রেল স্টেশনে নেমে বাসযোগে কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে গেলেই শিবপুর গ্রামে পাওয়া যায়। গ্রামটি আয়তন মাঝারি ধরনের। গ্রামে উল্লেখ্য দেবতাই হলেন শিব এবং শিবের অবস্থান হেতু গ্রাম নাম 'শিবপুর' হয়েছে।

শিবের গাজনকে কেন্দ্র করে গ্রামটি উৎসবে মেতে ওঠে এবং তখনই গ্রামবাসী আত্মীয়-পরিজনদের গ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানায়। শিবের গাজনকে ঘিরেই তখন কয়েকদিনের জন্য গ্রামে একটি মেলাও বসে। গ্রামে শিব ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীরা হলেন আশ্বিনের দুর্গা, কার্তিকের কালী। গ্রামে রয়েছে ৪টি মনসা ও ৪টি শীতলাদেবী, যাদের পূজাও বেশ সমারোহে পালিত হয়।

গ্রামটি কৃষিকেন্দ্রিক। চাকুরিজীবীও আছে। গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, মোদক ছাড়াও বেশ কিছু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বাস।

শোনপুর ঃ— গোপভূমের অন্তর্গত বর্তমান অণ্ডাল থানার অধীন ২২নং জে.এল. ভুক্ত গ্রাম শোনপুর। রাণীগঞ্জ থেকে শিউড়ী যাবার রাস্তায় হরিপুরে নেমে প্রায় ৪ কি.মি. উত্তর পূর্বে অগ্রবর্তী হলে এই গ্রামে যাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ২/৪ ঘর ব্রাহ্মণ ও কিছু অন্ত্যজ সম্প্রদায় ছাড়া সকলেই গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত। গোপভূমের প্রাচীন গোপপ্রধানগ্রামগুলির মধ্যে এটিও একটি গোপ প্রধান গ্রাম।

গ্রামে অন্য সময়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা হলেও গ্রামে উল্লেখ্য দেবতা হলেন ভগবতী। তাই এই দেবীব পূজা এখানে প্রায় বছর ভাদ্রের শেষে, কোন কোন বছর আশ্বিনের প্রথম দিকে ললিতাসপ্তমী, রাধাঅষ্টমী, তালনবমী ও পরের দশমী তিথিকে কেন্দ্র করে শারদীয়া দুর্গাপূজার মতই ৪দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এই ভগবতী আসলে দশভুজাদুর্গারিই নামান্তর মাত্র। বঙ্গে দুর্গাপূজা সাধারণত দুবার হয়ে থাকে। একবার বসন্তকালের চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা রূপে। দ্বিতীয়বার হয় শরৎকালে শারদীয়া দুর্গারূপে। কিন্তু গোপভূমের এই গ্রামে, শারদীয়া দুর্গাপূজার সামান্য আগেই ভাদ্রের রাধাঅষ্টমীকে ঘিরে চার দিন ধরে বহু ছাগ, মেষ, মহিষ বলিদানসহ মহাধুমধামে গ্রাম্য উৎসব হিসাবে ভগবতীর পূজা হয়ে থাকে। এ এক ব্যাতিক্রমী শক্তি আরাধনা তাতে সন্দেহ নাই। তবু বলা যায় এই ভগবতী পূজা গোপভূমের কেবল এই গ্রামেই সম্পন্ন হয় না, তা আরও বহু গ্রামেই হয়ে থাকে। যেমন— গোপভূমের বুদবুদের পাণ্ডুদহে, বর্তমান শিল্প নগরী দুর্গাপুরের গোপাল মাঠে, খনি এলাকা কুমার ডিহি ইত্যাদি বহু স্থানে এমনকি বাঁকুড়ার সাত দেউলে, জোয়ালডাঙ্গা ইত্যাদি অনেক স্থানেও সাড়ম্বরে ভাদ্রে ভগবতী পূজা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তাই বলা যায় এটি গোপভূমের এক বিশেষ শাক্ত সাধন প্রক্রিয়াও বটে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় "যে সু দেশেষু যে দেবা"। অর্থাৎ যে দেশে (দেশ অর্থে এখানে স্থান বা গ্রাম) যে দেবতা খুবই জাঁকজমক সহকারে পূজিত হয় তাকেই সেই স্থানের গ্রাম্যদেবতা বলা হয়ে থাকে। সে দিক থেকে এই জগৎজননী দেবী দুর্গাই এখানে ভগবতী নামে দেবী দুর্গার মতই চারদিন ব্যাপী মহাসমারোহে পূজিত হলেও দেবী এখানে গ্রাম্যদেবী। আর যেহেতু দেবী তাদের নিজস্ব দেবী তাই তার উৎসবকে ঘিরেই গ্রামবাসীগণ তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ঐ পূজায় গ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানায়। ফলে আত্মীয়পরিজনদের নিয়ে তখন গ্রামে চাঁদের হাট বসে যায়।

গ্রামটি খুবই সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল। এখানকার অধিকাংশের জীবিকা ছিল দুগ্ধ ব্যবসা ও চাষআবাদ কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় অবলুপ্ত। এই গ্রাম, খনি এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় ধীরে ধীরে এখানে ভিনপ্রদেশের বহু নাগরিকের সমাবেশ ঘটেছে। তাছাড়াও এই শোনপুরও পার্শ্ববর্তী গ্রামবাজারকে নিয়ে। 'শোনপুর-বাজারী' প্রজেক্ট চালু হওয়ায় এটি এখন ব্যস্ত শহরে পরিণত হয়েছে। ফলে হারিয়েছে তার গ্রাম্য

পরিবেশ। চাষ আবাদ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। চাষের জমি এখন শিল্প ও আবাসনে পরিণত হয়েছে, সর্বোপরি এই প্রকল্প এখন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উল্লেখ্য কোলমাইন প্রজেক্ট হওয়ায় ও এখান থেকেই বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা থাকায় এবং এখানে নানাবিধ প্রকল্প থাকায়, গ্রামের অধিকাংশ লোকই এখন চাকুরিজীবী।

শ্যামডি ঃ— সালানপুর থানার ৬৩ নং জে.এল. ভুক্ত এক পাহাড়ি গ্রাম শ্যামডি। আসানসোল হতে সাইকেল কারখানা সেনর্যালে এবং লালগঞ্জের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটি চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত গিয়েছে, সেই রাস্তার গায়ে ফুলবেড়িয়া, লহাট ও পাতাল গ্রামের লাগাও রয়েছে একটি ছোট পাহাড়, আর তাকে ঘিরে যে গ্রাম সেটিই শ্যামডি। এই পাহাড়টিকে মুক্তাইচণ্ডী পাহাড়ও বলা হয়— কারণ এখানে সবথেকে উল্লেখ্য আরাধ্যা দেবী হলেন মুক্তাইচণ্ডী। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার দিন দেবীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে এবং তখন এখানে একটি বড় ধরনের মেলাও বসে।

এখন এই মুক্তাই চণ্ডীব স্বরূপ এবং তিনি কোন সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী তা নিয়ে নানান মত পার্থক্য বর্তমান। বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মতে ইনি আসলে অনার্য সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী। শুরুতে এক প্রস্তর খণ্ডে সিন্দূর লেপে আদিবাসীদের মনোনীত কোন 'পাছান' বা পুরোহিতের দ্বারা এর পূজা পরিচালিত হত। সেই আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত ঐ প্রথাই চালু ছিল।

শুরুতে চণ্ডী কোন সময়েই আর্য দেবতা ছিলেন না। তা থাকলে বিভিন্ন প্রাচীন বেদ পুরাণে চণ্ডীর উল্লেখ থাকত। কিন্তু ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থে কোথাও তার উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে আর্যীকরণ প্রক্রিয়ায় অনেক অনার্য দেব-দেবী ধীরে ধীরে আর্যীকৃত হয়েছে। তার ফলে অনেক অর্বাচীন পুরাণেও আস্তে আস্তে স্থান পেয়ে গেছে। এই ভাবেই মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চণ্ডীকে আর্যীকৃত করে বলা হয়েছে তিনি অসুরদলনী মহাশক্তি এবং শিবজায়া।

এইভাবেই অনার্য দেবীচণ্ডীর আর্যীকরণ পর্ব সূচিত হলে এখানকার আদিবাসী পূজিত মুক্তাই চণ্ডীরও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণীকরণ হয়ে যায়। ফলে তার আকার অবয়বেও পরিবর্তন আনা হয়। শুরুতে যেখানে এক আকারহীন প্রস্তরখণ্ড সিন্দূর লিপ্ত হয়ে কোন পাছান কর্তৃক পূজা পেত, এখন সেখানে দেবীর মূর্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রস্তর নির্মিত ছয় ঘোড়ায় টানা কারুকার্যময় রথে উপবেশিত ধনুবান হাতে অধিষ্ঠিত এক নারী মূর্তি। আর পাছান অপসারিত হয়ে এখন সেখানে কোন ব্রাহ্মণ তনয় দ্বারা সংস্কৃত মন্ত্রে দেবীর পূজা পরিচালিত হয় [৪১]।

শুধু তাই নয়, দেবীর আর্যীকরণ পরিপূর্ণ করার জন্য এক পৌরাণিক কাহিনীর মায়া জালে তাকে বদ্ধ করার চেষ্টাও করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে— দক্ষ যজ্ঞে শিবপত্নীর মৃত্যু হলে শিব সেই সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে যখন তাণ্ডব নৃত্যে পরিক্রমণ শুরু

করেছেন তখন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছেদিত হয়ে সেই দেহ মর্তের বিভিন্ন স্থানে পড়ার ফলে দেবীর নাকছাবির মুক্ত নাকি এখানে পড়ে এস্থান তাই মুক্তাই চণ্ডী নামে খ্যাত হয়ে এটি পীঠক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পীঠতন্ত্রে কোথাও এর উল্লেখ নাই। সেদিক থেকে দৃঢ়তার সঙ্গেই-বলা যায় এটি কোন অনার্য দেবতা পরবর্তী কালে আর্যীকৃত হয়েছে ঐ প্রক্রিয়ায়।

উনি যে দেবীই হন না কেন, এতদঅঞ্চলে জনমনে দেবীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি বর্তমান। এখানকার লোকেদের যে কোন পারিবারিক উৎসবানুষ্ঠানে যেমন— বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদিতে, এই দেবতার পূজা প্রদান করে প্রসাদ গ্রহণ না করলে চলে না। দেবীও খুব জাগ্রতা। দূর দূরান্ত থেকেও বহু ভক্ত এখানে এসে পূজা দিয়ে যায়। দেবী নিত্য পূজিত। প্রতিবছব মাঘী পূর্ণিমায় দেবীর বাৎসরিক বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। তখন ৪/৫ দিন ধরে এখানে একটি মেলাও বসে। এই শ্যামডিতে মুক্তাই চণ্ডীর পূজা ছাড়াও দেবী কালিকা, শীতলা ও শিবের পূজাও অনুষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে বলি এই শ্যামডি অঞ্চল একটি পুরাক্ষেত্রও বটে। এখানের রূপনারায়ণপুর লালগঞ্জ সড়কের ধারে কয়লাখনি অধ্যুষিত অঞ্চলে মুক্তাই চণ্ডী পাহাড়েব (টিলার মতো) তলদেশ থেকে কয়েকটি পুরাপ্রস্তর যুগের আয়ুধ পাওয়া গেছে [৫০]।

(স)

সুখপুকুরিয়া ঃ— মঙ্গলকোট থানার পশ্চিম অংশে অজয় নদীর দক্ষিণ ও কুনুর নদীর উত্তরে এই গ্রামের অবস্থান। নতুন হাট-গুসকরা পাকা রাস্তার আহার নামক এক দেবখালের মোড়ে নেমে দক্ষিণে অগ্রবর্তী হলে এই গ্রামে যাওযা যায়। গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায় গ্রামে পুকুরের আধিক্য থাকায় এবং তা থেকে চাষ-আবাদের সুবিধা বা সুখ থাকায় গ্রামনাম 'সুখপুকুর' হয়েছে। গ্রামটি গোপভূমের দুই উল্লেখ্য নদীর মধ্যবর্তীস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বন্যাবিধ্বস্ত। সেই বন্যার কারণেই গ্রামের অনেকেই আজ গ্রামছাড়া।

গ্রামটির জে.এল. নং ৪৩। গ্রামে মুসলমান নাই। হিন্দুদের মধ্যে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, বৈরাগ্য ছাড়া অধিকাংশই সদ্গোপ সম্প্রদায়ের বাস। আর অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ডোম, বাগদি ও রুইদাসদের বাস।

গ্রামে প্রাচীন পুরাকীর্তি বলতে কয়েকটি শিব মন্দির যেমন— ঘটকদের একটি, মহান্তদের একটি, মণ্ডলদের জোড়া শিব মন্দির বর্তমান। শেষের উল্লেখ মন্দির দুটিতে কিছু টেরাকোটা শিল্পের কাজ দেখা যায়। এছাড়া গ্রামে গ্রাম্য দেবতা ধর্মরাজের এক তলা দালান মন্দিরও বর্তমান।

গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা সময় মত হলেও গ্রাম্য দেবতা হিসাবে সবিশেষ

উল্লেখ্য হলেন ধর্মরাজ। এখানের ধর্মরাজ 'মেঘরায' নামে খ্যাত। মহাজ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় মহা ধুমধামে বিভিন্ন কৃত্যাদিসহ ছাগ মেষ বলিদানে ধর্মরাজের গাজনও পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গাজনে অনুষ্ঠিত কৃত্যাদির মধ্যে উল্লেখ্য হল— বানফোঁড়া, ধুনোসেবা ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু উপভোগ্য অনুষ্ঠানও দেখা যায়— যেমন এখানের গাজনে ধর্মমঙ্গলের পালাগান গাওয়া হয়, ধর্মরাজের গাজনকে কেন্দ্র করে নানান সংস্কৃতি অনুষ্ঠান যেমন যাত্রাগান, কবিগান ইত্যাদিও হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে একটি কৃত্য লক্ষণীয় সেটি হল ভক্তদের বুকে পা দিয়ে পূজক ধর্মবাজ বিগ্রহকে মন্দিরে নিয়ে যায়। গাজন উপলক্ষে গ্রামের লোক আত্মীয় পরিজনদেব গ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানায। ধর্মরাজ আসলে ডোমেদের দেবতা ছিল কিন্তু বঙ্গের অন্যান্য ধর্মরাজের মত এখানেও ঐ দেবতা ব্রাহ্মণীকরণের কৃপায় তাদের হাতছাড়া হয়েছে। কাশ্যপ গোত্রীয় রায় উপাধির ব্রাহ্মণরাই এখন এই দেবতার পূজক।

গ্রামে পূর্বে অবস্থাপন্ন ব্যানার্জী পরিবারের জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হত কিন্তু এখন তারা গ্রামছাড়া তাই সেই পূজাও বন্ধ হযে গেছে। বন্যা প্লাবিত পলিগঠিত উর্বর মৃত্তিকায় ব্যাপক ফসলের মায়ায় যারা গ্রামে রয়েছেন তারা দুবার ধান ছাড়াও প্রচুর রবিশষ্যেরও চাষ করে থাকেন। চাষই গ্রামবাসীর মুখ্য জীবিকা। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই নগন্য। বাচ্চা ছেলে মেয়েদের পড়ার জন্য গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমান। মোরাম রাস্তার দৌলতে বাইরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ সাধিত হয়েছে।

সুশীলা ঃ— আউশগ্রাম ২নং ব্লকের অধীন এই গ্রাম বর্তমানে গুসকরা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গুসকরার সামান্য পশ্চিম-দক্ষিণে এর অবস্থান। পাশের গ্রাম ধাড়াপাড়া তাই এদের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করার জন্য বলা হয় 'সুশীলা-ধাড়াপাড়া'। গ্রামে মুসলমানসহ হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস থাকলেও সদগোপদের সংখ্যাই বেশি। কিছু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বাসও আছে।

গ্রামে বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রামে শিবমন্দিরও আছে তার পূজাও হয়, তবে সব থেকে আকর্ষণীয় গ্রাম্য উৎসব হল ধর্মরাজের গাজন। এখানকার ধর্মরাজ 'আদিরায়' নামে খ্যাত। এই ধর্মরাজই এখানকার গ্রাম্য দেবতা। বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে মহাধুমধামে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তখন সেই উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য আত্মীয়-স্বজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। গাজনে ভক্ত হয় অনেক।

উৎসবের সূচনা পর্বে ধারাপাড়ার ধর্মরাজ এখানে আসে এবং পূজারী ব্রাহ্মণ তখন উভয় ধর্মরাজের পূজা আরম্ভ করেন। তার পর ধাড়াপাড়ার ধর্মরাজ আপন আলয়ে চলে গেলে এখানকার ভক্তরা আনন্দ উল্লাসসহকারে নিজেদের ধর্মরাজের পূজা শুরু করেন। এইভাবেই এখানকার গাজন উৎসবের সূচনা হয়। তারপর একে একে গাজনের বিভিন্ন কৃত্যাদি পালিত হতে থাকে।

ধর্মরাজের কৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে সবথেকে উল্লেখ্য হল— এখানকার প্রধান ভক্তকে কাঠের পাটায়, পুঁতে রাখা লোহার কাঁটার উপর শায়িত করে সুশীলা ও ধাড়াপাড়ার গ্রামের মধ্যবর্তী এক চড়ক পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেই পুকুরে থাকা চড়ক কাঠের সন্ধান করে সেই কাঠে কোল দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে মুক্ত স্নান বলা হয়। অনুরূপভাবে ধাড়াপাড়ার ধর্মরাজও ঐ পুকুরেই একই সময়ে মুক্ত স্নানে আসে।

লোক বিশ্বাস এই দুই গ্রামের ধর্মরাজদ্বয় নাকি দুই ভাই। তাই উভয় ধর্মরাজই একই স্থানে সমবেত হওয়ায় দুই ভায়ের মিলন সাধিত হয়। এই মিলন স্থলে তখন বহু লোকের সমাবেশে সেখানে একটি মেলাও বসে যায়। ধর্মরাজের এই গাজন ছাড়াও দেবতার নিত্যসেবা সহ বছরের অন্য সময় যেমন শারদীয়া মহানবমী এবং বাৎসবিক নবান্নের উৎসবেও ধর্মরাজের বিশেষ পূজা হয়ে থাকে।

গ্রামটি কৃষি প্রধান হলেও বর্তমানে গুসকরা পৌরসভার আওতাধীন হওয়ায় এর গ্রামীণরূপের পরিবর্তন সূচীত হতে চলেছে— তাই গ্রামের অনেকেই এখনও চাষআবাদে যুও থাকলেও বহুজন চাকুরি ও ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

সোমাইপুর ঃ— আউশগ্রাম থানার ১নং ব্লকের ১৫২নং জে.এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম সোমাইপুর। গুসকরা-মোর বাঁধ পাকা রাস্তায় আউশ গ্রামের পূর্বে এবং গুসকরার প্রায় ৪ কি.মি. পশ্চিমে এর অবস্থান। পাকারাস্তাটি গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত স্পর্শ করে পূর্ব পশ্চিমে অগ্রবর্তী হয়েছে। গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারের মত।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে অনেকেই সোমেশ্বর শিব নাম থেকে গ্রাম নাম সোমাইপুর হয়েছে বলেন কিন্তু এই গ্রামে সোমেশ্বর নামক শিবের কোন অস্তিত্বই নাই। ঐ নামে শিব আছে কাঁকসার সোঁয়াইগ্রামে, কাজেই এই গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে ঐ যুক্তি খাটে না। এ গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাংলা স্থান নাম গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন— "সোঁসাই < সৌম্যক (Ficus glomerata) + আর্ষিকা।" Oficusglomerata বলতে যজ্ঞ ডুমুরকে বোঝায়। অর্থবৎ বৃক্ষ নাম থেকে গ্রাম নাম এসেছে [৫১]। আবার সৌম্য থেকে সৌম্যক শব্দটি এলে তা সুন্দরকেই বোঝায় সে দিক থেকে সুন্দর গ্রাম অর্থে সোমাই এবং তার সঙ্গে 'পুর' যুক্ত হয়ে গ্রাম নাম 'সোমাইপুর' হওয়াই সঙ্গত।

গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র মুসলমান পাড়াই আছে। সেখানে মসজিদও রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ, সদ্‌গোপ কৈবর্ত ছাড়াও বহু তপশিলি সম্প্রদায়ের বাসও আছে। এদের মধ্যে কোটাল, ডোম, হাড়ি ছাড়াও রয়েছে মহুলি নামে এক সম্প্রদায় যাদের কাজই হল বাঁশের আসবাবপত্র তৈরি করা কিন্তু তা করলেও এরা ঠিক ডোম নয়। গ্রামে শিক্ষিতের পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশ।

গ্রামে পূর্বে প্রচুর আমবাগান ও তালের বেড়া ছিল। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই গাছ

প্রতিষ্ঠা করতেন। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী এখনও সেই প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষে বৈশাখ মাসে বাড়ির মেয়েরা জলদান করে থাকেন। গ্রামে বহু পুকুর, দিঘি, সাগর লক্ষ করা যায়।

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই গ্রামে অনেক দেবকীর্তি লক্ষনীয়। গ্রামে পূর্বে বহু দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হত এখন মাত্র তিনটি অনুষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে দু'টি সদ্‌গোপদের ও একটি সার্বজনীন। সদ্‌গোপদের মধ্যে কোঙারদের দুর্গোৎসব খুবই প্রাচীন। এদের দুর্গামন্দির প্রাঙ্গনেই রয়েছে শিবমন্দির ও শ্রীধরজিউ-এর মন্দির। গ্রামে লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতীর পূজা হলেও বেশ কয়েকটি পাড়ায় ভাদ্রসংক্রান্তিতে মহাধুমধামে মনসার পূজা হয়ে থাকে। সাধারণত নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই মনসাপূজার আধিক্য বেশি। গ্রামের ঠাকরুণ পুকুরে মনসার ঘট বা বারি তোলা হয়। মনসাপূজা উপলক্ষে গ্রামে মনসার ভাসান গান এবং প্রতিযোগিতা মূলক শাঁকিগানও গাওয়া হয়। তবে পূর্বের সেই প্রতিভাবান গায়কদের অবসান ঘটলেও অবলুপ্ত প্রায় সেই সব গানের ট্রাডিশন চলে আসছে। গ্রামে বড় মনসার পূজা দেখার মত। মনসাপূজায় প্রচুর হাঁস, মুরগি, ছাগ, মেষ বলি দেওয়া হয় এবং অনেকেই আত্মীয়-পরিজনদের আমন্ত্রণ জানায়। গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে অনেকের মধ্যে অন্নপূর্ণা পূজারও বেশ চল আছে।

উল্লেখ্য উৎসবাদি ছাড়াও গ্রামের প্রধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গ্রাম্য দেবতা ধর্মরাজকে কেন্দ্র করে। এখানকার ধর্মরাজের নাম 'সুন্দর রায়'। ধর্মরাজের নিত্যসেবা ছাড়াও মহাজ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজনসহ উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারই হলেন ধর্মরাজের পূজক। এই ধর্মরাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এক বৃক্ষতলে অবস্থিত 'গৌতম বুড়ো'।

ইনি মন্দির নেন না। বৃক্ষতলেই থাকেন। এনার নামের মধ্যেই পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে। ইনি গৌতম বুদ্ধ > গৌতম বুড়ো হয়েছেন। ধর্মরাজের সঙ্গে বুদ্ধের যে গভীর সম্পর্ক আছে তা এখানকার ধর্মপূজার ক্রিয়াকাণ্ডেও প্রমাণিত হয়। গ্রামে ধর্মরাজ পূজার তিনদিন আগে গৌতমবুড়োর থান থেকে তার বাহন স্বরূপ আটনের ঘোড়াকে ধর্মতলায় এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তারপর ধর্মরাজের পূজা শুরু হয়। এই ঘোড়া আনা পর্বটিকে বলা হয় 'দাদাআনা'। অর্থাৎ গৌতমবুড়োই এখানকার ধর্মরাজের দাদা।

এ প্রসঙ্গে আউশগ্রাম নিবাসী সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বর্ধমানের ইতিহাস' গ্রন্থে সোমাইপুর গ্রামকে গৌতমবুদ্ধের তলাতীর্থ বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রামে ধর্মরাজের সেবাপূজার জন্য বেশ কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। তার আয় থেকেই দেবসেবা পরিচালনা করেও প্রতিবছর কলকাতার নামি-দামী যাত্রাদলের গান অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামে গোস্বামী পরিবার পূজিত 'রেবতীরাম জিউ'-এর বিগ্রহ রয়েছে। এই দেবতা নিত্যসেবিত হলেও চৈত্র পূর্ণিমায় এনার মধুরাস অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে এই রাসের প্রচুর

জৌলুস ছিল বহু লোকজন অংশ গ্রহণ করত কিন্তু এখন তা দায়সারা গোছের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এক উঁচু ঢিবি বা ডাঙ্গা রয়েছে— যাকে ধনটিকরের ঢিবি বা ডাঙ্গা বলা হয়। এটি একটি প্রত্নক্ষেত্রও বটে, তার সম্পর্কে অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

এতক্ষণ গ্রামের পূজাপার্বণ উৎসবাদির কথা বলা হল, এবার গ্রামের ঐতিহ্যবাহী কিছু প্রাচীন কৃষ্টির কথায় আসা যাক। গ্রামে একদা কীর্তন গানের বেশ রেওয়াজ ছিল। গ্রামের বনয়ারী দাস বৈরাগ্য প্রখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন। শোনা যায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তার কণ্ঠে কীর্তন গান শুনে মোহিত হয়েছিলেন এবং তাকে আশীর্বাদও করেছিলেন।

মনসার ভাসানগান ও শাঁকিগানের চর্চা গ্রামে ভালই ছিল এবং এখনও তার রেশ বর্তমান আছে। ভাদ্র মাসে ভাদু গান বিশেষ উৎসাহে এখনও চর্চিত হয়। এই ভাদ্রমাসেই আর এক লোককৃষ্টি যা এখন প্রায় অপসৃয়মান হতে বসেছে। একদা গ্রাম বাংলার প্রায় সবগ্রামেই কুমারী মেয়েরা তাদের কুমারীত্ব অবসানের কামনায় দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন শস্যের বীজ মাটি ভরা সরায় ফেলে তাতে জল সিঞ্চনে অঙ্কুরিত অবস্থায় এক ব্রত উদযাপন করত এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটত ইন্দ্র দ্বাদশীর রাতে। এ রাতে তারা গ্রামের কোন ঘেড়া বেড়া স্থানে অন্যান্য গৃহবধূ ও বয়স্কা মহিলাদের সহায়তায় সারা রাত ধরে ছড়া ও শ্লোকসুর দিয়ে নাচে গানে ঐ রাত অতিবাহিত করত। এটি সম্পূর্ণ প্রমিলা আসর। একমাত্র বাজনদার ছাড়া অন্যকোন পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই নৃত্যানুষ্ঠানই ভাঁজো।

পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে তার সামান্য নমুনা দিই। মেয়েরা এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অংশ নিত। তাই তাদের বলতে শুনি—

এক কলসী গঙ্গাজল এক কলসী ঘি,
বৎসরান্তে একবার ভাঁজো নাচবো না তো কি?
এক ঘটি গঙ্গাজল দু ঘটি ঘি,
ভাঁজো তলায় শ্লোক বলবো রাগারাগির কি?

তাদের ঐ গান ছিল বহুক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক সৃষ্ট। তাই হঠাৎ বিপক্ষ কিছু বলার পর অপরপক্ষ কে বলতে শোনা যায়—

ওই কথাটি বলে তোমার কিবা হল সুখ?
পাতকাঠিতে শোন জড়িয়ে পোড়াই তোমার মুখ।

তার উত্তরে অন্য পক্ষকে তৎক্ষণাৎ বলতে শুনি—

মুখপোড়ালি বেশ করলি হনুমান হব।
হনুমান হয়ে আমি ভালমন্দ খাব।

এইভাবে সারারাত রঙ্গরসিকতা ও নাচে গানে পার করে, সকালে কোন জলাশয়ে সরা বিসর্জন দিয়ে তারা বাড়ি ফিরত। এটি কৌমার্য অবসানের ও সেই সঙ্গে ফসল বৃদ্ধির কামনায় অনুসৃত প্রাচীন ব্রত ভাঁজো, যা এখনও এই গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।

সর ঃ— আউশ গ্রাম থানার ২নং ব্লকে অবস্থিত এক সমৃদ্ধ গ্রাম সর। গুসকরা-বর্ধমান ভায়া গোলিগ্রাম বাসে চেপে বর্তমানে সরাসরি সর গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে সরগাছের আধিক্য ও সরেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত থাকায় গ্রাম নাম 'সর' হয়েছে বলে মনে করা হয়।

গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈরাগ্য, গোপ, সদ্‌গোপ, নাপিত, ছুতার, তিলি, তাম্বুলি, মোদক, কৈবর্ত ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস এবং তারা সম্প্রদায়গত ভাবে আলাদা আলাদা পাড়ায় বাস করেন। এছাড়াও গ্রামে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে হাড়ি, ডোম, বাউরি, মুচি, তেঁতুলে বাগদির বাস রয়েছে এবং তারাও আপন আপন পাড়ায় বাস করে এই নিয়ে গ্রামে ১৮টি পাড়া আছে। বর্তমানে তার সংখ্যাও আরও বেড়েছে। মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে রয়েছে সম্ভ্রান্ত পাঠানপাড়া।

গ্রামে আকর্ষণীয় পুরাকীর্তির মধ্যে বিভিন্ন শিবমন্দির, রাধাবল্লভমন্দির ও অন্যান্য পুরাকীর্তির কথা ‘‘গোপভূমের পুরাকীর্তি’’ অধ্যায়ে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে,তাই সে প্রসঙ্গে আর যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

গ্রামে রাধাবল্লভের নানান উৎসব অনুষ্ঠান এবং শিব ও ধর্মরাজের গাজন ছাড়াও অন্যান্য বহু দেবদেবীর পূজাও হয়ে থাকে। দুর্গোৎসবও বেশ ধুমধামেই হয়। গ্রামের উত্তরে মুসলমান পাড়ায় বেশ কয়েকটি প্রাচীন পুরাকীর্তিও লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল এক বিশাল বটবৃক্ষের নিবিড় ছাওয়ায় ঘেরা, পীর গঞ্জল সাহের মাজার। খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের কোন এক সময় বহিরাগত গঞ্জল শাহ পীর এখানে মুসলমান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তার দেহান্তের পর মাঘ মাসে উরস উৎসব উপলক্ষে পূর্বে এখানে কয়েকদিনের জন্য একটি মেলাও বসত। বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভক্ত এখনও এখানে সমবেত হয় ও তাদের মনস্কামনা জানিয়ে থাকে। তা পূরণের পর মাটির ঘোড়া নিবেদন করে থাকে। মাজারের উত্তরে রয়েছে মসজিদ। এই পাড়ার পশ্চিমের দিকে আর এক প্রাচীন পুরা কীর্তির ভগ্নাবশেষ লক্ষ করার মত। গ্রামে মনসাপূজাও হয় ভাদ্র মাসে। তখন কয়েকদিন ধরে মনসার ভাসানগানও হয়ে থাকে।

গ্রামে পোষ্ট অফিস, একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ বিদ্যালয়ও আছে। কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম হলেও চাকুরিজীবীর সংখ্যা কম নয়। অনেকেই উচ্চপদাধিকারী চাকুরেও আছেন। বহু কৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে বর্ধমানের প্রখ্যাত সংস্কৃতি গবেষক

ও লেখক ভব রায়ের জন্মভূমিও এই গ্রামে। গ্রামে এখনও ভাদু, টুসু ইত্যাদি গানের চল আছে।'

সাগরপুতুল ঃ— আউশ গ্রাম ২ নং ব্লকের অধীন ভেদিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত গোপভূমের উত্তর সীমান্ত নির্দেশক দুরন্ত পাহাড়ি নদী অজয়ের তীরবর্তী এক ছোট গ্রাম, সাগরপুতুল। ভেদিয়া-মোরবাঁধ রাস্তায় দীননাথপুরে নেমে উত্তরে গেলে গ্রামটি পাওয়া যায়। গ্রামটি ছোট হলেও তা বিশেষ ঐতিহ্যে ঐতিহ্যময়। কারণ সমগ্র গোপভূমে তো বটেই এমনকি সমগ্র রাঢ় বঙ্গের আর কোথাও যে বৃক্ষের সন্ধান মেলে না সেখানে এই গ্রামেই রয়েছে, গন্ধে মাধুর্যে অতুলনীয় স্বর্গের পারিজাত রূপে খ্যাত নাগেশ্বর বা নাগকেশর ফুলের বিশাল বাগান।

গ্রামটির বেশ কিছু অংশ অজয় নদীর বন্যা নিরোধক দক্ষিণের বাঁধের ভিতরেই রয়ে গেছে। বিশেষ করে এখানকার অতুলনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ নাগেশ্বর ফুলের বাগানটিও বাঁধেব ভিতরেই রয়েছে। নাগেশ্বরের গাছগুলি মাঝারি আকারের বৃক্ষ, অনেকটাই মেহগিনি গাছের মত দেখতে। গাছগুলি ঘনসবুজ পল্লবে মোহময়। ঋতুরাজ বসন্তেই সাধারণত এব প্রসূন প্রস্ফুটিত হয়। তখন তার শ্বেতশুভ্র মনোমোহিনী রূপ মাধুর্য ও মনপ্রাণ আকুল করা অনন্য গন্ধ সৌরভ, দশ দিগন্ত আমোদিত করে।

ঐ নাগেশ্বর ফুল মালঞ্চ থেকে উঁচু বাঁধটি অতিক্রম করলেই সাগরপুতুল গ্রামটি চোখে পড়ে। প্রথম দিকেই কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। তাদের পাড়া অতিক্রম করলে আসবে সদ্‌গোপ পাড়া। এখানকার অধিবাসীরা বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন চাষি। চাষ আবাদই এখানকার প্রধান জীবিকা। নদীবাহিত বিস্তৃত পলিগঠিত মাঠ-ময়দানে প্রচুর পরিমাণে ধান, আলু ও রবিশস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। গ্রামে চৈত্র অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা বেশ ধুমধামেই অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তার পাঠ শেষ করে ছেলেরা নিকটের পি.পি.ডি. হাইস্কুলে যায়।

সাঁকো ঃ— বর্ধমান থেকে দুর্গাপুরগামী জি. টি. রোডের কুলগড়িয়া চটিতে নেমে সামান্য দক্ষিণে ডি.ভি.সি. মেনক্যানেল পার হয়ে সাঁকো গ্রামে যাওয়া যায়। এটি গলসী থানার ১৫৪ নং জে.এল. ভুক্ত গ্রাম। গ্রামটি বেশ ঐতিহ্যপূর্ণ এবং প্রাচীনও বটে।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, একদা গ্রামে শঙ্খ বণিক সম্প্রদায়ের আধিক্য হেতু গ্রাম নাম সাঁকো হয়েছে। অন্যদিকে গ্রামে মহাধুমধামে আষাঢ় মাসের পঞ্চমীতে পূজিত হয় 'শঙ্খেশ্বরী' নামে দেবী মনসা। গ্রাম নামের ক্ষেত্রে শঙ্খেশ্বরী দেবীর নামের ভূমিকা যে থাকতে পারে না তা নয়। তবে ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন, সংক্রম (অর্থ সেতু) > সাঁকো হয়েছে [৫২]।

শোনা যায় একদা এক খালের দ্বারা গ্রামটি দামোদর নদের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সেই খালের জলপথ দিয়ে এখানকার বণিক সম্প্রদায় দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-

বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। এখন সেই জলপথের কোন চিহ্ন না থাকলেও গ্রামে 'লা ঘাটা' নামক স্থানটি অতীতে নৌকা পারাপারের ঘাটের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। হয়তো তখনকার দিনে সেই খাল পারাপারের জন্য সংক্রম বা সাঁকোও ছিল, যার থেকে গ্রাম নাম ডঃ সেনের মতে সাঁকো হয়ে থাকবে।

অতীত দিনের ঐ সব ব্যবসা বাণিজ্যের কথা স্মরণ করলে ধরেই নিতে হয় গ্রামটি বেশ প্রাচীন। সেদিক থেকে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি (১৫৪৪-১৫৭৭ খ্রিঃ) সময় কালে রচিত 'চণ্ডীমঙ্গলে' কবি মুকুন্দরাম সাঁকো গ্রামের শঙ্খ দত্তর, ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধে গমনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

সাঁকো হইতে বেনে আইসে নামে শঙ্খ দত্ত।
রাত্রিদিন বহে যার আট ঘোড়ার রথ।।

এতে প্রমাণ হয় যে গ্রামটি অন্তত পক্ষে প্রায় সাড়ে চারশ বছরের প্রাচীন তো বটেই।

গ্রামের পুরাকীর্তি ও উৎসব প্রসঙ্গে বলা যায়, গ্রামটি একটি ব্যতিক্রমী গ্রাম। কারণ সমগ্র রাঢ় বঙ্গে সৌর উপাসনার তেমন চল দেখা যায় না কিন্তু একমাত্র এই গ্রামেই এক সুন্দর প্রস্তর মূর্তিতে 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্' রূপী সূর্য 'উষাদিত্য' নামে এখানে সাড়ম্বরে পূজিত হন। তিনি নিত্য পূজিত হলেও মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তার বিশেষ বাৎসরিক পূজাও মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্যপ্রমাণে জানা যায় যে, গ্রামের হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ ভারত থেকে ভাস্কর্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন এই সূর্য মূর্তিটি এনে গ্রামে ১২১২ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে বর্ধমানের রাজ অনুগ্রহে বিগ্রহের সেবাপূজার ব্যবস্থাসহ দালান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। গ্রামের লোকেও এই সূর্যদেবতার পূজা দিয়ে তার প্রসাদ ও নির্মাল্য গ্রহণ করে থাকেন। মাঘ মাসে দেবতার বিশেষ পূজার দিন বিগ্রহসহ গ্রাম পরিক্রমা হয়ে থাকে। ঐদিন পূজা হোম যাগ-যজ্ঞাদি সম্পন্নের পর দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পরমান্ন প্রসাদ বিতরিত হয়।

গ্রামে অন্যান্য দেব-দেবীর অবস্থানের মধ্যে উল্লেখ্য হল একটি শিখর দেউলের শিবমন্দির, যা উনবিংশ শতকে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া গ্রামে আরও রয়েছে দু'টি আটচালা শিবমন্দির, একটি পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ, গ্রামের মাটির তলদেশ থেকে আবিষ্কৃত হওয়া বাসুদেব মূর্তি ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা যথা নিয়মে পালিত হলেও আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথিতে মহাধুমধামে পূজিত হয় 'শঙ্খেশ্বরী' নামে দেবীমনসা।

গ্রামটি কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও অনেকেই চাকুরিজীবীও আছেন। গ্রামে সাধারণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পোষ্ট অফিস, প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ হাইস্কুলও আছে। একদা এখানে

সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ চর্চা ছিল। সেখানে ধর্মদাস পণ্ডিতের টোলের বিশেষ খ্যাতিও ছিল কিন্তু বর্তমানে তা সবই অস্তমিত হয়েছে।

সামন্তপাড়া ঃ— গোপভূমের অন্যতম গোপরাজা ভাল্কীর ভল্লুপদর সৈন্য সামন্তরা এখানেই থাকত বলেই এই গ্রামের নাম হয়েছে সামন্তপাড়া। এটি ভাল্কী গ্রামেরই সংলগ্ন, পূর্বের ভাল্কীর একটি পাড়া, বর্তমানে এখন এক স্বতন্ত্রগ্রাম হিসাবে পরিচিত। গুসকরা, মনকর বাস রাস্তায় অভিরামপুর কিংবা সুয়াতায় নেমে উত্তরে অগ্রবর্তী হলেই এই গ্রামে যাওয়া যায়। অন্যদিকে গুসকরা-মোরবাঁধ রাস্তার আউশ গ্রামে নেমে দক্ষিণের মোবাম রাস্তা ধরেও গ্রাম যাওয়া যায়।

গ্রামটি ছোট হলেও এখানে বেশ কিছু পুরাকীর্তি লক্ষনীয়। তন্মধ্যে বর্ধমানের রাজা বিজয়চাঁদ মহতাবের তৈরি গ্রামের পশ্চিমে সম্পূর্ণ অরণ্য ঘেরা পরিবেশে অবস্থিত রাণী সায়ব ও তার পাড়ে কালী মন্দির উল্লেখ্য পুরাকীর্তির মন্দির, যার গায়ে কিছু টেবাকোটার কাজও লক্ষ কবা যায়। ব্রাহ্মণ পাড়ায় মৃদ্ধা পুকুরের পাড়ে তেঁতুলতলায় ধর্মরাজের আটন বর্তমান। সেখানে পূর্বে নেউল বাঁধি থেকে এতদ অঞ্চলের প্রখ্যাত ধর্মবাজ উদয়নারায়ণ যাতায়াত করতেন। এখন যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামে বেশ ধুমধামে ১৫-১৮ই বৈশাখের মধ্যে ২৪ প্রহর হরিনাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামে দুর্গোৎসব ও অন্যান্য উৎসবাদি সম্পন্ন হলেও পালেদের বাসন্তী পূজা সাড়ম্বরে চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রামে ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাস থাকলেও সদগোপদের সংখ্যাই বেশি। গ্রামটি বেশ আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন গ্রামও বটে। গ্রামটি মূলত কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও চাকুরিজীবীও আছেন তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। গ্রামে একটি পোষ্ট অফিসসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও আছে।

সাতকাহনিয়া ঃ— কাঁকসা থানার অধীন ৩৪নং জে.এল. ভুক্ত এক প্রাচীন গ্রাম সাতকাহনিয়া। পানাগড়-ইলামবাজার দার্জিলিং রোডের ১১ মাইল স্টপের পরে নেমে সামান্য উত্তর-পশ্চিমে অগ্রবর্তী হলে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি অজয় নদীর সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত। বনকাটি-অযোধ্যার পূর্বে এবং বসুধার উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান।

গোপভূমের গহন জঙ্গলের আরণ্যক পরিবেশে অবস্থিত প্রাচীন এই গ্রামটি এক প্রত্নক্ষেত্রও বটে। সুদূর অতীতে এতদ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের অধিবসতি যে গড়ে উঠেছিল তার বহু প্রমাণ এখানের বনকাটি, অযোধ্যা, সাতকাহনিয়া ইত্যাদি স্থানে পাওয়া গেছে। এই সাতকাহনিয়ায় পাওয়া গেছে শিলীভূত গাছের অংশ থেকে তৈরি আয়ুধ বা হাত কুঠার। এই বৃক্ষ জীবাশ্ম নির্মিত আয়ুধের বয়স আনুমানিক দেড়লক্ষ হতে দুলক্ষ বছর [৫৪]। এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে, বর্ধমান জেলার অজয় নদের কাছে সাতকাহনিয়া-বনকাটি অঞ্চলের প্রত্নক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব

অধিকার ১৯৬৫-৬৭ খ্রিঃ আবিষ্কার করেন। এখানকার বৈশিষ্ট্য হল fossil-wood বা প্রস্তরীভূত কাঠের প্রস্তরযুগের অস্ত্র [৫৫]। পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব অধিকার বনকাটি সাতকাহনিয়ার প্রত্নক্ষেত্রে পুরা প্রস্তরযুগের কোয়ার্টজ পাথরের কাটিবার হাতিয়ার (Chopping tool) ও 'ফসিলউড'-এর হাতকুঠার ও শেষ পুরা প্রস্তরযুগের কিছু আয়ুধ আবিষ্কার করে (তুলনীয় ব্রহ্মদেশের আনিয়াথাঙে প্রাপ্ত অনুরূপ আয়ুধ)। পরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ও এই অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে কোয়ার্টজ ও 'ফসিল উডের পুরাপ্রস্তরযুগ ও শেষ প্রস্তর যুগের কিছু আয়ুধ সংগ্রহ করে [৫৬]।

ঐ সকল পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এই এলাকা সুদূর অতীতে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে ঐ সকল গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে অজয় নদীর তীরেই বহুদূর বিস্তৃত এক তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তাও বর্তমানে সুদৃঢ় ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই সেদিন ২০০২ খ্রিঃ অজয়ের প্রলঙ্করী বন্যায় বাঁধ ভেঙে এই গ্রাম প্লাবিত হওয়ার কালে, গ্রামের একস্থানে মাটির তলদেশ থেকে প্রাচীন পুরাকীর্তিসহ প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে যা বয়সে বেশ প্রাচীন। অন্তত গুপ্তযুগীয় নিদর্শন বলে অনেকেই অনুমান করেন। তাই বলা যায় অতি প্রাচীন কাল থেকেই এখানে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এবং তা ক্রমানুসারী বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে যুগ পরম্পরায় প্রবাহমান ছিল।

সেদিক থেকে বলা যায় গ্রামটি খুবই ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম। এই গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাও এখানে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কৃষিপ্রধান এই গ্রামে অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজে জড়িত। এখানকার মাঠে প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, আলু ও রবি ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে। গ্রামে চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম। এখানে এক পীরের সমাধিও বর্তমান।

সোঁয়াই ঃ— কাঁকসা থানার আরণ্যক পরিবেশে গড়ে ওঠা এক প্রাচীন গ্রাম সোঁয়াই। কাঁকসা থেকে উত্তরে প্রায় ৩ কি.মি. এগিয়ে গেলে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আধিক্যই বেশি। তাছাড়া গ্রামে গোপ, সদ্গোপ ও অন্যান্য সম্প্রদায়সহ তপশিলি সম্প্রদায়েরও বেশ কিছু লোক বাস করে।

এই গ্রামে সোমেশ্বর শিব বিরাজিত থাকায়, গ্রামের গ্রাম্যদেবতা সোমেশ্বরের নাম থেকেই গ্রাম নাম সোঁয়াই হয়েছে। গ্রামের প্রায় মধ্যস্থলে এক সুন্দর মন্দিরে সোমেশ্বর শিবের অবস্থান। দেবতার নিত্যসেবা হলেও সারা বছর ধরে নানা শৈব অনুষ্ঠান যেমন শিবরাত্রি এবং শিবের গাজন খুবই আড়ম্বরে পালিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উপলক্ষে বহু ভক্ত সমন্বয়ও তাদের আকাশ ভেদি গর্জনে এখানকার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

গ্রামের দুর্গোৎসব ও বিশেষ জাঁকজমকে অনুষ্ঠিত হয়। দেবী পূজায় নানান প্রাচীন রীতিনীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। পূজায় বহু ছাগবলিসহ মহিষ বলিদানও হয়। মহিষ বলিদান দেখার জন্য এখানে বহু লোক সমাগমও হয়। গ্রামে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজাও যথা সময়ে হয়ে থাকলেও এখানে হরিনাম মহাযজ্ঞও খুবই গুরুত্বের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামটি কৃষিপ্রধান গ্রাম তাই অধিকাংশের জীবিকাই চাষআবাদ। তবে চাকুরিজীবীও কিছু আছেন। এই গ্রামেই সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিদুষী মহিলা হটীবিদ্যালঙ্কাব।

সারুল ঃ— গলসী থানাব ১১৬ নং জে. এল. এ অবস্থিত প্রাচীনগ্রাম সারুল। গলসী থেকে মাত্র তিন কি.মি. পূর্বে এর অবস্থান। গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বাস। এখানে, বেশ কিছু পরিবার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবকীর্তি বর্তমান। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল মুখার্জী পরিবাব সৃষ্ট প্রায় তিনশ বছরেব প্রাচীন এক শিখব দেউল মন্দির— যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পশৈলী সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করে। মন্দির গাত্রের পশ্চাৎভাগে টেরাকোটার এক মিথুন মূর্তি লক্ষনীয়। মন্দিরটির তলদেশ বিশেষভাবে ক্ষয়িত হয়েছে। এর অচিরাৎ সংস্কার প্রয়োজন, নচেৎ যে কোন দিন ভেঙে পড়বে।

এবার আসা যাক গ্রামের প্রবেশ পথে ভট্টাচার্য পবিবার প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ এবং একটু সরে এক দালান মন্দিরে অবস্থিত বিশালাক্ষী দেবীর কথায়। দেবী এখানে নিত্যপূজিতা হলেও বৈশাখী পূর্ণিমায় দেবীর বাৎসরিক বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিশালাক্ষীব মূর্তি বলতে একখণ্ড প্রস্তরের উপর কেবল দেবীর বড় বড় চোখ আঁকা আছে, তাই বিশাল অক্ষি বা চক্ষুর জন্যই দেবী বিশালাক্ষী নামেই খ্যাত। দেবীর বিশেষ পুজায় একবিশেষ রীতি হল পাশের গ্রাম শ্রীধরপুর থেকে ধর্মরাজ চাঁদ রায়ের আটন থেকে পোড়ামাটির ঘোড়া আনা হয়। সেই মাটির ঘোড়া আনার পর দেবী বিশালাক্ষীর পূজা শুরু হয়।

এখন রায় পরিবার প্রতিষ্ঠিত তাদের কুলদেবতা রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের কথা বলা যাক। যুগল বিগ্রহ অধিষ্ঠিত এই মন্দিরে সমস্ত বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানাদিসহ সারা বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও গ্রামের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এক প্রাচীন শিখর দেউলে শিবলিঙ্গ। আর রয়েছে চ্যাটার্জীদের স্থাপিত একজোড়া পঞ্চরত্নের শিবমন্দির। শিব এখানে নিত্য সেবিত। এই মন্দিরদ্বয়ের পিছনেও আর এক জোড়া শিখর দেউলের শিবমন্দির বর্তমান। গ্রামে হরিনাম সংকীর্তনাদিও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য দেবদেবীর পূজাদিও হয়ে থাকে।

গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। চাকুরিজীবীও আছে তবে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

সালডাঙ্গা ঃ— প্রাচীন সিলামপুর পরগনার, বর্তমান চাকতেঁতুলে পঞ্চায়েতের আওতায় সালডাঙ্গা একটি ছোট গ্রাম। বুদবুদ থানার ডি.ভি.সি. ক্যানেলের দক্ষিণে, ৩ নং জে. এলে. এর অবস্থান। গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌গোপদের সংখ্যাই বেশি। নিম্নসম্প্রদায়ের মধ্যে বাগদিদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও এখানে ডোমেদের সংখ্যাও কম নয়। ডোমেদের মধ্যে আঁকুড়ে ডোমেরা পূর্বে রাজা বাদশার আমলে সৈনিকের কাজ করতো। পরবর্তীকালে তারা জমিদারদের লাঠিয়ালের কাজ করত। এখন তারা কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

গ্রামের উত্তরে ডি.ভি.সি. ক্যানেল দু'বার জল দেওয়ায় প্রায় ৮ মাস জলে পরিপূর্ণ থাকে। গ্রামে ঐ ক্যানেল পারাপারের জন্য কোন ব্রীজ না থাকায় মাঠে চাষ আবাদের জন্য এবং ভিনগ্রামে যাতায়াতের জন্য ক্যানেলে ফেরিঘাট আছে।

গ্রামে এক ছোট মন্দিরে ধর্মরাজের বিগ্রহ আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় সেখানে ধর্মরাজের গাজন পালিত হয়। গাজনে বহু ভক্ত হয় এবং নানান কৃচ্ছসাধন কৃত্যাদিও নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। গ্রামে ধর্মরাজই গ্রাম্য দেবতা। গ্রামে অন্যান্য দেবদেবতার পূজা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হলেও সাড়ম্বরে মনসা ও কালীপূজা হয়ে থাকে। ১লা আশ্বিন গ্রামে বেশ কয়েকটি জায়গায় দেবীমনসার পূজা হয়ে থাকে। এক জায়গায় পাকা মন্দিরসহ অন্যত্র আটনে কোথাও মৃন্ময়ী মূর্তি, কোথাও ঘটবারিতে দেবী মনসার পূজা ধূমধামেই পালিত হয়। এখানে ডাকসংক্রান্তি উপলক্ষেও মানসাপূজার চল আছে। এখানকার মনসাপূজায় কাঁটা ভাঙ্গা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মনসাপূজা গ্রামে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলেও বাগদি সম্প্রদায়ের লোকেরাই এতে বেশি অংশ নিয়ে থাকে। গ্রামে ২৪ প্রহর হরিসভাও হয়ে থাকে। এখানকার কালী মূর্তি এতদঅঞ্চলের মধ্যে বড়।

কৃষি প্রধানগ্রাম। গ্রামের প্রায় সব লোকই চাষ আবাদের সঙ্গে যুক্ত। চাকুরীজীবীর সংখ্যা কম। নিকটবর্তী রেলস্টেশন পানাগড়। সেখান থেকে নেমে বাস যোগে ভরতপুর হয়ে কিংবা হেঁটে গ্রামে যাওয়া যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হয়েছে গ্রামের পূর্বদিকে রাস্তা প্রসারিত হওয়ায়। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ও আছে।

সাঁকুরী ঃ— বুদবুদ থানার অধীন ভরতপুর মৌজায় সাঁকুরী গ্রাম অবস্থিত। এর জে.এল. নং-২ পানাগড় থেকে ভরতপুর হয়ে এই গ্রামে যাওয়া যায়। মাঝারি ধরনের গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, গোপ, তিলি ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস তবে মুসলমান নাই। অন্ত্যজসম্প্রদায়ের সংখ্যাও কম নয়। কৃষিপ্রধান গ্রাম। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম।

গ্রামে প্রধান উৎসব তিনটি— যথা ধর্মরাজের গাজন, ২৪ প্রহর ও বাসন্তী পূজা। তবে ধর্মরাজের গাজনই গ্রাম্য উৎসব। একতলা দালান মন্দিরে ধর্মরাজ বুড়োরাজের

অবস্থান। ইনি কূর্মাকৃতি, লোক বিশ্বাস এরা সাতভাই বিভিন্ন নামে পাশাপাশি গ্রামে অবস্থিত আছেন। মহাধুমধামে বিভিন্ন কৃত্যাদিসহ যেমন— বানফোঁড়া, জিভ বান, অষ্টাঙ্গবান, ধূনাসেবা, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড লম্ফদানে পার হওয়া ইত্যাদি এখনও পালিত হয়। পূর্বে পাটভাঙ্গা, অগ্নিগড় ইত্যাদি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ভক্তের বুকে পা দিয়ে পুরোহিত মূর্তি নিয়ে যায়। এই গ্রামের গাজনে এখনও ধর্মমঙ্গলের পালাগান গাওয়া হয়। বিপত্তারণ মুখার্জী-ই তা করেন। এখানকার ধর্মরাজের নামে একশিরা প্রতিরোধের ওষুধ দেওয়া হয়। এই ধর্মবাজেব ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র তুলে দেওয়া হল—

ধ্যানমন্ত্র ঃ ওঁ নিরঞ্জন নিরাকার নিশাবর্ত্তাং বন্দেময়া বরাভযং
ধর্মঅনাদ রূপীনাং ধ্রাং ধ্রীং ধ্রু ধর্মরাজায় নমঃ

প্রণামমন্ত্র ঃ বাজদ্বাবে মহা ঘোরে যমদ্বারে শ্মশানে চ প্রণমামি ধর্মরাজায় নমঃ।

গ্রামে দ্বিতীয় উল্লেখ্য উৎসব হল চৈত্রমাসে বাসন্তীপূজা। চার দিন ধরে মহাসাড়ম্বরে ছাগবলিসহ এই পূজা সম্পন্ন হয়। ২৪ প্রহর হরিনাম যজ্ঞও গ্রামের উল্লেখ্য উৎসব। ঐগুলি ছাড়াও গ্রামে দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী পূজাও হয়ে থাকে। গ্রামে সংস্কৃতির চর্চা আছে। এখানে রয়েছেন কবিয়াল হারাধন আকুড়ে, রয়েছেন বাউল গায়ক, বেতার শিল্পী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

সরপী ঃ— ফরিদপুর থানার অন্তর্গত ৩৪ নং জে.এল. ভুক্ত গ্রাম এই সরপী। দুর্গাপুর থেকে সরাসরি বাস যোগে এই গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামটি উখরা থেকে মাত্র ২ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অতীতের গোপভূমের জঙ্গল মহলের মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থান, জঙ্গল পরিষ্কার করে তখনকার দিনের এতদ অঞ্চলের জমিদাররাই এখানে বসতি গড়ে তোলেন। যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় এখানের জমিদার অর্জুন রায়চৌধুরীই নবাব সরফরাজ খানের কাছে ইজারা নিয়ে এখানে যে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন তাই 'সরফপুর' নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীকালে উচ্চারণ বিকৃতির দৌলতে তা সরফ > সরপ > সরপী-তে পরিণত হয়। সেদিক থেকে এই গ্রাম নামটি এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাম থেকে।

জমিদার রায়চৌধুরীদের পরবর্তী বংশধরদের দ্বারা বেশ কয়েকটি পুরাকীর্তি তথা দেবকীর্তি গ্রামে সংস্থাপিত হয়েছে। যেমন— জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ অর্জুন রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর কর্তৃক গ্রামের পূর্বদিকে একটি মনোরম সরোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সরোবরের নাম হয় 'রামসায়র'। পরে তিনিই সেই সায়রের পাড়ে ল্যাটেরাইট পাথরের দ্বারা দু'টি সুন্দর শিবমন্দির নির্মাণ করে তাতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামেশ্বরের অন্যপুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ১৬৭৭ শকাব্দে বা ১৭৫৫ খ্রিঃ এই গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোপালজিউ এর নবরত্ন মন্দির। মন্দির গাত্রে টেরাকোটা শিল্পের অপূর্ব শিল্প সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম। তবুও শিল্প ও খনি এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এখানের অনেক লোকই চাষআবাদ ছাড়াও ব্যবসা ও চাকুরিতে নিয়োজিত আছেন।

সাঁকতোরিয়া ঃ— কুলটি থানার অধীন বরাকরের সন্নিকটে আসানসোল শিল্পাঞ্চল-এর আওতায় এক সমৃদ্ধ শিল্পক্ষেত্র। এখানেই গঠিত হয়েছে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়। মাটির নীচে থেকে তোলা কয়লাকে ঘিরেই এটি এখন এক কর্মচঞ্চল শহরে পরিণত হয়েছে। ভিনপ্রদেশ থেকে আগত বহু ব্যক্তির সমাবেশে এটি এখন মিশ্রকৃষ্টি সম্পন্ন শহবে পর্যবসিত হযেছে। এখানে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোলবোর্ড নির্মিত হাসপাতালটি সবিশেষ উল্লেখ্য।

(হ)

হিট্টা ঃ— গলসী থানাব অন্তর্গত ১৪৭নং জে.এল. ভুক্তগ্রাম হিট্টা। খানা জংশন থেকে উত্তরে ৩ কি.মি. মোরাম রাস্তায় অগ্রবর্তী হলে গ্রামে যাওয়া যায়। অন্যদিকে গুসকরা-বর্ধমান সিউড়ী রোডের হলদিস্টপে নেমে পশ্চিমে মোরাম রাস্তা ধরে ৩ কি.মি. গেলে গ্রামে যাওয়া যায়।

গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়েরই বাস। তাদের মধ্যে কিছু ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয় ও কায়স্থ ছাড়া অধিকাংশই গোপ। সেদিক থেকে এটি গোপ প্রধান গ্রাম। গ্রামে তপশিলি সম্প্রদায়েরও কিছু লোক আছে। গ্রামে রায়পাড়ায় একটি দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজনও হয়, তবে সবথেকে ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয় কালীপূজা। এই কালীমৃন্ময়ী কালী এবং তার পূজা অনুষ্ঠিত হয় অগ্রহায়ণমাসের ২০ তারিখের পর মঙ্গলবারে। এটি গ্রাম সাধারণের পূজা এবং গ্রাম্যদেবী হিসাবেই এই পূজা বিশেষ ধুমধামে বিভিন্ন উপাচারে বহু ছাগবলিসহ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই গ্রামবাসী আত্মীয়-পরিজনদের গ্রামে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাকে ঘিরেই নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি যেমন যাত্রা, কবিগান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে চণ্ডীর আটনও আছে। সেখানেও ঐ কালীপূজার দিনেই চণ্ডীপূজা হয়ে থাকে।

কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম। তাই গ্রামের অধিকাংশের জীবিকাই কৃষি নির্ভর। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম।

হাঁসুয়া ঃ— বুদবুদ ব্লকের ৬নং জে.এল.এর আওতায় অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম হাঁসুয়া। বুদবুদ থেকে জি.টি. রোড বরাবর ৪কি.মি. পশ্চিমে সেনাছাওনির ৭নং গেট পার হয়ে দক্ষিণে অগ্রবর্তী হলে হাঁসুয়া গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামে বর্ধমানের রাজাদের প্রতিষ্ঠিত একতলা দালান মন্দিরের এককক্ষে রয়েছেন পাষাণময়ী হংসেশ্বরী কালী, অন্য কক্ষে হংসেশ্বর শিব। এই হংসেশ্বর ও হংসেশ্বরী নাম থেকেই গ্রাম নাম হাঁসুয়া।

সেনা নিবাসের প্রয়োজনে এই গ্রামটি অধিগৃহীত হলেও জাগ্রত দেবতা ক্ষেত্রপালের সৌজন্যেই তার আটন এলাকা সেনা অধিকারের বাইরেই রয়েছে। প্রতিদিন বহু বহু লোক বিভিন্ন পূজাউপকরণসহ এখানে সমবেত হয়ে মনোস্কামনা পূরণের জন্য পূজা দেন। সারাদিন ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে এবং তাদের পূজা অর্চনার কাজও চলতে থাকে। তাই এখানকার পৌরহিত্যেব্রতী কোটাগ্রামের ব্রাহ্মণেরা সারাদিন পালা করে অবস্থান করেন।

মূল গ্রামটি এখান থেকে সরে গেলেও বেশ কয়েকটি তেঁতুল বৃক্ষের অবগুণ্ঠনে ঢাকা ক্ষেত্রপালের আটন স্বস্থানেই বর্তমান। সেখানে পশ্চিমমুখী একতলা দালান মন্দিরে কাঠের বেদীর উপর দেবতার অবস্থান। ক্ষেত্রপাল দেবতা হিসাবে হলেন ভৈরব। এখানে তার ধ্যানমন্ত্রটি হল নিম্নরূপ ঃ—

ওঁ ভ্রাজচ্চন্ড জটাধরং ত্রিনয়নং নীলঞ্জনাদি প্রভম,
দোর্দ্দন্ডাওগদাক, পালমরুনস্রগ্ গন্ধ বস্ত্রোজ্জগম।
ঘন্টা মেঘলঘর্ঘর ধ্বনি সিলজ ঝঙ্কারভীমং বিভুং,
বন্দেহ হংসিত সর্পকুন্ডল ধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা।।

এই ভৈরব ক্ষেত্রপালের আটনেই সহ দেবদেবী হিসাবে আরও কয়েকটি মূর্তি রয়েছে। তারমধ্যে পাশেই যে ভগ্ন দেবীমূর্তি অবস্থিত সেটি চণ্ডীর ধ্যানে পূজিত হয়। ক্ষেত্রপালের দুপাশে দুটি সাদা বড় ঘোড়া ও দু'টি ষাঁড়ের মূর্তিও বর্তমান। ক্ষেত্রপাল নিত্য পূজিত হলেও প্রতি শনি, মঙ্গলবার ছাড়াও ১লা মাঘ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরায় বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। প্রতিদিন প্রচুর লোক সমাগম হলেও বিশেষ পূজার দিনগুলিতে ক্ষেত্রপালতলা জনসমুদ্রের রূপ নেয়। তখন ভক্তদের ভিড় সামলাতে সেনাছাউনির জওয়ানরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই আসেন সন্তান কামনায় এবং সন্তানদের রোগমুক্তি ও তাদের কল্যাণ কামনায়।

ভক্তদের নানাবিধ মনোস্কামনা এখানে পূজা দেওয়ায় পূরিত হয়। তাই মানতপ্রদান এর নিমিত্ত ভক্তরা এখানে সমবেত হয়। মন্দিরের সামনে এক সুন্দর জলাশয়, যার পূর্ব পাড় দেবসেবা ও ভক্তদের স্নানাদির জন্য চওড়া ও সুন্দর করে বাঁধানো, তাতে স্নান সেরে ভক্তরা পূজা প্রদান করেন। এখানে দেবতাকে এক বিশেষ দ্রব্য প্রদানের রেওয়াজ আছে— সেটি হল ঘন্টা প্রদান। তাই এখানে দেবস্থানে কয়েক হাজার বিভিন্ন মাপের কাঁসার ঘন্টা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। তাছাড়াও পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া ও নানাবিধ উপহারসহ ছাগবলিদানেও পূজা দেওয়া হয়। ছাগবলি দেওয়ার কোন সময় নির্ধারিত নাই। যে কোন সময় ভক্তরা তা প্রদান করতে পারেন তাই প্রায় প্রতিদিনই যখন-তখন ছাগবলি নিবেদিত হয়ে থাকে।

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কোন গোপ এই দেবতার পূজা প্রথম শুরু করেন আর মানকরের

নিকট কোটা গ্রামের মধুসূদন চক্রবর্তীও স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দেবতার পূজা শুরু করেন, তাই কোটার ব্রাহ্মণরাই ক্ষেত্রপালের পূজক। দেবতার মাথার উপরে রয়েছে তিনটি সর্পছত্র। ভক্তদের সুবিধার জন্য রাস্তা থেকে আটন পর্যন্ত মাথার উপর বরাবর করগেটের ছাউনির ব্যবস্থা রয়েছে।

হিজলগড়া ঃ— জামুরিয়া থানার ৪০ নং জে.এল. ভুক্ত এক ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম হিজলগড়া। জামুরিয়া থেকে মাত্র ৪ কি.মি. পূর্বে সরাসরি বাসযোগে গ্রামে যাওয়া যায়। এটি অজয় নদীর সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে অনুমান—একদা হিজলজঙ্গলে পরিবৃত কোন ছোট পুকুর বা গড়েকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠাগ্রামই হিজলগড়া নামে খ্যাত হয়েছে। গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। আর পাঁচটি গ্রামের মত এটিও কৃষিপ্রধান গ্রাম।

গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হলেও গ্রামের গ্রাম্য দেবতা হলেন ধর্মরাজ। এই পূজা বা গাজনকে কেন্দ্র করেই গ্রামের লোক, আত্মীয়-পরিজনদের তাদের গ্রামে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। বঙ্গে ধর্মরাজঠাকুরকে নিয়ে এ পর্যন্ত উল্লেখ্য গবেষণাগ্রন্থ 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর' গ্রন্থে নিষ্ঠাবান গবেষক শ্রদ্ধেয় ডঃ অমলেন্দু মিত্র এই গ্রামের ধর্মরাজ পূজায় আনুষ্ঠানিক বৈচিত্রের যে স্বকীয়তার বর্ণনা দিয়েছেন পাঠকের জ্ঞাতার্থে তা নীচে তুলে দেওয়া হল—

"গ্রামের মধ্যে ধর্মরাজের পাকা মন্দির। ছয়টি শিলাখণ্ড। নাম অনাদিনাথ, বুড়ো শিব, আবালেশ্বর শিব, ধর্মরাজ, বুড়ো রায়, বানেশ্বর শিব। বেদীর সন্নিকটে সিংহাসন, পাল্কী, ঘোড়া ও পাদুকা। দোয়াশী শেঠ (ধীবর), পুজারী ঘোষাল। এই ধর্মরাজের সেবা পূজাদির জন্য বর্ধমান মহারাজ উদয়চাঁদ সম্পত্তি প্রদান করেন।

বৈশাখে নৃসিংহ চতুর্দশীতে পূজা শুরু হয়। ত্রয়োদশী বারের দিন। ভক্তরা কালাপুকুরে স্নানাদি করে নিকটস্থ শিব ও হনুমানজীর পূজা করেন। সেখান থেকে হট-টং-টং অর্থাৎ এক পায়ে দৌড়ে গাজন পর্যন্ত আসে এবং শিবমন্দিরে গিয়ে দুটি লোহার দণ্ডে পা ঝুলিয়ে অধোমুখে শিবপূজা করে। পরে বাড়ি গিয়ে জলযোগ করে ফিরে আসে এবং স্থানীয় দেবদেবীর নামগান করে ভক্তারা পাঁচালী গেয়ে থাকে। পরে রাত্রি ২ ঘটিকার সময় একটি বাঁশেরঝাড়ের বাঁশে হাত দিয়ে জাগিয়ে আসে। সেই বাঁশের একটি টোকা তৈরি করে পূজার দিন ভোররাত্রে ধর্মরাজকে স্নান করায়। এর নাম মুকতোলা। চতুর্দশীর দিন পূজা ও হোম। এইদিন বহু ভক্ত নানাগ্রাম থেকে উপবাস করে সেখানে আসে এবং মানসিক অনুযায়ী কেউ হোলাবান, কেউ দণ্ডী দেয়, কেউ শিবকুড়ি নামক জায়গা থেকে গড়াগড়ি দিয়ে ধর্মস্থান পর্যন্ত আসে। কেউ শক্তিশেল নিয়েও আসে। ভোরবেলা মুকতোলা হয়। সেখানে ভক্তরা শ্মশান থেকে নীত অঙ্গার, আগুন ধরিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করে খেলা করে। ঐদিন সগড়বান নামে বান আসে। তাতে একটি ভক্ত্যা

শিবকুড়ি নামক জায়গা থেকে উপরদিকে পা বেঁধে অধোমুখে আগুনে আহুতি দিতে দিতে মন্দিরে আসে। পূর্ণিমার দিনে কোন পূজা হয় না। ঐ দিন কাষ্ঠনির্মিত দোলায় ধর্মরাজকে চড়িয়ে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্নান শেষে ঠাকুরকে রাধাচক্রবান বা বানেশ্বরে চড়িয়ে আনা হয়। এব উপর একজন ভক্ত্যা চড়ে থাকে। পরদিন বলির পর দেবতাকে যথাস্থানে রক্ষা করা হয়।" (৫৭)

এতো গেল গ্রাম্য দেবতা ধর্মরাজের কথা। ধর্মরাজ ছাড়াও এখানের ঐ প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন অন্যান্য অনেক সহদেবতা, তাদের পূজাও যথাযথভাবেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়াও গ্রামে অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাও হয়ে থাকে। গ্রামটি মুখ্যত কৃষিপ্রধান গ্রাম। চাষ আবাদই গ্রামবাসীর মুখ্য জীবিকা। কিছু চাকুরিজীবীও আছেন।

হীরাপুর ঃ— ১৮নং জে.এল. ভুক্ত এই গ্রামই হীরাপুর থানার সদর কার্যালয়। আসানসোল থেকে ট্রেনে এই গ্রামে যাওয়া যায়, তবে বাসেই সরাসরি যাওয়ার সুবিধা। দামোদর নদের উত্তর তীরে এর অবস্থান।

গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ মাণিকচাঁদ কর্তৃক মদনগোপালের বিগ্রহ গ্রাম মধ্যে এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হচ্ছেন। মন্দির সন্নিকটে মাণিক চাঁদের সমাধিমন্দিরও বর্তমান।

খনি এলাকাভুক্ত হওয়ায় এখানে কাজের সন্ধানে বহিরাগত বহুজনের আবির্ভাব ঘটেছে, সেই সঙ্গে এই এলাকা আসানসোল শিল্পাঞ্চলের আওতায় পড়ায় এটি ক্রমশ তার গ্রাম্যরূপ হারিয়ে চকচকে ঝকঝকে শহররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।